শারদীয়া ১৪২৭
বর্তমান

আগমনীর আবাহনে
তন্তুজের সাজে

শপ অনলাইন

www.tantuja.in | www.flipkart.com
www.amazon.in/com | www.gocoop.com

ZEE বাংলা
নতুন ছন্দে লিখব জীবন
SUNRISE
Presents
সা রে
গা মা
পা
মন ভালো করা
গান নিয়ে আসছে
Co-powered by
fortune
rice bran health
Special Partner
Paragon
শনি-রবি। রাত 9:30

শা র দী য়

বর্তমান

১ ৪ ২ ৭

সূ চী প ত্র

স্টিল থেকে জন্ম
সহ্যশক্তি অসামান্য

স্টিলের মতো মজবুত নির্মাণ

সূ চী প ত্র

উপন্যাস

বড় গল্প

সূ চী প ত্র

গল্প

সূ চী প ত্র

ভ্রমণ

খেলা

খাওয়াদাওয়া

SWAMI VIVEKANANDA UNIVERSITY

EXCELLENCE . INNOVATION . ENTREPRENEURSHIP

www.swamivivekanandauniversity.ac.in

For Admission Related Queries

9163372101 | 8910554937

Salient Features :

- 17 Institutes
- 25000+ Students
- 30000+ Alumni
- 800+ Faculties
- 45 Different Courses
- Foreign Collaboration
- 24 x 7 E-Learning support
- Tailor-made curriculum for placement
- Corporate paid internship in Final Year
- Convergence of Industry and Academia
- Internationally benchmarked Group of Mentors
- On campus school of foreign studies and foreign languages

COURSES OFFERED

- Diploma - B.Tech - M.Tech - B.Sc(H) Agriculture - Hospital Management
- BBA - BCA - BTTM - MBA - MCA - Hotel & Hospitality Management
- B.Com - M.Com - Journalism - Psychology - Nutrition - Biotechnology
- Microbiology - Physiotherapy - Optometry - Data Science - Cyber Security

দুর্গা পূজার আনন্দ উৎসবে
আপনার মুখে খুশির হাসি নিয়ে আসার জন্য
আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

পার্সোনাল গোল্ড লোন
7.50%* হারে

কার লোন
7.50%* হারে

হোম লোন
6.95%* হারে

পার্সোনাল লোন
9.60%* হারে

আপনার বাড়িতে
বসেই বেশ আরামে ইয়োনো
এসবিআই অ্যাপের মাধ্যমে
লোনের জন্য আবেদন করুন

অধিক বিবরণের জন্য, কল করুন 1800 425 3800/1800 11 2211 অথবা ভিজিট করুন: bank.sbi | এখানে আমাদের অনুসরণ করুন

সূ চী প ত্র

সিনেমা

অতিথি সম্পাদক: **কাকলি চক্রবর্তী**
সহ সম্পাদক: **জয়ন্ত দে**

অলংকরণ: সুব্রত মাজী, সোমনাথ পাল, রঞ্জন দত্ত, প্রণব হাজরা, দেবাশিস সাহা

গ্রাফিক্স: সঞ্জয়কুমার দে, চিন্ময় গড়গড়ি
প্রচ্ছদের ছবি: রৌণক মুখোপাধ্যায়

জীবানন্দ বসু কর্তৃক ৬, জে বি এস হ্যালডেন অ্যাভেনিউ, কলকাতা- ৭০০১০৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ
DUTA
CORIANDER
TURMERIC
RED CHILLI
Kasuri Methi
TURMERIC
CUMIN
ডাটা
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্মী) প্রাইভেট লিমিটেড

• বিশেষ রচনা

এক সন্ন্যাসী ও তাঁর সপ্তজননীর অমৃতকথা

শংকর

গর্ভধারিণী জননী

বৈরাগ্যে বিভোর হয়ে সংসার ত্যাগ করে আবার গর্ভধারিণী জননীর সঙ্গে বার বার যোগাযোগ করাটা সন্ন্যাসোচিত নয় এমন সমালোচনা আমাদের স্বামীজিকে এখনও সহ্য করতে হয়।

বিবেকানন্দ অনুসন্ধানের শুরুতে গর্ভধারিণী ভুবনেশ্বরী দেবীর সঙ্গে তাঁর বার বার যোগাযোগ ও দুশ্চিন্তার কিছু বিবরণ দিয়ে একসময় সন্ন্যাসীমহলে কিছু অস্বস্তি সৃষ্টি করেছিলাম।

এঁদের কেউ কেউ মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, আত্মশ্রাদ্ধ ও বিরজা হোমের মাধ্যমে অতীতের সঙ্গে যাঁকে সমস্ত সম্পর্কচ্ছেদ

করতে হয় তাঁর পক্ষে নিঃশব্দে পূর্বাশ্রমের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটা ধর্মপথের অন্তরায়। মনের মধ্যে যখন সামান্য দ্বিধাবোধ, তখন ভাবছি সংসারের সব নিয়মকানুন ভেঙে ফেলাটাই যাঁর স্বভাব তিনি কেন সন্ন্যাসী হয়েও মায়ের কথা ভাববেন না? মনে মনে ভাবছিলাম, স্বামীজির বিখ্যাত উক্তি, যে মাকে খেতে দেয় না, সে কী করে বিশ্বজনের ক্ষুধা নিবারণ করবে?

আরও ভেবেছি, স্বামীজি কি অভাব সন্ন্যাসী? না স্বভাব সন্ন্যাসী? সংসারের অভাবে তিতিবিরক্ত হয়ে, যথাসাধ্য চেষ্টা করেও চাকরি না পেয়ে, নিতান্ত হতাশ হয়ে, তিনি ত্যাগের যে পথ বেছে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর এবং কাশীপুরে ছুটেছিলেন তা কি অভাব সন্ন্যাসীর লক্ষণ? নাবালক ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে ভিটেমাটি নিয়ে মামলার সময় যাঁরা তাঁদের দায়িত্বপালন না করে পিছপা হন তাঁরা কি আদর্শ পুরুষ?

আমরা দেখছি, ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রিয় সন্তান, বৈরাগ্যে বিভোর হয়েও, গর্ভধারিণীর অর্থাভাব মেটাবার চেষ্টা করছেন, কর্জ করছেন, কোর্ট-কাছারি করছেন এবং দেহাবসানের আগের দিন পর্যন্ত উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করছেন মা ও ভাইবোনরা যাতে ঘরছাড়া না হয়।

নানা সময়ে নানা কথা উঠেছে, সন্ন্যাসী সঙ্ঘের টাকা কি তিনি পূর্বাশ্রমের প্রিয়জনদের পিছনে ঢালছেন? মেজভাই মহিমকে আচমকা বিলেতে পাঠানোর খরচ কীভাবে জোগাড় হল? ভিটেবাড়ির মামলায় উকিল-ব্যারিস্টারের খরচ কে দিল?

ছোটভাই ভূপেন দত্ত তো পরবর্তীকালে সোজাসুজি লিখে দিলেন, উকিল ব্যারিস্টার কেউই বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করেননি, ব্যারিস্টারদের তো নগদ দিতে হতো।

আবার বরানগর মঠ থেকে মামলার প্রথম রাউন্ডে হেরে গিয়ে প্রিয় বন্ধু ও সন্ন্যাসীভ্রাতা রাখাল মহারাজের শরণাপন্ন হলেন তিনি এবং প্রিয় সন্ন্যাসীবন্ধু লোকজনের ব্যবস্থা করে ভিটে রক্ষার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তাতেও মুক্তি নেই, লোকের সন্দেহ, সঙ্ঘের টাকা তিনি কি মা ভাইবোনদের পিছনে ব্যয় করছেন? তিনি বলছেন, এক পয়সাও নিইনি, যা দিয়েছি নিজের রোজগার থেকে, এবং যা স্পষ্ট হচ্ছে, নিদারুণ অভাবের সময় তিনি ধার করেছেন এবং সুদের টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে তাঁর দেহাবসানের পরেও।

মোদ্দা কথাটা হল, সন্ন্যাসের চিরকালীন আচরণবিধির তোয়াক্কা না করে আমাদের বীরসন্ন্যাসী বারবার গর্ভধারিণী মায়ের কাছে মঠের তরিতরকারি পাঠালেন, মাকে নিয়ে পূর্ববাংলায় তীর্থ দর্শনে গেলেন, তার আগে কোর্ট-কাছারি করলেন, রেজিস্ট্রি অফিসে বারবার গিয়ে দানপত্র রেজিস্ট্রি করালেন, অভিমানী পরিব্রাজক ভাই যাতে মাকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে তার ব্যবস্থা করলেন, অন্য ভাইকে বললেন, বংশ রক্ষার জন্য বিয়ে করা প্রয়োজন। আরও কত কী করলেন।

জাহাজে চড়ে দ্বিতীয়বার বিদেশযাত্রার সময় স্বামীজি খোলাখুলি বললেন, বয়স একটু কম হলে, মায়ের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে সংসারাশ্রমে ফিরে গিয়ে বিবাহিত হতেন এবং তা শুনে বিদেশিনি শিষ্যা নিবেদিতা বললেন, থ্যাংক গড়, আপনার বয়স দশ বছর কম নয়! এবং সেই নিয়ে কত হাসাহাসি। অত ভেবেচিন্তে 'অচেনা অজানা বিবেকানন্দ' লিখতে বসিনি, কোনো লুপ্তরত্ন উদ্ধারও করিনি, শুধু অবাক হয়েছি, মানুষটার দুঃসাহস দেখে, কোথাও কোনো ঢাক ঢাক গুড়গুড় নেই, সন্ন্যাসীর সমস্ত জীবনটাই কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত।

একমাত্র তিনিই লিখতে পারেন (১৭ জানুয়ারি ১৯০১)— 'এখন আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, মঠের সব ভাবনা আমাকে ত্যাগ করতে হবে এবং একসময়ে আমাকে গর্ভধারিণী মায়ের কাছে ফিরে যেতে হবে। আমার দরুন তাঁর অনেক দুর্দশা হয়েছে। তাঁর শেষদিনগুলি আমি মসৃণ করতে চেষ্টা করব। মঠের একটা ট্রাস্ট দলিল করতে চাই সারদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও তোমার (ধীরামাতা) নামে।... তারপর আমি শান্ত হবো। আমি চাই বিশ্বাস, একমুঠো অন্ন, খানকয়েক বই এবং কিছু লেখাপড়ার কাজ।...এখন দেখা যাচ্ছে ১৮৮৪ সালে আমার মাকে ছেড়ে আসা মহাত্যাগের বিষয় ছিল— মায়ের কাছে ফিরে যাওয়া আরও ত্যাগের বিষয় হবে।'

নিজের ব্যাপারেই একটু ফেরা যাক। কয়েকজন তরুণ সন্ন্যাসীর অস্বস্তির কথা আমার মনকে যখন ব্যথিত করছিল, বুঝতে যখন চেষ্টা করছিলাম সংসারাশ্রমের সঙ্গে অহেতুক যোগাযোগ রাখা যখন বিধেয় নয় তখন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার অচেনা দিকটার প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে অকারণে আমি সঙ্ঘসেবকদের আঘাত করছি কি না? এর কি কোনো প্রয়োজন আছে?

এমনই এক কঠিন সময়ে খবর এল, মঠ মিশনের বিদগ্ধ প্রধান স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ম্যাগাজিন থেকে আমার লেখাটি পড়েছেন এবং আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। আরও শুনলাম, তিনি তরুণ ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং তাঁদের কয়েকজনকে লেখাটি পড়ে দেখতে বলেছেন।

দুরু দুরু বক্ষে এই সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রবীণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে বেলুড়ে দেখা করতে গিয়েছি। দক্ষিণ ভারতীয় এই সন্ন্যাসী শুদ্ধ বাংলায় যা বললেন— তোমার লেখাটা পড়ে খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। বিবেকানন্দ-জননীর অন্তরঙ্গ কথাগুলো একত্র করে তুমি ভালো কাজ করেছ। কমবয়সে রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে রামকৃষ্ণ মিশনে রাঁধুনির কাজ করেছি, তারপর যথাসময়ে সন্ন্যাসী হয়েছি। তারপর একসময় বাবার গুরুতর অসুস্থতার খবর পেলাম, তাঁর অন্তিমসেবায় দীর্ঘসময় সঙ্ঘ থেকে দূরে থাকায় শৃঙ্খলাভঙ্গের আশঙ্কা ছিল। কিন্তু তখন আমি সে নিয়ে মাথা ঘামাইনি।

অদ্ভুত এই সন্ন্যাসী, অনেকেই বলতেন, স্বামীজির পরে ইনিই মঠ মিশনের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী, সারা পৃথিবীজোড়া তাঁর নাম, অনন্য তাঁর গ্রন্থমালা।

প্রথম দর্শনে সস্নেহে তিনি আরও বলেছিলেন, যুগে যুগে সন্ন্যাসীরা সঙ্ঘ গড়েছেন, কিন্তু বংশ পরম্পরায় তাঁদের সঙ্ঘ সুরক্ষিত হবে কী করে? তাঁদের তো সন্তান হয় না। কঠিন সেই অভাব মেটাবার জন্য সমাজই উপহার দেয় কিছু সন্তানদের, জননী জঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েই তারা আমাদের কাছে আসে না, সংসারই তাদের বেশ কয়েক বছর ধরে লালনপালন করে। তারপর আমরা তাদের পেয়ে থাকি। সুতরাং আমরা সঙ্ঘে সংসারের মস্ত ভূমিকা ভুলে যাই কেমনে? তুমি লক্ষ করে থাকবে, প্রাক সন্ন্যাসীজীবনকে আমরাও সংসারাশ্রম বলে থাকি।

প্রিয়পুত্র নরেন্দ্রনাথ যে তেইশ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেছিলেন তা তাঁর গর্ভধারিণী একবার বলেছিলেন মঠমিশনের তরুণ সন্ন্যাসীদের। স্বামীজির ছোটভাই

ভূপেন্দ্রনাথ বলেছেন, তারপর একবারও তাঁকে ভিটেবাড়িতে পদার্পণ করতে দেখা যায়নি। কিন্তু গৌর মুখার্জি স্ট্রিটের এই পুরনো বাড়ি আমৃত্যু তাঁর মনের মধ্যে ছিল।

বিশিষ্ট জীবনীকাররা বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন, পিতৃদেবের আকস্মিক দেহাবসান ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪। বিশ্বনাথ দত্তের আর্থিক অবস্থা ফোঁপরা, বাইরে ঠাট-ঠমক বজায় থাকলেও অফিসে চুরি এবং বাড়িতে বঞ্চনা। শুরু হয়ে গেল পারিবারিক মামলা— সেই সঙ্গে নিদারুণ দারিদ্র্য, মা, ভাইবোনদের অন্নকষ্ট, মামলার খরচ এবং অনিশ্চিত ফলাফলের দুশ্চিন্তা।

কয়েক বছর পরে প্রমদাদাস মিত্রকে আমাদের মহানায়ক বিবেকানন্দ চিঠিতে লিখছেন— 'কলিকাতায় বহু ধনী লোক আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, তাঁহাদের সঙ্গ আমার সাতিশয় বিরক্তিকর বোধ হয়...৫/৭ বৎসর আমার জীবন ক্রমাগত নানাপ্রকার বিঘ্নবাধার সহিত সংগ্রামে পরিপূর্ণ...পূর্ণভাবে নিজে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছি না...আমার মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে...ইহাদের অবস্থা পূর্বে অনেক ভালো ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যুর পর বড়ই দুস্থ, এমনকী কখনও কখনও উপবাসেও দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা— দুর্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল, হাইকোর্টে মকদ্দমা করিয়া যদিও সেই পৈতৃক বাটির অংশ পাইয়াছেন, কিন্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন।... এবার তাঁহাদের মকদ্দমা শেষ হইয়াছে, কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া তাঁহাদের সমস্ত মিটাইয়া এদেশ হইতে চিরদিনের মতো বিদায় হইতে পারি, আপনি আশীর্বাদ করুন।...আমি এক্ষণে কলিকাতায় আছি...দাস নরেন্দ্র।'

দশদিন পরে (১৪ জুলাই ১৮৮৯) প্রমদাবাবুকেই আর একটি চিঠি— 'আমার এস্থানের গোলোযোগ প্রায় সমস্ত মিটিয়াছে, কেবল একটি জমি বিক্রয় করিবার জন্য দালাল লাগাইয়াছি, অতিশীঘ্রই বিক্রয় হইবার আশা আছে।'

কাশী থেকে প্রমদাবাবু কুড়ি টাকার নোট পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু স্বামীজির মাতা নেননি— 'আমার মাতা ভ্রাতাদির সাংসারিক অহঙ্কার প্রতিবন্ধক হইল।' তবে এই টাকা স্বামীজি নিজের কাছে রেখে দিলেন কাশী যাবার জন্য।

অনেক বছর পরেও স্বামীজি যে দুখিনী মায়ের কথা ভুলতে পারছেন না তার যথেষ্ট প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর পত্রাবলিতে। উইম্বলডন থেকে (৬ আগস্ট ১৮৯৯) তাঁর আর এক মা মিসেস ওলি বুলকে লিখছেন— 'মা,... জাহাজে ওঠার পর আমি ভালো ছিলাম কিন্তু নেমে অবধি আবার বেশ খারাপ বোধ করছি। মানসিক উদ্বেগের কথা বলতে গেলে— ইদানীং তা যথেষ্টই হয়েছে। কাকিমা, যাঁকে আপনি দেখেছেন, আমাকে ঠকানোর এক গভীর ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং তিনি ও তাঁর লোকজন আমাকে ৬০০০ টাকায় একটি বাড়ি বিক্রি করার ছক করেছিলেন আর আমি সরল বিশ্বাসে তা আমার মায়ের জন্য কিনি। পরে, তারা আমায় দখল দেয়নি; ভেবেছিল, আমি সন্ন্যাসী, লোকলজ্জার ভয়ে জোর করে দখল করার জন্য কোর্টে যাব না।'

আরও কিছু বিবরণ আছে ওই চিঠিতে। 'আপনি ও অন্যান্য ব্যক্তিরা যে টাকা আমাকে কাজের জন্য দিয়েছিলেন, তা থেকে একটি টাকাও খরচ করেছি বলে মনে হয় না। আমার মাকে সাহায্যের সুস্পষ্ট ইচ্ছা জানিয়ে ক্যাপটেন সেভিয়ার আমাকে ৮০০০ টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকাও মনে হয় জলেই গেছে। এর বাইরে আমার পরিজনের জন্য অথবা আমার ব্যক্তিগত খরচের জন্যও আর কিছুই খরচ করা হয়নি। আমার খাওয়া প্রভৃতির খরচ খেতড়ি-রাজ দিতেন আর তা থেকে অর্ধেকের বেশি প্রতিমাসে মঠে যেত। একমাত্র যদি ব্রহ্মানন্দ কাকিমার বিরুদ্ধে ঐ মামলা বাবদ কিছু খরচ করে থাকে...যদি সে তা করে থাকে তবে যে কোন উপায়েই হোক আমি তা পূরণ করে দেবো, যদি তা করতে বেঁচে থাকি।'

এই চিঠির শেষে লেখা— 'আপনার চির-অনুরক্ত সন্তান, বিবেকানন্দ।'

স্বভাবতই প্রবাসের এই অতুলনীয়া জননীর কথা যথাসময়ে বলতে হবে। কিন্তু তার আগে গর্ভধারিণী জননীর দুঃখমোচনের কিছু কথা। একমাত্র কন্যার দুঃখদিনে স্বামীজির দিদিমাও মস্ত বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। বলরাম দে স্ট্রিটে তাঁর যে চার কাঠা জমি ছিল তাও তিনি বেচে দিয়েছিলেন মামলা-মোকদ্দমার খরচ চালাতে। প্রমদাদাস মিত্রকে (১৪ জুলাই ১৮৮৯) স্বামীজি যে জমি বিক্রির জন্য দালাল লাগানোর কথা বলেছেন তা খুব সম্ভবত এই বলরাম দে স্ট্রিটের সম্পত্তি।

জীবনের শেষপ্রান্তে ভিটেবাড়ির মামলার নিষ্পত্তির জন্য স্বামীজি ব্যাকুল হয় উঠেছিলেন। মহাপ্রয়াণের দিন দুই আগে তিনি দলিল পাকা করবার জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দকে নিয়ে অ্যাটর্নি অফিসে গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তড়িঘড়ি অ্যাটর্নি পল্টু করের পারিশ্রমিক ৪০০ টাকা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। আপস মীমাংসার যে খসড়া তৈরি হয়েছিল তা দ্রুত অনুমোদন করে দিয়েছিলেন অ্যাটর্নি এন সি বসু। অতি দ্রুত কাজ না করলে স্বামীজি মায়ের ভিটের সমস্যার সমাধান দেহাবসানের আগে করতে পারতেন না।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু খোঁজখবর নিয়ে লিখছেন, 'মামলার অপমান যন্ত্রণা তাঁকে কুরে কুরে খেয়েছে। মামলার জন্য মঠের তহবিল থেকে ৫০০০ টাকা ধার করেছিলেন। সেজন্য পাশ্চাত্যভক্তদের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। শেষপর্যন্ত মৃত্যুর কয়েকদিন আগে আপসে মামলার নিষ্পত্তি হয়।'

মায়ের দীর্ঘস্থায়ী মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই অনেকদিন আগে (৫ জুন ১৮৯৬) স্বামীজি তাঁর মার্কিন মাদার মিসেস ওলি বুলকে লেখেন, 'আমার পিতা উকিল ছিলেন, তবু আমি চাই না আমার কোন প্রিয়জন উকিল হোক। আমার গুরুদেব এর বিরোধী ছিলেন। আমার বিশ্বাস, যে পরিবারে একাধিক উকিল আছে সে পরিবারের বরাতে দুঃখ অনিবার্য।... তাই আমি চাই, মহিম (মেজভাই) ইলেকট্রিসিয়ান হোক।... আমি চাই, মহিম বেপরোয়া ও সাহসী হোক। নিজের ও দেশের জন্য নতুন পথ কেটে বার করার লড়াই করুক।'

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আরও অনেক খবর আছে মাকে নিয়ে। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সংযোজন— 'শেষজীবনে তো বলতেনই, ঠাকুর তোমার বোঝা অনেক বয়েছি, এবার নিজের মায়ের কাছে ফিরে যাব, যদি বৃদ্ধাকে একটু স্বস্তি দিতে পারি। মায়ের যাতে ছোট্ট একটা নিজস্ব বাড়ি হয় সেইজন্য নিজের রাজকীয়তা পর্যন্ত ত্যাগ করে, খেতড়ির রাজার কাছে ভিক্ষা পর্যন্ত করেছেন। বাড়ি তৈরির টাকা অবশ্য মেলেনি।'

খেতড়িরাজা অজিত সিংহের কাছে স্বামীজির আর্থিক সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি বহুদিন আমাদের জানা ছিল না। এই বিস্মৃত অধ্যায়ের উপর অপ্রত্যাশিত আলোকপাত করলেন ড বেণীশঙ্কর শর্মা স্বামীজি শতবর্ষে। তাঁর বইটির গুরুত্ব

বাড়িয়ে ছিল রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের ভূমিকা যেখানে তিনি লিখলেন, এই বইয়ে অনেক অনাবিষ্কৃত তথ্যের সদ্ব্যবহার করা হয়েছে।

বইয়ের মুখবন্ধে বেলুড়মঠের স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ উদ্ধৃতি দিলেন স্বামীজির স্বীকৃতির— 'ভারতের উন্নতির জন্য আমি সামান্য যা কিছু করতে পেরেছি খেতড়িরাজের সঙ্গে পরিচয় না হলে তা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।'

স্বামীজি ও তাঁর ভাই মহেন্দ্রনাথের লেখা অপ্রকাশিত পত্রাবলি এই বইয়ের অক্ষয় সম্পদ। এই চিঠিগুলি পারিবারিক তথ্যপ্রকাশে আশ্চর্য সহায়ক হয়েছে।

বেণীশঙ্কর শর্মা দুঃখ করেছেন, 'ব্যক্তিগত পত্রাবলি সংরক্ষণ করা বিদেশীদের বৈশিষ্ট্য। ভারতীয়দের সে অভ্যাস নেই। ফলে স্বামীজির লেখা অসংখ্য রত্নের পত্রসম্ভার বিনষ্ট হয়েছে।'

বেণীশঙ্কর শুরুতেই খেতড়ি মহারাজের দেওয়ান মুন্সী জগমোহনকে লেখা স্বামীজির একটা চিঠি (১৫ এপ্রিল ১৮৯৮) ছেপেছেন— 'মহারাজকে আমি যেসব পত্র লিখিয়াছি সেগুলি যদি খুঁজিয়া বাহির করিতে পার তবে সযত্নে প্যাক করিয়া রেজিস্ট্রি ডাকযোগে যত শীঘ্র সম্ভব আমার মঠের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিও'।

অপ্রকাশিত পত্রাবলি ছাড়াও বেণীশঙ্কর স্বামীজি ও মহারাজের ঘন ঘন সাক্ষাতের বিবরণের 'ওয়াকোয়েৎ রেজিস্টার'-এর সন্ধান দিয়েছেন। মহারাজ ও স্বামীজি এই দুইজনের প্রথম সাক্ষাতের তারিখ ৪ঠা জুন ১৮৯১।

স্বামীজির প্রথম বিদেশযাত্রায় খেতড়ির ভূমিকা ও পি অ্যান্ড ও কোম্পানির 'পেনিনসুলার' জাহাজে প্রথম শ্রেণির টিকিট কেটে দেওয়া এবং পূর্বনামগুলি ছেড়ে দিয়ে বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করা সে মস্ত এক কাহিনি, তা এই মুহূর্তে আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় নয়।

টিকিট ও আমেরিকায় খরচের জন্য কিছু টাকা দিয়েই মহারাজের দায়িত্ব শেষ হয়নি, পরবর্তী সময়ে টমাস কুকের মাধ্যমে কখন কী সাহায্য পাঠিয়েছেন তা বেণীশঙ্কর ধৈর্য সহকারে লিপিবদ্ধ করেছেন।

আমার কাছে এই মুহূর্তে মূল্যবান স্বামীজি পরিবারের দরদী বন্ধু মহারাজ অজিত সিং-এর পরিচ্ছেদটি। বেণীশঙ্কর শুরুতেই স্বামীজির গর্ভধারিণী ভুবনেশ্বরীর পারিবারিক দুঃখের কথা উল্লেখ করেছেন। যৌথ পরিবারে তাঁর দৈনন্দিন যন্ত্রণার কথা জননী ভুবনেশ্বরী তাঁর কনিষ্ঠপুত্র ভূপেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন — 'এমনও দিন গিয়েছে যে সংসারের একমাত্র উপার্জনকারীর স্ত্রী হয়েও পরবার জন্য একখানার বেশি শাড়ি ছিল না।'...পরবর্তীকালে অবশ্য স্বামী বিশ্বনাথ স্ত্রীর নামে কিছু সঞ্চয় আরম্ভ করেন।

পরিবারের সেবায় সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর ভূমিকা সম্বন্ধে ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথের মন্তব্যের সঙ্গে লেখক বেণীশঙ্কর একমত হতে পারেননি। 'চিরদিনের জন্য সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে স্বামীজি তাঁর ভাই বা মাতার কথা চিন্তা করেন নি...ইহা ন্যায়সঙ্গত উক্তি নহে।'

পাশ্চাত্য বিজয়ের পর জুনাগড়ের দেওয়ান শ্রীহরিদাস দেশাইকে লেখা স্বামীজির চিঠি (২৯ জানুয়ারি ১৮৯৪) থেকে বেণীশঙ্কর উদ্ধৃতি দিয়েছেন— 'আপনি আমার দুখিনী মা ও ছোট ভাইদের দেখতে গিয়েছিলেন জেনে সুখী হয়েছি। আপনি আমার অন্তরের একমাত্র কোমল স্থানটি স্পর্শ করেছেন। আপনার জানা উচিত আমি নিষ্ঠুর পশু নই। এই বিপুল সংসারে আমার ভালবাসার পাত্র যদি কেউ থাকেন, তিনি আমার পুণ্যময়ী মা।'

বেণীশঙ্করের সংযোজন— 'পূর্বাশ্রমের আত্মীয়দের কথা চিন্তা করাকে ধর্মবিষয়ক নিষেধাজ্ঞা বহির্ভূত বিষয় বলেই তিনি মনে করতেন। মাতৃভক্তিকে তিনি সন্ন্যাসের বেদীমূলে বলি দেন নি।'

ধীরামাতা মিসেস সারা বুলকে লেখা চিঠি থেকে (২৭ ডিসেম্বর ১৯০০) গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি রয়েছে। রাজ-যোগ ও খেতড়ি থেকে পাওয়া ৫০০ ডলার মিস্টার লেগেটের কাছে আছে। সব মিলিয়ে প্রায় এক হাজার ডলার। 'আমার যদি মৃত্যু হয়, অনুগ্রহ করে ওই টাকা আমার মাকে পাঠিয়ে দেবেন।' অন্য আর এক চিঠিতে স্বামীজির মনোভাব আরও বিস্তারিত। 'আমার শেষ কটা দিন এবং মায়ের শেষ কটা দিনের জন্য আমি তাঁর কাছে চলে যাবো। নিউ ইয়র্কে এক হাজার ডলার আছে, তার থেকে মাসে ৯ টাকা পাবো, মায়ের জন্য এক খণ্ড জমি কিনে রেখেছি তার থেকে পাবো মাসে ৬ টাকা এবং তাঁর পুরনো বাড়ি থেকে আয় হবে আরও ৬ টাকা। আমি, আমার মা, আমার দিদিমা আর আমার ভাই— মাসিক ২০ টাকা আয়ে আমরা স্বচ্ছন্দে কাটাবো।'

শুধু ভক্ত, বন্ধু ও পরামর্শদাতা নন, খেতড়ির রাজা স্বামীজির আপনজনদের দেখাশোনার ভার 'স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন।' ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের একটি চিঠি (২রা জুন ১৮৯৩) থেকে স্পষ্ট হচ্ছে, সংসার ব্যয়ের জন্য মহারাজ অজিত সিং মাসে একশত টাকা পাঠাতেন। 'আপনার অনুগ্রহ পত্র ও টাকা পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি।...আমার মা ও দিদিমা দাদার পৃথিবী পরিভ্রমণে সম্মতি জানাচ্ছেন।' বেণীশঙ্করের ধারণা, আমেরিকা যাত্রার আগেই জননীকে প্রতি মাসে একশো টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হয়।

খেতড়ি রাজের কাছে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের চিঠি (১৩ জুন ১৮৯৩): 'আপনি স্বামী বিবেকানন্দের পরিবারবর্গ সম্বন্ধে যে আন্তরিক যত্ন নিচ্ছেন তার জন্য আমার আনন্দের সীমা নেই।...আপনার ন্যায় মহান রাজা যখন ঐ পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সদাচিন্তিত তখন আমার স্থির বিশ্বাস অচিরেই তাদের দুর্দিনের অবসান ঘটবে।'

এই চিঠিতে একটি 'পুনশ্চ' ছিল— 'মহেন্দ্রনাথ আপনার প্রেরিত একশ টাকা পেয়েছে। সে, তার ভাই, মা ও আর সবাই ভালো আছে।'

বেণীশঙ্কর শর্মা জানাচ্ছেন, সাহায্যের ব্যাপারটা এতোই গোপনীয় ছিল যে প্রথম দিকে দেওয়ান জগমোহনলালও ব্যাপারটা জানতেন না।

পরবর্তী সময়ে দত্ত পরিবারে টাকা পাঠানোর পদ্ধতিও অভিনব। একখানা একশ টাকার কারেন্সি নোট অর্ধেক করে প্রথমে ডাকে পাঠানো হত এবং পরে দ্বিতীয় অংশটি।

জগমোহনজীকে রামতনু বোস লেন থেকে ৩১ জুলাই ১৮৯৩ ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ লিখছেন— 'একশত টাকার কারেন্সি নোটের অর্ধাংশ পেয়েছি। ভবিষ্যতে এইরকম কারেন্সি নোট পাঠালে রেজেস্ট্রি যোগে পাঠাবেন, কারণ পোস্ট অপিসের লোক সন্দেহক্রমে চোখ রেখেছে এবং হয়তো খাম খুলে নিজেরাই আত্মসাৎ করবে, এমন ইঙ্গিতও তারা দিয়েছে।'

পাশ্চাত্য বিজয় করে দেশে ফেরার পর স্বামীজি নিজের হাতে বেলুড় মঠ থেকে খেতড়িকে যে চিঠি লিখেছিলেন (২২ নভেম্বর ১৮৯৮) তা আমরা এখন পড়তে পারছি—

'মাননীয় মহারাজা,...আপনাকে আমার জীবনের একমাত্র বন্ধু বলে জানি, আপনার কাছে মনের কথা খুলে বলায় তিলমাত্র লজ্জা আমার নেই।...স্বাস্থ্য প্রতিদিনই অবনতির দিকে চলেছে এবং আমি এখন প্রায় মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে। আজ আমি মহারাজের আশ্বাস, মহানুভবতা ও বন্ধুত্বের নিকট একটা আবেদন করতে চাই।

সর্বক্ষণ একটা পাপের কথা আমাকে ক্ষতবিক্ষত করছে... আমার মায়ের প্রতি আমি বড় অবিচার করেছি। আমার সেজভাই মহেন্দ্রনাথ চলে যাওয়ায় তিনি বড় বেশী কাতর হয়েছেন। এখন আমার শেষ ইচ্ছা, অন্তত কিছুকাল মায়ের সেবা করে পাপক্ষালন করি। আমি এখন মায়ের কাছে থাকতে চাই, আমাদের বংশটি যাতে লোপ না পায়, তার জন্য ছোটভাইয়ের বিয়েও দিতেও চাই...মা এখন জঘন্য বাসায় বসবাস করছেন, আমি তাঁর জন্য ছোট্ট সুন্দর একটা গৃহ নির্মাণ করতে চাই। ছোট ভাইয়ের ভবিষ্যৎ উপার্জন ক্ষমতা সম্পর্কে আশা কম, তার জন্যেও কিছু করে যাওয়া দরকার। আপনি রাজা রামচন্দ্রের বংশধর, যাকে বন্ধু মনে করেন তার জন্যে এই সাহায্য করা কি আপনার পক্ষে খুবই কষ্টকর হবে?... ইউরোপ থেকে যা কিছু পেয়েছিলাম তাঁর প্রতিটি কপর্দক আমার আরব্ধ 'কর্মে' নিয়োগ করেছি। আমি নিজের জন্য কারও কাছে হাত পাততে পারি না।...আমি ক্লান্ত, বিষণ্ণ, মৃতকল্প— আমার প্রার্থনা এই শেষবারের দাক্ষিণ্য আমাকে দেখান।'

এই চিঠিতেও একটি 'পুনশ্চ' আছে, 'এই পত্র নিতান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয়। আপনি কি অনুগ্রহ করে আপনার মতামত জানিয়ে তারবার্তা পাঠাবেন?'

হৃদয়বান মহারাজ যে তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন তার সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি স্বামীজির (১লা ডিসেম্বর ১৮৯৮) চিঠিতে— 'আপনার তারবার্তা যে আনন্দ দিয়েছে তা বর্ণনাতীত।...আমি কি চাই তা বিশদভাবে লিখলাম। কলকাতায় একটা ছোটখাট বাড়ি নির্মাণের ন্যূনতম খরচ দশ হাজার টাকা। ঐ টাকায় শহরের আশেপাশে চার পাঁচজনের বাসোপযোগী ছোট বাড়ি কেনা বা তৈরি করা যায়।'

'সংসার খরচের জন্য যে একশ টাকা আপনি মাকে পাঠিয়ে থাকেন তা তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। যদি আমার জীবদ্দশা পর্যন্ত আমার ব্যয় নির্বাহের জন্য আরও একশ টাকা প্রতিমাসে পাঠাতে পারেন তবে খুবই আনন্দিত হবো।

'অসুখবিসুখের জন্য আমার খরচ ভয়ানক বেড়েছে; এই বাড়তি একশ টাকার বোঝা আপনাকে বেশি দিন বইতে হবে বলে মনে হয় না, আমি বড় জোর দু'এক বছর মাত্র বাঁচবো। আমি আর একটা ভিক্ষা এখন চাইব। মায়ের জন্য একশ টাকার সাহায্যটি সম্ভব হলে আপনি স্থায়ী রাখবেন, আমার মৃত্যুর পরও সে সাহায্য যেন তাঁর কাছে পৌঁছয়।...এক তুচ্ছ সাধুর প্রতি আপনার একদা যে প্রেম-ভালোবাসা ছিল তার কথা স্মরণ করে আপনি যেন সাধুর দুঃখী বৃদ্ধা মাতার প্রতি এই করুণা বর্ষণ করেন। আমি এর বেশি কিছুই চাই না।... আমার কথা কি বলব!— এ জগতে আমি যা কিছু করেছি বা হয়েছি, প্রায় সবই আপনার দাক্ষিণ্যে।'

আর এক চিঠিতে স্বামীজি লিখছেন, 'পৃথিবীর একটিমাত্র লোকের কাছে ভিক্ষা চাইতে আমার কোনো লজ্জা বা সংশয় হয় না। আপনি দেন বা না দেন, আমার কাছে দুই-ই সমান।'

বেণীশঙ্কর শর্মা জানাচ্ছেন, স্বামীজি যে বিশ্বাস ও আস্থা রেখেছিলেন মহারাজ কোনোদিন তাঁর অবমাননা করেননি। যখন যেমন অর্থ প্রয়োজন হতো তা কলকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও পোদ্দার দুলিচাঁদ কাকরাণি মারফত পাঠিয়েছেন। স্বামীজির ১লা ডিসেম্বর ১৮৯৮ তারিখের চিঠি পেয়ে মহারাজ শেঠ দুলিচাঁদের নামে ৫০০ টাকার নির্দেশ পাঠিয়ে দেন।

স্বামীজি সঙ্গে সঙ্গে লেখেন 'মাননীয় মহারাজা, আপনার অনুগ্রহ পত্র ও শ্রীদুলিচাঁদের নামে কাটা ৫০০ টাকার অর্ডার পেলাম। আমি এখন একটু ভালো আছি।'

আরও একটা প্রাণস্পর্শী চিঠি স্বামীজি লেখেন মহারাজের অসুস্থতার খবর পেয়ে। তারিখ ২৬ অক্টোবর ১৮৯৮। 'আপনার স্বাস্থ্যের সংবাদের জন্য উদ্বিগ্ন আছি।... আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে আপনাকে দেখবার জন্য এখনই খেতড়ি ছুটে যাব।... আপনি জানেন, আপনার মঙ্গলের জন্য আমি প্রাণপাত করতেও প্রস্তুত।'

• গর্ভধারিণী জননী ভুবনেশ্বরী দেবী

বিস্তারিত খবরাখবর নিয়ে বেণীশঙ্কর শর্মা জানিয়েছেন, মাসিক একশ টাকা পাঠিয়েই মহারাজ তাঁর কর্তব্যে ছেদ টানেননি, তিনি দত্ত পরিবারের নানা বিষয়ে ব্যক্তিগত নজর রাখতেন এবং স্বামীজির দেহাবসানের পরেও যতদিন ভুবনেশ্বরী দেবী বেঁচেছিলেন (১৯১১) ততদিন অর্থসাহায্য প্রেরিত হয়েছে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের একটি চিঠিও (৫ জুলাই ১৮২৩) যথাস্থানে উদ্ধৃত হয়েছে— 'স্বামীজির ভাই মহেন্দ্রনাথের কলেজ খুলেছে এবং সে নিয়মিত পড়াশোনা করছে। কিছুদিন আগে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাকে একটু চিন্তিত মনে হলো।'

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আর একটা চিঠি মহারাজকে লিখলেন ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪। '...অনেকদিন পরে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই বিবেকানন্দের চিঠি পেয়েছি। এখন শিকাগোয় আছেন এবং ভালো আছেন।...কয়েকদিন আগে মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেছি। সে, তার মা, ছোটভাই সকলে কুশলে আছে।...

• স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

• স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত

স্বামীজির আত্মীয়দের অভাব মোচনের ভার যখন মহারাজ নিয়েছেন তখন ও বিষয়ে আমার কোনরকম চিন্তা করা সাজে না; কিংকর্তব্য তিনিই ভাল জানেন।'

বিলেত থেকে কাউকে না জানিয়ে স্থলপথে অভিমানী মহেন্দ্রনাথের দেশে ফিরবার কথাও মহারাজকে জানানো হচ্ছে। ছোটভাই ভূপেন্দ্রনাথ চিঠি লিখেছেন মুন্সী জগমোহন লালকে। 'খবর পেয়েছি আমাদের অগ্রজ এখন তুর্কীতে, সেখান থেকে পারস্য, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া হয়ে চিনের প্রাচীর পর্যন্ত যাবেন।' এই খবরের সূত্র আমেরিকান বন্ধু টফকে লেখা পর্যটক মহেন্দ্রনাথের একটা চিঠি।

পরবর্তী সময়ে আরও যা জানা যাচ্ছে তাতে স্পষ্ট, মহেন্দ্রনাথের আচমকা বিলেত যাবার টিকিট মহারাজই কিনে দিয়েছিলেন। পরে তিনি আরও ত্রিশ পাউন্ড পাঠিয়েছিলেন মিস্টার স্টার্ডির কাছে।

স্বামীজির মহাপ্রয়াণের কিছু আগে মহারাজের অপ্রত্যাশিত মৃত্যু ঘটে। স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখেছেন, 'এই শোক স্বামীজিকে গভীরভাবে আহত করেছিল। বহুবার তিনি আমাদের কাছে এই বেদনার কথা ব্যক্ত করেছিলেন।'

স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ আগ্রা থেকে চিঠি লিখে (২৬ ডিসেম্বর ১৮৯৪) জানাচ্ছেন, 'আপনি বোধ হয় জানেন, স্বামীজি আমাকে একটা ফনোগ্রাফ উপহার পাঠিয়েছেন।'

এই যন্ত্রে স্বামীজির কণ্ঠস্বর ধরা ছিল যা মহারাজ সাড়ম্বরে অনেককে শুনিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই রেকর্ডের অস্তিত্ব আর নেই।

সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি দেখতে গিয়ে পড়ে গিয়ে মহারাজ অজিত সিংহের মৃত্যু হয় ১৮ জানুয়ারি ১৯০১। বিষণ্ণ স্বামীজির সুর আমেরিকান ভগ্নী মেরি হেলকে লেখা কয়েকটি চিঠিতে— 'এখন আমার কাছে সব জিনিসই বিষাদময়।'

স্বামীজির দেহাবসান যে ৪ঠা জুলাই ১৯০২ তা সকলেই জানেন। বিবেকানন্দ জীবনের এক বিস্মৃত অধ্যায় লিখতে গিয়ে বেণীশঙ্কর শর্মা একটি ফুটনোটে জানিয়েছেন যে খেতড়িপ্রাসাদে এক বাইজির গান শুনে স্বামীজি তাঁকে 'মা' বলে ডাকতে শুরু করেন। অনাত্মীয়া অপরিচিতা মহিলাদের মা বলে ডাকাটা আমাদের সমাজে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু গর্ভধারিণী ছাড়াও আর কাকে স্বদেশে এবং বিদেশে তিনি জননীর আসনে বসিয়েছেন তা একসময় খোঁজ করতে বিশেষ আগ্রহ হয়েছিল। এই আগ্রহের পথটি খুবই সহজ, স্বামীজির চিঠিপত্রগুলি একটু সাবধানে লক্ষ্য করা।

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাইয়ের পর একটা শতাব্দী এবং আরও কয়েক দশক অতিক্রম করে যে কথাটা নতমস্তকে বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দর গর্ভধারিণী সম্বন্ধে আজও আমরা তেমন কিছু জানি না। জগদ্বিখ্যাত এই জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্বন্ধে শত শত পুস্তক দেশি-বিদেশি শত শত ভাষায় রচিত হলেও পুত্র ও জননীর সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা তেমন কিছু জানি না।

জননী ভুবনেশ্বরীর গোটা দুয়েক আলোকচিত্র আছে যার একটি জগদ্বিখ্যাত পুত্রের বিদেশিনী অনুরাগিনীরা জননীর দেহত্যাগের আগে প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার দিয়ে তুলিয়েছিলেন। শোকাহতা সন্তানহারা বঙ্গবিধবার আর একটি অস্পষ্ট ছবি যা শোকসংবাদ হিসেবে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের কাগজে বেরিয়েছিল, তার জেরক্স কপি দেখেছি, মূল ছবিটা আজও উদ্ধার করা যায়নি।

আরও যার ব্যাখ্যা নেই, যাঁর প্রিয়পুত্র তেইশ বছর বয়সে বিধবা জননী, নাবালক ভ্রাতা ও অবিবাহিত ভগ্নীদের নিষ্ঠুর ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে সংসার ত্যাগ করলেন, কপর্দকশূন্য অবস্থায় পরিব্রাজক হলেন এবং জীবনের শেষকটি বছর বিশ্বজনের বন্দিত হলেন মাকে লেখা তাঁর একটি চিঠিও আমরা উদ্ধার করতে পারলাম না। অথচ চলমান এই মানবশ্রেষ্ঠ শত শত চিঠি লিখলেন কত চেনা-জানা মানুষকে, যা আমাদের অক্ষয়সম্পদ হয়ে রইল।

মাকে তিনি চিঠি লেখেননি এবং তাঁর সুশিক্ষিতা গর্ভধারিণী কখনও তাঁর ভুবনজয়ী সন্তানকে কোনো উত্তর দেননি তা

অসম্ভব মনে হয়।

অন্যকে লেখা স্বামীজির চিঠি থেকে আমরা জানতে পারছি, দ্বিতীয় ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ অভিমান ভরে বিলেত থেকে স্থলপথে মাতৃভূমিতে ফেরার সময়ে মাকে একখানিও চিঠি লেখেননি খবর পেয়ে স্বামীজি ভ্রাতার বন্ধুদের মারফত খবর পাঠাচ্ছেন সে যেন অবশ্যই মাকে চিঠি লেখে।

মহাগুণবান এবং অনন্য এই ভ্রাতা দীর্ঘজীবী হয়ে দত্তদের ভিটেবাড়িতে অবস্থান করে অনন্য সব গ্রন্থ ভাবিকালের জন্য রেখে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁর লেখাতেও জননী ভুবনেশ্বরী সম্বন্ধে তেমন কিছু উল্লেখ নজরে পড়েনি।

ভুবনেশ্বরীর মেয়েদের কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে ভিটেবাড়িতে বসবাস করেছেন, কিন্তু আমরা সেইসব কথা তেমনভাবে আজও জানতে পারিনি। আমাদের কৌতূহল কিছুটা নিবৃত্তি ঘটিয়েছেন কনিষ্ঠপুত্র বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বহুদিন স্বেচ্ছা নির্বাসনে থেকে যিনি দেশে ফিরে এসে কিছু অনবদ্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন।

ভুবনেশ্বরী বসুর জন্ম ১.৮.১৮৪৯ সালে। মাতা রঘুমণির তিনি একমাত্র সন্তান, পিতা নন্দলাল বসু। কুঞ্জবিহারী বংশ বলে পরিচিত এই পরিবারের একটি বংশতালিকা খোঁজখবর করে আমরা অচেনা অজানা বিবেকানন্দ বইতে ছেপে দিতে পেরেছি।

পাঠক-পাঠিকারা এই তালিকাতে ভুবনেশ্বরীর অনেক খবরাখবর পেতে পারেন। সেই সঙ্গে জানতে পারবেন, স্বামী বিশ্বনাথ দত্তের সঙ্গে ১৬ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ। বংশতালিকা থেকে আরও একটা ভুল ভেঙে যায়— নরেন্দ্রনাথ অবশ্যই তাঁর প্রথম পুত্রসন্তান নন। এঁদের প্রথম সন্তান একটি পুত্র, শৈশবে আট মাস বয়সে তার মৃত্যু, কোনো একটা ডাকনাম হয়তো ছিল, কিন্তু তা পুনরুদ্ধার করতে পারিনি।

তবে আমরা জানি ভুবনেশ্বরী পরপর দশটি পুত্র-কন্যার জননী হয়েছিলেন— দ্বিতীয়টি কন্যা, তারও শৈশবে মৃত্যু হয়েছিল, বেঁচেছিল আড়াই বছর, নিশ্চয়ই নামকরণ হয়েছিল, কিন্তু তা আমাদের জানা নেই।

এরপর নরেন্দ্রনাথের পর পর তিন দিদি— হারামণি (বাইশ বছর বেঁচেছিলেন), স্বর্ণময়ী বেঁচেছিলেন ৭২ বছর। এর পরের দিদি ছ'বছর বেঁচেছিলেন, কিন্তু তাঁর নাম গবেষকদের কাছে আজও অনাবিষ্কৃত। তা হলে যা বলা যাচ্ছে, স্বামীজি তাঁর মায়ের ষষ্ঠ সন্তান এবং এরপরে দুই বোন (কিরণবালা ও যোগীন্দ্রবালা) এবং দুই ভাই মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ যাঁরা পিতৃদেবের ডায়াবিটিস ও হার্টের ব্যারামের তোয়াক্কা না করে যথাক্রমে ৮৮ বছর ও ৮১ বছর বেঁচেছিলেন। ভুবনেশ্বরীর নয়নের মণি বিলে অথবা নরেন যে অজস্র ব্যাধিকে তোয়াক্কা না করে মাত্র ৩৯ বছর ৫ মাস ২৪ দিনে বিশ্বকে বিমোহিত করে বিদায় নিয়েছিলেন তা তাঁর অনুরাগীদের কাছে অজানা নয়।

বলে রাখা ভালো, অভাব, অনটন, অপমান এবং পুত্রকন্যা হারানোর শোক, অবহেলা ও আর্থিক সংকটের নিরন্তর আঘাত সহ্য করে ভুবনেশ্বরী দত্ত তাঁর প্রিয়পুত্রের আকস্মিক দেহাবসানের (১৯০২) পরেও এক দশক (১৯১১) বেঁচেছিলেন। অন্তিমশয়ানে পুত্রকে শেষ দর্শনের জন্য ছোট ছেলেকে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তিনি বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন।

পর পর কয়েকটি কন্যা হওয়ায়, পুণ্যার্থী ভুবনেশ্বরী কাশীবাসিনী এক আত্মীয়ার মাধ্যমে প্রতি সোমবার বীরেশ্বরের পূজা আরম্ভ করেন এবং তিনি নিজে সোমবারের ব্রত পালন আরম্ভ করেন। এক বছরের আরাধনায় পুত্রের জন্মলাভ, তাই নাম 'বীরেশ্বর', যার অপভ্রংশ 'বিলে', এবং কিছু পরে নরেন্দ্রনাথ। সিমলার দত্তবাড়িতে যেখানে সূতিকাগার স্থাপিত হয়েছিল তা নিজের চোখে দেখবার জন্য আমি কয়েকবার ৩ নম্বর গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটে তীর্থযাত্রা করেছি।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর মা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখে যাননি, তবে দরদী বিলে এবং বিরক্ত জননীর মতামত লিপিবদ্ধ করে তিনি লিখেছেন, 'পাগলা শিবের পুজো করে ছেলে পেলাম, না কি একটা পাগলা ভূত, তা না হলে ছেলেটা এমন পাগলাটে ধাতের হলো কেন?'

স্কুলে-কলেজে বিবেকানন্দ যে ইংরিজিতে যৎসামান্য নম্বর পেয়েছেন তা গবেষকরা খুঁজে বার করেছেন, কিন্তু তাঁর ইংরিজি বক্তৃতা, ইংরিজি রচনা ও পত্রাবলি বিশ্বজনকে মোহিত করল কী করে? এর শুরুতেও জননীর দান।

শোনা যায় প্রথম পর্বে বিদেশি ও ম্লেচ্ছ ভাষার উপর বালকের বিশেষ ঘৃণা ছিল এবং একেবারেই পড়তে চাইত না। মা একসময় পাদরি মেম মাস্টারনি রেখে ইংরিজি শিখেছিলেন। অনন্যোপায় হয়ে তিনি নিজেই আদরের ছেলেকে ইংরিজি শেখানোর দায়িত্ব নিলেন। আমরা জানতে পারছি, 'মা বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর দিনকতক আগে পর্যন্ত দুপুরবেলা ও রাত্রে নিয়মমত বই পড়তেন।'

প্রাচুর্য ও প্রবল অভাবের মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন ভুবনেশ্বরী, তার বেশ কিছু বিবরণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। পিতা বিশ্বনাথ যেমন আইন ব্যবসায় প্রচুর রোজগার করেছেন তেমন নানা ধরনের বিজনেসে বহু টাকা লোকসান করেছেন। যখন ভালো দিন এসেছে, যখন মধ্যবিত্ত বাঙালির মাসমাইনে পনেরো টাকা তখন ভুবনেশ্বরী দেবীর পারিবারিক সংসার খরচ ছিল মাসে হাজার টাকা।

স্নেহের পুত্র যথাসময়ে নতমস্তকে বলেছেন, 'আমার প্রাণের বিকাশের জন্য আমি মায়ের কাছে ঋণী। এই মায়ের রঙ ছিল ফর্সা (যা সবেধন নীলমণি ছবি দেখে বোঝা যায় না, কণ্ঠ সুমধুর, প্রতি পদক্ষেপে আভিজাত্য, বুদ্ধিমতী, কার্যকুশলা, মিতভাষিণী, গম্ভীর প্রকৃতি, আলাপ মিষ্ট স্বভাব, কিন্তু তেজস্বিনী।'

ছেলেকে তাঁর শিক্ষা, 'আজীবন পবিত্র থাকিও, নিজের মর্যাদা রক্ষা করিও, কখনও অপরের মর্যাদা লঙ্ঘন করিও না। খুব শান্ত হইবে, কিন্তু আবশ্যক হইলে হৃদয় দৃঢ় করিবে।'

এই মায়ের কথা মনে রেখেই স্বামীজি জোর গলায় বলতে পেরেছিলেন, 'যে মাকে সত্য সত্য পূজা করতে না পারে, সে কখনও বড় হইতে পারে না।'

অচেনা অজানা বইতে একজন বিদেশি গবেষকের সমীক্ষা উল্লেখ করতে পেরেছিলাম— রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের প্রায় সবার ওপর 'গর্ভধারিণী জননীর প্রভাব খুব বেশী।'

মায়ের সম্বন্ধে বিবেকানন্দ পরবর্তী সময়ে বলেছেন, 'ছেলেবেলায় আমি বড় ডানপিটে ছিলাম, তা না হলে আর একটা কানাকড়ি সঙ্গে না নিয়ে দুনিয়াটা ঘুরে আসতে পারতুম রে।'

গর্ভধারিণী মায়ের আর একটি দিক বিবেকানন্দকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর সংযমশক্তি— 'মা একবার সুদীর্ঘ চোদ্দ দিন উপবাসে কাটিয়েছিলেন।' ছেলেও কম যান নি, চিকিৎসকের

নির্দেশে টানা একুশ দিন জল না খেয়ে সবাইকে বিস্মিত করেছেন।

ভুবনেশ্বরীর বৈধব্য ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪, ঐদিন ডায়াবিটিসের রোগী বিশ্বনাথ দত্তের মৃত্যু হার্ট অ্যাটাকে। এরপর ভুবনেশ্বরী সংসারে যতরকম দুঃখ আছে তা একের পর এক পেয়েছেন।

১৬ বছর বয়সে বিয়ের পর একের পর এক দশটি সন্তানকে গর্ভধারণ, একের পর এক সন্তানশোক, নাবালক ছেলেমেয়ে নিয়ে বৈধব্য এবং প্রায় একই সময়ে জটিল মামলায় ভিটেমাটি ছাড়া হওয়ার অবস্থা, যে ছেলে রোজগেরে হয়ে সংসারের হাল ধরতে পারত তার সন্ন্যাস গ্রহণ এবং কন্যার আত্মহনন। একসময়ে কেউ লিখেছিলেন— 'একষট্টি বছর বয়সে সন্ন্যাসীপুত্রের মৃতদেহের সামনে বসে থাকা। সংসারে একজন মায়ের জন্য আর কত যন্ত্রণাই বা থাকতে পারে?'

স্বামীর দেহাবসানের পর বড়ই কঠিন সময়— একই সময়ে মাথার ওপর ছাদ সরে যাওয়া, উকিলের খরচ এবং অর্ধাহারের দিন। শিক্ষিত পুত্রের একটি চাকরি জোগাড়ে ব্যর্থতা। সংসারের এই বিপর্যয়ের খবর সংগ্রহ করে নিন্দুকদের পত্র— নরেন্দ্রনাথ কি স্বভাব সন্ন্যাসী না অভাব সন্ন্যাসী? এই পর্বের হৃদয়বিদারক কিছু ছবি বিবেকানন্দ নিজেই দিয়ে গিয়েছেন। সেই সঙ্গে ভাই মহেন্দ্রনাথ বলে গিয়েছেন, যে দিন বিশ্বনাথ দত্তর দেহাবসান সেদিনই বড় ছেলের কনে দেখতে যাবার কথা ছিল।

এরই মধ্যে গর্ভধারিণী জননীর কাছে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা, 'ফল যা হোক না কেন, সর্বদা যা সত্য বলে মনে করবে তাই করে যাবে।'

সেই সময়েই বাড়িতে আহার্য না থাকায় নরেন্দ্রনাথ বাড়ির বাইরে অর্ধাহারে অথবা অনাহারে দিন কাটিয়েছেন। এই কঠিন সময়ে মায়ের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে, ছেলেকে বলেছেন, 'চুপ কর ছোঁড়া। ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান, ভগবান। ভগবান সব তো কল্লেন।' ছেলের নিঃশব্দ প্রশ্ন— 'মঙ্গলময়ের রাজত্বে এত প্রকার অমঙ্গল কেন?'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের হাত থেকে ছেলেকে ফিরিয়ে আনবার জন্য অসহায়া বিধবা নাবালক একটি সন্তান নিয়ে তাঁর কাছেও গিয়েছেন। প্রেমের ঠাকুর কোনো বাধা দেননি, ছেলেকে মায়ের কাছে দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কোনো স্থায়ী ফল হয়নি, আমরা শুধু পেয়েছি এক স্মরণীয় উক্তি— ঠাকুর গেরস্তকে বলেন হুঁশিয়ার হতে আর চোরকে বলেন চুরি করতে।

তেইশ বছরে অজানার আহ্বানে নরেন্দ্রনাথ যে জন্মভিটে ত্যাগ করেছিলেন তারপর আর কখনও গৌরমোহন স্ট্রিটের বাড়িতে পদার্পণ করেননি। কিন্তু তার মানে গর্ভধারিণীর সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয়নি এমন নয়। দেখা করবার জন্যে তিনি যেতেন দিদিমার বাড়িতে, আবার মা কখনও আসতেন বেলুড় মঠে, কখনও মাকে নিয়ে তিনি তীর্থযাত্রা করেছেন।

মায়ের আরও অনেক দুঃখ ছিল— ছেলেদের কেউই বংশরক্ষায় মন দিল না, মেয়েদের কেউ শ্বশুরবাড়িতে আত্মহত্যা করল। আমরা জানতে পেরেছি, স্বামীজি তাঁর প্রিয় বন্ধু ও গুরুভাই রাখাল মহারাজকে বলছেন, 'আমি শিগগির দেহত্যাগ করবো, তুই আমার মার বাড়ির ব্যবস্থা করে দিস, তাঁর তীর্থ দর্শন করাস। তোর ওপর এই ভার রইল।'

এবার বিবেকানন্দ-জননীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আদালত প্রাঙ্গণ আর একবার ঘুরে আসবার সময়। আজকাল প্রায়ই মনে হয় মামলা-মোকদ্দমায় নিত্য বিড়ম্বিত ও জর্জরিত ভুবনেশ্বরীর পাশে তাঁর প্রিয় সন্তান বিলুকে ঠিকমতন না দেখাতে পারলে সিমুলিয়ার দত্ত পরিবারকে ঠিক বোঝা সম্ভব নয়। এইসব মামলার সময়-পরিধি বিশাল, আদালতী নথিপত্রের প্রতি পরিচ্ছেদে ছড়িয়ে আছে এক অলিখিত ইতিহাস যা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের কালের প্রিয়তম সন্ন্যাসী ও তাঁর দুখিনী জননীকে আবৃত রেখেছিল।

মামলার অদৃশ্য জালে জড়িয়ে পড়ে আমরা দত্ত পরিবারের বধূ খ্যাতনামা আইনজীবীর সহধর্মিণী ও বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসীর গর্ভধারিণীকে বারবার আদালত প্রাঙ্গণে দেখেছি। এই যন্ত্রণার কিছু অংশ অন্যত্র বর্ণনা করতে সফল হয়েছি, কিন্তু অনেকটা আজও নতুন যুগের নতুন পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তেমনভাবে উপস্থাপিত করা হয়নি। এই কাজ নিতান্ত সহজসাধ্য নয়, কিন্তু অবশ্যই সম্পূর্ণ হওয়ার দাবি রাখে।

আজকের এই স্বল্পপরিসর রচনায় শুধু বলা যেতে পারে ভুবনেশ্বরী দেবী স্বামী বিশ্বনাথ দত্তের জীবনকালেই আদালতের বিষ-নিঃশ্বাসের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর ছেলেও প্রিয়জননীকে আদালতের তীর্থযাত্রায় নিয়ে এসেছেন কয়েকবার।

শৈশবে ভুবনেশ্বরীর স্তন্যদুগ্ধে পালিত এক আত্মীয়কে জীবনের এক চরম দুঃসময়ে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন— বিলু কি আর সংসারে ফিরবে না? গুরুপ্রাণ ডা রামচন্দ্র দত্ত সান্ত্বনাবাক্য দিয়েছিলেন— 'আপনাকে ছেড়ে ও যাবে কোথায়?'

দত্ত পরিবারের ভিটেবাড়ির মামলা একাধিক। প্রথম মামলার সময় ঘোড়ার গাড়িতে ওঠার মুখে ভুবনেশ্বরী তাঁর বিলেকে বলেছিলেন সঙ্গে যেতে, কিন্তু সে রাজি হয়নি।

এর পরের দৃশ্য বিশ্বনাথ দত্তের মৃত্যুর কয়েকমাস পরে হাইকোর্টে ভুবনেশ্বরীর দরখাস্ত লেটার্স অফ অ্যাডমিনিসট্রেশনের জন্য।

এই আবেদনপত্র সম্মতি স্বাক্ষর নরেন্দ্রনাথের, স্থান কলকাতা হাইকোর্ট, তারিখ ঠাকুরের দেহাবসানের চারদিন আগে ১১ আগস্ট ১৮৮৬। আবেদনে বলা হয়েছে নরেন্দ্রনাথের বয়স ২২, প্রয়াত পিতৃদেব কোনো উইল রেখে যাননি।

কলকাতা হাইকোর্টে জ্ঞানদাসুন্দরী বনাম ভুবনেশ্বরী দাসীর মামলা শুরু হয় ১৮৮৭ সালের গোড়ায়। নরেন্দ্রনাথ এই মামলায় সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ান ৮ মার্চ ১৮৮৭। হাইকোর্টের এই মামলায় পরাজিত হয়ে জ্ঞানদাসুন্দরী আপিল করেন। টানা একবছর নরেন্দ্রনাথ হাইকোর্টে যাতায়াত করতে বাধ্য হন। মনে রাখা ভালো এই ১৮৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে বিরজা হোম সম্পন্ন করে তিনি সন্ন্যাস নাম গ্রহণ করেন স্বামী বিবিদিষানন্দ।

স্বামী গম্ভীরানন্দের হাইকোর্টে মামলা সম্পর্কে কিছু উক্তি: 'হাইকোর্টের তিনজন বিচারপতি যে আপিল শোনেন তার রায় বেরোয় ১০ নভেম্বর ১৮৮৭— খুড়ির শোচনীয় পরাজয় হয়। অভিজ্ঞদের মন্তব্য, 'কিন্তু মামলা কি আর অত সহজে শেষ হয়।' এর রেশ গড়ায় বিবেকানন্দের দেহাবসানের মুহূর্ত পর্যন্ত।'

অস্বস্তিকর এই মামলার কিছু বিবরণ স্বামীজি নিজেই

PURSUE EXCELLENCE

GLOBAL @ AU

INTERNATIONAL EXPOSURE WITH OVER 50+ GLOBAL PARTNERS
International exposure through semesters abroad and summer schools.

LEARNING @ AU

LEARNING UNINTERRUPTED
Online classes, labs, international and industry master classes.
Outcome-based education system.
Interdisciplinary project-based learning.

3950+ COURSES
By top international universities through Coursera and Artificial Intelligence module for students.

CAREERS @ AU

- OVER ALL 83% TILL JUNE 2020
- 100 CAMPUS DRIVES DONE
- 95% STUDENTS ARE DOING INTERNSHIP & TRAINING

Prestigious Recruiters in 2019-2020: Infosys, TCS, Wipro, CTS, Genpact, BYJU'S, Cognizant, JBL, Nvidia, HDFC, Apollo, Kotak, Alembic, Futhersia, etc.
More than 500 organisations in client list.

ALUMNI @ AU

- Well established alumni base of last 3 years
- 4 alumni chapter - east/west/north/south
- Special facilities and policy for alumni

INCUBATION CENTRE:
- Dedicated program to guide & mentor business incubation
- Partnership with NEN
- Within a year time 5 projects initiated and one of them has already started.

Offering **117 UG** and **PG Programs**.
Courses offered in Management, Engineering, Media, Liberal Arts, Sciences, Pharmacy, Biotech, Law & Justice and Education.

RECOGNITIONS:

UGC Recognized | AICTE Approved | NCTE Approved | PCI Approved | BCI Approved

 8336944328, 18004197423 8335004433 (WhatsApp only) www.AdamasUniversity.ac.in

For a virtual tour of Adamas University please visit: http://AdamasUniversity.ac.in/virtual-tour
Follow us on:
RICE

আমেরিকান মাদার সারা বুলকে লিখেছেন ৬ আগস্ট ১৮৯৯। দেখা যাচ্ছে, নতুন করে মামলা হয়েছিল এবং মামলার খরচের কিছু টাকা মঠ তহবিল থেকে নিতে হয়। 'আগেকার পাঁচ হাজার টাকা এবং এই মামলার খরচের টাকা স্বামীজিকে একেবারে অস্থির করে তুলেছিল।' অনুসন্ধানে জানা যাচ্ছে, স্বামীজি শেষপর্যন্ত মায়ের জন্য ধারের সব টাকা শোধ করতে পেরেছিলেন।

মৃত্যুর কয়েক মাস আগে (মার্চ ১৯০২) সিস্টার নিবেদিতাকে স্বামীজি লিখছেন, ''ইউরোপ থেকে সামান্য যে টাকা এনেছিলাম তা মায়ের দেনা শোধ এবং সংসার খরচে লেগে গেল। সামান্য যা রয়ে গিয়েছে তাতেও হাত দেবার উপায় নেই, ঝুলে থাকা মামলার জন্য লাগবে।''

কৌতূহলীরা জেনে রাখতে পারেন, দেহাবসানের ছ'দিন আগে (২৮ জুন ১৯০২) সব বিবাদের মিটমাটের জন্য স্বামীজি উঠেপড়ে লেগেছিলেন এবং ২ জুলাই হাবুল দত্ত ও তমু দত্তের দাম অনুযায়ী চারশ টাকা দেওয়া হল।

এত কাছাকাছি, তবু অনেক দূরত্ব ছিল। ছোটভাই ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন '১৮৯৭ সালে ইউরোপ থেকে ফেরবার আগে পর্যন্ত বাড়িতে কেউ তাঁকে গেরুয়া বসনে দেখেন নি।'

গর্ভধারিণী জননী ও সংসারত্যাগী সন্তানের আশ্চর্য সম্পর্কের নানা কথা নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে, তার কিছুটা কয়েকটি বই থেকে সংগ্রহ করতে পেরে ধন্য হয়েছি।

আমরা জানতে পেরেছি, অসুস্থ সন্তানকে দেখবার জন্য স্নেহময়ী জননী যখন ছোট ছেলেকে নিয়ে বরাহনগরে ছুটেছেন তখন স্বামীজি নিয়ম করে দিয়েছেন মঠে মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ।

তার পরেও কত কী হয়েছে যা বর্ণনা করতে গেলে একটি মহাভারত হয়ে যায়।

সন্ন্যাসীর শপথ এবং সন্তানের দায়িত্বের মধ্যে সমন্বয় করা একদিকে প্রায় অসম্ভব। তবু শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব ও বিবেকানন্দ সেই অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টা করে আমাদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। দুই পক্ষকেই আমাদের প্রণাম— তুলনাহীনা জননীরাই তো তুলনাহীন সন্তানের জন্ম দিতে পারেন।

সংসার ত্যাগ করলেও নরেন্দ্রনাথ দত্ত কীভাবে দত্ত পরিবারের সুখ-দুঃখের সঙ্গে স্বেচ্ছায় জড়িয়ে ছিলেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত এবং সংসারে না থেকেও কেন সংসারের অভিশাপের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা, তা নতুন যুগের পাঠক-পাঠিকারা বিস্তারিত ভাবে জানতে আজও আগ্রহী। এ-বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি 'অচেনা অজানা বিবেকানন্দ' বইতে। কিন্তু সব বিষয়ে তেমন আলোকপাত করা সম্ভব হয়নি, তবে শুনেছি মধ্যবিত্ত সংসারের জ্যেষ্ঠপুত্রদের পারিবারিক দায়দায়িত্বের কথা ভেবেই মঠমিশনের কর্তারা বড় ছেলেকে সন্ন্যাসের পথে টেনে আনতে অনেক সময় দ্বিধা করতেন।

সংসারত্যাগী নরেন্দ্রনাথের এই দ্বন্দ্ব এবং মা-ভাইদের জলে ফেলে দেবার বিরুদ্ধ সংগ্রাম বিবেকানন্দজীবনকে চরম এক পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছিল, কারণ তাঁর পিতৃবিয়োগ ও সংসার ত্যাগ প্রায় একই সময়ে ঘটেছিল। উকিলের ছেলে উকিল হবেন এই ছিল বাবা-মায়ের প্রত্যাশা এবং সেইপথে অনেকটা এগিয়েও শেষ পর্যন্ত বৃহত্তর আকর্ষণে নরেন্দ্রনাথ ভিটেমাটি ছেড়ে কপর্দকশূন্য অবস্থায় ঈশ্বরসন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলেন মৃত্যুপথযাত্রী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে।

এই সময়ে জ্যেষ্ঠপুত্রের কাছে অসহায়া জননীর অনেক প্রত্যাশা। পুত্রকে সংসারে ফিরিয়ে আনবার জন্য জননী ভুবনেশ্বরীর যথাসাধ্য চেষ্টার খবর অনেকেরই জানা আছে।

একবার তিনি নরেন্দ্রনাথকে ফিরিয়ে আনার জন্য কাশীপুর উদ্যানবাটিতেও ধাওয়া করেছিলেন। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন নিতান্ত নাবালক কনিষ্ঠ পুত্র ভূপেন্দ্রনাথকেও।

তখন এই বালকটির বয়স ছয়। ছোটছেলের হাত ধরে জননী ভুবনেশ্বরী সোজা চলে গিয়েছিলেন কাশীপুরের দোতলায়, রোগযন্ত্রণায় কাতর রামকৃষ্ণ তখন একটা বড় বালিশে হেলান দিয়ে একটা খাটে বসেছিলেন। নরেন্দ্র জননী বলেছিলেন, ডাক্তারের বারণ রয়েছে কথা বলায়, তবু তিনি কথা বলবেন।

তাঁর স্বাভাবিক স্নেহের সুরে পরমহংসদেব বলেছিলেন, এসে ভালোই করেছ মা, নরেনকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। প্রিয় শিষ্যকে তিনি বলেছিলেন, তোমার মা বিধবা, ভাইরা নাবালক, এই অবস্থায় সন্ন্যাসী হওয়া ঠিক সিদ্ধান্ত নয়।

সেদিন বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়েই ফিরেছিলেন ভুবনেশ্বরী, মায়ের বক্তব্য: শুনলি তো সন্ন্যাসী হওয়ার ব্যাপারে ঠাকুর কী বললেন!

এরপরেই নরেন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত উক্তি— ঠাকুর ওরকমই বলেন, চোরকে বলেন চুরি করতে, গৃহস্থকে বলেন সাবধান হতে।

দত্ত পরিবারের ভিটেবাড়ির দখল নিয়ে সুদীর্ঘ মামলার কিছু বিবরণ নানা জায়গায় সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু কী করে এই সম্পত্তির টানাটানিতে বা গৃহযুদ্ধে দু'পক্ষই সর্বস্বান্ত হলেন তা বিস্তারিতভাবে সংগৃহীত হয়নি।

ভিটেবাড়ির আইন-যুদ্ধে কত টাকা উকিলবাড়িতে খরচ হয়েছে এ বিষয়ে নানা হিসেব নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে, আরও অনেক খবর হাইকোর্টের কাগজপত্রে আজও ঘুমিয়ে আছে তা আমাদের জানা নেই। এ ব্যাপারে কনিষ্ঠপুত্র ভূপেন্দ্রনাথ উদ্ধৃতি দিয়েছেন তামু বাবু থেকে। ইনি তখনকার দত্তবাড়ির সরকারবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই মামলা থেকে তুমি কত টাকা রোজগার করেছ? সরকারবাবুর বিনম্র উত্তর, পাঁচ হাজার টাকার বেশি হবে না!

সন্ন্যাসী জননীর অর্থসংকট বুঝতে গেলে দত্ত ভিটেবাড়ির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তি জেনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। একই সঙ্গে জানা হয়ে যাবে গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের প্রখ্যাত দত্তদের ইতিহাস।

তিন নম্বর গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের সূত্রপাত রামসুন্দর দত্তের আগমনে।

এঁর পাঁচ পুত্র। জ্যেষ্ঠ রামমোহনের দুই ছেলে সাত মেয়ে। দুই ছেলের নাম দুর্গাপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদ। দুর্গাপ্রসাদের একমাত্র পুত্রসন্তান বিশ্বনাথই হলেন নরেন্দ্রনাথের পিতা। এঁর বিবাহ হয় ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে। এঁদের দশটি ছেলেমেয়ে হয়, তাঁর মধ্যে নরেন্দ্রনাথ একজন। একালের পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি না ঘটিয়ে বলা চলে, রামমোহনের দ্বিতীয়পুত্র কালীপ্রসাদের দুই ছেলে— কেদারনাথ ও তারকনাথ। তারকনাথের তিন পুত্র— অমৃতলাল, সুরেন্দ্রনাথ ও শরৎ।

সাতপুরুষের উকিলের বাড়ি বলে বিখ্যাত এই দত্ত পরিবারের ওকালতির ইতিহাসও সযত্নে সংগৃহীত হয়েছে।

নরেন্দ্রনাথের ঠাকুর্দার বাবা রামমোহন ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের অ্যাটর্নি। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর বংশের ব্যাপারে ইংরিজিতে যে বই লিখেছিলেন সেখানে নিবেদন করেছেন, সম্ভবত পূর্বপুরুষ ছিলেন 'ফার্সি উকিল' অর্থাৎ যে আইনত ফার্সি ভাষায় বিশেষজ্ঞ। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন এক ব্রিটিশ অ্যাটর্নি অফিসের ম্যানেজিং ক্লার্ক। গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের বাড়ি তৈরি করে তিনি তাঁর ভাইকেও সেখানে থাকতে বলেছিলেন, কিন্তু ভাই রাজি হননি।

রামমোহনের দুই ছেলে ও সাত মেয়ে। এক মেয়ের বংশধররা বড়িশা-বেহালায় বসবাস করেন বলে লিখেছেন ভূপেন্দ্রনাথ। আর এক মেয়ের বিয়ে হয়েছিল শিমুলিয়ায়, পাত্রের নাম লক্ষ্মীনারায়ণ বসু।

• স্বামীজীর ভগিনী স্বর্ণময়ী দেবী

ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন, দুর্গাপ্রসাদের বিবাহ হয় শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে, এঁদেরই সন্তান নরেন্দ্রপিতা বিশ্বনাথ, যাঁর জন্ম ১৮৩৫। এই দুর্গাপ্রসাদই অল্পবয়সে সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। রামমোহনের মৃত্যুও অল্প বয়সে, মাত্র ছত্রিশ বছরে। তাঁর মৃত্যুর পরে এক জামাই যে পরিবারের অভিভাবক হন, তাও জানা যাচ্ছে পারিবারিক সূত্রে। এই লোকটি নাকি শাশুড়ির প্রায় লাখখানেক টাকা উড়িয়ে দেন, অভিযোগ ভূপেন্দ্রনাথের। দুর্গাপ্রসাদও নাকি এক সময় অ্যাটর্নি অফিসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

দুর্গাপ্রসাদ সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ত্যাগ করার পর হেড অফ দ্য ফ্যামিলি হলেন কালীপ্রসাদ। বিয়ে হয় জয়নগরের মিত্র পরিবারে। কিন্তু তাঁর নিজস্ব তেমন রোজগার ছিল না। ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন, কালীপ্রসাদ এক সময় মামলা ইত্যাদি করার জন্য শ্যামাসুন্দরীর গহনাগাটি বন্ধক দিয়ে টাকাকড়ি জোগাড় করেছিলেন। এর বদলে একসময় তিনি বিশ্বনাথ দত্তের নামে কিছু সম্পত্তি লিখে দেন। সেইসময় নরেন্দ্রপিতার বয়স মাত্র ১৪ বছর। আইনি পেশায় সফল বিশ্বনাথ দত্তর বিচিত্র জীবনকথা একসময়ে নানা সূত্র থেকে সংগ্রহ করে একটা বই লিখেছিলাম, সেই সঙ্গে ছিল তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির সংবাদ, বিশেষ করে তাঁর রচিত উপন্যাস সুচরিতার কথা যা অন্য এক আত্মীয়ের নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

কালীপ্রসাদের একমাত্র পুত্র তারকনাথ হয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের নামী অ্যাডভোকেট এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে আইনি পরামর্শদাতা। তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে। নরেন্দ্রনাথ নিজেও এক সময়ে (১৮৮৩) তিন বছরের আইন কোর্সে ভর্তি হয়েছিলেন, বাবার ইচ্ছা বিলেতে পাঠিয়ে ব্যারিস্টার করিয়ে আনা। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা না হলে কী হত? এই প্রশ্নে স্বামী সারদানন্দ একবার বলেছিলেন, হয়তো মস্ত ব্যারিস্টার হয়ে অঢেল টাকা রোজগার করতেন। কিন্তু তিনি বি এ পাশ করেন ৩০ জানুয়ারি ১৮৮৪ এবং কয়েক সপ্তাহ পরে ২৫ ফেব্রুয়ারি পিতৃদেব বিশ্বনাথের আকস্মিক দেহান্ত। তার আগেই যৌথ পরিবারের বিষাক্ত পরিবেশে ভীত বিরক্ত বিশ্বনাথ ভৈরব বিশ্বাস লেনে বাড়ি ভাড়া করে উঠে এসেছিলেন। সেই সময়ে অ্যাটর্নি নিমাইচাঁদ বসুর অফিসে নরেন্দ্রনাথ আর্টিকেলেড্‌ ক্লার্ক, এই কোম্পানির নাম এন সি বোস অ্যান্ড কোং।

পিতৃহীন হবার সময় নরেন্দ্রনাথের বয়স মাত্র একুশ।

পরিবারের ভাগ্যবিপর্যয়ের সময়, নরেন্দ্রনাথ ভৈরব বিশ্বাস লেনের ভাড়াবাড়ি ছেড়ে ৯ রামতনু বসু লেনে উঠে এসেছিলেন মা, ভাই, বোনদের নিয়ে। আরও যা খারাপ খবর, বিশ্বনাথ কোনো উইল করে যাননি। এর ফলে একসময়ে হাইকোর্টে এক আবেদনপত্র ফাইল করতে হয় ভুবনেশ্বরী দেবীর নামে এবং কাগজপত্রে নরেন্দ্রনাথ দত্তকেও সেই আবেদনে সই করতে হয়। মাননীয় হাইকোর্ট এই আবেদনপত্রের বিচার করেন ১২ আগস্ট ১৮৮৬ এবং শোনা যায় হাইকোর্ট থেকেই নরেন্দ্রনাথ সোজা চলে যান কাশীপুর উদ্যানবাটিতে। যার কয়েকদিন পরেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি।

বিশ্বনাথ দত্তর মৃত্যুর ঠিক পরেই তারকনাথ দত্ত যৌথসম্পত্তি নিয়ে দাবি দাওয়া শুরু করেন। তাঁর দাবি তিনিই ভুবনেশ্বরী দেবীর বেনামে গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের একটা বড় অংশ ক্রয় করেছিলেন।

১৮৮৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারকনাথের দেহাবসানের পরেই তাঁর পত্নী জ্ঞানদাসুন্দরী প্রয়াত স্বামীর দাবি অনুযায়ী কলকাতা হাইকোর্টে মামলা রুজু করেন। এই মামলার অন্যতম সাক্ষী হিসেবে জাস্টিস ম্যাকফারসনের আদালতে হাজির হয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। শোনা যায় এ ব্যাপারে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, তিনি বলেছিলেন, ভয় পেও না, লড়ে যাও।

আরও শোনা যায়, এক পিতৃবন্ধু কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নি এই সময় প্রস্তাব দেন তাঁর নাতনির সঙ্গে নরেনের বিয়ে হলে তিনি মামলার সব ব্যয়ভার গ্রহণ করবেন। শোনা যায়, মামলার সময় ভুবনেশ্বরী দেবী পালকি করে কলকাতা হাইকোর্টে আসতেন, কিন্তু তাঁর আদরের বিলু যেতেন পদব্রজে। মোকদ্দমা বিশ্বনাথ দত্তের স্ত্রী বনাম তারকনাথ দত্তের স্ত্রী, তখন স্বামী বিবেকানন্দ বলে কেউ ছিলেন না।

১৮৮৭ সালের গোড়ার দিকে জ্ঞানদাসুন্দরীর মামলা কলকাতা হাইকোর্টে শুরু হল, তাঁর পক্ষে বিখ্যাত ইংরেজ ব্যারিস্টার পিউ। ৮ মার্চ ১৮৮৭ নরেন্দ্রনাথ যখন বরাহনগর মঠনিবাসী, এখন সাক্ষ্য দিতে এসে জেরার মুখে পড়তে হল তাঁকে।

এই জটিল মামলা সম্বন্ধে পরবর্তীকালে ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর বিবেকানন্দ জীবনীতে লিখেছেন, স্বামীজির অনেক গ্রন্থে একটা মিথ্যা সংবাদ আছে, এই মামলায়, ব্যারিস্টার ও উকিল পাই পয়সাটি পর্যন্ত আদায় করেছিল, ব্যারিস্টারদের নগদ বিদায় দিতে হয়। আর উকিলের পাওনা, তা শেষবার দেবার সময় লেখক হাজির ছিলেন এবং তার রসিদ আছে।

জানা যাচ্ছে, ভুবনেশ্বরীর পক্ষে ব্যারিস্টার ছিলেন ডবলু সি বনার্জি যিনি পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন।

মাননীয় জাস্টিস ম্যাকফারসন রায় দিলেন ১৪ মার্চ ১৮৮৭। তিনি জ্ঞানদাসুন্দরীর মামলাটা খারিজ করে দিলেন। কিন্তু সমস্যার শেষ হল না, কারণ জ্ঞানদাসুন্দরী ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করলেন। এই আপিল শুনেছিলেন স্বয়ং চিফ জাস্টিস আর্থার উইলসন এবং জাস্টিস রিচার্ড টোটেনহাম। তাঁরাও ভুবনেশ্বরীর পক্ষে রায় দিলেন ১০ নভেম্বর ১৮৮৭। সম্পত্তিতে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জননী ভুবনেশ্বরী এবার সম্পত্তি ভাগের আর্জি জানালেন। তখন নরেন্দ্রনাথের বয়স ২৪।

হাইকোর্টের আপিলেই কিন্তু পারিবারিক মামলার অবসান হয়নি। শোনা যায় নানা অছিলায় নরেন্দ্রজননীকে ঠকাবার চেষ্টা অব্যাহত ছিল। এবার জ্ঞানদাসুন্দরী প্রস্তাব দিলেন, তাঁর সম্পত্তির অংশ তিনি ৬০০০ টাকায় বিক্রি করে দিতে চান, নরেন্দ্রনাথ বুঝতেই পারেননি এই প্রস্তাবের পিছনে ফাঁদ পাতা আছে। সরল মনে নরেন্দ্রনাথ তাঁকে ৬০০০ টাকা দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই টাকা নিয়েও জ্ঞানদাসুন্দরী তাঁর বেচে দেওয়া অংশ ভুবনেশ্বরীকে দিলেন না। অতএব আবার আইনি যুদ্ধ এবং সেইসব চলেছিল স্বামীজির দেহাবসানের সময় পর্যন্ত। এই মিটমাট এবং সব কিছু শেষ করবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন।

অনেকের ধারণা স্বামীজি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর মহাসমাধি আগত, তাই গর্ভধারিণীর ভিটেবাড়ির আইনি সমস্যা ঝটপট মিটিয়ে, সেইসঙ্গে অ্যাটর্নি পল্টু করের পাওনা ৪০০ টাকাও মিটিয়ে দিয়েছিলেন এবং দলিল দস্তাবেজ পাকা করবার জন্য মহাপর্বের দিন দুই আগে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে নিয়ে নিজেই অ্যাটর্নি অফিসে গিয়েছিলেন।

৪ জুলাইয়ের পরের দিন প্রিয়পুত্রের প্রাণহীন দেহ শেষবারের মতন দেখতে জননী ভুবনেশ্বরী কীভাবে বেলুড়ে ছুটে গিয়েছিলেন তার মর্মস্পর্শী বিবরণ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর ইংরিজি রচনায় লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

স্থান ৭ নম্বর রামতনু বসু লেন, এখানেই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ মাঝে মাঝে আসতেন জননী ও দিদিমাকে দেখতে। এইখানেই শনিবার ৫ জুলাই ১৯০২ সর্বনাশা খবর নিয়ে হাজির নাদু। নাদু মহারাজের আদিনাম হরেন্দ্রনাথ রায়, মঠের নাম ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথ। সম্পর্কে উনি স্বামীজির ভাগ্নে, তিনি স্বামীজির সেবকও বটে। পরবর্তী সময়ে বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ নাদু মহারাজ ছিলেন স্বামীজির স্নেহের শিষ্য। পরবর্তীকালে বৃন্দাবনে 'ভাগ্যচক্রে' এক বিধবাকে বিবাহ করতে হয়। যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে দেখা করতে কলকাতায় এসেছিলেন এবং বৃন্দাবনে ফিরে গিয়ে দেহরক্ষা করেন।

ভূপেন্দ্রনাথ বলেন, শনিবার ৫ জুলাই ভোরবেলায় নাদু দুঃসংবাদ নিয়ে রামতনু বসু লেনে উপস্থিত। অসহায় ভূপেন্দ্রনাথ মা ও দিদিমাকে খবর দিতে। মা জানতে চাইলেন, কী হয়েছিল? ছোট ছেলে ভূপেন্দ্রনাথ জানালেন, বাবার যা হয়েছিল। শোকাহত মা ও দিদিমা উচ্চৈস্বরে কাঁদতে লাগলেন এবং পাশের বাড়ি থেকে এক প্রতিবেশিনী ছুটে এলেন।

ভূপেন্দ্রনাথকে নাদু বললেন, সিমলা স্ট্রিটের মিত্রদের খবর দিতে। ভগ্নিপতির বাড়িতে পৌঁছে ভূপেন্দ্রনাথ দেখলেন তাঁরা ইতিমধ্যেই খবর পেয়ে গিয়েছেন।

নাদু ও ভূপেন্দ্রনাথ এরপরে বেলুড়ে রওনা হয়ে গেলেন। সেখানে হাজির হয়ে দেখলেন কিছু সন্ন্যাসী, অতুলচন্দ্র ঘোষ এবং নিবেদিতা ইতিমধ্যেই চলে এসেছেন। তারপর দেখলেন, বড় নাতি ব্রজমোহন ঘোষকে নিয়ে মা হাজির হলেন। সন্তানহারা জননীর কান্না শেষ হতে চায় না এবং সাধুরা এক সময় ছোটভাইকে বললেন, মাকে নিয়ে যেতে।

ক্রন্দনরতা নিবেদিতা মাকে এগিয়ে দিতে এলেন এবং মা বড় নাতিকে নিয়ে বেলুড় থেকে বিদায় নিলেন। নিবেদিতা এক সময় গিরিশচন্দ্র ঘোষকে জিজ্ঞেস করলেন, ওঁরা মাকে চলে যেতে বললেন কেন? দেহাবসানের পর সন্ন্যাসীদের নিয়মকানুন সম্পর্কে বোধহয় কিছু কথা বলা হয়েছিল।

ভূপেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, কয়েকদিন পরে স্বামী নির্ভয়ানন্দ (কানাই মহারাজ) মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তারপর এসেছিলেন স্বয়ং স্বামী ব্রহ্মানন্দ, তাঁর সঙ্গে ছিলেন এক তরুণ ব্রহ্মচারী।

সন্ন্যাসীর শ্রাদ্ধ হয় না, কারণ আত্মশ্রাদ্ধ করেই তো তাঁরা সন্ন্যাসজীবনে প্রবেশ করেন।

তবে স্বামীজির অন্তিম ইচ্ছা পূরণের জন্য ৪ জুলাইয়ের পরবর্তী অমাবস্যার রজনীতে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীকালীপূজার অনুষ্ঠান হয়েছিল। পূজকের আসন গ্রহণ করেছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতৃদেব ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী। বাইরের কাউকেই আমন্ত্রণ করা হয়নি, কেবল এসেছিলেন ভাই ভূপেন্দ্রনাথ। ঠাকুরের সান্ধ্যকালীন ভোগের পর স্বামী ব্রহ্মানন্দ বললেন স্বামী প্রেমানন্দকে, ''ভূপেনকে ঠাকুরের প্রসাদ খেতে দাও, আমাদের সকলের আজ উপবাস।''

এবার শেষের কথা এবং মায়ের একমাত্র সন্তান হয়েও এই দুঃখিনী সারাজীবন ধরে নানা দুঃখ, কষ্ট ও অবিচার নীরবে হাসিমুখে সহ্য করেছেন এবং বিশ্বকে এক অবিস্মরণীয় সন্তান উপহার দিয়েছেন। বিশ্ববিজয়ী সন্তানের মহাসমাধির পরেও তিনি এক দশক বেঁচেছিলেন। ভুবনেশ্বরীর দেহাবসান কলকাতায় মেনিনজাইটিস রোগে ২৫ জুলাই ১৯১১। তাঁর শেষকৃত্যের সময় শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন পুত্র মহেন্দ্রনাথ ও সিস্টার নিবেদিতা। কনিষ্ঠপুত্র ভূপেন্দ্রনাথ তখন মার্কিন দেশে নির্বাসিতের জীবন যাপন করছেন।

শেষজীবন পর্যন্ত ভুবনেশ্বরীর একমাত্র নির্ভরযোগ্য আশ্রয় জননী রঘুমণি। মেয়ের শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের এবং নাতিদের আজব কাণ্ডকারখানার নীরব সাক্ষী হয়ে নব্বুই বছর পর্যন্ত তিনি বেঁচেছিলেন। আদরের কন্যার মৃত্যুর আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে রঘুমণির দেহাবসান হয়।

গুরুপত্নী ও জননী

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সুযোগ্যা সহধর্মিণী সারদামণি অবশ্যই স্বামীজির শ্রীমা। সন্ন্যাসজীবনে এই মা বিবেকানন্দের জীবনে ঘুরেফিরে এসেছেন।

গর্ভধারিণী জননীকে বিদায় জানিয়ে নরেন্দ্রনাথ যে কঠিন

পথে অগ্রসর হলেন সেখানে তিনি মাতৃহীন হননি তা আজ আর কারও জানতে বাকি নেই। কবে কোথায় এই নতুন মাকে তিনি প্রথম দেখলেন তা এখনও স্পষ্ট নয়।

খুঁজেপেতে পেয়েছি এক সাক্ষাতের কথা জননী সারদামণি নিজেই বলেছেন— ‘‘নরেনের জন্য ঠাকুর একদিন বললেন, ‘বেশ করে রাঁধো’। আমি মুগের ডাল, রুটি করলাম। খাবার পরে নরেনকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘ওরে কেমন খেলি?’ নরেন বললে, ‘বেশ খেলুম, যেন রোগীর পথ্য।’ ঠাকুর শুনে গৃহিণীকে বললেন, ‘ওকে ওসব কি রেঁধে দিয়েছ? ওর জন্য ছোলার ডাল, আর মোটা রুটি করে দেবে।’ আমি শেষে তাই করলুম। তবে নরেন খেয়ে তুষ্ট হলো।’’

মা আর একবার বললেন, ‘‘তিনি নরেনকে যখনই বলতেন, ‘তুই আজ এখানে থাকবি, আমি তখনই তার জন্যে ছোলার ডাল চড়িয়ে দিয়েছি। তিনি আমাকে নরেনের খাবার কথা বলতে এসে দেখেন, ডাল সেদ্ধ হচ্ছে। ময়দা মাখছি।’’

ঠাকুরের অসুস্থ অবস্থায় শ্যামপুকুরে নরেন্দ্রনাথ যে নিজের বাড়িতে আহার করে এসে রাত্রে ঠাকুরের কাছে থাকতেন সারদামণি তা কখনও ভোলেননি। একসময় তিনি বলছেন, কাশীপুর বাগানবাড়িতে তিনটি রান্না হতো— একটি ঠাকুরের, একটি নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির এবং তৃতীয়টি অন্য সকলের। ঠাকুরের গৃহীভক্তরা চাঁদা তুলে এই খরচ বহন করতেন।

লেখক মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত ঘুসুড়ির বাড়িতে প্রিয় সন্তানের সঙ্গে মায়ের দেখা হওয়ার কথা উল্লেখ করছেন। মাঘ মাসের প্রথম দিকে দোলের আগে কামারপুকুর থেকে ঘুসুড়িতে এসে তিনি রাজ গোমস্তার ভাড়াটে বাড়িতে বসবাস করতেন। ‘এই বাড়িতে নরেন্দ্রনাথ তাঁকে গান শুনিয়ে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে তাঁর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দীর্ঘ প্রব্রজ্যায় বেরিয়েছিলেন। সেবার স্বামীজির সঙ্গী গঙ্গাধর মহারাজকে মা বলেছিলেন, ‘বাবা তোমাদের হাতে আমাদের সর্বস্ব দিলাম। তুমি পাহাড়ের সব অবস্থা জানো, দেখো যেন নরেনের কষ্ট না হয়।’

আমেরিকা যাবার আগে স্বামীজি মাদ্রাজ থেকে এক চিঠিতে মায়ের আশীর্বাদ চেয়েছিলেন।

উত্তরে মা লিখেছিলেন, ‘বাবা তুমি দিগ্বিজয়ী হয়ে ফিরে এসো। তোমার মুখে সরস্বতী বসুক।’

পরে আমেরিকা থেকে স্বামীজি এক চিঠিতে লেখেন, ‘মা ঠাকরুণ যে কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখানেও কেউ পারে না— ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না...মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন... রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান— আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ। রাগ করো না, তোমরা এখনও কেউ মাকে বোঝনি। মায়ের কৃপা আমার বাপের কৃপার চেয়ে শতগুণ বড়ো। ...রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন— যা হয় বলো ; কিন্তু দাদা, যার মায়ের উপর ভক্তি নাই, তাকে ধিক্কার দাও।’

ঠাকুরের সমস্ত সন্তানের মধ্যে যে নরেনকে সবচেয়ে বড় এবং অতুলনীয় মনে করতেন তা সমকালের অনেকেই জানতেন। একবার মা বলেছিলেন, যেখানে নরেনের পুজো হয় না, সেখানে কি আর ঠাকুর পুজো গ্রহণ করেন?

নরেন কীভাবে মাকে দর্শন করতে যেতেন তার বর্ণনা রেখে গিয়েছেন স্বামী প্রেমানন্দ। ‘স্বামীজি যেদিন মাকে দর্শন করতে যেতেন, নিজেকে পূর্ণভাবে প্রস্তুত করে নিতেন। একদিন ভোরে উঠে গঙ্গাস্নান করতে গেলেন এবং বারবার ডুব দিতে লাগলেন,... সেবককে বলতে লাগলেন, ওরে আমার গায়ে গঙ্গাজলের ছিটে দে...তারপর কোনরকমে মায়ের দরজা পর্যন্ত গিয়ে আর চলতে পারলেন না, ভাবে বিহ্বল হয়ে পড়ে গেলেন। মা তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে তুলে ধরলেন।’

• গুরুপত্নী ও জননী শ্রীশ্রী মা সারদামণি

মায়ের স্মৃতিকথায় রয়েছে, ‘নরেন বলেছিল, মা, আর আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে। সব দেখছি উড়ে যায়।’

মা বললেন, ‘দেখো, দেখো, আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না।’

নরেন বলেছিলেন, মা তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞানে গুরু পাদপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে তো অজ্ঞান।

এই দিনেই নরেন সুখবরটি শ্রীমাকে দিয়েছিলেন। ‘মা, এই ১০৮ বিল্বপত্র ঠাকুরকে আহুতি দিয়ে এলাম, যাতে মঠের জমি হয়। তা কর্ম কখনো বিফলে যাবে না। ও হবেই একদিন।’

আমেরিকা জয় করে দেশে ফিরে এসে মায়ের সঙ্গে স্বামীজির সাক্ষাৎকারটি স্মরণীয়। এবিষয়ে কুমুদবন্ধু সেনের স্মৃতিচারণই আমাদের অবলম্বন। ‘১৮৯৭ সালের এপ্রিল মাসে মা যখন কলকাতায় পৌঁছন ও বাগবাজারে গঙ্গার সন্নিকটে ভাড়াটে বাড়িতে থাকেন, তখন স্বামীজি ডাক্তারের উপদেশে দার্জিলিং গিয়েছিলেন। সেই সময় খেতড়ির মহারাজা অজিত সিংহ বিলেত যাবার আগে কলকাতায় আসেন এবং তাঁর অনুরোধে স্বামীজিও দার্জিলিং থেকে কলকাতায় আসেন। কলকাতায় পৌঁছেই পরেরদিন বিকেল বেলায় স্বামীজি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে তাঁর বাড়িতে যান।

‘আমেরিকা হইতে ফিরিবার পর মায়ের সহিত তাঁহার এই প্রথম সাক্ষাৎ।...মা, তাঁহার ঘরের কাছে বস্ত্রাবৃত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া ছিলেন। সুদীর্ঘ সাত বৎসর পরে স্বামীজি তাঁহার সম্মুখে আসিয়াই সটান মাটিতে পড়িয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। কিন্তু তাঁহার পাদস্পর্শ করিলেন না...মা বললেন, ঠাকুর সর্বদাই তোমার সঙ্গে আছেন। আর জগতের কল্যাণের জন্য তোমার আরও অনেক কাজ করতে হবে।...’

স্বামীজি বললেন, 'মা, আমি ঠাকুরের বাণীই প্রচার করতে চাই, আর তার জন্যে যত সত্বর সম্ভব একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়তে চাই। কিন্তু তা আমি যত তাড়াতাড়ি করতে চাই, তা হচ্ছে না বলে আমি হতাশ বোধ করি।'

উত্তরে মা বললেন, 'ওজন্য কোনো দুশ্চিন্তা কোরো না। তুমি যা করছ, আর পরে যা করবে, তা চিরকাল থাকবে। এই কাজের জন্যেই তোমার জন্ম।'

বিদায়কালে স্বামীজি আবার মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেছিলেন।

কুমুদবন্ধু সেন জানাচ্ছেন, কয়েকদিন পরে দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ১লা মে ১৮৯৭ স্বামীজি রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন। প্রতি রবিবার বলরাম বসুর বাড়িতে মিশনের যে যে সভা বসত তার কয়েকটিতে শ্রীমা উপস্থিত থাকতেন। এবং তিনি মিটিংয়ে থাকলেই স্বামীজি অনেকগুলি গান গাইতেন।

মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত খোঁজখবর নিয়ে জানিয়েছেন, ২০ জুন ১৮৯৯ স্বামী তুরীয়ানন্দ ও নিবেদিতাকে নিয়ে স্বামীজি দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য যাত্রা শুরু করেন। ওইদিন দুপুরে মা তাঁদের 'পরিতোষপূর্বক' খাইয়েছিলেন। অপরাহ্ণে স্বামীজি তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে প্রিন্সেপ ঘাটে গিয়ে জাহাজে ওঠেন।

পরবর্তী সময়ে আরও খবর পাওয়া যাচ্ছে, আমেরিকা থেকে ফিরে এসে শ্রীমাকে প্রথমবার দর্শন করতে গিয়ে স্বামীজি বলেছিলেন, আমেরিকাতে তিনি যে সম্মান ও সাফল্যলাভ করেছিলেন তা মায়ের আশীর্বাদেই সম্ভব হয়েছিল। আবার কখন-কখন তিনি বলেছেন, ''মা ঠাকুরের চাইতেও বড়।''

মায়ের স্মৃতিতে নরেনের অনেক কথা সঞ্চিত ছিল। 'বোসপাড়ায় আমরা আছি। শুনতে পাচ্ছি, নিচের তলায় নরেন এসে গোলাপকে বলছে, গোলাপ-মা, আমার বড় খিদে পেয়েছে। গোলাপ-মা গোটাকতক মিছরির টুকরো নিয়ে নরেনের হাতে দিয়েছে। নরেন তো রেগেই খুন! আমি একটা থালায় করে খাবার পাঠিয়ে দিলুম। নরেন খায় আর বলে, 'একেই বলি মা...পুজুরী বামুনের মেয়ে মা কেমন-করে এমন হলো আমি বুঝতে পারছি না'।

কাম-কাঞ্চন ত্যাগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ মঠের প্রতিষ্ঠাকালে সব নিয়মের ঊর্ধ্বে উঠে সারদামণিকে সঙ্ঘজননীর সম্মান দিয়েছিলেন। সকল বিষয়েই তিনি মায়ের সম্মতি কামনা করতেন। এই মা অনেক বছর আগে গঙ্গায় স্বামীর পিণ্ডদান করতে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা করেছিলেন, ''ঠাকুর আমার ছেলেরা থাকতে পায় না, খেতে পায় না, দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের তুমি একটা জায়গা করে দাও।''

১৮৯৮ সালে— মার ওই প্রার্থনার ঠিক আট বৎসর পরে মঠের জমি কেনা হয় এবং অল্প পরেই স্বামীজি তাঁকে মঠের নতুন জমি দেখান। মঠের চতুসীমা ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে স্বামীজি বললেন, 'মা তুমি আপনার জায়গায় আপন মনে হাঁপ ছেড়ে বেড়াও।'

নতুন মঠবাড়ি নির্মিত হলে মা তা দেখতে আসেন কালীপূজার দিনে ১২ নভেম্বর ১৮৯৮ সনে। মা সেদিন সেখানে বসে ঠাকুরের পূজা ও ভোগ নিবেদন করেন। সেদিন সুদীর্ঘ সময় ধরে ঠাকুরের ছবিও আত্মারামের কৌটা পূজা করেন। 'তখন তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে, হাত দুটি কম্পিত হইতেছে। পরে ওই আত্মারামের কৌটাটি বুকে ধারণ করিয়া বহুক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন।'

মঠের প্রথম দুর্গাপূজার সময় শ্রীমাকে মঠে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। 'সেবার পূজককে আমার হাত দিয়ে পঁচিশ টাকা দক্ষিণে দেওয়ালে। চৌদ্দশ টাকা খরচ করেছিল।'

সেবারের বড় খবর, গর্ভধারিণী জননী ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের দেখা। শোনা যাক সারদামায়ের মুখ থেকে— 'তার মাকেও পূজার সময় মঠে নিয়ে এসেছিল। সে বেগুন তোলে, লঙ্কা তোলে আর এ বাগান ও বাগান ঘুরে বেড়ায়। মনে একটু অহং যে, আমার নরেন এসব করেছে। নরেন তখন তাকে বলে, ওগো, তুমি করছ কি? মায়ের কাছে গিয়ে বস না— লঙ্কা ছিঁড়ে বেগুন ছিঁড়ে বেড়াচ্ছ। মনে করছ বুঝি তোমার নরু এসব করেছে। তা নয়, যিনি করবার তিনিই করেছেন, নরেন কিছু নয়।'

জননী সারদামণির প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে প্রিয় লেখক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের কিছু মন্তব্য উদ্ধৃত করতে চাইছি। 'নরেন্দ্রনাথ যে নবযুগ উদ্বোধনের বার্তাবহ সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না আরেকজনের। তিনি শ্রীমা সারদাদেবী। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তের পর তাঁর ত্যাগী শিষ্যদের এক চরম সঙ্কটের মধ্যে পড়তে হয়েছিল।...তাঁদের নেতা নরেন্দ্রনাথও তখন দ্বিধাগ্রস্ততা স্পষ্টভাবে কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হননি। তখন সেই ক্রান্তি মুহূর্তে তাঁর এবং তাঁদের সম্মুখে আশার আলো দেখালেন জননী সারদা, বললেন: সাধারণ সন্ন্যাসীদের মতো জীবন কাটাবার জন্য তাঁরা আসেননি, তাঁরা এক মহান ভাবান্দোলনের স্থপতি, যে ভাবান্দোলন সমগ্র পৃথিবীকে দেবে নতুন প্রভাবের প্রতিশ্রুতি। আর নরেন্দ্রনাথকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনিই সে ভাবান্দোলনের প্রধান নায়ক।'

স্বদেশে তৃতীয়া জননী মৃণালিনী বসু

এর পরেও আছেন কয়েকজন সৌভাগ্যবতী। স্বদেশে আমরা মন্ত্রশিষ্যা মৃণালিনী বসুর নাম পাচ্ছি। বড়জাগুলিয়া গ্রামের জমিদার সর্বেশ্বর সিংহের কন্যা মৃণালিনী বাপের বাড়িতে থাকতেন। এগারো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ, স্বামীর নাম বেণীমাধব বসু, তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন, পুত্র বিষাদ বসুর বয়স তখন দুই। শ্বশুরবাড়িতে দুর্ব্যবহার হতে থাকায় মৃণালিনীর বাবা তাঁকে বড়জাগুলিয়াতে নিয়ে আসেন। পিতার মৃত্যুও অকালে হওয়ায় একমাত্র উত্তরাধিকারিণী মৃণালিনী বাবার জমিদারি দেখতেন। এঁকে লেখা স্বামীজির দুটি অত্যন্ত মূল্যবান চিঠির তারিখ ৩ জানুয়ারি ১৮৯৮ ও ২৩ ডিসেম্বর ১৯০০।

মৃণালিনীর নাতনি (বিষাদ বসুর কন্যা) কাঞ্চনমালা পালিত পরবর্তী সময়ে বলেছেন— ঠাকুমার কাছে শুনেছি স্বামীজি ট্রেনে কাঁচড়াপাড়া এসে সেখান থেকে গরুর গাড়ি করে বড়জাগুলিয়া আসেন। স্বামীজি সপ্তাহখানেক ওখানে ছিলেন। সেই ক'দিন হইচই এবং আনন্দে স্বামীজি সবাইকে মাতিয়ে রেখেছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের দিনলিপি অনুসারে স্বামীজির সঙ্গে যে দুজন বড়জাগুলিয়া এসেছিলেন তাঁরা হলেন স্বামী নির্ভয়ানন্দ ও নাদু।

'স্মৃতির আলোয় স্বামীজি' গ্রন্থের সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের মন্তব্য, মন্ত্রশিষ্যা মৃণালিনীকে স্বামীজি যে দুখানি দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন তার থেকে বোঝা যায় এই শিষ্য খুবই বিদুষী ও মনস্বিনী ছিলেন।

মৃণালিনীর কাছে লেখা চিঠি দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু

• বড় জাগুলিয়ায় মৃণালিনী বসুর বাড়ি

তারিখ নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। তিনখণ্ডে ইংরিজি ভাষায় সাবধানি জীবনীকার শৈলেন্দ্রনাথ ধর পত্রাবলী এবং বাণী ও রচনায় 'দেওঘর, বৈদ্যনাথ, ৩রা জানুয়ারি ১৮৯৮' উল্লেখটি সন্দেহ করেছেন। অধ্যাপক ধর বলছেন, ১লা জানুয়ারি ১৮৯৮ তিনি জয়পুর থেকে আজমির রওনা দিলেন। আজমির থেকে যোধপুরে স্যর প্রতাপ সিং-এর বাড়িতে দশ দিন ছিলেন। অনেক হিসেব নিকেশ করে অধ্যাপক ধর সন্দেহ করছেন স্বামীজির ভুল, ওটা হবে ৩রা জানুয়ারি ১৮৯৯।

পরবর্তী সময়ে ইংরেজি রচনাবলীর নবম খণ্ডে যে সংশোধিত ইনডেক্স প্রকাশিত হয়েছে সেখানে মৃণালিনীকে লেখার চিঠিটি ৩রা জানুয়ারি ১৮৯৯ বলা হচ্ছে। অধ্যাপক ধর এরপর বলছেন, ৯ জানুয়ারি ১৮৯৮ যোধপুর থেকে তিনি আজমিরে ফিরে এলেন, সেখান থেকে খাণ্ডওয়া বম্বে-ক্যালকাটা মেল ধরবার জন্যে।

এখন প্রশ্ন হলো, 'মা' মৃণালিনীকে কি স্বামীজি আরও চিঠি লিখেছিলেন যা আমাদের আয়ত্তে নেই? এইসব 'ইফ অ্যান্ড বাটস'-এর মধ্যে না গিয়ে দেখা যাক মৃণালিনীর প্রশ্নের উত্তর তিনি কীভাবে দিয়েছিলেন।

স্বামীজি তাঁর নতুন মাকে স্পষ্ট জানাচ্ছেন, ঋষি, মুনি, দেবতা কারও সাধ্য নেই যে সামাজিক নিয়মের প্রবর্তন করেন।

আরও প্রশ্ন: সমাজ যে সকল নিয়ম করে তা কি সামাজিক সাধারণের কল্যাণের জন্য? উত্তর: অনেকে বলেন, হ্যাঁ; আবার কেউ কেউ বলেন, না। কতকগুলি লোক অপেক্ষাকৃত শক্তিমান হয়ে ধীরে ধীরে অপর সকলকে নিজের অধীন করে ফেলে এবং ছলে বলে বা কৌশলে স্ব-কামনা পূর্ণ করে।

মা মৃণালিনীকে চিঠির এক অংশে শিক্ষক বিবেকানন্দ প্রশ্ন তুলেছেন— সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না, এই তুমি আমি বড় জাত!!! আর যদি তাই সত্য হয়, তা হলেও তোমার আমার কি অহঙ্কার যে, আমরা অন্য সকলকে পথ দেখাই? আমরা কি সবজান্তা?

এক পর্যায়ে মা মৃণালিনীকে 'কল্যাণাকাঙ্ক্ষী বিবেকানন্দ' বলছেন, ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নটি বড়ই সুন্দর... সকল ধর্মের ইহাই সার— বাসনার বিনাশ; সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় ইচ্ছার বিনাশ হলো; কারণ বাসনা ইচ্ছাবিশেষের নামমাত্র।

'মা' মৃণালিনীকে লেখা 'সদাশুভাকাঙ্ক্ষী' বিবেকানন্দের দ্বিতীয় চিঠি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। দার্শনিক স্বামীজি ব্যাখ্যা করছেন, অনেকগুলি ব্যক্তির একত্র নাম 'সমষ্টি', এক-একটির নাম 'ব্যষ্টি'। তুমি আমি 'ব্যষ্টি', সমাজ 'সমষ্টি'। ...ব্যষ্টির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে কিনা এবং কত পরিমাণে হওয়া উচিত...আত্মসুখ ত্যাগ করা উচিত কিনা— এই প্রশ্নই সমাজের অনাদিকালের বিচার্য।

কিছু পরেই সাধারণ মানুষের জয়গান। 'তিনখানা মাটির ঢিপি ও খানকতক কাষ্ঠখণ্ড নিয়ে এদেশের রাঁধুনি যে সুস্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, তা আর কোথাও নেই। একটা মান্ধাতার আমলের এক টাকা দামের তাঁত ও একটা গর্তের ভিতর পা, এই সরঞ্জামে ২০ টাকা গজের কিংখাব এদেশেই সম্ভব। একখানা ছেঁড়া মাদুর, একটা মাটির প্রদীপ, তায় রেড়ির তেল, এই উপাদান-সহায়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিত এদেশেই হয়। খেঁদাবোঁচা স্ত্রীর উপর সর্বসহিষ্ণু মহত্ব ও নির্গুণ মহাদুষ্ট পতির উপর আজন্ম ভক্তি এদেশেই হয়।'

আরও সব মহামূল্যবান উক্তি আছে স্বামীজির এই চিঠিতে।— 'ধরে-বেঁধে প্রীতি কি হয়? চিরভিখারীর ত্যাগে কি মাহাত্ম্য?...একজনের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারলে তবে সমাজের জন্য ত্যাগের কথা বলা উচিত, তার আগে নয়। সকাম থেকেই নিষ্কাম হয়। কামনা না আগে থাকলে কি কখনও ত্যাগ হয়? আর তার মানেই বা কি? অন্ধকার না থাকলে কি কখনো আলোকের মানে হয়?'

স্বামীজির চিঠির শেষে আরও স্পষ্ট কথা আছে। 'ক্ষীর-ননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে, এক ফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে?... কাঁদতে ভয় পাও কেন? কাঁদো। কেঁদে কেঁদে তবে চোখ সাফ হয়, তবে অন্তর্দৃষ্টি হয়।'
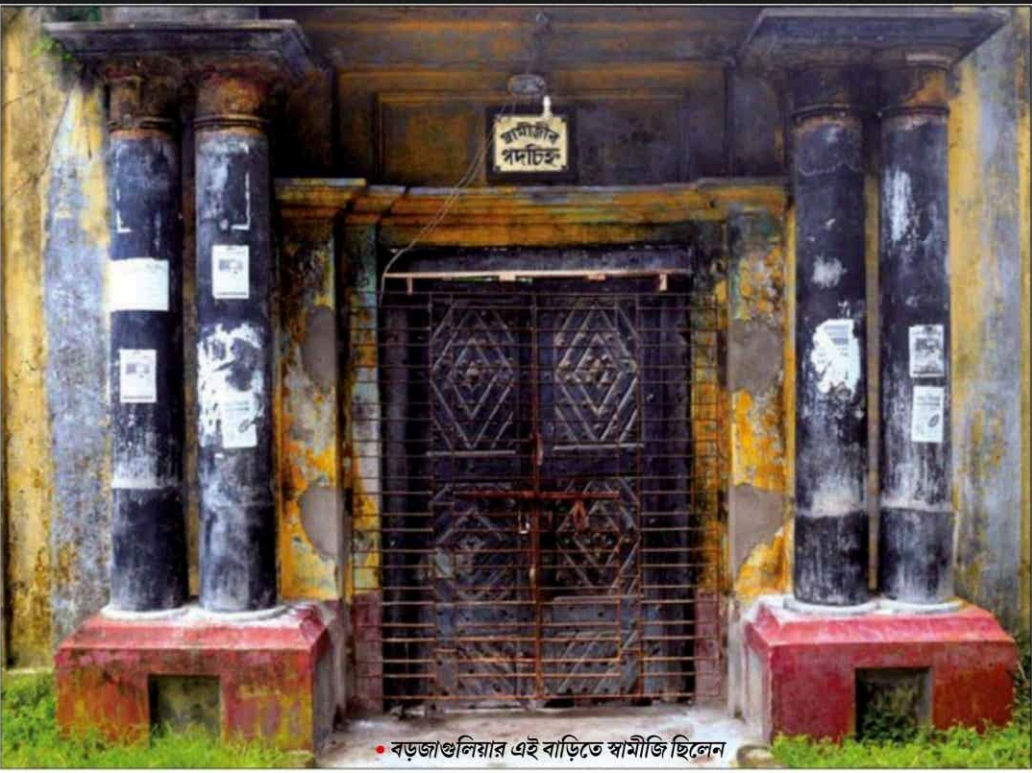
• বড়জাগুলিয়ার এই বাড়িতে স্বামীজি ছিলেন

প্রশ্নমালা ও উত্তরের স্টাইল দেখে ভাবতে ইচ্ছা হয় না যে স্বামীজি তাঁর 'মা' মৃণালিনীকে মাত্র দুটি চিঠি লিখেছিলেন। সেইসব হারানো অথবা বিস্মৃত চিঠিগুলো কোথায় তা আজ আর জানবার উপায় নেই। সম্পাদকের ফুটনোটে শুধু জানা যায়, স্বামীজি তাঁর এই মাকে তাঁর একটি ফটো উপহার দিয়েছিলেন এবং সেই ছবিটি মৃণালিনী গৃহে আজও পূজিত হয়।

ভাবতে ভালো লাগে, দেহত্যাগের মাসখানেক আগে স্বামীজি বড়জাগুলিয়ায় এক সপ্তাহ (৬-১২ জুন ১৯০২) থাকেন।

ক্যালেন্ডারের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে, বড়জাগুলিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অন্ত্যলীলার কথা। এর অনেক আগে গর্ভধারিণী জননীর চোখের জল উপেক্ষা করে ও দ্বিতীয়া জননী সারদামণির কথা তেমন না ভেবে স্বামীজি সাগরপারে পাড়ি দিয়েছিলেন অজানার সন্ধানে। একপর্বে তিনি কলকাতার মায়া কাটিয়ে পরিব্রাজক হয়েছিলেন স্বদেশের মানচিত্র ধরে, তাঁর স্মৃতিতে ছিল বহুযুগ আগের আর এক নবীন সন্ন্যাসী যাঁর নাম শঙ্করাচার্য। তারপর বোম্বাই বন্দর থেকে স্বামীজি চললেন দূর মহাদেশে, এই দূরত্ব যে ১৫,০০০ মাইল তা বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে নিজের চিঠিতেই লিখেছেন।

গর্ভধারিণীকে ছেড়ে গুরুমাতাকে জননীর আসনে বসিয়ে সন্ন্যাসের নিয়মকানুনে বন্দি না হয়ে তিনি গুরুমাতাকে সঙ্ঘজননীর দুর্লভ স্বীকৃতি দিলেন, তারপর একদিন শুরু হলো বিশ্ব পরিক্রমার পরিকল্পনা। অনেকদিন জানতাম, মহাসমুদ্রের ওপারে যাওয়ার পূর্বে তিনি দ্বিতীয়া জননী সারদামণির সম্মতি আদায় করেছিলেন। ঐতিহাসিকের কাছ থেকে অনেক বছর পরে আরও জানা যাচ্ছে, গর্ভধারিণী জননীও তাঁর সম্মতি-আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। কোথাকার কোন চিঠি ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় তা সমকালে অনেক সময়ে বোঝা যায় না।

গর্ভধারিণীকে কাঁদিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে নতুন সঙ্ঘজননীর মায়া কাটিয়ে অজানার উদ্দেশে বেরিয়েও কোনো কোনো ভাগ্যবান আবার নতুন মায়ের মায়াবন্ধনে পড়ে যান। আমাদের সন্ন্যাসীরও কি তাই হয়েছিল? তেইশ বছরে গৃহত্যাগ, কমবয়সে দেশত্যাগ, শঙ্করাচার্যের মতন কয়েকবছর ধরে অজানা মহাদেশে চিরন্তন ভারতের পতাকা উত্তোলন করে, ভগ্নশরীর সন্ন্যাসী মানুষের মুক্তি ও মঙ্গলের কামনায় স্বদেশে ফিরে এলেন উদাত্ত আহ্বান জানাতে, ওঠো, জাগো, তিনি অতি দ্রুত স্থাপন করলেন বিশ্বের নবীনতম ও দরিদ্রতম সন্ন্যাসী সঙ্ঘ। কিন্তু এরই মধ্যে কপর্দকশূন্য অবস্থায় সংখ্যাহীন নতুন মানুষের হৃদয় তিনি জয় করলেন এক অবিশ্বাস্য কঠিন-কঠোর পরিবেশে।

আর প্রবাসের মাটিতে সন্ন্যাসীর হৃদয় জয় করলেন নতুন দেশের নতুন মেয়েরা। বিদেশবাসের প্রথম পর্যায়ে অনবদ্য বাংলায় হরিদাস মিত্রকে স্বামীজি যে চিঠি লিখেছিলেন তা এত বছর ধরে স্বদেশের মানুষকে স্তব্ধতায় রেখেছে। 'এদেশের আশ্চর্য বিষয় অনেক।...এদেশের স্ত্রীদের মতো স্ত্রী কোথাও দেখি নাই।...এ দেশের তুষার যেমন ধবল, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে দেখেছি। আর এরা কেমন স্বাধীন!... আমাদের পোড়া দেশে মেয়েছেলেদের পথ চলিবার জো নাই। আর এদের কত দয়া! যতদিন এখানে এসেছি, এদের মেয়েরা বাড়িতে স্থান দিচ্ছে, খেতে দিচ্ছে...সঙ্গে করে বাজারে নিয়ে যায়, কি না করে বলতে পারি না। শত শত জন্ম এদের সেবা করলেও এদের ঋণমুক্ত হবো না।'

প্রশস্তি আরও রয়েছে। 'মনু মহারাজ বলেছেন— যেখানে

স্ত্রীলোকেরা সুখী সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা। এরা তাই করে, এরা তাই সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন, উদ্যোগী।' এই লেখা প্রথম পড়ি ক্লাস সেভেনে এগারো বছর বয়সে (১৯৪৪)। তারপর অন্তত হাজার বার পড়া হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই পুরনো হয় না। যতবার পড়ি তত নতুন মনে হয়— 'এদের মেয়েরা কি পবিত্র। ২৫ বছর ৩০ বছরের কম কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পাখির মত স্বাধীন। বাজার-হাট, রোজগার, দোকান, কলেজ, প্রোফেসর— সব কাজ করে, অথচ কি পবিত্র।' আমিও লজ্জা বোধ করেছি। 'তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করতে পারো? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচবে না।'

আর একটি চিঠি, যা এক বন্ধুকে লেখা ও আমাদের কলেজ জীবনে হাতে হাতে ঘুরেছে কিন্তু যা পত্রাবলিতে খুঁজে পাইনি। সেখানেও শ্বেতদ্বীপবাসিনী জননী ও ভগ্নীদের অভূতপূর্ব জয়ধ্বনি। সেই চিঠিটা এখন আমার হাতের গোড়ায় নেই। কবে যে স্বামীজির সব চিঠি একত্রিত হয়ে সম্পূর্ণাকারে পাওয়া যাবে তা কেউ জানে না।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি অনন্য গবেষিকা মেরি লুই বার্ককে, দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে তিলে তিলে লুপ্তরত্ন পুনরুদ্ধার করে যিনি আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজিনী হয়েছেন। বিবেকানন্দ-জীবনের নানা দলিল ছাড়াও তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন এযাবৎ অপ্রকাশিত পত্রাবলি যা নতুন আলো ফেলেছে আমাদের প্রিয় সাগরপারের সন্ন্যাসীর ওপর।

যে জাহাজে স্বামীজি বোম্বাইবন্দর ত্যাগ করেছিলেন (৩১ মে ১৮৯৩) সেই জাহাজে ইয়াকোহামা পৌঁছে, আর এক জাহাজে তিনি আমেরিকার উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন ১৪ জুলাই। ৬০০০ টনের এমপ্রেস অফ ইন্ডিয়া ভ্যাংকুভার পৌঁছেছিল ২৫ জুলাই। তারপর সেখানে রাত্রি কাটিয়ে পরপর তিনবার ট্রেন পাল্টে সন্ন্যাসী কীভাবে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছেছিলেন তা মেরি লুই বার্ক সযত্নে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

এসবের বর্ণনার আগে মহাপ্রস্থানের শেষপর্বে বড়জাগুলিয়ায় স্বামীজির শেষ ভ্রমণের কিছু বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। সেই ভ্রমণের শেষে বড়জাগুলিয়ার তৃতীয়া জননী মৃণালিনী বসু খালি হাতে প্রিয় পুত্রকে বিদায় দেননি বলেই আমাদের খবর। স্বামীজির স্নেহের নরেশচন্দ্র ঘোষ, যাঁর ডাকনাম গৌর। একসময় স্বামীজি যে চার পাঁচটি বালককে মঠে রেখে পালন করতেন গৌর তাদের অন্যতম। এই মানুষটি স্বামীজির দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য প্রত্যাবর্তন (৯ ডিসেম্বর ১৯০০) থেকে ৪ঠা জুলাই ১৯০২ স্বামীজির শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে বেলুড় এবং অন্য জায়গায় কাটান। আগেই বলেছি স্বামীজির শেষ ছুটিতে বড়জাগুলিয়ায় তাঁর সঙ্গী হল ভাগ্নে নাদু এবং কানাই মহারাজ, যিনি স্বামী নির্ভয়ানন্দ নামে পরিচিত হন। গৌর অথবা নরেশচন্দ্র একসময় লিখেছেন, বড়জাগুলিয়া থেকে ফিরে আসবার সময়ে জননী মৃণালিনী যে এক ঝুড়ি ভালো কালোজাম দিয়েছিলেন তা মঠে আনা গেল। স্বামীজি বললেন, 'আগে সব জামগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে যেন। তারপর কতকগুলো বোতল সাফ করে ওই রস অনেকগুলোতে ভরা হল। ছিপি এঁটে বেশ মজবুত করে দড়ি দিয়ে মুখগুলো বাঁধতে বললেন। পাঁচ সাতদিন রোদ্দুর খাওয়ানো হল। তারপর ওঁর রান্নাঘরের পাশে সিঁড়ির নিচে একটা কুঠুরিতে বোতলগুলো রেখে আসতে বললেন, অন্ধকার ঘরে।'

একদিন চায়ের টেবিলে স্বামীজি বসে আছেন। হঠাৎ দুম করে একটা আওয়াজ সকলের কানে এল। স্বামীজি বললেন সঙ্গে সঙ্গে, 'দ্যাখ দ্যাখ— বোতল ফাটল বুঝি— বাস্তবিকই তাই। ফারমেন্ট হয়ে রস তেজি হওয়ার দরুন একটা বোতল ওইভাবে ফেটেছিল। স্বামীজি বললেন, 'এই-ই শিরকা। ভারি হজমি। এইবার— এতদিনে ঠিক তৈরি হয়েছে। তোরা সব রোজ একটু একটু খাবি।'

স্বামীজির তৃতীয়া জননী মৃণালিনীর কোনো ছবি নজরে আসেনি। এবিষয়ে আমেরিকাবাসী গবেষক স্বামী চেতনানন্দের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলাম, তিনিও জননী মৃণালিনীর কোনো ছবি দেখেননি। সত্যি কথাটা হল, মৃণালিনী-সম্পর্ক সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের সুযোগ রয়েছে এবং সেই সঙ্গে খোঁজ করা, তাঁর দূরসম্পর্কের আত্মীয়াকে নিশ্চয় কোনো বিশেষ কারণে স্বামীজি মায়ের পবিত্র আসনে বসিয়েছিলেন।

বিদেশের মাটিতে প্রথমা জননী ক্যাথরিন স্যানবর্ন

যাঁর কথা এখনকার সব বিবেকানন্দ-কৌতূহলীই জানেন তাঁর নাম ক্যাথারিন স্যানবর্ন। ট্রেনের সামান্য পরিচিত এক সহযাত্রীকে এই উদারহৃদয়া বিদেশিনি নিজের বাড়িতে আতিথ্য নিতে অনুরোধ জানিয়ে আমাদের অনন্ত কৃতজ্ঞতার বিষয় হয়ে উঠেছেন।

হেল পরিবারের ঠিকানাই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মার্কিনি ঠিকানা হয়ে উঠেছিল। বহু বছর পরে একজন বাঙালি গবেষক অসীম চৌধুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল এন্টালির অদ্বৈত আশ্রমে। তাঁর বিবেকানন্দ অনুসন্ধানের আদিতে রয়েছেন মিসেস মেরি লুইস বার্ক। তাঁর নতুন বইতেই ক্যাথারিন স্যানবর্ন সম্বন্ধে নতুন খবর পেলাম, কেন তিনি কুমারী স্যানবর্ন। স্নেহময়ী এই বিদেশিনির জন্ম ১৮৩৯ সালে (দেহাবসান ১৯১৭)। ১৮৮৫ সালে তিনি বাগদত্তা হয়েছিলেন নিউ ইয়র্কের ধনবান জর্জ বার্নহামের সঙ্গে। কিন্তু বিবাহের তিন সপ্তাহ আগে জর্জের আকস্মিক অকালমৃত্যু হয়। কিন্তু তার আগেই তিনি প্রেয়সীকে তাঁর বিশাল সম্পত্তির বড় অংশ দিয়ে যান।

অসীমবাবু খোঁজখবর করে দুটি নতুন খবর পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। যে আরামভবনে স্বামীজিকে তিনি আতিথ্য দিয়েছিলেন তা আর নেই, কালপ্রবাহে সেখানে নতুন বাড়ি উঠেছে।

শাস্ত্র বলে এক কর্ম থেকে আর এক কর্মের উৎপত্তি, উদ্যোগী পুরুষরা এইভাবেই নিজেদের জয়যাত্রার পথ তৈরি করে নেন। ট্রেনে পরিচিতার সূত্র ধরে পরিচয় হল দার্শনিক অধ্যাপক জন হেনরি রাইট ও তাঁর সহধর্মিণীর সঙ্গে। এই অধ্যাপকই খুলে দিলেন পরিচয়হীন সন্ন্যাসীর দ্বার।

বিদেশে বক্তৃতামালায় স্বামীজি সোজাসুজি বলেছিলেন, ভারতবর্ষকে মার্কিনিদের ধর্মশিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তাঁরা বরং শিল্পোদ্যোগ শেখানোর ব্যবস্থা করুন।

সপ্তসাগর পেরিয়ে মার্কিন দেশের প্রথম জননীকে খুঁজে পাওয়া মস্ত এক সৌভাগ্যের কথা। এই জননী ক্যাথারিন স্যানবর্নকে আমরা আজও তেমন জানি না। অগতির গতি স্বামী গম্ভীরানন্দের 'যুগনায়ক' বইতে নজরটি দেওয়া যাক। ভগবান অপ্রত্যাশিতভাবে একজন সুহৃদয় বন্ধু জুটাইয়া দিলেন, তিনি ম্যাসচুসেটস প্রদেশের ব্রিজি মেডোজ নামক

একটি গোলাবাড়ির স্বত্বাধিকারিণী বর্ষীয়সী শ্রীমতী ক্যাথেরিন স্যানবর্ন। ...এই ক্যাথেরিন (সংক্ষেপে কেট) স্যানবর্ন সম্বন্ধে স্বামীজি লিখিয়াছিলেন: 'আমি এক্ষণে বস্টনের এক গ্রামে এক বৃদ্ধা মহিলার অতিথিরূপে বাস করিতেছি। ইঁহার সহিত রেলগাড়িতে হঠাৎ আলাপ হয়। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার নিকট রাখিয়াছেন। এখানে থাকায় আমার এই সুবিধা হইয়াছে যে, প্রত্যহ এক পাউন্ড করিয়া যে খরচ হইতেছিল, তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে। আর তাঁহার লাভ এই যে তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভারতাগত এক অদ্ভুত জীব দেখাইতেছেন!!!' এরপর স্বামীজি যে তিনটি বিস্ময়চিহ্ন দিয়েছিলেন তা লক্ষণীয়।

স্বামীজির মন্তব্যের ওপর স্বামী গম্ভীরানন্দের মন্তব্য: 'মিস স্যানবর্নকে স্বামীজি বৃদ্ধা বলিয়া উল্লেখ করিলেও তিনি তখনও আমেরিকাবাসীদের দৃষ্টিতে বৃদ্ধা নহেন; তিনি তখন প্রৌঢ়া এবং বয়স চুয়ান্ন কর্মোদ্যম তাঁহার তখনও যথেষ্ট ছিল এবং স্বামীজিকে লইয়া এখানে সেখানে যাইতে আনন্দই পাইতেন। সমাজেও বাগ্মী লেখিকা হিসাবে তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। ...ইহারই সাহায্যে তিনি অধ্যাপক রাইটের সহিত পরিচিত হন এবং এই সূত্রে ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধির আসন লাভ করেন। আমরা আরও জানিতে পারি যে, শ্রীমতী স্যানবর্নের সহিত ১৮ আগস্ট ঘোড়ার গাড়িতে ১০ মাইল দূরবর্তী একস্থানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান।'

এঁরই সাহায্যে নারী-কারাগারের অধ্যক্ষা মিসেস জনসনের পরিচয় এবং আমেরিকান সংশোধনাগার সম্বন্ধে স্বামীজির অনুভূতি যা স্বদেশের চিঠিতে প্রতিফলিত। 'ইহা দেখিয়া তারপর যখন দেশের কথা ভাবিলাম, তখন আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে আমরা গরিবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি। তাহাদের কোনো উপায় নাই, পালাইবার কোনো রাস্তা নাই, উঠিবার কোনো উপায় নাই।'

স্বামী গম্ভীরানন্দ বিদেশে ব্যয়বাহুল্যে নিপীড়িত স্বামীজি প্রসঙ্গে বলছেন, 'আমরা জানি, তিনি শীতবস্ত্র আনেন নাই।' চিঠিতে স্বামীজির উদ্বেগ, 'এখানে শীত আসিতেছে, আমাকে সকলরকম গরম কাপড় যোগাড় করিতে হইবে ...এখানকার অধিবাসী অপেক্ষা আমাদের অধিক কাপড়ের আবশ্যক হয়। ...এই গ্রাম হইতে কাল আমি বস্টনে যাইতেছি। ...বস্টনে গিয়া আমাকে প্রথমে কাপড় কিনিতে হইবে। সেখানে যদি বেশিদিন থাকিতে হয়, তবে আমার এ অপূর্ব পোশাক চলিবে না।'

দয়াময়ী কেট-এর খামারবাড়ি ব্রিজি মেডোজ-এর বর্ণনা দিয়েছেন এস এন ধর, যেখানের জলাশয়ে ফুটছে পদ্ম এবং দুটি স্রোতস্বিনী যা স্বামীজিকে মুগ্ধ রেখেছিল। আরও জানা যাচ্ছে, হার্ভার্ড-এর অধ্যাপক রাইট ছাড়াও কেট খবর দিয়েছিল তাঁর 'কাজিন' ফ্র্যাংকলিন স্যানবর্নকে যিনি এই বিশিষ্ট ভারতীয়কে দেখে মুগ্ধ। কেট স্যানবর্নের দাক্ষিণ্যে এই ভারতীয়কে দেখে স্থানীয় জনগণ মুগ্ধ, ঘোড়ার গাড়িতে চড়া স্যানবর্ন-অতিথিকে দেখতে রাস্তায় ভিড় এবং স্থানীয় সংবাদপত্রেও খবরাখবর, ফ্র্যাংকলিন স্যানবর্ন যে বিশিষ্ট সাংবাদিক লেখক ও দার্শনিক এবং কংকর্ড সামার স্কুল অফ ফিলজফি তা এস এন ধর জানাচ্ছেন। বোনের উৎসাহে তিনিই স্বামীজিকে (২৪ আগস্ট ১৮৯৩) বস্টনে নিয়ে গেলেন এবং আমেরিকা সোস্যাল সায়ান্স কনভেনশনে বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণ জানালেন। ২৪ আগস্টেই স্বামীজির প্রথম পরিচয় হার্ভাডের অধ্যাপক রাইট-এর সঙ্গে এবং যথাসময়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে, মিসেস রাইট যে মুগ্ধ তা নতুন যুগের গবেষকরা জানিয়েছেন।

স্যানবর্নদের প্রচেষ্টায় স্যারাটোগায় সেপ্টেম্বরে যে পাঁচটি বক্তৃতা দিতে পেরেছিলেন তা স্বামী গম্ভীরানন্দ খোঁজ পেয়েছেন। মিসেস লুইস বার্ক তাঁর বিখ্যাত বইতে আরও স্যানবর্ন সংবাদ দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে মিস্টার বেনজামিন স্যানবর্নের সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল এমার্সন এবং থোরোর।

'নিউ ফাইন্ডিংস' বলে একটি বিশিষ্ট গবেষণা গ্রন্থের লেখক অসীম চৌধুরী খোঁজ করেছেন কেট স্যানবর্নের রচনাবলির এবং খবর পেয়েছেন তাঁর স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৫ সালে। জীবনের শেষপ্রান্তে তিনি নিউ ইয়র্ক থেকে মেটকাফে ফিরে এসেছিলেন এবং সেখানেই তাঁর দেহাবসান।

জানা যাচ্ছে, অচেনা হিন্দু সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে এবং নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে তিনি কিছু মিশনারির কুনজরে পড়ে গিয়েছিলেন। বাড়িতে পুরুষ অতিথিকে আশ্রয় দেওয়া যে মহিলাদের পক্ষে শোভন নয় তাও বলা হয়েছিল।

ভ্যাংকুভার থেকে শিকাগোগামী ট্রেনের অবজার্ভেশন কারে স্বামীজির সঙ্গে তাঁর পরিচয়, তাঁর সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিজের কার্ড দেন এবং বলেন, যদি কখনও আপনি নিজেকে নিরাশ্রয় মনে করেন আমার কাছে চলে আসবেন।

প্রয়োজনবোধে স্বামীজি শিকাগো থেকে বেরিয়ে ১৪ অথবা ১৫ আগস্ট মেটকাফে পৌঁছলেন। এবার শুনুন কেট স্যানবর্নের কথা— 'আমি তখন সবে সুস্থ হয়েছি, ৪৫ শব্দের টেলিগ্রাম পেলাম আমার ট্রেনে পরিচিত বন্ধু কুইলসি হাউস, বস্টনে উপস্থিত হয়ে আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছেন। গেরুয়াপরা পণ্ডিতকে কীভাবে অভ্যর্থনা করব ভেবে পাচ্ছি না, কিন্তু উত্তর পাঠিয়েছিলাম, খবর পেয়েছি। আজ ৪.২০-র ট্রেনে বস্টন অ্যালকনিতে আসুন।'

প্ল্যাটফর্মে দেখা হল, অতিথির সঙ্গে এতই লাগেজ যে

• বিদেশে প্রথম জননী ক্যাথরিন স্যানবর্ন

সেসব নামাতে ট্রেন দশমিনিট লেট হয়ে গেল। সঙ্গে এতই বই যে একটা বোডলিয়ান লাইব্রেরি হয়ে যায়। এঁর মাথার পাগড়িটি খুব ঝকঝকে মনে হল। অসীম চৌধুরীর টিকা, গ্রামের মেটকাফ স্টেশনকে কেট নাম দিয়েছিলেন 'গুজভিন'। এই ট্রেন বার্মিংহাম থেকে মিলকোর্ড যায়, মধ্যিখানে যেখানে থামত মেটকাফে সেই প্ল্যাটফর্ম আর নেই।

অসীম চৌধুরীর আন্দাজ লাগেজ নামাতে স্বামীজির কুলি খরচ অনেক লেগেছিল, খরচের ধাক্কায় বস্টনের হোটেলে থাকতে না চেয়ে তিনি ব্রিজি মেডোজে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। তিনি সেখানে পৌঁছেছিলেন ১৫, ১৬ অথবা ১৭ আগস্টের কোনোদিন।

কেটের বাবা ছিলেন ডার্ট মাউট কলেজে ল্যাটিনের অধ্যাপক এবং মা ছিলেন বিখ্যাত বক্তা ডানিয়েল ওয়েবস্টারের ভাইঝি। একসময়ে কেট পড়িয়েছেন সেন্ট লুই, ব্রুকলিন এবং নর্দাম্পটনে। অসীম চৌধুরী হিসেব করেছেন, স্বামীজি অন্তত সাতদিন স্যানবর্নের আতিথ্য উপভোগ করেছিলেন। এইখান থেকেই তিনি আলাসিঙ্গা পেরুমলকে চিঠি (২০ আগস্ট) লিখেছিলেন, এরপরেই সেই হৃদয়হরণ করা দৃশ্য যা কেট স্যানবর্ন নিজেই লিখে গিয়েছেন— সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আমেরিকার মাটিতে তাঁর প্রথম জননীকে খুঁজে পেয়েছেন। 'বিদায়দিনে স্বামীজি আমায় 'মা' বললেন। আমার খুব ভালো লাগল, এমন ছেলের জন্য আমার গর্ব ধরে না। আমি অবশ্যই প্রত্যাশা করিনি আমার ছেলে আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, কিন্তু ছেলের কাছে শুনতাম, মায়ের চরণে পুষ্প অর্পণ করা এবং তাঁর চরণ বন্দনা করাই ভারতীয় রীতি।'

অতএব সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই, সুদূর মার্কিন মহাদেশে কে আমাদের স্বামীজির প্রথমা জননী, অবশ্যই তাঁর নাম ক্যাথারিন স্যানবর্ন (১৮৩৯-১৯১৭)।

বিদেশে দ্বিতীয়া জননী মাদার চার্চ মিসেস হেল

বিবেকানন্দের শিকাগো আগমনের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে মেরি লুইস বার্ক দেখিয়েছেন তখন রেলপথে রিটার্ন টিকিটের দাম ২৬ ডলার। শুক্রবার ৮ অথবা শনিবার সেপ্টেম্বর ৯ তাঁর শিকাগো পৌঁছনোর কথা। স্টেশন থেকে কোথায় যাবেন তার ঠিক নেই, কাগজপত্তর হারিয়ে গিয়েছে, তারপর যা হয়েছিল তা এদেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও জানে। বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে ফিরে ঠিক করলেন একটা বক্সকারে রাত্রিযাপন করবেন। মেরি লুইস বার্ক এই বাক্সরহস্য উদঘাটন করে জানিয়েছেন, মার্কিনি ভাষায় এর অর্থ রেলের ওয়াগন। মার্কিন দেশের ভবঘুরেরা এই সব ওয়াগনেই রাত্রিযাপনে অভ্যস্ত।

পরের দিন সকালে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ভিক্ষা সন্ধানে বেরুলেন বিবেকানন্দ। সে কাহিনি এদেশের সব মানুষের জানা। গৈরিক বসনে দ্বারে দ্বারে অজানা ভিক্ষুককে দেখে গৃহলক্ষ্মী অথবা গৃহভৃত্যেরা সভয়ে তাঁর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে এবং তার আগে নবাগতকে যা-তা বলছে।

এবার স্বামী গম্ভীরানন্দের বেস্টসেলার 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' থেকে উদ্ধৃতি দেওয়াই নিরাপদ। 'সুসভ্য আমেরিকায় ভিক্ষুকের বিশেষত কালো আদমীর স্থান নাই।... টেলিফোন প্রভৃতির সাহায্য কিরূপে লইতে হয় তাহাও জানা ছিল না। অবশেষে হতাশমনে পথিপার্শ্বে বসিয়া তিনি শ্রীভগবানের নির্দেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় ঠিক সম্মুখবর্তী এক ধনীর গৃহের দ্বার উদঘাটিত হইল এবং রাজরাণী সদৃশা এক মহীয়সী মহিলা তাঁহার নিকটে আসিয়া অতি মৃদুভদ্রতাপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ধর্ম মহাসভার প্রতিনিধি?" স্বামীজি নিজ বিপদের কথা খুলিয়া বলিলেন, অমনি সেই মহিলা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নিজ বাড়িতে লইয়া গেলেন এবং ভৃত্যদের প্রতি নির্দেশ দিলেন, একটি কক্ষে যেন আরামের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। তিনি স্বামীজিকে বলিয়া রাখিলেন যে প্রাতরাশের পর তিনি তাঁহাকে মহাসভার অফিসে লইয়া যাইবেন।...এই মহিলাটি হলেন শ্রীযুক্ত জর্জ ডবলিউ হেল-এর পত্নী।

শুরু হল আজীবনের সম্পর্ক, যার ঠিকানা...ডিয়ারবোর্ন পার্ক, শিকাগো। সবাই জানেন আমেরিকার আর কোনো পরিবারের সঙ্গে স্বামীজি এমন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েননি।

মেরি লুইস বার্ক এই বাড়ির খোঁজ করতে বেরিয়ে দেখেন সেই বাড়িটি ভেঙে স্কাইস্ক্র্যাপার উঠেছে। যা ছিল ৫০০ ব্লক অফ ডিয়ারবোর্ন পার্ক তা এখন হয়েছে ১৪০০ ব্লক অফ নর্থ ডিয়ারবোর্ন স্ট্রিট। ব্যাপারটা বোঝাবার জন্যে মেরি লুইস বার্ক নির্ভর করেছেন নিউ ইয়র্ক থেকে শশী মহারাজকে লেখা (২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪) স্বামীজির চিঠির ওপর।

'এই যে হেল-এর ঠিকানায় চিঠি দাও, তাদের কথা কিছু বলি। হেল আর তার স্ত্রী বুড়োবুড়ি। আর দুই মেয়ে, দুই ভাইঝি, এক ছেলে। ছেলে রোজগার করতে দোসরা জায়গায় থাকে। মেয়েরা ঘরে থাকে।... চারজনেই যুবতী— বে থা করেনি।... মেরী ও হ্যারিয়েট হলো মেয়ে, আর এক হ্যারিয়েট ও ইসাবেল হলো ভাইঝি। মেয়েদুটির চুল সোনালি অর্থাৎ (তারা) ব্লন্ড, আর ভাইঝি দুটি ব্রানেট, অর্থাৎ কালো চুল। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ— এরা সব জানে,... মেয়েরা আমাকে দাদা বলে, আমি তাদের মাকে মা বলি। আমার মালপত্র সব তাদের বাড়িতে— আমি যেখানেই কেন যাই না।'

আরও মন্তব্য আছে স্বামীজির এই চিঠিতে। 'এদেশের অবিবাহিতা মেয়েরা বড়ই ভাল, তারা ভয়-ডর করে না।... এরা দয়াবান, সত্যবাদী। সব ভাল, কিন্তু ঐ যে ভোগ, ঐ ওদের ভগবান— টাকার নদী, রূপের তরঙ্গ, বিদ্যার ঢেউ, বিলাসের ছড়াছড়ি।...এদের মেয়ে দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম বাবা। আমাকে যেন বাচ্চাটির মতো ঘাটে-মাঠে দোকান-হাটে নিয়ে যায়, সব কাজ করে— আমি তার সিকির সিকিও করতে পারি না। এরা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, আমি এদের পুষ্যিপুত্তুর, এরা সাক্ষাৎ জগদম্বা, বাবা, এদের পুজো করলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়।...এই রকম মা জগদম্বা যদি ১০০০ আমাদের দেশে তৈরি করে মরতে পারি, তবে নিশ্চিন্তি হয়ে মরব।'

খোঁজখবর নিয়ে মিসেস মেরি লুইস বার্ক জানাচ্ছেন, মিস্টার হেল এক নামী ইস্পাত কারখানায় সিনিয়র পার্টনার ছিলেন এবং সেখান থেকে ১৮৮২ সালে অবসর নেন। এঁরা প্রেসবিটেরিয়ান খ্রিস্টান, স্বামীজির 'ফাদার পোপ' ও 'মাদার চার্চ'।

মিসেস বার্ক আরও খবর নিয়ে লিখেছেন, নিজের দুই কন্যা ছাড়া আর দু'জন কর্তার বোন মিসেস জন ম্যাকিন্ডলের মেয়ে, এঁরা আবার পিতার অকালমৃত্যুর পরে আংকেল জর্জ ও আন্ট বেলের সঙ্গে থাকতেন।

আরও জানা যাচ্ছে, হেলের তিনতলা বাড়িতে অনেক

ঘর। বোনদের মধ্যে হ্যারিয়েট ম্যাকিন্ডলে সবচেয়ে বড়, তারপর ইসাবেল, তারপর মেরি হেল এবং তারপর হ্যারিয়েট। এদের থেকে ছোট স্যাম। এই ভাই পরে আলাস্কা চলে গিয়েছিল। হ্যারিয়েট এবং ইসাবেল যে কিন্ডারগার্টেন স্কুল চালাতেন তার খবরাখবরও মিসেস বার্ক আমাদের দিয়েছেন।

এঁদের মধ্যে স্বামীজি তাঁর মায়ের পেটের বোনদের খুঁজে পেয়েছিলেন। স্বামীজি সহোদরারা কোনওদিন জীবনে সুখ পায়নি। একটি বোনকে স্বামীজি খুব ভালবাসতেন— শ্বশুরবাড়ির পীড়নে সে আত্মহত্যা করেছিল। জীবনের শেষপ্রান্তে স্বামীজি মেরি হেলকে লিখেছিলেন— আমি বোধ হয় এই পৃথিবীতে তোমাদের চারজনকেই সবচেয়ে ভালবাসি।

দুই বোনকে একই দিনে (১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬) উইম্বলডন, ইংলন্ড থেকে দুটি চিঠি লিখেছিলেন। হ্যারিয়েটকে লিখলেন— সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরে এসে তোমার সুখবরটি পেলাম। বৃদ্ধা চিরকুমারীদের আশ্রমে লভ্য আরাম সম্বন্ধে তুমি যে অবশেষে মত পরিবর্তন করেছ তাতে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। এখন তুমি ঠিক পথ ধরেছ, শতকরা নিরানব্বই জন মানুষের পক্ষে বিবাহই জীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্য।...স্নেহের হ্যারিয়েট, তুমি ঠিক জেনো 'সর্বাঙ্গসুন্দর জীবন'— একটা স্ববিরোধী কথা।'

• বিদেশে দ্বিতীয়া জননী মাদার চার্চ মিসেস হেল

এরপর স্বামীজি শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন, 'স্বামীকে ইহজীবনে সমস্ত কাম্যলাভে সহায়তা করে তুমি সর্বদা তাঁর ঐকান্তিক প্রেমের অধিকারিণী হও।...আমি তোমাকে যতটুকু জানি, তাতে মনে হয় তোমার মধ্যে এমন প্রভূত ও সুসংযত শক্তি রয়েছে, যা ক্ষমা ও সহনশীলতায় পূর্ণ। সুতরাং আমি নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যে, তোমার দাম্পত্য জীবন খুব সুখের হবে। তোমাকে ও তোমার ভাবী বরকে আমার অনন্ত আশীর্বাদ। ভগবান যেন তাকে সর্বদা একথা স্মরণ করিয়ে দেন যে, তোমার মতো পবিত্র, সুচরিত্রা, বুদ্ধিমতী, স্নেহময়ী ও সুন্দরী সহধর্মিণী লাভ করে সে কৃতার্থ হয়েছে।'

একই দিনে স্বামীজি তাঁর স্নেহের ভগিনী মেরি হেলকে লিখলেন, 'আমার আনন্দ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য আমি তোমার ও অপর ভগ্নীদের কাছ থেকেও অনুরূপ সংবাদ আশা করছি... আমি তোমাকে বলছি— হ্যারিয়েট বেশ সুখের ও শান্তির জীবন লাভ করবে।...একজন সেরা গৃহিণী হবার মতো মেয়ে সে।...মেরি তুমি হলে তেজী আরবী ঘোড়ার মতো— তোমাকে রাণী হিসেবে চমৎকার মানাবে...তুমি একজন তেজস্বী, বীর, দুসাহসী, নির্ভীক স্বামীর পাশে উজ্জ্বল দীপ্তিতে শোভা পাবে।...তুমি জানো, আমি তোমাদের যে 'বোন' বলে ডাকি— তার চেয়ে বেশীই আমি তোমাদের মনে করি।...সতত তোমার স্নেহশীল ভ্রাতা, বিবেকানন্দ।'

হেল পরিবারের বিভিন্ন সংবাদ সংগৃহীত হয়েছে পরবর্তী সময়ে। যেমন মিসেস হেলের জন্ম ১৮৩৬ এবং দেহাবসান ১৯৩০। তাঁর স্বামী জর্জের জন্ম ১৮২৯, দেহাবসান ১৯০০। মেরি হেল ১৮৬৫-১৯৩৩ এবং হ্যারিয়েট ১৮৭১-১৯২৯। মৃত্যুর আগে মেরি হেল (১৯৩৩) বেলুড় মঠকে ১৮,৫০০ ডলার দান করেন, ২০০৮ সালে যার মূল্য তিনলক্ষ ডলারের বেশি।

হ্যারিয়েটের স্বামীর বিস্তারিত খবরও পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর স্বামী ক্ল্যারেন্স মট উলি (১৮৬৩-১৯৫৬) একসময় বিখ্যাত কোম্পানি আমেরিকান র‍্যাডিয়েটর ও স্ট্যান্ডার্ড কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ওয়ার্লড ট্রেড বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান।

মার্কিনি গবেষকরা আরও খোঁজখবর দিয়েছেন। পশ্চিমের জীবনকালে স্বামীজি অন্তত পাঁচবার হেল পরিবারে ঘুরেফিরে এসেছেন এবং তাঁদের সঙ্গে মোট বসবাসের সময় দু'মাসেরও বেশি। গবেষক গোপাল স্টেভিগ হিসেব করে জানাচ্ছেন, এঁদের কাছে লেখা স্বামীজির চিঠির সংখ্যা শতাধিক।

ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬তেই স্বামীজি লিখছেন মেরি হেলকে— 'আমি তোমাদের চার বোনের কাছে চিরকৃতজ্ঞ, এদেশে যা কিছু হয়েছে সবই তোমাদের জন্যে। আমি পৃথিবীর যেখানেই থাকি তোমাদের স্মরণে রাখব with deepest gratitude and sincere love.'

আরও খোঁজখবর নেবার লোভ সংবরণ করা গেল না। একসময় নিজেদের বাড়ি লিজ দিয়ে এই হেল দম্পতি ইউরোপের ফ্লোরেন্সে চলে যান এবং স্বামীজি ভারতে ফেরার পথে ফ্লোরেন্সে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ নষ্ট করেননি।

জীবনীকাররা জানাচ্ছেন, মেরি হেলের পরবর্তী ঠিকানা ১৫২ ওয়াল্টন প্লেস। হ্যারিয়েট তাঁর স্বামীর সঙ্গে থাকতেন ১০ অল্টার স্ট্রিটে, ১৯০০ সালে স্বামীর মৃত্যুর পরে মাদার চার্চও সেখানে ফিরে এসেছিলেন। স্বামীজি দ্বিতীয়বার আমেরিকা ত্যাগের আগে (২রা জুন ১৯০০) চারদিন তাঁর মার্কিনি মা ভাইবোনদের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন। মেরি ১৯০২ সালে (৫ নভেম্বর) একজন ইটালিয়ানকে বিয়ে করে ফ্লোরেন্সে থেকে যান। এই স্বামীর দেহাবসান ১৯২২ সালে এবং এখানেই স্বামীজির প্রিয় মাদার চার্চ দেহরক্ষা করেন ৯৩ বছর বয়সে ১৯৩০ সালে। হ্যারিয়েট বেঁচেছিলেন ৯৪ বছর, তাঁর দেহাবসান ১৯৫৫ সালে।

হেল পরিবারকে স্বামীজির লেখা শতাধিক চিঠির সন্ধানী বিশ্লেষণ আজও আমার নজরে পড়েনি। কিন্তু লস এঞ্জেলেস থেকে মেরি হেলকে লেখা (১৭ জুন ১৯০০) স্বামীজির চিঠিতে কিছু খবর পাওয়া যাচ্ছে। 'এবার নিজের কথা। হ্যারিয়েট যাতে প্রতিমাসে আমাকে কয়েক ডলার করে দেয়, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চয়ই তাকে রাজি করাবে এবং অন্য কয়েকজন বন্ধুর দ্বারাও তাকে রাজি করাবার চেষ্টা করবো, যদি সফল হই, তাহলে ভারতে চলে যাচ্ছি। জীবিকার জন্য এইসব মঞ্চ-বক্তৃতার কাজ করে আমি একেবারে ক্লান্ত। একাজ আমার ভাল লাগছে না। ...মেরি, সারা জীবন আমি জগতের জন্য খেটেছি, কিন্তু সে জগৎ আমার দেহের এক খাবলা মাংস কেটে না নেওয়া পর্যন্ত একটুকরো রুটিও আমাকে ছুঁড়ে দেয়নি। দিনে এক টুকরো রুটি জুটলেই আমি পরিপূর্ণ অবসর নিই। কিন্তু তা অসম্ভব।'

প্রিয় ভগিনী মেরি হেলকে নিউ ইয়র্ক থেকে লেখা (১১ জুলাই ১৯০০) আর এক চিঠিতে চিরবিশ্বস্ত স্নেহশীল ভ্রাতার দুঃখ বা হতাশার সুর নেই। 'লম্বা চুল কেটে ফেলবার জন্য আমি সকলের কাছে তিরস্কৃত হচ্ছি। দুঃখেরই বিষয়; তুমি জোর করেছিলে বলেই আমি তা করেছিলাম।'

আর একটি চিঠি অখণ্ড পত্রাবলিতে খুঁজে পাইনি, কিন্তু স্বামীজির বাণী ও রচনার অষ্টম খণ্ডে স্থান পেয়েছে, এটি প্যাসাডোনা থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০০-তে মেরি হেলকে লেখা।

'মিস্টার হেলের দেহত্যাগের বেদনাদায়ক সংবাদ বহন করে তোমার চিঠিখানা গতকাল পৌঁছেছে। আমি মর্মাহত হয়েছি, সন্ন্যাসের শিক্ষা সত্ত্বেও আমার হৃদয়বৃত্তি এখনও বেঁচে আছে।'

তারপর, যেসব মহাপ্রাণ মানুষ আমি দেখেছি, মিস্টার হেল তাঁদের একজন। অবশ্যই তুমি দুঃখিত ও নিতান্ত ব্যথিত হয়েছ: মাদার চার্চ, হ্যারিয়েট— সবারই একই অবস্থা.... জীবনে আমি অনেক সয়েছি, অনেককে হারিয়েছি আর সেই বিয়োগের সবচেয়ে বিচিত্র যন্ত্রণা হল— আমার মনে হয়েছে, যে চলে গেল আমি তার যোগ্য ছিলাম না। স্বামীজি এবার স্বীকার করছেন, বাবার মৃত্যুর পর মাসের পর মাস এই যাতনায় কেটেছে— আমি তাঁর কতই না অবাধ্য ছিলাম।... জীবনে এতদিন পর্যন্ত তুমি নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছ, আর আমাকে জ্বলতে-কাঁদতে হয়েছে সারাক্ষণ। এখন ক্ষণকালের জন্য তুমি জীবনের অপরদিকটা দেখতে পেলে।... শুধু একটা কথা বলি এবং তার মধ্যে এতটুকু ভেজাল নেই, যদি আমাদের দুঃখ বিনিময় করা সম্ভব হতো এবং তোমাকে দেবার মতো আনন্দ-এর মন যদি আমার মন থাকতো, তাহলে নিশ্চয় বলছি, চিরদিনের জন্য তোমার সঙ্গে তা বিনিময় করে নিতাম। তোমার চিরবিশ্বস্ত ভাই বিবেকানন্দ।'

মেরি হেল সেই চিঠির উত্তর সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছিলেন (২ মার্চ ১৯০০)। তিনি স্বামীজিকে শিকাগো যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু স্বামীজি তখন টাকা জোগাড়ে ভীষণ ব্যস্ত। স্বামীজি লিখছেন, 'তোমরা সকলে কেমন আছ? মাকে আমার আন্তরিক ভালবাসা দিও। তাঁর মতো মনোবল যদি আমার থাকতো! খাঁটি খ্রিস্টান তিনি।'

স্বামীজি তাঁর শিকাগোবাসিনী জননীকে বলতেন মাদার চার্চ এবং তাঁর স্বামীকে ফাদার পোপ, এঁদেরই এক স্নেহময়ীকে (মিসেস জেমস ম্যাথুজ) তার স্মরণীয় সম্ভাষণ 'মাদার টেম্পল'।

ইংরিজি নবম খণ্ডে এই জননীকে লেখা অনেকগুলি চিঠি একের পর এক ছাপা হয়েছে এবং এতদিন পরেও এগুলি গোগ্রাসে পড়লে এক অসামান্য জননীর স্নেহময়ী মূর্তি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

এই মাকে মিনিয়াপলিস থেকে লেখা চিঠির তারিখ ২১ নভেম্বর ১৮৯৩। 'ডিয়ার মাদার, আমি নিরাপদে ম্যাডিসন পৌঁছে হোটেলে উঠেছি এবং মিস্টার আপডাইককে খবর পাঠাই।' এখানে বক্তৃতা করে স্বামীজি যে ১০০ ডলার পেয়েছেন তা স্নেহময়ী জননীকে জানিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে সংবাদ, 'বক্তৃতার পরেই রাতের ট্রেন ধরে আমি মিনিয়াপলিস।' মাকে লেখা চিঠিতে স্বামীজি জানাচ্ছেন ধর্মযাজকদের কনসেশন টিকিটের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা পাওয়া সম্ভব হয়নি। রোজগারের টাকাটা তিনি যে ব্যাঙ্ক ড্রাফটে নিয়েছেন এবং তার জন্যে যে ৪০ সেন্ট খরচ হয়েছে তা নতুন মাকে জানাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।

তিনদিন পরেই (২৪ নভেম্বর) মাকে আবার চিঠি মিনিয়াপলিস থেকে চিঠি— আগামী কাল আমার বক্তৃতা এবং তার পরের দিনই ডিময়নি যাত্রা। এর পরেই প্রথম তুষারপাতের মনোমোহিনী বর্ণনা এবং সেই সঙ্গে বরফে জমে যাওয়া লেকের কথা।

ডেট্রয়েট থেকে লেখা পরবর্তী চিঠির তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪। 'গত রাত্রে ১টার সময়ে নিরাপদে পৌঁছেছি' এ ট্রেন যে সাতঘণ্টা লেট ছিল সে কথাও মাকে বলা হচ্ছে। সেই সঙ্গে বরফ কেটে কেটে দুটো ইঞ্জিনের এগিয়ে যাওয়ার সুমধুর ছবি। কিন্তু পৃথিবীর সব মায়েরাই যে ছেলেদের জন্য চিন্তিত থাকেন তা বুঝেই ছেলে লিখছেন, গভীর রাতেও মিসেস ব্যাগনির ছোট ছেলে তাঁর জন্যে স্টেশনে দাঁড়িয়েছিলেন। এই মিসেস জন জুডসন ব্যাগনির (১৮৩৩-১৮৯৮) সঙ্গে শিকাগোর ধর্ম মহাসভায় স্বামীজির দেখা হয়েছিল এবং স্বামীজির সম্মানে তিনি ডেট্রয়েটে মস্ত রিসেপশনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ডেট্রয়েট থেকে লেখা (২০ ফেব্রুয়ারি) পরের চিঠিতে জননীকে তিনি জানান, বক্তৃতা কোম্পানির খপ্পরে পড়ে তাঁর যে ৫০০০ ডলার ক্ষতি হয়েছে তার জন্যে আক্ষেপ। মায়ের কাছের ছেলের এলাহি ডিনার পার্টির বর্ণনা— একটার মধ্যেই যেন একশ ভুরিভোজন, 'আমার ধারণা ছিল, তিনাদের ডিনারই অর্ধেক দিন চলে এবং মাঝে মাঝে তামাক খাওয়া। সর্বশেষে মাই লাভ টু হ্যারিয়েট, মেরি, ইসাবেল, মাদার টেম্পল, মিস্টার ম্যাথুজ, ফাদার পোপ এবং তোমাদের সবাইকে।'

দু'দিন পরেই মাকে পুত্রের আনন্দসংবাদ— বক্তৃতা দিয়ে ২০০, ১৭৫ এবং ১১৭ ডলার উপার্জন এবং সেই সঙ্গে এক মহিলার ১০০ ডলার উপহার। আগামী কাল মিসেস ব্যাগলি এই টাকা চেকে তোমার কাছে পাঠাবে, আজকেই পাঠানো হতো, কিন্তু ব্যাঙ্ক বন্ধ। সেই সঙ্গে আগাম খবর, বক্তৃতা কোম্পানির মিস্টার স্লেটনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চলেছে মায়ের প্রিয় সন্তান।

প্রবাসে খুঁজে পাওয়া স্নেহময়ী জননীর কাছে স্বীকারোক্তি মালপত্রের প্যাকিং করা তাঁর মোটেই পছন্দ নয়, তাই লাগেজ খুলে দাড়ি কামানো সম্ভব হয়নি, তবে আজকে কোনো সময়ে দাড়িটা কামাতেই হবে।

ডেট্রয়েটে তোলা দুটো ফটোগ্রাফ যে স্বামীজির তেমন পছন্দ হয়নি তাও মাকে জানানো হচ্ছে। তার পরেই রসিকতা,

ফটোগ্রাফারের দোষ কী, আমি ইদানীং যা মোটা হয়ে গিয়েছি! এর পরেই এক সেনেটের মিস্টার টি ডবলু পামারের তোতলামি নিয়ে মায়ের কাছে রসিকতা। এর পরেই কৃতজ্ঞতার প্রকাশ অনবদ্য ভাষায়— হিমালয় যদি দোয়াত হয়, মহাসাগর কালি স্বর্গীয় দেবদারু আমার কলম এবং মহাকাল আমার কাগজ, তবুও আমি তোমাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারব না।'

স্নেহময়ী জননীর কাছে প্রাণখুলে চিঠি লিখতে বসতেন স্বামীজি। আর এক চিঠি: 'এখন আমার কাছে যে অর্থ আছে তা দিয়ে আমি সহজেই দেশে ফিরে যাবার টিকিট কাটতে পারব। আমার কাজের পরিকল্পনার সাইজ দেখে ভয় হয়, যে রকম গয়ংগচ্ছ ভাবে চলছে তাতে চার-পাঁচ বার আমাকে পুনর্জন্ম নিতে হবে।'

২৭ মার্চের চিঠিতে আবার অর্থপ্রসঙ্গ— এই সঙ্গে ব্যাঙ্কে জমা দেবার জন্য দুটো (১৭৫ ডলার+ ৭৫ ডলার) পাঠাচ্ছি। দু-একদিনের মধ্যে বস্টন যাচ্ছি সঙ্গে ৫৭ ডলার নিয়ে।' এবারেও বিনম্র শ্রদ্ধা 'উইথ মাই ইটারন্যাল গ্র্যাটিচুড, লাভ, অ্যাডমিরেশন ফউর মাদার চার্চ, ইওর সন বিবেকানন্দ।'

এই রকম চিঠি একের পর এক। বস্টন থেকে খবর দিচ্ছেন ৩০ ডলার দিয়ে একটা সুন্দর গাউন কিনেছেন, তবে রঙটা ঠিক মনের মতো নয়।

আবার নিজের ক্লান্তির কথা মাকে ছাড়া কাকে জানাবেন, 'আমার মনে হয় একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। আমি বড়ই ক্লান্ত। এতো যাতায়াত করে আমার নার্ভ ভেঙে যাচ্ছে, তবে খুব তাড়াতাড়ি আমি চাঙ্গা হয়ে উঠবো। গত দুদিন ধরে সর্দি এবং সামান্য জ্বর, এসব নিয়েও বক্তৃতা, আশা করি দু-একদিনের মধ্যে এসব কাটিয়ে উঠবো।' তারপরে মায়ের কাছে নিজেকে খুলে ধরা— 'বিশেষ কিছুই লেখার নেই, শুধুই পুরনো কথার পুনরাবৃত্তি: টকিং, টকিং, টকিং।'

অনবদ্য ইংরিজিতে লেখা এইসব চিঠির যথাযথ বাংলা অনুবাদ সহজ কাজ নয়, এসব দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন হলে মন্দ হয় না।

স্বামীজির চিঠিতে মাঝে মাঝেই গভীর কৃতজ্ঞতার প্রকাশ— 'ভগবান আপনাকে আশীর্বাদ করুন— ফরএভার অ্যান্ড এভার। আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা নেই।'

আবার কোনো চিঠিতে (৮ আগস্ট ১৮৯৪) বোনদের কথাও তারা জানতে চেয়েছে আমার কিছু প্রয়োজন আছে কি না। 'আমার কোনো অভাব নেই— যা প্রয়োজন সবই হাতের গোড়ায় রয়েছে, কিছু বাড়তিও রয়েছে।'

জননী হেলকে লেখা স্বামীজির চিঠিগুলি বারবার পড়ার মতো, ক্লান্ত পরিব্রাজকের ছবিটা এখানে বারবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আগস্ট ১৮৯৪ সালে অ্যানিসকোয়াস থেকে স্বামীজি তাঁর আমেরিকান মাকে লিখছেন, 'আমি বলে দিয়েছি ভারতবর্ষ থেকে আমাকে বারবার চিঠি লিখে যেন বিরক্ত করা না হয়। আমি স্বদেশে যখন পরিব্রাজক ছিলাম তখন তো আমি চিঠি পেতাম না।'

রুজিরোজগার ও টাকাকড়ির সব খবর মাকে না জানিয়ে স্বামীজি শান্ত থাকতে পারতেন না। কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস থেকে স্বামীজি তাঁর প্রিয় জননীকে জানাচ্ছেন— 'আমার অর্থের একাংশ ইতিমধ্যেই ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছি, বাকিটাও খুব তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেবো, যৎসামান্য রাখবো ফিরে যাবার জন্য।'

ইংরিজি নবম খণ্ডে মাদার চার্চকে লেখা শেষ চিঠির তারিখ ৩১ জুলাই ১৮৯৫। তখন তিনি বন্ধু ফ্রানসিস লেগেটের বিয়েতে বরযাত্রী হিসেবে বন্ধুর খরচেই ইউরোপে যাচ্ছেন, 'আমি অবশ্যই সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্কে ফিরবো।'

এরপরেও মাদারকে লেখা চিঠি আছে। কিন্তু তার বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। শুধু বলা যায় এ এক অপূর্ব সম্পর্ক যার কোনো তুলনা স্বামীজির জীবনে নেই।

বিদেশে তৃতীয়া জননী সারা চ্যাপম্যান বুল

সুদূর মার্কিন প্রবাসে স্বামীজি যাঁকে গর্ভধারিণী জননীর সমান আসনে বসিয়েছিলেন তাঁকে নিয়ে এদেশে এখনও নানা বিভ্রান্তি। ছাত্রজীবনে তাঁকে আমরা ওলি বুল বলেই ডাকতাম, তারপর আমাদের প্রধান শিক্ষক সুখাংশুশেখর ভ্রম সংশোধন করে বললেন ওটা তাঁর স্বামীর নাম, উনি হচ্ছেন মিসেস ওলি বুল। ওঁর শ্বশুরবাড়ির দেশে, পুরুষদের ওই রকম নাম হয়, স্বামীজির চিঠিতে উনি আমাদের 'ধীরামাতা'।

বিদেশে আমাদের সন্ন্যাসীরা অনেক প্রাণময়ী সুন্দরীকে মাদার সম্ভাষণ করে নিরাপত্তার বলয় এঁকে নেন। কোন সন্ন্যাসী কার সঙ্গে কী সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছিলেন তা ঠিকমতন বুঝতে হলে তাঁর চিঠিপত্রগুলো খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া খুব প্রয়োজন।

এখানেও স্বামীজির গ্রন্থাবলিতে যথেষ্ট বিভ্রান্তি। যা সাবধানি গবেষিকা মেরি লুইস বার্ক ধরে দিয়েছেন।

১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ বোস্টনের হোটেল বেলভিউ থেকে স্বামীজি একটি চিঠিতে শুরু করেছেন 'ডিয়ার মাদার সারা', ফুটনোটেও ব্যাখ্যা 'মিসেস ওলি বুল', কিন্তু লেখিকা মিসেস বার্কের ব্যাখ্যা— 'ইনি কোনোক্রমেই মিসেস বুল নন, ইনি নিউইয়র্কের মিসেস আর্থার স্মিথ! মূল চিঠিটি অদৃশ্য।' বার্ক এরপর সারা বুলকে লেখা পত্রাবলি থেকে দেখাচ্ছেন, পরিচয়ের প্রথম থেকে স্বামী বিবেকানন্দ অনেকদিন তাঁর শ্রদ্ধেয়া ভাবী জননীকে 'ডিয়ার মিসেস বুল' বলেই সম্বোধন করতেন। যেমন ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ তারিখের চিঠি, যেখানে বিবেকানন্দ বলছেন, 'আগামী মঙ্গলবার আমি অবশ্যই আপনার বাড়িতে চলে আসব, কিন্তু আমি ঠিকানাটা ভুলে গেছি! আমি লেখার জন্য একটা নীরব জায়গা খুঁজছি, কিন্তু আপনি যত জায়গা আমাকে দিতে চেয়েছেন, তার থেকে অনেক কম জায়গায় আমার চলে যাবে। আমি যেখানে হয় গুড়িসুড়ি মেরে পড়ে আরামে থাকতে পারব।'

মিসেস মেরি লুইস বার্ক হিসেব করে লিখছেন, স্বামীজি তিনবার কেমব্রিজে মিসেস বুলের আতিথ্য নিয়েছিলেন— ১৮৯৪ অক্টোবরে দশ দিন, ডিসেম্বর ১৮৯৪ তিন সপ্তাহ এবং মার্চ ১৮৯৬-তে এক সপ্তাহ।

পরিচয়ের প্রথম পর্বে সব চিঠিতেই 'ডিয়ার মিসেস বুল', যেমন নিউইয়র্ক স্টেশন থেকে (২৮ ডিসেম্বর ১৮৯৪) লেখা— 'আমি নিরাপদে পৌঁছেছি,...আমার ক্ষুরখানা ১৬১ নং বাড়িতে ফেলে এসেছি, অনুগ্রহপূর্বক সেটা ল্যান্ডসবার্গের নামে পাঠিয়ে দেবেন।'

গবেষিকা মিসেস বার্কের বিস্তারিত বিবরণের ওপর আরও একটু নির্ভর করা যাক। ২রা অক্টোবর ১৮৯৪ স্বামীজি গেলেন মিসেস বুলের সুবিখ্যাত কেমব্রিজ নিকেতনে। এই সময় তিনি একটা নিরিবিলি জায়গা খুঁজছিলেন যেখানে বসে তিনি লেখালেখি করতে পারেন।

আরও বিবরণ আছে, তখন মিসেস বুলের বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে (তাঁর জন্ম ১৮৫০) এবং ১৪ বছরের সুকঠিন বৈধব্য জীবন। এঁর প্রয়াত স্বামী ওলি বুল ভুবনবিদিত বেহালাবাদক, নরওয়ের নাগরিক। বিবাহপূর্ব জীবনে তাঁর পরিচয়— সারা থর্প, অনারেবল জোসেফ থর্পের কন্যা, ইনি ধনী ব্যবসায়ী এবং ম্যাডিসনের সেনেটর।

সারা জননী মিসেস থর্প স্থানীয় সমাজের মধ্যমণি এবং এঁদের বাড়ি দেশের বিখ্যাত গাইয়ে বাজিয়ে, অভিনেতা, শিল্পী ও লেখকদের প্রিয় কেন্দ্র। এই জনপ্রিয়তা থেকেই থর্প পরিবারের খ্যাতি এবং সমস্ত পারিবারিক দুঃখের উৎপত্তি। এইখানেই একদিন এলেন বিখ্যাত নরওয়েজিয়ান পিয়ানো বাদক, তখন তাঁর বয়স ষাট এবং কুমারী সারা থর্পের মাত্র কুড়ি।

প্রচলিত গল্প, সতেরো বছর বয়সে সারা একবার ওলি বুলের এক কনসার্টে গিয়ে মোহিত হয়েছিলেন এবং সেইদিনই ঠিক করেন, একদিন এই পিয়ানো বাদকের জীবনসঙ্গিনী হবেন। আরও তিন বছর পরে পিতৃগৃহের বিশিষ্ট অতিথি ওলি বুলের সঙ্গে তরুণী সারার দৃষ্টি বিনিময় হয়।

মিসেস মেরি লুইস বার্ক লিখছেন, একেই বলে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। তাঁর আরও সংযোজন, জননী মিসেস থর্পের সমর্থন এবং পারিবারিক নানা বাধা বিপত্তি এড়িয়ে সেপ্টেম্বর ১৮৭০ সালে তরুণী সারার সঙ্গে ষাট বছরের বৃদ্ধ ওলি বুলের বিবাহ।

এই বিবাহ বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা পর্যায়েই থেকে যেত, যদি থর্প পরিবারের প্রধান মিস্টার থর্প, তাঁর পুত্র যোসেফ এবং মিসেস থর্পের সারাক্ষণের সঙ্গিনী অ্যাবি শ্যাপনি সারাক্ষণ আমেরিকা এবং ইউরোপে এই দম্পতির ওপর নিঃশব্দ নজর না রাখতেন।

শাশুড়ি মিসেস থর্প এক সময় সিদ্ধান্তে এলেন, বেহিসেবি এবং বেপরোয়া জামাইটি তাঁর প্রিয় কন্যার সুযোগ্য স্বামী নয়। অতএব যথাসময়ে তিনি আদরের কন্যা ও নবজাতা নাতনিকে তাঁদের ম্যাডিসনের বাড়িতে সরিয়ে আনলেন।

সংক্ষেপে জানা যায়, কিছুদিন পরে বিদ্রোহিণী সারা মায়ের উপদেশে কান না দিয়ে সাগরপারের নরওয়েতে স্বামীর কাছে ফিরে গেলেন এবং যথাসময়ে বেহিসেবি বেপরোয়া বেহালাবাদকের শিল্পীজীবনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিলেন এবং প্রয়োজনে পিতৃদেবের কাছ থেকেও আর্থিক সাহায্য নিতে দ্বিধা করলেন না।

মেরি লুইস বার্ক সোজাসুজি তাঁর অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাদের জানিয়েছেন, সারা তাঁর বেপরোয়া বেহিসেবি স্বামীটিকে শুধু ভালবাসতেন তা নয়, প্রায় পুজো করতেন।

আরও খবর, ম্যাডিসন থেকে কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটসে ফিরে এসে সারার ভাই জোসেফ বিয়ে করলেন বিখ্যাত আমেরিকান কবি লংফেলোর কনিষ্ঠা কন্যাকে। এইখানেই একদিন সারা বুলও ফিরে এসেছিলেন ১৮৮০ সালে এবং তারপর ১৯১১তে দেহাবসান পর্যন্ত এখানেই তিনি বসবাস করেন সম্রাজ্ঞীর মতন।

স্বামী ওলি বুলের দেহাবসান ১৮৮০ সালে। সারা এইখানেই ১৮৯৪ সালে স্বামী বিবেকানন্দের শান্তিতে লেখাপড়ার জন্য থাকবার জায়গা দেন।

প্রাথমিক এই বিবরণে যাঁদের মন ভরে না, তাঁদের জন্য রয়েছে সারদা মঠের আমেরিকান সন্ন্যাসিনী প্রবুদ্ধপ্রাণার ২০০২ সালে প্রকাশিত 'সেন্ট সারা' বইটি, প্রচ্ছদপটেই

তাঁকে বলা হয়েছে 'আমেরিকান মাদার অফ স্বামী বিবেকানন্দ'।

এই বইয়ের প্রথম পরিচ্ছেদেই বলা হচ্ছে, নিউ ইয়র্কে একবার জিজ্ঞেস করা হল 'সন্ত' অথবা 'সেন্ট'-এর ডেফিনিশন কী? হল ভর্তি লোক নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা থামিয়ে বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, স্বামীজির তাৎক্ষণিক প্রাণবন্ত উত্তর— মিসেস ওলি বুল। তারপর শোনা গেল সন্ন্যাসী বলছেন, মিসেস বুল একজন সন্ত, প্রকৃত সেন্ট, যাঁকে নিজের চোখে দেখাই এক তীর্থযাত্রা!

বিদেশের সন্ন্যাসিনী প্রবুদ্ধপ্রাণার বর্ণনা— সপ্তদশী সারা, চার্মিং, প্রতিভাময়ী, ব্রাইট, সঙ্গীতপ্রেমী, পিয়ানোবাদিকা এবং বাকবিদগ্ধ, কথাবার্তায় সবাইকে মোহিত করতে পারেন। গর্ভধারিণী অ্যামেলিয়া চ্যাপম্যান থর্পের নানা বিশিষ্টতা তিনি জন্মসূত্রেই পেয়েছিলেন। এই সারা জননী ছিলেন মেয়েদের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। বিভিন্ন সভায় তিনি জোরগলায় জিজ্ঞেস করতেন, আপনারা কতদিন মেয়েদের ইডিয়ট এবং ক্রিমিন্যাল ভাববেন? মায়ের অনুপ্রেরণায় সারা মদ স্পর্শ করতেন না, তিনি বলতেন, আমি 'ইনটেলেকচুয়াল অনেস্টি'-তে বিশ্বাসী, আমাদের জীবনকে পরিমাপ করতে হবে ধর্ম, বিজ্ঞান ও প্রকৃতির নিয়মাবলির সঙ্গে।

আরও বিবরণ রয়েছে— ১৮৩৮ সালে আমেলিয়ার বিবাহ হয় জোসেফ থর্পের সঙ্গে, এঁদের চারটি ছেলেমেয়ে, প্রথম দুটি ডিপথেরিয়া মহামারীতে মারা যায়, তারপর ১৮৫০-এ সারার জন্ম। এর আগেই 'ড্রাই-গুডস' ও চেরাকাঠের ব্যবসায় বিপুল সাফল্য। করাত কল থেকেই প্রাত্যহিক মুনাফা ১২০০০ ডলার। একসময়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জোসেফ থর্প সেনেটর হন।

• বিদেশে তৃতীয়া জননী সারা চ্যাপম্যান বুল

২০ জানুয়ারি ১৮৬৯— ম্যাডিসনের সিটি হলে পিয়ানো বাজাতে এলেন সেইসময়কার সবচেয়ে জনপ্রিয় পিয়ানোবাদক ওলি বুল। তখনই তাঁর বয়স ৫৮, কিন্তু দেখলে বয়স বোঝা যায় না।

পিয়ানোতে অসংখ্য মানুষের হৃদয়হরণ করে নরওয়েজিয়ান ওলি বুল এলেন এক রিসেপশনে এবং সেখানে উইলকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক সারার সঙ্গে ওলির আলাপ করিয়ে দিলেন। সপ্তদশী কুমারী কন্যার চোখের বিস্ময় দেখে জননী মিসেস থর্প খুবই আনন্দিত, কিন্তু বাবা খুশি নন, কারণ দুজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান চল্লিশ বছর।

কিন্তু সঙ্গীতশিল্পী ওলি বুলের জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে, বোস্টনের সঙ্গীত উৎসবে তাঁর অর্কেস্ট্রায় ১০৯৪ জন বাদক এবং ১০০০০ জনের কোরাস এবং কনসার্ট মাস্টার হিসেবে তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন ৫০০ ভায়োলিন বাদকের। শ্রোতার সংখ্যাও কম নয়— ৩৫০০০।

শিল্পী ওলি বুল এক সময় এক ফরাসি মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন এবং প্রথমপক্ষের ছটি সন্তানই সারার থেকে বয়সে বড়। খেয়ালি ওলি একবার নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। সেই সময়ে এক বিধবা মহিলা তাঁকে উদ্ধার করেন এবং তাঁর কন্যা ওলির প্রেমে পড়ে যান। সেইসময় ওলি বুল ধার করে একটা ভায়োলিন কেনেন এবং কৃতজ্ঞতার নিদর্শন রূপে মেয়েটিকে বিবাহ করেন। শিল্পী ওলি ততক্ষণে মহাসমুদ্রের ওপারে মার্কিন দেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মার্চ ১৮৭০-তে সংবাদপত্রের গসিপ কলামে থর্প মহিলার সঙ্গে তাঁর আসন্ন বিবাহের গুজব ভালই ছড়াতে আরম্ভ করেছে। এই সময় মিস্টার জোসেফ থর্প চিঠি লিখে অনুরোধ করলেন, আমার মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবেন না।
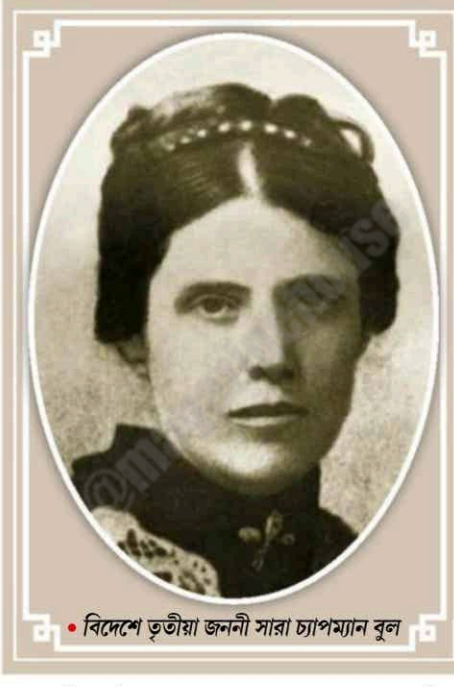
কিন্তু প্রেমমুগ্ধ ওলি মস্ত এক চিঠি লিখলেন সারাকে এবং এক সময় সারা তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে নিউইয়র্কে হাজির হলেন। তাঁরা নরওয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত।

নানা বাধা পেরিয়ে ওলি ও সারার প্রাইভেট ম্যারেজ সম্পন্ন হলো। আর্থিক ব্যাপারে ওলির অভিজ্ঞতা খুবই কম এবং এক বিপজ্জনক ব্যবসায়িক ব্যাপারে খুব জড়িয়ে পড়লেন, ভাবী শ্বশুর মিস্টার থর্প অনেক চেষ্টা করে তাকে বাঁচালেন। ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭০ দম্পতি ফিরে এলেন ম্যাডিসনে এবং সেখানে আমেরিকান আইন অনুযায়ী তাঁদের দ্বিতীয়বার বিবাহ হল।

কিন্তু সারার মা মস্ত বড় সামাজিক অনুষ্ঠান চাইলেন এবং এক হাজার কার্ড পাঠালেন দেশের সর্বত্র। শিকাগোর এক কেটারার ডিনারের অর্ডার পেলেন এবং সব অতিথিকে রুপোর বাসনে আপ্যায়িত করলেন। শোনা যায় এই উৎসবে রুপোর বাসনের দামই ৩০,০০০ ডলার।

বেহিসেবি জামাই-এর আর্থিক দিকটা দেখার দায়িত্ব সারার অনিচ্ছুক বাবাকেই নিতে হলো এবং ওলি বুল সমস্ত আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পেরে বেজায় খুশি হলেন।

মেয়ের আসন্ন সন্তান সম্ভাবনার সংবাদে খুশি হয়ে মিস্টার থর্প সাদার্ন মেইন-এ মেয়ে জামাই-এর জন্যে একটা বাড়ি কিনলেন। এবং ৪ঠা মার্চ ১৮৭১ নাতনি সারা ওলিয়ার জন্ম হল। পরের বছর শীতকালে ওলি বুল তাঁর ৭৫তম কনসার্টের পর অসুস্থ মেয়েকে দেখাশোনার জন্য ম্যাডিসনে ফিরে এলেন।

পরের বছর ওলি নরওয়েতে পুরো একটা দ্বীপ কিনে

ফেললেন। তার পরের বছর আমেরিকায় ফিরে এসে খেয়ালি ওলি তাঁর পুরনো এক দুর্বলতায় ফিরে গেলেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস কলম্বাসের ৪০০ বছর আগে একজন নরওয়েজিয়ান লিফ এরিকসন আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন এবং তাঁর মূর্তি তৈরির টাকা তুলবার জন্যে তিনি বিভিন্ন জায়গায় কনসার্ট করেছিলেন।

ইতিমধ্যে থর্প পরিবারের সঙ্গে বেহালাবাদক ওলি বুলের সম্পর্ক আরও খারাপ হল এবং মিস্টার জোসেফ থর্প একদিন তাঁর ডায়রিতে লিখলেন, ওলি বুল ও সারা আজ সকালে চলে গেল, সারা যাচ্ছে ফ্লোরেন্সে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে, তারপর সে যেতে পারে যেখানে তার ইচ্ছে।

ওলি স্বদেশে যে দ্বীপ কিনেছিলেন তা চালু রাখার সঙ্গতি নেই, তখন শ্বশুরমশাই তা কিনে নিয়ে জামাইকেই সেই সম্পত্তির তদারকি দিলেন।

ইতিমধ্যে সারা তার মায়ের সঙ্গে আমেরিকায় ফিরে এসেছে। ওলির সঙ্গীত অভিযান ইতিমধ্যে অব্যাহত এবং ৬৬ বছর বয়সে নরওয়ের রাজা তাঁকে কায়রোর বিখ্যাত এক পিরামিডে ভায়োলিনের এক উৎসবের ব্যবস্থা করতে বললেন। এই সময়ে সারা স্থির করলেন স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে হবে, এঁর ভালবাসার বিষয় সঙ্গীত এবং নরওয়ে। তাই তিনি ঝটপট নরওয়ের একটা জনপ্রিয় উপন্যাস ইংরিজিতে অনুবাদ করে সেটি স্বামীকে উৎসর্গ করলেন। স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন এবার থেকে চিরস্থায়ী হল।

আমেরিকার সর্বত্র ওলি বুলের কনসার্টের প্রধান ব্যবস্থাপক তাঁর স্ত্রী। জানা যাচ্ছে, ১৮৭৬ থেকে ১৮৮০ প্রত্যেকদিন স্বামী ও স্ত্রী একসঙ্গে পাঁচ ঘণ্টা করে রেওয়াজ করতেন। ১৮৭৯ সালের গ্রীষ্মকালে তাঁরা আবার নরওয়েতে ফিরে এলেন। তারপর আবার কেমব্রিজে, সেই সময় সারার ভাই হাভার্ডে ভর্তি হচ্ছে। কেমব্রিজেই ওলি বুলের ৭০তম জন্মদিবস পালিত হল।

এই সময়েই ওলি বুলের দেহাবসান— ১৭ আগস্ট দুপুর বারোটায়— মৃত্যুপথযাত্রী ওলি তাঁর তরুণী ভার্যাকে মোজার্টের রিকোয়েম বাজাতে বললেন, সারা পরবর্তী সময়ে ডায়েরিতে লিখলেন, সব যন্ত্রণার শেষে মৃত্যু তো 'হ্যাপি পিসফুল এন্ডিং অফ সাফারিং'।

বৈধব্যের বেদনা ভুলতে চেষ্টা করে সারা তাঁর স্বামীর জীবনী লিখে ফেললেন এবং শোককে কীভাবে জয় করা যায় জানতে বিভিন্ন ধর্মের অমৃতবাণী সন্ধান করতে লাগলেন।

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ, বিষয় বিবেকানন্দ। ২৪ জানুয়ারি নিউ ইয়র্ক থেকে সারা বুলকে স্বামীজি লিখছেন, 'প্রিয় মিসেস বুল, ক্যাটসকিন অঞ্চলে একটা জমি আছে, দাম মাত্র ২০০ ডলার। টাকা মজুত আছে, কিন্তু জমি আমার নামে তো কিনতে পারি না। এদেশে আপনিই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন বন্ধু। আপনি সম্মত হলে এই জমিটা আপনার নামে কিনি।...বক্তৃতা এবং অধ্যাপনায় আমার বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছে।...আমি যে 'নিষ্কর্মা' সাধু হয়ে থাকিনি, সে বিষয়ে অন্তর থেকে আমি নিসন্দেহ। একটা লেখার খাতা আমার আছে, এটি আমার সঙ্গে পৃথিবীময় ঘুরছে। দেখছি সাত বছর আগে এতে লেখা রয়েছে: এবার একটা একান্ত স্থান খুঁজে নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়ে থাকতে হবে।...আমার বিশ্বাস, এবার কর্মক্ষয় হয়েছে এবং ভগবান আমাকে প্রচারকার্য এবং শুভকর্মের বন্ধন থেকে অব্যাহতি দেবেন।'

আরও গভীর কথা রয়েছে এই চিঠিতে। 'দুনিয়া তার ভালমন্দ নিয়ে নানা রূপে চলতে থাকবে। ভাল মন্দ শুধু নতুন নামে ও নতুন স্থানে দেখা দেবে। নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তি ও বিশ্রামের জন্য আমার হৃদয় তৃষিত। একাকী বিচরণ করো। একাকী বিচরণ করো। যিনি একাকী বিচরণ করেন, কারও সঙ্গে তাঁর বিরোধ হতে পারে না।...সেই কৌপীন, মুণ্ডিত মস্তক, তরুতলে শয়ন ও ভিক্ষান্ন-ভোজন—হায়! এগুলোই আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষার বিষয়।...জীবনে আর কখনও এর চেয়ে তীব্রভাবে জগতের অসারতা অনুভব করিনি। ভগবান সকলের বন্ধন ছিন্ন করে দিন— সকলেই মায়ামুক্ত হোক।'

আর এক চিঠিতে (১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫) সারার কাছে স্বামীজির নিবেদন— 'মনুর মতে, সন্ন্যাসীর পক্ষে সৎকার্যের জন্যও অর্থসংগ্রহ করা ভাল নয়। আমি এখন বেশ প্রাণে প্রাণে বুঝেছি যে প্রাচীন ঋষিরা যা বলে গেছেন তা অতি ঠিক কথা।...ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, কারও কাছে থেকে কিছু সাহায্য চেও না— কিছুরই আকাঙ্ক্ষা কোরো না।'

এই চিঠিতেই বৈরাগ্যশতকম্ থেকে বিখ্যাত উদ্ধৃতি: 'ধন থাকলে দারিদ্র্যের ভয়, জ্ঞানে অজ্ঞানের ভয়, রূপে বার্ধক্যের ভয়, যশে নিন্দুকের ভয়, অভ্যুদয়ে ঈর্ষার ভয়, এমন কি দেহে মৃত্যুর ভয় আছে। এই জগতের সবকিছুই ভয় যুক্ত। তিনিই কেবল নির্ভীক, যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন।'

আর এক চিঠিতে (নিউ ইয়র্ক, ২১ মার্চ ১৮৯৫) মিসেস বুলের কাছে স্বামীজি তাঁর মনোভাব ব্যাখ্যা করেছেন— 'যাঁরা মানুষের কোনো সাহায্য করতে চান তাঁদের সুখ দুঃখ, নাম যশ ইত্যাদি যতপ্রকার স্বার্থ আছে সেগুলো একটা পোঁটলা বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দিতে হবে এবং ভগবানের কাছে আনতে হবে।...জগতের ইতিহাসে কি কখনও দেখা গেছে যে ধনীদের দ্বারা কোন বড় কাজ হয়েছে? হৃদয় ও মস্তিষ্ক দিয়েই চিরকাল কিছু বড় কাজ হয়েছে— টাকার দ্বারা নয়।'

তবু টাকা না হলে এই পৃথিবীতে ভগবানকেও খোঁজা যায় না। নিউ ইয়র্ক থেকে মিসেস বুলের কাছে স্বামীজির দুঃখ (মে, ১৮৯৫) 'গতকাল মিসেস থার্সবিকে ২৫ পাউন্ড দিয়েছি। ...দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, যদিও ক্লাসে বহু ছাত্রের সমাগম হয়, তারা যা দেয়, তাতে ঘর ভাড়াটাও ওঠে না। এ সপ্তাহটা চেষ্টা করে দেখবো, তারপর ছেড়ে দেবো।'

অর্থাভাবে বিব্রত সন্ন্যাসী কেবল স্নেহময়ী মিসেস বুলের কাছেই নিজেকে উন্মুক্ত করতে পারতেন। থাউজেন্ড আইল্যান্ড পার্ক থেকে (অগস্ট ১৮৯৫) মিসেস বুলকে খোলাখুলি লিখছেন, 'আমার গুরুভাইদের ও আমার কাজের জন্য আপনি যতটুকু সাহায্য করতে পারেন কেবল সেইটুকু সাহায্যই আমি এখন চাই। আমি নিজের দেশের মানুষের প্রতি কর্তব্যের কিছুটা করেছি, এখন জগতের জন্য, দেশের জন্য এবং মনুষ্য জাতির জন্য কিছু করবো। যতই বয়স বাড়ছে, ততই মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী হিন্দুদের এই মতবাদের তাৎপর্য বুঝতে পাচ্ছি।'

রিডিং, ইংলন্ড থেকে মিসেস বুলকে থেকে লেখা চিঠিতে (২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫) স্বামীজি নিজের মনোভাব খুলে দিয়েছেন। 'এড়িয়ে যেও না, খুঁজে বেড়িও না, ভগবান যা পাঠান তার জন্য অপেক্ষা করো, এই আমার মূল মন্ত্র। আমি চিঠি খুব কম লিখি বটে, কিন্তু আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ।'

প্রিয় মিসেস বুল কবে থেকে জননী বুল হয়ে উঠলেন তা

অনেকেই জানতে চান। ইংলন্ড থেকে একই সময়ে (অক্টোবর ১৮৯৫) স্বামীজি দু'খানা চিঠি লিখেছিলেন, তার একটায় 'প্রিয় মিসেস বুল', এবং আর একটায় মিসেস লেগেটকে 'মা' বলেছেন। 'ছেলেকে ভোলেননি তো? আপনি এখন কোথায়?'

২৬ মার্চ ১৮৯৭ দার্জিলিং থেকে স্বামীজি যে চিঠি লিখছেন সেখানেও ডিয়ার মিসেস বুল। 'পশ্চিমে একটানা খাটুনি এবং ভারতে একমাস প্রচণ্ড পরিশ্রমের পরিণাম বাঙালির ধাতে 'ডায়াবিটিস'। এটি একটি বংশগত শত্রু এবং বড় জোর কয়েক বছরের মধ্যে আমার দেহাবসান নিশ্চিত। শুধু মাংস খাওয়া, জল একেবারে না খাওয়া এবং মাথার সম্পূর্ণ বিশ্রামই বোধ হয়, জীবনের মেয়াদ বাড়ানোর একমাত্র উপায়। মগজটাকে বিশ্রাম আমি দিচ্ছি দার্জিলিংয়ে, সেখান থেকেই আমি এই চিঠি লিখছি।...মোহিনীমোহন চ্যাটার্জি কলকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন এবং আমার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করলেন। আপনার বার্তা তাঁকে দিয়েছি। আমার সঙ্গে কাজ করতে তিনি আগ্রহী।... আমার মঠটি চালু করতে আমি বিশেষ আগ্রহী। সেই কাজ সম্পন্ন হওয়া মাত্রই আমি আবার আমেরিকায় যাবো।'

২০ জুন ১৮৯৭-তে আলমোড়া থেকে লেখা স্বামীজির চিঠিতে আবার 'ডিয়ার মিসেস বুল'।

এর কয়েকমাস পরেই (এপ্রিল ১৮৯৮) আমরা পাচ্ছি 'মাই ডিয়ার ধীরামাতা'। মাতাজী তখন এদেশে। 'কলকাতার গরমে আপনি নিশ্চয় ঝলসে যাচ্ছেন।...কলকাতায় আমার শরীর খারাপ ছিল না। এখানেও তাই। সুগার উধাও, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি মাত্র ১৩। কাল রাতেও বেশ ঘুমিয়েছি... মিস মুলার এখানে (দার্জিলিং) একটা বাংলো নিয়েছেন এবং বুধবার আসছেন। মিস নোবল ওঁর সঙ্গে আসছে কি না জানি না, আমাদের আগেকার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাশ্মীরে আপনার গেস্ট হওয়াই ভাল।'

এরপর থেকে 'মাইডিয়ার মাদার' একের পর এক পাওয়া যাচ্ছে। যেমন উইম্বলডন থেকে লেখা (৬ আগস্ট ১৮৯৯) স্বামীজির চিঠি। 'কাজের জন্য আপনি এবং অন্যরা যে টাকা দিয়েছিলেন, তা থেকে একটি টাকাও খরচ করিনি।... ইউরোপ এবং আমেরিকায় বক্তৃতা করে যে টাকা পেয়েছি, তা আমি ইচ্ছামতো খরচ করেছি, কিন্তু কাজের জন্য যা পেয়েছি তার প্রতিটি পাই-এর হিসেব রাখা হয়েছে, তা মঠে আছে এবং সমস্ত ব্যাপারটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার থাকা উচিত।...আমার মনে হয় না ব্রহ্মানন্দ কখনো আমাকে ঠকাবে। এডেনে পাওয়া সারদানন্দের চিঠি থেকে জানলাম ওরা হিসাব তৈরি করছে, আমি অবশ্য এখনও কিছু পাইনি।'

'ডিয়ার মিসেস বুল', আবার ফিরে আসছেন ১২ নভেম্বর ১৮৯৯-এর চিঠিতে। স্বামীজি তখন নিউ ইয়র্কে কেয়ার অফ ডক্টর গুর্নসী, ঠান্ডা লেগে শয্যাশায়ী। 'একাধিক ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু কেউ কোনো অর্গানিক ডিজিজও খুঁজে পায়নি।... কিডনির সমস্যাগুলোও এই মুহূর্তে উধাও।... তিনবার হেলমারের চিকিৎসা হয়ে গেছে। আসছে সপ্তাহে আরও কিছু হবে। পেটে বায়ু সঞ্চারের ব্যাপারে কেউ কিছু করতে পারছে না, সেই জন্যে যে কোনো উপায়ে ডায়েটিং করতে হবে।'

পনেরো দিন পরেই (৩০ নভেম্বর ১৮৯৯) স্বামীজির চিঠিতে আবার 'মাই ডিয়ার ধীরামাতা'কে ফিরে পাওয়া যাচ্ছে। 'আমার বিশেষ কিছুই লেখার নেই, শুধু জানাই মার্গট বেশ ভাল আছে। কাল রাতে কেউ কেউ অভিযোগ করছিল যে তাদের ভয় পাইয়ে দেওয়া হচ্ছিল এই বলে যে স্বামীজি কখনও ভুল করতে পারেন না।'

ধীরামাতার সঙ্গে সম্পর্ক আরও নিবিড় হওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে টার্ক স্ট্রিট, সানফ্রানসিসকো থেকে লেখা (১২ মার্চ ১৯০০) স্বামীজির চিঠিতে। নিবেদিতাকে 'আপনার হাতে সঁপে দিয়েছি এবং নিশ্চিত জানি আপনি তার দেখাশোনা করবেন।...টাকাকড়ির ব্যাপারে এখানে মোটেই সফল হইনি, কিন্তু অভাবও নেই।...যদি না চলে, তাতেই বা কি? আমি সম্পূর্ণ গা ভাসিয়ে দিয়েছি।'

মাই ডিয়ার মাদারকে লন্ডনে লেখা (১৮ মে ১৯০০) চিঠিতে অসুস্থ সন্তানের হতাশার সুর। তাঁর ধারণা তাঁর সব অসুখের মূলে নার্ভ। 'আমার প্রয়োজন দু'তিন বছরের বিশ্রাম এবং এর মধ্যে কোনো কাজকর্ম থাকবে না। মিসেস সেভিয়ার আমার ফ্যামিলির জন্য যে ৬০০০ টাকা দিয়েছিলেন আমার কাজিন, খুড়িমা ইত্যাদির হাতে দেওয়া হয়েছে। বাড়ি কেনবার ৫০০০ টাকা মঠ থেকে নেওয়া হয়েছিল। সারদানন্দ যতোই আপত্তি করুক আমার কাজিনের কাছে টাকা পাঠানো বন্ধ করবেন না, আমি অবশ্য জানি না এ ব্যাপারে সারদানন্দের মত কী।'

'কলকাতায় আমার কাছে ও লেগেটের কাছে আমার কিছু টাকা আছে এবং আপনি যদি আরও এক হাজার দেন তাহলে আমার নিজের খরচের জন্য একটা তহবিল হয়। আপনি তো জানেন, ব্যক্তিগত খরচের জন্য আমি কখনও মঠের টাকায় হাত দিই নি। ছোট বাড়ি একটা কেনার পরিকল্পনা ত্যাগ করার জন্য সারদানন্দকে আপনি লিখবেন।'

'ডিয়ার মাদার' সম্ভাষণটি এবার পাকাপাকি হয়ে গিয়েছে। মায়ের কাছে কিছু লুকোবার নেই, (২২ অক্টোবর ১৯০০) স্বামীজি লিখছেন— 'পুরো জীবনটাই আমি আশা ও হতাশার মধ্যে ওঠানামা করেছি, বোধ হয় সব মানুষেরই এমন হয়, পতনগুলো মাঝে মাঝে এলে খারাপ নয়। সব বুঝেও কিন্তু আমি ছটফট করি এবং তেড়েমেড়ে অভিযোগ করি। বোধ হয় এইভাবেই আমি আবার উঠে আসি।' এরপরেই বিদেশিনি মাকে তিনি জানাচ্ছেন, পরশু দিন তাঁরা মিশরের পথে রওনা দেবেন।

নিজের পারিবারিক দুঃখের কথা 'মাই ডিয়ার মাদার' ছাড়া কাকে জানাবেন আশ্রয়হীন সন্ন্যাসী? ঢাকায় এর আগে কখনও যাওয়া হয়নি। সেখান থেকে (২০ মার্চ ১৯০১) চিঠি, মেজভাই মহেন্দ্রনাথের দুঃখজনক আচরণ সম্বন্ধে।

দাদার সঙ্গে মতবিরোধের পরে মহেন্দ্রনাথ আচমকা লন্ডন থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন পায়ে হেঁটে স্থলপথে দেশে ফিরতে। তারপর কয়েক বছর কেটে গিয়েছে। এখন সে কোথায় তা জানবার জন্যে সন্ন্যাসীভ্রাতা উদ্বিগ্ন, কেন সে চিঠি লেখে না?

এবার শ্বেতাঙ্গিনী জননীকে বিবেকানন্দ প্রথম সুযোগেই জানাচ্ছেন: 'আমার ভাই মোহিন এখন বোম্বাই-এর কাছে করাচিতে, সারদানন্দর সঙ্গে তার পত্রালাপ রয়েছে। সে লিখেছে এখন সে বার্মা এবং চায়না যাবে।...আমি তার সম্বন্ধে আদৌ উদ্বিগ্ন নই। মানুষটি ভীষণ স্বার্থপর।'

ঢাকা থেকে বেলুড় মঠে ফিরে 'ডিয়ার মাদার'-এর সঙ্গে আবার খবরাখবর বিনিময়। দেখা যাচ্ছে, টাকা-পয়সার ব্যাপারে তিনি সারা বুলের ওপর বেশ নির্ভরশীল। (১৩ মে

১৯০১)— 'গতকাল আমি কলকাতায় ফিরেছি, আর আজ সকালে আমার খুড়তুতো বোনের জন্যে আপনার তিনখানা চেক এসে হাজির। এগুলো অবশ্যই তার কাছে পৌঁছবে।... আমার গর্ভধারিণী, আমার খুড়তুতো বোন এবং অন্য সবাই তাদের ভালবাসা জানাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে আমার চিরন্তন ভালবাসা সে তো আপনি জানেনই— এভার ইওর সন বিবেকানন্দ।'

মার্চ ১৯০২— পবিত্র কাশীধামে গোপাললাল ভিলায় বসে স্বামীজি আচমকা ভাবছেন শেষের সময় আগত। ইউরোপ থেকে যে সামান্য অর্থ এনেছিলেন তা তাঁর গর্ভধারিণীর ভরণপোষণ ও দেনা শোধ করতে খরচ হয়ে গিয়েছে। সামান্য যা অবশিষ্ট রয়েছে তা মামলায় লেগে যাবে। বেলুড় মঠে তিনি ফিরে এসেছেন সেই মাসে। তার পরেই জননী সারাকে এক আশ্চর্য স্নেহে ভরা চিঠি, নিবেদিতাকে নিয়ে। সারা বুল তখন নিবেদিতা ও জোসেফিন ম্যাকলাউডকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার এসপ্ল্যানেড ইস্টে আমেরিকান কনসালের অতিথি। তাঁদের কলকাতা ত্যাগ ২রা এপ্রিল ১৯০২। এইসময় বোধহয় দূত মারফত সারা কিছু জানতে চেয়েছিলেন। এই 'ইংরেজ মহিলারা' আসলে আমেরিকান সারা ও জোসেফিন।

আমার আন্দাজের সমর্থন খুঁজে পাচ্ছি সন্ন্যাসিনী প্রবুদ্ধপ্রাণার গবেষণায়। জানা যাচ্ছে, কলকাতায় এসেই ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯০২ রবিবার স্বামী সারদানন্দের নিমন্ত্রণে স্বামী সদানন্দ নৌকায় তাঁদের মঠে নিয়ে এসেছিলেন। ঐখানেই দুপুরের খাওয়াদাওয়া। বিবেকানন্দ বারাণসী থেকে ফিরেছিলেন ১৯ মার্চ। এবং রামকৃষ্ণ মহোৎসবের দিনে কাউকে দর্শন না দিয়ে তিনি দরজা বন্ধ করে বসে আছেন। মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন সারা, নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিনা এবং তাঁরাই একবার দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে বিদায় নিয়ে তাঁরা যে অসুস্থ স্বামীজির প্রশংসা অর্জন করেছিলেন তা প্রবুদ্ধপ্রাণা সমর্থন করেছেন। খোঁজখবর নিয়ে প্রবুদ্ধপ্রাণা জানাচ্ছেন, নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে সারা ২২ মার্চ সমস্ত দিন বেলুড়ে কাটিয়েছিলেন এবং সেইসময় পুত্র বিবেকানন্দ গঙ্গাতীরে স্ত্রীমঠ স্থাপনের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন।

স্বামীজি বলেছিলেন, পুরুষদের মঠের আদলেই হবে এই স্ত্রীমঠ। শ্রীশ্রীমা সারদামণিই হবেন অনুপ্রেরণাদাত্রী। এখানেই ব্রহ্মচারিণীরাই এদেশের মেয়েদের পুনর্জাগরণের কাজে নিজেদের উৎসর্গ করবেন।

প্রবুদ্ধপ্রাণা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, স্বামীজির সঙ্গে দেখা করা ছাড়াও সারার এবারের ভারতভ্রমণের উদ্দেশ্য নিবেদিতার ইস্কুলের আবার খোলার সময়ে উপস্থিত থাকা।

প্রবুদ্ধপ্রাণা লিখেছেন, সারা আশা করছিলেন গোপালের মা গঙ্গাতীরে যেখানে থাকতেন সেখানে খুব কম দামে কোনো বাড়ি ভাড়া পাওয়া যাবে। এক বছর আগে নিবেদিতা চেয়েছিলেন নজর রাখতে যদি গোপালের মার বাড়ির কাছাকাছি কোনো ভাঙাচোরা বাড়ি পাওয়া যায়। প্রবুদ্ধপ্রাণার মন্তব্য: পঞ্চাশ বছর পরে এই রকম একটা পুরনো বাড়ি বেলুড় মঠ কিনেছিল স্ত্রীমঠের জন্য। জননী সারা ও কন্যা নিবেদিতা চেয়েছিলেন স্ত্রীমঠ খুব দ্রুত স্থাপিত হোক, কিন্তু তা নানা কারণে সম্ভব হয়নি।

আর এক নিঃশব্দ নায়িকার সমর্থন লাভ করেছিলেন জননী সারা। তিনি সিস্টার ক্রিশ্চিন। এঁকে বোম্বাই বন্দরে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে সারা সবান্ধবে যেতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তাঁর আসা একমাস পিছিয়ে যাওয়ায়, সারা অ্যান্ড পার্টি চললেন এলিফ্যান্টা ও অজন্তা দেখতে। সারা, জোসেফিন এবং নিবেদিতা ক্রিশ্চিনকে নিয়ে কলকাতায় ফিরলেন ৭ এপ্রিল।

এঁরা সবাই যে আজকের এসপ্ল্যানেড ইস্ট আমেরিকান কনসুলেটে জেনারেল প্যাটারসনের বাড়িতে উঠেছিলেন তা স্পষ্ট। এঁদের সঙ্গেই ছিলেন বিখ্যাত জাপানি ওকাকুরা।

প্রবুদ্ধপ্রাণা আমাদের জানিয়েছেন, ক্রিশ্চিনা আসামাত্রই, পরের দিন সারা তাঁকে বেলুড়মঠে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেদিন স্বামীজির সঙ্গে তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল 'চেস্টিটি', সন্ন্যাসীর শারীরিক পবিত্রতার কথাও সেদিন উঠেছিল। জীবনের সব পদক্ষেপেই 'চেস্টিটির' কথা ওঠে। স্বামীজি এতোদিন 'রিনানসিয়েশন' বা বৈরাগ্যের কথা বলে এসেছেন, কিন্তু চেস্টিটি ছাড়া বৈরাগ্যের কোনো অর্থ হয় না। সারা সেদিন বুঝেছিলেন, এই চেস্টিটির প্রয়োজন জীবনের সর্বক্ষেত্রে।

সারা তাঁর অসুস্থ সন্তান বিবেকানন্দকে ছেড়ে দেশে চললেন নিজের মেয়ে ওলিয়ার খোঁজে। বান্ধবী জোসেফিন তখন মায়াবতীতে, ২০ এপ্রিল তাঁরা স্বদেশযাত্রা করলেন।

১৭ এপ্রিল কলকাতা ছাড়ার আগে সারা তাঁর পুত্রের মানসকন্যার বইয়ের পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে নিলেন যোগ্য প্রকাশক খুঁজবেন বলে।

নিবেদিতা এবং অন্য অনেকেই সেই সময় ভেবেছিলেন, বিবেকানন্দ জননী সারা এবার থেকে ভারতেই সময় কাটাবেন। নিবেদিতার মতামত: 'ওলিয়ার সঙ্গে জীবনে সারার কোনো প্রাণ নেই, অথচ ভারতবর্ষে অনেকের কাছে তিনি প্রাণ এবং আলো দুইই। বেচারা ওলিয়া তখন সবে অ্যাপেনডিসাইটিস অপারেশনের পরে পেরিটোনাইটিসের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। একজন নার্সকে সঙ্গে নিয়ে মা ও মেয়ে এবার নরওয়ের পথে জাহাজে উঠলেন।'

ইতিমধ্যে আমেরিকান মাদারের সঙ্গে পত্রালাপ চলেছে পুত্র বিবেকানন্দের। প্রধান বিষয় ব্রহ্মচর্য। সারা বলছেন, কঠোর বৈধব্য পালন হচ্ছে সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুতির পথ। এই বিষয়ে বিবেকানন্দের শেষের একটি চিঠি থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন প্রবুদ্ধপ্রাণা।

এই চিঠিতে (১৫ জুন ১৯০২) স্বামীজি তাঁর আমেরিকান জননীকে লিখছেন, 'কোনো জাতকে পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে সর্বপ্রথম বিবাহের পবিত্রতা ও অবিচ্ছেদ্যতার মধ্য দিয়ে মাতৃত্বের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব অর্জন করতে হবে। রোমান ক্যাথলিক এবং হিন্দুরা বিবাহবন্ধনকে পবিত্র ও অবিচ্ছেদ্য মনে করেন, তাই তাঁরা ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত মহাশক্তিমান পবিত্র বহু নরনারীর জন্ম দিতে পেরেছেন।...ভগবান সকলের বন্ধন মোচন করুন, সকলেই মায়ামুক্ত হোক— এই আমার চিরপ্রার্থনা।'

এই চিঠিটিই আমেরিকান মাদারের কাছে আমাদের বিবেকানন্দের শেষ যোগাযোগ। সেখানে একটা লাইন হৃদয় স্পর্শ করে— 'আমার জীবনে এর চেয়ে স্পষ্টতর ভাবে জগতের নিষ্ফলতা কখনো অনুভব করিনি।'

রামকৃষ্ণ আন্দোলন সম্পর্কে বিদেশিনী জননীর কাছে এই চিঠি কবে পৌঁছেছিল তা আমাদের জানা নেই, কারণ তখনো এয়ারমেল চালু হয়নি। তবে আমরা জানি, এই চিঠি পড়ে সারা যখন উত্তর দেবার জন্য তৈরি হচ্ছেন তখন বেলুড়

থেকে পাঠানো ৫ই জুলাইয়ের টেলিগ্রাম তাঁর হাতে এলো— The end has come. Swamiji has slept last night at nine never to rise again.

এর উত্তর পুত্রহারা জননীর টেলিগ্রামে দুটি শব্দে— Loving sympathy. এরপর সারা কয়েকজন আপনজনকে চিঠি লিখতে বসলেন— ৪ঠা জুলাই স্বামীজি নির্বাণ লাভ করেছেন। অতি প্রিয়, ক্লান্ত, আহত মানুষটির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর কাজগুলি এখন আমাদেরই করতে হবে।

প্রবুদ্ধপ্রাণা লিখছেন, সারার স্থির বিশ্বাস, স্বামীজির কাজ চলতেই থাকবে। দৈহিকভাবে উপস্থিত না থাকলেও তিনি সারাক্ষণ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।

আমাদের কৌতূহলী জননী সারা কবে তাঁর সন্তানকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন? মিসেস মেরি লুইস বার্কের বই সাবধানে পড়লে নানা তথ্য পাওয়া যাবে। যেমন সন্ন্যাসীকে দেওয়া তাঁর প্রথম ৫০০ ডলার। মিসেস হেলকে স্বামীজি সানন্দে জানাচ্ছেন, মিসেস বুলের কাছে থাকায় তাঁর কোনো খরচই নেই। 'এছাড়াও তিনি আমাকে ৫০০ ডলার দিয়েছেন আমার কাজের জন্য অথবা যেমন ইচ্ছা খরচের জন্য।'

এই ৫০০ ডলারের সঙ্গে মিসেস বুল যে চিঠি স্বামীজিকে পাঠিয়েছিলেন তাও সংগৃহীত রয়েছে। সেখানে সারা তাঁর স্বামীর কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'তিনি বেঁচে থাকলে আপনাকে খুব পছন্দ করতেন, আপনাকে তাঁর সন্তান মনে করে সামান্য কিছু পাঠালাম। সামনের বছরেও আরও কিছু পাঠাবার ইচ্ছা রইল।'

জননী সারার উপর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের নির্ভরতা ক্রমশই বেড়েছে। প্রথমবার আমেরিকা ছাড়বার আগে তিনি লিখলেন— 'আগামীকাল আমার জাহাজ ছাড়ছে। এখনকার সব কিছুর দায়িত্ব আপনার উপরেই রইলো।'

পরবর্তী সময়ে গুডউইন বলছেন, ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনই স্বামীজির বৃহত্তম প্রোজেক্ট। এই বিষয়ে স্বামীজি তাঁর ব্রিটিশ বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

বার্ক জানাচ্ছেন, মিস মুলার প্রতি বছর দুশো পাউন্ড প্রতিশ্রুতি দিলেন, স্টার্ডি দিলেন ৫০০ পাউন্ড এবং আর একজন এক হাজার। স্বামীজির ক্ষিপ্রলিপিকার গুডউইন এই ব্যাপারে চিঠি লিখলেন সারাকে। এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে জানালেন ৩৫০০০ টাকা দেবেন।

স্বামীজি তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে জানালেন, শুরুতেই আমি বেশি টাকা চাই না। আমি ছোটখাটোভাবে শুরু করতে চাই, পরে অবশ্য মিস মুলারের টাকায় বেলুড়ের জমি কেনার বিষয়ে স্বামীজি সারা বুলের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন।

স্বামীজির ক্ষিপ্রলিপিকার এবং প্রিয় সহকারী গুডউইনকেও সারা কয়েকবার টাকা দিতে চেয়েছেন, কিন্তু গুডউইন রাজি হননি। শেষপর্যন্ত মতের পরিবর্তন হলো এবং গুডউইন সারাকে লিখলেন, স্বামীজি মাঝে মাঝে তাঁর কাজে এদিক ওদিক যেতে বলেন এবং এর জন্য মঠের কাছ থেকে রাহাখরচের টাকা চাইতে হয় যা আমার ভাল লাগে না। আপনি আগে একবার বলেছিলেন প্রয়োজন হলে আপনাকে জানাতে। আপনি যদি মনে করেন এইসব কাজের জন্যে আমাকে কিছু দিতে পারেন।

মঠের জন্য সারা যে ৩৫০০০ টাকা স্বামীজিকে দিয়েছিলেন তার থেকে ৫০০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল স্বামীজির খুড়িমাকে।

আমেরিকান জননী সারার উপর কতখানি বিশ্বাস ও প্রত্যাশা ছিল তার প্রমাণ সারা বুলকে লেখা স্বামীজির ২৭ ডিসেম্বর ১৮৯৯ তারিখের চিঠি। 'আমি চাই মঠের ট্রাস্টডিড সারদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ এবং আপনার নামে। সারদানন্দের কাছ থেকে কাগজপত্র এনেই আমি ঝাড়া হাতপা হয়ে যাবো। আমার চাই এক মুঠো অন্ন, একটু বিশ্রাম এবং কয়েকটা বই।'

লেখিকা বার্কের মন্তব্য: মঠের ট্রাস্টি হিসাবে একজন আমেরিকান মহিলার অন্তর্ভুক্তি অনেকের কাছেই আশ্চর্য মনে হতে পারে। এর কারণ হতে পারে সারা বুলের ভক্তি এবং ব্যবসায়িক বুদ্ধি। স্বামীজি ২৭ ডিসেম্বর ১৮৯৯ জননী সারাকে লিখেছিলেন, বিজনেস বুদ্ধিতে পাকা এমন একজনকে দৈনন্দিন পরিচালনার জন্য প্রয়োজন। ভারতবর্ষে এমন কাউকে পাওয়া কঠিন, কেউ থাকলে পাশ্চাত্যের কারুর কাছে তার প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। বার্ক জানাচ্ছেন, শেষপর্যন্ত মঠের ট্রাস্টি হিসেবে সারা বুলের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বার্কের আন্দাজ, সারা বুলের ইচ্ছেতেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়নি।

শোনা যায়, মার্কিন দেশে থাকার সময় শরীর খারাপ করলে একাধিকবার স্বামীজি উইল করেছেন ঝটপট এবং সবকিছু লিখে দিয়েছেন জননী সারা বুলকে। মিসেস বার্ক জানিয়েছেন, সারা বুলের কাগজপত্রের মধ্যে স্বামীজির শেষ উইলের একটা কপি রয়েছে। তারিখ ৬ জুলাই ১৯০০।

এই উইল অনুযায়ী যাঁদের তিনি সর্বস্ব দিয়ে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দ ছাড়াও রয়েছেন ফ্রানসিস লেগেট, নিবেদিতা ও সারা বুল। এঁদের তিনি উইলের একজিকিউটরও নিয়োগ করেছিলেন। স্বামীজির দেহাবসানের সময় এই উইল নাকি আইনসঙ্গত ছিল, তবে এই উইল কখনোই প্রোবেট করা হয়নি।

এতদিন পরে দেখছি ছেলে বিবেকানন্দের সুবাদে আরও দু'জনকে সারা নিতান্ত কাছে টেনে নিয়েছিলেন। একজন স্বামীজির প্রিয় গুরুভাই সারদানন্দ যিনি তাঁকে granny বা ঠাকুমার স্থানে বসিয়েছিলেন, আরেকজন তাঁর প্রিয় পুত্রের মানসকন্যা নিবেদিতা।

সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়াশোনা করা সারদানন্দ প্রথম রামকৃষ্ণতনয় যাঁকে বিবেকানন্দ বিদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইংলন্ড হয়ে তাঁকে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন স্বামীজি।

লন্ডনে সারদানন্দের প্রথম কয়েক সপ্তাহের অন্তরঙ্গ বিবরণ দিয়ে গিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত। যথাসময়ে তাঁকে আমেরিকায় পাঠানো হয়েছিল এবং সেখানেই সারা বুলের সঙ্গে এই সন্ন্যাসীর নিবিড় পরিচয়। ঠিক কোন সময়ে 'মিসেস বুল' থেকে তাঁকে গ্র্যানিতে উন্নীত করেছিলেন সারদানন্দ তা খুঁজে বার করার সুযোগ পাইনি। ইংরিজি গ্র্যানি শব্দটির অর্থ 'ঠাম্মা' ও 'দিদিমা' দুই-ই হয়, এবং এঁদের দু'জনের পত্রাবলি প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত অবস্থায় বিস্তারিত বিশ্লেষণের অপেক্ষায় রয়েছে।

সারা বুলের বৈশিষ্ট্য তিনি চিঠিপত্র ও দলিল দস্তাবেজ সযত্নে রক্ষা করায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেসব আজও কোথাও সংগৃহীত হয়ে রয়েছে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাসে তিনি স্তম্ভস্বরূপ এবং একসময় জোসেফিন ও সারা বিবেকানন্দ ও সারদানন্দকে সোয়ামি নাম্বার ওয়ান ও সোয়ামি নাম্বার টু ডাক নাম দিয়েছিলেন। সারদানন্দের

জীবনকথা আজও নিপুণভাবে লিখিত হয়নি বলাটা অত্যুক্তি হবে না, যদিও সঙ্ঘজীবনের প্রারম্ভে তাঁর অবদানের কথা অনুরাগীমহলে আজও প্রচারিত। অনেকেই জানেন, আর এক অবিস্মরণীয় সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁর জ্যেঠতুতো ভাই এবং শরৎ-শশী মহারাজ হিসেবে তাঁদের বিনম্র অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিবেকানন্দের মতন সারদানন্দের ছিল পূর্বাশ্রমের অভাব-অনটন। সেই অভাব-অনটনের নিবৃত্তিতে গ্র্যানি সারা বুল নিঃশব্দে সাহায্যের হাত এগিয়ে দিয়েছিলেন। অনেকেই জানেন, তাঁর এক ভাই স্বামীজি, তুরীয়ানন্দ ও নিবেদিতার সঙ্গে একই জাহাজে কলকাতা থেকে বিদেশযাত্রা করেছিলেন, তবে অর্থাভাবে তিনি নিম্নশ্রেণির টিকিট কেটেছিলেন। নাতি সারদানন্দের পরিবারের দিকে গ্র্যানি সারা যে সাহায্যের হাত এগিয়ে দিয়েছিলেন তা পরিচিত মহলে অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিল বলে শোনা যায়।

বিবেকানন্দের জীবনাবসানের পরেও গ্র্যানি ও নাতির সম্পর্ক যে গভীর ছিল তা লেখিকা ও সন্ন্যাসিনী প্রবুদ্ধপ্রাণা বর্ণনা করেছেন। জানুয়ারি ১৯০৩, তিরোধানের পর প্রথম বিবেকানন্দের জন্মদিনের বিবরণ সারদানন্দ পাঠিয়েছেন সারার কাছে মর্মস্পর্শী ভাষায়— আজ আমরা আমাদের প্রিয় স্বামীজির জন্মদিন পালন করছি সঙ্গীত ও উপবাসের মধ্যে এবং সেই সঙ্গে স্মরণ করছি শ্রীরামকৃষ্ণকে।We are joyful when we forget ourselves and sad when the mind dwells upon his blessed compainonship with us, which is no more.

পুত্রশোকে কাতর জননীকে সারদানন্দ সেবার স্বামীজির জন্মোৎসবের খুঁটিনাটিও পাঠিয়েছিলেন। একজন ভক্ত এই উৎসবের জন্য ৪০০ টাকা দিয়েছেন এবং আরও ৩০০ টাকা উঠেছে শিষ্য ও ভক্তদের কাছ থেকে। এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ সঙ্গীত এবং ৩০০০ লোকের মধ্যাহ্নভোজন। 'পুজো এবং উৎসবের সময় তোমার কথা মনে পড়ছিল।...যে ১৬০ পাউন্ডের কথা তুমি লিখেছ তা এই উত্তর দেবার সময় পর্যন্ত ব্যাংকে জমা পড়েনি। এই চিঠি তোমার হাতে পৌঁছবার আগেই তা নিশ্চয় এসে যাবে। ইতিমধ্যে আমি ব্রহ্মানন্দের কাছে ধার নিয়েছি।'

চিঠিতে গ্র্যানির কাছে অনেক দুঃখের কথাও আছে। শেষ চিঠির পরে কত যে দুঃখের কারণ হয়েছে। সবচেয়ে বেদনার উৎস আমার ছোট ভাইয়ের মৃত্যু। প্লেগের আক্রমণে তিন দিনে তার দেহাবসান। সব চেষ্টা করেও তার প্রাণরক্ষা করা গেল না। আমার গর্ভধারিণী জননীর কাছে মস্ত এই আঘাত। আমার এই ভাইয়ের বয়েস এগারো। আমার ভায়ের মৃত্যুর তিন দিন পর আমার ভাগ্নে (বড়বোনের ছেলে) ম্যালেরিয়ায় মারা গেল, বয়স মাত্র কুড়ি। ভাইয়ের মৃত্যুর কুড়িদিন আগে আমার ভাইঝি সন্তান প্রসবের সময় প্রাণ হারালো। আরও দুসংবাদ আছে, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ হরিদ্বারে কলেরায় মারা গেলেন যখন আমার ভাই প্লেগের সঙ্গে লড়াই করছে।

এরপরেই সারাকে দেখা যাচ্ছে জাপানে। সেখান থেকে আবার তিনি ভারতবর্ষের পথে, 'আমার প্রিয়জনদের' সঙ্গে মিলিত হতে। তবে কিছু বিলম্ব হবে, হংকংটাও ঘুরে দেখা হবে না, কারণ চিনে তখন প্লেগের প্রকোপ। সিঙ্গাপুর ও পেনাং-এর মধ্যে তখন দশ দিনের কোয়ারেনটাইন।

১০ জুন দার্জিলিং থেকে কলকাতায় নেমে এসে দেখলেন নির্ধারিত (১১ জুন) সময়ের একদিন আগেই সারার জাহাজ এসে গিয়েছে। জোসেফিন এবং নিবেদিতা আশা করেছিলেন এবার পাকাপাকিভাবে প্রয়াত সন্তানের দেশেই থেকে যাবেন। কিন্তু সারা সেরকম কোনো টান দেখালেন না, তাঁকে বিশেষ কাজে জাপানে ফিরে আসতে হবে।

মিসেস ব্রিগসকে তিনি লিখছেন, 'সমুদ্রযাত্রা ভালই হলো, গত গ্রীষ্মে নরওয়েতে যেরকম হয়েছিল 'রিচ ফুড' থেকে পেটের গোলমাল, কলকাতায় জাহাজ থেকে নামার সময়ে আমি নিতান্তই একা। এর অবশ্যম্ভাবী ফলাফল সারা জাপানে ফিরছেন না। নাতি সারদানন্দের সঙ্গে দেখা হলো দার্জিলিং পাড়ি দেবার আগে, দুজনের অন্তরঙ্গ আলাপ আলোচনা হলো স্ত্রীমঠ সম্বন্ধে।

সারার তৃতীয় ভারতভ্রমণের সময়কাল যে দু'মাস তা প্রবুদ্ধপ্রাণার লেখা থেকেই স্পষ্ট হচ্ছে। এই সময়েই স্ত্রীমঠ স্থাপনের ব্যাপারেই সারদানন্দের প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা। 'আপনার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাতেই মেয়েদের জন্য আমি এই কাজে নেমেছি। আপনার নিশ্চয় কেমব্রিজে যেসব কথা হয়েছিল তা মনে আছে। এছাড়াও আমার অন্য একটা কারণ আছে— এদেশ এবং আমেরিকার মেয়েদের কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি। এঁরাই আমার জীবনের ধ্রুবতারা, এঁদের মাধ্যমেই আমি জগজ্জননীকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছি।'

৪ জুলাই ১৯০২ স্বামীজির অকালে আকস্মিক প্রয়াণের পর জননী সারা ও কন্যা নিবেদিতা এক দশকের বেশি বেঁচেছিলেন। এই সীমিত সময়ে দু'জনেই অনেক কাজ করেছেন মানুষের মঙ্গলের জন্য। এর মধ্যে যেমন ছিল সন্ন্যাসী পুত্রের অসমাপ্ত স্বপ্নের পূরণ তেমনি ছিল বিশ্ববিজ্ঞানী মহলে অনন্যপ্রতিভাধর জগদীশচন্দ্র বসুকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করা।

১৯০৩ সালে নিবেদিতা এক চিঠিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে জানাচ্ছেন— ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে তিনি জগদীশচন্দ্র এবং অবলা বসুর সঙ্গে পরিচিত হন। 'আপনি অবশ্যই বুঝবেন যে বিজ্ঞান জগতে মার্কনি, টেসলা, ধরনের উদ্ভাবক বা আবিষ্কারকদের স্থান ড বসুর মত সন্ন্যাসী-মনের সন্ধানীদের তুলনায় অনেক নিম্নে...' দীর্ঘ চিঠির শেষে নিবেদিতার ধৈর্যভঙ্গ— 'হে ভারত যদি তুমি নিজের সন্তানকে আশীর্বাদ জানিয়ে সজ্জিত আকারে রণক্ষেত্রে পাঠাতে অসমর্থ হও— তাহলে এই দেশের আসন্ন সর্বনাশ বিলম্বিত হোক।'

১৯০৫-এর ১২ জুন সারা চাপম্যান বুলের, নিবেদিতাকে লেখা চিঠি সযত্নে পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায় সারা বুল জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনায়, বই লেখায় এবং সহকারী রাখায় এবং গবেষণার যন্ত্রপাতি কেনায় অর্থসাহায্য করছেন। নিবেদিতার ক্ষেত্রেও কিছু আর্থিক সাহায্য থাকা উচিত— লিখবেন বলে স্বামীজি বিশ্রাম চাইতেন— তাঁর কন্যা যেন তা পায়— তাঁকে অবশ্যই লিখতে হবে বিবেকানন্দের জীবনকথা।

১২ জুন ১৯০৫: জননী বুল তাঁর প্রয়াতপুত্রের প্রিয় কন্যা নিবেদিতাকে ১০০ পাউন্ড পাঠিয়ে লিখছেন, স্বপ্ন ছিল আমার পুত্রকে এমন ব্যবস্থা করে দিই যাতে সে নিশ্চিন্তে লিখতে পারে— তোমার ক্ষেত্রেও তেমন কিছু করতে পারার সুযোগ পাব না? এই চিঠিতেই আছে গ্রিন্ডলেজ ব্যাংককে সারা চ্যাপম্যান বুলের কিছু আর্থিক নির্দেশ।

একই দিনে জগদীশচন্দ্রকে একই সুরে লেখা সারার চিঠি। সঙ্গে প্রকাশনার খরচ হিসেবে কিছু অর্থসাহায্য। এবং অনুরোধ, অন্যান্য খরচ বাবদ যা পাঠানো হয়েছে তা যথেষ্ট না হলে নির্দ্বিধায় জানাতে। এই চিঠিতে সারার আসন্ন লাস্ট উইল অ্যান্ড টেস্টামেন্টের ইঙ্গিতও রয়েছে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করে নিবেদিতার অনেক খবর শঙ্করীপ্রসাদ আমাদের দিয়েছেন।

১৫ নভেম্বর ১৯১০-এ আমরা ভারতকন্যা নিবেদিতাকে দেখছি বোস্টন কেমব্রিজে। জননী সারার শরীর নিয়ে তাঁর প্রিয়জনদের গভীর আশঙ্কা। এর আগেই সারা জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি শরৎকালের আগে ভারতবর্ষে আসছেন না। কিন্তু তার আগেই কি কিছু বিপদ ঘটবে? ২৫ নভেম্বর জোসেফিন ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'তিনি অসুস্থ এবং গুরুতর কিছু ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। ও ইয়ুখ, তা কি ভয়াবহ হবে।...কি ভয়াবহ!!! ভাবতেও শিউরে উঠি!'

সেই দুঃসময় এল ১৮ জানুয়ারি। জোসেফিনকে নিবেদিতার চিঠি, আগেই তার চলে গিয়েছে। 'আজ সকাল ৫টায় তিনটি গোঙানি... আমরা সবাই তাঁকে ঘিরে ছিলাম, ৮টায় তাঁর দেহান্ত পর্যন্ত।' নিবেদিতা মন্ত্রোচ্চারণ করলেন, হরি ওঁ! রামকৃষ্ণ! ওঁ শান্তি।

এরপরেই জননী সারার উইল নিয়ে চরম তিক্ততা। শঙ্করীপ্রসাদ লিখেছেন, নিবেদিতার জীবনে চরম দুঃখদিন এল এরপরেই। নিবেদিতার বোন দুঃখ করেছিলেন, এই উইলই তাঁর দিদির মৃত্যুর জন্য দায়ী।

জননী সারার উইল অনুযায়ী জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং ভারতে নারীশিক্ষার জন্য অনেক টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। শঙ্করীপ্রসাদের মন্তব্য: মিসেস বুলের টাকা নেওয়ার ব্যাপারে নিবেদিতা নৈতিক সংকোচ বোধ করতেন না, তিনি মনে করতেন স্বামীজি তাঁর কর্মের অধিকার দিয়ে গিয়েছেন দু'জনের ওপর; সারা বুলের ওপরে সংস্থানের দায় এবং নিবেদিতার উপরে আন্দোলন চালু রাখার দায়।

উইলের বিবরণ জেনে কন্যা ওলিয়া ভীষণ ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট হলেন এবং তিনি উকিলের পরামর্শ নিলেন। প্রথম দিকে আইনজ্ঞ মামা ও বিবেকানন্দের অনুরাগী মিস্টার থর্পের পরামর্শ এড়িয়ে গেলেন বলে মনে হয়। ওলিয়ার সন্দেহ, অর্থের লোভে ভারতপ্রেমীরা তাঁর মাকে বিষ খাইয়েছে। কেন নিবেদিতা ভারত থেকে ছুটে এসেছেন?

শেষের শেষে এবার লাস্ট উইল অ্যান্ড টেস্টামেন্টের বেদনাদায়ক কাহিনি কৌতূহলীরা জানেন। ওলিয়ার মামলা মার্কিন গণমাধ্যমকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে এবং বিভিন্ন সাক্ষীর জবানবন্দির মারফত গেরুয়া সন্ন্যাসীদের দুর্নাম ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে, এঁরা নাকি ধনবতী মহিলাদের বিপুল সম্পদ হাতিয়ে নিতে বিশেষ তৎপর। এতদিন পরে ইচ্ছে হয়, মঠ মিশনের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করার এই তিক্ত ও কঠিন বিষয়টিকে ঠান্ডা মাথায় সংবাদপত্র এবং নথিপত্র থেকে বিশ্লেষণ করা যাক। আমেরিকাবাসী এক বিশিষ্ট বাঙালি প্রযুক্তিবিদ ও ফোরেনসিক ঐতিহাসিক এই বিষয়ে মূল্যবান কাজ করছেন। কিন্তু তাঁর সুদীর্ঘ সন্ধানের সমাপ্তির আগেই যতটুকু জানা যায় তা বলে রাখার প্রয়োজন অনুভব করছি শতাব্দীর দূরত্ব পেরিয়ে এই কঠিন সময়ে।

উইলের মামলায় নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে নিবেদিতা পিছপা হননি। এই মামলা এনেছিল তাঁর নীতিবোধের ওপর প্রচণ্ড আঘাত। এই সময়ে নিবেদিতা তাঁর দুঃখদিনের ধৈর্যময়ী সঙ্গিনী জোসেফিনকে লিখলেন (২৯ মার্চ): 'আমি ঠিক করেছি, যে পরীক্ষার মধ্যে আমাকে যেতে হবে আমি তার মুখোমুখি হব সাহসের সঙ্গে শান্ত ভাবে।'

জননী সারার ভাই বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ওলিয়ার মামাকে লেখা চিঠিপত্র খুঁটিয়ে দেখা প্রয়োজন। 'ব্যাপারটা নিরাপদ, কিন্তু সহ্য করতেই হবে।' 'এ পথ স্বামীজিই দেখিয়েছেন...বিচিত্র বিষয় আমি লক্ষ্য করছি; খ্রিস্টের বিচারের দিকে তাকিয়ে দেখো, যখন পৃথিবী তাঁকে কাঠগড়ায় তুলেছে তখন তিনিই কিন্তু পৃথিবীর বিচার আরম্ভ করেছিলেন। অতএব দৃঢ় হওয়া যাক, শিব! শিব!'

১৯০৯-১০ যে বিচ্ছেদ-ব্যথায় কাতর নিবেদিতার সবচেয়ে খারাপ দিন তা সহজেই বলা যায়। জানুয়ারি ১৯০৯তে তাঁর গর্ভধারিণী জননীর মৃত্যু। পরের বছর জানুয়ারিতে চলে গেলেন বহু আদরের মাতৃস্বরূপা সারা বুল, ফেব্রুয়ারিতে প্রিয় বন্ধু ও সহকর্মী স্বামী সদানন্দ, জুলাইয়ে স্বামীজির গর্ভধারিণী ভুবনেশ্বরী দেবী এবং পরের মাসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, সবার কাছে যিনি শশী মহারাজ বলে পরিচিত।

এরই মধ্যে জননী সারার জন্য চোখের জল ফেলা। নিবেদিতা তাঁর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন, ভেবেছেন একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনীও লিখবেন এই আশ্চর্য রমণী সম্বন্ধে। সারার ভাই থর্পের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল, ইনিই মামলায় নিবেদিতার স্বার্থ দেখতেন বলে জানাচ্ছেন শঙ্করীপ্রসাদ। থর্পের স্ত্রী যে কবি লংফেলোর কনিষ্ঠা কন্যা তা ভক্তমহলে সুপরিচিত। নিবেদিতা যদি জননী সারার জীবনী রচনা করেন তবে ইংলন্ডে সুশিক্ষিতা এই আমেরিকান মহিলার সহযোগিতা প্রয়োজন।

মামলার দৈনিক বিবরণ দিয়ে খবরের কাগজের যে সব রিপোর্ট জোসেফিন তাঁকে পাঠাতেন তা ভীষণ কষ্ট দিত নিবেদিতাকে। অসহ্য সেইসব কাটিং না পাঠাবার জন্য নিবেদিতা অনুরোধ করেছিলেন প্রিয় জোকে। নিবেদিতার স্বীকারোক্তি— কাগজের টুকরোগুলো ভয়াবহ মুহূর্ত এনে দেয়। প্রতিটা উল্লেখ যন্ত্রণা বাড়ায়। কারণ স্বামীজির নাম ও শিক্ষাকেও কালিমালিপ্ত করার যথেষ্ট চেষ্টা উকিলরা করেছিলেন আদালতে।

এতদিন পরে মনে ছিল আশা এই সব সংবাদ কাটিং পাশাপাশি সাজিয়ে এই মামলার একটা পাঠযোগ্য বিবরণ একালের পাঠকদের হাতে তুলে দেব। কিন্তু সে কাজে এখনও হাত দেওয়া হয়নি। মার্কিন সংবাদপত্রের রিপোর্ট প্রায়শই এদেশের ধর্মপ্রচারকদের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত এমন কথা শুনে আসছি এবং এদেশের বক্তব্য সম্বন্ধে কেউ বলবার ছিল না এমন কথাও শুনে আসছি। এদেশের জনসংযোগ গবেষকরা এক সময়ে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নজর দেবেন আশা করি।

সুখের কথা, আমেরিকান সন্ন্যাসিনী ও গবেষিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা তাঁর সংগ্রহ থেকে মাতা-কন্যার মান-অভিমানকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে যে ঝড় উঠেছিল তার কিছু নমুনা আমাদের উপহার দিয়েছেন। ১৯১৭-তে প্রকাশিত এই সংগ্রহ অবশ্যই আংশিক, কিন্তু তাও আমাদের নজরে পড়েছে বলে মনে হয় না।

শঙ্করীপ্রসাদও প্রয়াত জননী সারা ও জীবিতা কন্যার এই বিস্ফোরক সংঘাতের মধ্যে তেমনভাবে ঢোকেননি, যদিও কবিকন্যা লংফেলোকে লেখা নিবেদিতার চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সারার জীবনীরচনা প্রসঙ্গে। 'যদি এই বই হয়, ওলিয়া সম্বন্ধে নিষ্ঠুর নগ্ন সত্য তাতে থাকবেই।' নিবেদিতার

মূল্যায়ন— বিধবা সারা তাঁর অর্থকে অপরের সাহায্যে নিয়োগ করে নিজের বৃহৎ শোকের মাধ্যম করে তুলেছিলেন। এর থেকেই তো তাঁর প্রাচ্যচিন্তার সঙ্গে যোগাযোগ।

শঙ্করীপ্রসাদ জানিয়েছেন, এই চিঠি লেখার পাঁচসপ্তাহের মাথায় ১৩ অক্টোবর, নিবেদিতার দার্জিলিং-এ দেহত্যাগ। তাঁর সিদ্ধান্ত, শেষের চিঠি থেকে 'এই নিষ্ঠুর সত্যটি আমাদের কাছে ধরা পড়ছে সারা বুলের উইলের মামলাই নিবেদিতার অকালমৃত্যুর হেতু।'

অস্বস্তিকর ও দুঃখজনক হলেও মার্কিন সংবাদপত্রের আংশিক প্রতিবেদন পাঠকের কাছে নিবেদন করছি। জননী সারার ভাই জে জি থর্পের ৫ অক্টোবর ১৯১১ সংবাদপত্রে একটা চিঠিতে ভ্রমসংশোধন প্রচেষ্টায় লিখেছিলেন, কাগজে প্রায়ই বলা হচ্ছে, সারা বুল তাঁর উইলে তাঁর পাঁচ লক্ষ ডলার সম্পত্তির বেশিরভাগ 'হিন্দু মিশনারিদের দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি এদের এক ডলারও দিয়ে যাননি। তিনি তাঁর ইংরেজ বান্ধবী, লেখিকা ও শিক্ষিকাকে তিরিশ হাজার ডলার দিয়ে গিয়েছেন ভারতবর্ষে নারীশিক্ষার জন্য। স্বামী সারদানন্দকে সেবা ও ধর্মীয় কাজের জন্যে ৫০০০ ডলার। একজন আইনজ্ঞকে ৫০০ ডলার। তাঁর উইলের এগজিকিউটরদের অনুরোধ করেছেন, প্রয়োজন বোধ করলে কলকাতার বিজ্ঞানী ডঃ জগদীশ বসুর গবেষণা কর্মে সাহায্যের জন্যে ২০,০০০ ডলার দিতে। অতএব দেখা যাচ্ছে, যাঁদের তিনি মোট ৫৫,০০০ ডলার দিয়েছেন তাঁদের কেউ হিন্দুমিস্টিক নন।

উইল নাকচের মামলায় ওলিয়া ভন-এর আইনজ্ঞ ছিলেন অ্যাটর্নি শারম্যান হুইপল ও রালফ কার্টলেট। আদালতে তাঁদের নিবেদন, এই উইল অন্যায়ভাবে তৈরি করা হয়েছে এমন সময়ে যখন সারার মানসিক সুস্থিরতা ছিল না। যখন তাঁর মস্তিষ্ক সজাগ নয় সেই সময় যে মিস মার্গারেট নোবল এই উইল ডিকটেশন দেন তিনি এখন কলকাতায়।

২৬ জুন ১৯১১ দ্য আমেরিকান সংবাদপত্রের মন্তব্য: ওলিয়া বুলের উকিলদের হাতে সংখ্যাহীন দলিলপত্র রয়েছে।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে দুইপক্ষের মধ্যে আপোষের চেষ্টা চলছে, যাতে মামলা তুলে নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আশা যায়। প্রবুদ্ধপ্রাণার নতুন সংগ্রহে এই ধরনের সংবাদ-রিপোর্ট নেই। কিন্তু এক বন্ধু আমাকে কেমব্রিজ ক্রনিকল-এর (২২ জুলাই ১৯১১) সুদীর্ঘ রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। সুবৃহৎ শিরোনাম: আপোষ মীমাংসার দিনেই মিসেস বুল ভন-এর মৃত্যু। বিচারপতি হবস মঙ্গলবার রায় দিলেন, মিসেস ওলি বুলের উইল না-মঞ্জুর করে। আদালতের বাইরে দুই পক্ষের এগ্রিমেন্ট মেনে নিলেন দুই পক্ষের স্বার্থের কথা ভেবে।

সুদীর্ঘ এই রিপোর্টের শুরু: বিচারপতি হবস যেদিন ওলিয়া ভনের পক্ষে রায় দিয়ে তাঁর মা সারা বুলের উইলকে নাকচ করলেন সেদিনই ওয়েস্ট লেবাননে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তাঁর মেয়ে ওলিয়া ভন। রায়ের আগেই তাঁর দেহাবসান। নতুন এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী ওলিয়া ভন ফেরত পাচ্ছিলেন তাঁর মায়ের পাঁচ লক্ষ ডলার সম্পত্তির একটা বড় অংশ। মিসেস বুলের মৃত্যুর (১৮ জানুয়ারি) পর দেখা যায় তিনি তাঁর একমাত্র সন্তানের জন্য, বাৎসরিক সাড়ে তিন হাজার ডলার ছাড়া প্রায় কিছুই রেখে যাননি। তাঁর উইলে মিসেস বুল রেখে গিয়েছেন ৩০,০০০ ডলার নিবেদিতার জন্য। শোনা যায় তিনি এখন ইন্ডিয়ায়, ডক্টর জগদীশ চন্দ্র বসু পাবেন ২০০০০ ডলার। এই উইলকে বেআইনি ঘোষণা করার জন্য ওলিয়া বুল ভন প্রোবেট কোর্টে আবেদন করেন এবং শেষপর্যন্ত দুই পক্ষের মধ্যে আপোষ মীমাংসা হয় যাতে ওলিয়া তাঁর মায়ের সম্পত্তির প্রায় সবটাই পাবেন।

সারা বুল চেয়েছিলেন, তাঁর চিতাভস্ম যেন প্রয়াত স্বামী ওলি বুলের সমাধিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। নরওয়ের খ্রিস্টান রীতি অনুযায়ী এই ইচ্ছা পালন করা যাবে কি না তা এখনও অনিশ্চিত। ওলিয়া ভনের একমাত্র সন্তানের মৃত্যুর পর তিনি দুটি মেয়ে এবং একটি ছেলেকে দত্তক নিয়েছিলেন, এদের বয়স ১৩,১২ এবং সাড়ে তিন। ওলিয়ার উইলে, আশা করা যাচ্ছে, তাঁর উকিল ও বন্ধু রলিফ বার্টনেট মোটা অর্থ পাবেন বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে।

বেহালাবাদক ওলি বুলের মৃত্যু ১৭ আগস্ট ১৮৮০, কিন্তু তিনি তেমন কিছু রেখে যাননি। জীবনকালে তিনি অনেক অর্থ উপার্জন করেছিলেন, কিন্তু পেনসিলভেনিয়ার পটার কলোনিতে নরওয়েজিয়ানদের জন্য এক বসতি স্থাপন করতে তিনি দশ লক্ষ ডলার খরচ করেন। ১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দ যখন শিকাগো বিশ্ব ধর্মসভায় আসেন তখন তাঁর সঙ্গে সারা বুলের পরিচয় হয়। তখনই তিনি রাজযোগে আকৃষ্ট হন। তিনি অনেকবার ভারতবর্ষে যান এবং সেখানে অনেক টাকা দান করেন। মিসেস ওলিয়া ভনের জন্ম ৪ মার্চ ১৮৭১, তাঁর একমাত্র সন্তানের মৃত্যু ২৪ জুলাই ১৮৯৮।

এদিকে আমাদের ভারতবর্ষেও তখন নানা অঘটন ঘটছে। জুলাই ১৯১১ স্বামীজির গর্ভধারিণীর শেষযাত্রায় নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন। অক্টোবরে তিনি জগদীশ বসু পরিবারের সঙ্গে দার্জিলিং-এর রায় ভিলায় রয়েছেন। ওইখানেই শতদুঃখে জর্জরিতা মার্গারেট অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং নিজেও তাঁর শেষ উইল রচনা করলেন। রেখে গেলেন তাঁর সর্বস্ব এদেশের মেয়েদের শিক্ষার জন্য। ১৩ অক্টোবর ভোর আড়াইটের সময় তিনি বললেন, তরী ডুবছে। তার কয়েক ঘণ্টার পরেই মর্তের বন্ধন কাটিয়ে তিনি অমৃতপথের যাত্রী।

এইভাবেই শেষ হল সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, তাঁর সাগরপারের আমেরিকান জননী সারা চ্যাপম্যান বুল ও মানসকন্যা নিবেদিতার তুলনাহীন জীবনকথা।

শেষের পরেও একটা শুরু থাকে আমাদের এই পৃথিবীতে। জগদীশচন্দ্রের স্বপ্নের বসু বিজ্ঞান মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ৩০ জানুয়ারি ১৯১৭। প্রথমে তিনি স্থির করেছিলেন, মিসেস সারা বুলের মৃত্যুদিনে এই মন্দিরের উন্মোচন করবেন। তা হয়নি, কারণ তাঁর সহযোগীদের মনে হয়েছিল, মৃত্যুর চেয়ে জীবন বড়।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে নিবেদিতার যে মূর্তিটি জগদীশচন্দ্র স্থাপন করেছিলেন তার নাম— 'লেডি অফ দ্য ল্যাম্প' অর্থাৎ দীপরূপিণী। কোথাও নিবেদিতা অথবা সারা বুলের উল্লেখ নেই। কিন্তু মাতৃরূপিণী ও ভগ্নীরূপিণীদের বৃত্তান্ত শেষ করার আগে বিজ্ঞানী বশীশ্বর সেন নিবেদিতার জীবনীকার লেজেল রেমঁকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার থেকে উদ্ধৃতি না দিয়ে এই লেখার শেষ টানতে পারছি না। আলমোড়া থেকে ২১ জুন ১৯৩৯ রেমঁকে বশীশ্বর লিখেছিলেন, আমি দার্জিলিং থেকে নিবেদিতার চিতাভস্ম কলকাতায় নিয়ে এসেছিলাম। এর একটা অংশ বেলুড়ে রয়েছে, আর একটা আমার ক্ষুদ্র মন্দিরে ৮ নম্বর বোসপাড়া লেনে। বসু বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনের সময় জগদীশচন্দ্র বললেন, একটা অংশ বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আনা যায় কি না। ফোয়ারার নিচে ছোট্ট একটি পেটিকায় নিবেদিতার রিলিফ

মূর্তির তলায় আমি রেখে দিলাম। জগদীশচন্দ্রের স্ত্রী অবলা বসু ছাড়া বিশ্ব সংসারের কেউ এই ব্যাপারটা জানে না।

দুই আশ্চর্য বিদেশিনির স্নেহস্পর্শের কথা ভেবেই, আচার্য জগদীশচন্দ্র এই সময়ে যা বলেছিলেন তা আর একবার মনে করে এই পর্বের ইতি টানতে চাই। 'সর্বজাতির সব নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকবে, এখান থেকে প্রকাশিত আবিষ্কার সমস্ত জগতের সম্পত্তি হবে, এখান থেকে কোনো পেটেন্ট নেওয়া হবে না, কারণ, আমি মনে করি, জ্ঞান দেবতার দান, অর্থ উপার্জনের পথ নয়।'

এই রচনার শেষে বিবেকানন্দের বিদেশিনি জননী সারা চ্যাপম্যান বুলকে আর একবার প্রণাম।

বিদেশে চতুর্থ জননী শার্লট সেভিয়ার

শেষ হয়েছে সারা চ্যাপম্যান বুলের অমৃতকথা, যাঁকে কেউ কেউ স্বামীজির আমেরিকান মাদার বলেছেন।

এরপরেও একজন আছেন, জীবনের শেষপর্বে তিনি বিবেকানন্দের ব্রিটিশ মাদার। তিনিই তুলনাহীনা শার্লট সেভিয়ার, নিতান্তই লজ্জাবতী, স্বল্পভাষিণী কিন্তু অফুরন্ত স্নেহে ভরা জননী যিনি বহুযত্নে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সংক্ষিপ্তজীবনের শেষ কটি বছর অবিশ্বাস্য এবং নিঃশব্দ ভালোবাসায় পূর্ণ করে রাখবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং সন্ন্যাসী সন্তানকে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। যাঁরা কিছু খবর রাখেন তাঁরা বলেন, আমেরিকান মাদার সারার সঙ্গে স্বামীজির যখন দেখা তখন তিনি বিধবা, অর্থাৎ বিবেকানন্দ পিতৃহীন, কিন্তু মহাসাগরের ওপারে...ইংলন্ডে বিবেকানন্দ একই সঙ্গে পেয়ে গেলেন পিতা ও মাতা সেভিয়ারকে।

সপ্তম জননী সম্বন্ধে অনেক কথাই বলতে হবে যা আজও তেমন প্রচারিত বা প্রচলিত নয়, খোঁজ করতে হবে কেন সেভিয়ার দম্পতির সন্তানস্নেহ ও নিঃশব্দ ত্যাগ সম্বন্ধে আজও মানুষ তেমন কিছু জানে না?

হিসেব করলে দেখা যাচ্ছে, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সপ্তজননীর তিনজন ইন্ডিয়ান, তিনজন আমেরিকান এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, একজন ব্রিটিশ।

স্বামীজির ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন, লন্ডনে স্বামীজি একদিন আমেরিকান ও ব্রিটিশ নারীর তুলনামূলক বিচার করে বলেছিলেন, 'আমেরিকান মেয়েরা কি চটপটে! তারা মেয়ে নয়, যেন মদ্দ। এই বাজার যাচ্ছে, জিনিস কিনছে, হিসাব রাখছে, ব্যাংকে যাচ্ছে, টাকা ভাঙিয়ে আনছে। এই বাসে চড়ে গাড়ি করে— এখানে যাচ্ছে, ওখানে চলেছে। কি চমৎকার চটপটে। পুরুষগুলোকে হার মানিয়ে দিচ্ছে। মেয়েলি ভাব এদের মধ্যে এতটুকু নেই, সব যেন মদ্দ, আর সেই হিসেবে ইংলন্ডের মেয়েগুলো যেন ঢিব্‌সি!'

মহেন্দ্রনাথ প্রায় একই সঙ্গে ব্রিটিশ মেয়েদের সম্বন্ধে স্বামীজির মতামত লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। খোদ লন্ডনে বসে স্বামীজি প্রফুল্ল মনে তামাক খেতে খেতে বলছেন 'ইংলন্ডের মেয়েগুলো কি ষণ্ডা! রাস্তায়, পথে সর্বত্রই তাঁরা কেমন মরদের মত চলাফেরা করে কাজ করে। ওদের মাংসপেশীগুলোও খুব শক্ত। এরা যেন জাতের সুস্বাস্থ্যের নমুনা। তাই এদেশে যত ছেলে জন্মায়, তারা এত তেজস্বী ও বলবান হয়। ২৫/৩০ বছরের আগে এরা বে করবে না। শরীর বেশ সুস্থ রাখবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করে। এইজন্যে এদের মেয়েগুলোও এত সবল ও তেজী হয়।'

পাশ্চাত্যের মেয়েদের প্রশস্তি স্বামীজি শুরু করেছেন, ভ্যাংকুভার থেকে ট্রেনে শিকাগো যাবার পথে ক্যাথারিন স্যানবর্নের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই। আমরা জানি, এই কেট স্যানবর্নকেই স্বামীজি বিদেশের মাটিতে প্রথম মাতার আসনে বসিয়েছিলেন।

আমেরিকায় পদার্পণের প্রথম পর্বেই পশ্চিমি মেয়েদের গুণমুগ্ধ বিবেকানন্দ মন খুলে প্রশস্তি গেয়েছিলেন অতুলনীয় বাংলায়। আমেরিকায় তাঁর দ্বিতীয়া জননী মিসেস জর্জ হেল-এর ৫৪১ ডিয়ারবর্ন অ্যাভিনিউ থেকে (১৯ মার্চ ১৮৯৪) স্বামীজি তাঁর প্রিয় শশী মহারাজকে নিপুণ বাংলায় লিখছেন, 'এদেশের মেয়ের মতো মেয়ে জগতে নেই। কি পবিত্র, স্বাধীন, স্বাপেক্ষ, আর দয়াবতী— মেয়েরাই এদেশের সব। বিদ্যে বুদ্ধি সব তাদের ভেতর। যিনি পুণ্যবানদের গৃহে স্বয়ং লক্ষ্মীরূপিণী এদেশে, আর পাপাত্মাগণের হৃদয়ে অলক্ষ্মী স্বরূপিণী আমাদের দেশে, এই বোঝ। হরে হরে, এদের মেয়েদের দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম। ...এদেশের বরফ যেমনি সাদা, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে আছে যাদের মন পবিত্র। ...আরে দাদা, যেখানে স্ত্রীলোকেরা পূজিতা হন, সেখানে দেবতারাও আনন্দ করেন, মনু বলেছেন।'

এবার শুরু করা যাক ইংলন্ডের মেয়েদের কথা। আমেরিকায় বেশ কিছু সময় কাটিয়ে স্বামীজি একবার ইংলন্ডে গিয়েছিলেন অনবরত বক্তৃতায় ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীরকে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম দিতে। ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'দুই-একমাস পরে তিনি আবার আমেরিকায় চলিয়া যান। ১৮৯৬ সালের মে মাসে দ্বিতীয় বার বিলেতে এসে মিস্টার স্টার্ডির বাড়িতে কিছুদিন অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বামী সারদানন্দও এই সময়ে স্বামীজির নির্দেশে লন্ডনে হাজির হন।'

ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন, সারদানন্দ কলকাতা ত্যাগের সপ্তাহ পরে তিনিও ব্যারিস্টার হবার বাসনায় লন্ডনে হাজির হন। প্রবাসে ভাইকে আচমকা দেখে স্বামীজি বিস্মিত হন এবং খেতড়ি রাজের অর্থসাহায্যে তিনি টিকিট কিনেছেন জেনে বেশ অস্বস্তি বোধ করেন। তবুও ভাইকে একটা দামী ফাউনটেন উপহার দেন, যা পরবর্তী সময়ে ডাক বিভাগের কল্যাণে অদৃশ্য হয়। সেই সময়ের বিবেকানন্দ মাথার মাঝখানে সিঁথি কাটেন, পরিধানে কালো রঙের ইজের, কালো রঙের ভেস্ট এবং গলায় কলার, কিন্তু টাই ছিল না। পকেট থেকে পাঁচ পাউন্ড বার করে জনৈক মেলনের সঙ্গে ভাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিলেন। স্বামীজি ও সারদানন্দ তখন মিস হেনরিয়েটা মুলারের অতিথি, বাড়তি ঘর না থাকায় মহেন্দ্রনাথ পাশের একটি বাড়িতে উঠলেন, তবে 'সর্বদাই তিনজনে একত্রে থাকতেন'। সেই সময় চিঠি এল রাখাল মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) পূর্বাশ্রমের পুত্র সত্যের মৃত্যু হয়েছে এবং সেই খবর পেয়ে স্বামীজি ব্যথিত ও বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন। খবর শুনে স্বামীজি বললেন, মানুষ জগতের সব সহ্য করতে পারে কিন্তু পুত্রশোক সহ্য করতে পারে না। ছেলেটি বেঁচে থাকলে তাকে মঠে নিয়ে নেবার পরিকল্পনা ছিল স্বামীজির।

কী ছিল বিধাতার মনে, এই মে মাসেই সেভিয়ার দম্পতি এসেছিলেন লন্ডনে স্বামীজির বক্তৃতা শুনতে। প্রথম শ্রবণ ও দর্শনে তাঁরা মুগ্ধ এবং ক্রমশ গড়ে উঠল অনন্য সম্পর্ক। পরবর্তী সময়ে 'মাদার অফ মায়াবতী'র লেখিকা অমৃতা সালম লিখেছেন, এই সময়ে ৬৩ নম্বর সেন্ট জর্জেস রোডের ছোট একটি হলে স্বামীজি বক্তৃতা করতেন, সেখানে ১০০

থেকে ১৫০ লোকের স্থান হত। এই পাঁচতলা বাড়িতেই স্বামীজি খুঁজে পেলেন তাঁর ব্রিটিশ জননীকে।

এই সময় স্বামীজির ক্লাশ চলত ঘণ্টা দেড়েক ধরে এবং প্রায় একই সঙ্গে পিকাডিলির রয়াল ইনস্টিটিউটেও বসতো স্বামীজির সভা। লেখিকা অমৃতা সালামের ধারণা, সেভিয়ার দম্পতি দুজায়গাতেই স্বামীজির বক্তৃতা শুনতে আসতেন। এই দম্পতির পুরো নাম ক্যাপটেন জেমস হেনরি সেভিয়ার (১৮৪৫-১৯০০) এবং শার্লট সেভিয়ার (১৮৪৭-১৯৩০)। স্বামীজি এই ব্রিটিশ দম্পতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে একসময় লিখেছিলেন, 'জুয়েল অফ এ লেডি এই মিসেস সেভিয়ার— এতো ভালো, এতো দয়ালু।' তিনি আরও স্বীকার করেছেন, 'যখন প্রচণ্ড শীত তখন এঁরা আমায় জামা-কাপড় পরিয়েছেন। আমার গর্ভধারিণীর চেয়েও ভালোভাবে সেবা করেছেন, আমার দুর্বলতাগুলো জেনে সহ্য করেছেন, এবং আমাকে আশীর্বাদ করা ছাড়া তাঁদের আর কিছু নেই। মিসেস সেভিয়ার সম্মান বা স্বীকৃতির তোয়াক্কা করেন না, এবং যখন তিনি দেহরক্ষা করবেন তখন জানা যাবে দরিদ্র ভারতবাসীদের কত আপনজন ছিলেন তিনি।'

• বিদেশে চতুর্থ জননী শার্লট সেভিয়ার

সম্প্রতি অদ্বৈত আশ্রম থেকে 'মাদার অফ দ্য অদ্বৈত আশ্রম' নামে যে বই বেরিয়েছে তাতে রয়েছে স্বামীজির সপ্তম জননী সম্বন্ধে নানা অজানা সংবাদ। মুখবন্ধে লেখিকা উল্লেখ করেছেন, উনিশ শতকের ব্রিটিশ রমণীদের অস্থির জীবনসংগ্রামের কথা। সেইখান থেকে কিছু উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শার্লট এলিজাবেথ লিংউডের জন্ম ১৮ অক্টোবর ১৮৪৭, মাতা মেরি স্ট্যানটন ও পিতা ইংলন্ডের রবার্ট সোল লিংউড।

শার্লটের মানসিকতা ও আত্মত্যাগ ঠিক মতন বুঝতে গেলে বিশেষ প্রয়োজন উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত ইংরেজ মহিলাদের উত্থান-পতন সম্পর্কে জানা। এর আগে ইংলন্ডের মেয়েরা খুব একটা এগিয়ে ছিল না, তাঁদের কাছ থেকে সমাজের প্রত্যাশা 'চেস্টিটি অ্যান্ড ওবিডিয়েন্স', যার সোজা বাংলা সতীত্ব এবং বশ্যতা। পুরুষদের কাছ থেকে সেযুগে যা প্রত্যাশিত ছিল তা হলো মানসম্মান ও সাহস। ইংরেজ মেয়েদের শ্রেষ্ঠ স্থান তখনও গৃহকোণ। বিবাহিত মেয়েদের ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর এবং ১৮৮২ সালের আইনের আগে মেয়েদের স্ত্রীধন অবশ্যই স্বামীর সম্পত্তি। স্ত্রী কিছু রোজগার করলেও তাতে স্বামীর অধিকার। এর আগে ১৮৫৭ সালে আইন করে ডাইভোর্সের অধিকার, কিন্তু সেই আইনের সুযোগ নিতে খরচ অনেক, অর্থাৎ বড়লোকরাই কেবল খরচাপাতি করে বিবাহবিচ্ছেদের সুবিধা নিতে পারেন।

আরও জানা যাচ্ছে, উনিশ শতকে ইংলন্ডে পুরুষের তুলনায় মেয়ের সংখ্যা অনেক বেশি, ফলে বহু মেয়েকে বাবা-মায়ের সংসারে থেকে যেতে হত। তারপর সত্তরের দশকে টাইপ রাইটার ও টেলিফোনের আশীর্বাদে অনেক ঘরের মেয়ে, কাজের মেয়ে হয়ে কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত শুরু করল তারপরের দশকে প্রাইমারি শিক্ষা আবশ্যিক হওয়ার সুযোগে মেয়েদের অনুপ্রবেশ ঘটল শিক্ষিকা হিসেবে। এই সবই ঘটেছে যখন শার্লট বড় হয়ে উঠছেন। উনিশ শতকের শেষার্ধেই বিলিতি মধ্যবিত্তের বিস্তার ১% থেকে ২%। এই সময়েই মেয়েদের হোয়াইট কলার কাজেকর্মে প্রথম যোগ দেওয়া।
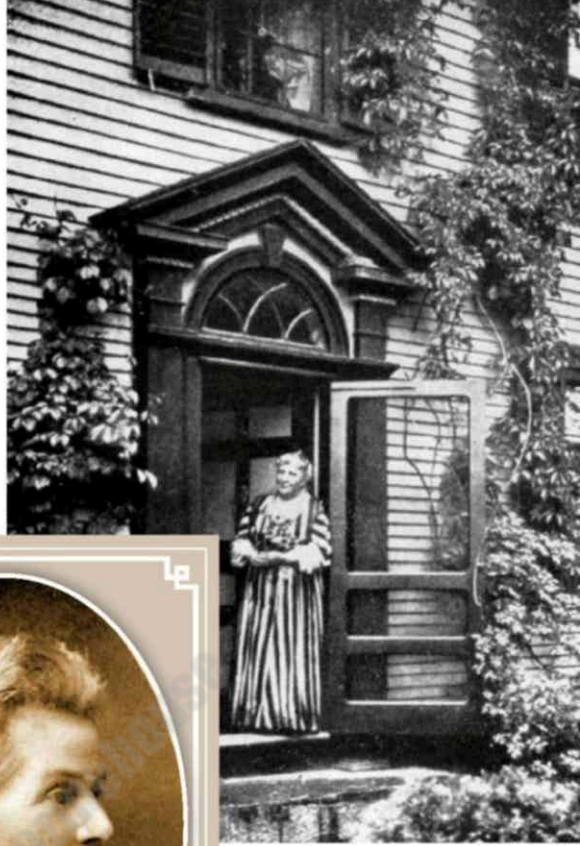
এমনই উত্তাল সময়ে প্রখ্যাত অ্যাটর্নির মেয়ে শার্লট লিট্রেড নিজের জায়গা ছেড়ে লন্ডনে এসে হাজির হলেন। তখন বাইসাইকেল এসে গিয়েছে এবং এই সাইকেলের দৌলতে ঘরবন্দি মেয়েরা স্বাধীনভাবে চলাফেরার স্বাদ পেল। যাকে এক কথায় বৈপ্লবিক বলা হয়েছে।

খোঁজখবর নিয়ে জানা যাচ্ছে ১৮৪১-১৮৫৫-র মধ্যে শার্লট জননী মেরি লিংউড দশটি ছেলেমেয়ের জননী হয়েছিলেন, এর মধ্যে শার্লটের জন্ম ১৮ অক্টোবর ১৮৪৭ সালে। মনে রাখা ভালো, আমাদের স্বামীজির জন্ম ১৮৬৩।

সেকালের তুলনায় শার্লটের বিয়ে হয়েছিল একটু দেরিতে, ২৯ বছর বয়সে। এই বিবাহ সম্বন্ধ করে না পছন্দ করে তা

নিয়ে কিছুটা সন্দেহ আছে। লেখিকা অমৃতা জানাচ্ছেন, পরস্পরকে পছন্দ করে বিবাহের যথেষ্ট সম্ভাবনা, কারণ শার্লট তখন লন্ডনে সিংগল উয়োম্যানের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত।

শার্লটের প্রিয় স্বামী জেমস হেনরি সেভিয়ার সম্বন্ধে কিছু জেনে রাখাও মন্দ নয়। এঁদের জমিদারের বংশ, অর্থাৎ ইংলন্ডে অনেক স্থাবর সম্পত্তির মালিক। এঁর জন্ম এসেক্সে, ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৫। তখনকার অনেকেই টাকা দিয়ে সৈন্যবাহিনীতে কমিশন কিনতেন। ১৮৬৭ সালে এইপথে তিনি ওয়েলস ইনফ্যানট্রির লেফটেনান্ট হলেন। কী ছিল বিধাতার মনে, মিলিটারিতে অফিসার হিসেবে সাগরপারে ভারতে তাঁর পোস্টিং হলো এবং তিনি পাঁচ বছর ভারতে থাকলেন প্রায় নিঃশব্দে এবং এখান থেকে আবার স্বদেশে ফিরে গেলেন ১৮৭১ সালে। তখন থেকেই তাঁর পরিচয় ক্যাপটেন সেভিয়ার।

শার্লট লিংউড ও ক্যাপটেন জেমস হেনরির শুভপরিণয় ২৭ এপ্রিল ১৮৭৬। শুরু হলো সুখের সংসার। পাঁচ বছর পরে (১৮৮১) দেখা যাচ্ছে এঁরা ওয়েস্টমিনস্টার ক্যাথিড্রালের কাছে মরপেথ টেরাসে বসবাস করছেন। মিস্টার সেভিয়ার সেই সময়ে উডসেভিং কোম্পানির ম্যানেজার ও সেক্রেটারি।

এই দম্পতি যখন ইংলন্ডে স্বামীজির খবর পেলেন তখন স্বামীর বয়স ৫১ এবং শার্লটের ৪৯, কুড়ি বছরের বিবাহিত জীবন, কিন্তু কোনো সন্তানসন্ততি হয়নি। খোঁজখবর নিয়ে জানা যাচ্ছে জুন ১৮৯৬ তাঁরা স্বামীজির সঙ্গে পরিচিত হলেন, যদিও খুব সম্ভবত তার আগের মাসে থেকে এঁরা স্বামীজির বক্তৃতা সভায় উপস্থিত থাকছেন।

এই সময়কার লন্ডনে স্বামীজির বক্তৃতার কিছু বিবরণ ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দিয়ে গিয়েছেন। 'স্বামীজি সাতটার সময় খাইয়া লইলেন, কারণ আটটা সাড়ে আটটার সময় বক্তৃতা আরম্ভ হইবে। স্বামীজি বক্তৃতা ঘরে গেলেন। রাত্রির বক্তৃতায় পুরুষের সংখ্যা বেশী হইত। তাহার ভিতর অনেক পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকিতেন।' স্বামীজির বক্তৃতা শুনে একদিন সারদানন্দ স্বামী মোহিত, ঘরে ঢুকে বাঁদিকে যে কাবার্ড ছিল, সেখান থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে এক নিঃশ্বাসে খেলেন। স্বামীজি সেই সময় বললেন, 'দেখছ দেখছ, এর কাজটা দেখছ। আমি করলাম বক্তৃতা আর তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠলেন এই মানুষটি।' উত্তরে সারদানন্দ, 'আরে তোমার যা বক্তৃতার ধমক তাতে তৃষ্ণা না পেয়ে থাকে কি করে! এক গ্লাস নয়, তিন গ্লাসের তৃষ্ণা পেয়েছে।'

মহেন্দ্রনাথের বর্ণনা অনুযায়ী রবিবার ওয়াটার পেন্টিং গ্যালারিতে স্বামীজি বিদগ্ধজনদের সামনে বক্তৃতার জন্য ঘোড়াটানা বাসগাড়িতে বসে পিকাডিলিতে যেতেন। নির্বাচিত সময়ের কিছু আগে মিস্টার গুডউইন লেকচারের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতেন, 'তিনি উপস্থিত বক্তা ছিলেন, পূর্বে কিছুই চিন্তা করতেন না। এইজন্য আমেরিকায় তাঁকে বলা হতো দৈবশক্তিসম্পন্ন বক্তা— an acetor by divine right.'

নির্ধারিত সময়ে হল-এ প্রবেশ করে মঞ্চের উপর সিংহের ন্যায় ক্ষণিক পদচারণা করে মধুর ও মিষ্টকণ্ঠে স্বামীজি লেকচার আরম্ভ করতেন। তারপর এক সময় তাঁর 'চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত ও স্থিরদৃষ্টি, তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি, স্বতন্ত্র তাঁর কণ্ঠস্বর।'

মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন, বক্তৃতাকালে স্বামীজি স্থির নেত্রে উপরের দিকে কী যেন লক্ষ করতেন। কাগজে কোনও নোট লিখে রাখতেন না। একভাবে তিনি বলতেন— সম্পূর্ণ বিভোর, সম্পূর্ণ আত্মহারা। এইভাবে দেড় দুই ঘণ্টা তিনি বক্তৃতা করতেন এবং বক্তব্য শেষ হলে জলপান করে মঞ্চ থেকে নেমে আসতেন। বক্তৃতায় কী বলেছেন তা স্বামীজির মনে থাকতো না। তিনি বলতেন, এইসব লিখে রেখে দাও, আমার বেশ লাগছে।

বক্তৃতার শেষে বাসস্থানে ফিরবার আগে কোনো কোনো মুগ্ধ শ্রোতা আসতেন তাঁর সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে। এবং এইভাবেই স্বামীজির পরিচয় তাঁর ব্রিটিশ জননী ও তাঁর স্বামীর সঙ্গে। কোনো বন্ধুর কাছে থেকে তাঁরা প্রথম শুনেছিলেন এই ইন্ডিয়ান যোগী সম্বন্ধে।

এই সময়ে স্বামীজি নাকি বলতেন, ''আমি তো একটা মস্ত মূর্খ, পাগল, আমার মাথায় কি কিছু আছে রে? তবে সামনে একটা জ্যান্ত ছবি দাঁড়ায়, তার হাত মুখ নড়ে, আর আমি তাই দেখে দেখে বড় বড় করে বকে যাই! মাথা-মুন্ডু কিছুই বুঝি না। আমি যে মুখ্যু, সেই মুখ্যু।''

মিসেস সেভিয়ারের জীবনীকার একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য খুঁজে বার করেছেন। আমেরিকান বন্ধু জোসেফিন ম্যাকলাউড বিলেতে স্বামীজির এক সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানেই দেখা মিস্টার সেভিয়ারের সঙ্গে। দু'জনের পরিচয় ছিল না, তবু জোসেফিনকে একটা বক্তৃতার পরে ক্যাপটেন সেভিয়ার জিজ্ঞেস করলেন, ''আপনি কি এই তরুণটিকে চেনেন? Is he really what he seems?'' জোসেফিন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, ইয়েস।

ক্যাপটেন সেভিয়ার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ''সে ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করতে হবে এবং ওঁর সহযোগিতায় ঈশ্বর লাভ করতে হবে।''

এই কথাবার্তার পরেই ক্যাপটেন সেভিয়ার তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, ''তুমি কি আমাকে এই সন্ন্যাসীর শিষ্য হবার অনুমতি দেবে?'' হ্যাঁ, বলেই শার্লট উল্টো প্রশ্ন করলেন একইভাবে। স্বামী মজা করে বললেন, ''আমি জানি না।''

স্বামীজির ইংরিজি জীবনীকার বলছেন, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই তখন বিবেকানন্দ-মুগ্ধ। তাঁরা বলছেন, ''এই মানুষ এবং এই দর্শনের জন্য আমরা অযথা এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।''

অমৃতা তাঁর গবেষণার এক পর্বে জানাচ্ছেন, যখন স্বামীজির সঙ্গে ওঁদের প্রথম কথাবার্তা হলো তখনই স্বামীজি এই ইংরেজ মহিলাকে মা বলে সম্বোধন করেছিলেন।

আরও যা বলেছিলেন তা বিস্ময়কর। ''তোমরা ভারতবর্ষে আসবে না? আমার যা কিছু উপলব্ধি তা তোমাদের দেব।'' দূরদর্শী বিবেকানন্দ সেদিনই মানসচক্ষে সেভিয়ার দম্পতির ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন।

বিভিন্ন চিঠি সেই সময়। স্বামীজি এই ইংরেজ দম্পতিকে শিষ্য এবং শিষ্যা বলে স্বীকৃতি দিতে আরম্ভ করেছেন। স্বামীজির পশ্চিমি অনুরাগীদের সম্বন্ধে বিশাল বইতে গোপাল স্টেভিগ বলেছেন, পরিচয় হবার দুমাসের মধ্যে স্বামীজি সেভিয়ার দম্পতিদের নিমন্ত্রণে তাঁদের সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রথম সাক্ষাতেই তাঁরা সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের হৃদয় জয় করেছিলেন। এর যথেষ্ট প্রমাণ খুঁজে পাচ্ছি স্বামীজির চিঠিতেও। দ্বিতীয় ইংলন্ড ভ্রমণে স্বামীজি যখন প্রাণপাত করছেন তখনও অভিযোগ উঠেছে বিলাসিতার— সেই সময় তিনি মিস্ হেনরিয়েটা মুলার ও ই টি স্টার্ডির আতিথ্যে রয়েছেন। এই বিলাসিতার অভিযোগ কানে যাওয়ায় স্বামীজির ধৈর্য হানি হয়েছিল এবং এই সময়

তিনি নিউইয়র্ক থেকে স্টার্ডিকে যে কঠিন চিঠি লিখেছিলেন তা ভক্তজনেরা আজও পাঠ করেন এবং কপর্দকহীন সন্ন্যাসীর কঠিন কঠোর জীবনযাপন সম্বন্ধে দুঃখিত হন।

মি লেগেটের ঠিকানা থেকে (নিউইয়র্ক) এই চিঠিতে তারিখ নেই, শুধু 'নভেম্বর' লেখা। এই চিঠির বঙ্গানুবাদ পত্রাবলীতে রয়েছে।

'বিলাসতা, বিলাসিতা— গত কয়েক মাস থেকে কথাটি বড্ড বেশি শুনতে পাচ্ছি...সর্বক্ষণ ত্যাগের মহিমা কীর্তন করে ভণ্ড আমি নাকি নিজে সেই বিলাসিতা ভোগ করে আসছি। এই বিলাস-ব্যসনই নাকি আমার কাজের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, অন্তত ইংলন্ডে।'

তারপরেই সন্ন্যাসীর রোষ। 'তোমাদের সমালোচনায় আমার আর কোনও আস্থা নেই— ...স্মৃতিতে জেগে উঠছে অন্য এক দৃশ্য, সেই কথাই লিখছি। উপযুক্ত মনে করলে এ চিঠি বন্ধুদের কাছে একে একে পাঠিয়ে দিও...।'

এরপরেই নিতান্ত আপনজন সেভিয়ারদের উল্লেখ, 'ক্যাপটেন ও মিসেস সেভিয়ারের কথা বাদ দিলে ইংলন্ড থেকে আমি রুমালের মতো একটুকরো বস্ত্রখণ্ড পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। অথচ ইংলন্ডে আমার শরীর ও মনের উপর অবিরত পরিশ্রমের ফলেই আমার স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। তোমরা— ইংরেজরা আমাকে এই তো দিয়েছ, আর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছ অমানুষিক খাটিয়ে। এখন আবার বিলাস-ব্যসন নিয়ে নিন্দা করা হচ্ছে!!'

বিরক্তি এবং বেদনায় ভরা এই চিঠিতে স্বামীজি লিখছেন— 'তোমাদের মধ্যে একথা বলবার দুঃসাহস কার আছে যে, আমি খাবার, পানীয়, সিগার, পোশাক ও টাকা চেয়েছি? ...আমার কাজের জন্য তোমরা যে টাকা দিয়েছ, তার প্রতিটি পেনি সেখানেই আছে। তোমাদের চোখের সামনে আমার ভাইকে পাঠিয়ে দিতে হয়েছে। সম্ভবত মৃত্যুর প্রতীক্ষায়, কিন্তু তাকে আমি কানাকড়িও দিইনি, কারণ তা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না।'

এরপরেই সেভিয়ারদের উল্লেখ, 'আর অন্যদিকে সেভিয়ারদের কথা মনে পড়ে— শীতের সময় তাঁরা আমাকে বস্ত্র দিয়েছেন, আমার নিজের চেয়েও যত্নে আমার সেবা করেছেন, ক্লান্তি ও দুঃখের দিনে আমার সমব্যথী হয়েছেন, আর তাঁদের কাছ থেকে আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু পাইনি। সেই মিসেস সেভিয়ার মানমর্যাদার পরোয়া করেননি বলেই আজ হাজার হাজার লোকের পূজনীয়া।... তাঁরা কখনও আমাকে বিলাসিতার জন্য নিন্দা করেননি, যদিও আমার ইচ্ছা ও প্রয়োজন হলে বিলাসিতার উপকরণ যোগাতে তাঁরা প্রস্তুত।...নোংরা গর্তে অনাহারের মধ্যে রেখে যখন তোমরা আমার গায়ের মাংস তুলে নিচ্ছিলে এবং মনে ঠিক করে রেখেছিলে বিলাসিতার এই অপবাদ, সেদিনও এই লেগেট ও বুলদের দেওয়া রুটিই আমি খেয়েছি। তাঁদের দেওয়া কাপড়ই আমি পরেছি, বাড়িভাড়াটা পর্যন্ত মিটিয়েছেন তাঁরাই।'

গোপাল স্টেভিগের বইতে আরও উল্লেখ আছে, জননী সারা 'আমাকে ৮০০০ টাকা দিয়ে বলেছিলেন এটা আমার গর্ভধারিণী জননীকে সাহায্য করার জন্য, এছাড়াও শার্লট দিয়েছিলেন ৬০০০ টাকা পারিবারিক সাহায্যের জন্য।'

নতুন ব্রিটিশ মা ও বাবার উৎসাহে স্বামীজির সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি ভ্রমণ ১৮৯৬ সালের মস্ত বড় খবর। স্বামীজি এক চিঠিতে জানাচ্ছেন, তিনজন ব্রিটিশকে নিয়ে তাঁর এবারের হলিডে। সেভিয়ার দম্পতি ছাড়া তৃতীয় ইংরেজটি হলেন মিস হেনরিয়েটা মুলার যিনি একসময় বেলুড়ের জমি কেনার জন্য চল্লিশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন।

ন'সপ্তাহের এই হলিডের শুরু ১৯ জুলাই ১৮৯৬। লন্ডন থেকে শুরু করে তাঁরা প্রথমে এলেন ক্যালে বন্দরে, সেখান থেকে জেনেভা এবং মাঝখানে একদিন প্যারিসে রাত্রিযাপন। জেনেভাতে তাঁরা লেক লিমান হ্রদের সামনে এক বিখ্যাত হোটেলে ছিলেন। এই সময় ব্রিটিশ মা-বাবাকে নিয়ে স্বামীজি যে বেলুনে চড়েছিলেন তাও জানা যাচ্ছে। জেনেভাতে বেশি সময় না কাটিয়ে তাঁরা ফরাসি আল্পসে চলে এলেন যেখান থেকে মঁ ব্লাঁর নয়নাভিরাম দৃশ্য আজও সবাইকে মুগ্ধ করে। তারুণ্যের স্রোতে উৎপ্রাণিত স্বামীজি এখানে গ্লেসিয়ার ক্রশ করতে চাইলেন, এর জন্য প্রয়োজন অশ্বেতরর পিঠে তিন ঘণ্টার কঠিন যাত্রা। তাঁর প্রাণময় সান্নিধ্যে মুগ্ধ সেভিয়ার দম্পতি।

শুধু প্রকৃতি দর্শন নয়, স্বামীজি এবার আল্পসের একটি ক্রিশ্চান সঙ্ঘারাম দেখতে চাইলেন। অতএব তাঁরা চললেন লিট্‌ল সেন্ট বার্নার্ডে। আগস্টিনিয়ান ক্যাননের সন্ন্যাসীরা তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন সাত হাজার ফুট উঁচু শৈলাবাসে, এখানকার সেন্ট বার্নার্ড কুকুর জগদ্বিখ্যাত এবং শোনা যায় তাঁর ভবিষ্যৎ মঠের জন্য একটি কুকুর সংগ্রহ করতে স্বামীজি বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। এরপরের স্টপ জারম্যাট এবং সেখানে পর্বত দেখে মুগ্ধ হয়ে কিছু ফুল সংগ্রহ করে তিনি প্রিয়জনদের তা পাঠাতে শুরু করলেন।

৮ আগস্ট ১৮৯৬ স্বামীজি চিঠি লিখতে বসলেন জে জে গুডউইনকে— 'আমি এখন বিশ্রাম ভোগ করছি... বড় কাজ করতে হলে দীর্ঘকাল ধরে লেগে থাকতে হয়।... আমি তুষারপ্রবাহের কাছ থেকে তোলা গোটা কয়েক ফুল কৃপানন্দকে পাঠিয়েছি।' একই দিনে তিনি আর একটি চিঠি লিখেছিলেন স্টার্ডিকে। 'যদি সেভিয়াররা আমাকে সঙ্গে নিতে রাজি হন, তবেই আমি কিয়েল যাবো।... সেভিয়াররা মহৎ এবং সহৃদয়, কিন্তু তাঁদের বদান্যতার অযথা, সুযোগ নেবার কোন অধিকার আমার নেই।' এই চিঠিতে তিনটে পুনশ্চ আছে, '১০ই সেপ্টেম্বর আমি কিয়েলে ডয়সনের বাড়িতে উঠবো।...আমি সেভিয়ারদের সঙ্গে কিয়েল যাচ্ছি।' স্টার্ডিকে লেখা পরবর্তী চিঠির তারিখ ১২ আগস্ট— আগামী সপ্তাহে আমরা এখান থেকে জার্মানি রওনা হবো...ক্যাপটেন সেভিয়ার, মিসেস সেভিয়ার এবং আমি তোমাকে কিয়েলে আশা করব।' আরও খবর লুশার্ন থেকে লেখা ২৩ আগস্টের চিঠিতে— 'ডয়সনের কাছে যাবার দিন পরিবর্তিত হয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর হয়েছে।'

অজ্ঞাত কারণে সন্ন্যাসীর মনে তখন বিরক্তি। ২৩ আগস্ট আমেরিকান মাদার মিসেস সারা বুলকে তিনি লিখছেন, 'আমি পারিবারিক বন্ধনরূপ লোহার শিকল ভেঙেছি— আর ধর্মসঙ্ঘের সোনার শিকল পরতে চাই না। আমি মুক্ত, সর্বদাই মুক্ত থাকবো। আমার ইচ্ছা, সকলেই মুক্ত হয়ে যাক— বাতাসের মতো মুক্ত।... আর আমার কথা— আমি তো অবসর গ্রহণ করেছি বললেই চলে। জগৎ-রঙ্গমঞ্চে আমার যেটুকু অভিনয় করবার ছিল, তা আমি শেষ করেছি।' আরও একটা চিঠি রয়েছে, তারিখ ২৩ আগস্ট। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে বিবেকানন্দ জানাচ্ছেন, 'জার্মানি থেকে ইংলন্ড প্রত্যাবর্তন ২৩।২৪ সেপ্টেম্বর নাগাদ এবং আগামী শীতে দেশে প্রত্যাবর্তন।'

কিয়েল থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে স্বামীজির চিঠি মিস্টার স্টার্ডিকে— 'অবশেষে অধ্যাপক ডয়সনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।... কালকের দিনটা খুব চমৎকার কাটানো গেছে।'

ইংলন্ডে ফিরে ২২ সেপ্টেম্বর আলাসিঙ্গা পেরুমলকে স্বামীজি আরও খবরাখবর দিচ্ছেন— 'জার্মানিতে প্রফেসর ডয়সনের সঙ্গে কিছুদিন আমার খুব সুন্দর কেটেছে। তারপর দু'জনে লন্ডনে আসি। ইতিমধ্যে আমাদের দু'জনের মধ্যে খুব সৌহার্দ্য জন্মেছে। আমি শীঘ্রই তোমাকে তাঁর সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পাঠাচ্ছি।'

৭ই অক্টোবরের এক চিঠিতে জানা যাচ্ছে, সেভিয়ার দম্পতির ফ্ল্যাট থেকেই স্বামীজি চিঠি লিখছেন।

দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ জননী তাঁর সন্ন্যাসী সন্তানের জন্য ১৪ গ্রে কোর্ট গার্ডেনসে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন। এইখানে দু'মাস থেকে নতুন মা-বাবাকে নিয়ে ভারত যাত্রা ১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৬। অমৃতা লিখেছেন, এর আগে (৭ অক্টোবর ১৮৯৬) স্বামীজি সেভিয়ারদের ফ্ল্যাটে রাত্রিযাপন করতে দ্বিধা করেননি। ৬৬ ফেয়ার হ্যাজেল, হ্যাম্পস্টেডের এই ফ্ল্যাটবাড়ির ছবি তুলেছেন গবেষিকা অমৃতা। একই সঙ্গে তিনি রোমাঁ রোলাঁ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন— 'পুত্র-জননী সম্পর্ক স্বামীজির এই শার্লট সেভিয়ারের সঙ্গে। তাঁকে নিজের বাসস্থানে পেয়ে এই ব্রিটিশ দম্পতির আনন্দের শেষ নেই।'

এই সময়ে স্বামীজির মনের মধ্যে রয়েছে দেশে ফিরবার চিন্তা, তিনি চান তাঁর নতুন মা ভারতবর্ষে একটি স্থায়ী ঠিকানা তৈরি করুন। কোনো উচ্চ পর্বতমালায় হবে এই নতুন মঠের অবস্থান। সেভিয়ারদের কোনো দ্বিমত নেই। এবং যা আশ্চর্য, অতি দ্রুত তাঁদের বিলিতি সম্পত্তি বিক্রি করে সমস্ত টাকা তাঁরা স্বামীজিকে দিতে চাইলেন। অতো টাকা স্বামীজি নিতে রাজি হলেন না। জননী সেভিয়ার ততদিনে নিজের আবাসন বিক্রি করে দিয়ে ভাড়াটে ফ্ল্যাটে আশ্রয় নিয়েছেন।

ব্রিটিশ মাতা-পিতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের দেশে ফিরবার যাত্রা শুরু ১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৬। ফেরার পথে প্রিয় সন্তানকে সেভিয়ার দম্পতি ইতালি দেখালেন, কারণ এর আগে স্বামীজির ইতালি দেখা হয়নি।

প্রথমে রোম, পরে নেপলস, পম্পেই ও ভিসুভিয়াস দেখে ৩০ ডিসেম্বর তাঁরা জাহাজে চড়লেন। এডেন হয়ে কলম্বো পৌঁছনোর ইতিহাস অবিস্মরণীয়। ঘরের ছেলে বিশ্ববিজয় করে ঘরে ফেরার পথে যে ঐতিহাসিক সংবর্ধনা পেলেন তা এককথায় তুলনাহীন, প্রিয় সন্তানের এই অসামান্য স্বীকৃতি দেখে শার্লট সেভিয়ার অবশ্যই মুগ্ধ।

বজবজ হয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে যখন বিবেকানন্দ ট্রেন থেকে নামলেন তখন বিশ হাজার মানুষের জয়ধ্বনি শুনে বিবেকানন্দের ব্রিটিশ জননী নির্বাক। বিদেশ থেকে আসা যাত্রাসঙ্গীরা উঠলেন গোপাললাল শীলের উদ্যানবাটিতে— এখানে যে দুটি ছবি তোলা হয়েছিল তা বিশেষ মূল্যবান, দুটিতেই রয়েছেন সেভিয়ার দম্পতি। আলমবাজার মঠে রাত্রিযাপন করে স্বামীজি যখন গোপাললাল শীলের উদ্যানবাটিতে আসতেন তখন প্রতিদিন তাকে লাঞ্চ খাওয়াতেন স্নেহময়ী শার্লট। বিকেলে ছেলের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করতেন বিদেশিনি জননী।

কলকাতা থেকে স্বাস্থ্যোদ্ধারে দার্জিলিং গিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, তারিখ ৮ মার্চ ১৮৯৭। সেই সময় ব্রিটিশ জননী শার্লট তাঁর স্বামীকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত। সেই সময় স্বামীজির গভীর বিশ্বাস, লালমুখো সায়েবরাই এদেশের উপর প্রভাব বিস্তার করবে, কারণ হিন্দুদের কিছু অবশিষ্ট নেই, তারা মৃত!

দার্জিলিং থেকে সেভিয়াররা যে সিমলায় গিয়েছিলেন তা জানা যাচ্ছে। এবং সেখানে তিন মাস থেকে আম্বালায় প্রিয় পুত্রের সঙ্গে আবার দেখা ১২ আগস্ট। সেখানে কয়েক দিন থেকে অমৃতসরে স্বামীজির সঙ্গে। স্বাস্থ্য ভালো না থাকায় স্বামীজি দলবল নিয়ে চললেন ধরমশালা, তারপর অমৃতসরে, রাওলপিণ্ডি এবং মসরি। শার্লটের জীবনীতে লেখিকা অমৃতা একটি ম্যাপ এঁকে দিয়েছেন, এই দম্পতি ১৮৯৬-৯৯ ভারতবর্ষের কোন কোন জায়গায় গিয়েছিলেন। সেই মানচিত্রে কাশ্মীর থেকে কলম্বো কোনো জায়গাই বাদ নেই।

এই পর্বে একবার বিবেকানন্দ পত্রাবলিতে নজর দেওয়া মন্দ নয়। দার্জিলিং থেকে (২৫ এপ্রিল ১৮৯৭) ভারতী সম্পাদককে স্বামীজি বাংলায় লিখছেন, 'পাশ্চাত্য দেশে নারীর রাজ্য নারীর বল, নারীর প্রভুত্ব।' স্বামীজির ভবিষ্যৎ বাণী, কোনো তেজস্বিনী বিদুষী যদি ইংলন্ডে যান, এক এক বৎসরে অন্তত দশ হাজার নরনারী ভারতের ধর্ম গ্রহণ করে কৃতার্থ হবে। '...প্রভু জানেন, ইংলণ্ড, ইংলণ্ড, ইংলণ্ড আমরা ধর্মবলে অধিকার করবো, জয় করবো— নান্য পন্থা বিদ্যতেয়নায়'। আরেক চিঠিতে দার্জিলিং থেকে মার্কিনি ভগ্নী মেরি হেলকে স্বামীজি জানাচ্ছেন, ''আমি এখন মস্ত দাড়ি রাখছি, আর তা পেকে সাদা হতে আরম্ভ করেছে— এতে বেশ গণ্যমান্য দেখায়...হে সাদা দাড়ি, তুমি কত জিনিসই না ঢেকে রাখতে পারো! তোমারই জয় জয় করি।'

৫ মে ১৮৯৭ নিবেদিতাকে খবর দিচ্ছেন স্বামীজি, 'মিস সুভার ইতিমধ্যেই আলমোড়ায় পৌঁছেছেন। মিস্টার মিসেস সেভিয়ার সিমলা যাচ্ছেন। তাঁরা এতদিন দার্জিলিং-এ ছিলেন।' এক পক্ষকাল পরে আলমোড়া থেকে (২০ মে) রাজা মহারাজকে তিনি লিখছেন, 'তুমি ভয় খাও কেন? ঝট করে কি মরা সম্ভব? এই তো বাতি জ্বললো, এখনও সারা রাত্রি গাওনা আছে। আজকাল মেজাজটা বড় খিটখিটে নেই— আমি বেশ আছি।'

আরও দশদিন পরে (৩০ মে) আলমোড়া থেকেই প্রমদাদাস মিত্রকে স্বামীজি লিখছেন— 'বুঝেছি যে, পরোপকারই ধর্ম, বাকি যা তাও সব পাগলামো— নিজের মুক্তি ইচ্ছাও অন্যায়।'

আলমোড়া (৯ জুলাই) থেকে মিস মেরি হেলকে স্বামীজি লিখছেন, 'আমেরিকান খবরের কাগজে দেখলাম, মার্কিন মেয়েদের সম্বন্ধে আমার উক্তি সমূহের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে— তাতে আরও এক খবর পেলাম যে আমাকে এখানে জাতিচ্যুত করা হয়েছে। আমার আবার জাত হারবার ভয়— আমি যে সন্ন্যাসী।'

২৫ জুলাই ১৮৯৭ আলমোড়া থেকে আর এক বিদেশিনিকে নিজের দুঃখের কথা লিখছেন স্বামীজি— 'আমার আপনার লোকেরাই আমার পক্ষে সবচেয়ে বেশি দুঃখের কারণ হয়েছে— আমার ভ্রাতা, ভগ্নী, জননী ও অন্যসব আপনজন। আত্মীয়স্বজনরাই মানুষের উন্নতির পথে কঠিন বাধাস্বরূপ।' আর এটা খুব আশ্চর্যজনক নয় কি যে, 'মানুষ তৎসত্ত্বেও বিবাহ করবে ও নতুন মানুষের জন্ম দিতে থাকবে!!!'

২৯ জুলাই মার্গারেট নোবলকে লেখা চিঠিতে রয়েছে

যথেষ্ট সেভিয়ার সংবাদ। 'মিসেস সেভিয়ার নারীকুলের রত্নবিশেষ, এতো ভাল, এতো স্নেহময়ী তিনি। সেভিয়ার দম্পতিই একমাত্র ইংরেজ, যাঁরা এদেশীয়দের ঘৃণা করেন না,...একমাত্র সেভিয়াররাই আমাদের উপর মুরুব্বিয়ানা করতে এদেশে আসেন নি। কিন্তু তাঁদের এখনও কোনো নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী নেই, তুমি এলে তোমার সহকর্মীরূপে তাঁদের পেতে পারো এবং তাতে তোমার ও তাঁদের— উভয়েরই সুবিধা হবে।'

শৈলাবাসে নতুন মঠের প্রসঙ্গ এবার উঠছে। মুসৌরি থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে স্বামীজি লিখছেন, 'ক্যাপ্টেন সেভিয়ার বলছেন যে, তিনি জায়গার জন্য অধীর হয়ে পড়েছেন। মসূরীর নিকট বা অথবা অন্য কোন সেন্ট্রাল জায়গায় একটা স্থান যত শীঘ্র হয়— তাঁর ইচ্ছা, তাঁর ইচ্ছা যে মঠ থেকে দু'তিনজন এসে জায়গা 'সিলেক্ট' করে। তাদের মনোনীত হলেই তিনি মরী হতে গিয়ে খরিদ করে একদম বিল্ডিং শুরু করবেন, খসড়া নক্সা তিনি পাঠাবেন। আমার সিলেকশন তো এক আমাদের ইঞ্জিনিয়ার। বাকী আর যে যে এ বিষয়ে ডেকে পাঠাবে।....খুব ঠান্ডা স্থানেও কাজ নেই, বড় গরমও না হয়.... ব্রিটিশ বা গাড়োয়াল রাজ্যে জায়গা পাওয়া যাবেই। অথচ সেই জায়গায় বারমাস জল চাই, নাইবার-খাবার জন্য। এ বিষয়ে মি সেভিয়ার তোমার খরচ পাঠিয়ে চিঠি লিখছেন।'

১৫ নভেম্বর লাহোর থেকে আরও খবর রয়েছে ইন্দুমতী মিশ্রকে লেখা চিঠিতে— 'ক্যাপটেন ও মিসেস সেভিয়ার নামে যাঁহারা ইংলণ্ড হইতে আসিয়া আমার সহিত প্রায় আজ নয় মাস ফিরিতেছেন, তাঁহারা দেরাদুনে জমি খরিদ করিয়া একটা অনাথালয় করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। তাঁহাদের অত্যন্ত অনুরোধ যে, আমি যাইয়া ঐ কার্য আরম্ভ করিয়া দিই। ....দেশের লোক বরং পূর্বে আমাদের মঠে যে সাহায্য করিত, তাহাও বন্ধ করিয়াছে। তাহাদের ধারণা যে আমি ইংলণ্ড হইতে অনেক অর্থ আনিয়াছি।'

মে ১৮৯৮, স্বামীজি তখন আলমোড়ায়, দুসংবাদ এলো মাদ্রাজ থেকে প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক রাজেন আয়ার প্রয়াত হয়েছেন। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত স্বামীজি জানেন না, কীভাবে এই অতিপ্রয়োজনীয় ইংরিজি পত্রিকাটিকে রক্ষা করা যায়। অগতির গতি সেভিয়ারকে তিনি বললেন, 'সেভিয়ার, তুমি বলেছিলে ভারতের মঙ্গলের জন্য তুমি কাজ করবে। বাংলার ক্লাইমেট তোমার সহ্য হবে না। তুমি আলমোড়ায় থেকে গিয়ে প্রবুদ্ধ ভারতকে বাঁচিয়ে রাখবে? এই জার্নালের তিন হাজার গ্রাহক আছে। আমার ইচ্ছে অনুযায়ীই এই কাগজের সূত্রপাত, আমার ইচ্ছে নয় প্রবুদ্ধ ভারত বন্ধ হয়ে যাক, তুমি আলমোড়া বা কাছাকাছি কোথাও থেকে এই কাগজটিকে পুনর্জীবিত করো।' সেই কাজে ক্যাপটেন সেভিয়ার, সেই সঙ্গে প্রধান সহায়িকা বিবেকানন্দ জননী শার্লট সেভিয়ার।

আলমোড়ায় চায়ের আসরে প্রত্যহই বড় বেশি ভিড় দেখে জননী সেভিয়ার চাইছিলেন, আরও একটু নির্জন স্থানে চলে যেতে। খোঁজ শুরু হলো কুমায়ুনের বেশ কিছু জায়গায়— হিরাদুংড়ি, কালামাটি, গণনাথ, দুধপুখরা ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত পছন্দ হলো এক পরিত্যক্ত চা বাগান, নাম গ্লেন সাইন। ২৭ ফেব্রুয়ারি সিদ্ধান্ত হয়ে গেল এবং সম্পত্তি কেনার কাগজপত্র তৈরি হয়ে গেল ২রা মার্চ ১৮৯৯। এই সম্পত্তির দাম ৭৩০০ টাকা। জায়গাটার আদি নাম মাইপত। স্বামী স্বরূপানন্দ নতুন নাম দিলেন মায়াবতী— ২৫ একর বনানী, আলমোড়া থেকে ৫০ মাইল পূর্বে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬৫০০ ফুট উচ্চতা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শার্লট ও তাঁর স্বামী, সন্ন্যাসী স্বরূপানন্দকে নিয়ে মায়াবতীতে চলে এলেন নতুন মঠের প্রতিষ্ঠার জন্যে যার নতুন নাম অদ্বৈত আশ্রম।

সানফ্রানসিসকোতে ১৯০০ সালে স্বামীজি সগর্বে ও সানন্দে ঘোষণা করলেন, হিমালয় পর্বতে আমার এক পবিত্রভূমি আছে, যেখানে নির্ভেজাল সত্য ছাড়া আর কিছুরই প্রবেশ নেই। এই আশ্রমের দায়িত্বে একজন ইংরেজ এবং তাঁর নিষ্ঠাবতী সহধর্মিণী। এইখানে যেসব বালক বালিকাদের স্থান হবে যেখানে যীশু, বুদ্ধ, শিব, বিষ্ণু কারও নাম শোনা যাবে না, 'They shall learn, from the start, to stand upon their ownfeet and should be worshipped in spirit and in truth.'

লেখিকা অমৃতা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, হিমালয় আশ্রয়ে সেভিয়াররা যখন নতুন জীবন শুরু করলেন তখন তাঁদের বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে। আরও মনে করিয়ে দিয়ে অমৃতা লিখলেন, অদ্বৈত আশ্রম যখন শুরু হল তখন রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের মাত্র দুটি কেন্দ্র— বেলুড়ে ও মাদ্রাজে। আরও দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত নতুন এই নিবাস কোনো মূর্তি বা চিত্রপূজা হবে না, এমন কি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পূজাও এখানে হবে না।

অদ্বৈত আশ্রমের বিবরণ জানিয়ে একটা 'প্রসপেক্টাস' প্রকাশের ব্যবস্থা হলো, সেই সময় বিবেকানন্দ স্পষ্ট ভাষায় লিখলেন, আমার বা কার নাম উপরে ছাপা হলো তাতে কিছু এসে যায় না। মিসেস সেভিয়ারের নাম অবশ্যই আমার উপরে যেতে পারে, এই প্রসপেক্টাসে অবশ্যই যাওয়া উচিত সেভিয়ারদের নাম। বেশ কয়েকমাস পরে (জানুয়ারি ১৯০০) এই দলিলটি প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত হয়েছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নতুন পিতৃদেব ক্যাপটেন সাহেবকে 'হ্যারি' বলে ডাকতে শুরু করেছিলেন। সেই সূত্র ধরে শার্লট লিখছেন— 'হ্যারি এখন 'নিউর‍্যালজিয়া'য় ভুগছে, স্বরূপানন্দের পিঠে আঘাত লেগেছে গাছ থেকে পড়ে গিয়ে, আমরা এখানে সকলের সেবার জন্য এক বাক্স হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আনিয়েছি।' জানা যাচ্ছে, মায়াবতীতে আসবার মাসখানেকের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বিতরণের ব্যবস্থা শুরু করেছিলেন।

পিতা ও মাতা সেভিয়ারের অনুরোধে (২৩ জুন ১৮৯৯) স্বামীজি মায়াবতীতে এক সন্ন্যাসীদল পাঠিয়েছিলেন, যার মধ্যে ছিলেন স্বামী বিরজানন্দ, সচ্চিদানন্দ, বিমলানন্দ ও হরেন্দ্রনাথ।

ক্যাপটেন সেভিয়ারের স্থানীয় নাম আবার পাল্টাল, তিনি হয়ে গেলেন সবার পিতাজি। তিনি এই সময় হাল্কা গেরুয়া রঙের ধুতি পরা শুরু করলেন। আরও জানা যাচ্ছে ব্রিটিশ জননী ও পিতৃদেব এই সময় স্বামীজিকে অনুরোধ করছেন, আমাদের সন্ন্যাস দাও।

কিন্তু স্বাস্থ্যসংবাদ মোটেই ভাল নয়। নিউরালজিয়া ছাড়াও হ্যারির মূত্রাশয়ের গোলযোগ, কিন্তু তিনি তখন আলমোড়ায় গিয়ে চিকিৎসায় উৎসাহী নন।

মায়াবতীতে আসবার দেড় বছরের মধ্যে স্বামীজির ব্রিটিশ পিতা সেভিয়ার 'সেস্টাইস' রোগে অদ্বৈত আশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তিনি আমাদের পরম প্রিয় ক্যাপটেন সেভিয়ার— তারিখ রবিবার, ২৮ অক্টোবর ১৯০০। সময় দুপুর আড়াইটে। শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী হিন্দুমতে তাঁর শেষকৃত্য

সম্পন্ন হলো। মরদেহ শ্মশানে বহন করে নিয়ে গেলেন স্থানীয় ব্রাহ্মণরা।

ব্রিটিশ পিতা হ্যারির মৃত্যু সংবাদে বিচলিত স্বামীজি এক সময় তাঁর বিধবা জননী শার্লটকে দেখতে মায়াবতীতে ছুটে এসেছিলেন। তারপর এই জননী কলকাতা ঘুরে প্রথমবার জন্মভূমি ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। সেবার তাঁর জন্যে নীলাম্বর মুখার্জির বাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল। বিলেতে প্রয়াত স্বামীর বিষয় সম্পত্তির কিছু কাজ সেরে জননী সেভিয়ার গিয়েছিলেন নরওয়েতে পুত্রের আমেরিকান জননী সারা বুলের কাছে। সেবার লণ্ডনে এগারোমাস কাটিয়েছিলেন ব্রিটিশ জননী।

অমৃতা জানাচ্ছেন, শার্লট সেভিয়ার মোট একুশ বছর ভারতবর্ষে কাটিয়ে ছিলেন এবং মায়াবতীতে সাধারণ মানুষ তাঁকে ভগবতী বলে ডাকতেন। কেউ বলতেন, ইনি স্পিরিচুয়াল ডায়নামো।

লেখিকা অমৃতা ধৈর্য ধরে শার্লটের অনেকগুলি চিঠির বিশ্লেষণ করেছেন। বিবেকানন্দকে লেখা প্রথম চিঠিতে (মে ১৮৯৮) তাঁর সম্বোধন, 'মাই ডিয়ার মিসেস সেভিয়ার', ১৮ মাস পরের চিঠিতে তিনি মাদার। তিনি লিখছেন, তোমার যাতায়াতের জন্য বা যে কোনো কাজে অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই জানাবে, তুমি তো জানো তুমি কিছু চাইলে আমার আনন্দের সীমা থাকে না। এই দ্বিতীয় চিঠির শুরু— 'মাই ডিয়ার সন'।

তৃতীয় চিঠির তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০১, মাই ডিয়ার সনকে শার্লট লিখছেন, আমার সদাই প্রার্থনা তুমি যথেষ্ট খাওয়া দাওয়া করবে, 'ও আমি বলতে ভুলে গিয়েছি আমি একটা স্টোভ ও ওভেন সংগ্রহ করেছি যাতে তুমি এলে আমি ব্রেড তৈরি করতে পারি।'

পরের চিঠিতে (১০ অক্টোবর) ব্রিটিশ জননী তাঁর ছেলেকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন এবং প্রর্থনা করছেন তার সুস্বাস্থ্যের।

স্বামীজির চিঠি থেকে (৪ঠা মার্চ) জানা যাচ্ছে, মায়ের কাছ থেকে ১০০ পাউণ্ড নিয়ে তিনি সিস্টার ক্রিশ্চিনকে পাঠিয়েছেন, ভারতবর্ষে আসার জন্য।

অমৃতার মন্তব্য, স্বামীজিকে লেখা তাঁর নবম চিঠিতে মাদার সেভিয়ার জানাচ্ছেন জোসেফিন ম্যাকলাউড দু'সপ্তাহের জন্য মায়াবতীতে এসেছিলেন। এই চিঠির শেষে— 'লাভ অ্যান্ড নমস্কারস্ ফ্রম দ্য সোয়ামিজ অ্যান্ড মাইসেল্ফ, ইওর অ্যাফেকশনেটলি মাদার।'

স্বামীজির মহাপ্রয়াণের কয়েক সপ্তাহ আগে (২৬ মে ১৯০২) মাই ডিয়ার সনকে শার্লট সেভিয়ার দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন, সম্ভবত স্বামীজি তাঁর মাকেও লম্বা চিঠি লিখেছিলেন যা আজও পত্রাবলিতে নেই। ব্রিটিশ জননী বিদায়কালের আগে স্বামীজিকে লিখছেন, 'তুমি তো জানো আমি তোমার জীবনকে আনন্দময় করতে ও তোমার বোঝা হালকা করতে কি না করতে পারি। আমাদের মত, তুমি আলমোড়ায় চলে এসো, এই পরিবর্তন তোমার প্রয়োজন.., ইয়োরস্ লাভিং মাদার।'

মাদারের শেষ চিঠির তারিখ ১৫ জুন, ১৯০২। 'জেনে সুখী হলাম, তুমি এখন বেশ ভাল বোধ করছ, যদিও তোমার চোখের জন্য আমি উদ্বিগ্ন'। এই চিঠিতেই জানা যাচ্ছে, জগদীশচন্দ্র বসু মায়াবতীতে এসেছিলেন এবং তাঁর সর্দি হয়েছিল।

স্বামী শুদ্ধানন্দের পরবর্তী সময়ের মন্তব্য, তিনি কোনো সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেননি, তাই তাঁর সব স্নেহ প্রবাহিত হয়েছিল স্বামীজি এবং তাঁর শিষ্যদের প্রতি। স্বামীজির দেহাবসানের পরেও এই মাতৃত্বের ধারা সমানভাবে প্রবাহিত হয়েছিল।

সেই স্নেহপ্রবাহের ধারাটি বহু বিচিত্র এবং প্রাণস্পর্শী। ছেলেই যখন ইহলোকে নেই তখন শোকস্তব্ধা জননী তাঁর ছেলেকে মৃত্যুঞ্জয়ী করার জন্য কী কী করেছেন তা অন্য এক অনুসন্ধানের বিষয়। শুধু ব্রিটিশ জননীর এই ইতিবৃত্তের শেষ টানতে গিয়ে বলা উচিত, অদ্বৈত আশ্রমের ট্রাস্টিদের প্রথম মিটিং হয়েছিল মায়াবতীতে ২৮ জুন ১৯০৩।

জোসেফিন ম্যাকলাউড একবার মায়াবতীতে এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই রকম নিঃসঙ্গ জায়গায় তোমার একা একা মনে হয় না? বিবেকানন্দ-জননীর স্মরণীয় উত্তর— 'আমি তো সব সময় তার কথা ভাবি।'

এর পরেও আছে, কিন্তু সে তো অন্য এক পরিচ্ছেদ, যার সঙ্গে এবারের এই অনুসন্ধানের তেমন কোনো সংযোগ নেই। আমরা শুধু বলতে এবং স্মরণে রাখতে চাই, জীবনের শেষ প্রান্তে বিদেশের মাটিতে তাঁর সপ্তম জননীকে খুঁজে পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন ক্লান্ত ও রোগজর্জরিত এক সন্ন্যাসী, যাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ।

- *তৃতীয় জননী মৃণালিনী বসুর কোনও ছবি পাওয়া যায়নি।*
- *বড়জাগুলিয়ার বাড়িটির যে ছবি পাওয়া গিয়েছে তাই ব্যবহার করা হল। ছবি তুলেছেন কুমার বসু*
- *অন্যান্য ছবি অদ্বৈত আশ্রমের সৌজন্যে।*

তথ্যসূত্র: স্বামী বিবেকানন্দ— কমপ্লিট ওয়ার্কস্ ১-৯, বাণী ও রচনা ১-১০, পত্রাবলী
মহেন্দ্রনাথ দত্ত— লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ— ১-৩
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত— প্যাট্রিয়ট অ্যান্ড প্রফেট স্বামী বিবেকানন্দ
ভগ্নী নিবেদিতা— লেটার্স— ১-২, স্বামীজিকে যেরূপ দেখিয়াছি, কমপ্লিট ওয়ার্কস
ক্যাথরিন স্যানবর্ন— ইস্টার্ন অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন অ্যাডমায়ারর্স, রেমিনিসেন্সেস্
স্বামী গম্ভীরানন্দ— যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ— ১-৩
এস এন ধর— এ কমপ্রিহেনসিভ বায়োগ্রাফি অফ বিবেকানন্দ— ১-৩
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ— স্বামীজির পদপ্রান্তে, মেরি লুইস বার্ক— স্বামী বিবেকানন্দ— ১-৬, ইন দ্য ওয়েস্ট— ১-৬
স্বামী অভেদানন্দ— আমার জীবনকথা— ১-২
লিজেল রেমঁ— ভারতকন্যা নিবেদিতা
শঙ্করীপ্রসাদ বসু— স্বামী বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ— ১-৭, নিবেদিতা লোকমাতা— ১-৪
অমিত চৌধুরী— স্বামী বিবেকানন্দ ইন আমেরিকা
প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা— সেন্ট সারা ট্যানটিন
কালীজীবন দেবশর্মা— শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা অভিধান, উদ্বোধন পত্রিকা, প্রবুদ্ধ ভারত
শংকর— অচেনা অজানা বিবেকানন্দ

সমাপ্ত

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণির কালী মন্দির, অপূর্ব উদ্যান, পঞ্চবটী, পশ্চিমে প্রবাহিত গঙ্গা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দীর্ঘ সাধনার তপোভূমি। মন্দিরের পাষাণময়ীকে তিনি জাগ্রত করেছিলেন। মা কালী বালিকা হয়ে তাঁর সঙ্গে খেলা করতেন। একদিন দ্বিপ্রহরে আপনি সেখানে এসেছিলেন। এখন (২০২০) থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নিজের কথায়: 'পঞ্চবটীতলায় একদিন বসে আছি— ধ্যানচিন্তা কিছু যে করছিলাম তা নয়, অমনি বসেছিলাম। এমন সময় জ্যোতির্ময়ী নারী মূর্তি আবির্ভূত হয়ে স্থানটিকে আলোকিত করে তুলল। ঐ মূর্তিটিকে তখন যে দেখতে পাচ্ছিলাম তা নয়, পঞ্চবটীর গাছপালা, গঙ্গা সবই দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখলাম, মূর্তিটি মানুষের, কারণ তা দেবীদের মত ত্রিনয়না নয়। কিন্তু প্রেম- দুঃখ- দয়া- সহিষ্ণুতা পূর্ণ সেই মুখের মত অপূর্ব ওজস্বী গম্ভীর ভাব দেবীমূর্তিতেও সচরাচর দেখা যায় না। প্রসন্ন দৃষ্টিতে মুগ্ধ করে ঐ দেবী-মানবী ধীর পায়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে আমার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

'অবাক হয়ে ভাবছি, 'কে ইনি?' এমন সময় একটি হনুমান কোথা থেকে হঠাৎ এসে 'উ-উপ্' শব্দ করে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। আর আমার মন বলে উঠল, সীতা, জনম দুঃখিনী সীতা, জনকরাজনন্দিনী সীতা, রামময়জীবিতা সীতা! তখন 'মা' 'মা' বলে অধীর হয়ে পায়ে লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছি, এমন সময় তিনি হঠাৎ এসে এর (ঠাকুরের) শরীরের ভেতর প্রবেশ করলেন! আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলুম।'

আপনি কে? কী আপনার পরিচয়? সাধক রামকৃষ্ণ এক কথায় প্রকাশ করে দিলেন— প্রেম, দুঃখ, দয়া, সহিষ্ণুতার আকর— সীতা জনম দুঃখিনী সীতা জনকরাজনন্দিনী, রামময়জীবিতা, দেবী মানবী।

ধরার ধূলি হতে উৎসারিত, অলৌকিক এক আবির্ভাব। রাজা জনক খুব অল্প কথায় মুনিবর বিশ্বামিত্রকে জানাচ্ছেন, কি ভাবে হঠাৎ আপনাকে পেলেন— আকস্মিক প্রাপ্তি: 'অথ মে কৃষতং ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ, লাঙ্গল দিয়ে আমি কৃষিক্ষেত্র কর্ষণ করছিলাম। ক্ষেত্র শোধন করার সময় লাঙ্গলের অগ্রভাগ থেকে একটি কন্যকা উঠে এল। সীতা নামেই সে বিশেষভাবে পরিচিতা। মাটি থেকে উঠে এলেও সে আমারই কন্যা।'

সীতা শব্দটির অনেক অর্থ— লাঙ্গলের ফাল, লাঙ্গলের রেখা, শস্যের অধিদেবতা, মদিরা, স্বর্গ গঙ্গা, লক্ষ্মী, উমা। কৃষিক্ষেত্র থেকে উঠেছিলেন সেই কারণেই আপনাকে কৃষিদেবী রূপে অভিহিত করা হয়।

পৃথিবীতে মানব-শরীর ধারণ করে আপনার এই আকস্মিক আগমন এত অল্প কথায় যথেষ্ট নয়। মহাসাধক শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথ দেবকে স্মরণ করি। তিনি সবিস্তারে সেদিনের সেই দিব্যঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন—

'হের সখে যজ্ঞভূমি কর্ষণরত জনক নৃপতি
হেরিয়া সীতামুখে (লাঙ্গলের ফাল) অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা
বিস্মিত নয়নে হেরিছেন পুনঃপুনঃ।'

'একি, এ যে প্রফুল্ল পদ্মের মতো একটি কন্যা! এ কন্যা ধরাগর্ভে কেমন করে এল! এত রূপ তো মানবীতে সম্ভব নয়! ইনি কোন দেবী, আমাকে ছলনা করবার জন্য কন্যারূপ ধারণ করে ভূগর্ভে শয়ান ছিলেন। কে মা তুমি?' আপনি [illegible] নিরাভরণ।

জনকরাজার কোলে নিশ্চিন্ত সমর্পণে। রাজা আপনার রূপ দর্শন করে বিমুগ্ধ, 'মরি মরি কি মধুর হাস্য! কি সুন্দর নয়ন! ভ্রূযুগল কি মনোহর! অকলঙ্ক চাঁদের মতো মার মুখখানি অপূর্ব লাবণ্যমণ্ডিত! কি কোমল হস্তপদ! নখরগুলি শঙ্খতুল্য শ্বেতবর্ণ, গণ্ডদুটি অলক্তাভ, নয়নদুটিতে যেন কত ভালবাসা লুক্কায়িত রয়েছে। দর্শনমাত্রই আমার প্রাণ মন সবলে আকর্ষণ করে নিলে? তুমি কে মা?'

কে মা তুমি? এই প্রশ্নের কোনো সহজ উত্তর নেই। মা তুমি চির রহস্যময়ী। রহস্যের অন্তরালেই থাকো মা। তুমি ধরিত্রী-কন্যা, না অগ্নিকন্যা? আপনাদের দু'জনের বংশলতিকায় সঞ্চিত রয়েছে সুদীর্ঘ কাল। হাজার হাজার বছর। প্রথমে দেখি রঘুবীর রামচন্দ্রের বংশলতিকা: ব্রহ্মা > মরীচি > কশ্যপ > বিবস্বান > মনু > ইক্ষ্বাকু (অযোধ্যার প্রথম রাজা) > শ্রীমান কুক্ষি > শ্রীমান বিকুক্ষি > বাণ > অরণ্য > পৃথু> ত্রিশঙ্কু > ধুন্ধুমার > যুবনাশ্ব > মান্ধাতা > সুসন্ধি > ১. ধ্রুবসন্ধি ২. প্রসেনজিৎ

ধ্রুবসন্ধি > ভরত (প্রথম)> অসিত > সগর > অসমঞ্জ > অংশুমান > দিলীপ > ভগীরথ > ককুৎস্থ > রঘু > প্রবৃদ্ধ (কল্মাষপাদ) > শঙ্খণ > সুদর্শন > অগ্নিবর্ণ > শীঘ্রগ > মরু > প্রশুশ্রুক > অম্বরীষ > নহুষ> যযাতি > নাভাগ> অজ > দশরথ > ১. রামচন্দ্র ২. ভরত ৩. লক্ষ্মণ ৪. শত্রুঘ্ন।

এবার আপনার বংশলতিকা, অর্থাৎ রাজা জনকের: নিমি > মিথি > জনক (প্রথম) > উদাবসু > নন্দিবর্ধন > সুকেতু > দেবরাত > বৃহদ্রথ > মহাবীর > সুধৃতি > ধৃষ্টকেতু > হর্যশ্ব > মরু > প্রতীন্ধক > কীর্তিরথ > দেবমীঢ় > বিবুধ > মহীধ্রক > কীর্তিরাত > মহারোমা > স্বর্ণরোমা > হ্রস্বরোমা > ১.জনক ২. কুশধ্বজ। জনক > ১. কন্যা সীতা ২. কন্যা উর্মিলা।

মা! আপনার তো জগৎ-বংশ! রক্ত মাংসের কোনো মানব-মানবীর মিলনজাত সন্তান তো আপনি নন! ধরার ধূলি অঙ্গে মেখে রাজার কোলে পরম আদরের রাজকন্যা। তবু রহস্যের আড়ালে আরো রহস্য। 'রামায়ণ'— সেই মহাকাব্যে শুধুই তো 'রাম কথা'! মহর্ষি বাল্মীকি একদিন ভরদ্বাজমুনিকে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'শোনো ঋষিবর!' তমসানদীর তীরে সুন্দর সেই আশ্রম। বৃক্ষলতায় প্রভাত সূর্যের রশ্মি রেশম, বায়ু হিল্লোলে জড়াজড়ি করছে। নদীর কল্লোল, পাখির কূজন। বাল্মীকি বলছেন, 'হে প্রিয় শিষ্য ভরদ্বাজ, আমার যে-রামায়ণটি ভূলোকে প্রচলিত আছে, চব্বিশ হাজার শ্লোকবিশিষ্ট সেই কাব্যে বিশদাকারে রামচরিত কথাই বলা হয়েছে, সীতামায়ের অপূর্ব চরিত কথা চলে গেছে রামচন্দ্রের ছায়ার আড়ালে। শোনো তবে বলি— সীতা কে?'

'জানকী প্রকৃতিঃ সৃষ্টেরাদিভূতা সনাতনি। সীতা স্বর্গলক্ষ্মী, শ্রেষ্ঠা মাতা, সনাতনী মহামায়া সতী, মহাবিদ্যারূপী।' বাল্মীকি বিভোর হয়ে বলতে লাগলেন, 'রাম আর সীতার স্বরূপত কোন ভেদ নেই। যেই রাম সেই সীতা। জগতে এসেছিলেন পুরুষ ও প্রকৃতির লীলা বিস্তারের কারণে। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা। তিনি সাকার, তিনি নিরাকার। ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী মাতা স্বর্গের ঈশ্বরী। জনকরাজার গৃহে জানকী সুন্দরী।'

'ভরদ্বাজ বলতে পার রামচন্দ্র কি কারণে ইক্ষ্বাকু-কুলে অবতীর্ণ হলেন? তবে শোনো সেই কথা। সূর্যবংশের রাজা ত্রিশঙ্কু, তাঁর প্রিয়পত্নী সর্বসুলক্ষণা পদ্মাবতী। তিনি পবিত্র মনে তদ্গত চিত্তে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করতেন। মুক্ত হস্তে দানধ্যান [illegible]

নারায়ণের মন্দিরে পূজা কালে তিনি হঠাৎ একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ক্লান্তিজনিত ক্ষণনিদ্রা পূজার আসনেই। সেই নিদ্রিত অবস্থায় ভগবান তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'সাধ্বী! তুমি আমার কাছে কি বর চাও?'

রানী স্বপ্নাবস্থায় এই বর চাইলেন— 'প্রভু! অতি গুণবান, শক্তিমান এক সন্তানের জননী হতে চাই, আপনাতে যার একান্ত ভক্তি থাকবে।'

ভগবান আশীর্বাদ করে পদ্মাবতীকে একটি ফল দান করলেন।

চমকে জেগে উঠে পদ্মাবতী দেখলেন, তিনি সত্যসত্যই একটি ফল ধরে আছেন। অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন। ডাকার মতো ডাকতে পারলে ভগবান তাহলে কৃপা করেন! স্বামীর অনুমতি নিয়ে সেই দৈব ফলটি তিনি ভক্ষণ করলেন এবং যথাকালে সন্তানের জননী হলেন। যার বক্ষদেশে রয়েছে চক্রচিহ্ন। পিতা সমস্ত মাঙ্গলিক ক্রিয়া সম্পাদন করে পুত্রের নাম রাখলেন অম্বরীষ। বাল্যকাল থেকেই নারায়ণে বিশ্বাসী-শ্রদ্ধাশীল এবং মহা তেজস্বী। পিতার পরলোকগমনের পর তিনিই হলেন ইক্ষ্বাকুকুলের রাজা। রাজ সিংহাসন, রাজ্যশাসন — এসব তাঁর ভালো লাগল না। তিনি ভক্ত, ঈশ্বর বিশ্বাসী। বিষয় বিমুখ। মন্ত্রীদের ওপর রাজ্যভার অর্পণ করে চলে গেলেন তপস্যায়।

দীর্ঘ তপস্যা। স্বয়ং বিষ্ণু ভক্তের ভক্তির পরীক্ষা নেবেন। নিজের বাহন গরুড়কে ঐরাবতে রূপান্তরিত করে নিজে ধারণ করলেন ইন্দ্রের রূপ। ধ্যানমগ্ন অম্বরীষের কাছে গিয়ে বললেন, 'মহারাজ। তোমার কুশল হোক। তোমার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে আমি ইন্দ্র এসেছি, বলো কী বর চাও?'

অম্বরীষ বললেন, 'দেবরাজ! আমি সুদীর্ঘ কাল নারায়ণের ধ্যানে মগ্ন। আমি একান্ত ভক্ত। আমি শুধু তাঁরই দর্শন চাই। প্রভু! আপনি স্বস্থানে ফিরে যান। শুধু একটি অনুরোধ, আপনার ওই ঐরাবত এই আশ্রমের বৃক্ষাদির কোনো ক্ষতি যেন না করে।'

বিষ্ণু তখন নিজ মূর্তি ধারণ করে অম্বরীষকে বললেন, 'আমি এসেছি। তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট। বলো ভক্ত, তোমার কী প্রার্থনা!'

'প্রভু! আমার একটিই প্রার্থনা, ধন নয়, জন নয়, তব পদে যেন থাকে আমার চির মতি। আবার যদি আমাকে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করতে হয় তাহলে আমি যেন প্রজাদের কল্যাণে নিজেকে নিবেদন করে দিতে পারি, ধর্মের রক্ষক হতে পারি। ভক্ত অম্বরীষ স্তব শুরু করলেন,

> হে বিশ্বাত্মা শ্রীহরি,
> তুমিই জগন্নাৎ, সকলের নমস্কৃত।
> তুমি অনাদি, অনন্ত পুরুষ,
> তুমিই অনল, অনিল, রবি-শশী
> আদিদেবঃ ক্রিয়ানন্দঃ পরমাত্মাত্মনিস্থিতঃ।
> প্রভু! আমাকে রক্ষা কর।'

ভগবান নারায়ণ প্রসন্ন হয়ে ভক্ত অম্বরীষকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'রুদ্র কৃপা করে যে সুদর্শন চক্র আমাকে দিয়েছিলেন, সেই দুর্লভ অস্ত্র আমি তোমাকে দান করলাম। এই অস্ত্র তোমাকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করবে, ঋষি শাপ, শত্রু ভয়, রোগ ভয় অন্যান্য যত ক্লেশ, কোনো কিছু তোমাকে বিপর্যস্ত করতে পারবে না।'

শ্রীহরি অদৃশ্য হলেন। অম্বরীষ হৃষ্ট মনে ফিরে এলেন তাঁর রাজধানী অযোধ্যায়।

ও মা! কাহিনী যে অনেক লম্বা। বাল্মীকি বলছেন, দীর্ঘ তপস্যা সমাপ্ত করে রাজা অম্বরীষ সিংহাসনে বসলেন। রাজ্যে ফিরে এল সুশাসন। হৃষ্ট প্রজাকুল। চতুর্দিকে সমৃদ্ধির চিত্র। সবাই বলতে লাগলেন সুখে আছি, বড় সুখে আছি। রাজা অম্বরীষ সর্ব সুলক্ষণা এক কন্যার পিতা হলেন। তার নাম রাখলেন শ্রীমতী। সময় যায়। কন্যার বিবাহের বয়স হল। আর ঠিক সেই সময় দেবর্ষি নারদ ও পর্বতমুনি রাজ দরবারে এসে হাজির। 'কী সৌভাগ্য আমার!' যথাবিধ অর্চনা করে রাজা বললেন, 'আসন গ্রহণ করুন! বলুন কী বার্তা?' মুনিদ্বয় বসলেন, 'আপনার কন্যা বিবাহযোগ্যা হয়েছে। আমরা তার পাণিপ্রার্থী।'

অম্বরীষ বললেন, 'আমার কন্যা তো একটি, আর আপনারা দুজন,— উপায়? একটি উপায় এইরকম হতে পারে, আমার কন্যা যাঁকে নির্বাচন করবে তাঁর হাতেই আমি আমার কন্যাকে অর্পণ করব। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তার। এতে যদি রাজি থাকেন!'

মুনি দুজন পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করে বললেন, 'বেশ তাই হোক। স্বয়ম্বরের আয়োজন করুন, তবে আমরা দুজন বিশেষ ভাবে চিহ্নিত, সেটি যেন স্মরণে থাকে।' অম্বরীষ বললেন, 'অবশ্যই।'

ঋষি, মুনিদের কাণ্ডকারখানা বড়ই দুর্বোধ্য। নারদমুনি ত্রিভুবন ঘুরে বেড়ান হরি নাম নিয়ে, হঠাৎ তাঁর বাসনা হল সুন্দরী শ্রীমতীকে বিবাহ করে সংসারী হবেন। সময় নষ্ট না করে তিনি চলে গেলেন শ্রীবিষ্ণুর কাছে, 'প্রভু! একটি প্রার্থনা।'

'বলো, কী প্রার্থনা?'

'আমি অম্বরীষ-কন্যা শ্রীমতীকে বিবাহ করব।'

'বেশ তো, তা আমি কী করব?'

'তা হলে শুনুন, রাজা অম্বরীষ কয়েকদিনের মধ্যে স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করবেন। এদিকে পর্বতমুনিও শ্রীমতীকে চায়। ওই সভায় সেও থাকবে। আমরা দুজনেই অম্বরীষের রাজসভায় উপস্থিত হয়ে আমাদের বাসনা নিবেদন করেছিলুম। রাজার বক্তব্য, কন্যা একটি প্রার্থী দুটি, অতএব স্বয়ম্বরেই ভাগ্য নির্ধারিত হবে। আমি ভেবে পাই না, একজন মুনি যার জীবনের ব্রত তপস্যা, সে কি না এক রমণীর রূপে মোহিত হয়ে গেল!'

ভগবান বিষ্ণু বললেন, 'আর তুমি?'

নারদ বললেন, 'আমি তো ভক্ত! বীণা বাজিয়ে গান গেয়ে ভুবন পরিক্রমা করি। আমার তো প্রেমের শরীর। জগতের বৈচিত্র দেখে বেড়াই।'

ভগবান বিষ্ণু বললেন, 'সে অতি উত্তম কথা; কিন্তু তোমার এই সমস্যার সমাধান আমার হাতে নেই।'

নারদ বললেন, 'আছে প্রভু! আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে কী করতে হবে। সভায় আমরা দুজন সেজেগুজে বসে থাকব। শ্রীমতী আমাদের দিকে তাকাবে, হাতে তার বরমাল্য। সুন্দরী শ্রীমতী দেখবে, আমার পাশে একটি বানর বসে আছে। আপনি মায়া বলে পর্বতের মুখটি বানর সদৃশ করে দেবেন। অন্যের চোখে যা স্বাভাবিক একটি মানুষের মুখ, শ্রীমতীর দৃষ্টিতে সেটি একটি বানরের মুখ। শ্রীমতীর এই দৃষ্টি বিভ্রমটি আপনি কৃপা করে ঘটিয়ে দেবেন প্রভু, এই আমার বিনীত প্রার্থনা! পর্বতের বড় সখ হয়েছে সাধনভজন ত্যাগ করে বিবাহ করবে! রাজার জামাতা হবে! আপনি তার এই মোহ বিনষ্ট করে দিন।'

ভগবান বিষ্ণু মৃদু হেসে বললেন, 'বেশ, না হয় তাই হবে।'

নারদ মহা খুশি। প্রণাম করে বিদায় নিলেন। পরক্ষণেই এসে হাজির পর্বত মুনি। তারও সেই এক প্রার্থনা, স্বয়ম্বর সভায় শ্রীমতী যেন নারদের মুখটি বানরের মতো দেখে। ভগবান বিষ্ণু বললেন, 'তথাস্তু! তাই হবে।' পর্বতও মহা খুশি।

নারদ মুনির বিরাট বিচিত্র ইতিহাস। তাঁর প্রথম জন্ম হয় ব্রহ্মার কণ্ঠ হতে। কণ্ঠই সঙ্গীতের উৎস। ব্রহ্মা বললেন, 'আমার অন্যান্য মানসপুত্রদের মতো তোমাকেও সৃষ্টির কাজে লাগতে হবে। প্রচুর সন্তান চাই। এতবড় একটা পৃথিবীকে মানুষে মানুষে ভরে দিতে হবে। সমুদ্রের কল্লোলের মতো জনকল্লোল! তুমি বিবাহ কর।'

নারদ বললেন, 'পিতা! অসম্ভব এই যুক্তি। আমি ঈশ্বরের আরাধনা করব। বিবাহ, সন্তান, সংসার আমি এসবের মধ্যে নেই!'

ব্রহ্মা বললেন, 'তবে তুমি মরো! তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি লুপ্ত হোক।'

পরের জন্মে নারদ হলেন এক গন্ধর্ব। নাম হল উপবর্হন। ব্রহ্মার যেমন ইচ্ছা, পঞ্চাশটি কুমারীকে বিবাহ করে শুরু হল তাঁর গন্ধর্ব জীবন। বিখ্যাত সঙ্গীত সাধক, অদ্বিতীয় বীণাবাদক।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার যেমন ইচ্ছা। গন্ধর্ব নারদের জীবন শেষ হল। পরের জন্মে দাসী পুত্র, একান্ত বিষ্ণুভক্ত। সীতা মাঈ! আপনি তো জনকরাজার লাঙ্গলের ফালে ধরিত্রী থেকে উঠে এলেন, হলেন জনকনন্দিনী, কিন্তু তার আগে এই ভারতে কত কী যে ঘটে গেছে! ভারতবর্ষের প্রাচীন নাম 'অজনাভ' ও 'জম্বুদ্বীপ'। ঋষভদেবের পুত্র ভরতের (যাকে বলা হয় জড়ভরত) রাজ্যকাল থেকে 'ভারতবর্ষ' নামে পরিচিত হয়ে আসছে। (শ্রীমদ্ভাগবত)

নারদ হবেন গন্ধর্ব উপবর্হন, তা সেই উপাখ্যানটি আপনাকে শোনাই। পুষ্কর হ্রদের গন্ধর্ব চিত্রকেতু সন্তান কামনায় তপস্যা করছিলেন। শিবের তপস্যা। মহাদেব দর্শন দিয়ে বললেন, 'নারদ তোমার সন্তান হয়ে আসছে। জন্ম হল উপবর্হনের। জন্মাবধি বিষ্ণুভক্ত। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে চলে গেলেন হিমালয়ে। বসলেন তপস্যায়। ব্রহ্মার পরিকল্পনা তো ভিন্ন! উপবর্হন একদিন সমাধিমগ্ন। সেইসময় চিত্ররথ গন্ধর্বের পঞ্চাশটি মেয়ে সেখানে এসে উপস্থিত। রূপবান ধ্যানস্থ যুবকটির প্রেমে বিগলিত হলেন গন্ধর্ব কন্যারা। তাঁরা গান শুরু করলেন। তাপসের সমাধিভঙ্গ হল। চোখ মেলে দেখলেন এক ঝাঁক সুন্দরী। তপস্যা ঘুচে গেল। পঞ্চাশ জনকে বিবাহ করে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন।

এইবার ব্রহ্মালোকে অপ্সরা ও গন্ধর্বরা আমন্ত্রিত হলেন বিষ্ণুর সঙ্গীত সভায়। উপবর্হনও গেছেন। স্বচ্ছবসন পরিধান করে সুন্দরী রম্ভা নৃত্য শুরু করেছেন। উপবর্হন কামাবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পেরে সভাস্থলেই বিশ্রী একটা কাণ্ড করে ফেললেন। প্রজাপতিরা (ব্রহ্মা, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রমুখ দশজন) অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে শিথিল উপবর্হনকে শাপ দিলেন, 'যাও, এবার মানুষ হয়ে জন্মাও।'

দেবতা থেকে মানুষ, মানুষ থেকে দেবতা— বড় নটঘট— হায় রাম! বিষণ্ণ শাপগ্রস্ত উপবর্হন প্রাসাদে ফিরে এলেন। মৃত্যু আসন্ন। স্ত্রীদের সমস্ত ঘটনা বললেন। ভূমিতে কুশ বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা। জ্যেষ্ঠা স্ত্রী মালতী সোজা চলে গেলেন ব্রহ্মা, যমরাজ ও মৃত্যুকে অভিশাপ দিতে। তিনজন বিষ্ণুর কাছে এসে বললেন— 'এই ব্যাপার।'

বিষ্ণু বললেন, 'আমার তো কিছু বলার বা করার নেই, তোমরা মালতীর সঙ্গে দেখা কর।' সেইসময় এক ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কেউ জানে না, এই ব্রাহ্মণ কে? কোথা থেকে এলেন! এই ব্রাহ্মণ বিষ্ণুরই আর এক রূপ। ব্রাহ্মণও ব্রহ্মার কাছে গিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'উপবর্হনের মৃত্যুর কারণটা কী?'

ব্রহ্মা তো বুঝতেই পারছেন, এই ব্রাহ্মণটি কে! সরাসরি প্রশ্ন করার সাহস আর কার হবে! ব্রহ্মা বললেন, 'উপবর্হনের এখনো হাজার বছর পরমায়ু রয়েছে। প্রজাপতিদের ক্রোধে তার মৃত্যু হয়েছে।'

ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণু তখন উপবর্হনকে জীবিত করলেন। তিনি মহাসুখে জীবন কাটাতে লাগলেন— রাজ্যপাট, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতনি, এলাহি ব্যাপার। শেষ বয়েসে স্ত্রী মালতীকে নিয়ে গঙ্গাতীরে কৃচ্ছ্রসাধনে বসলেন। মৃত্যু এল। মালতীও স্বামীর চিতায় প্রাণ ত্যাগ করলেন।

এইবার নারদের তৃতীয় জন্ম। এবারের পরিচয় দাসীপুত্র। স্থান— কান্যকুব্জ। দ্রুমিল নামে এক গোপরাজ, তাঁর স্ত্রী কলাবতী। সন্তান কামনায় দুজনে গঙ্গার তীরে তপস্যা করছেন। একদিন হঠাৎ কশ্যপ মুনি এলেন। সন্তুষ্ট হয়ে দম্পতিকে আশীর্বাদ করে বললেন অভীষ্ট লাভ হবে। আর এক মতে, ঋষি একদিন গঙ্গাস্নানে এসে দেখলেন, জল থেকে মেনকা উঠে আসছেন সিক্ত বসনে। মুনি বেসামাল। কলাবতী সেই বীর্য পান করে গর্ভবতী হলেন।

গোপরাজ দ্রুমিল তাঁর সর্বস্ব ব্রাহ্মণদের দান করে বনবাসী হলেন। বনেই তাঁর মৃত্যু হল। কলাবতী সহমরণে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। দৈববাণী হল, মরলে চলবে না। অনেক কাজ আছে। গর্ভের সন্তানটিকে পৃথিবীর আলো দেখাতে হবে। সামনে পড়ে আছে লম্বা ঘটনা প্রবাহ।

কলাবতী এক ব্রাহ্মণের পরিবারে দাসী হলেন। ছিলেন রাজরানী হলেন দাসী। যথাসময়ে হলেন সন্তানের জননী। দেশে সেইসময় চলছিল ঘোর অনাবৃষ্টি। পুত্রটি জন্মাবার পর নামল বৃষ্টি। গৃহস্বামী পুত্রের নাম রাখলেন নার-দ। জলদাতা। নারদ বড় হয়ে মাতা কলাবতীকে তাঁর পূর্ব, পূর্ব জন্মকথা জানালেন এবং হয়ে উঠলেন বিষ্ণুভক্ত। মাতার আদেশে যোগীদের সেবায় রত হলেন। যোগীদের আজ্ঞায় তাঁদের উচ্ছিষ্ট অন্ন গ্রহণ করায় পূর্ব জীবনের শাপ হতে মুক্তি পেলেন।

সর্পদংশনে কলাবতীর মৃত্যু হল। সংসারে নারদ একা। এই সময় শিব ও তাঁর তিনজন অনুচর ছদ্মবেশে নারদের কাছে এলেন। নারদের বিষ্ণুভক্তি ও সেবাপরায়ণতা দেখে তাঁরা খুশি। মহাদেব তাঁকে ভাগবত শিক্ষা দিলেন। ভগবান বিষ্ণুও দর্শন দিয়ে বলে গেলেন, ভক্ত হও, সাধু সেবা কর, তুমি মুক্তি পাবে। হবে ভগবানের পার্শ্বচর। কণ্ঠে তোমার সঙ্গীত রয়েছে। জগতে ছড়াও ভগবানের নাম।

নারদ পথ পেয়ে গেলেন। নাম নিয়ে ত্রিভুবনে ঘোরা শুরু হল। জগৎবাসীকে শোনাতে লাগলেন মুক্তির গান। অবশেষে গঙ্গার তীরে একটি স্থান নির্বাচন করে বসলেন তপস্যায়। শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করতে করতে ব্রহ্মে লীন হলেন। কয়েক কল্প পরে ব্রহ্মা যখন আবার জগৎ সৃষ্টি করলেন তখন তাঁর কণ্ঠ থেকে নারদ আবার জন্মালেন। ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মার দশজন মানসপুত্র— মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, বশিষ্ট, ভৃগু ও নারদ।

এবারেও ব্রহ্মার সেই এক নির্দেশ— নারদ তোমাকে বিবাহ করতে হবে। চতুরাশ্রম অবলম্বন করেও মুক্তি লাভ করা যায়। স্বয়ং শিব তোমার বিবাহের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। মহর্ষি সৃঞ্জয়ের কন্যা দময়ন্তীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে। বিধির বিধান। এখন যাও পৃথিবীর তীর্থ পরিক্রমায়।

আমাদের পুরাণে এই নারদ মুনিকে নিয়ে মহা সমস্যা। নারদ-এক, নারদ-দুই, নারদ-তিন, তিনজন নারদ। প্রথম নারদ একজন দেব গন্ধর্ব। তিনি অর্জুনের জন্ম সময়ে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় নারদ মুনি বিশ্বামিত্রের এক পুত্র। আর তৃতীয় নারদ একজন দেবর্ষি। এই নারদকে ঘিরেই যত চাঞ্চল্যকর ঘটনা। যত হই চই। এর পিতা হলেন পরমেষ্ঠি— একুশজন প্রজাপতির একজন।

তা হলে! পুরাণ, মহাভারত, ভাগবত সব একাকার হয়ে কী যে হল, একটা জটিল ব্যাপার। ব্রহ্মার কণ্ঠ থেকে কোন নারদের উৎপত্তি? তাঁর একজন বোনও রয়েছেন। সেই বোনের পুত্র পর্বত মুনি। পর্বত নারদের ভাগনে। দুজনের অবিচ্ছেদ্য এক জুটি। যেমন ভাব, তেমন ঝগড়া— শাপ-শাপান্ত। সর্ব অর্থে বিখ্যাত, এই কলহ প্রিয়, কলহ তৈরিতে পারদর্শী নারদ মুনির বর্ণনা মহাভারতে যেমন আছে— মাথায় সুন্দর জটা, পরিধানে স্বর্ণ বর্ণের পোশাক, হাতে স্বর্ণ দণ্ড ও কমণ্ডলু, সুন্দর, অপূর্ব সুরেলা একটি বীণা। বীণাটি তৈরি করা হয়েছে কচ্ছপের খোলা দিয়ে। দেবতারা তাঁকে খাতির করেন তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার জন্য। আবার ভয়ও করেন; কারণ এই স্বর্ণময় মুনিটি যে কোনো মুহূর্তে বিবাদ বাধিয়ে দিতে পারেন। গোপন খবর ফাঁস করে দিতে পারেন।

পর্বত মুনির সঙ্গে নারদের চুক্তি হয়েছিল প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মনের কথা খোলাখুলি বলবেন। কোনো কিছু গোপন করবেন না। ব্রহ্মার আদেশমতো দুজনে পরিক্রমায় বেরোলেন। ঘুরতে ঘুরতে এসে উপস্থিত হলেন রাজা সৃঞ্জয়ের রাজধানীতে। এদিকে বর্ষা শুরু হয়েছে। দুজনে স্থির করলেন বর্ষার চারমাস সৃঞ্জয়ের আশ্রয়ে থাকবেন। সৃঞ্জয়ের স্ত্রীর নাম কৈকেয়ী, মেয়ের নাম দময়ন্তী। অতিথিপরায়ণ রাজা পরম সমাদরে দুই মুনির থাকার ব্যবস্থা করলেন। রাজকন্যা দময়ন্তী সেবার কোনো ত্রুটি রাখলেন না। দময়ন্তী ক্রমে নারদের প্রেমে পড়ে গেলেন। দুজনের ঘনিষ্ঠতা দেখে পর্বত মুনির সন্দেহ হল। নারদকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপারটা কী? নারদ মুনি অকপটে স্বীকার করলেন সুন্দরী দময়ন্তীকে আমি ভীষণ ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছি।

পর্বত ভীষণ রেগে গেছেন, তীর্থ পরিক্রমায় বেরোবার আগে কী চুক্তি হয়েছিল? তুমি এতদিন এই সংবাদ চেপে রেখেছিলে! আমি তোমাকে এই শাপ দিচ্ছি, তোমাকে বানরে পরিণত হতে হবে। 'তুমি বানর হবে, তুমি বানর হবে।'

নারদও রেগে গিয়ে পর্বতকে শাপ দিলেন, 'একশো বছর তুমি স্বর্গে যেতে পারবে না, নরকে থাকতে হবে।'

নারদ বানর মূর্তি ধারণ করলেন। পর্বত চলে গেলেন নরকে। রাজা সৃঞ্জয়ের মহা বিপদ। শেষপর্যন্ত নর-বানর নারদের সঙ্গেই দময়ন্তীর বিবাহ হল। রাজপ্রাসাদে দুজনের সংসার শুরু হল। কেটে গেল একশো বছর। পর্বত মুনি শাপ মুক্ত হয়ে ফিরে এলেন। বানর রূপী নারদ তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। পর্বত দময়ন্তীর কথা ভেবে নারদকে শাপ মুক্ত করে মানুষের মুখটি ফিরিয়ে দিলেন। নারদও পর্বতকে শাপ মুক্ত করলেন। মিটমাট হয়ে গেল। কেটে গেল দীর্ঘকাল। দময়ন্তীর মৃত্যু হল, নারদ ফিরে এলেন ব্রহ্মলোকে, স্রষ্টার কাছে।

জননী সীতা, নারদের কাহিনী বিরাট লম্বা। এক পর্ব শেষ হলেই আর এক পর্ব। এই বানর পর্বে এসে থামছি। পর্বত মুনির শাপ— বিবাহ করতে চাইলেই মুখটা বানরের মতো হয়ে যাবে। নারদ আর পর্বত দুজনেই সৃঞ্জয় কন্যাকে কামনা করেছিলেন। আবার সেই একই ব্যাপার। রাজা অম্বরীষের কন্যা শ্রীমতী। নারদ আর পর্বত পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। বিষ্ণুর সাহায্য দুজনেই চাইছেন। যুক্তি সেই এক— স্বয়ম্বর সভায় বানরের মতো হয়ে যাওয়া। নারদ চাইছেন পর্বত, পর্বত চাইছেন নারদ বানর মুখো হয়ে যাবেন, শ্রীমতী যখন তাকাবেন দুজনের দিকে স্বয়ম্বর সভায়।

এইবার আমরা যাব নৃপতি অম্বরীষের কন্যা শ্রীমতীর স্বয়ম্বর সভায়। সুসজ্জিত অযোধ্যা নগরী ধ্বজায়, মালায়, তোরণে। বিধৌত রাজপথ, চতুর্দিকে ছড়ান মাঙ্গলিক চিহ্ন, বাতাসে সঙ্গীতের সুর, দিব্যগন্ধ। সভা অলঙ্কৃত করেছেন রাজন্যবর্গ, বিশিষ্ট জনগণ। সে এক বিচিত্র, বিপুল শোভা— বর্ণময়, ঐশ্বর্যময়! আনন্দের হিল্লোল। সে কি কম কথা! রাজকুমারী স্বয়ম্বর হবেন। নির্বাচন করে নেবেন নিজের পতি।

জননী! আপনি এখনও জগৎ থেকে সময়ের হিসেবে অনেকটা দূরে। হয়তো বায়ুমণ্ডলে স্পন্দিত কোনো অস্তিত্ব— অরূপে বিরাজ করছেন। ইক্ষ্বাকু পরিবার ধাপে ধাপে নামছে সোপানের মতো। অতলের কোনো তল আছে কি! এই দেখুন, অম্বরীষের পর নহুষ, যযাতি, নাভাগ, অজ তারপর দশরথ, তারপর জগতে রব উঠবে জয় সীতা রাম! এখনও বাকি অনেক খেলা। আপনার জন্মবৃত্তান্তে অনেক রহস্য।

এখন ওই দেখুন রাজেন্দ্র অম্বরীষ সর্বাভরণে ভূষিতা সুনয়না কন্যা শ্রীমতীকে নিয়ে সভায় প্রবেশ করছেন। সব বাক্যালাপ স্তব্ধ। সেই অমেয়, অপূর্বাকে দর্শন করে সকলেই স্তম্ভিত। সখীরা সেই সুন্দরীকে ঘিরে রেখেছেন। শ্রীমতী ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছেন। আসছেন রাজা অম্বরীষ। তিনি কন্যাকে বললেন, 'ভদ্রে! ওই দেখ দুজন মুনি বসে আছেন, একজন নারদঋষি, আর একজন পর্বতমুনি; এই দুজনের মধ্যে তুমি তোমার পছন্দমতো একজনকে নির্বাচন করো।'

সখী পরিবৃতা শ্রীমতী দুজনের দিকে এগিয়ে গিয়ে, কী একটা ভয়ে স্থির হয়ে গেলেন। সারা শরীর কাঁপছে। কোথায় মুনি! তিনি দেখছেন, বিকটাকার দুটি বানর বসে আছে। অম্বরীষ প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কী হল কন্যা? দেখতে পাচ্ছ না পাশাপাশি বসে আছেন সম্মানিত দুই মুনি?' শ্রীমতী বললেন, 'পিতা! কোথায় মুনি! বসে আছেন দুটি নরবানর!'

রাজা অম্বরীষ বিস্মিত হয়ে কন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী আশ্চর্য! পাশাপাশি উপবিষ্ট দুই মুনিকে তুমি অন্যরকম দেখছ? কন্যা! তুমি আর কী দেখছ? তোমার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি তো!'

'পিতা, আমি উভয়ের মাঝে দণ্ডায়মান অপূর্ব এক যুবাপুরুষকে দেখছি। কী অসাধারণ তাঁর রূপ!'

একমাত্র শ্রীমতীই তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন বর্ণনা দিচ্ছেন, তাঁর গলে দুলছে বনমালা, বাহু দুটি দীর্ঘ, সুবিশাল বক্ষদেশ, সুগভীর নাভিদেশ, ত্রিবলী রেখা, যজ্ঞসূত্র শোভমান, অতিকৃশ কটিদেশ, শ্যামল গাত্রবর্ণ, মুখ যেন প্রস্ফুটিত একটি পদ্ম, চোখ দুটিও যেন পদ্মের মতো। আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন আমাকে বরণ করতে চান, ইঙ্গিতে সেই কথাই বলছেন। পিতা! আপনার অনুমতি বিনা আমি কেমন করে তাঁকে বরণ করব? চিরকাল আমরা যে সুন্দরের পূজারী!

কুৎসিৎ এক বানরের গলায় মালা দেবো, না এই সুন্দরের গলায়! দ্বিধা, বড় দ্বিধা! প্রভু! রক্ষা কর আমাকে। দিশা দেখাও।'

নারদ মুনি এতক্ষণ অবাক হয়ে সব শুনছিলেন। ব্যাপারটা কী হল! ভগবান বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, শ্রীমতী যেন পর্বতকে বানরের মতো দেখেন। নারদকে কেন বানরের মতো দেখাবে! ভগবান কি তাহলে তঞ্চকতা করলেন! নারদ জানেন না, তিনি চলে আসার পর একই প্রার্থনা নিয়ে পর্বতও গিয়েছিলেন ভগবান বিষ্ণুর কাছে। ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তকে কি বিমুখ করতে পারেন!

নারদ মুনি শ্রীমতীকে প্রশ্ন করলেন, 'কন্যা, সত্য করে বল তো, তুমি যে পুরুষটিকে দেখছ, তার কটি বাহু?'

শ্রীমতী বললেন, 'দুটি বাহু।'

পর্বত মুনি প্রশ্ন করলেন, 'তাঁর বক্ষদেশে কোনো চিহ্ন আছে?'

'দোলে বনমালা।'

'দুটি হাতে কী ধারণ করে আছেন?'

'বাঁ হাতে ধনু আর ডান হাতে বাণ।'

নারদ আর পর্বত দু'জনেই স্তম্ভিত। 'এ কার মায়া! স্বয়ং শ্রীহরি কি শ্রীমতীকে বরণ করে নিতে চাইছেন? অম্বরীষেরও প্রভূত শক্তি। তিনিই কি মায়ামণ্ডল তৈরি করে স্বয়ম্বর সভাটিকে লণ্ডভণ্ড করে দিলেন! আমাদের আমন্ত্রণ করে এ কী অসম্মান!'

রাজা অম্বরীষ মুনিদ্বয়কে বিনীতভাবে বললেন, 'হে ঋষিদ্বয়! আপনারা মহা বুদ্ধিমান, তবু আপনাদের কেন এমন বুদ্ধিভ্রম হচ্ছে! আপনারা শান্ত হয়ে আসনে বসুন। দেখুন না কন্যা শ্রীমতী কাকে বরণ করে নেয়! অযথা ক্রোধ প্রকাশ করবেন না। আমি কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিনি। আমার ক্ষমতা খুবই সামান্য। সভা আবার শুরু হোক।'

রাজার আশ্বাস মতো দুজনে আসনে বসতে বসতে বললেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি রাজা, এসবই তোমার চক্রান্ত, যত কিছু মোহ তুমিই সৃষ্টি করেছ! আর সময় নষ্ট না করে তোমার মানিনী কন্যাকে বলো আমাদের দুজনের মধ্যে একজনকে বরণ করে নিতে।'

একটা ভয় তো রয়েছেই। রাজা অম্বরীষ এবং শ্রীমতী দুজনেই জানেন মুনিরা রেগে গেলেই শাপ দেন আর তার পরিণতি বড় ভয়ংকর। রাজকন্যা হাতে একটি মালা তুলে নিয়ে ধীর পায়ে আবার চললেন দুই মুনির দিকে। স্তব্ধ সভা! কী হয়, কী হয়! পর্বত মুনি আর নারদ বসে আছেন শ্বাসরুদ্ধ করে। কার ভাগ্যে কী আছে? শ্রীমতী দেখছেন দুই মুনির মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেই যুবা পুরুষ— দুচোখে তাঁর আহ্বান। মুখে মৃদু হাসি।

শ্রীমতী এগোচ্ছেন। তাঁর হাতে দুলছে সুন্দর একটি বরমাল্য। কার গলায় তিনি পরাবেন মালাটি। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠবে শঙ্খ, বাদ্য, সমবেত সুর মূর্চ্ছনা। স্তব্ধ সভাস্থলে উঠবে কলকোলাহল। শ্রীমতীর হাত দুটি ক্রমশ উপর দিকে উঠছে। ধীরে ধীরে মালাটি শূন্যপথে অদৃশ্য হচ্ছে। রাজতনয়া শ্রীমতীও অদৃশ্য। নেই, কোথাও নেই। শুরু হল খোঁজাখুঁজি। চতুর্দিকে কলরব। স্বয়ং বিষ্ণু এসেছিলেন শ্রীমতীকে গ্রহণ করার জন্যে— দুজনে চলে গেলেন বিষ্ণুলোকে। পূর্বজন্মে শ্রীমতী শ্রীবিষ্ণুকে বররূপে লাভ করার জন্যে দীর্ঘ তপস্যা করেছিলেন, এই জন্মে তাঁর কামনা পূর্ণ হল। নারদ আর

পর্বত তা জানতেন না, জানতেন না রাজা অম্বরীষও।
নারদ আর পর্বত অত্যন্ত বিচলিত, ক্ষুব্ধ। তাঁরা বৈকুণ্ঠে গেলেন ভগবান বিষ্ণুর কাছে তাঁদের অভিযোগ নিয়ে। এই ঘটনার পর কেউ আর কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নন। দুজনেই অপমানিত, বঞ্চিত। শ্রীমতী যখন বললেন, 'দুটি বানর বসে আছে।' তখন সবাই শুনলেন! এসবই ভগবান বিষ্ণুর চালাকি। বৈকুণ্ঠের দ্বারে দাঁড়িয়ে তাঁরা সমস্বরে বললেন, 'জয় নারায়ণ হরি'।

ভগবান বিষ্ণু হাসতে হাসতে শ্রীমতীকে বললেন, 'শিগগির অন্তরালে যাও। আমার পাশে তোমাকে দেখলে আর রক্ষা নেই, ভীষণ রেগে যাবে।'

নারদ প্রণাম করে বললেন, এটা আপনি কী করলেন ভগবান? শ্রীমতীকে স্বয়ম্বর সভা থেকে তুলে নিয়ে এলেন আমাদের বঞ্চিত করে! এই যদি আপনার উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের বললেই পারতেন, আমরা অপমানিত হওয়ার জন্যে সেজেগুজে স্বয়ম্বর সভায় যেতাম না!'

ভগবান বিষ্ণু নিজের কানদুটি চেপে ধরে বললেন, 'ছি, ছি এ তো কামীর কথা! তুমি তো মুনি, তোমার মুখে এমন কথা কি শোভা পায়, তাও আবার বলছ আমার সামনে! আমার খুব দুঃখ হচ্ছে। তোমাদের এই আর্ত আবেগ দেখে! তোমরা না তপস্বী!'

নারদ বললেন, 'আমি প্রার্থনা করেছিলাম, পর্বতের মুখটা যেন হনুমানের মতো দেখায়, আমার মুখটা কেন বানরের মতো করে দিলেন?'

বিষ্ণু বললেন, 'ওহে মুনিবর তোমরা দুজনেই আমার ভক্ত। সময়ে, অসময়ে আমার কাছে আগমন কর। প্রথমে তুমি এসে চাইলে পর্বতের মুখের বিকৃতি; পরক্ষণে পর্বত এসে প্রার্থনা করল তোমার মুখের বিকৃতি। সব ভক্তই এক ভক্ত। দুই-দুই করা চলে? আমি ভগবান। তুমি এবং পর্বত দুজনেই যা চেয়েছিলে আমি তাই করেছি। আশা করি বুঝতে পেরেছ?'

নারদ বললেন, 'দ্বিতীয় রহস্য, আমাদের দুজনের মাঝখানে কে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ওই দ্বিভুজ ধনুর্ধারী!'

ভগবান বিষ্ণু শান্ত মধুর গলায় বললেন, 'হে মুনিবর! ভূমণ্ডলে অনেক মায়াবী পুরুষ আছেন তাঁদের মধ্যে কেউ হয়তো রাজকন্যাকে হরণ করে নিয়ে গেছেন; আর তোমরা বেশ ভালোভাবেই জান যে আমি চিরদিনই চতুর্ভুজ চক্রধারী সুতরাং আমি কখনোই সেই হরণকারী নই। তোমরা অকারণে, সন্দেহবশে আমার ওপর রুষ্ট হচ্ছ।'

মুনি দুজন সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'বুঝেছি ভগবান, আপনি নির্দোষ। সব মায়া সেই অম্বরীষের। সে এই মায়া সৃষ্টি করে আমাদের বঞ্চিত করেছে। সকলের সামনে আমরা অপমানিত হয়েছি। সেই চতুর আমাদের বোকা বানিয়েছে। সকলে আমাদের অবস্থা দেখে মজা পেয়েছে। নির্বোধ অম্বরীষ জানেনা, আমাদের কত শক্তি!'

নারদ আর পর্বত চললেন অযোধ্যায়। রাজা অম্বরীষকে যথোচিত শিক্ষা দিতে হবে। দুই মুনিকে দেখে রাজা যথোচিত সম্বর্ধনা জানালেন। দুই মুনি রাগে জ্বলে উঠলেন— 'রাজা! তোমার লোক দেখানো ভক্তি রাখ। তুমি এক মহা ধুরন্ধর। বলে দিলেই পারতে, আমার সুন্দরী কন্যা রানি হবে। মুনিঋষির ঘরে যাবে না। রাজার মেয়ে রাজপুরে যাবে। বিলাসীর জীবন যাপন করবে। পরিষ্কার কথা। তা না করে তুমি কী করলে! ছলনা! দ্বিচারিতা! স্বয়ম্বর সভায় আসুন, আমার কন্যার পছন্দ! আমরা সেই ফাঁদে পা দিলুম। তোমার শঠতা আমরা অনুমান করতে পারিনি। একটা মায়া, একটা ঘোর, একটা নাটক তৈরি করে মেয়েকে অন্যের হাতে তুলে দিলে! ঋষিদের সঙ্গে ছলনা! এর ফল তোমাকে ভুগতে হবে রাজা অম্বরীষ। এই নাও শাপ— মোহ তোমাকে গ্রাস করুক। তুমি আত্মবিস্মৃত হও।'

একটা আঁধার তৈরি হল। রাজাকে গ্রাস করতে আসছে। ওই আঁধার তাঁকে জড়পিণ্ডে পরিণত করবে। রাজা অম্বরীষ পূর্ব তপস্যায় শ্রী বিষ্ণুর দর্শন ও কৃপা লাভ করেছিলেন। বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়ে অম্বরীষকে বলেছিলেন, 'রুদ্র আমাকে যে মহান সুদর্শন চক্র দান করেছিলেন, সেই দুর্লভ অস্ত্রটি আমি তোমাকে দিলাম। এই দৈব অস্ত্র তোমাকে ঋষিশাপ, শত্রুর আক্রমণ, সমস্ত রোগের উপদ্রব থেকে রক্ষা করবে।'

দুই মুনি জানতেন না, কত বড় রক্ষা কবচে সুরক্ষিত এই রাজা অম্বরীষ। তমোরাশি রাজাকে আক্রমণ করতে আসছে দেখেই সুদর্শন চক্রটি সক্রিয় হল। আরো ঘোর অন্ধকার সৃষ্টি করে মুনিদের দিকে ধাবিত হল। চির অন্ধকার তেড়ে আসছে। সে-অন্ধকারের ঘনত্ব ভয়াবহ। আতঙ্কিত দুই মুনি ত্রাহি ত্রাহি রবে ছুটছেন। থকথকে ঘন কালো অন্ধকার তাঁদের গ্রাস করতে আসছে। এ কী হল! এ কী ভয়ংকর বিপত্তি! কোনো রকমে তাঁরা আবার বিষ্ণুলোকে এসে পৌঁছলেন। ভগবান বিষ্ণু দুজনের শোচনীয় অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল?'

তাঁরা সমস্বরে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'ওই আসছে, রক্ষা করো হে ভগবান!'

বিষ্ণু দেখলেন, সুদর্শন চক্র ঘুরছে, আলোর পরিবর্তে অদ্ভুত এক অন্ধকারে চারপাশ আচ্ছাদিত হচ্ছে। তমোরাশি। বিষ্ণু হাত তুলে চক্রকে নিবারিত করলেন। ঘোর অন্ধকার নিমেষে অদৃশ্য।

ভগবান বিষ্ণু দুই মুনিকে বললেন, 'বিপদ কেটে গেছে, এখন বসুন, বিশ্রাম করুন। আশা করি বুঝতে পেরেছেন, শক্তির ওপরেও শক্তি আছে। কাম আর ক্রোধ, দেব ও মানব উভয়েরই শত্রু। চাইলেই সব কিছু পাওয়া যায় না। ইচ্ছা করলেই ক্ষতি করা যায় না। অহংকার, মানসিক অসুস্থতা। সংযম শক্তিশালী এক দিব্য অস্ত্র। শাপ এমন এক সর্প, যা অধিকারীকেও ঘুরে ছোবল মারতে পারে। মানুষের শক্তি কখনই দিব্য শক্তিকে ছাপিয়ে যেতে পারে না। ভুলের ওপরেই ভুল জমে ভুলের পাহাড় তৈরি হয়। তপস্যার চেয়ে বড় চরিত্র সংশোধন। দুজনেই দুজনকে বানর করতে চেয়েছিলেন। মন-ই ত বানর। নামতেও জানে উঠতেও জানে। ঋষিবর! অতল সমুদ্রেরও তল আছে। মহামায়ার শক্তির কাছে দেব, দানব, মানব সকলেই খেলার পুতুল। মহামায়ার এমনি মায়া রেখেছে কি কুহক করে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি জানিতে পারে! তিন ভুবনে ছটফট করে ফেরেন, নিজের অন্তরের আঁধারের খবর কেন রাখেন না মুনি? এখন শান্ত হয়ে বসে আসল কথাটা শুনুন। রহস্য কিছু আছে বই কি! সবচেয়ে বড় রহস্য— ভবিষ্যৎ। অতীত নয়, বর্তমান নয়, আগামী।'

ভগবান বিষ্ণু বললেন, 'স্বয়ম্বর সভাকে আমি বিষ্ণুমায়ায় আচ্ছন্ন করে শ্রীমতীকে হরণ করেছি। আপনাদের বিব্রত করেছি, ছুটিয়েছি দিগ্‌বিদিকে। এখন আপনাদের প্রথা অনুযায়ী আমাকে শাপ দিন, যা হবে আমার ভবিষ্যৎ, ভারতের ভবিষ্যৎ। রাজা অম্বরীষ নির্দোষ, অসহায়। সে একটি

ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। বিরাট এক ইতিহাসের পূর্বপুরুষ।'

নারদ বললেন, 'বুঝেছি। পরিষ্কার হয়েছে আমার বুদ্ধি। আর শাপ নয়, আমি বলব একটি কালের ভবিষ্যৎ, সেটি একটি শাপের আকার নেবে অবশ্যই।'

মানুষের ইচ্ছায়, মানুষের প্রয়োজনে ভগবান মানবদেহ ধারণ করে পৃথিবীতে আসেন। নারদ মুনি বলছেন, 'ভগবান বিষ্ণু, আপনার ভবিষ্যৎ শুনুন। ওই অম্বরীষ বংশেই আপনাকে জন্মাতে হবে। যে মূর্তি ধারণ করে আপনি শ্রীমতীকে হরণ করলেন— সেই মূর্তি। নব দূর্বাদলশ্যাম, দ্বিভুজ, ধনুর্বাণধারী। রাজা দশরথ হবেন পিতা আর শ্রীমতী হবেন ধরণীসম্ভবা। বিদেহরাজ জনক তাঁকে লালন পালন করে আপনার হাতে সমর্পণ করবেন। এক বিশাল শক্তিশালী রাক্ষস আপনার ভার্যাকে অপহরণ করে নিয়ে যাবে। শ্রীমতীর জন্যে আমরা যে অশেষ কষ্ট পেয়েছি, সেই একই কষ্ট, বুকভাঙা একই বেদনা আপনাকে ভোগ করতে হবে। তখন বুঝতে পারবেন, প্রিয়াকে হারানোর বেদনা। সুখের সংসার তছনছ হয়ে যাওয়ার বিষাদ। যে কান্না হৃদয়ে জমা থাকে চোখের জল হয়ে বেরিয়ে আসে না।'

ভগবান বিষ্ণু বললেন, 'বাকিটা আমি বলি, অম্বরীষের পর নহুষ, যযাতি, নাভাগ, অজ, তারপর দশরথ। রাজা দশরথ হবেন আমার পিতা। তাঁর পুত্র শ্রীরাম রূপে অবতীর্ণ হব আমি। তখন আমার দক্ষিণ বাহু হবে ভরত, বাম বাহু হবে শত্রুঘ্ন আর লক্ষ্মণ আমার অনন্তদেব। আমার ছায়া, বিষ্ণু-শক্তি হয়ে আমাকে ঘিরে থাকবে। মুনিবর! এই তো ভবিষ্যৎ! আমি এখন আমার হস্তধৃত এই চক্রকে বলি, তোমার তমোরাশি সংযত করে যথাস্থানে ফিরে যাও, এই দুই মুনি ও রাজা অম্বরীষকে বিপর্যস্ত কোরো না। আর আমি যখন রাম অবতার হব; তখন আমাকে আশ্রয় কোরো। সে সব অনেক পরে। আপাতত শান্তি।'

বিষ্ণুলোক ত্যাগ করার সময় নারদ আর পর্বত প্রতিজ্ঞা করলেন তাঁরা আর কোনোদিন বিবাহ করবেন না। যথেষ্ট বিব্রত হয়েছেন। ভগবান যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী সেখানে জীবনসঙ্গিনী লাভ করা কি সহজ ব্যাপার! বৃথাই ছোটাছুটি। ভগবান বিষ্ণুও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। মুনির কেন সংসার বাসনা! রূপের পূজারী কেন হতে চাও ব্রহ্মার পুত্র তুমি প্রজাপতি! দেবাদিদেব তোমাকে সুর ও সঙ্গীত দিয়েছেন। তিন ভুবনে তোমার অবাধ বিচরণের স্বাধীনতা। তুমি কেন হবে নারীর প্রণয়প্রার্থী! তোমার তো জাগতিক ঐশ্বর্য কিছু নেই, অন্তরের ঐশ্বর্যের অধিকারী! অনন্ত সময় তোমার অধিকারে। ত্রেতা, দ্বাপর, কলি— এই তিনটি যুগের কত ঘটনা তুমি দেখবে। ঋষি বাল্মীকিকে রামায়ণ বলবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মহাভারতের পতন দেখবে। দেখবে সময়ে প্রবেশ করছে কাল কলি। কলির রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ দেখবে। তারপর ক্রমে ক্রমে সবই হয়ে যাবে কাহিনী, খণ্ড খণ্ড পুরাণ।

জননী সীতা! এই কি দৈব কৃপা! নিমেষে চলে গেলেন ইহলোক থেকে দেবলোকে। ভগবান বিষ্ণুর প্রিয়া। ইক্ষ্বাকু বংশে একের পর এক রাজা আসছেন। চলছে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের খেলা। দেব-দানবের সংঘর্ষ। ভগবানের সঙ্গে ভাগ্য জোড়ার অশেষ দুঃখ যে স্বীকার করতে হবে মা! নিক্ষিপ্ত হবেন ধরণীতে। ধূলায় অপেক্ষা। কবে বিষ্ণুভগবান হবেন রাম অবতার! তারপর? ভাগ্য ত সুখের হবে না মা! সবাই কইবে রামের কথা— রঘুবীর। জনকনন্দিনী সীতার কথা 'কয় না কেন কেউ!' থাক, থাক, নারীর জীবন দুঃখের, ত্যাগের, বঞ্চনার। লাঙলের ফালে ফালা ফালা হতে হতে হঠাৎ রক্ষা পাওয়া। বাজবে সানাই, সাজবে রাজ্য, তারপর অরণ্যের আঁধার। নীচশক্তির কামোল্লাস। আবার যুদ্ধ, কখনো জয়, কখনো পরাজয়! স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার নিষ্ঠুর খেলা। অশ্রুজল নাকি ভক্তির লক্ষণ! পরিত্যক্ত হওয়াই না-কি পাতিব্রত্য!

পৃথিবী আপনাকে আবিষ্কার করেছিল। ছোট্ট একটি দেহ ধারণ করে ধরণীতে প্রবেশ। অলৌকিক কোনো শক্তির প্রকাশ নেই। পরে যে-সব মহা মহা ঘটনা ঘটবে অতি নিঃশব্দে তারই সূচনা। একটি পার্শ্বকাহিনী আছে, শুনবেন আপনি? তাহলে বলি, এই কাহিনী বাল্মীকি বলছেন ভরদ্বাজ মুনিকে। সে এক বিষ্ণুভক্ত, নাম তার কৌশিক। ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ সর্বদা বিষ্ণুকে ধ্যান করেন, বন্দনা করেন। পরিভ্রমণকালে তিনি একটি জায়গায় এলেন, সেই স্থানটিকে তাঁর মনে হল অতি পবিত্র এবং বিষ্ণুক্ষেত্র। সেইখানে তিনি স্থায়ী হলেন, একটি ছোট্ট আশ্রম তৈরি করলেন। সাধন-ভজনে মেতে উঠলেন। তাঁর হরি গুণগানে মুগ্ধ হয়ে স্থানীয় এক ব্রাহ্মণ, যাঁর নাম পদ্মাক্ষ, তাঁকে নিত্য অন্নদান করতেন। হরি নামের আসরে পদ্মাক্ষও নিয়মিত আসতেন।

দেখতে দেখতে ব্রাহ্মণ কৌশিকের সাতজন হরিভক্ত শিষ্য হল। তাঁরা কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য। দ্বিজ পদ্মাক্ষ এঁদেরও দায়িত্ব নিলেন। দেখতে দেখতে স্থানটি একটি পবিত্র ধর্মক্ষেত্রে পরিণত হল। পূজাপাঠ, নামগান। এলেন মালব আর মালবী নামে এক বৈশ্য দম্পতি। মালব প্রতিদিন সন্ধ্যায় দীপমালা দিয়ে হরিক্ষেত্রটিকে সজ্জিত করেন। আর মালবী প্রতিদিন গোময় লেপন করে হরিক্ষেত্রের পরিচর্যা করেন। স্থানটি অতি সুন্দর হয়ে উঠল। সাধন ভজন, নাম গুণগান। এই সময় কুশস্থলীর (দ্বারকা) পঞ্চাশজন ব্রাহ্মণ সেখানে এলেন। তাঁরা সকলেই সঙ্গীতজ্ঞ। কৌশিকের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁরা সুন্দর একটি সংকীর্তনের দল তৈরি করে ফেললেন। চারিদিকে প্রচারিত হল খ্যাতি। কলিঙ্গ নামে এক রাজা একদিন আশ্রমে এসে কৌশিককে বললেন, 'আজ থেকে তুমি তোমার সঙ্গীদের নিয়ে আমার গুণকীর্তন করবে। কুশস্থলবাসী সকলে আমার গুণকীর্তন শুনুক, এই আমার আদেশ।' কৌশিক বললেন, 'মহারাজ! আমার এই কণ্ঠ শ্রীহরি ছাড়া আর কারো গুণকীর্তন করে না, করবেও না কোনো দিন।' সঙ্গীরাও সমস্বরে একই কথা বললেন।

রাজা বললেন, 'তাই নাকি! এত বড় কথা!'

রাজা কলিঙ্গ তাঁর অনুচরদের বললেন, 'এখানে তারস্বরে আমার নাম গুণগান শুরু করে দাও। সেই হইচই-তে এদের হরিনাম যেন চাপা পড়ে যায়, সব ভণ্ডুল করে দাও।'

হরিনামকারী ব্রাহ্মণরা কানে তুলো দিলেন। অনেকে জিহ্বা ছেদন করে ফেললেন। রাজা সব শুনে বললেন, 'দেখাচ্ছি মজা।' সমস্ত সম্পত্তি হরণ করে, হরিসভা তছনছ করে রাজ্য থেকে সকলকে বিতাড়িত করলেন।

নির্বাসিত ব্রাহ্মণগণ ও কৌশিক, উত্তরাভিমুখে পরলোকের পথে যাত্রা করলেন। একসঙ্গে এতজনকে আসতে দেখে যমরাজ চিন্তিত হয়ে ব্রহ্মার পরামর্শ চাইলেন। ব্রহ্মা বললেন, আমার কাছে নিয়ে এস। ব্রহ্মা তাঁদের অভ্যর্থনা করে সবাইকে নিয়ে বিষ্ণুলোকে গেলেন। ভগবান বিষ্ণু বললেন, 'যারা সঙ্গীতজ্ঞ, সৎপ্রসঙ্গে অনুরক্ত, যারা কৌশিকের নামযজ্ঞের সহায়ক ছিল, তারা এখন সাধ্যদেব নামে অভিহিত হবে।

তারা এই বিষ্ণুলোকেই অবস্থান করবে। আর কৌশিক! তুমি হলে গণাধিপতি, তোমাকে আমি 'দিগ্বন্ধু' উপাধি দিলাম। তুমি আমার বিষ্ণুলোকেই থাকবে।'

শ্রীবিষ্ণু মালব আর মালবীকে বললেন, 'তোমরাও আমার কাছে থাকবে, সঙ্গীত শ্রবণ করবে, আর পদ্মাক্ষ, তোমার সুকৃতির ফলস্বরূপ তুমি ধনপতি কুবের হয়ে এই বিষ্ণুলোকে বিহার করবে।' বিষ্ণু তারপর ব্রহ্মাকে বললেন, 'এই কৌশিককে আমি গণাধিপতি করেছি। এখন থেকে গণগণ, শিবের অনুচরগণ এঁকে স্তব করবেন।' ভগবান বিষ্ণু সকলের জন্যেই ব্যবস্থা করে দিলেন।

জননী সীতা আপনি ভাবছেন, কেন এইসব অবান্তর কাহিনী আপনাকে শোনাচ্ছি! এই যে— আবার শাপ আসছে, নারদ মুনির খেলা! একটু ধৈর্য ধরে শুনুন। বৈকুণ্ঠে দেবতাদেরও ভাগ্য কাজ করে! বাল্মীকিই শোনাবেন সেই কাহিনী। শুনুন তিনি কী বলছেন, 'বীণাবাদ্যবিশারদ মধুরাক্ষর গণাধিপতি কৌশিককে আনন্দ দেবার জন্যে নৃত্য-গীতের মহা সমারোহ শুরু করে দিলেন। আপনি তো তখন ভগবান বিষ্ণুর সহধর্মিণী লক্ষ্মী। সেই নৃত্য, গীতের সভায় আপনারা দুজনে চেড়ী পরিবৃত হয়ে এলেন, নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে। সভা একেবারে পরিপূর্ণ। ঠাসাঠাসি ভিড়। আপনারা প্রবেশের পথ পাচ্ছেন না। তখন চেড়ীরা তাদের হাতের দণ্ডের সাহায্যে ভিড় হঠাতে লাগল। ব্রহ্মাদি মুনিগণ, নারদ ঋষি সেই ধাক্কাধাক্কিতে সভার বাইরে ছিটকে গেলেন। আপনারা পরস্পর আলাপে মশগুল। কী হল লক্ষ করলেন না। সংরক্ষিত আসনে বসলেন। সেইসময় বিজ্ঞ মহাজন তুম্বুরু ঋষি এসে উপস্থিত। আপনারা তাঁকে সঙ্গীত পরিবেশন করতে বললেন। আপনারা তাঁকে নানা রত্ন, বসনাদি উপহার দিলেন। তিনি প্রণাম করে চলে গেলেন। ব্রহ্মাদি দেব ও মুনিগণও আপনাদের প্রণাম করে জয়ধ্বনি দিতে দিতে বিষ্ণু মন্দির ত্যাগ করলেন। রইলেন নারদ মুনি।

চেড়ীদের বেতের আঘাত নারদের শরীরে লেগেছে। এতক্ষণ তিনি ক্রোধ দমন করেছিলেন। এইবার তিনি ফেটে পড়লেন। শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবীকে বললেন, 'তোমার চেড়ীরা এক একটি রাক্ষসী। কোনো কারণ ছাড়াই আমাকে বিতাড়িত করার জন্যে বেত্রাঘাত করেছে। তুমি দেখলে, বাধা দিলে না, লজ্জিত হলে না, দুঃখপ্রকাশ করলে না। এই ভয়ংকর অপরাধের জন্যে আমি তোমাকেই শাপ দিচ্ছি— তোমাকে রাক্ষসী গর্ভে জন্ম নিতে হবে। তোমার চেড়ীরা যেমন আমাকে বেত্রাঘাত করেছে, ঠিক সেই একই ভাবে রাক্ষসপুরীতে রাক্ষসী চেড়ীরা তোমাকে অহরহ নির্যাতন করবে। এই হবে তোমার কপালের লিখন।'

ক্রোধের বেগে এই ভয়ংকর অভিশাপ দেওয়ার পর নারদঋষি আত্মগ্লানিতে ভেঙে পড়লেন, এ কী করলাম, এ কী করলাম! শাপ এমন এক সর্প, যা ঝাঁপি থেকে বেরিয়ে পড়লেই ছোবল মারবে। বিষ উদ্গার করে নিষ্ক্রিয় হবে। সাপে আর শাপে বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। সাপ বেরোয় গর্ত থেকে, শাপ বেরোয় ঋষি-মুখ থেকে।

নারদের অভিশাপ শুনে পৃথিবী কম্পিত হল। দেবতা, গন্ধর্ব ও দানবদের মধ্যে হাহাকার রব উঠল। নারদ তখন ভীষণ অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। তুম্বুরুর প্রতি তাঁর খুব দ্বেষ। তার প্রতি ভগবান বিষ্ণুর এত কৃপা! সেই কৃপা থেকে আমি কেন বঞ্চিত! তুম্বুরু একজন গন্ধর্ব। বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী। স্বয়ং ব্রহ্মার কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। তাঁর পিতা কশ্যপ, মাতা প্রধা। তুম্বুরু চৈত্রমাসে সূর্যের রথে অবস্থান করেন। স্বর্গে চারজন বিখ্যাত গন্ধর্ব আছেন, তুম্বুরু, বাহু, হাহা আর হুহু। পূর্ণিমার দিন গন্ধমাদন পর্বতে তুম্বুরুর গান শোনা যায়। তুম্বুরু যে বাদ্যযন্ত্রটি নির্মাণ করেছিলেন, সেটি তাম্বুরা বা তানপুরা নামে পরিচিত, এটি টংকার যন্ত্র। বড় লাউয়ের খোলা দিয়ে তৈরি, ওপরে ফাঁপা একটি বাঁশের গায়ে দুটি পিতল ও দুটি লোহার তার সংযুক্ত। তুম্বুরুর কাহিনীতে প্রচুর চমক। অপ্সরা রম্ভার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কুবেরের সভায় অনুপস্থিত থাকার কারণে, কুবেরের শাপে হয়ে গেলেন এক রাক্ষস। সেই রাক্ষসের নাম হল বিরাধ। বিকট তার আকৃতি— রক্তাক্ত দেহ, পরনে বাঘছাল। দণ্ডকারণ্যে রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে বিরাধের যুদ্ধ হবে। যুদ্ধে তাকে পরাজিত করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হবে জীবন্ত। তখন শাপমুক্ত হয়ে সেই রাক্ষসের দেহ থেকে বেরিয়ে আসবেন সুন্দর দেহধারী, গন্ধর্ব তুম্বুরু।

হঠাৎ ক্রোধের বশে অভিশাপ দিয়ে নারদ ঋষি থমকে গেছেন। মা লক্ষ্মী কিন্তু স্থৈর্য হারাননি। করজোড়ে নারদকে বললেন, 'মুনিবর! যে অভিশাপ দিলেন, তা মিথ্যা হবার নয়, তবে সে বিষয়ে আমার একটি বক্তব্য আছে, কৃপা করে তা পূরণ করুন। আগে মন দিয়ে শুনুন— যে রাক্ষসী নিজের ইচ্ছায় মুনিদের শোণিতে পূর্ণ কলস থেকে শোণিত পান করবে, আমি সেই শোণিতেই তার গর্ভে উৎপন্ন হব। শুক্র শোণিতে আমার জন্ম যেন না হয়।'

নারদ বললেন, 'দেবী তাই হবে।'

এইবার ভগবান বিষ্ণু নারদকে ধরলেন। কথায় কথায় এত ক্রোধ, শাপ! এই ঋষিটিকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া উচিত। 'শোনো মুনিবর, তপস্যা, যজ্ঞ, দান, যে যতই করুক, আমি কিন্তু আমার নামগানেই অধিক সন্তুষ্ট হই। দেখ, কৌশিক আমার নামগান করেই বিষ্ণুলোকে চলে এসেছে। ঠিক সেইরকম তুম্বুরুও গানের প্রভাবেই তোমার চেয়ে আমার প্রিয় হতে পেরেছে। তোমাকেও বলি, সঙ্গীতের সাহায্যে আমার প্রিয় হওয়ার চেষ্টা কর! ভালো ভাবে সঙ্গীতে পারদর্শী হও। আর সে ইচ্ছা যদি তোমার থাকে, তাহলে তুমি উলুকের সঙ্গে যোগাযোগ কর। তিনি 'গানবন্ধু' নামে প্রখ্যাত। মানস সরোবরের উত্তর দিকের পর্বতে বাস করেন।'

নারদ মানস সরোবরের উত্তর দিকের সেই পর্বতে উপস্থিত হলেন। দেখছেন, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর ও অপ্সরাগণ পরিবৃত হয়ে 'গানবন্ধু' বসে আছেন। তাঁরা সকলেই সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছেন। নারদ মুনিকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে বন্ধু প্রশ্ন করলেন, 'মহামান্য! আপনার আগমনের উদ্দেশ্য?'

আত্মগ্লানিতে দীর্ণ নারদ বললেন, 'বন্ধু! আমি এক হতভাগ্য! এক সময় আমি বৈকুণ্ঠে ছিলাম নারায়ণের সান্নিধ্যে। সদ্য আমি বিতাড়িত হয়েছি। একদিন তিনি তুম্বুরুকে আহ্বান করে সস্ত্রীক তাঁর গান শুনছিলেন। ব্রহ্মাদি, দেবতাগণ ও আমাকে সেই আসরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। সকলেই বিতাড়িত হয়েছিলেন। সেই আসরে স্থান পেয়েছিলেন বিষ্ণুভক্ত কৌশিক ও কয়েকজন ব্রাহ্মণ। তাঁরা সকলেই শ্রী হরির গান করে গানপত্য লাভ করেছেন, তুম্বুরু প্রচুর সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন। আমাকে এই উপেক্ষা আমার কাছে অসহনীয় হওয়ায় আমি শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীকে বিশ্রী শাপ দিয়ে এসেছি। ভগবান বিষ্ণু তখন বললেন, তুমি সঙ্গীতে আরো পারদর্শী হও, তবেই দেবসভায় আমরা তোমার গান উপভোগ করব। সঙ্গীত শিক্ষার জন্যে ভগবান

আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাই, কৃপা করুন।'

গানবন্ধু মৃদু হেসে বললেন, 'দেবর্ষি! আমি কে— আগে সেই বৃত্তান্ত তুমি শোনো। তারপরে অন্য কথা! এ এক রাজার চরম বিভ্রমের করুণ বৃত্তান্ত। সেই রাজার নাম ছিল ভুবনেশ। বিখ্যাত রাজা। তিনি একাধিকবার বাজপেয়, অশ্বমেধ, আরো যে-সব যজ্ঞ আছে, সব করেছিলেন। প্রচুর দান-ধ্যান। কিন্তু ভীষণ অহংকার। সুশাসক হলেও নিজের নাম-যশের আকাঙ্ক্ষায় বিচার, বোধ শূন্য। তিনি নিজের রাজ্যে ঘোষণা করে দিলেন, শ্রীহরির নাম করা যাবে না। অন্য সব দেব-দেবীর আরাধনা নিষিদ্ধ। এই আদেশ লঙ্ঘনের শাস্তি প্রাণদণ্ড। ব্রাহ্মণরা বেদগান করতে পারবেন না। সূত, মাগধ, গায়িকারা সর্বদাই তাঁর গুণগান করবেন।

রাজার আদেশ জারি হয়ে গেল। তিনিও শাসনকার্য যথারীতি চালাতে লাগলেন। রাজা ভুবনেশের প্রাসাদের অদূরে, নদীর তীরে এক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর মন্দিরে শ্রী হরির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে দিবা-রাত্র অর্চনা করতেন স্থানটি হরিনামে মুখর হয়ে থাকত। হরিমিত্র— সেই ব্রাহ্মণের নাম। তিনি বীণা বাজিয়ে তাল-লয় সহযোগে হরি নাম করে সকলকে মাতিয়ে দিতেন।

একদিন রাজার অনুচরেরা এসে সব লণ্ডভণ্ড করে হরিমিত্রকে ধরে নিয়ে গেল রাজার কাছে। ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করে, সমস্ত বিষয়আশয় কেড়ে নিয়ে, রাজ্য থেকে নির্বাসন দেওয়া হল।

বহুদিন পরে এই রাজার দেহাবসান হল। পা রাখলেন পরের জন্মে। হলেন একটি উলূক, পেঁচা। আহারের সন্ধানে ছোটাছুটি। কোথায় পাবে খাদ্য। পূর্ব জন্মের কর্মফল। উলূকরূপী রাজা যমরাজকে গিয়ে বললেন, 'আমি অনাহারে রয়েছি দিনের পর দিন। কেন? এর কারণ কী?'

যমরাজ বললেন, 'শুনবে কারণ? তুমি যখন রাজা ছিলে, তখন তোমার রাজ্যে হরিমিত্র নামে এক পরম ভক্ত ছিলেন। তুমি সেই ব্রাহ্মণকে নির্যাতন করে রাজ্য ছাড়া করেছিলে। সেই দুষ্কর্মের এই ফল।'

এরপর যমরাজ যা বললেন, সে আরও ভয়ংকর— 'তুমি পর্বত কোটরে গিয়ে দেখ তোমার পূর্বজন্মের দেহটি সেখানে পড়ে আছে। প্রথমে তুমি সেটি ভক্ষণ করো, তারপর নিজের দেহ। তারপর? তুমি জন্মাবে একটি কুকুরের দেহ নিয়ে; তারপর আবার মানুষ হবে। হে নারদ! আমিই সেই রাজা ভুবনেশ।'

নারদ স্তম্ভিত। ভয়ংকর এই বৃত্তান্ত! যমরাজের কি বিচিত্র আদেশ। নারদ প্রশ্ন করলেন, 'তারপর?'

গানবন্ধু বললেন, 'সেই নির্দিষ্ট কোটরে প্রবেশ করে দেখলাম, সত্য সত্যই আমার পূর্বজন্মের দেহটি পড়ে আছে। আশ্চর্যেরই ব্যাপার। আরো আশ্চর্য, আমি দেহটি 'ভক্ষণ করা' শুরু করতে যাব, ঠিক সেইসময় হরিমিত্র অপ্সরা, কিন্নরাদি পরিবেষ্টিত হয়ে পুষ্পরথে ভ্রমণ করতে করতে আমাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'পক্ষী! তুমি রাজা ভুবনেশের শবদেহ ভক্ষণ করছ কেন?'

আমি সবিনয়ে বললাম, 'বৈষ্ণবর হরিমিত্র, রাজা ভুবনেশ তোমার ওপর অত্যাচার করেছিল, সেই ভুবনেশের আজ এই পরিণতি। ওই দেখ, পড়ে আছে আমার পূর্বদেহ, রাজা ভুবনেশ। আমি এখন একটি পাখি। আদেশ হয়েছে, ওই দেহটি ভক্ষণ করে আমাকে সুদীর্ঘকাল বাঁচতে হবে তারপর আমি জন্মাব কুকুর হয়ে। তারপর হবে আমার মনুষ্য জন্ম। সে অনেক পরের কথা। আমার সমস্ত যাগযজ্ঞের শুভফল নষ্ট হয়ে গেছে একটি মাত্র অপরাধে— 'তোমার ওপর অত্যাচার।'

প্রসন্ন হরিমিত্র বললেন, 'ভুবনেশ পূর্বজন্মে যা হয়ে গেছে, যেতে দাও, আমার কারণে তোমার এই পরিণতি দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি তোমাকে শাপমুক্ত করে দিলাম। এই শবদেহ অদৃশ্য হয়ে যাক। তোমাকে আর কুকুরজন্ম নিতে হবে না। তুমি আমার কৃপায় আজ থেকে সঙ্গীত বিদ্যা লাভ করলে। এখন থেকে সুরে, তালে, লয়ে ভগবান বিষ্ণুর গুণগান করো। তোমার জিহ্বার আড়ষ্টতা দূর হয়ে যাবে। তুমি দেব, বিদ্যাধর ও অপ্সরাগণের সঙ্গীতাচার্য হতে পারবে। তোমার আহারাদি আর জীবন-ধারণের কোনো সমস্যা থাকবে না।'

'নারদ! এই হল আমার জীবন কথা। পরম বিষ্ণুভক্ত হরিমিত্রের উদার কৃপায় আমি শাপমুক্ত, বিশিষ্ট এক সঙ্গীত আচার্য। এই দেখুন, কত কিন্নর, বিদ্যাধর আমার কাছে এসেছে সঙ্গীত শিক্ষার জন্যে। তপস্যা, যাগ-যজ্ঞ করলে ধর্মজীবনে অগ্রসর হওয়া যায়, সঙ্গীতের জন্যে প্রয়োজন ভিন্ন ধরনের অনুশীলন, সাধনা। যদি প্রস্তুত থাকেন, তবেই আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করুন, যথাবিধ অনুশীলন করুন।'

গানবন্ধু নারদকে কয়েকটি অনুশাসন বললেন। প্রথম, লজ্জা ত্যাগ করতে হবে। দ্বিতীয়, মনোযোগ, অন্য বিষয়ে মন দিলে চলবে না। তৃতীয়, এক হাতে তালি দিয়ে গান শেখা উচিত নয়। চতুর্থ, ভয়ার্ত, ক্ষুধার্ত হয়ে, অথবা অন্ধকারে বসে সঙ্গীতের অনুশীলন অনুচিত।

নারদ সমস্ত মেনে নিয়ে অনুশীলন শুরু করলেন। শিখলেন, হাজার হাজার রাগ, রাগিণী, স্বরভেদ। নারদ গানবন্ধুকে বললেন, 'আপনি গান বিদ্যায় বিশারদ, আমার গুরু, আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন, এখন বলুন, আমার শক্তিতে আমি আপনার কী করতে পারি?'

গানবন্ধু বললেন, 'ব্রহ্মার একদিন, মানে চোদ্দজন মনুর অধিকার কাল। সেই কালের আদি-অন্ত করা সহজ ব্যাপার নয়, এতটাই দীর্ঘ। সেই কাল শেষ হলেই প্রলয় আসবে পৃথিবীতে। আমি যেন ততদিন স্থায়ী হতে পারি— এই মহৎ দক্ষিণা আমাকে দান করুন।'

নারদ বললেন, 'আপনার ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে। এই কল্প শেষে আপনি গরুড় হয়ে জন্মাবেন এবং শ্রীবিষ্ণুর বাহন হবেন। আপনার কল্যাণ হোক। আপনার শিক্ষায় সমৃদ্ধ হয়ে আমি এখন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী তুম্বুরুকে জয় করতে চললাম।' তুম্বুরুর আশ্রমে গিয়ে নারদ হতবাক। এ কী দৃশ্য দেখছেন তিনি। বিকৃতাকার কয়েকজন নর-নারী, বিকলাঙ্গ, এদিকে, সেদিকে পড়ে আছে। নারদ জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কী কাণ্ড! তোমরা এমন খণ্ড- বিখণ্ড হয়ে পড়ে আছ কেন?' কে তোমাদের এই অবস্থা করলে?'

তারা সমস্বরে বলে উঠল, 'নারদ! আমরা সবাই রাগ আর রাগিণী। নারদ আমাদের এই অবস্থা করেছেন। তাঁর গানের ভ্রান্তি ও বেচালে আমরা খণ্ড, খণ্ড, বিকলাঙ্গ। তবে তুম্বুরুর সঙ্গীতে আমরা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসি, সুস্থ হই। অর্থাৎ আপনার সঙ্গীতে আমরা মরি, তুম্বুরুর সঙ্গীতে আমরা বেঁচে উঠি। সুস্থদেহ ফিরে পাই।'

নারদ তুম্বুরুর সঙ্গে দেখা করার সাহস হারালেন। বুঝলেন, তিনি কিছুই তেমন শিখতে পারেননি। সঙ্গীতকে তিনি বিকৃত

করেছেন। রাগ-রাগিণীকে হত্যা করেছেন। বিষণ্ন মনে, শ্বেত দ্বীপে নারায়ণের কাছে চলে গেলেন। নারদকে দেখে ভগবান বললেন, 'দেবর্ষি! সঙ্গীতে তুমি এখনো তুম্বুরুর সমকক্ষ হতে পারনি। দ্বাপরে আমি যদুকুলে কৃষ্ণ নামে জন্মাব। তখন তুমি আমার কাছে এসো। আমিই তোমাকে গান শেখাব। তুমি তুম্বুরুর মতো পারদর্শী হবে। তোমার আর কোনো ক্ষোভ থাকবে না।'

সে তো অনেক পরের কথা। আপাতত নারদ মুনি বীণাধারী হয়ে ত্রিভুবনে হরি গুণগান করে পুণ্য সঞ্চয় করবেন। পরোক্ষে সীতা মায়ের ধরায় আগমনের পথ প্রশস্ত করবেন। কিন্তু মা জননী আপনার আগমনের রহস্য যে অতীব চমকপ্রদ। আপনি ধরিত্রীকন্যা, কিন্তু ধূলা হতে কি জীবন সম্ভব! তাহলে যে কাহিনী বাল্মীকি মুনি অন্তরালে রেখেছিলেন সেটি প্রকাশ্যে আনি, আপনার অনুমতি নিয়ে। দেখুন, আপনাদের আগমন এবং তারপরে কী ঘটবে নারদ তা সবই জানতেন, আর বাল্মীকিকে বলেছিলেন। আপনারা আবির্ভূত হওয়ার পূর্বেই মুনিবর বাল্মীকি সব লিখে ফেলেছিলেন, সে এক বিরাট মহাকাব্য। আপনারা পর্বে পর্বে সেই সব ঘটনাকে নিজেদের জীবনে রূপায়িত করেছিলেন, যেন অভিনয়।

শুনি তাহলে, কী বলছেন মুনিবর! দশানন রাবণের কথা বলছেন, বলছেন সীতা মায়ের জন্মকথা। তবে শুরু হোক সেই কাহিনী— দশানন রাবণ বসেছেন দুশ্চর তপস্যায়। কী তাঁর কামনা! দৈত্যরাজ কী চাইছেন? চাইছেন শক্তি! 'আমি অমর হতে চাই। ত্রিলোকে আমার আধিপত্য বিস্তার করতে চাই— একমাত্র আমার শাসন— তর্জন, গর্জন।' দীর্ঘ তপস্যা। সেই তেজে জগৎ দগ্ধ হয় আর কি! চতুর্দিক শুষ্ক, জলহীন। খাঁ, খাঁ প্রান্তর। যজ্ঞাদি ক্রিয়া বন্ধ। তীব্র রৌদ্রতাপ। দাবানল। অনাহারে মৃত্যু। ব্রহ্মা রাবণকে দর্শন দিয়ে বললেন, 'কী চাই তোমার?'

রাবণ বললেন, 'প্রভু! আমাকে অমরত্ব বর প্রদান করুন।'

ব্রহ্মা বললেন, 'অন্য বর চাও।'

বুদ্ধিমান বিচক্ষণ রাবণ তখন বললেন, 'বেশ, তাহলে আমাকে এই বর দিন, সুর, অসুর, যক্ষাদি, কিন্নর, পিশাচ, উরগ (সর্পাদি), রাক্ষস এবং অপ্সরাদের মধ্যে কেউ যেন আমাকে বধ করতে না পারে।'

ব্রহ্মা বললেন, 'আমি তোমাকে অমরত্ব দিচ্ছি না। একটা কোনো পথ তো খোলা রাখতে হবে।'

রাবণ বললেন, 'অবশ্যই। সেটি হল— যদি আমি কোনো সময়ে মোহবশে কামার্ত হয়ে আমার কন্যাকে গ্রহণে উদ্যত হই এবং কন্যা যদি তাতে অসম্মত হয়, তাহলে সেই অপরাধে আমার যেন মৃত্যু হয়।'

ব্রহ্মা মৃদু হেসে বললেন, 'তথাস্তু'। ব্রহ্মা অদৃশ্য হলেন। দেবতারা চিরকালই নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনেন। আসলে তা নয়, একটা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে হাতে কলমে শিক্ষা দান। একরকম নয়, বহুরকমের জীবনের অবস্থার ক্রিয়াকাণ্ড। সৃষ্টির উল্লাস। তা না হলে মজাটাই থাকত না। মহাকাব্যের মশলা মিলত না। জমকালো, জীবন্ত একটা জগৎ তৈরি হত না।

ব্রহ্মার বরে বলীয়ান নিশাচর, দুর্ধর্ষ রাক্ষস রাবণের খেলা শুরু হল। ত্রস্তব্যস্ত করার যাবতীয় কর্মকাণ্ড। ব্রহ্মা নির্বিকার। বরদানের আগে একবারও কি ভাবলেন— সাধারণ মানুষের কী হবে, কী হবে অরণ্যচারী ঋষি-মুনিদের! রাবণ তো তমোগুণী! রাত্রির চেয়েও অন্ধকার তাঁর অন্তর্লোক। তাঁর রাক্ষসবাহিনী নিয়ে ত্রি-জগতে দাপিয়ে বেড়াতে লাগলেন। দেবতাদের তুচ্ছজ্ঞান করে ত্রিভুবন জয় করে ফেললেন। একদিন প্রবেশ করলেন দণ্ডকারণ্যে। শান্ত অরণ্যে ঋষিরা সব ধ্যানস্থ। বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে বেদমন্ত্র। অগ্নির আবাহনে নিরত সাগ্নিক ঋষিরা। রাবণ ভাবলেন, এই দৃশ্য কি সহ্য করা যায়, আমি যখন ভূলোকের অধিপতি! ভোগ, নৃশংসতা, যুদ্ধ, ধ্বংস করাই তো আমার ধর্ম। সব জয় করার পর এই অঞ্চলটির এ কেমন ছবি!

রাবণ বীর দর্পে সমবেত ঋষিদের বললেন, 'আমি দশানন, আমি রাবণ! ব্রহ্মার বরে আমি অমর। এই জগৎ এখন আমার শাসনে। আমি তোমাদের জয় করতে এসেছি। তোমরা আনত হয়ে আমার শাসন স্বীকার করো, জয় ঘোষণা করো।'

শান্ত, নীরব ঋষিরা উপেক্ষার দৃষ্টিতে বিশাল রাবণের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কে তুমি? এলে কোথা থেকে! তোমার যত অনুচর এই অরণ্যের শান্তি অনেকদিন ধরেই নষ্ট করছে, যজ্ঞস্থল লণ্ডভণ্ড করছে। তুমি আর নতুন কথা কী বলতে এলে দৈত্যরাজ! কোনো উৎপাতেই আমাদের কিছু হয় না, হবে না।

ক্ষিপ্ত রাবণ বললে, 'তাহলে রক্ত ঝরুক। আমি ঋষি রক্ত পান করে আমার ক্রোধ শান্ত করি।'

সেই দণ্ডকারণ্যে তপস্বী তাপসরা ছাড়াও এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর নাম গৃৎসমদ। এই ব্রাহ্মণের অনেকগুলি পুত্র ছিল, কোনো কন্যা ছিল না। তাঁর পত্নীর বড়ই ইচ্ছা, যদি একটি কন্যা হয়। স্বামীকে তাঁর ইচ্ছার কথা জানালেন— সংসারে একটি কন্যা যদি আসে, সে যে কী আনন্দের হবে! ব্রাহ্মণ গৃৎসমদ আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন গৃহিণীর আশাকে— যেমন তেমন কন্যা নয়, আমাদের কন্যা হয়ে আসুন লক্ষ্মীদেবী। সেই মতো শুরু হল তাঁর নিত্য আরাধনা। যথাবিধ মন্ত্র উচ্চারণ করে, কুশাগ্রে দুগ্ধ গ্রহণ করে এটি কলসীর মধ্যে নিক্ষেপ করতেন। তারপর সেটিকে অরণ্যের নিভৃতে রেখে নিজের গৃহে ফিরে যেতেন।

কে জানত দানব রাবণ অরণ্য বিজয়ে আসবে। কিন্তু রাক্ষসরাজ সেই কলসীটি হঠাৎ আবিষ্কার করে ভাবলে, বাহ্! এই তো একটি সুন্দর পাত্র। এই পাত্রে আমি অগ্নিকল্প ঋষিদের শোণিত সংগ্রহ করব। শুরু হল নিরীহ, শান্ত ঋষিদের ওপর দানবীয় বল প্রয়োগ। তীক্ষ্ণ শরের আঘাতে তাঁদের পুণ্যদেহ থেকে শোণিত নির্গত করে সেই কলসটি ভরে ফেললেন। ব্রাহ্মণের সঞ্চিত দুধের সঙ্গে মিশে গেল ঋষি রক্ত। রাবণ অরণ্য বিজয় করে ফিরে গেল তার রাজধানী শ্রীলঙ্কায়। তারপর! রাবণ সেই কলসটি তাঁর পত্নী মন্দোদরীকে দিয়ে বললেন, 'তুমি এটি অতি যত্নে রক্ষা করবে। এতে আছে ঋষিদের শোণিত, যা গরলের চেয়েও শতগুণ তীব্র। এই পরম বস্তু তুমি কাউকে দেবে না, নিজেও কখনও দুঃসাহসী হয়ে পান করবে না। এত দিনে আমার ত্রিলোক বিজয় সম্পূর্ণ হল।'

জননী সীতা! এইবার দেখুন, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! শুধু মনে রাখুন ঋষিদের শোণিতে পূর্ণ ওই কলসে রয়েছে ব্রাহ্মণ গৃৎসমদের সঞ্চিত দুগ্ধ, যার প্রতিটি বিন্দুতে আছে মা লক্ষ্মীর মতো একটি কন্যা লাভের কামনা। এই কামনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঋষি রক্তের তেজ। শোণিত পরিণত হয়েছে বীর্যে। উল্লাসে উন্মত্ত রাবণ বেরিয়েছেন ভোগ

সফরে। দেবতা, দানব, যক্ষ, গন্ধর্বদের সুন্দরী কন্যারা দৈত্যরাজের শিকার। রাবণ কখনও মন্দারে, কখনও হিমালয়ে, সুমেরু কি বিন্ধ পর্বতে, রমণ উল্লাসে বেপরোয়া। তপস্যায় লাভ করেছেন তমোশক্তি। সুন্দরীদের নিস্তার নেই। রাবণ মেতেছেন রমণে।

মন্দোদরীর কর্ণগোচরে এল স্বামীর এই ব্যাভিচারের বার্তা। স্বামী যার বশে নেই, তার আর বেঁচে থেকে কী হবে! কী হবে এই স্বর্ণপুরী, বিলাসের জীবনে! প্রতিযোগিতায় পরাজিত। যৌবনের কাছে হার স্বীকার। আর নয়, মৃত্যুই এবার কাম্য। মন্দোদরী, তুমি মরো। কিন্তু বিষ কোথায়! গরল চাই গরল। কেন? ওই তো সেই শোণিত পূর্ণ কলস। সূর্যের মতো তেজ, ভীষণ উত্তাপ।

একটা ঘটনা ঘটাবেন আশাহত, অভিমানী দানবপত্নী। তার আগে জানার কৌতূহল হচ্ছে তাঁর পূর্ব পরিচয়। এমন এক দানব রাজের প্রধান মহিষী হলেন কী ভাবে! সে অনেক কথা! কাহিনীর শুরু কৈলাসে। কার্তিকেয়র জন্মতিথিতে ব্রাহ্মণ ভোজন করাবার জন্য পার্বতী কয়েকদিনের জন্যে কৈলাস থেকে চলে গেলেন। মহাদেব একা। এই সময় মধুরা নামে একজন অপ্সরা মহাদেবকে প্রণাম করতে এলেন। প্রণাম পরিণত হল বিহারে। পার্বতী ফিরে এসে সব জানতে পারেন। তাঁর অবর্তমানে শিবঠাকুর কী করেছেন! সেই দিনটি ছিল সোমবার। মধুরা সূর্যপূজা করে মহাদেবের কাছে এসেছিলেন, এবং তারপর দুজনে রঙ্গ করেছেন মনের আনন্দে। ক্ষুব্ধ পার্বতী মধুরাকে শাপ দিলেন, 'তুই ভেক হয়ে যা। একটা ব্যাঙ হয়ে কূপের মধ্যে পড়ে থাক।'

মধুরা শিবঠাকুরকে বললেন, 'ঠাকুর! সব অপরাধ কি আমার! আমি তো এসেছিলাম আপনাকে সোমবারের, শিববারের প্রণাম জানাতে।'

শিব বললেন, 'আমি তোমাকে বর দিচ্ছি, বারো বছর ভেক হয়ে থাকার পর, তুমি আবার নিজের দেহ ফিরে পাবে, আর ত্রিভুবন বিজয়ী এক বীরের সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে।'

মন্দের ভালো! মধুরা ভেকরূপ ধারণ করে একটি কূপে দিন কাটাতে লাগলেন। এইবার আর এক গল্প। কশ্যপ ও দনুর পুত্র ময়। একজন বিখ্যাত স্থপতি। হিমালয়ে গিয়ে ব্রহ্মার তপস্যা করে এই বিদ্যায় চরম দক্ষতা অর্জন করেন। দেবতা, অসুর সকলকেই নির্মাণের কাজে সাহায্য করতেন। তাক লাগিয়ে দিতেন। অসাধারণ সব প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। একবার দেবলোকের নৃত্যসভায় আমন্ত্রিত হলেন। এই সভাতেই হেমা নামে এক অপ্সরার প্রেমে পড়লেন। দেবতারা দুজনের বিবাহ দিয়ে দিলেন। ময় হিমালয়ের দক্ষিণে হেমপুর নগরী নির্মাণ করে দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন। ময়ের কোনো কন্যা ছিল না। ময় আর হেমা শিবের আরাধনা শুরু করলেন— বাবা! একটি কন্যা দাও।

এই তপস্যাস্থলের অদূরে একটি কূপ ছিল। সেই কূপেই মধুরা ছিল ব্যাঙ হয়ে। ময় আর হেমা যখন তপস্যায় বসেন তখন মধুরার ব্যাঙ-জীবনের বারো বছর শেষ। সে একটি সুন্দরী কন্যায় পরিণত হয়েছে। ময় একটি কন্যার ক্রন্দন ধ্বনি শুনতে পেলেন। কে কাঁদে! যেন সদ্যোজাত এক কন্যার ক্রন্দন। শিবের কাছে তাঁরা তো একটি কন্যাই প্রার্থনা করছেন। কান্না আসছে ওই নিকটস্থ কূপের ভেতর থেকে। অপরূপা সুন্দরী এক শিশুকন্যাকে তাঁরা কূপ থেকে উদ্ধার করলেন। দুজনে অভিভূত। বাবা তপস্যায় সাড়া দিয়েছেন। কোলে তুলে দিয়েছেন, জীবন্ত সুন্দরী এক কন্যা। নাম রাখলেন মন্দোদরী। অতি যত্নে পালন করলেন, বড় করলেন। এই সময় ময় হীরক, বৈদুর্য, ইন্দ্রনীল খচিত স্বর্ণময় একটি অপূর্ব প্রসাদ নির্মাণ করলেন। তাঁর অনেক কীর্তির একটি। ময় পরিচিত ছিলেন ময়দানব নামে। তাঁর অন্যতম পুত্র বলদানব। তিনি অতলে বাস করতেন। এ সব বাড়তি কথা। আসল কথা মন্দোদরী। সুন্দরী, যুবতী। অপ্সরার রূপে ময়দানবের মায়ামহল আলোকিত করে রেখেছে। একদিন ময় আর মন্দোদরী অরণ্য পথে বিচরণ করছেন। বসন্ত সমাগত। প্রফুল্ল বাতাসে হিল্লোলিত পুষ্প কুঞ্জ। এমন সময় বনপথে বিশাল এক মেঘ ছায়ার মতো আবির্ভূত হলেন রাবণ। তিনি মৃগয়া করে ফিরছিলেন। রাবণের দৃষ্টি কোনো সুন্দরীকে কি এড়িয়ে যেতে পারে!

ময় পরিচয় জানতে চাইলেন। দশানন বললেন, আমি লঙ্কেশ্বর রাবণ। ত্রিভুবনের অধিপতি। পাত্র হিসেবে খুবই ভালো। আর বীরের চরিত্র সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না!

রাবণের সঙ্গে মন্দোদরীর বিবাহ হল। ময় যৌতুক হিসাবে রাবণকে একটি মহাস্ত্র দান করেছিলেন। অস্ত্রটি তপস্যা করে পেয়েছিলেন। ভীষণ তার শক্তি। লঙ্কা যুদ্ধে এই অস্ত্রের আঘাতে লক্ষ্মণ জ্ঞান হারিয়েছিলেন। মন্দোদরী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ছিলেন। স্বামীর বিপরীত মেরুতে ছিল তাঁর অবস্থান। মা সীতা লঙ্কার অশোককাননে তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হবে। রাজসভায় সর্বসমক্ষে স্বামী রাবণকে তিনি বলবেন, সীতাকে প্রত্যার্পণ করো। যুদ্ধ নয় সন্ধি। অশোকবনে চেড়ীরা যখন আপনার ওপর অত্যাচার চালাবে, তখন বাধা দেবেন। তবে আপনার সম্বন্ধে একটি কথা বলবেন, যা শুনলে আপনার হয়তো মন্দ লাগবে। স্বামীর ক্ষিপ্ত অবস্থা দেখে বলেছিলেন, 'সীতা, সীতা! কি সীতা, সীতা করছে রাবণ, সে কি আমার চেয়ে সুন্দরী! রূপে, কুলে, দাক্ষিণ্যে সে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট।'

এ তো সব পরের ঘটনা। এখন স্বামীর ওপর অভিমানে মন্দোদরী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবেন। বিষ আছে ওই কলসে, ঋষি রক্তের আকারে। বিদায় পৃথিবী।

মন্দোদরী দুটি কাণ্ড করবেন। প্রথমটি হয়ে গেছে। পূর্ব জীবনে, যখন তিনি মধুরা, তখন মহাদেবের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছিল এবং দেবাদিদেবের সেই বীর্যটি ধারণ করে পার্বতীর শাপে ভেকরূপ ধারণ করে কূপে আবদ্ধ ছিলেন। বারো বছর পরে আবার নারী দেহ। সুন্দরী যুবতী হলেন। রাবণ তাঁর স্বামী। দেববীর্য সক্রিয় হয়ে গর্ভসঞ্চার। জন্মগ্রহণ করল পুত্র ইন্দ্রজিৎ। রাবণ জানতেও পারলেন না— কী থেকে কী হল!

দ্বিতীয় কাণ্ড— এই আত্মহননের চেষ্টা। কলসে রক্ষিত ঋষি-রক্ত এক ঢোঁক পান করলেন। মৃত্যুর অপেক্ষা। মৃত্যুর পরিবর্তে এল জীবন। মন্দোদরী গর্ভবতী হলেন। সর্বনাশ। দীর্ঘকাল স্বামীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। প্রশ্ন করলে, কী বলবেন! কার সন্তান গর্ভে ধারণ করেছেন!

মন্দোদরী রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করে তীর্থভ্রমণের ছলে কুরুক্ষেত্রে গমন করলেন। যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হল একটি কন্যাসন্তান। সেই সদ্যোজাত কন্যাটিকে স্বহস্তে কুরুক্ষেত্রের ভূমিতে প্রোথিত করে, সরস্বতীর জলে স্নান করে পবিত্র হয়ে লঙ্কার রাজভবনে ফিরে এলেন। মুক্তি। এই আখ্যানের অন্য একটি রকম আছে। রাজপ্রাসাদেই কন্যার জন্ম হল। রাবণ কন্যাটির রূপ দেখে আনন্দিত। শাস্ত্রজ্ঞ, জ্যোতিষী বিভীষণ যথাবিধ বিচার করে বললেন, 'দাদা! এটি তোমার মৃত্যুবাণ!

রাক্ষসকুল ধ্বংস করার জন্যে এসেছো।'

রাবণ হতচকিত। মন্দোদরীর গর্ভে জীবনের মোহিনী আকারে এল মৃত্যু। তিনি ছোট্ট সেই কন্যাটিকে নদীতে নিক্ষেপ করলেন। এখন আসরে আসবেন রাজা জনক। তিনি কোথা থেকে উদ্ধার করবেন আপনাকে? কুরুক্ষেত্রের ভূমি থেকে স্বর্ণ লাঙ্গল মুখে, অথবা সরযূর স্রোত তরঙ্গ থেকে। দ্বিতীয়টি থাক। প্রথমটিই গ্রহণ করি— 'ভূমিলক্ষ্মী সীতা'।

জননী জানকী?

কে তুমি?

আমি অনেক অনেক পরের মনুষ্যকুলের এক সামান্য মানুষ। তিনটে যুগ অতীত হয়ে গেছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর। আমি কলি যুগের এক সাঁতারু। কূল-কিনারাহীন সময়ের সমুদ্রে ভেসে, ভেসে চলেছি কোন অকূলে, তা কে জানে? তবু অতীত নিয়ে এই নাড়াচাড়া। সেই একটা সময়, তখন দেবলোক আর নরলোকের মধ্যে একটা যোগসেতু ছিল, এখন আর নেই। সম্বল কয়েক খণ্ড পুঁথি। কলের জাহাজ চলেছে অবিশ্বাসের পাল তুলে।

মা! আপনাকে ঘিরে সেই কালে তৈরি হয়েছিল বিরাট এক দৈব পরিকল্পনা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র— এঁরা সব এক একটি শক্তি। ঘটনার পর ঘটনা ঘটিয়ে ভবিষ্যতের নির্মাতা। মানুষ কেমন সহজ করে জটিল কথা বলতে পারে! শাস্ত্র বললেন, 'দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন।' সৃষ্টির একটা গতি অনাসৃষ্টির দিকে, যেমন তীর্থপথে দুষ্ট অশ্বের গতি গভীর খাদের দিকে।

স্বয়ং বিষ্ণু মানুষ হয়ে আসবেন রাজ কুলে, আপনাকে আসতে হবে সহধর্মিণী হয়ে। এই অধোগতি তো কাম্য হতে পারে না। স্বর্গলোক হতে দুঃখ, ব্যাধি, জরা, সংঘাত ক্লিষ্ট মর্তে গমন। ভগবান হবেন শাপগ্রস্ত, তাঁর গতি হবে অধোমুখী। জনক রাজার গৃহে এলেন মা লক্ষ্মী, নাম হল সীতা আর দশরথ রাজার পরিবারে আসবেন বিষ্ণু, নাম হবে রাম। এইবার দেখুন একটি নাটক। রচনা করেছেন, মহাসাধক শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব।

লঙ্কাপুরী-রাজসভা

সিংহাসনে সমাসীন রাবণ, অন্যান্য সভাসদগণ ও ব্রহ্মা

রাবণ— [ব্রহ্মাকে বলছেন] দেব! আপনার বিধান অখণ্ডনীয়, ইহা সাধারণের ধারণা; বস্তুত এ ধারণা অলীক। পুরুষার্থ প্রয়োগের দ্বারা আপনার বিধানও লঙ্ঘন করা যায়।

ব্রহ্মা— এ কথা কেন বলছ রাবণ? আমার বিধান অন্যথা করতে পারে এমন সাধ্য তো কারো নেই।

রাবণ— অপরের না থাকলেও রাবণের আছে! রাবণ স্বতন্ত্র পুরুষ, তার কাছে বিধাতার বিধানও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল।

ব্রহ্মা— আমার কোন্ বিধান তুমি খণ্ডন করেছ বৎস?

রাবণ— সেদিন আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম, দেব-দানব-যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব-কিন্নর কারো হাতে যখন আমার মরণ নেই, তখন আমি অমর! নর-বানর তো আমাদের ভক্ষ্য। কৌশলে আপনাকে বঞ্চিত করে আমি অমর হয়েছি। আপনি বললেন না রাবণ, মানুষই তোমাকে বিনাশ করবে। আমি বললাম, কে সে? কার পুত্র? আপনি বললেন অযোধ্যাপতি রাজা দশরথ কোশল-রাজকন্যা কৌশল্যাকে বিবাহ করবেন, কৌশল্যার গর্ভে 'রাম' নামে একটি পুত্র জন্মাবে, সেই রাম আমায় সংহার করবে। আমি আপনার কথা শুনে অযোধ্যায় গমন করে দেখলাম যুবক দশরথ সরযূতে নৌকার ওপর অবস্থান করছে, পাঁচদিন পরেই কোশল রাজকন্যার সঙ্গে তার বিবাহ হবে। রাজ্যে আনন্দোৎসব চলছে। আমি যুদ্ধ করে সকলকে পরাস্ত করলাম। দশরথ সরযূ সলিলে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। তাকে দেখতে পেলাম না। তারপর কোশল দেশে এসে কোশল রাজকন্যাকে হরণ করে পেটিকাবদ্ধ করলাম। তারপর সেই পেটিকাটিকে এক তিমিঙ্গিল মৎস্যের মুখে দিয়ে এলাম। তাই বলছিলাম লোক-পিতামহ! আপনার বিধানের আমার ওপর প্রভুত্ব করার শক্তি নেই, আমি আপনার বিধানেরও বিধাতা।

ব্রহ্মা— ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্।

রাবণ— এ কি সহসা আপনি পুণ্যাহ বাচন করছেন কেন?

ব্রহ্মা— গন্ধর্ব-বিধানে বিবাহ হচ্ছে যে।

রাবণ— কার? কোথায়?

ব্রহ্মা— পেটিকার মধ্যে রাজা দশরথের সঙ্গে কৌশল্যা দেবীর গন্ধর্ব বিবাহ হচ্ছে, তাই পুণ্যাহ বাচন করছি।

রাবণ— সে কি! সে কি! রাজা দশরথ ও কৌশল্যা তো ইহজগতে নেই, আমি তো উভয়কেই বিনষ্ট করেছি।

ব্রহ্মা— কেহই বিনষ্ট হয় নাই রাবণ। দশরথ ও সুমন্ত্র বৃহৎ এক কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বন করে ভাসতে ভাসতে সমুদ্র মধ্যে যে দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হন, সেই দ্বীপে তোমার কৌশল্যা পুরিত পেটিকা-গ্রাহক তিমিঙ্গিল পেটিকা রেখে অন্য প্রতিপক্ষ তিমিঙ্গিলের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়, ইত্যবসরে দশরথ ও সুমন্ত্র সেই পেটিকা উদ্ঘাটন করে তাতে কৌশল্যাকে দেখতে পান, সেই পেটিকা মধ্যে দশরথের সঙ্গে কৌশল্যার গান্ধর্ব বিধানে বিবাহ হচ্ছে। ওই দ্বীপে ওই ভাবে তাঁদের গন্ধর্ব বিবাহ হবে এ আমার বিধান, তুমি রামজননী কৌশল্যাকে বহন করে আনবে এও আমারই বিধান, বুঝলে রাবণ?

রাবণ— আপনি অসম্ভব কথা বলছেন!

ব্রহ্মা— আমার বিধানে সম্ভব-অসম্ভব কিছু নেই, সবই সম্ভব, আবার সবই অসম্ভব। ইচ্ছা করলে আমার কথার পরীক্ষা করতে পার।

রাবণ—উত্তম— নিকুম্ভ, তুমি সত্বর ওই দ্বীপ হতে সেই পেটিকা নিয়ে এসো।

নিকুম্ভ— আর্য! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য।

রাবণ— দেব! আপনার একথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না, কোথায় সরযূ আর কোথায় সমুদ্র, কী করে এরূপ যোগাযোগ হতে পারে? পিতামহ! আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন বোধ হয়!

ব্রহ্মা— বেশ তো, একটু অপেক্ষা কর, এখনি সব সংশয় দূর হবে।

রাবণ— অসম্ভব, অসম্ভব।

[নিকুম্ভ পেটিকাটি নিয়ে এল, খুলে দেখা গেল দশরথ ও অন্যান্যদের]

রাবণ— [চমকিত ভাবে] এ কী! এ কী! সত্যই তো, সত্যই তো! দশরথ, কৌশল্যা! এ কী আশ্চর্য!

দশরথ, কৌশল্যা, সুমন্ত্র পেটিকা থেকে বেরিয়ে এসে ব্রহ্মাকে প্রণাম করলেন।

রাবণ— দেখি এবার কে রক্ষা করে। [অসি নিষ্কাসন করে আঘাত করার উদ্যোগ]

ব্রহ্মা— সাবধান রাবণ। তুমি এদের কেশাগ্র স্পর্শ করো না! একজনকে পেটিকায় রেখেছিলে তিনজন হয়েছে, এখনি শত শত, সহস্র সহস্র লোক এই পেটিকা থেকে বেরিয়ে

আসবে। এই মুহূর্তেই রাম জন্মগ্রহণ করে তোমায় ধ্বংস করবেন।

[রাবণ হতবাক। অসি কোষবদ্ধ করে ব্রহ্মার দিকে তাকিয়ে]

ব্রহ্মা— এখনও কিছুদিন যদি জীবিত থাকতে চাও, নবদম্পতিকে সসম্মানে অযোধ্যায় পাঠিয়ে দাও।

রাবণ— কুম্ভ! তুমি পিতামহের আজ্ঞা পালন কর।

কুম্ভ— যথা আজ্ঞা, (দশরথের প্রতি) আপনারা উপবেশন করুন। অযোধ্যায় নিয়ে যাই।

নাটক শেষ হল মা। আপনার রাম আসছেন অযোধ্যায়, রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ব্রহ্মার ইচ্ছায়। রাবণ তাহলে অমর নয়। মরতে তাকে হবেই এবং রামের হাতে। এখন দেখি জনকপুরীতে আপনি কী করছেন— সুন্দরী বালিকা। আবার আপনি যে শাপগ্রস্ত হবেন দেবী! রাজা দশরথ গ্রহরাজ শনিকে প্রসন্ন করে রাজ্যকে রক্ষা করেছিলেন করাল দুর্ভিক্ষ থেকে; কিন্তু আপনার ভাগ্য কেন বারে বারে এমন বিপন্ন হবে! জগতের কোন কল্যাণে! বুঝেছি— দুঃখ আর দুর্ভাগ্যের গলাতেই আপনি বরমাল্য পরাতে চান। ভগবান রঘুবীরেরও নিষ্কৃতি নেই।

ছোট্ট একটি টিলার ওপর আপনি বসে আছেন, সঙ্গে দুই প্রিয় সখী। দ্বিপ্রহর, মৃদু বাতাস। চার পাশ সবুজ। উজ্জ্বল নীল আকাশ। একটি গাছের ডালে দুটি সুন্দর পাখি বসে আছে। সবুজ টিয়া। পাখি দুটি নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। আপনি দুটি শব্দ যেন বুঝতে পারছেন। পাখি দুটি বলছে— রাম সীতা, রাম সীতা। সীতা তো নিজের নাম! রাম সে আবার কে? তবে শুনতে বেশ ভালো লাগছে। বেশ একটা আরাম! রাম নাম বড় মধুর। 'ওরে! তোরা বিহঙ্গ দুটিকে ধরে আন আমার কাছে।'

সখীরা পাখি দুটিকে ধরেছে। ভয়ে কর্কশ চিৎকার করছে। সীতা তাদের শান্ত করে বলছে, 'ও পাখি, তোমাদের ভয় নেই। শুধু বলো, তোমরা কোথা থেকে এলে? বারে, বারে ও কার নাম বলছ! রাম রাম, অবিরাম?'

শুক তখন বললে, 'সে এক ঋষি, তাঁর নাম বাল্মীকি, আমরা দুজনে তাঁর আশ্রমে থাকি। সেই মান্যবর মুনি প্রতিদিন তাঁর শিষ্যদের একটি কাহিনী শোনান। একটু, একটু করে, দিনের পর দিন। যে ঘটনা একদিন ঘটবে, সেই সব কথা তিনি আগেই বলে দিচ্ছেন, একেবারে ছবির মতো। আমরা সব মনে রেখেছি।'

সীতা বললেন, 'ও শুক। আমাকে সেই কাহিনী একটু শোনাও না। তুমি কি জান না, আমিই যে সেই সীতা, জনক নন্দিনী— জানকী!'

শুক বললে, 'তাহলে শোনো। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি অযোধ্যায় রাজা দশরথের জন্যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করবেন। স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু নিজেকে চারভাগে বিভক্ত করে দশরথের চার পুত্র হয়ে জন্মাবেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হবে রাম। মুনি যে সংস্কৃত বলেছিলেন সেদিন তা আমাদের কণ্ঠস্থ। বালিকা! তোমাকে বলছি শোনো—

রামো মহীপতির্ভূমৌ ভবিষ্যতি মনোহরঃ।
তস্য সীতেতি নাম্না তু ভবিষ্যতি মহেলিকা।।
সীতয়া সহ বর্ষাণাং সহস্রাণ্যেক যুগ্ দশ।
রাজ্যং করিষ্যতি ধীমান্ কর্ষণ ভূমিপতীন্ বলী।।
ধন্যা সা জানকী দেবী ধন্যোঽসৌ রামসঞ্জিতঃ।
যৌ পরম্পরমাপন্নৌ পৃথিব্যাং রমতো মুদা।। [ওঁঙ্কারনাথ]

বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে দশরথপুত্র রাম মিথিলায় আসবেন,

অন্য রাজগণের অসাধ্য ধনু উত্তোলন করবেন, হরধনুতে গুণ চড়াতেই সেটি তিন টুকরো হয়ে যায়। এক টুকরো উড়ে গেল আকাশে। আর এক টুকরো প্রবেশ করল পাতালে, আর এক টুকরো স্থলভাগের যেখানে পড়বে, সেই স্থানটি হবে চিরকালের এক পুণ্যতীর্থ ধনুষধাম।

[বিশেষ বক্তব্য, কাহিনীর সঙ্গে সত্যকে মেলাবার চেষ্টা চিরকালের। এখানেও তাই। ভক্তদের বিশ্বাস— বর্তমান নেপালের জনকপুরেই ছিল রাজর্ষি জনকের রাজধানী। জনকপুর থেকে ৫৬ কিলোমিটার দূরে সীতামারীতে জনক রাজা হলকর্ষণের সময় সীতাকে পেয়েছিলেন। জনকপুর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে হরধনুর তৃতীয় খণ্ডটি পড়েছিল। সেই কারণেই স্থানটির নাম ধনুষধাম। হলকর্ষণের স্থানে নির্মিত হয়েছে সাদা মার্বেল পাথরের প্যাগোডাধর্মী জানকী মন্দির। আছে জনক মন্দির, আর রাম-সীতার বিবাহ মন্দির। ধনুষধামে হরধনুর চূর্ণ বিচূর্ণ খণ্ডিত অংশগুলি ফসিলের আকার ধারণ করেছে। মন্দিরগুলির গঠনে বৌদ্ধ ভাস্কর্যের প্রভাব।]

ধনু ভঙ্গ করে সুমনোহর জনকনন্দিনী সীতাকে প্রাপ্ত হবেন এবং তাঁর সঙ্গে রাজ্য করবেন। এই সব কথা ও অন্য অনেক রামকথা আমরা সেই আশ্রম থেকে শিখেছি। শুনলে সুন্দরী! এবার আমাদের ছেড়ে দাও।'

আপনি পাখি দুটিকে কিছুতেই ছাড়তে চাইবেন না। আপনার মধুর লেগেছে রাম নাম, রাম কথা। 'পাখি তুমি আরও বলো, আরও বলো। হে শুকী! সে রাম কোথায় আছেন এখন? কেমন দেখতে! কী ভাবে তিনি সীতার পাণিগ্রহণ করবেন!'

শুকী বললে, 'তাহলে শোনো সেই কাহিনী— সূর্যবংশে দশরথ নামে একজন রাজা হবেন। যাঁর সাহায্যে দেবতারাও শত্রু জয় করবেন, তাঁর পত্নী হবেন তিনজন। তাঁদের গর্ভে চারটি পুত্র হবে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাম, তাঁর কনিষ্ঠ ভরত, তাঁর অনুজ লক্ষ্মণ, সর্ব কনিষ্ঠ শত্রুঘ্ন। রামের অনন্ত নাম, পদ্মকোষের মতো তাঁর সুন্দর মুখ, পঙ্কজের মতো তাঁর সুদৃশ্য, সুদীর্ঘ নয়নযুগল, উন্নত পৃথুল মনোহর নাসিকা, ভ্রূযুগল পরস্পর সংলগ্ন, আজানুলম্বিত সুন্দর বাহুদ্বয়, কণ্ঠদেশ কম্বুবৎ, শ্রীবৎস চিহ্নিত কবাটের ন্যায় বিশাল বক্ষ, সুন্দর উরুদ্বয় আর পাদপদ্ম দুটি অখিল ভক্তগণ সর্বদা সেবা করেন; সেই রঘুনাথের রূপের তুলনা নাই, শত মুখেও রামের রূপ বর্ণনা করা যায় না। আমি ক্ষুদ্রপক্ষী, আমার কি সাধ্য আছে যে, তাঁর রূপ গুণ বর্ণনা করি! তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্মী নিয়ত চরণ সেবা করেন। জগতে এমন কে আছে সেই কোটি কন্দর্পের দর্পহর শ্রীরঘুনাথকে দেখে না মুগ্ধ হয়!

জয় রঘুনন্দন রাম নিরঞ্জন জনকসুতা রতিকান্ত
সুর-নর-বানর খেচর নিশাচর যছুগুণ গাবে অনন্ত;
দুর্বাদল নব শ্যামল সুন্দর, কঞ্জ-নয়ন রণ-ধীর!
বামে ধনুর্ধর, দক্ষে নিশিত শর, জলধি-কোটি-গম্ভীর
শ্রীপদ পাদুক, ধর ভরতানুজ চামর ছত্র নো ধারী।
শিব চতুরানন, সনক সনাতন, শতমুখ রহ করজোড়ী
ভকত-আনন্দন, মারুত নন্দন, চরণ কমল করুঁ সেবা।

পাখি বললে, 'সেই জানকী দেবী ধন্যা, যিনি অযুত বর্ষকাল সেই রামের সঙ্গে বিহার করবেন। আচ্ছা, তুমিই বা কে সুন্দরী? এইরকম আদর করে বার বার শ্রীরামের কথা শুনতে চাইছ?'

সীতা— ও পাখি! তুমি যে জানকীর কথা বললে আমি সেই জানকী! রাম রাম রাম, আহা শুক, তোমার কথা যে ভারি মিষ্টি। যতদিন না শ্রীরাম আসেন ততদিন আমি তোমাদের ছাড়ব না। আমি দিবারাত্র তোমাদের মুখে রাম – কথা শুনবো। তোমরা নানা রকমের সুমিষ্ট বস্তু ভোজন করে আমার কাছে সুখে থাকবে।

শুকী বললে, 'কন্যা, আমরা বনের পাখি, বনের বৃক্ষে বাস করি, সর্বত্র উড়ে উড়ে বেড়াই, তাইতেই আমাদের সুখ, গৃহবাসে আমাদের প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া আমি এখন গর্ভবতী। আমাদের ছেড়ে দাও। প্রসব হয়ে যাওয়ার পর আমরা আবার এসে তোমাকে রাম-কথা শোনাবো।'

সীতার সেই এক কথা, ছাড়বো না কিছুতেই। রাম কথা শুনবো আমি অবিরাম। রাম, রাম!

শুক বললে, 'সীতে তুমি আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে কেন বন্দী করে রাখতে চাইছ? মুক্তি দাও। আমরা দুজনে উড়ে যাই অরণ্যে। দেখ সীতে! আমার পত্নী সন্তানসম্ভবা। কথা দিচ্ছি, সন্তানের জন্মের পর আমরা আবার আসব।'

সীতা— 'তোমার যেখানে খুশি তুমি চলে যাও। শুকীকে আমি ছাড়বো না। সে আমার কাছে থাকবে, পরম আদরে থাকবে। তুমি যেতে চাইলে চলে যাও।'

শুক— সুন্দরী! সাথী ছাড়া আমি বাঁচি কেমন করে! তোমার কাছে আমার কাতর প্রার্থনা, আমার সঙ্গিনীকে তুমি মুক্তি দাও।

সীতা— না, না, না, আমি ছাড়তে পারবো না। কে আমাকে রাম-কথা শোনাবে!

শুকী— দেখ সীতে! তুমি যেমন আমার পতির সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটালে ঠিক সেইরকম গর্ভাবস্থায় তুমিও তোমার পতি রামের সঙ্গ বঞ্চিতা হবে।

[রাম রাম বলতে বলতে শুকী দেহত্যাগ করল]

সীতা— শুকী! শুকী! বল বল শ্রীরাম কবে আসবেন? শুকী! শুকী! ও সখী, এ যে মরে গেল যাঃ, রাম রাম রাম।

শুক— সীতে! তোমার জন্যে আমার প্রিয়া ভার্যাকে হারালাম। এইবার শোন সীতা আমি জনপূর্ণ রামের নগরে জন্মগ্রহণ করব, আমার কথায় তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গ হারাবে। আমি এই প্রার্থনা করে গঙ্গায় দেহত্যাগ করবার জন্য চললাম।

শুক আকাশ পথে উড়ে গেল, দূর থেকে দূরে। দিয়ে গেল নিদারুণ অভিশাপ।

জানকী! কেন এই একগুঁয়েমি করলেন! বুঝেছি, ভবিতব্য, ভবিতব্য!

পৃথিবীর দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে মা চলেছেন জগৎপথে। কর্ষণের ক্ষতে জন্মাবে ফসল। দুঃখের অশ্রু হবে সেচের জল। ধুলোর ঝড়ে দৃষ্টি হারা দৈবজ্ঞ।

শুক পাখি সম্বোধন করছিল 'সীতে' বলে, আমি বলব 'জননী জানকী'! আমাকে কিছু বলবেন?

'বলবো, আমি ধরিত্রী জননী! দ্যাখ শ্রী শ্রী চণ্ডীতে একটি আছে 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু। ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ'——সব নারীই আমার বিগ্রহ, জননী রূপা, আমি, একমাত্র আমি-ই, একাকিনীই এই জগতের অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছি। কখনো হাসছি, কখনো গুমরে গুমরে কাঁদছি। কখনো জন্মাচ্ছি, কখনো মরে যাচ্ছি। দিন আর রাত্রি পর্যায়ক্রমে আসছে। আলো আর অন্ধকার। প্রকাশ আর অপ্রকাশ এই দুনিয়া একটা খেলাঘর— এইটাই সত্য। এখন দেখ বাল্মীকি মুনি দীর্ঘ

একটি কাহিনী লিখলেন, চরিত্ররা সব সেজেগুজে নেমে গেল অভিনয়ে।'

'তাহলে মা, চলুন যাই কলকাতার ন্যাশান্যাল থিয়েটারে। সময়ের কাঁটাটাকে একটু ঘোরাই, ২৮ ফাল্গুন, ১২৮৮ সাল। এই কালের বিখ্যাত এক নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখা নাটক 'সীতার বিবাহ' মঞ্চস্থ হবে। এই দেখুন হ্যান্ডবিল। এই থিয়েটারের তত্ত্বাবধায়ক প্রতাপচন্দ্র জহুরী। এই দেখুন তারিখ, ১১ মার্চ ১৮৮২। আজই প্রথম রাত। অভিনয়ে কারা রয়েছেন দেখুন, বিশ্বামিত্র— স্বয়ং গিরিশচন্দ্র, জনক— নীলমাধব চক্রবর্তী, রাম— অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), লক্ষ্মণ— কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাবণ— অঘোরনাথ পাঠক, পরশুরাম ও কালনেমি— অমৃতলাল মিত্র, জনকপত্নী, ক্ষেত্রমণি, অহল্যা— কাদম্বিনী, আর আপনার ভূমিকায়, সীতা— ছোট রানী।'

আমার পাশে চুপটি হয়ে বসুন। রূপ ঢেকে রাখুন। রাতের কলকাতার রঙ্গালয় পাড়ায় অনেক রকমের উৎপাত থাকে। রঙ্গালয়ে কিছু বেসামাল লোকও আসতে পারে। কনসার্ট শুরু হয়েছে। পর্দা সরে যাচ্ছে। দেখুন, ধর্মদাস সুর কেমন নতুন ধরনের মঞ্চ করেছেন। একটার ওপর আর একটা— দ্বিতল। এই প্রথম, আগে এমন স্টেজ কখনো হয়নি! জনকের রাজসভা! দারুণ হয়েছে, তাই না!

দেখুন, কৈলাসে মহাদেবের কাছে ব্রহ্মা এসেছেন। যাই বলুন, দেবতারা বেশ স্বার্থপর। সেই এক কথা, রাবণ বধ। ব্রহ্মা বলছেন, 'কহ হে পার্বতী নাথ/ দশাস্য নিপাত হইবে কেমনে/ ঘুচিবে দেবের ত্রাস?/ কৃত্তিবাস/ রক্ষ-বংশ-ধ্বংস হেতু করহ উপায়!' এইবার শুনুন গান। গিরিশচন্দ্রের কলমে শক্তি আছে, প্রচুর লেখাপড়া। আপনাকে নিয়ে লেখা। সুর, ইমন কল্যাণ, ঝাপতাল,

গাও গাও সবে জানকী-মিলন
জগজন-তারণ প্রেমে
ভক্তি মুক্তি গতি রাম রঘুপতি
পরমা-প্রকৃতি সতী জানকী বামে।

'পরমা-প্রকৃতি সতী', ভারী সুন্দর। ভক্ত গিরিশ। দক্ষিণেশ্বরে, রাসমণির কালীবাড়ির উদ্যানে মাতৃসাধক, অবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আপনি দর্শন দিয়েছিলেন। আমরা তাঁকে ঠাকুর বলি। গিরিশচন্দ্র সেই ঠাকুরের কৃপা লাভ করেছেন। ঠাকুর গিরিশের নাটক দেখতে থিয়েটারে আসেন। যেমন আজ আপনি এসেছেন। যদিও আপনাকে কেউ চিনতে পারছে না। ভক্ত সাধক না হলে ভগবানকে চেনা যায়! ওই শুনুন, ব্রহ্মা জানতে চাইছেন, কেমনে হইবে দেব জানকী-মিলন? মহাদেব বলছেন, 'জনক সদনে আমি প্রেরিব ভার্গবে ধনু লয়ে/ ধনুর্ভঙ্গে হবে রাম-সীতার মিলন।'

এই ধনুটিও এক মহা সমস্যা। আপনার পালক পিতা জনকরাজার কাছে এল কী-ভাবে! বিশ্বামিত্র জানতে চাইছেন। রাজা জনক বলছেন, 'দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের পর মহেশ্বর এই ধনু দেবতাদের দিয়েছিলেন। তাঁরা আমার পূর্বপুরুষদের কাছে এটিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে রেখেছিলেন [ন্যাস হিসেবে]। একদিন যজ্ঞভূমি শোধনের জন্যে আমি ক্ষেত্র কর্ষণ করছিলাম সেইসময় সীতামুখে (লাঙল) অযোনিজা কন্যা সীতাকে প্রাপ্ত হই। সীতা বড় হতে লাগল। আমার চিন্তা কন্যাটিকে কোন্ যোগ্য পুরুষের হাতে সমর্পণ করব! আমার মন বলে উঠল— জনক! যে- রাজকুমার এই ধনুতে জ্যা যোজনা করতে পারবে সে-ই হবে সীতার স্বামী। আমার এই ঘোষণা শুনে, বিভিন্ন দেশের রাজারা এসে ধনুটিকে উত্তোলনের চেষ্টা করে অকৃতকার্য হলেন। কালনেমিকে নিয়ে রাবণও এসেছিল। পারেনি। লজ্জায় মামা-ভাগনে পালিয়ে গেল। ব্যর্থ রাজারা একজোট হয়ে মিথিলাপুরী অবরোধ করে একবছর ধরে নানারকমের অত্যাচার চালাল। আর কোনো উপায় না দেখে আমি তপস্যায় বসলাম। দেবগণ আমার সাহায্যে চতুরঙ্গ সেনা পাঠালেন। মিথিলা অবরোধ মুক্ত হল। এখন একমাত্র ভরসা দাশরথি রাম। তিনি যদি এই ধনু আকর্ষণ করতে পারেন তাহলে আমার অযোনিজা কন্যা সীতার একটা গতি হবে।'

বিশ্বামিত্র বললেন, 'আপনি রামকে ধনুপ্রদর্শন করুন।'

তখন, জনক রাজার আদেশে পাঁচ হাজার বলশালী বাহক একটি মঞ্জুষা (লৌহ সিন্দুক) টানতে টানতে রাজসভায় নিয়ে এল। সেটিতে লাগানো রয়েছে আটটি সুবৃহৎ লোহার চাকা। জনক রাজা সেই মঞ্জুষার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে ব্রহ্মন্! এই শ্রেষ্ঠ ধনু জনক বংশীয়গণ এবং উত্তোলনে অসমর্থ রাজগণ দ্বারা পূজিত। মানব তো দূরের কথা, দেব দানব গন্ধর্ব যক্ষ রক্ষ কিন্নর উরগগণও আকর্ষণ, উত্তোলন, জ্যা রোপণ, টঙ্কার দিতে পারেন নি। আপনার আদেশে আনা হয়েছে। রাজকুমাররা এখন দেখুন।'

বিশ্বামিত্র বললেন, 'বৎস রাম ধনুটি দর্শন কর!'

শ্রীরামচন্দ্র এগিয়ে গেলেন সেই বিশাল লৌহ সিন্দুকটির দিকে। দর্শকরা ভাবছেন এই সামান্য যুবকটির পক্ষে কি সম্ভব হবে, সিন্দুকের ডালা খুলে ধনুকটি বের করে এনে জ্যা রোপণ করা! মহাদেবের শক্তির সঙ্গে এই তরুণ মানবটির শক্তির তুলনা চলে কি? নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হবে। স্বয়ং দশানন মানে মানে সরে পড়েছেন। বলশালী অন্য রাজারা সাহস পাননি। মানবের অসাধ্য, দানবেরও অসাধ্য। রাজা জনক তো বলেই দিলেন। কন্যা সীতার বিবাহ তিনি চাইছেন না, বোঝাই যায়। রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা— কী হয়, কী হয়!

আশ্চর্য কাণ্ড, শ্রীরাম এক ঝটকায় সিন্দুকের ভারি ডালাটি খুলে ধনু স্পর্শ করে বিশ্বামিত্রের দিকে তাকালেন— 'দেব অনুমতি করুন।'

বিশ্বামিত্র ও জনক দুজনেই সমস্বরে বললেন, 'তুমি ধনু গ্রহণ কর।'

শ্রীরামচন্দ্র বাঁ হাতে ধনুর মাঝখানটা ধরে ঊর্ধ্বে তুলে, ডান হাতে জ্যা রোপণ করলেন অবলীলায়, যেন কোনো ব্যাপারই নয়! তারপরেই দিলেন টঙ্কার, তারপর— 'আকর্ণ আকর্ষণে ধনু দ্বিধা ভগ্ন হইল, পর্বতবিদীর্ণ ও ভূমিকম্প শব্দবৎ ধনুর্ভঙ্গ শব্দে বিশ্বামিত্র, জনক, লক্ষ্মণ ও রাম ব্যতীত সকলের মোহপ্রাপ্তি, দেব দুন্দুভিবাদ্য, রামের উপর পুষ্পবর্ষণ, কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে আশ্বস্ত হইলেন। অন্তপুরস্থ গবাক্ষজাল হইতে স্ত্রীগণের উলুধ্বনি দান। [ওঙ্কারনাথ]

অভিভূত জনক আসন হতে উঠে দাঁড়ালেন, স্থির গলায় বললেন, 'অচিন্তনীয়, পরমাশ্চর্য বীর্য প্রত্যক্ষ করলাম। দশরথ নন্দন অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। আমার কন্যা সীতা বীর্য-শুল্কা, আজ আমার এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হল, সত্য হল। আমার প্রিয়তমা জানকীকে আমি রামের হস্তে সমর্পণ করব। কোথায় আমার সীতা। অন্তঃপুরে সংবাদ দাও।'

ওই যে, সখীগণ সহ জনক কন্যা সীতা আসছেন, স্বর্ণময়ী মালা হস্তে কম্পিতপদে।

মিথিলাপতি জনক রাজা কন্যাকে সাহস দিচ্ছেন, 'জানকী মা,

এই যে দশরথপুত্র রাম হরধনু ভঙ্গ করেছেন, ইনিই তোমার স্বামী, এই দিব্য পুরুষের গলদেশে মাল্য অর্পণ কর। লজ্জা কিসে! কেন দ্বিধা! তুমি ক্ষত্রিয় কন্যা, এই স্বয়ম্বর সভাস্থলে বরমাল্য দান করে পতিকে বরণ করাই আমাদের চির প্রচলিত নিয়ম। লজ্জা কোরো না, মাল্যদান কর।'

ভক্ত সাধক চিরকালের ভক্তিপটে সেই অলৌকিক বরণ দৃশ্য যখনই ইচ্ছা করেন তখনই প্রত্যক্ষ করেন। তেমনি এক পরম ভক্ত তুলসীদাস। তিনি প্রত্যক্ষ করছেন এই অলৌকিক 'সভা দৃশ্য'।

তন সকোচু মন পরম উছাহু। গূঢ় প্রেমু লখিপরই না কাহু।।
জাই সমীপ রাম ছবি দেখি। রহি জনু কুআঁরি চিত্র অবরেখী।।

সীতার শরীরে সঙ্কোচ মনে কিন্তু পরম উৎসাহ। তাঁর সুগভীর প্রেম কেউ জানতেই পারল না। শ্রীরামচন্দ্রের সামনে গিয়ে তিনি যেন পটে আঁকা একটি ছবির মতো হয়ে গেলেন।

সখীরা বুঝতে পেরেছে, তারা কানে কানে বলছে— পহিরাবহু জয়মাল সুহাঙ্গ। মালাখানি গলায় পরিয়ে দাও। যত দেরি করবে তোমার অঙ্গ তত বিবশ হবে। সীতা দুহাতে মালাটি তুলে নিলেন; কিন্তু পরাতে পারছেন না। শেষে হাত দুটি এগোচ্ছে, আর তুলসী কি দেখছেন!

সোহত জনু জুগ জলজ সনালা।
সসিহি সভীত দেত জয়মালা।।
গাবহিঁ ছবি অবলোকি সহেলী।
সিঁয় জয়মাল রাম উর মেলী।।

সুশোভিত অলঙ্কার খচিত হাত দুটি যেন মৃণালসহ দুটি পদ্মফুল ভয়ে ভয়ে চন্দ্রকে জয়মালা পরাচ্ছে। সখীরা সব গীত গাইছে, আর সীতা মালাটি দুলিয়ে দিলেন শ্রীরামচন্দ্রের গলায়। স্বর্গে, মর্ত্যে মহা সোরগোল, আনন্দের হিল্লোল, রাম আর সীতার মিলন। সেই অপূর্ব মিলনের, যুগল মিলনের ছবিটি কেমন? যেন আদিরস ও সুষমা একত্রে মিলিত হয়েছে! সখীরা বলছে, 'সীতা! তুমি এইবার শ্রীরামের চরণ স্পর্শ করো।' সীতা ভয় পাচ্ছেন। কেন? গৌতম ঋষির পত্নী ওই চরণস্পর্শে শাপমুক্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন। সীতা এখনই মুক্তি চাইছেন না। জীবন এই তো সেদিন শুরু হল। এখনো অনেক, অনেক লীলা বাকি। দ্বাপরের প্রান্তে গিয়ে শেষ হবে। রঘুবীর ধনু ফেলে দেবেন, শ্রীকৃষ্ণ তুলে নেবেন বাঁশি। যুদ্ধ, যুদ্ধ, কত যুদ্ধ। সীতার মনোভাব বুঝতে পেরে রামের মুখে মৃদু হাসি।

সভায় সীতার সেই আরক্তিম রূপ দর্শন করে কোনো কোনো রাজার মনলুব্ধ হল। ভোগবাসনা জাগল। তুলসী বলছেন, 'মূর্খ, মূঢ়, কুপুত্রদের মুখ ক্রোধে লাল হয়ে উঠল। সেই হতভাগা রাজারা বর্ম পরে যত্রতত্র ঘুরে ঘুরে আস্ফালন করছিল। কেউ বলল, সীতাকে কেড়ে নাও, এই দুই রাজকুমারকে ধরে বেঁধে ফেল। হরধনু ভাঙলেই সব হয়ে গেল নাকি, আমরা বেঁচে থাকতে রাজকুমারীকে কে বিবাহ করতে পারে? জনকরাজা যদি সাহায্য করে তাহলে তাকেও শেষ করে দোবো। এই নির্লজ্জ রাজাদের দেখে লজ্জাও লজ্জিত হল। রাজ সমাজহি লাজ লজানী। আরে বাপু! তোমাদের শৌর্য, বীর্য, মর্যাদা, অহঙ্কার— সবই তো ওই ভগ্ন ধনুকটির সঙ্গে চলে গেছে। এখন মুখে যে বীরত্ব দেখাচ্ছ, সেই বীরত্ব আগে ছিল কোথায়! এই দুর্বুদ্ধির জন্যেই বিধাতা তোমাদের মুখে কালি লেপে দিয়েছেন।

দেখহু রামহি নয়নভরি তজি ইরিষা মদু কোহু।
লখন রোষু পাবকপ্রবল জানি সলভজনি হোহু।।

ঈর্ষা, দম্ভ আর ক্রোধ ত্যাগ করে এখন দু চোখ ভরে শ্রীরামরূপ দেখ। জান না ক্রোধ হল প্রবল, হুহু-অগ্নি, পতঙ্গ হয়ে সেই আগুনে ঝাঁপ দিও না।'

রাজকীয় মহা সমারোহে, যথারীতি বৈদিক ও লৌকিক বিধিমতে রাজা দশরথের চারপুত্রের একই সঙ্গে বিবাহ হবে। রাজা জনকের দুই কন্যা, সীতা ও উর্মিলা। রাজা জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের দুই কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি। উর্মিলা হবেন লক্ষ্মণের স্ত্রী, মাণ্ডবী ভরতের আর শ্রুতকীর্তি শত্রুঘ্নের। ইক্ষ্বাকু ও বিদেহ রাজবংশের মহামিলন। দুই মহামুনি বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ এই অপূর্ব মিলন সম্ভব করলেন। রাজা দশরথ তাঁর পার্ষদদের নিয়ে মিথিলায় এলেন। বিরাট অনুষ্ঠান, প্রচুর দানধ্যান। এইবার তিনি পুত্র, পুত্রবধূদের নিয়ে ফিরছেন অযোধ্যায়। রাজগুরু বশিষ্ঠদেব রয়েছেন সঙ্গে। বিশ্বামিত্র বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন উত্তর পর্বতে। কত সুখ, কত আনন্দ! দর্পণে মুখ দেখতে গিয়ে রাজা দশরথ তাঁর কেশ তটে বয়সের চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এইবার রাজ-সিংহাসনের অধিকার দেওয়ার সময় হয়েছে। প্রজারা খুশি হবে, দেশ আরো সমৃদ্ধ হবে, রাজা হবেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র, মহাবীর রাম। রাজরানি সীতা।

রথ ছুটছে অযোধ্যার দিকে। দশরথ যত মধুর চিন্তায় ক্রমশই নিমজ্জিত হচ্ছেন। সুদীর্ঘকাল রাজ্য শাসনের দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। এইবার অবসর। সুযোগ্য চারপুত্র, চারজন সুন্দরী পুত্রবধূ, নিজের তিন পত্নী। আর যুদ্ধ কেন? এইবার শান্তি। রথ চলেছে। চাকার শব্দ। অশ্বক্ষুরের তাল সমন্বিত পরিচিত ধ্বনি। চতুর্দিকে পাখির কূজন। হরিণের বিচরণ; কিন্তু কোথায় যেন অসঙ্গতি। কিসের একটা আশঙ্কা! বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'অশুভ পাখিরা এমন বিকট চিৎকার করছে কেন? মৃগেরা আমাদের প্রদক্ষিণ করছে কেন? এ-সব কি কোনো অশুভ লক্ষণ! হঠাৎ আমার প্রসন্ন মনে বিষণ্ণতা আসছে কেন? বশিষ্ঠদেব মধুর কণ্ঠে বললেন, 'রাজন! এ সব অবশ্যই লক্ষণ, পাখিদের এই বিকৃত সুর ইঙ্গিত দিচ্ছে, সামনে বিপদ। আবার মৃগরা প্রদক্ষিণ করছে, এতে মনে হচ্ছে— বিপদ এলেও, বিপদ কেটে যাবে। আপনি সমস্ত দুশ্চিন্তা ত্যাগ করে প্রশান্ত হোন।'

বশিষ্ঠদেব সাহস দিলেও, আকাশ, বাতাস যেন ভীষণ ভয়ের ইঙ্গিতই দিচ্ছে। গভীর অন্ধকার ঘনিয়ে এল, উন্মাদ, ঝোড়ো বাতাস। ভূমি কাঁপছে। বড়, বড় গাছ উৎপাটিত হচ্ছে। এত অন্ধকার যে, রথ কোন দিকে যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না। গতি আছে দিশা নেই। চারপাশ ভস্মে ঢেকে গেল। সৈন্যরা হতচকিত। আরোহীরা সকলেই অচেতন, কেবল রাজা দশরথ, ঋষি বশিষ্ঠ, অন্যান্য ঋষিগণ ও দশরথের চার পুত্র সচেতন রইলেন। পদাতিক সৈন্যরা ভস্মাচ্ছাদিত। ধাবমান অশ্বদের শরীর থেকে ছাই ঝরে পড়ছে। তীব্র বাতাসে রুদ্রের জটাজালের মতো উড়ছে। সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করছে। যেন একদল দিশাহারা অন্ধ ঘোর অন্ধকারে ধাবমান। হঠাৎ বিশাল এক পর্বত গতিরোধ করে দাঁড়াল। সব স্তব্ধ। রাজা দশরথ দেখছেন, পর্বত নয়, পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছেন ভৃগুবংশ জাত জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম। বাল্মীকি ঋষির বর্ণনা,

'দদর্শ ভীমসঙ্কাশং জটামণ্ডলধারিণম্। ভার্গবং জামদগ্নেয়ং রাজা রাজবিমর্দনম্। কৈলাসমিব দুর্ধর্ষং কালাগ্নিমিব দুঃসহম্।'

তিনি ভীষণদর্শন, জটামণ্ডলধারী এবং ক্ষত্রিয়ঘাতী, বিশাল কৈলাস পর্বতের মতো তিনি দুর্ধর্ষ। প্রলয়কালীন

অগ্নির মতো তিনি অসহ্য। ভীষণ তেজে তিনি যেন জ্বলছেন। কাঁধে তাঁর কুঠার, হাতে বিদ্যুৎপুঞ্জের মতো ধনু এবং ভীষণ বাণ। যেন ত্রিপুর ধ্বংসকারী রুদ্র। ভীষণদর্শন ভার্গবকে সামনে দেখে বিশিষ্ট ঋষিরা, যাঁরা রথে দশরথের পাশে বসেছিলেন এবং বশিষ্ঠ দেব, তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, পিতৃহত্যার প্রতিশোধে, ক্রোধে একদা ইনি ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস করেছিলেন। ক্রোধ প্রশমিত হয়েছিল। আবার কি সেই ক্রোধ জাগ্রত হয়েছে! আবার কি ক্ষত্রিয় হত্যার জন্যে কুঠার তুলেছেন! ঋষিরা অর্ঘ দিয়ে অর্চনা করে মধুর ভাষায় শান্ত গলায় বললেন, 'রাম রাম, আমাদের অর্ঘ, বন্দনা গ্রহণ করে তুষ্ট হোন।'

পরশুরাম সরাসরি শ্রীরামকে সম্বোধন করে বললেন, 'হে বীর রাম, তোমার বিস্ময়কর শক্তির কথা প্রচারিত। তোমার ধনু ভাঙার কথা জগতের সবাই শুনেছে। অচিন্তনীয়, অবাক করা ঘটনা। আমি সেই সংবাদ পেয়ে চলে এসেছি। আমার হাতে এই যে ধনুটি দেখছ, এটি ধর তো দেখি! এই ভয়ঙ্কর ধনুটি হল জমদগ্নির। এতে বাণ যোজনা করে তোমার শক্তি আর একবার দেখাও তো দেখি। তারপর আমি তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হব।'

তাঁর কথা শুনে রাজা দশরথ বিষণ্ণমুখে, দীনভাবে, করজোড়ে বললেন, 'হে মহাওজস্বী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করে আপনি তো এখন বেশ শান্ত। আমার বালক পুত্রদের আপনি দয়া করে অভয় দিন। মহর্ষি ভৃগুর বংশধরেরা স্বাধ্যায়বান, ব্রতপরায়ণ। তাঁদের বংশে আপনার জন্ম। ইন্দ্রের কাছে প্রতিজ্ঞা করে আপনি শস্ত্রত্যাগ করেছেন। আপনি ধর্মকে আশ্রয় করে কশ্যপকে পৃথিবী দান করে বনে গিয়ে মহেন্দ্রপর্বতে আশ্রয় নিয়েছেন। হে মহামুনে, আপনি আমার সব ধ্বংস করার জন্য এসেছেন। রাম না থাকলে আমরা কেউই বাঁচবো না।'

পরশুরাম দশরথের কথার কোনো গুরুত্ব দিলেন না। তিনি রামকে বললেন, 'শোনো রাম, দুটি ধনুর বিবরণ তোমাকে আগে শোনাই। যে ধনুটি তুমি ভেঙেছ, প্রথমে সেটির কথা। বিশ্বকর্মা দৃঢ় এবং শক্তিশালী দুটি ধনু নির্মাণ করেছিলেন। যুদ্ধের সময় দেবগণ একটি ধনু মহেশ্বরকে দান করেছিলেন। মহেশ্বর সেই ধনু দিয়ে ত্রিপুরাসুরকে বধ করেন। রাম, তুমি যেটি ভেঙেছ, সেটি হল ওই শিবধনু। দুর্ধর্ষ দ্বিতীয় ধনুটি দেবতারা বিষ্ণুকে দিয়েছিলেন। রাম এই দ্বিতীয় ধনু, বৈষ্ণব ধনুটি শত্রুপুরী জয় করতে সক্ষম। এই দ্বিতীয় ধনুটি প্রথমটির মতোই সমান শক্তিশালী। শোনো তাহলে, দেবলোকের একদিনের একটি ঘটনার কথা, তোমাকে বলি— দেবতারা একদিন সবাই মিলিত হয়ে বললেন, বললেন জগৎ পিতামহ ব্রহ্মাকে— আপনার বিচারে শিব এবং বিষ্ণুর মধ্যে কার শক্তি বেশী? দেব পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের অভিপ্রায় বুঝতে পারলেন। দেবতারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বরের মধ্যে একটা বিরোধ সৃষ্টি করতে চাইছেন। এই বিরোধে তাঁদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। ঘোরতর যুদ্ধ। হঠাৎ শিবের ভীষণ ধনুটি শিথিল হয়ে পড়ল। বিষ্ণুর হুঙ্কারে মহেশ্বর স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তখন দেবতারা চারণদের নিয়ে সেখানে এলেন। প্রার্থনা করলেন শান্তি। বরেণ্য দেবতা দুজন শান্ত হলেন। শৈব ধনুটিকে শিথিল দেখে ঋষিগণ সহ দেবতারা বিষ্ণুকেই অধিক শক্তিশালী বলে মেনে নিলেন। শিবও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বিদেহ দেশের রাজা দেবারতকে সেই ধনু বাণসহ দান করলেন। হে রাম, আমার হাতের এই ধনুটি সেই শত্রুপুরী ধ্বংস-সমর্থ বৈষ্ণবধনু। ভগবান বিষ্ণু ভৃগুবংশীয় ঋচীককে এই ধনুটি বন্ধক দেন। মহাতেজস্বী ঋচীক মহাপ্রাণ জমদগ্নিকে এই ধনু দান করেন। তপঃশক্তিতে শক্তিমান আমার পিতা জমদগ্নি শস্ত্র ত্যাগ করেন। দুর্বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে কার্তবীর্যার্জুন আমার পিতৃদেবকে হত্যা করে।

[কার্তবীর্যার্জুনের কাহিনী: কৃতবীর্যের পুত্র— কার্তবীর্যার্জুন বা অর্জুন। বংশ লতিকা: যযাতি > যদু > সহস্রজিৎ > একবীর > ভদ্রসেন > কৃতবীর্য > কার্তবীর্য। নর্মদার তীরে হৈহয় রাজ্যের রাজধানী মাহিস্মতী। কার্তবীর্য রাজা হয়ে গার্গ মুনির কাছে অমিতবলশালী হবার জন্য উপদেশ চাইলেন। গার্গ তাঁকে দত্তাত্রেয়র কাছে পাঠালেন। অত্রিপুত্র দত্তাত্রেয় মুনির কাছে হাজার হাত পেয়ে অজেয় হয়ে উঠলেন। দশ হাজার যজ্ঞ করলেন। ত্রিলোকের রাজা হলেন। একদিন অগ্নি এসে তাঁর কাছে কিছু ভিক্ষা চাইলেন। রাজা কিছু পাহাড় ও বন দান করলেন। অগ্নি সেই সব পোড়াতে শুরু করলেন। আগুনে আপব মুনির আশ্রম পুড়ে গেলে, মুনি শাপ দিলেন রাজার সব হাত কাটা যাবে। হৈহয়রা ক্ষত্রিয়; কুল পুরোহিত ভৃগু বংশীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে, ক্রমে সমস্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষের সূত্রপাত।

কার্তবীর্যের পরিণতি— মৃগয়ায় গেছেন। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে জমদগ্নি মুনির আশ্রমে এসে দেখছেন, আশ্চর্য সেই কামধেনু। কামধেনুটি তাঁর চাই। শুরু হল ঋষি জমদগ্নির সঙ্গে লড়াই। জমদগ্নি নিহত হলেন। কামধেনুটি ব্রহ্মলোকে অন্তর্হিত হল। কার্তবীর্য বাছুরটিকে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। প্রতিশোধ নেবার জন্যে পরশুরাম শিষ্য অকৃতব্রণকে সঙ্গে নিয়ে মাহিস্মতী আক্রমণ করে একে একে রাজার সব হাত কেটে ফেললেন, অবশেষে শিরচ্ছেদ।]

'পিতার মর্মান্তিক এবং অন্যায়ভাবে মৃত্যুর কথা শুনে আমি ক্রোধের বশে বহু ক্ষত্রিয়কে হত্যা করেছি। তারপর সমগ্র পৃথিবীকে নিজের অধিকারে এনে যজ্ঞ করে দক্ষিণা হিসেবে কশ্যপ মুনিকে সব দান করে দিয়ে মহেন্দ্রপর্বতে প্রস্থান করি।

শৈব ধনু ভাঙার সংবাদ শুনে আমি সেই মহেন্দ্রপর্বত থেকে চলে এসেছি। আমার হাতে এই দেখ সেই অজেয় বৈষ্ণবধনু, যা আমি পিতৃপিতামহক্রমে পেয়েছি। রাম! তুমি নিজেকে অদ্বিতীয় ক্ষত্রিয় বীর বলে মনে করো! এইবার প্রমাণ করার সময় উপস্থিত। দেখাও তোমার বীরত্ব। শত্রুপুরী ধ্বংসকারী এই বাণ তুমি এই ধনুতে যোজনা করো। দেখি রাম তোমার কত শক্তি।'

রথে গুরুজনরা রয়েছেন। রয়েছেন বধূরা। শ্রীরামচন্দ্র সেই কারণে সংযত এবং ধীর। প্রতিপক্ষও যথেষ্ট সমান্বিত, বীর শ্রেষ্ঠ। রাম বললেন, 'হে ভৃগুবংশধর পরশুরাম, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়ে পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হবার জন্যে আপনি যা করেছেন, সব শুনলাম, সমুচিত বলে মেনেও নিলাম; কিন্তু আপনি আমাকে মনে করছেন দুর্বল, বীর্যহীন, ক্ষত্রিয়ের বীর ধর্ম পালনে আমি অক্ষম। আপনার কথায় যথেষ্ট অবজ্ঞার ভাব। আজ আপনি আমার তেজ ও বীর্যবত্তা দর্শন করুন।'

কথা শেষ করেই ক্রুদ্ধ রামচন্দ্র চকিতে পরশুরামের হাত থেকে ধনু ও বাণ ছিনিয়ে নিলেন। গুণ যোজনা করে অক্লেশে বাণ স্থাপন করলেন; তারপর পরশুরামকে বললেন, আপনি ব্রাহ্মণ, আমার পূজনীয়, আমার পূজ্য মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ভগ্নীর পৌত্র, অতএব আপনি আমার অতীব পূজ্য। সেই কারণে এই প্রাণঘাতী শর নিক্ষেপ করতে পারছি না, যদিও

ইচ্ছা হচ্ছে। এই মুহূর্তে আপনার ঔদ্ধত্য, আপনার গতিশক্তি স্তব্ধ করে দি, তপোবলে অর্জিত আপনার অতুলনীয় রাজ্যগুলি বিনষ্ট করে দি। এই দিব্য বৈষ্ণব বাণের নিদারুণ শক্তি আপনার অজানা নয়। এই বাণ কোথাও নিক্ষিপ্ত হলে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ঋষি বাল্মীকি জানাচ্ছেন, শ্রীরামচন্দ্র ধনুটি ধারণ করা মাত্রই সমগ্র জগৎ যেন স্পন্দনহীন, জড় হয়ে গেল। আর পরশুরাম শক্তিহীন হয়ে দশরথনন্দন রামের দিকে তাকিয়ে রইলেন অসহায় দৃষ্টিতে। তাঁর অমিত তেজ নির্বাপিত। চর্তুদিকে ভস্মরাশি বাতাসে উড়ছে জটাজালের মতো। তাঁর বীরত্বের মহাযুগ আজ শেষ হয়ে গেল। নিবীর্য, জড়ীভূত পরশুরাম কমল নয়ন রামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠে বললেন, ‘পূর্বে কাশ্যপকে আমি যখন বসুন্ধরা দান করেছিলাম, তখন কাশ্যপ আমাকে আদেশ করেছিলেন, আমার রাজ্যে তুমি বাস করো না। এই আদেশের পর, হে রাম! আমি আর একটি রাতও এই পৃথিবীতে বাস করিনি! হে বীর রামচন্দ্র, তুমি আমার গতিশক্তি হরণ কোরো না। আমি এখনই আমার মহেন্দ্রপর্বতে প্রস্থান করতে চাই। আমার কাল শেষ হল। তপস্যার বলে আমি যে-সব রাজ্য অধিকার করেছিলাম এই বিধ্বংসী বাণের দ্বারা তুমি সব ছারখার করে দাও। আর কালবিলম্ব কোরো না। এই ধনু আকর্ষণ করাতেই আমি বুঝতে পেরেছি, তুমিই হলে সেই অবিনাশী মধুদৈত্যবিনাশী দেবাধিপতি বিষ্ণু। হে শত্রুপীড়ক তোমার মঙ্গল হোক। ত্রিভুবনপতি তুমি। তুমি যে আমাকে পরাস্ত করেছ, তাতে আমার কোনো লজ্জা নেই। হে শোভনব্রতিন তোমার অতুলনীয় শর তুমি নিক্ষেপ করো।’

জমদগ্নি পুত্র পরশুরাম এই কথা বললে প্রতাপশালী দাশরথি রাম সেই ভয়ঙ্কর শরটি নিক্ষেপ করলেন। যে-অন্ধকারে চারিদিক সমাচ্ছন্ন হয়েছিল, বিপুল ভস্মরাশিতে সব ঢেকে গিয়েছিল, অলৌকিক আলোর ছটায় দিঙ্মণ্ডল বিভাসিত হল। বিরাট এক ছায়ামূর্তি গগন পথে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, অন্ধকারের কুণ্ডলী উত্তরীয়ের প্রান্তের মতো পশ্চাদগামী; পরশুরাম দেখছেন, তাঁর অধিকারের রাজ্যগুলি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বিদায় ভৃগুনন্দন!

শ্রীরামচন্দ্র সেই বৈষ্ণবী ধনুটি বরুণদেবকে সমর্পণ করে দিলেন। দেবতারা এতক্ষণ সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলেন। স্বর্গ, মর্ত, পাতাল, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র তাঁরা বিচরণ করতে পারেন। স্থান অথবা কালে তাঁরা আবদ্ধ নন। পরশুরামের মুক্তি তাঁরা দেখলেন। সুদীর্ঘ একটি কালের অবসান। সমস্ত দুর্যোগ অন্তর্হিত। সময় আবার সময়ে ফিরে এল। জগতের ঘড়ি দুলতে শুরু করল। ক্ষয় আর অক্ষয়ের পরিসরে। রাজা দশরথ ও অন্যান্যরা যেন জীবন ফিরে পেলেন। রামচন্দ্র বিহ্বল পিতাকে প্রণাম করে বললেন, ‘অনুমতি করুন, আমাদের যাত্রা আবার শুরুহোক। সামনে দীর্ঘ পথ। পুত্রের মাথায় দুটি হাত রেখে দশরথ ভাবছেন, এ কে? মানুষ, না দেবতা! জনকনন্দিনী সীতা। কী বুঝছেন? কার গলায় দিয়েছেন মালা! সুখের সংসার পাতবেন অযোধ্যার রাজমহলে? সোনার পালঙ্ক, হাজার দাস, দাসী! স্বর্ণরথ, গজ, অশ্ব।

শ্রেষ্ঠ মেঘপুঞ্জের মতো শ্রীরামচন্দ্রের তিন মহলা প্রাসাদ। ‘কনক ভবনে’ আপনাদের ‘প্রথম মিলন’ রাতের সুন্দর একটি কল্পচিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন মহাসাধক

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথ দেব। তিনি ছিলেন রামময়। তাঁর শ্বাসে-প্রশ্বাসে চলত রামনাম। আমাদের আহ্বান করছেন, 'হের সখে, সীতারামে প্রথম মিলন।' পুষ্পভূষিত পালঙ্কে, পুষ্পভূষিত শ্রীরাম, অর্ধশায়িত। পুষ্পভূষণ পরিহিতা সীতা পদসেবা করছেন।

শ্রীরাম— সীতা!

শ্রীসীতা— কী বলছেন?

রাম— অযোধ্যা কেমন লাগছে?

সীতা— ভাল।

রাম— মিথিলার চেয়ে?

সীতা— হ্যাঁ।

রাম— আচ্ছা জানকী, তুমি আগে আমায় দেখেছ?

সীতা— হ্যাঁ।

রাম— কবে?

সীতা— যখন ধনুভঙ্গ করেন।

রাম— তার আগে?

সীতা— তার আগে না দেখলেও, আপনাকে প্রথম দেখেই চেনা-চেনা মনে হল, যেন কোথায় দেখেছি, কী জানি কোথায় বা বোধহয় স্বপ্নে দেখে থাকব।

রাম— আমার নাম কতদিন শুনেছ?

সীতা— অনেক দিন।

রাম— কার মুখে?

সীতা— একটি শুকপাখীর মুখে।

রাম— কী শুনেছিলে?

সীতা— (নীরব)

রাম— বলো। চুপ করে রইলে কেন?

সীতা— না বলবো না।

রাম— বলো লজ্জা কি, পাখী কী বলেছিল?

সীতা— পাখী বলেছিল, অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা হবেন, তাঁর রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন নামে চারটি পুত্র হবে, জ্যেষ্ঠপুত্র রাম মিথিলায় হরধনু ভঙ্গ করে...

রাম— সীতাকে বিবাহ করবে! পাখী এ সব কথা পেল কোথায়?

সীতা— বাল্মীকি নামে এক মুনি আছেন। তিনি ভবিষ্যৎ রাম চরিত্র যোগবলে জেনে রামায়ণ রচনা করেছেন। তাঁর শিষ্যরা সর্বদা রামগুণ গান তা শুনে পাখীরা শিখেছে।

রাম— তারপর, তারপর আমি বলি, তুমি পাখীটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করলে, রোজ তার মুখে আমার কথা শুনবে বলে।

সীতা— পাখীটাকে রাখতে পারলুম না। সে তার স্বামীর সঙ্গে যাবার জন্যে অনেক কাকুতি মিনতি করতে লাগল, কিন্তু আমি তাকে না বললে সে আমায় শাপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করলে।

রাম— পাখী কী শাপ দিলে?

সীতা— পাখী বলেছিল যেমন গর্ভাবস্থায় তুমি আমায় স্বামী সঙ্গ বিয়োজিতা করলে, তেমনি তোমার গর্ভাবস্থায় রাম তোমায় ত্যাগ করবেন।

রাম— বটে! এর মধ্যে শাপও হয়ে গেছে, তা বেশ, আচ্ছা এরপর তুমি কী করলে?

সীতা— কেবল আপনার নাম জপ করতাম আর আপনি কবে এসে ধনুর্ভঙ্গ করে আমায় নেবেন তা ভাবতাম। পথ চেয়ে থাকতাম। কোন দিন আকুল হয়ে কাঁদতাম। মনে হয়, রামের নাম যে করে, সে কাঁদে। না কাঁদলে রামকে কি পাওয়া যায়!

রাম— বলো, বলো সীতা, তারপর কী হল?

সীতা— সখীরা খবর আনত, দশরথ রাজার পুত্র রামের কত বীরত্ব!

এক বাণে তাড়কা রাক্ষসীকে মেরেছেন, সুবাহু ও অন্যান্য রাক্ষসদের বধ করেছেন। বিশ্বামিত্র মুনির যজ্ঞ রক্ষা করেছেন। বিশ্বামিত্র মুনি তাঁকে মিথিলায় নিয়ে আসবেন, আমরা তাঁকে দেখতে পাব। তারপর শুনলাম, আমাদের পুরোহিত মহাশয়ের মা অহল্যা স্বামীর শাপে পাষাণ হয়ে গিয়েছিলেন, আপনার পাদস্পর্শে মানবী হয়েছেন।

রাম— এত সব শুনে তুমি কী করলে?

সীতা— অবিশ্রাম আপনার নাম, রাম, রাম, জয় রাম। শুনলাম, আপনার পাদস্পর্শে নাবিকের কাঠের নৌকা সোনা হয়ে গেছে।

রাম— শুনে কী করলে?

সীতা— কবে সেই সোনা করে দেওয়া শ্রীচরণ দুটি আমি স্পর্শ করতে পারবো! অনুক্ষণ সেই চিন্তা।

রাম— তারপর?

সীতা— তার পর সবই তো তুমি জানো। যাঃ, তুমি বলে ফেললাম!

— তুমিই তো বলব, আপনি কত দূর, তুমি কত কাছে, কত আপন! সীতা! তোমার আমার আজ এই প্রথম দেখা, তোমার কি খুব লজ্জা করছে?

সীতা— না গো, প্রথম দেখা বলে মনেই হচ্ছে না, তোমায় যেন কোথায় কত দেখেছি, একদিন, আধদিন নয়, কতদিন, কতযুগ ধরে দেখেছি! তুমি আমার যেন চির পরিচিত!

রাম— সীতা! তুমি কি জানো, তুমি কে?

সীতা— কেন, আমি তো জনকনন্দিনী সীতা।

রাম— এ ছাড়া আরো কিছু?

সীতা— কেউ বলে আমি পৃথিবীর কন্যা।

রাম— তার আগে কে ছিলে?

সীতা— সে আমি জানবো কেমন করে?

রাম— কেন? তোমার ওই রাম নাম জপ করলে শুনেছি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব জানা যায়, তুমি তো সেই রাম নাম খুব জপ করেছ, তাও জানতে পারনি?

সীতা— না।

রাম— সীতা, তুমি কিসের ওপর বসে আছ?

সীতা— কেন! বসে আছি সুন্দর এক খাটের ওপর।

রাম— ভালো করে দেখো।

সীতা— আরে না, এ যে একটা প্রকাণ্ড সাপ। দুধের সাগরে সাপটা ভাসছে। এ সাপটার অনেক মাথা। তোমার মাথার ওপর ফণা ধরে রয়েছে। সাপের মাথায় মানিক জ্বলছে, তোমার চার হাত হয়ে গেল কেন, এ সব কী?

রাম— বল দেখি কমলা, এ সব কী?

সীতা— ওঃ, এসব তোমার লীলা, আমার কিছুই মনে ছিল না। তবে এই অনন্তশয়নের চিত্র মাঝে মাঝে মনে উদিত হত, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারতাম না। তুমি ত বেশ! এতদিন দূরে রেখেছিলে, একবারও আমায় মনে পড়ত না? আমি তোমার জন্য কত কেঁদেছি, কত ভেবেছি, কত ডেকেছি! এখানে যতবার আন, ততবার দুঃখই দাও।

রাম— সীতা, তুমি সাপ কোথায় দেখলে? দুধের সাগর বা সাপ কোথা থেকে আসবে? এই ত ঘর, এই ত পালঙ্ক!
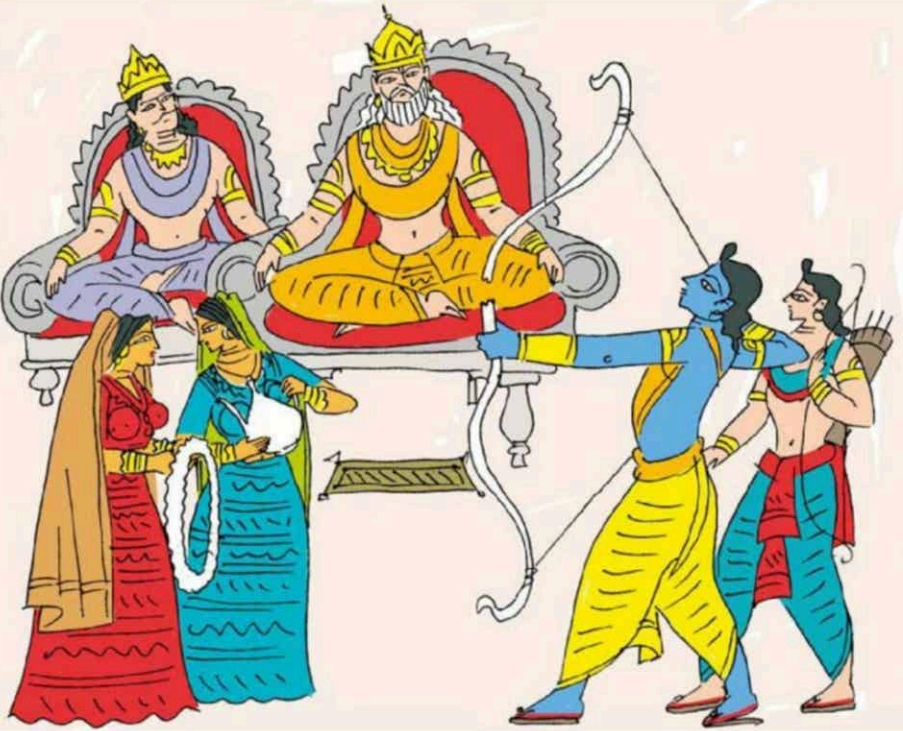
আমার চার হাত কী করে হবে?

অযোধ্যার প্রাসাদে ভোরের আলো। মধু-রাতের মাধুর্য প্রাত্যহিকতায় বিলীন হল। দেবতারা যখন মানবজীবন অঙ্গীকার করেন প্রকৃতিদেবী তখন তাঁদের অধিক কোনো সুযোগ দেন না। সেই এক দুঃখ, সুখ, দুর্যোগ, বার্ধক্য, মৃত্যু। বরং বেশি আদায় করে নেন। কারণ, আপনাদের সহ্যশক্তি অনেক বেশী। রাম অযোধ্যার রাজ সিংহাসনে আরোহণ করবেন। প্রজাপালক। সত্যাশ্রয়ী। ন্যায়দর্শী। পূর্ণ ব্রহ্ম পরাৎপর রাম। কালান্তক পরমেশ্বর রাম। সীতা-হৃৎপঞ্জর-শুকরাম।

সেই নারদঋষির হঠাৎ আগমন। স্বর্গের বার্তা বহন করে এনেছেন। সীতার প্রেমে রাম যেন আত্মহারা হয়ে না যান। রাজঐশ্বর্য যেন তাঁকে মোহগ্রস্ত না করে! নারদ স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছেন দুজনের স্বরূপ। মালা তখনো শুকোয়নি। সোহাগ-রাতের স্মৃতি তখনো টাটকা। ঘোর তখনো কাটেনি। দুজনের সামনে মূর্তিমান নারদ। স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছেন দুজনের স্বরূপ। পৃথিবীতে তাঁরা এসেছেন কেন, কি কারণে! নারদ এক নিশ্বাসে বলে চললেন, 'আমি কি জানিনা, রাম, তুমি বিষ্ণু, জানকী, তুমি লক্ষ্মী! রাম, তুমি রুদ্র, জানকী, তুমি রুদ্রাণী! তুমিই ইন্দ্র, জানকী শচী, তুমি ব্রহ্মা, জানকী সাবিত্রী, তুমি যম, জানকী নৈর্খতি, তুমি বরুণ, জানকী ভার্গবী, তুমি অনল, সীতা স্বাহা, তুমি বায়ু, সীতা সদাগতি, তুমি চন্দ্র, সীতা রোহিনী, তুমি কুবের, সীতা সর্ব সম্পদ। আমি জানি, জগতে স্ত্রীবাচক যা কিছু আছে সব জানকী, আর পুরুষবাচক যা কিছু আছে সব তুমি— রাম। তোমরা দুজন ছাড়া জগতে আর কিছু নেই।'

রাম— বৎস নারদ, এইবার বলো, হঠাৎ আসার কারণটা কী?

নারদ পিতার আদেশ; তিনি বললেন, যাও অযোধ্যায়, রামকে রাবণ-বধের কথা মনে করিয়ে দিয়ে এস। রাজ্যাভিষেকের আয়োজন হচ্ছে। রাম রাজা হয়ে সিংহাসনে একবার বসে গেলে, রাক্ষসবধের কী উপায় হবে! মুনি-ঋষিদের কে রক্ষা করবে!

রাম— মুনিবর! ভুলিনি, আমি কিছু ভুলিনি, ভোলার উপায় নেই। রামের ভাগ্য রাম হাতের মুঠোয় ধরে বসে আছে। আর একজনের ভাগ্য গাঁট ছড়ায় বেঁধেছে। ধুলোয় পা রেখেছি কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হব বলে। পিতাকে বোলো, দেব কার্য ভুলিনি, তবে তাদের প্রারব্ধ ক্ষয়ের জন্যে অপেক্ষা করছি। ক্রমে পৃথিবীর ভার হরণ করব। শুরু আর শেষ দুটোরই লগ্ন আছে। শেষ না হলে শেষ করা যায় কি? সবই তো এক একটি পালা! অঙ্কে, অঙ্কে এগোতে থাকবে যবনিকা পতনের দিকে। পালাকার তো সবই জানেন, তবে প্রশ্ন কেন? রাবণের ভাগ্য তো ভূমি থেকে উৎকীর্ণ করেছেন রাজা জনক। জুড়ে দিয়েছেন আমার ভাগ্যের সঙ্গে। সজ্জিত এই রাজকক্ষ, সুবর্ণ পালঙ্ক, যত উপাধান, বিলাসের যত উপকরণ, কিছুই থাকবে না মুনিবর। যা হবে, তা হয়েই আছে। এখন শুধু সময়ের পথ ধরে এগিয়ে চলা। মুনিবর! একটা কথা আজ শুনে যান, পিতা দশরথের কর্মফল হল রামের ভাগ্য আর

রামের কর্মফল হল সীতার ভাগ্য। রাম যখন মানুষ তখন সে জগতের নাগপাশে বাঁধা এক মহা যন্ত্রণা আর রাম যখন দেবতা তখন সে জগতাতীত মুক্তির মহানন্দ। তখন সাধকের কণ্ঠের সঙ্গীত— রামনাম সুখদায়ী, সাচ্চা মনসে ভজো রাঘব তো, ইকদিন মুক্তিপায়ী। ভূমি লক্ষ্মী সীতা আমাকে মুক্তির বন্ধনে বেঁধেছে। এক হাত দূরে সিংহাসন, ভোগ আর সুখের আহ্বান, সে রাজসুখ আমাদের জন্যে নয়। অরণ্যের আহ্বান, সমুদ্রের আহ্বান। দৈত্যপুরে দৈত্যরা অপেক্ষা করছে কবে আসবে রাম, আমাদের মুক্তি দাতা! সীতা ধরণীর ধূলা, আর সেই ধূলাই হবে রামের অঙ্গরাগ। আর কদিন পরেই তুমি এই দৃশ্য দেখবে,

চিত্রকূটে প্রত্যন্ত পর্বতময়
নির্জন প্রদেশে স্ফটিক-শিলায়
সীতা-ক্রোড়ে রাখিয়া মস্তক
নিদ্রিত রাঘব
বরষিছে বৃক্ষদল কুসুম নিচয়
শ্রীরামের শ্যাম কলেবরে। [ওঙ্কারনাথ]

তখন কোথায় রাজপ্রাসাদ, স্বর্ণমুকুট, রাজছত্র, দণ্ড-মুণ্ড! মাথার ওপর আকাশ, শিলাশয্যা, বনানী, পশুকুল, রাক্ষস, বনচারী, নদী, প্রান্তর, মেঘ, বরষণ। নারদ! এই রাম, কতটা মানুষ, কতটা ভগবান, কখনো কি ভেবে দেখেছো? এই প্রশ্ন পার্বতী করেছিলেন মহেশ্বরকে, 'ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয়, সকলের আদি কারণ, প্রাকৃতিক ত্রিগুণাতীত, প্রমাদরহিত সিদ্ধপুরুষরা এইরকম বলে থাকেন, দিবানিশি তাঁর ভজন করে পরমপদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু!'

মুনিবর! কী সেই 'কিন্তু'? কেউ কেউ বলেন, পরম ব্রহ্মস্বরূপ হয়েও শ্রীরামচন্দ্র আপনার মায়ার দ্বারা আবৃত হয়ে আত্ম-স্বস্বরূপ বিস্মৃত হয়েছিলেন, সেই কারণেই তিনি বশিষ্ঠাদি গুরুর উপদেশ সহায়ে পরমতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন। সেই তরুণ বয়সেই সংসার, ভোগসুখ ত্যাগ করে অরণ্যে প্রস্থান করে যোগীর জীবন যাপন করতে চেয়েছিলেন। বশিষ্ঠদেব তরুণ শ্রীরামকে তর্কে আহ্বান করেছিলেন। বলেছিলেন, 'প্রমাণ করো, সংসারে ঈশ্বর নেই। এ জগৎ তো তাঁরই সৃষ্টি।' আপনি থমকে গিয়েছিলেন। নিজের স্বরূপ কি ভুলে গিয়েছিলেন আপনি? বিস্মৃতি!'

'নারদ! এই মুহূর্তে তুমি কোথায় রয়েছ?'

'অযোধ্যায়।'

'অযোধ্যা কোথায়? স্বর্গে না মর্তে? এই রাম এখন মানুষ, তার নরলীলার কাল। মানুষ স্বর্গে জন্মায় না নারদ, মানুষ জন্মায় পৃথিবীতে। ছোট থেকে বড় হয়, বড় থেকে বুড়ো হয়। শেষে তার দেহের পতন হয়। তারপরে কী হয়— কে জানে, কে বলতে পারে? আমাকে মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে কিছুকাল থাকতে দাও। আকাশ, বাতাস, অরণ্য, নদী, পাহাড়, সমুদ্র। স্বর্গে চাষ-বাস নেই? শস্যক্ষেত্রে ধান, গম, ভুট্টা হয় কি? মাতার গর্ভে সন্তান আসে কি? মানুষের মধ্যেই ভগবানের শোভা প্রকাশিত হয়। দুঃখের অশ্রুতে মুক্তা ঝরে। হাহাকারে জ্বলে শ্মশান চিতা। প্রেম, বিরহ, বিচ্ছেদে লেখা হয় মানবজীবনের নাটক। পাঁচটা ভূতের খেলায় অস্থির জীবন। নারদ! আমি এখন মানব। আমার বালকজীবন অতিবাহিত। যৌবনের শৌর্যে আমি পেয়েছি আমার প্রিয়াকে! আমার এক মাতার চক্রান্তে হারাব রাজ্যপাট। দেখব মানুষের মোহের পরিণতি। দেখব নারীর বিভিন্ন রূপ। অনুভব করব মানুষের কামের সীমাহীন দুর্বলতা। সময়, সময় নিজেও বিস্মিত হব নিজের দেবত্বে। মুনিবর এ-সবই হল মহাকাব্যের উপাদান। কোথাও আনন্দ, কোথাও বেদনা। কোথাও প্রাচুর্য, কোথাও অভাব। আপনার তো কোনো ঠিকানা নেই। কাল থেকে কালান্তরে প্রবাহের মতো ভেসেই চলেছেন। আপনি যেন— দৃষ্টিহীন অনন্তের জাগ্রত দুটি চক্ষু। দেখবেন, কত রাম, কত সীতা আসে আর যায়! রাবণেরও শেষ নেই। যখন নারদ আমার অন্তরঙ্গ, আমার ভেতরে দেব ভাব প্রত্যক্ষ করে, তখন বলি 'তুমি', যখন দূরে সরে যায়, দেবলোকের ঘনিষ্ঠ হয়, তখন বলি 'আপনি'। পরিবর্তন এই জগতের নিয়ম। দিবস আর রজনী, আলো আর আঁধার।

মহাকাব্যের রচয়িতা মানুষ, দেবতারা সব চরিত্র। গ্রহরা বিচরণশীল, বিগ্রহরা স্থির। এই রঘুপতি রাঘব এখন গ্রহ, কালে বিগ্রহে পরিণত হবে। তখন আর যুদ্ধ করবে না। সীতাহারা রাম, অরণ্যপথে কেঁদে কেঁদে বেড়াবে না। মানুষের মন্দিরে মন্দিরে পাথরের মূর্তি। কত আরাধনা! কত সঙ্গীত! কত বাদ-বিবাদ! আদেশ-উপদেশ! নারদ! আমার জীবন তো এতটুকু নয়। কাল থেকে কালান্তরে ব্যাপ্ত। ঘটনা আর অঘটনায় ভরা। পার্বতী দেবাদিব মহাদেবের কাছে সংশয় প্রকাশ করবেন, শ্রীরামচন্দ্রকে সিদ্ধপুরুষগণ পরম ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানে কেন পূজা করেন। তিনি তো মায়ার কাছে পরাভূত হয়ে আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হয়েছিলেন। সীতার দুঃখে সাধারণ মানুষের মতো বিলাপ করেছিলেন। মহাদেব কী উত্তর দেবেন? উত্তর তো আমার কাছে! মানব শরীর ধারণ করলে পঞ্চভূতে তৈরি খাঁচাটাকেও স্বীকার করতে হবে। মানুষের দুঃখ, সুখ, জরা, ব্যাধি, শোকতাপ স্বীকার করতে হবে। অগ্নি যদি কাষ্ঠখণ্ডকে দগ্ধ করতে পারে, আমাকেও পারবে। দেবতারা রাবণকে অমর করে, তার মৃত্যুর দায়িত্বটা আমাকে দিলেন কেন? কেন দিলেন? পৃথিবীকে ধ্বংস করার শক্তি বরুণদেবের আছে, ইন্দ্রের আছে বজ্র, নারায়ণের আছে সুদর্শন। তবু এই রাঘবকে ধনুর্বাণ ধারণ করে যেতে হবে অরণ্যে। সীতা হবেন দশাননের টোপ। অসহ্য নির্যাতন তাঁর কপালের লিখন। রাম কিন্তু বিদ্রোহী হবে না। সীতা রামকে পরিত্যাগ করবে না, কারণ সম্পর্কের বন্ধন। শাস্ত্র যেন অস্ত্রের চেয়েও যন্ত্রণা দায়ক। যাও নারদ, চলে যাও আকাশ ভ্রমণে, আমি যাই আমার ভূমিকায় নিয়তিকে বরণ করে নিতে।

'আপনার (নারদের) সঙ্গে আবার দেখা হবে, অনেকবার হবে, এখন অদর্শনের পূর্বে একটি কথা শুনে যান, বশিষ্ঠদেব তখন আমাকে বলেছিলেন, যখন এই রাজগৃহে, রাজঐশ্বর্যে প্রতিপালিত হতে, হতে আমার মনে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়েছিল। বশিষ্ঠদেব বলেছিলেন,

অজ্ঞস্য দুঃখৌঘময়ং জ্ঞস্যানন্দ ময়ংজগৎ।
অন্ধং ভুবনমন্ধস্য প্রকাশং তু সচক্ষুসঃ।।

নারদ! যে অজ্ঞানী তার কাছে এই জগৎ দুঃখময়, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে এই জগৎই আবার আনন্দময়। অন্ধের জগতে শুধুই অন্ধকার, কিন্তু চক্ষুষ্মানের দৃষ্টিতে এই জগৎ উদ্ভাসিত। হে নারদ! আমাকে দুর্বল করে দিও না। এ আমার পরীক্ষার কাল। আমি অন্ধকারের যাত্রী নই, আমি আলো থেকে আরো আলো, সুখ থেকে আরো সুখে চলেছি। রাম ধর্ম, রাম রাজনীতি, রাম বর্তমান, রাম ভবিষ্যৎ, রাম মানুষ, রাম ভগবান, রাম জীবন, রাম বিরাম, রাম নির্বাণ, রাম অবিরাম। মুনিবর! রাম কঠোর, রাম কোমল। রাম ভূস্বামী হয়ে রাজ

ছত্রতলে সিংহাসনে বসতে চায় না। সে বসতে চায় মানুষের হৃদয়ের সিংহাসনে। হৃদয়-রাম, দয়া-রাম, প্রেম-রাম। রাম এক আরাম, রাম অভিরাম। রাম কি শুধুই দশরথ-পুত্র, অযোধ্যার রাজা? রাম যদি রামের মতো না হয়, তাহলে যুগান্তরে আমার ভক্ত তুলসীদাস জগৎকে কেমন করে শোনাবে এই দোঁহা:

এক ঘড়ি আধি ঘড়ি, আধি হুমে আধ্।
তুলসী সঙ্গত, সন্তকি, হরে কোটি অপরাধ।।
...
রাম নাম আরাধি সে, তুলসী বৃথা ন যায়।...
রাম ভরসে যো রহে, সো পরবত পর হরি যায়।।

কেমন করে কবন্ধ আমার স্বরূপ ব্যাখ্যা করবে!

'পাতাল আপনার চরণতল, মহাতল আপনার গোড়ালি। রসাতল ও তলাতল আপনার দুটি গুল্‌ফ। আপনার জানু দুটি সুতল আর উরু দুটি বিতল। অতল আর পৃথিবী আপনার জঘন (কোমর), আপনার নাভি হল ভূর্লোক, স্বর্লোক বক্ষস্থল আর মর্হলোক আপনার গ্রীবাদেশ। জনলোক আপনার মুখ, তপলোক আপনার ললাট (কপাল), আর সত্যলোক আপনার মস্তক। ইন্দ্রাদি লোকপালগণ আপনার দুটি বাহু, দিক্‌সকল আপনার দুটি কর্ণ, দুই অশ্বিনীকুমার আপনার নাসিকা (নাক), অগ্নি আপনার মুখ। সূর্য আপনার নেত্র, চন্দ্র আপনার মন, কাল (সময়)আপনার ভ্রূভঙ্গি, বৃহস্পতি আপনার বুদ্ধি। রুদ্র আপনার অহঙ্কার, বেদ আপনার বাণী, যম আপনার দংষ্ট্রা (দাঁত) আর নক্ষত্ররা আপনার দন্তাবলী। মোহকরী মায়া আপনার হাস্য, সৃষ্টি আপনার কটাক্ষ, ধর্ম আপনার অগ্রভাগ, অধর্ম আপনার পশ্চাদভাগ্। হে রঘুবর! রাত্রি আর দিন আপনার নিমেষ ও উন্মেষ। প্রভু! সপ্ত সমুদ্র আপনার কুক্ষি, নদীসমূহ আপনার নাড়ী।

'হে প্রভো! বৃক্ষ ও ওষধিসমূহ আপনার রোমাবলী, বৃষ্টি আপনার বীর্য, জ্ঞানশক্তি আপনার মহিমা। আপনার স্থূল শরীরের এই হল গঠন।'

'কবন্ধকে আমি উদ্ধার করব। সে এক মহাকায় অদ্ভুত আকৃতির রাক্ষস। তার বক্ষস্থলে বিরাট এক মুখগহ্বর। চোখ নেই। বিরাট দুটো হাত, চার ক্রোশ বিস্তৃত। এই দুটি বাহুর বেড়ে যে-সব প্রাণী বিচরণ করত, তাদের ধরে এনে মুখের মৃত্যু গহ্বরে পুরে দিত। এই কবন্ধ এক সময় রূপ গর্বে গর্বিত, যৌবন-মদে মত্ত এক গন্ধর্ব ছিল। ব্রহ্মার বরে অবধ্য। সুন্দরী স্ত্রীদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদের জীবন। একদিন কী দুর্মতি হল অষ্টাবক্র মুনির বিকৃত দেহ দেখে উপহাস করায়, রুষ্ট মুনি শাপ দিলেন, 'ইতর! তুই রাক্ষস হয়ে যা।'

অষ্টাবক্র রাক্ষসে পরিণত সেই গন্ধর্বকে মুক্তির পথও বলেদিলেন, ' অপেক্ষা করো। ত্রেতা যুগে স্বয়ং নারায়ণ দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হবেন। তিনি এই অরণ্যে আসবেন। তিনিই তোমাকে শাপমুক্ত করবেন।' শাপগ্রস্ত রাক্ষসরূপী গন্ধর্বের দুর্ভাগ্যের আরো একটু বাকি ছিল। দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ। ইন্দ্র সরাসরি মাথায় বজ্রাঘাত করলেন। মাথা আর দুটো পা পেটের মধ্যে ঢুকে গেল। কিন্তু মৃত্যু হল না, কারণ ব্রহ্মার বরে গন্ধর্ব অমরত্ব লাভ করেছে। তার শোচনীয় অবস্থা দেখে বললেন, ' এরপর তুমি বাঁচবে কী করে? দাঁড়াও, তোমার পেটে একটা মুখ করে দি, হাত দুটোকে করে দি মস্ত লম্বা।'

ত্রাতা শ্রীরাম, জয়-জয় শ্রীরাম! এইবার কবন্ধের শাপ-মুক্তির ক্ষণ! শ্রীরাম আর লক্ষ্মণ বিরাট একটি অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করলেন। কবন্ধ সেই রামাগ্নিতে প্রবেশ করল প্রকাশিত হল সর্বাভরণভূষিত কামদেবতুল্য সুন্দর এক পুরুষ, শাপমুক্ত সেই গন্ধর্ব। আর তখনই তিনি মুক্তিদাতা শ্রীরামের ওই স্বরূপ বন্দনায় বিভোর হয়ে গেলেন।

নারদ স্তব্ধ! শ্রীরাম আজ এ কোন রূপে নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছেন! নিজেই নিজের জীবনের রূপকার। 'মুনিবর! মানবদেহে ধারণ করলে জগতের ঋণ শোধ করে যেতেই হবে। যে-আগুনে দেবতার হোম হয়, সেই আগুনেই জনপদ দগ্ধ হয়, সুখের দেহ পুড়ে ছাই হয়। সূর্যের উত্তাপ, বর্ষার অশ্রুতে স্নিগ্ধ না হলে দুর্ভিক্ষ হয়, নদী হয় স্রোত হারা। ছাই যে একসময় কাঠ ছিল, আর কাঠ যে একসময় ছাই হতে পারে, ভুলে যেও না। সত্য চিরকালই নিষ্ঠুর ও নির্দয়। চোখে শুধু বিলোল কটাক্ষ থাকে না, অশ্রুও থাকে। মুনিবর! আমার জীবনের রূপকার আমি। এই ত্রেতাযুগ আমার কীর্তিতেই ভরা। পৃথিবীর মানুষকে আমি আদর্শ এক মানুষ উপহার দিয়ে যাব জ্বালা, যন্ত্রণা, বঞ্চনা, দুঃখ, সুখে ভরা। ক্ষত-বিক্ষত এক মানুষ! রাক্ষস কাদের বলে? পৃথিবীর মেদ। সেই মেদভার কমিয়ে ধরণীকে হাল্কা করব। অসুরকে সুরে বাঁধব। পূর্ণিমার আকাশে ভক্তির চন্দ্রোদয়।

নারদ! এমন কথা তো তুমিই একদিন বলবে! আর আমার সেই পরমভক্ত তুলসীদাস ওই বারাণসীর আশ্রমে বসে লিখবে:

রাকা রজনী ভক্তি অব রাম নাম সোই সোম।
অপর নাম উডুগণ বিমল রসহুঁ ভক্ত উরু ব্যোম।।

দেখ নারদ, ভক্ত কবির কী অসাধারণ ভাব! তোমার ভাবে ভাব মিলিয়ে আমাকে কোন আকাশে তুলে নিয়ে গেছে, পূর্ণিমার রাতই ভগবানের ভক্তি, আর তাইতে যে রামনাম, তাই পূর্ণ শশধর, আর ভক্তকণ্ঠে সেই নাম তারা হয়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। ভক্তের হৃদয় সেই আকাশ। নারদ! কোন রামকে জগৎ যুগ-যুগ ধরে মনে রাখবে? এই ধনুর্ধারী, রাক্ষসনিধনকারী যোদ্ধা রামকে? না, বল্কলধারী জটাজুট সমন্বিত বনবাসী রামকে? একটা গোপন কথা আজ তোমাকে বলে রাখি,

বচন কর্ম মন মোর গতি ভজন করে নিষ্কাম।
তিনেক হৃদয় কমল মই করো সদা বিশ্রাম।।

আমি একবার যখন এসেছি, থাকব জগতের অস্তিত্বের শেষ দিন পর্যন্ত। কিন্তু কোথায়?

যে মানুষ কায়মনোবাক্যে আমার প্রতি ঐকান্তিকী প্রীতি প্রদর্শন করে, আমি ছাড়া যার আর অন্য কোনো উপায় নেই, যে নিষ্কামভাবে আমারই ভজনা করে আমি সেই মহাত্মার অন্তরেই নিরন্তর বিশ্রামে থাকব।

নারদ! তুমি গগনচারী, প্রত্যক্ষদর্শী, অনন্তকালের সাক্ষী, যুগ-যুগান্তরের সাংবাদিক, ঐতিহাসিক। আমার রাজ্যাভিষেকের সূচনাপর্বে, আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছ— কী কারণে, কী দায়িত্ব নিয়ে আমি পৃথিবীতে এসেছি! পিতামহ! আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ আমার স্মৃতিই আছে বিস্মৃতি নেই। আমি সদা চৈতন্য, আমি অনিমিষ। ভক্তমুখে শুনে যাও— আমি কে? ওই স্বর্ণ সিংহাসন কালচক্রে চূর্ণ-বিচূর্ণ, ধূলিকণা হয়ে ফুঁ-ফুঁ বাতাসে উড়ে যাবে। আর ওই দেখ রাজা দশরথের রাজকীয় করুণ অবস্থা। ওই সেই উদ্ভিন্ন যৌবনা, অস্তমিত সুন্দরী কৈকেয়ী। প্রৌঢ় দশরথ তাঁর পদতলে। ফাঁদে পড়েছেন রাজা দশরথ। অঙ্গীকারে বদ্ধ। সুন্দরী! আমি তোমাকে সব দেব,

তুমি শুধু আমাকে তোমার যৌবনটা দাও। মোহিত আমি তোমার রূপে। দুটি বর— তুমি চাও, চাও! কৌশলী রমণী। উন্মাদ করা সেই রাতে মৃদু হেসে বলেছিল, এই আনন্দের রাতে আবার ও-সব কেন? তোলা থাক, পরে হবে। রাজা যার আলিঙ্গনে, রাজত্ব তার যাবে কোথায়! উপযুক্ত সময়ে আদায় করে নেব আমার পাওনা।

নারদ! সময় তো অফুরন্ত, চলো ওই অদ্ভুত দৃশ্যে গিয়ে হাজির হই। পত্নীর পদতলে বেপথু পতি। ওদিকে রাজদরবারে অভিষেকের সব আয়োজন সম্পূর্ণ। দশরথপুত্র রাম আজ রাজা হবে। বাজে মৃদঙ্গ, মুরলী বীণা। চলো নারদ! দেখি ব্যাপারটা কী? রাজা কেন লুটায় ভূমিতে।

রাম— মাতঃ! মহারাজের এরূপ দুঃখের কারণ কী?

কৈকেয়ী— রাম! মহারাজের দুঃখের কারণ তুমি।

রাম— আমি? মহারাজের দুঃখের কারণ আমি?

কৈকেয়ী— হ্যাঁ রাম, মহারাজের দুঃখের কারণ তুমি। এখন তাঁর ইচ্ছানুযায়ী, তাঁরই দুটি নির্দেশ পালন করো, তাহলে তাঁর সব দুঃখ দূর হবে। তিনি প্রসন্ন চিত্তে আমাকে দুটি বর প্রদান করেছেন। সেই দুটি তোমাকে পালন করতে হবে। মহারাজ সত্যনিষ্ঠ, আর তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ। তুমি কি চাইবে, তোমার জন্যে মহারাজ সত্যভ্রষ্ট হন? সত্যপাশে আবদ্ধ তোমার পিতাকে এখন একমাত্র তুমিই পরিত্রাণ করতে পারো। পুত্র শব্দের অর্থ, সে পিতাকে নরক হতে ত্রাণ করে।

রাম— হঠাৎ আপনি এত কথা বলছেন কেন? এই ভূমিকার অর্থ কী?

কৈকেয়ী— মহারাজের দুটি আদেশ তোমাকে এখনি পালন করতে হবে; কিন্তু তিনি নিজ মুখে তোমাকে বলতে সঙ্কোচ বোধ করছেন, লজ্জা পাচ্ছেন।

রাম— কী এমন আদেশ, যা পিতা পুত্রকে সরাসরি বলতে পারছেন না!

কৈকেয়ী— স্থির হয়ে শোনো। আমি তোমাকে বলছি। তাঁর প্রথম বর এবং তোমার প্রতি আদেশ, রাজ্যাভিষেকের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ, নগরী আজ উৎসব মুখর। রাম রাজা হবে; কিন্তু হবে না। অভিষেক হবে আমার পুত্র ভরতের। ভরত আজ রাজা হবে। আমাকে মহারাজের দ্বিতীয় বর— পিতার আজ্ঞায় তুমি আজই, এখনি,বল্কল ধারণ করে বনবাসে যাবে চোদ্দ বছরের জন্যে। এই হল তোমার পিতার ইচ্ছা, আদেশ। সঙ্কোচ হচ্ছে, সরাসরি তোমাকে বলতে লজ্জা করছে। রাম! তুমি তো উত্তম পুত্র, পিতার আদেশ অবিলম্বে পালন করবে— তাই না!

রাম—হে মাতঃ! ভরত সানন্দে এই রাজ্য উপভোগ করুক, আমি এখনি দণ্ডকারণ্যে গমন করছি; কিন্তু একটি কথা, মহারাজ কেন আমার সঙ্গে একটি কথাও কইছেন না! তাঁর পুত্র হওয়াটাই কি আমার ভয়ংকর অপরাধ?

দশরথ তাঁর করুণ মুখটি পুত্রের দিকে তুললেন। অশ্রুবিজড়িত আরক্ত দুটি চোখ। অন্তরে তাঁর ঝড় বইছে। নিজের অতীতের দিকে তাকিয়ে বলছেন, 'রাম! আমি স্ত্রী পরবশ, ভ্রান্তচিত্ত, কুমার্গগামী পাপাত্মা, আমাকে বন্ধন করে তুমি এই রাজ্য গ্রহণ কর, এতে তোমার কোনো পাপ হবে না, আর আমাকেও কোনো অসত্য স্পর্শ করবে না।'

দশরথ রাজার আত্মোদয় হয়েছে। নারীর মায়া-মোহিনী শক্তির কাছে অসি-শক্তি পরাভূত। রাজা তালগোল পাকিয়ে গেছেন। ভ্রাতা লক্ষ্মণ ভীষণ ক্ষিপ্ত। তিনি ভদ্রতার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করে কম্পিত ক্রোধে ফেটে পড়লেন, 'উন্মত্ত, বিভ্রান্তচিত্ত, কৈকেয়ীর বশীভূত মহারাজ দশরথকে আমি বন্ধন করব, আর ভরত ও তার সাহায্যকারী মাতুলদের হত্যা

করব। আজ অযোধ্যাবাসীরা দেখবে আমার পৌরুষ। আমি লক্ষ্মণ। হে শত্রুদমন রাম! আপনি অভিষেকের জন্যে প্রস্তুত হোন। দেখি, কার কত সাহস, যে বাধা দেয়। রক্ত স্রোত বইবে। অযোধ্যার রাজা রাম। ওই সিংহাসনে বসার অধিকার আর কারো নেই। স্ত্রৈণ দশরথ! মতিভ্রম হয়েছে তোমার!'

শ্রীরাম ক্রোধে কম্পমান ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করে বলছেন— শান্তি, শান্তি! 'ভাই লক্ষ্মণ, চারপাশে যা দেখছ— এই জগৎ-কাণ্ড— এর কোনো কিছুই সত্য নয়। রাজা, রাজত্ব, রাজদণ্ড, কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আজ আছে কাল থাকবে না। ব্যাসদেব বলেছেন, বিষয়ভোগ বিস্তৃত মেঘরূপ পটমণ্ডপস্থ প্রকাশমান বিদ্যুল্লেখার মতো চঞ্চল ও জীবের আয়ু অগ্নিসূতপ্ত লৌহখণ্ডোপরি নিক্ষিপ্ত জলবিন্দুর মতোই ক্ষণিক। ভারী সুন্দর একটি উপমা দিয়েছিলেন, একটা সাপ একটা ব্যাং ধরেছে, সেটাকে ধীরে ধীরে গিলছে, সাপটার মুখের কাছে অনেক মশা উড়ছে, ব্যাঙের মুখটা বাইরের দিকেই রয়েছে, ধীরে ধীরে সাপের পেটে ঢুকছে, সেই অবস্থাতেও ব্যাং মশা ধরে খাচ্ছে। ঠিক সেই রকম কালরূপ সর্প আমাদের ধীরে ধীরে গিলছে, আর আমরা স্বভাবের তাড়নায় যত অনিত্য কর্মে ব্যস্ত— ভোগ করব, প্রভুত্ব করব, ধন সঞ্চয় করব। এই যে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব সব যেন এক একটি কাষ্ঠখণ্ড, স্রোতে ভেসে চলেছি, কখনো কাছাকাছি আসছি, একত্রিত হচ্ছি, পরক্ষণেই দূরে সরে যাচ্ছি।

ভ্রাতা লক্ষ্মণ! এই চরম সত্যটি স্মরণে রেখো— লক্ষ্মী ছায়ার ন্যায় চঞ্চল, যৌবন জলতরঙ্গবৎ অনিত্য, স্ত্রীসুখ স্বপ্নের মতো মিথ্যা, মানুষের পরমায়ু চোখের পলক! অতএব ভ্রাতা। শান্ত হও।

তোমার বীর্য, তোমার সাহস, সহিষ্ণুতা প্রকাশের প্রচুর সুযোগ আসবে। ভ্রাতা! তুমি এখন শান্ত হও, সুস্থির হও। এই নাটকের পরবর্তী অঙ্কের সাক্ষী হও। বিশেষ একটি কথা এখনি তোমাকে বলে রাখি, ক্রোধ, ক্রোধই মনের সর্ব সন্তাপের মূল। ক্রোধই সংসারবন্ধনকারী, ধর্মনাশক। ক্রোধ মহাশত্রু, তৃষ্ণা বৈতরণী নদী, সন্তোষ নন্দনবন আর শান্তিই হল কামধেনু।'

'নারদ!'

'প্রভু! এই তো আমি! আপনার পাশে সদা উপস্থিত।'

'এইবার দেখো, নারীই নিয়তি। পুরুষ নিমিত্ত মাত্র। কৈকেয়ীকে আমি কী বলছি শোনো—

'মাতঃ, আপনার ইচ্ছানুসারে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা— তিনজনেই বনগমনের জন্যে প্রস্তুত। পিতা এইবার শেষ আদেশ উচ্চারণ করুন। বলুন, 'যাও রাম বনবাসে!'

কৈকেয়ী বসেছিলেন। লক্ষ্মণ দেখছিলেন, যেন এক রাক্ষসী। তিনি দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন। চীর বা বল্কল প্রস্তুত করেই রেখেছিলেন। নিজের হাতে প্রত্যেককে একটি করে দিয়ে নিষ্ঠুর কণ্ঠে বললেন, 'রাজবেশ পরিত্যাগ করে এই বল্কল ধারণ করো। তুমি এখন চোদ্দ বছরের জন্যে বনবাসী। দণ্ডকারণ্যে এই দণ্ড ভোগ করবে। তোমার পিতা তোমার জন্যে একটি সিংহাসন করিয়েছিলেন,

আদিক্ষদাদীপ্তকৃশানুকল্পং সিংহাসনং তস্যসপাদপীঠম্।
সন্তপ্তচামীকরবল্গুবজ্রং বিভাগবিন্যস্তমহার্ঘরত্নম।।

[ভট্টিকাব্যম]

[অনুবাদ: বিশুদ্ধ সুবর্ণসদৃশ লোহিতবর্ণ মণিনিকরে ও যথাস্থানে স্থাপিত মহামূল্য নীল রত্নরাজিতে খচিত প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় পরিশোভমান, পাদপীঠ সমন্বিত।]

অতি সুন্দর। সেটি দেখে যাও, আমার ভরত বসবে। সীতা! ত্যাগ করো তোমার রাজবধূ বেশ, সমস্ত অলংকার। চীর পরিধান করো। তুমি স্বামীর সঙ্গে বনে যাবে, ফলমূল, শাকপাতা খাবে, গাছতলায় ঝরা পাতার বিছানায় শোবে, কখনও রোদ কখনও বৃষ্টি, রাতের অন্ধকারে রাক্ষস আসবে, শরীরের ওপর দিয়ে সাপ চলে যাবে, বন্যজন্তুর দল ঘুম পাড়াবে। নাও, নাও বনবেশ ধারণ করো! দেরি কোরো না।'

সীতা বুঝতে পারছেন না, সর্বসমক্ষে বিবস্ত্র হয়ে কেমন করে চীর ধারণ করবেন। তিনি সলজ্জ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রামচন্দ্রের দিকে। রঘুবীর সীতার হাত থেকে বল্কলটি নিয়ে তাঁর পরিহিত রাজকুলোচিত বধূর-পোশাকের ওপর জড়িয়ে দিলেন। এই দৃশ্য দেখে রানিমহলের রমণীরা একসঙ্গে কেঁদে উঠলেন; আর সেই অশুভ শব্দ শুনে বশিষ্ঠদেব ঘটনাস্থলে এলেন। তিনি ক্রোধ সম্বরণ করতে না পেরে কৈকেয়ীকে বললেন, 'তুমি একটি দুর্বৃত্তা, দুঃশীলা, অমানবী! তুমি তো কেবল রামের বনগমনই প্রার্থনা করেছিলে, সীতাকে কেন চীরবস্ত্র প্রদান করছ? এ তোমার কী উল্লাস! পতিব্রতা সীতা যদি রামের পরিচর্যার জন্যে বনবাসে যেতে চায়, তাহলে সে সব আভূষণে ভূষিত হয়ে দিব্যবস্ত্র ধারণ করেই যাবে।'

মহারাজ দশরথের ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল, 'সুমন্ত্র! তুমি রথ আনো।'

অরণ্যের প্রান্ত অবধি তিনজনে রথে যাবেন। সারথি সুমন্ত্র। সমগ্র অযোধ্যাবাসী ধাবিত হবেন সেই রথের পশ্চাতে। এই পাপ পুরী তাঁরা পরিত্যাগ করবেন। সব দীপ নিবে যাবে। ফুল আর মালায় সাজানো যত উৎসব মণ্ডপে নৈশ বাতাস আর্তনাদ করবে। সব বাদ্য নীরব। শ্মশানের নিস্তব্ধতা। সব চোখেই জল। একমাত্র কুচক্রী কৈকেয়ীর চোখেই বিষাক্ত আলো। রাজা! যৌবনে তুমি অনেক হরিণ শিকার করেছ। তির বিদ্ধ প্রাণীর অসহায় যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করেছ। আজ এক বৃদ্ধ হরিণ আমার শিকার। যৌবনের মৌবন থেকে বেরিয়ে এল ভিমরুল। দংশনেই তার আনন্দ। কী আনন্দ, এক আঘাতে দুই সতিন বধ। চোদ্দটা বছর শুধু হাহাকার। ভরতের কৃপায় বেঁচে থাকা।

নারদ বললেন, 'অতঃপর?'

রাম বললেন, 'এই তো সবে শুরু। রাম উপাখ্যান। এখন সবাই বলছে, রাম-সীতা; কিন্তু মুনিবর! কালান্তরে সকলেই যে বলবে 'সীতা রাম'। সেই ব্যবস্থাটা তো আমাকেই করতে হবে। আজকের রাতটা আমরা তমসা নদীর তীরে কাটাব। কাল পৌঁছে যাব গঙ্গারতীরে। সে আসবে। সে এক চণ্ডাল, রামগত প্রাণ গুহক। শূন্য রথ নিয়ে সুমন্ত্র ফিরে আসবে অযোধ্যায়। তারপর! রথ আছে, অশ্ব আছে, পথ আছে, প্রজা আছে, রাম নেই।

তারপর! এই ভয়ংকর শূন্যতা রাজা দশরথ সহ্য করতে পারলেন না। ভীষণ এক উত্তাপে তাঁর সর্ব অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। কেমন উত্তাপ! যে-উত্তাপে তৃণের শীর্ষ থেকে মূল পর্যন্ত দগ্ধ হয়ে যায়। রাজবৈদ্য অসহায়। এ-জ্বালা কেমনে জুড়ায়। ভর্তৃহরি 'ভট্টিকাব্যে' লিখবেন:

আসিষ্ট নৈকত্র শুচা ব্যরংসীৎ কৃতাকৃতেভ্যঃ ক্ষিতিপালভাগ্‌ভ্যঃ।
স চন্দনোশীরমৃণাল দিগ্ধঃ শোকাগ্নিনাগাদ্ দ্যুনিবাসভূয়ম।।

[অনুবাদ: তিনি শোকবিহ্বল হয়ে একস্থানে স্থির হয়ে থাকতে পারলেন না, রাজকার্য সব বিস্মৃত হলেন। সর্বাঙ্গে

চন্দন, উশীর (খসখস) আর মৃণাল লেপন করেও দেহের ক্রমবর্ধমান উত্তাপ কমল না। তাঁর স্বর্গপ্রাপ্তি হল।]

নারদ! ওই দেখ, রাজা দশরথের মরদেহ তৈলপূর্ণ একটি নৌকায় সংরক্ষিত হচ্ছে। ভরত রয়েছে তার মামারবাড়িতে। কেন? আমার অভিষেক হবে। রাজধানীতে উৎসবের পরিবেশ। ভরত কেন দূরে! কৈকেয়ীর অভিযোগ, রাজা দশরথই তাকে মামারবাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে যেন কোনো অশান্তি করতে না পারে! নারদ! তুমি তিন মহিষীকে দেখলে। তিন জন তিন রকমের। আর আমার স্ত্রী সীতা। স্ত্রী-চরিত্র, দেবতারাও বুঝতে পারেন না, হার মেনে যান। মানুষের কী বিশেষ ক্ষমতা যে বুঝবে! শোনো নারদ, এই সীতাকে নিয়েই শুরু হবে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আমি তাকে অরণ্যে একা ফেলে রেখে সোনার হরিণ ধরতে ছুটব। আচ্ছা! রাম কি এতটাই নির্বোধ, যে সে জানে না সোনার হরিণ হয় না। না, সীতা হবে রাবণকে ধরার টোপ। রাবণ ব্রহ্মার বরে অমর। দেব, দানব, যক্ষ,রক্ষ কেউ তাকে মারতে পারবে না। মানুষের উল্লেখ সে করেনি, কারণ, মানুষ তার কাছে ঘাসের মতো। এক গ্রাসে মুঠো মুঠো খেয়ে ফেলতে পারে। ব্রহ্মা জানতে চেয়েছিলেন, তোমার অপরাধের তো কোনো সীমা থাকবে না, কিন্তু, এমন একটি অপরাধ নির্বাচন করো, যাতে, তুমি রাক্ষসজন্ম থেকে মুক্তি পাও। তুমি তাপস, ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞ, অমিত বলশালী, কিন্তু রাক্ষস! রাবণ বলেছিল, আমি ভোগ করব, চূড়ান্ত ভোগ, তবে একটা ফাঁক আমি রাখব আমার মুক্তির জন্যে, সেটি হল আমি যদি আমার কন্যাকে ভোগ করতে চাই, তাহলেই আমি নিহত হব। রাক্ষসরাজ রাবণ জানে না যে সীতাই তার কন্যা। আর তার মৃত্যু হবে মানুষের হাতে। নারদ! আমি কে?'

নারদ মৃদু হেসে বললেন, 'জানি প্রভু, আমি সব জানি।'

রাম বললেন, 'মুনিবর! তুমি আকাশটা জানো, তুমি ভূমিটা জানো না, যে ভূমিতে জগৎ বিচরণ করছে। ধানের শিষ বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে, বিরাট বৃক্ষ মাটির ভরসায় দাঁড়িয়ে আছে, শত সহস্র নদীর ধারা যার বুকের ওপর খেলা করছে। সন্তান যেখানে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। এই ভূমিই হল সীতা। রামের জায়া জানকী, রামের ছায়া জানকী। সীতা হল আধার, রাম হল আধেয়, রাম হল নাম, সীতা হল উচ্চারণ। নারী জীবনের সম্ভব, অসম্ভব যত যন্ত্রণা, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা সে নীরবে সহ্য করবে। সোনা যত পুড়বে, তত খাঁটি হবে। রামের মন্দিরে সোনার সীতা। সীতা একটা ঝড়, একটা বিপ্লব। সে কালে রামকে অতিক্রম করে যাবে। শুনবে সবাই, 'জয় সীতা রাম।' রাম সীতা— বললে ছন্দপতন। শ্রুতি আহত হবে। চলো চিত্রকূট পর্বতে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে। মুনির মানসলোকেই রামের জন্ম, বিচরণ, রাজ্যপালন, পরিণতি। শুনলে না, ভরদ্বাজ মুনি কি বললেন— 'ব্রহ্মার প্রার্থনায় আপনার অবতরণ, আমার সাধনা, উপাসনা ও জ্ঞানের বলে জেনেছি, কেন আপনার এই বনবাস, আপনার ভূত ও ভবিষ্যৎ। আপনি সাক্ষাৎ পরমাত্মা, মায়া-মনুষ্যরূপ ধারণ করেছেন। প্রকৃতির পারে আপনার অবস্থান।'

'নারদ! ওই দেখ চিত্রকূট'

যমুনা নদীর পরপারে চিত্রকূট। মুনিবর বাল্মীকির আশ্রম। আহা! কী মনোরম! যেন স্বর্গের একটি খণ্ড। বৃক্ষরাজি। ফল-ফুল, পক্ষীনিনাদ। নির্ভয় হরিণের বিচরণ। মধুসন্ধানী ভ্রমরকুল। মহামুনিকে প্রণাম করে শ্রীরামচন্দ্র বললেন, 'আমাদের পরিচয় আপনি জানেন। কেন এসেছি, তাও আপনার অজানা নয়। আগামী কালে কী হবে, আপনি লিখে রেখেছেন।'

বাল্মীকি বললেন, 'প্রভু! শব্দ শরীর ধারণ করে আমার এই তপোবনে আপনি দীর্ঘকাল রয়েছেন। আকাশ-বাতাস রামময়। আজ সশরীরে, সদলে আপনার আগমন। পুণ্য হল এই ভূমি আপনার পদচিহ্ন ধারণ করে। স্রষ্টার সামনে আজ সৃষ্টি এসে উপস্থিত। ভক্তের আকর্ষণে ভগবানের আবির্ভাব। আমি আপনাদের আশ্রমের স্থান নির্বাচন করে রেখেছি। এই পর্বত আর গঙ্গার মধ্যবর্তী স্থানে সুন্দর, সুবিস্তীর্ণ একটি পর্ণশাল নির্মিত হবে। পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত দুটি কক্ষ থাকবে। আপনারা সেখানে সুখে দিনাতিপাত করবেন।'

'মুনিবর। নারদ এইবার গগনপথে বিদায় নেবেন। তার আগে আপনি আমার একটি ভয়ংকর প্রশ্নের সমাধান করুন— রাম কি নিষ্ঠুর! সে কি তার জীবনসঙ্গিনীকে নানা পরীক্ষার মধ্যে ফেলে নিজের পুরুষাধিকার প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে! সীতার শক্তিকে খর্ব করেছে!'

বাল্মীকি বললেন, 'এমন আত্মসমালোচনা সচেতন মানুষের মনে আসতে পারে। কিন্তু রাম কী সাধারণ মানুষ? সে তো দেব মানব! রাম হল অগ্নি, সীতা সেই অগ্নির দাহিকা শক্তি। দহন কি দহনকে দহন করতে পারে? অগ্নিতে অগ্নি প্রবেশ করলে দাহিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। সীতার উত্তাপ, উজ্জ্বলতা বেড়ে যায়। তবে, আমি একটি বিশেষ ঘটনা সরিয়ে রেখেছি, সেটি আজ প্রকাশ করব।

চোদ্দো বছর পরে রাম ফিরবেন অযোধ্যায়। রাজাসনে রাম। রাজা দশরথ এই উৎসব দেখে যেতে পারেননি। শুরুতেই সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল কর্ম দোষে। চোদ্দ বছর অযোধ্যা যেন দমবন্ধ করেছিল। মৃত নগরীতে প্রাণ ফিরে এল। রামের বীরত্বগাথা আকাশে বাতাসে। মুনিরা সব এসেছেন শিষ্যদের নিয়ে— বিশ্বামিত্র, চ্যবন, বশিষ্ঠ। তাঁরা রামচন্দ্রের অসীম বীরত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রাক্ষসরাজ রাবণের ত্রাসমুক্ত হয়েছে পৃথিবী; কিন্তু আমাদের সীতামাকে কত দুঃখ, কত নির্যাতনই না সহ্য করতে হয়েছে! আমরা অন্তরে যে-কষ্ট অনুভব করছি, সে তো ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।'

মুনিবর্গের এই সব কথা শুনতে, শুনতে সীতা হঠাৎ এমন একটি কথা বললেন, যা শুনে সকলে স্তম্ভিত। সীতা বললেন, ঠোঁটে তাঁর মৃদু হাসি— 'আপনারা দশানন রাবণের নিধন সম্পর্কে যা বললেন, প্রশংসা করলেন, আমার কাছে তা পরিহাসের মতো বোধ হচ্ছে। আমার নিদারুণ দুঃখ ও কষ্টে আপনারাও কাতর, মনে করুন, দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্টের আর এক নাম 'সীতা', 'সীতা-দাহ'। রাবণ অবশ্যই এক ত্রাস। সেই ত্রাস দূর করলেন শ্রীরামচন্দ্র। অবশ্যই তিনি ভূয়সী প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু, রাবণের চেয়েও সহস্রগুণ বেশী আরো একটি ত্রাস পৃথিবীতে বর্তমান। আপনারা যদি অনুমতি করেন, তাহলে বলি।

'তখন আমার বিবাহ হয়নি। পিত্রালয়ে। একদিন এক ব্রাহ্মণ এসে পিতাকে বললেন, যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে বর্ষার চারটে মাস আমি তোমার রাজপুরে অবস্থান করতে পারি।

আমার ব্রাহ্মণভক্ত পিতা, তাঁর অবস্থানের ব্যবস্থা করে আমাকে দিলেন সেবার দায়িত্ব। সেই ব্রাহ্মণ একদিন আমাকে জানালেন, দধি সমুদ্রের পর আর একটি সমুদ্র আছে, তার

নাম স্বাদুদক। সেই সমুদ্রটি পুষ্কর দ্বীপকে বেষ্টন করে রেখেছে; আর সেইখানেই আছে ব্রহ্মার পদ্মাসন। বিশ্বকর্মা দ্বীপটিকে অতি যত্নে সাজালেন। বৈজয়ন্তের চেয়েও শতগুণ সুন্দর। সেখানে আছে বিশ্রবা মুনির আশ্রম। সেখানে আছে সুমালী নামে এক রাক্ষসরাজ। তার কন্যার নাম নিকষা। তিনি বিশ্রবা মুনির পত্নী। সেই নিকষার গর্ভে দুটি রাবণ জন্মাল, একজনের দশমাথা, আর একজনের সহস্র মাথা। ভীষণ শব্দ করে জন্মেছিল তাই নাম রাখা হল 'রাবণ'। দশ মাথা রাবণ গেল লঙ্কায়। আর সহস্র মাথা রাবণ রয়েছে পুষ্করে। সেই ব্রাহ্মণ আমাকে এই কথা শোনালেন।'

বাল্মীকি বললেন, 'সীতা, জনকনন্দিনী, রাম সোহাগিনী, শক্তিরূপিণী, তেজস্বিনী। তার অন্যরূপে আর এক প্রকাশ। দুটি শক্তিশালী রজ্জুকে যখন একত্রে বাঁধা হয়, তখন সমান শক্তিতে আকর্ষণ করে একটি গেরো দিতে হয়। একটি সবল, আর একটি দুর্বল হলে বন্ধন দৃঢ় হয় না। রাম আর সীতা দু'জনেই সমান শক্তিশালী, দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। রাম রূপী চন্দ্রকে ষোল কলায়ভাস্বর করে, সীতা রূপী জ্যোৎস্না এবার উদ্ভাসিত হতে চলেছে।

মুনিদের সেই সমাবেশে স্বতঃ নির্ভিক সীতা যেন অন্যরূপে প্রকাশিতা। মুখে মৃদু হাসি। বলছেন, 'রাবণ অবশ্যই দুরাচারী, বিশ্বের ত্রাস। রাবণ নিহত। পৃথিবীর ভয় কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ ভাবে দূর হয়নি। সহস্রবদন রাবণের ভয়ে ত্রিলোক শঙ্কিত। সেই পরিভ্রমণকারী ব্রাহ্মণ আমাকে বলেছিলেন, এই অতিশক্তিশালী রাবণ বাস করে পুষ্কর দ্বীপে।'

সীতা স্বল্পক্ষণ নীরব থেকে বললেন, 'আমার পতি লঙ্কার দশাননকে বধ করেছেন, অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন। সেই সব কাজের জন্যে আমি বিস্মিত নই, আশ্চর্যও হই নি। সেই পুষ্কর বাসী, সহস্র স্কন্ধ ভয়ংকর রাবণটিকে যদি তিনি বধ করতে পারেন, তবেই তাঁর খ্যাতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে। তার আগে নয়। সেই কারণেই আপনাদের মুখে আমার পতির প্রশংসা শুনে মনে, মনে হাসছি। ভাবছি, রঘুবীর আসল পরীক্ষা এখনো বাকি। আমার এই ঔদ্ধত্য আপনারা মার্জনা করবেন; কিন্তু আমি যে তাঁর শক্তি। ওই আধারে আমি স্ফুরিত হতে চাইছি। সব রকমের ভয়মুক্ত বিশ্বের স্বপ্ন দেখছি। পরিপূর্ণ আলোকময়ের নামই 'রামময়'। সেখানে যেন কোনো ছায়ার বাধা না থাকে।'

'সাধু, সাধু!' মুনিরা সমস্বরে বলে উঠলেন।'

বাল্মীকি বিস্মিত রামচন্দ্র এবং নারদকে বললেন, 'চতুর্দশ বর্ষ পরে ঠিক এইরকম একটি দৃশ্য ও কথোপকথন বাস্তবে সংঘটিত হবে। প্রকৃতপক্ষে যা হচ্ছে, সবই আমার ভেতরে হওয়ার পূর্বেই হয়ে চলেছে। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার! বর্তমান অতীত হয়, ভবিষ্যৎ বর্তমান হয়। এক্ষেত্রে সময় চলেছে বিপরীত দিকে। অতীত বর্তমানে এসে ভবিষ্যতে জমা পড়ছে। সময়ের বিপরীত চলন। এ কেমন? আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।'

শ্রীরামচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, 'আমরা সামনের দিকে এগোচ্ছি, তাই সময় পেছন দিকে চলে যাচ্ছে। আমরা যদি পেছন দিকে চলতে থাকি, সময়ও ঘুরে যাবে। যেটাকে সামনে বলছি সেই দিকে যাবে। এ এক গণিত! আপনি আমার শেষটা বলে শেষ করে দিন। মঞ্চে নেমে পড়ি, পর্দা উঠুক, 'কাল' এসে বসুক দর্শকের আসনে।'

বাল্মীকি তাঁর পুঁথির পাতা ওল্টালেন, 'সীতার কথা শুনে উত্তেজিত রামচন্দ্র সমরসজ্জার আদেশ দিলেন। মুনিদের বললেন, 'আজই আমি সহস্রবদন রাবণকে জয় করার উদ্দেশ্যে পুষ্করদ্বীপে যাত্রা করব।'

লক্ষ্মণ, ভরত, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান সকলেই রণসাজে সজ্জিত। আবার যুদ্ধ। রাম স্মরণ করা মাত্রই পুষ্পকরথ 'রথোত্তম' এসে গেল। যুদ্ধযাত্রা শুরু। অযোধ্যার পাত্র, মিত্র, মন্ত্রীগণ, সুমন্ত্র, অগস্ত্যাদি মুনিগণ রামচন্দ্রের সহগামী হলেন। পুষ্করে বিরাট রণ সমাবেশ। রামচন্দ্রের ধনুর টঙ্কারে আকাশ, বাতাস কম্পিত। সহস্রবদন রাবণ অতর্কিত আক্রমণে বিস্মিত। ক্রোধে ভীষণাকার উগ্রমূর্তি ধারণ করল। মেঘের মতো তর্জন, গর্জন। প্রলয় বুঝি আসন্ন!

সহস্রস্কন্ধ রাবণ একাই এক হাজার। তার সঙ্গে রয়েছে তার বলশালী পুত্ররা, তাদের নাম, কালকণ্ঠ, প্রভাষ, কুম্ভাণ্ডক, কালকাক্ষ, মধুবর্ণ, চিত্রদেব, এরাই প্রধান। যুদ্ধে অবতীর্ণ অসংখ্য রাক্ষস। এক, একজনের এক এক রকম মুখ, যেমন উষ্ট্রবদন, শশবক্ত্র, কাকবক্ত্র, ময়ূরবদন, অজমুখ, মহিষমুখ, কুম্ভীরমুখ, গরুড়ানন, সর্পবদন, বৃষবদন। কেউ কেউ আবার জটাধারী। সে এক অসাধারণ সমাবেশ। তর্জন, গর্জন, আস্ফালন, যেন নরকের ঢাকনা খুলে, সব পিল পিল করে বেরিয়ে এসেছে। কারো চোখ পিঙ্গলবর্ণ, অনেকের কান শাঁখের মতো, নাক বাঁকা। বিশাল, বিশাল দাঁত। চামড়ার পোশাক। পোশাকের বিভিন্ন রঙ। প্রত্যেকের গলায় দুলছে ঘণ্টা। বিচিত্র সব অস্ত্রধারণ করে তাদের রণনৃত্য। শব্দে, তাণ্ডবে, গর্জনে কান ঝালাপালা।

অন্যদিকে ধীরস্থির রঘুবীর। সহস্র বানরসেনা। হঠাৎ দৈববাণী। রাক্ষসরা নিস্তব্ধ। আকাশের কণ্ঠস্বর: 'মহাবীর রক্ষপতি রাবণ! তোমার সামনে অযোধ্যার রঘুকুলনন্দন শ্রীরাম, সাক্ষাৎ ধর্ম। তোমার অনুজ দশানন রামভার্যা সীতাকে অপহরণ করেছিল বলেই তাকে নিহত করে ভার্যা সীতাকে উদ্ধার করেন। আজ তিনি এই স্থানে সীতা, বিভীষণ, ভ্রাতৃগণ, বানর, রাক্ষস ও মনুষ্যগণ পরিবৃত হয়ে তোমাকে বধ করার জন্য এসেছেন।'

দৈববাণী শুনে আকাশ, বাতাস কাঁপিয়ে মহারাবণ হা, হা করে হেসে উঠল। 'আমি বিশ্ববিজয়ী। আমার ত্রাসে দেবতারাও পর্বত কন্দরে প্রবেশ করে। সামান্য এক মানুষ কয়েকটা বানর নিয়ে আমাকে জয় করতে এসেছে। ওদের বেঁধে ফেল, কচুকাটা কর।' শুরু হল ঘোরযুদ্ধ। রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, হনুমান, সুগ্রীব, জাম্ববান, নল, নীল, বিভীষণ বহু রাক্ষস সৈন্য নিধন করলেন। বানরদের আনন্দনৃত্য।

তখন সহস্রস্কন্ধ রাবণ পবনবেগগামী রথে আরোহণ করে এক সুতীক্ষ্ণ শক্তি গ্রহণ করে সমরে প্রবিষ্ট হল। বানররা ক্ষুদ্র প্রাণী, তার আকৃতি পর্বত প্রমাণ। মনে মনে ভাবলে, এই সব তুচ্ছ প্রাণী রামকে সাহায্য করার জন্যে গৃহ ও পরিবার ত্যাগ করে এসেছে; এদের হত্যা করে আমার কি এমন গৌরব বাড়বে! বরং এদের ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দি যেখান থেকে এসেছে সেইখানে। রাবণ বায়ব্যবাণ নিক্ষেপ করলে। সব উড়ে চলে গেল নিজের নিজের গৃহে। এ কী আশ্চর্য ঘটনা! একই অবস্থা হল ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, হনুমানাদি সব বীরের। অদ্ভুত মায়া। পূর্বের কোনো যুদ্ধে এমন হয়নি।

এদিকে একেবারে একা রাম ও সীতা। মুনি ঋষিগণ পুষ্কর দ্বীপেই রয়েছেন। সহস্রস্কন্ধ রাবণের ভেলকি দেখে হতবাক। অসহায় শ্রীরামচন্দ্র। এই পর্বতপ্রমাণ, অলৌকিক শক্তিধারী

রাক্ষসকে নিধন করা কি সম্ভব? এ তো প্রকৃতিকে জয় করে বসে আছে! মুনিদের মনে পড়ল— অতীতে শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং গরুড়ে আরোহণ করে পুষ্করে এসেছিলেন এই মহা রাক্ষসকে নিধন করতে। তারপর? সে যে অতি করুণ পরিণতি! এই রাবণ বিষ্ণু ভগবানকে বাঁ হাতে তুলে লবণ সাগরে নিক্ষেপ করেছিল। তাঁর সঙ্গী দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নরগণ পালিয়ে গিয়েছিলেন।

এখন সেই ভগবান বিষ্ণুই দশরথনন্দন রাম, সঙ্গে সীতারূপিণী লক্ষ্মীদেবী। এখন, কি হয়, কি হয়! সময় যেন গতি হারা! রণক্ষেত্রের বাইরে দর্শক মুনিগণ স্তব্ধ। প্রার্থনারত। রাক্ষসদের মহাকলরব, মহা রাবণের মহা হুঙ্কার। শ্রীরামচন্দ্র যেন বৃহৎ এক অগ্নিকুণ্ড। শত সূর্যের দীপ্তিতে দীপ্যমান। ধরা কম্পিত। পর্বত শিখর স্খলিত, সমুদ্র উত্তাল। সহস্রবদন রাবণের আস্ফালন, 'অবলীলায় আমি একা আমার এই মহাশত্রু রামকে ধ্বংস করব, জগৎ দেখবে। পৃথিবীকে আমি মানবশূন্য, দেবলোককে দেবশূন্য করব, সমস্ত সাগর শোষণ করে জলশূন্য করব। রাম! তুমি আমার ভ্রাতাকে হত্যা করেছ, আজ আমি তোমাকে সংহার করে তার প্রতিশোধ নোব। এ সেই লঙ্কাপুরী নয়, আর আমি সেই দশানন নই, আমি সহস্রানন। আজ তোমার রক্তে আমার ভ্রাতার তর্পণ।'

পৃথিবী কম্পিত। যুদ্ধের বর্ণনা সাধু ভাষায়: 'অগ্নিবাণ বরুণ বাণের দ্বারা, দৈব অস্ত্র দৈবাস্ত্রের দ্বারা, গন্ধর্ব অস্ত্র গন্ধর্বাস্ত্রের দ্বারা, উভয়ে উভয়কে প্রতিহত করিতে লাগিল।' রাবণ পন্নগাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। অজস্র সাপ রামের দেহ জড়িয়ে ধরে তাদের মুখ দিয়ে অগ্নি উদ্‌গীর্ণ করছে। রাম তখন গরুড়াস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। সমশক্তি দুই যোদ্ধা। রাম অবশেষে যে-বাণে দশাননকে নিধন করেছিলেন, সেইটি হাতে নিলেন। ভগবান অগস্ত্য এটি রামচন্দ্রকে প্রদান করেছিলেন। ব্রহ্মা এই বাণটি নির্মাণ করিয়েছিলেন ইন্দ্রের জন্যে! ইন্দ্র ত্রৈলোক্য বিজয় করবেন। সেই কারণে বাণটির বিশেষ নাম-'ব্রহ্মবাণ'। বাণটির শরীরে পবন, ফলকে অগ্নি, গৌরবে মেরু, আধার আকাশ, তেজে সূর্য। বেদমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে রামচন্দ্র সেই বাণ নিক্ষেপ করলেন। সহস্রানন রাবণ সেই বাণ বামহস্তে ধারণ করে জানুতে চেপে খণ্ড খণ্ড করে ফেলল। শ্রীরামচন্দ্র বিস্মিত— কী অমিত শক্তি এই দানবের!

সহস্রানন রাবণ এই বার রামচন্দ্রের প্রতি 'ক্ষুরপ্রবাণ নিক্ষেপ করল। সেই বাণ শ্রীরামের বক্ষভেদ করে পাতালে প্রবিষ্ট হল। শ্রীরাম সংজ্ঞা হারালেন। দানবের নৃত্য। ত্রিলোক বিস্মিত। প্রলয় কি আসন্ন!

বশিষ্ঠদেব ও অন্যান্য ঋষিরা সীতাদেবীর ওপর অসন্তুষ্ট। 'কেন তুমি শ্রীরামকে এই মহা-দানবটির কথা শোনালে?' মূর্ছিত রামচন্দ্রের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সীতাদেবী। ধনুর্বাণ বক্ষে ধারণ করে শায়িত রঘুবীর। নয়নদুটি নিমিলিত, যেন গভীর নিদ্রা। অসংখ্য রাক্ষসের উল্লাস নৃত্য।

হঠাৎ সীতাদেবীর অট্টহাস্য। সিংহনাদ। তাঁর রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। তিনি বিকটাকার ধারণ করেছেন। সে রূপ কেমন?

ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী চ চক্রভ্রমিতলোচনা। দীর্ঘ জঙ্ঘা মহারাবা মুণ্ডমালা বিভূষণা অস্থিকিঙ্কিণিকা ভীমা ভীম বেগ পরাক্রমা। খরস্বনা মহাঘোরা বিকৃতা বিকৃতাননা।

ক্ষীণ উদর, কোটরগত চক্ষু, চক্রের ন্যায় ভ্রমিত, জঙ্ঘাদ্বয় দীর্ঘ, মুণ্ডমালা বিভূষণা, জিহ্বা বিলোল, চতুর্ভুজা, খর্পর ধারিণী দেবী চামুণ্ডা। এই ভয়ঙ্করী এক লাফে সেই সহস্রবদন রাবণের সামনে গিয়ে একে একে সব কটি মুণ্ড ছেদন করলেন। তাঁর আঙুলের ভীষণ নখ দিয়ে যত রাক্ষসের দেহ

ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। সে এক ভয়ংকর রণ। তাঁর বিশাল, বিরাট ঘূর্ণায়মান দেহ হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন মাতৃকাগণ— প্রভাবতী, বিশালাক্ষী, পালিতা, গোনসী, জয়াবতী, মালতিকা, ধ্রুবরত্না, বিশাকা, কমলাক্ষী, শোভনা, মাধবী, গীতপ্রিয়া, চিত্রসেনা, মেঘবাহিনী, সুভগা, লুম্বিনী, রোচমানা, সুরোচনা, বিশিরা।

পৃথিবী কাঁপছে। ভূতল রসাতলে প্রবেশের আশঙ্কা। মুনিরা সন্ত্রস্ত। দেবতারা অসহায় দর্শক। দেবগণের প্রার্থনায় মহাদেব রণক্ষেত্রে এলেন। তিনি জানেন এই ভয়ংকর শক্তিকে শান্ত করার কৌশল। রণরঙ্গিনী মায়ের পদতলে তিনি বুক পেতে দিলেন। নিমেষে সব শান্ত। জানকী মায়ের কালী রূপ। রণক্ষেত্রে রুধির ধারার মাঝে শিব বক্ষে ধীর-স্থির। ব্রহ্ম স্তব করছেন, 'সর্বভূত প্রবর্তিকা সর্বেশ্বরী দেবী তুমি। তুমি সনাতনী মায়াশক্তি, সকল শক্তির সৃষ্টিকারিণী। জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, প্রাণশক্তি। তুমি শিবের শক্তি, তুমিই আবার রামের শক্তি। রঘুনন্দন রাম শক্তিসমূহের আধার, তুমি দেবী বিশ্বেশ্বরী। তুমি শান্ত হও মা, পৃথিবী শান্ত হোক।'

উগ্রমূর্তি সীতা বললেন, 'শান্তি! রাক্ষসের ক্ষুরপ্র অস্ত্রের আঘাতে আমার স্বামী অচৈতন্য, মৃতবৎ। কিসের শান্তি! আমি এক গ্রাসে এই জগৎকে গিলে ফেলব। শূন্যে শূন্য মিলাবে। মহাকাল নৃত্য করবে।'

'দেবি প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়। আমরা রঘুবীরকে এখনি স্বস্থ করছি।'

ধীরে ধীরে চোখ মেলছেন রঘুবীর। সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন পরমেশ্বরী, জ্যোতির্ময়ী।

বলছেন, 'কে আপনি, মহাদেবী?'

সীতাদেবী বললেন, 'চিনতে পারছ না? আমি সীতা। রঘুবর আমার প্রকৃত পরিচয়— মহেশ্বরাশ্রয়িনী পরমাশক্তি। যাঁরা মুমুক্ষু তাঁরা আমাকে এক ও অব্যয়রূপে দর্শন করে থাকেন। আমার মহিমা অনন্ত। সংসারের মায়াজাল থেকে আমি জীবকে উদ্ধার করি। আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দান করছি আমার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করো।'

রামচন্দ্র সীতার প্রকৃত রূপ দর্শন করছেন আর পুলকিত হচ্ছেন, কোটি সূর্যের তেজ চতুর্দিকে প্রসারিত। অসহ্য সে দীপ্তি। সেই মূর্তির মস্তকে জটা মণ্ডপ। হাতে ত্রিশূল ও বর, মুখমণ্ডল প্রসন্ন। ভয়াবহ আকৃতি কিন্তু ঐশ্বর্যের আধার। কান্তি কোটি চন্দ্রবৎ কমনীয়। শিরে কিরীট, হস্তে গদা, পরিধানে দিব্য বসন। দেবগণ তাঁর আরাধনায় নিরত। ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরণন্তবীর্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।

রণক্ষেত্র রূপান্তরিত হল বিরাট এক দেবালয়ে।

শ্রীরামচন্দ্র আর মহাযোদ্ধা নন, নতজানু এক উপাসক। তিনি নতজানু। ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করেছেন। আত্মায় আত্মা স্থির। পরম যোগের অবস্থা। পরমপবিত্র ওঁকার শব্দ সহযোগে সীতাদেবীর অষ্টোত্তর সহস্র নামকীর্তনে পরমেশ্বরীকে স্তব করছেন,

ওঁ অয়ি সীতা, মা, পরমাশক্তি, অনন্ত, নিষ্কলা, অমলা,
শান্তা, মাহেশ্বরী, নিত্যা, শাশ্বতী, পরমা, অক্ষরা, জানকী...

স্তব্ধ, শান্ত, পরমেশ্বরী সীতার কণ্ঠস্বর বায়ুমণ্ডলে মুখর হল— 'পৃথিবীর সূর্য একটাই। রাম, তুমি উদয়, আমি অস্ত। পূর্ব দিকটা তোমার, পশ্চিম দিকটা আমার। ভূমি আমার, আকাশ তোমার। তুমি আমাকে ত্যাগ করার আগে আমি তোমাকে ত্যাগ করব। ওই দেখ, ভূমি থেকে উত্থিত হয়েছে আমার স্বর্ণ সিংহাসন। বিদায় শ্রীরাম। নাগবাহিত সিংহাসনে আমার প্রবেশ ঘটবে অতলে। যুগের উন্মাদনা আপাতত শান্ত। তুমি যুগযুগ ধরে বিচরণ করো আমারই পৃষ্ঠে, শবর আর শবরীর মায়া ঘেরা অরণ্যে। লক্ষ্মণ সরযূর তীরে দেহত্যাগ করবে। 'কাল' তোমার পুত্র কানে কানে কথা কইবে। আমি চির দুঃখ, আমার আসন মানবের অন্তরে। আর সেই অন্তর হলে তুমি, আর আমি থাকি অন্তরালে।'

'সেদিন গঙ্গার ধারে সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ আমাকে দেখে ফেলেছিল। নির্জন দ্বিপ্রহরে আমি আমারই কালীরূপ দেখতে গিয়েছিলাম। প্রায়ই যাই ওই মন্দির উদ্যানে। সাধক আমাকে হঠাৎ হারিয়ে ফেলেছিল। লুকোচুরি খেলা। নহবতে উঁকি মারলেই দেখতে পেত, আমি বসে আছি সীতা হয়ে। আলোর সঙ্গে আঁধার যুক্ত করো। রামের সঙ্গে কৃষ্ণ। আবার দেখা হবে যমুনার তীরে। তখন তুমি হবে আমার 'মুরলীধর'।

• **যে সব গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে:**
১) কথামৃত (শ্রীম) ২) কথা রামায়ণ (শ্রীওঙ্কারনাথ) ৩) রচনাবলী (গিরিশচন্দ্র ঘোষ) ৪) রামায়ণম (আচার্য ধ্যানেশনারায়ণ সম্পাদিত) ৫) ভট্টিকাব্যম (ভর্তৃহরি) ৬) অধ্যাত্ম রামায়ণ (শ্রী ব্যাসদেব, অনুবাদ শ্রীরামদাস) ৭) শ্রীরামচরিতমানস (তুলসীদাস) ৮) অদ্ভুত রামায়ণ (মহর্ষি বাল্মীকি, পুরাণ ভারতী ধনপতি হালদার সম্পাদিত)

অলংকরণ: সুব্রত মাজী

সমাপ্ত

• বিশেষ রচনা

• মন্দাকিনী তটে রামঘাট এবং চিত্রকূটে যোগী সাধুবাবা

চিত্রকূটে যোগীসঙ্গ

শিবশংকর ভারতী

সাতনা স্টেশন থেকে বাস ছাড়ল। পথের দু-পাশে বাড়ি-ঘর নেই বললেই চলে। মসৃণ রাস্তা। বাস চলছে উঠেপড়ে। যেদিকে তাকাই সেদিকেই সব্জি খেত। একটানা বাস চলার পর এসে থামল শ্রীরামচন্দ্রের পদধূলিপূত চিত্রকূটে। সাতনা থেকে পাক্কা ৫০ কিমি।

১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর। আগস্টেই ফিরেছি অমরনাথ দর্শন করে। মায়ের কোনও কথাই শুনিনি কোনওদিন। অনেকবার বারণ করা সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়েছি। এবার সঙ্গী জোটেনি।

ভ্রমণে মনের মতো সঙ্গী আর সংসার জীবনে মনের মতো বউ পাওয়া কঠিন। তাই একাই বেরিয়েছি এ যাত্রায়। আমার সঙ্গী একটা জামা, একটা প্যান্ট আর গামছা।

হোটেল বলতে যা, তাতে উঠিনি। ধর্মশালার মতো একটা বাড়ি তবে ধর্মশালা নয়। ছোট্ট একটা ঘরভাড়া করলাম। সামান্য ভাড়া। এক দেশওয়ালি মহিলা ঘরটা ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। চেহারায় দারিদ্র্যের ছাপ ষোলোআনা। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে (অবাঙালিরা দেখেছি পায়ের পাতায় নয়, হাঁটুর কাছে হাত স্পর্শ করলেই এদের প্রণাম করা হয়ে যায়।) হিন্দিতেই বলল, বাবা, এখানে ভালো খাবার কোথাও পাওয়া যায় না। আপনি যদি বলেন তবে যে ক-দিন থাকবেন আমি রোজ 'রোটি সব্জি' করে এনে দেব। তার জন্য সামান্য যা মন চায় কিছু দেবেন। আপনি সাধুবাবা আছেন। আমার একটা ছোট বাচ্চা আছে, তাকে একটু আশীর্বাদ করে দেবেন। ও বড্ড অসুখে ভোগে। আপনার আশীর্বাদে ও ভালো হয়ে উঠবে।

দাড়ি দেখে ভেবেছে সাধুবাবা। আমি যে কী— আমার থেকে ভালো আর কেউ জানে না। যাইহোক, খাওয়ার ব্যাপারটায় নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম। ব্যাগটা রেখে ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

একটা টাঙা ভাড়া করলাম। চললাম কামদগিরিতে কামতানাথ মন্দিরে। পিচের বাঁধানো রাস্তা কখনও উঁচু, কখনও নিচু মালভূমির মতো। পাহাড়ি এলাকা। বছরভরই লোকের আনাগোনা হয় রামতীর্থ চিত্রকূটে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গেলাম কামতানাথ মন্দিরে। পথ মাত্র ৫ কিমি।

কামদগিরি পাহাড়ের পাদদেশেই মন্দির। চিত্রকূটের তীর্থদেবতা কামতানাথজি দ্বারপাল, রক্ষকও বটে, বেনারসে যেমন কালভৈরব এখানে কামতানাথ। প্রবাদ আছে, চিত্রকূটে এসে প্রথম প্রার্থনা করতে হয় এই মন্দিরে কামতানাথের কাছে। অনুমতি চাইতে হয় নইলে তীর্থ চিত্রকূট ভ্রমণে বড্ড বিঘ্ন হয়।

কামদগিরিতে যা কিছু তা দর্শন করে ফিরে এলাম ঘরে। খাওয়াদাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিতে নিতেই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি। যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি সন্ধ্যা লেগে গেছে। এখন আর রাস্তায় কোনও যাত্রী নেই, দু-চারজন স্থানীয় বাসিন্দা ছাড়া। আজ রাতটা কাটালাম 'রোটি সব্জি' খেয়ে।

খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে নিলাম। রোটি সব্জি নিয়ে এল দিদি। কাজে ফাঁকি নেই। সময় সম্পর্কে সচেতন। খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

চিত্রকূটের বাসগুলি মিনি বাসের মতো নয়। ছোট স্কুল বাসের মতো, তবে একেবারে ঝরঝরে। দেখলে মনে হয় বাদশা হুমায়ুন কিংবা আকবরের রাজত্বকালের। ক্রনিক রুগির মতো চেহারা। মরে না ভোগে। কোনও রকমে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। এখন যে দশা তাতে কোনও ফল হবে না চিকিৎসায়। এগুলো ছাড়া সাধারণ তীর্থযাত্রীদের আর কোনও গতিও নেই।

বাঙালি বলতে এই বাসের সম্বল আমি। অন্য সব দেশওয়ালি উত্তরপ্রদেশবাসী। অধিকাংশই বয়স্ক। পঞ্চাশের ওপরে মহিলা পুরুষ। বুড়োবুড়িও আছে অনেক। মাঝবয়সি অল্প। কম বয়েসের ক্রনিক ব্যাচেলার আমিই।

এই বাসের যাত্রীদের চেহারায় পোশাকে কোনও আভিজাত্যের ছাপ নেই। দেখলে মনে হয়, অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবন নির্বাহ করে এরা। অধিকাংশেরই পোশাকআশাক ময়লা। টিনের স্যুটকেশ আর পোটলাপুঁটলি আছে সকলের কাছে। রামের ওপরে ভরসা করেই হয়তো চলে এদের জীবন। শত দুঃখ কষ্ট, সংসার জীবনের বেহাল তরীতে বসেও রামকে ভোলেনি, ছাড়েনি তাঁকে অন্তরে। তাই হয়তো কিছু সম্বল বাঁচিয়ে চলেছে চিত্রকূটে রামের লীলাভূমি দর্শন করতে।

লক্ষ করছি বার বার প্রণাম করছে কপালে হাতজোড় করে। বিশ্বাসে ভরপুর মন। রামের উদ্দেশে এমন নিঃসংকোচ প্রণাম অর্থ আর আভিজাত্যের গরিমা থাকলে হয় না। অভিমান মুক্ত ও সরল মনের মানুষ যারা তাদের দ্বারাই সম্ভব এটা। কিছুতেই পারলাম না ওদের মতো হাতদুটো কপালে তুলতে। অভিমানের ভারী পাথর বসানো রয়েছে মনে। চেষ্টা করেও পারলাম না।

বাস ছাড়ল। মরার আগে অনেক রুগি যেমন চাঙ্গা হয়ে ওঠে, এখন তেমন দশা দেখছি বাসের গতি দেখে। চিত্রকূট থেকে বাস যায় স্ফটিক শিলা। ৫ কিমি। দেখতে দেখতে এসে গেলাম, নেমে এলাম বাস থেকে।

বিশাল মসৃণ একটি পাথর। বেশ কয়েকজন শুয়ে বসে থাকতে পারে একসঙ্গে অনায়াসে। স্ফটিক শিলা তবে স্ফটিকের শিলা নয়। এর গা ছুঁয়ে বয়ে চলেছে মন্দাকিনী। গতি অতি ধীর। ওপারে ছায়া ঘেরা মনোরম বনভূমি, পাহাড়। শান্ত নির্জন পরিবেশ। প্রকৃতির রূপের কোনও তুলনা হয় না চিত্রকূটের উপবন স্ফটিক শিলায়।

এখানে বিশাল শিলাটির উপরে রয়েছে দুটি পায়ের ছাপ। একটি রামচন্দ্রের অপরটি সীতার। রামচন্দ্রের ছাপটি বড়। আর একটি ছোট, সীতার। দেখলে বোঝা যায় শিল্পীর ছেনি হাতুড়িতে হয়নি এটা। ঠিক পুরীর মন্দিরচত্বরে মহাপ্রভুর পাদপদ্মের মতো।

চিত্রকূটের সবকিছু দেখে আবার বাস ধরলাম। সাতনা যাওয়ার পথেই অত্রিমুনির আশ্রম। স্ফটিকশিলা থেকে ১৩ কিমি পথ পেরিয়ে বাস এসে থামল অত্রিআশ্রমে।

চিত্রকূটের মন্দাকিনী এখানেও বয়ে চলেছে অত্রিআশ্রম প্রাঙ্গণের পাশ দিয়ে। আমার বাঁ-পাশে মন্দগতির মন্দাকিনী। জল এখানে খুব কম। চওড়াও বেশি নয়। হেঁটে পার হওয়া যায়। কাচের মতো স্বচ্ছ নীল জল। শান্ত-সুন্দর প্রকৃতির পরিবেশ। নদীর এ-পারে পাহাড়ি পরিবেশে আশ্রম। ওপারে ঘন সবুজ বনভূমি আর পাহাড়। এপারের গাছগুলি বেশিরভাগ ঝাউ, ওপারের বন শাল সেগুনের। নিবিড় ছায়াঘেরা বনের মধ্যেই অত্রিমুনির আশ্রম। প্রাচীন ঋষিদের তপস্যা করার মতোই এখানকার পরিবেশ। ভাবি, এখন যদি এই হয়, তখন কী ছিল!

পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে প্রথমে পড়ল পরমহংস পরমানন্দজির সমাধিমন্দির। ডানপাশে দোতলা আশ্রম। তার মধ্যে সমাধিমন্দির। নির্লিপ্ত সাধক ছিলেন পরমানন্দজি। অত্রির তপোবনেই তপস্যা করেছিলেন। শোনা যায়, এই অবলুপ্ত তীর্থ অত্রিআশ্রমকে প্রকটিত করেছিলেন তিনি।

সমাধিমন্দির ছেড়ে একটু এগতেই চোখে পড়ল ছোট্ট একটা সাইনবোর্ড। তাতে লেখা আছে 'অত্রিজিকা প্রাচীন আশ্রম'। পাহাড়ের পাদদেশে। এখানে পরপর ঘরগুলি সাধারণ ঘরের মতো, তবে প্রতিটা ঘরই মন্দির। ভিতরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ উপদেশ দানরতা অনসূয়া।

এখানে একটা মন্দিরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে

শারদীয়া বর্তমান ২০২০ ● ৯০

• চিত্রকূটে লক্ষ্মণের বিশ্রাম ক্ষেত্র

আছেন অতিবৃদ্ধ এক সাধুবাবা। মাথায় জটা নেই তবে চুলগুলো ঝোড়ো কাকের মতো ছন্নছাড়া। চুলগুলো কাঁধ ছাড়িয়ে সামান্য নীচে। বয়সের ভারে মনে হল সামান্য সামনে ঝুঁকে চলেন। পাশে জীবনসঙ্গী লাঠিটাকে এমনভাবে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা, দেখলে মনে হবে কোনও হাইব্লাড প্রেশারের রুগি যেন ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। গায়ের রং ময়লা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। তবে কালো বলা যাবে না। মুখশ্রী সুন্দর তবে বয়সের ধাক্কায় চোখদুটো একটু কোটরে ঢুকে আছে, ফলে মুখের হনুদুটো বেরিয়ে পড়েছে। বয়সটা আন্দাজ করতে পারলাম না, পরে জেনে নেব। পরনের ছেঁড়া কাপড়টা এককালে গেরুয়া ছিল বলে মনে হল। এখন ময়লা জলে জমে রংটা যে কী দাঁড়িয়েছে তা বোঝা দায়। তবে কাপড়টা এখন তেলচিটে মারা। পাশে পড়ে আছে ছোট্ট একটা ঝোলা। সেটির দশাও কাপড়ের মতো। ভিতরে কী আছে কে জানে! পাশ থেকে দেখলাম নাকটা বেশ টিকালো। গলায় মালা, কপালে তিলক-টিলক কিছু নেই।

টুকটুক করে এগিয়ে গেলাম কাছে। চোখ দুটো দেখলাম উদাসীন। কোনও দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। শূন্য দৃষ্টি। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই অন্যমনস্কতা ভাঙল। সোজা হয়ে বসে হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে মুখে বললেন, 'ওঁ নমো নারায়ণায়।'

ইশারায় বসতে বললেন। বসলাম বাবু হয়ে। প্রথমেই কথা শুরু করলেন সাধুবাবা বললেন, বেটা তুম কহাসে?

একটু হাসিমাখা মুখে বললাম, বাবা, আমি কলকাতা থেকে আসছি শ্রীরামচন্দ্র এবং প্রেমিক কবি তুলসীদাসের স্মৃতি বিজড়িত চিত্রকূট দর্শনে। এখানকার সব দেখা হয়ে গেলে আবার ফিরে যাব কলকাতায়।

কথাগুলো শুনলেন মন দিয়ে। মাথাটাও একটু নাড়ালেন। এবার বললেন, তা বেটা, ঘুরতে এসেছিস তো ঘুরে বেড়া। আমার কাছে কেন?

আমি রাখঢাক না করে বললাম, আসলে বাবা সাধুদের জীবনকথা শুনতে আমার ভালো লাগে তাই যখন যেখানে যাই কোনও সাধু পেলে তাঁর সঙ্গ করি। সেই জন্য আপনাকে দেখতে পেয়ে চলে এলাম।

মুখমণ্ডলে প্রসন্নতার ছাপ। মনে হল কথা-কটা শুনে সাধুবাবা খুশি হলেন। মাথাটা দোলাতে দোলাতে বললেন, তুই কী জানতে চাস বল!

প্রথমেই জানতে চাইলাম, বাবা এখন আপনার বয়স কত হল?

এবার হেসে ফেললেন সাধুবাবা। হাসির সময় দেখলাম গালে একটা দাঁতও নেই। কাঁচায় পাকায় মেলানো দাঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, সাল তারিখ তো বলতে পারব না তবে এখন আমার বয়স চলছে ছিয়ানব্বই।

সাধারণভাবে দেখেছি, সাধুসন্ন্যাসীরা কথা বলার সময় নিজেকে খুলেমেলে ধরেন না। কেউ বিরক্ত হন, কেউ রেগে যান, কেউ [illegible] উত্তর [illegible] না। শান্ত মনোভাবাপন্ন এই সাধুবাবাকে দেখলাম একটু অন্যভাবের, অন্য মনের। জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, আপনি কোন সম্প্রদায়ের সাধু? কতদিন আছেন এখানে?

হাসিমাখা মুখে শান্ত কণ্ঠে বললেন,

—বেটা আমি শ্রীসম্প্রদায়ের সাধু। এই চিত্রকূটে রামজির কোলে পড়ে আছি ষাট বছর ধরে। জানতে চাইলাম।

—ভারতের সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করেছেন?

মাথাটা নাড়িয়েও মুখে বললেন,

—হাঁ বেটা, যখন বয়স কম ছিল, তখনই বিভিন্ন তীর্থ ঘুরেছি, কখনও পায়ে হেঁটে, আবার কখনও মানুষের দেওয়া ভিক্ষার দানে গাড়িতে করে, তবে মরুতীর্থ হিংলাজ যাওয়া হয়নি। কিন্তু বেটা আমি মানস সরোবর আর কৈলাসে হেঁটে গেছি দু-বার।

এই পর্যন্ত বলে থামলেন। এদিক-ওদিক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তাকালেন আমার মুখের দিকে। বললাম,

—বাবা, সারাটা জীবন তো কাটালেন পথে পথে, না না তীর্থে। কোন জায়গা আপনার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে।

সাধুবাবা কোনও চিন্তা না করেই একবাক্যে বললেন,

—বেটা উত্তরাখণ্ড। কেদারনাথ, বদ্রীনারায়ণ, যমুনোত্রী আর গঙ্গোত্রী।

এবার মনে মনে ভাবলাম, সাধুবাবার ফেলে আসা জীবনের কথা কিছু জানতে হবে। বললাম,

—বাবা, কত বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেছিলেন?

সাধুবাবা এবার বাবু হয়ে বসে বললেন,

—বেটা, সাধুসন্ন্যাসীদের এসব কথা বলায় মানা আছে।

তবুও আমি নাছোড় হয়ে বললাম,

—বলুন না বাবা, এতে তো আপনার ক্ষতি কিছু হবে না। সাধুসন্ন্যাসীদের জীবন সম্পর্কে আমার জানার বড্ড ইচ্ছা। আমি তো সাধু হতে পারিনি, তাই!

আমাদের দু-জনের মধ্যে কথা হচ্ছে হিন্দিতে। সাধুবাবার গালে দাঁত না থাকায় মাঝে মাঝে কিছু কথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তবে কথার ভাবে তা বুঝে নিচ্ছি। এবার জানতে চাইলাম,

—বাবা, কত বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেছিলেন?

ভ্রু-টা সামান্য কুঁচকে সাধুবাবা চলে গেলেন সুদূর অতীতে। একটু চোখ বুজলেন। মিনিট খানেক পর বললেন,

—বেটা, তখন আমার [illegible] বছর হবে।

সঙ্গে সঙ্গে বললাম,

—অতটুকু বয়সে ঘর ছাড়লেন কেন?

এরই মধ্যে দেখলাম একদল তীর্থযাত্রী এসে উপস্থিত। চিৎকার করে কথা বলছেন। কয়েকজন তো বসেই পড়ল আমাদের আশপাশে। আমাদের দু-জনের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তি আর অস্থিরতার সৃষ্টি হল। ইশারায় সাধুবাবা উঠতে বললেন। উঠে দু-জনে হাঁটতে লাগলাম। একটু হেঁটে, একটু নিরিবিলিতে এলাম। মন্দাকিনীর পাড়ে সাধুবাবা বসলেন, আমি বসলাম মুখোমুখি হয়ে। এবার তিনি বললেন,

—আমার বাড়ি ছিল মধ্যপ্রদেশের কোনও একটা গ্রামে। নামটাম আমি বলতে পারব না। আমাদের বাড়িতে বেশিরভাগ দিনই পেট ভরে দুটো অন্ন জুটত না। পাঁচ ভাইবোন আমরা। বাবা জনমজুরের কাজ করে যা পেত তাতে সংসার চলত না। এমনটা চলত দিনের পর দিন। একদিন ভাবলাম, আমি যদি বাড়ি ছেড়ে চলে যাই তাহলে আমার খাবারটা মা আর ভাইবোনদের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। তাতে ওদের সামান্য হলেও পেটটা ভরবে। মা তো আমার বেশিরভাগ দিনই না খেয়ে থাকত। এসব ভেবে একদিন মানসিক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। সোজা হাঁটা দিলাম। পথে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করে ধরলাম স্টেশনের পথ। বাড়ি থেকে অনেকটা পথ স্টেশনের। হাঁটতে হাঁটতে একসময় পৌঁছে গেলাম স্টেশনে।

এক নাগাড়ে এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন। দেখতে দেখতে বেলা অনেকটা গড়িয়েছে। সাধুবাবাকে ইশারায় একটু বসতে বলে এক ছুটে চলে গেলাম খাবারের দোকানে। দু-জায়গায় চারটে করে গরম পুরি আর সব্জি নিয়ে এসে বসলাম সাধুবাবার পাশে। একটা পাতা দিলাম সাধুবাবাকে, আর একটা নিলাম নিজে। মুখটা দেখে মনে হল বেশ খুশি হয়েছেন। খাওয়া শেষ হতেই মন্দাকিনীর জলে দু-জনে হাত ধুয়ে মন্দাকিনীর জল খেলাম অঞ্জলিভরে। সাধুবাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। ডানহাতটা স্পর্শ করলেন মাথায়। তারপর বললেন,

—আমি স্টেশনে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর একটা ট্রেন এল। তখন প্রায় সন্ধে। সকাল থেকে খাওয়া তো দূরের কথা, একফোঁটা জল পড়েনি পেটে। ট্রেনে উঠে এক জায়গায় বসে থাকার পর ক্লান্ত দেহে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, কিছুই জানি না। সকাল হতে কোনও বড় স্টেশনে ট্রেনটা থামতেই আমার ঘুমটা ভেঙে গেল। আমি ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। কোন স্টেশন তা কিছুই জানি না।

সাধুবাবা থামলেন, এদিক-ওদিক দেখলেন। কী দেখলেন জানি না। তারপর মুখের দিকে তাকালেন। আমাকে যেন এক্সরে করে নিলেন পলকে। তারপর আবার শুরু করলেন,

—বেটা খিদেতে তখন আমার পেট জ্বলছে। জীবনে আজ পর্যন্ত ভিক্ষে করিনি, তখনও না। প্ল্যাটফর্মে একটা চায়ের দোকান দেখে সেখানে গিয়ে কাজ করতে চাইলাম। দোকানদার রাজি হয়ে গেলেন। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আমার তখন হয়ে গেল। আমি বাঁচলাম।

একটু থেমে উচ্চস্বরে কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, জয় গুরু মহারাজ কি জয়। আমি চুপ করেই রইলাম। সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, থাকা খাওয়ার একটা ব্যবস্থা হতে আমার খুব আনন্দ হল। ভাবলাম, আমি না থাকাতে মা আমার দুটো খেতে পাচ্ছে। বেশিরভাগ দিনই মায়ের আহার জুটত না।

সাধুবাবা থেমে গেলেন। দেখলাম, দু-চোখ বেয়ে নেমে এসেছে মন্দাকিনী ধারা। এমনটা দেখে বললাম,

—বাবা, সেই কোন ছোটবেলায় ঘর ছেড়েছেন। এখন বয়স ছিয়ানব্বই। আপনি সাধু মানুষ। এখনও আপনার ভিতর এত মায়া? সাধুবাবা এবার একটু ডুকরে কেঁদে ফেললেন। কান্না জড়িত কণ্ঠে বললেন,

—মায়ের জন্য কাঁদব না তো কার জন্য কাঁদব। আমাদের জন্যেই তো মায়ের জীবন কেটেছে কখনও অর্ধাহারে, কখনও অনাহারে। আজ যে আমার এই পরমানন্দময় সাধুজীবনে আসা, তা আমার দুঃখিনী মায়ের জন্যেই তো। বেটা, একটা কথা নিশ্চিতভাবে জানবি, যে মায়ের ভালোবাসা পেয়েছে, সে ভগবানকে পেয়েছে। যে মায়ের ভালোবাসা পায়নি, সে না পার্থিব, না অপার্থিব, কিছুই পায়নি। বেটা জানবি, ভগবানের থেকে অনেক অ-নে-ক বড় মা।

কথাগুলো বলার পরও সাধুবাবার চোখের জল থামেনি। দু-জনেই চুপ করে বসে রইলাম। দেখতে লাগলাম তীর্থযাত্রীদের আনাগোনা। সাধুবাবার কাছ থেকে এত সহজে তাঁর জীবনকথা জানতে পারব তা ভাবতেই পারিনি। শত শত 'রমতা' সাধুসঙ্গ করেছি কিন্তু এমন আপন করে নিয়ে ফেলে আসা জীবনকথা খুব সহজে কেউ বলেনি। প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম,

—বাবা, সাধু জীবনে এলেন কীভাবে?

মাথাটা ধীরে ধীরে নাড়তে নাড়তে বললেন,

—বেটা, দেখতে দেখতে ওখানে আমার দুটো বছর কেটে গেছে। একদিন ওই দোকানের কোনও একটা কাজে কী যেন একটা ভুল করেছিলাম। আজ অত আর মনে নেই। দোকানদার আমাকে একটা লাথি মারল। এতে মনটা আমার খুব খারাপ হয়ে গেল। মনে মনে ভেবে নিলাম, আমাকে লাথি মারল, আর এখানে থাকব না। একদিন অনেক রাতে একটা ট্রেনে চড়ে বসলাম। ট্রেনটায় খুব ভিড় ছিল। শোওয়ার জায়গা ছিল না। সারাটা রাত জেগেই কাটালাম। সকালে একটা স্টেশনে ট্রেন থামতেই হুড়মুড় করে যাত্রীরা নেমে পড়ল। ওদের দেখাদেখি আমিও নামলাম। আমি লেখাপড়া কিছু জানি না। একজন যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কোন স্টেশন? তিনি বললেন, বেনারস। আগে যেখানে ছিলাম, পরে জেনেছিলাম, সেটা এলাহাবাদ।

এই পর্যন্ত বলে থামলেন। কথার তার কেটে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলাম না। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না সাধুবাবার দেহে কোনও রোগ আছে। খানিক থেমে থাকার পর আবার কথা শুরু করলেন,

—বেটা, আবার একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেলাম। কোথায় যাব, কোথায় থাকব, কী খাব— এমন ভাবনায় একেবারে অস্থির হয়ে উঠলাম। কিছু চিনি না, জানি না, কোথায় যাব, এসব কথা ভাবতে ভাবতে হাঁটতে লাগলাম। একদল লোক গান গাইতে গাইতে চলেছে যে দিকে, তাদেরই পিছু নিলাম। অনেকক্ষণ হাঁটার পর এলাম একটা মন্দিরের কাছে। জানতে পারলাম এখানে আছে বাবা বিশ্বনাথ আর মা অন্নপূর্ণা মন্দির। মনে মনে ভাবলাম, মন্দির যখন আছে তখন খাওয়া কিছু না কিছু জুটবে। যাত্রীদের জিজ্ঞাসা করে মা অন্নপূর্ণা আর বাবা বিশ্বনাথের দর্শন করে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসলাম।

—বেটা, তখন সন্ধ্যা প্রায় নেমে এসেছে। ঘাটও অনেক ফাঁকা হয়ে এল। হঠাৎ এক বয়স্ক দেশওয়ালি মহিলা এসে

শালপাতায় চারটে রুটি, কিছু সব্জি আর খানিকটা সুজি আমার পাশে রেখে চলে গেলেন। আমার চেহারা আর পোশাক দেখে আমাকে ভিখারি ছাড়া অন্য কিছু ভাবেননি। বেটা, ঠিকই ভেবেছেন। এটাই তো সত্য। রাতে দুটো রুটি আর সব্জি খেলাম। আর দুটো রুটি সব্জি রেখে দিলাম কালকের জন্য। গঙ্গার ফুরফুরে হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়লাম ক্লান্ত দেহে, ঘাটের সিঁড়ির উপরে।

এদিকে মন্দাকিনী তটে অত্রিআশ্রমে ক্রমশ ভিড় ও কোলাহল বাড়তে শুরু করেছে। চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে তবে সেদিকে কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই সাধুবাবার। একমনে তিনি বলে চলেছেন তাঁর ফেলে আসা দুঃখময় জীবনকথা। বললেন,

—বেটা, এই বেনারসে আসার পর কিছু না কিছু খাবার আমার জুটে যেত না চাইতেই। এইভাবেই কাটছে জীবন। একদিন জুটে গেলেন এক সাধুবাবা। তিনি এসেছিলেন ঘাটে স্নান করতে। স্নান সেরে ফেরার পথে আমি তাঁর নজরে পড়ে গেলাম। ক্রমে পোশাকের পরিবর্তন, মনের পরিবর্তন, পরে দীক্ষা হল তাঁর কাছে। আমার গুরুর কোনও স্থায়ী ডেরা ছিল না। কিছুদিন বেনারসে থাকার পর আমার গুরুজি আমাকে নিয়ে গেলেন নৈমিষারণ্যে। নির্জন বনভূমির মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে গোমতী নদী। এই নদীর কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে দেখলাম গাছের ডাল আর কিছু জিনিস দিয়ে তৈরি একটা ঝুপড়ি। সাধুবাবা আমাকে নিয়ে সেখানেই উঠলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, ওখানে গেলেন কীভাবে?

সাধুবাবা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন,

—বেটা, বেনারস থেকে লখনউ গেলাম ট্রেনে। তারপর লখনউ থেকে পায়ে হেঁটে 'নিমষার'। অনেকটা পথ।

কথা শেষ হতেই বললাম,

—বাবা, পথে কী খেতেন, খাবার জোগাড় হতো কীভাবে এবং কোথা থেকে?

চারদিকে একনজর শূন্য দৃষ্টিতে চোখ দুটি বুলিয়ে বললেন,

—খাবারের ব্যবস্থা করে নিয়েই সেই সাধুবাবা আমাকে নিয়ে ট্রেনে উঠেছিলেন।

জানতে চাইলাম, বাবার দীক্ষা হয়েছে কি ওই সাধুবাবার কাছে?

ঘাড় নেড়েও মুখে বললেন,

—হাঁ বেটা, ওই সাধুবাবাই আমার গুরুজি মহারাজ তবে আমার দীক্ষা কিন্তু বেনারসে হয়নি। দীক্ষা হয়েছে ব্যাসতীর্থ নৈমিষারণ্যে।

জানতে চাইলাম,

—খাবার পেতেন কোথা থেকে? আপনার গুরুদেবের বয়স তখন কত ছিল?

সাধুবাবা বললেন,

—আমাকে কখনও ভিক্ষায় যেতে দিতেন না। কেন যেতে দিতেন না, বলতে পারব না। 'নিমষার' বনভূমিতে কোনও লোকালয় ছিল না। লোকালয় ছিল বনভূমির বাইরে অনেকটা দূরে। তখন বয়স আমার কম হলেও একটা বিষয় লক্ষ করতাম, গুরুজি মহারাজ ভিক্ষায় যেতেন কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভিক্ষায় সংগ্রহ করা প্রচুর খাদ্যসামগ্রী নিয়ে আসতেন, সেটা আমাকে বেশ অবাক করে দিত। তবে আমি কিছু জানতে চাইতাম না। শুধু ভাবতাম, এত অল্প সময়ে এটা কী করে সম্ভব?

একটু থেমে বললেন,

—বেটা, আমার সঙ্গে যখন বেনারসে গুরুজি মহারাজের যোগাযোগ হয় তখন তাঁর বয়স আমার ধারণা আন্দাজ ৮০/৮৫ হবে।

এবার জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, নৈমিষারণ্যে দিনগুলো কেমন করে কাটাতেন? ওখানে তো তখন লোকজন থাকত না। আপনি আর আপনার গুরুদেব, এই তো মাত্র দু-জন।

হাসিমাখা মুখে সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, আমাদের দু'জনের দিনগুলো কাটত সাধনভজনে। জপতপ পুজোপাঠের পর গুরুজি আমাকে শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন আর বিভিন্ন ধরনের যোগ শেখাতেন।

এতক্ষণ পর বুঝতে পারলাম সাধুবাবা আর তাঁর গুরু মহারাজ ছিলেন যোগী। হঠাৎ করে সাধুবাবা বলতে শুরু করলেন,

—বেটা, এইভাবে নৈমিষারণ্যে আনন্দেই কাটতে লাগল জীবন। মাঝে মাঝেই আমরা দু-জনে বেরিয়ে পড়তাম তীর্থভ্রমণে।

জানতে চাইলাম,

—বাবা, তীর্থভ্রমণকালে এমন কোনও ঘটনা কি কখনও ঘটেছে যা আজও আপনাকে বিস্মিত করে?

কথাটা শুনে বৈষ্ণব সাধুবাবা হেসে উঠলেন হো-হো করে। বললেন,

—হাঁ-হাঁ বেটা, এমন ঘটনা হামেশাই ঘটেছে তীর্থভ্রমণে।

একথা বলে চিত্রকূটে অত্রিআশ্রমের চারপাশটা এক নজর দেখে নিলেন। মুখখানা প্রসন্নতায় ভরা। বললাম,

—দু'-একটা ঘটনার কথা বলুন না বাবা, যদি অসুবিধা না থাকে।

সাধুবাবা কিছুক্ষণ ভাবলেন, ভাব দেখে মনে হল, ভাবটা এই একে বলা ঠিক হবে কি না? পাঁচ-সাত ভেবে বললেন, বেটা তখন আমার বয়স খুব কম। আমি গুরুজি মহারাজ চলেছি মানস সরোবর ও কৈলাসের পথে। শীতবস্ত্র কিছু নেই, একদানা খাবারও সঙ্গে নেই। হাঁটছি তো হাঁটছিই। হাঁটার যেন আর শেষ নেই। যখন শীতের এলাকায় পড়লাম তখন গুরুজি আমায় কিছু জড়িবুটি হাতে দিয়ে বললেন, 'খা লে বেটা, ঠান্ডা নেই লাগে গা।'

আমি কোনও কথা না বলে খেয়ে নিলাম। তারপর ধীরে ধীরে শরীর গরম হয়ে গেল। দেহে শীতের কোনও অনুভূতি নেই। চলার গতি আর মনের শক্তি যেন বেড়ে গেল। হাঁটতে লাগলাম মহানন্দে। আমার নীরোগ গুরুজিও হাঁটতে লাগল সমান তালে।

জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, কৈলাস যাত্রার পথে কী খেতেন? কোথায় পেতেন? খাবার সংগ্রহ করতেন কোথা থেকে? কে বা কারা দিত খাবার?

এ কথা বলার পর দেখলাম, সাধুবাবার মুখখানা কেমন যেন একটা অস্বস্তিতে ভরে উঠল। মনে হল মৌচাকে ঢিল মেরে দিয়েছি। কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার জন্য পাত্তা না দিয়ে বললেন,

—বেটা, পথেই ওটা জোগাড় হয়ে যেত।

সাধুবাবার এ কথায় আমল না দিয়ে বললাম,

—বাবা, আমার কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। সত্যি করে বলুন না, সারাটা পথ কী খেতেন? কেমন করে জোগাড় হতো
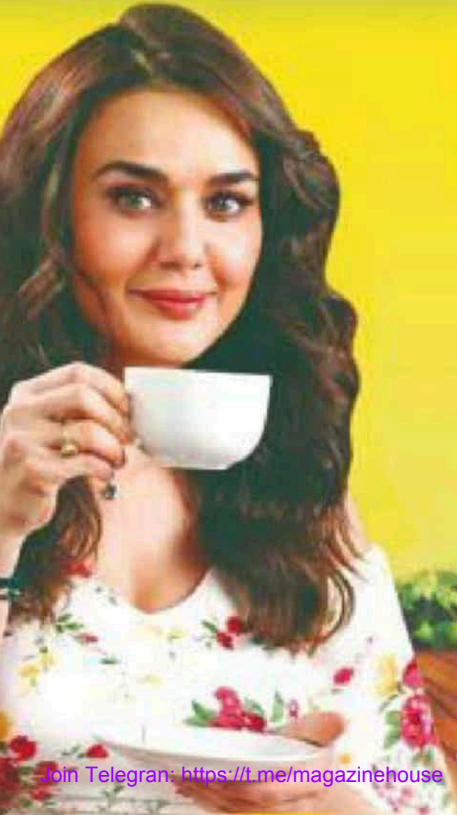
খাবার, আপনি তো প্রথমেই বলেছেন, কোনও দিন ভিক্ষা করেননি, করবেনও না কখনও আর, শিষ্য যেখানে কারও কাছে হাত পাততে নারাজ, সেখানে তাঁর গুরু মহারাজ হাত পেতে ভিক্ষা করবে, এ কথা কি বিশ্বাস করা যায়, আপনিই বলুন না?

আমার কথা শুনে মনে হল, সাধুবাবার মুখখানা কে যেন সেলাই করে দিল। একটা কথা নেই মুখে। চুপ করে বসে আনাগোনা করা তীর্থযাত্রীদের দেখতে লাগলেন। আমি দেখতে লাগলাম সাধুবাবাকে। বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল এইভাবে। একটু অধৈর্য হয়ে বললাম,

—বলুন না বাবা, দুর্গম হিমালয়ে যেখানে লোকবসতি নেই, সেখানে খাবার পেতেন কোথা থেকে? আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা গোপন করে যাচ্ছেন।

মুখে কিছু বলছেন না। শুধু তাকাচ্ছেন আমার মুখের দিকে। আমার জানা আছে, মেয়েমানুষ বশ হয় আদরে, সাধু বশ হয় প্রণামে। এবার সাধুবাবার পা-দুটো ধরে বললাম,

—বলুন না বাবা, কেমন করে আহার সংগ্রহ করতেন যেখানে যখন প্রয়োজন হতো!

সাধুবাবা পা থেকে হাত দুটো সরিয়ে দিতে দিতে বললেন,

—বেটা, এরকম করিস না, লোকে দেখলে কী ভাববে বল তো?

সামনে দিয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে মন্দগতির মন্দাকিনী। ওদিকে শত শত লোক চলেছে বিভিন্ন মন্দিরে নানা দেবদেবীর দর্শনে। কোলাহল আছে মৃদু তবে অসভ্যের মতো চিৎকার করে নয়। সামনের গভীর জঙ্গলে বাতাস বয়ে চলেছে যেমন ছোট্ট শিশুকে মা ঘুম পাড়ানোর জন্য হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করে, এখানে বাতাসটা তেমন। গতিতে মোটেই উগ্রতা নেই। পা দুটো কিন্তু আমি ধরেই আছি। এবার পা থেকে হাতদুটো সরিয়ে দিয়ে সাধুবাবা মুখ খুললেন,

—বেটা, দুর্গম কোথাও গেলে অথবা আহার পাওয়ার পরিস্থিতি না থাকলে তবেই গুরুজি মহারাজ যোগের প্রক্রিয়া করে অতি সহজেই নানান সুখাদ্য সংগ্রহ করতেন।

জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, ম্যাজিকের মতো ছুঁ করলেই কি হাতে খাবার চলে আসত?

হেসে ফেললেন সাধুবাবা। বললেন,

—না বেটা, যোগের এই প্রক্রিয়ায় স্থান দুর্গম হলে অথবা লোকালয় থাকুক বা না থাকুক, কেউ না কেউ খাবারটা দিয়ে যায়। দুর্গম স্থান কিংবা লোকালয় বিহীন জায়গা হলে খাবারটা আসতে একটু দেরি হলেও খাবার আসবেই— আসবে। আমার গুরুজি ক্ষেত্রবিশেষে যোগের প্রক্রিয়াতেই খাবার আনতেন। যেখানে খাবার সহজলভ্য সেখানে তিনি কখনওই যোগের প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতেন না। যে কোনওভাবে সংগৃহীত সেই অর্থের মাধ্যমে খাবার সংগ্রহ করতেন। গুরুজির সঙ্গে থাকাকালীন নানান ধরনের সুখাদ্য খাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

এবার সাধুবাবাকে বাগে পেয়েছি। বললাম,

—বাবা, গুরুজি মহারাজ আপনাকে যোগ শিক্ষা দিয়েছিলেন, তখন তো আহার সংগ্রহের এই প্রক্রিয়াও আপনাকে শিখিয়েছেন।

সাধুবাবা আমার এ কথায় কোনও উত্তর দিলেন না। চুপ করে বসে আমাকে এক্স-রে করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে বসে থাকার পর সাধুবাবা বললেন,

—বেটা কোথায় থাকিস, কী করিস, বিয়ে করেছিস, বাবা-মা আছে, এখন তোর বয়স কত?

একবারে এতগুলো প্রশ্ন এর আগে আর কোনও সাধুবাবা করেনি কখনও। নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে, পরে হয়তো বুঝতে পারব। উত্তরে বললাম,

—বাবা, আমি থাকি কলকাতায়। এখন আমার বয়স আঠাশ। বিয়ে-থা করিনি। বাবা মারা গেছেন আমার পনেরো বছর বয়সে। এখন চাকরিবাকরি কিছু করি না। টুকটাক যা করি তা বলার মতো নয়।

আমার কথাগুলো মাথা নাড়তে নাড়তে শুনলেন মন দিয়ে। জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, সারা ভারতের সমস্ত তীর্থই কি আপনার গুরুজির সঙ্গেই ঘুরেছেন, না একা?

উত্তরে সাধুবাবা বললেন,

—হাঁ বেটা, সারা ভারতের প্রায় সব তীর্থই আমার ঘোরা। যতদিন গুরুজি দেহে ছিলেন ততদিন গুরুজির সঙ্গে, গুরুজির দেহান্তের পর একাই ঘুরেছি তবে মানস-কৈলাসে প্রথমে ঘুরেছি গুরুজির সঙ্গে। তারপর একবার গুরুজির দেহান্তের পর। বেটা, অন্যান্য তীর্থে লোকসমাগম অনেক বেশি। সমান তালে কোলাহল। তুই দেখ, রামপ্রেমিক তুলসীদাসের প্রধান সাধনস্থলী। যেমন শান্ত তেমনই কোলাহল মুক্ত। সাধনভজনের এমন উপযুক্ত ক্ষেত্র আছে তবে সংখ্যায় খুব কম। জল আলো বাতাস, কোনওটারই কমতি নেই। সেই জন্যেই রামের পদধূলিপূত এই চিত্রকূটে পড়ে আছি। আর কোথাও মন চায় না।

জানতে চাইলাম,

—বাবা, ভিক্ষে করেন না বলেছিলেন। এখানে কী করে চলছে আপনার? খাবার পান কোথা থেকে? অনেক বয়স হল। হঠাৎ অসুস্থ হলে তখন কী করবেন? দেখবে কে আপনাকে?

কথাটা শোনামাত্র সাধুবাবা হেসে ফেললেন। হাসিতে কেমন যেন একটা হেঁয়ালি ভাব। হাসিমাখা মুখে নির্বিকার বৃদ্ধ বললেন,

—বেটা রামজি আর গুরু মহারাজ কি কৃপা সে প্রতিদিন কিছু না কিছু জুটে যায়। চাইতে হয় না কারও কাছে।

সাধুবাবার কথা শেষ হতে না হতেই দেখি দু'জন লোক এসে হাজির। একজনের হাতে আধঝুড়ি পুরি, আর একজনের হাতে আধ বালতি সব্জি। সঙ্গে আর একজন আছে হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে। সাধুবাবাকে শালপাতায় লুচি আর সব্জি আর পাশের লোকটি ব্যাগ থেকে দুটো বোঁদের লাড্ডু দিলেন।

ওরা চলে যেতেই মনে হল সাধুভোজনের উদ্দেশ্যেই ওরা এসেছিলেন। এবার সাধুবাবা শালপাতা ছিঁড়ে নিজে তিনটে পুরি একটা লাড্ডু নিলেন। আমাকেও তাই দিলেন। আমি একটা পুরি আর একটু সব্জি রেখে বাকিটা দিয়ে দিলাম সাধুবাবাকে। তিনি দুটো পুরি একটু সব্জি নিয়ে বাকিটা রেখে দিলেন ঝোলায়। বুঝলাম রাতের খাবারটা রামজি জুটিয়ে দিলেন। পুরি খেয়ে মন্দাকিনীর জল পান করে একটা পরিতৃপ্তির হাসি দিলেন। ভাবটা এই, 'দেখলি তো বেটা, খানা ক্যায়সে মিল গয়া।' আমারও আর বলার কিছু রইল না।

মাথার মধ্যে একটা বিষয় আমার চক্কর খাচ্ছে, কী এমন বিদ্যা সাধুবাবার গুরুদেব দিয়েছেন যে, সে বিদ্যার প্রয়োগ করলে না চাইতেই খাবার পাওয়া যায়। এটা যে কোনওভাবে

• চিত্রকূটে সতী অনসূয়া মন্দির

শিখতে হবে সাধুবাবার কাছ থেকে। পরে হবে, এখন একটু অন্য কথা। বললাম,

—বাবা, জীবনে এমন কোনও দিন গেছে যেদিন সারা দিন-রাত অনাহারে ছিলেন। কোনও খাবার জোটেনি।

উচ্চস্বরে 'জয়গুরু মহারাজ কি জয়' বলে কপালে হাত জোড় করে বললেন,

—না না বেটা, গৃহত্যাগের পর থেকে আজ পর্যন্ত কখনও অভুক্ত থাকিনি। কিছু না কিছু খাবার জুটেই গেছে।

এবার বললাম,

—বাবা, দেহ যখন তখন রোগব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনও উপায় নেই। আপনি কি কখনও কোনও বড় রোগে আক্রান্ত হয়েছেন? তখন কে সেবা-যত্ন করেছিল আপনাকে?

প্রসন্ন মুখে বললেন,

— বহু বছর আগের কথা। যাচ্ছিলাম চারধাম কেদার, বদ্রী, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী দর্শনে। এখন তো আবহাওয়ার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তখন ঠান্ডা মানে বেশ জব্বর ঠান্ডা। পথ চলছি একা, পায়ে হেঁটে। চলার পথে পরিচয় হল এক সাধুবাবার সঙ্গে। যোশীমঠ ছাড়িয়ে গেছি। গোবিন্দঘাটের কাছে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। ওখানে একটা ধর্মশালায় ছিলাম বেশ কয়েকদিন। সেই সাধুবাবার সেবাযত্নে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলাম। তখন আমার বয়স বছর আঠারো হবে। গুরুজির দেহান্ত হয়ে গেছে। তার আগে একবার এসেছিলাম গুরুজির সঙ্গে। গুরুজি বলতেন, গুরুর সঙ্গে গোবিন্দ দর্শন করলে তার আর জন্ম হয় না। আত্মা মুক্তিলাভ করে।

প্রসন্নচিত্ত সাধুবাবা। আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন সহজ সরল ভাবে। মুখমণ্ডলে এতটুকুও বিরক্তির ছাপ নেই। জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, সাধুজীবনে আসার পর কখনও কোনওভাবে বিপদে পড়েছেন?

সঙ্গে সঙ্গেই বললেন,

—না না বেটা, গুরুজি মহারাজ থাকতে সাধুদের কি কখনও বিপদ হতে পারে? তবে হ্যাঁ, হতে পারে। সংসার ছাড়লেও যারা কামনা-বাসনা ত্যাগ করতে পারেনি, লোভ যাদের পিছন ছাড়েনি, তারা তো বিপদে পড়তেই পারে।

জানতে চাইলাম,

—বাবা, সাধুজীবনে কোনও নারীর প্রতি আকর্ষণ এসেছে, দেহ তো, কাম রিপুর তাড়না তো কমবেশি থাকে। এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন?

আমার কথা শুনে সাধুবাবার মুখখানা এক পারমার্থিক আনন্দে ভরে উঠল। হাসতে হাসতে বললেন,

—ছোটবেলায় দিনের পর দিন দু-বেলা পেট ভরে খাওয়া জুটত না। তারপর পড়লাম সাধুবাবা মানে গুরুজির পাল্লায়। তখনকার দিনে নৈমিষারণ্যে (হিন্দিভাষীরা বলে নিমষার) লোকজনের যাতায়াত প্রায় ছিল না বললেই চলে। সুতরাং শুধু [illegible] বোধ হয়নি আমার।
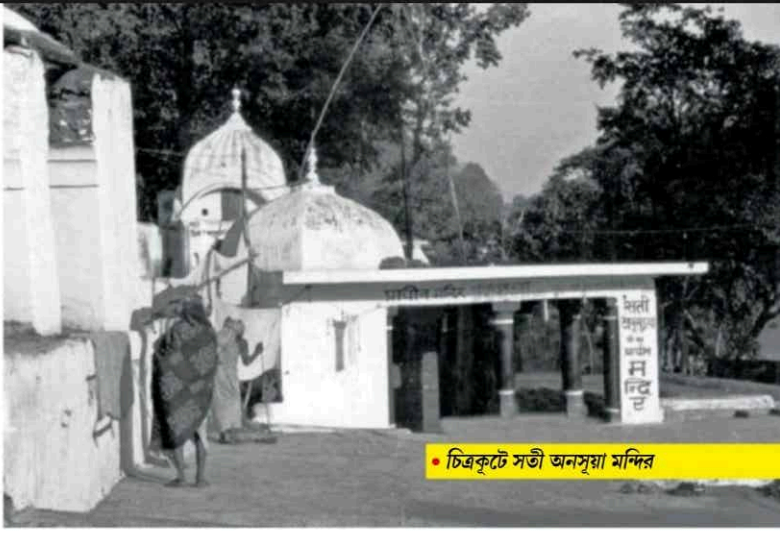
এবার জানতে চাইলাম,

—বাবা আপনার গুরুমহারাজ তো যোগীপুরুষ ছিলেন। তাঁর যোগের কোনও ঘটনার কথা কিছু বলুন, যা দেখেছেন নিজের চোখে।

এ কথা শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন সাধুবাবা বললেন,

—হ্যাঁ হ্যাঁ বেটা, অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখেছি নিজের চোখে, যা নিজের চোখে না দেখলে এ যুগের কোনও মানুষই তা বিশ্বাস করবে না। তোকে তো বলেছি এই নির্জন বনাঞ্চলে ভিক্ষে দেওয়ার মতো কেউ নেই। তিনি জঙ্গলের বাইরে যেতেন, অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে নানান ধরনের খাদ্যসামগ্রী নিয়ে চলে আসতেন। তিনি আমাকে দিয়ে সব্জি কাটাতেন। রান্না করতেন গুরুজি। খুব সুস্বাদু রান্না করতেন তিনি। গুরুজিকে দেশলাই দিয়ে আগুন ধরাতে দেখিনি কখনও। শুকনো কাঠ সাজিয়ে পরে ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালাতেন।

কথাটা শুনে একটু অবাক হলাম। শুনেছি আগেকার দিনে ব্রাহ্মণদের এই শক্তি ছিল। সাধুবাবার কথায় কোনও ছেদ টানলাম না। বিস্মিত হয়ে শুধু কথাগুলো শুনছি। তিনি বললেন,

—বেটা, গুরুজি আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। আর সবসময় বলতেন, জানবি আমার দেহটা চলে গেলেও আমি কিন্তু সদা সর্বদা তোর সঙ্গে থাকব। নির্ভয়ে থাকবি। শুধুমাত্র ভগবান শ্রীরামজির নাম জপ করবি। তাতেই ভববন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে।

সাধুবাবা থামতেই বললাম,

—অত্রিআশ্রমের পাশে পড়ে থাকেন। শীতবস্ত্র বলতে যা, তা তো কিছুই দেখলাম না। শীতকালে কষ্ট হয় না?

ঘাড়টা নেড়েও মুখে বললেন,

—না বেটা, তেমন কোনও কষ্ট গুরুজির কৃপায় এ দেহটা ভোগ করে না, বেটা বেশ ভালো আছি, আনন্দেই আছি।

কথাটা শেষ করেই বললেন,

—চল বেটা, রামঘাটে যাই, যেখানে রামপ্রেমিক তুলসীদাস রক্তমাংসের দেহে দর্শন করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণকে।

আমরা দু'জনেই উঠে পড়লাম মন্দাকিনীর পাড় থেকে। বৃদ্ধ সাধুবাবা ধীর পায়ে চলতে লাগলেন লাঠিতে ভর দিয়ে। সাধুবাবার কাঁধের ঝোলাটা আমার কাঁধে নিলাম একটু কষ্ট কম হবে এই ভেবে। [illegible]

• অত্রিমুনির সাধনক্ষেত্র অত্রিজী মন্দির

বলতে লাগলেন। বাংলায় আমার ভাষায়,— চিত্রকূট অরণ্য। ত্রেতাযুগ থেকেই বহন করে চলেছে রামচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতি, আজও। তাঁরই পদধূলিতে পবিত্র হয়ে উঠেছে চিত্রকূট, বৃক্ষলতা। তাই তো ভক্তপ্রাণ তীর্থযাত্রী ছুটে আসে দূর-দূরান্তর থেকে। চিত্রকূটের ধূলিস্পর্শে নিজেকে চাই নির্মল পবিত্র করতে। এমন মনোরম তীর্থ, ভক্তের সঙ্গে রাম যেন একাত্ম হয়ে যায় এখানে এলে। চিত্রকূটের অতিথি রঘুপতি রাম। রাজা রাম এসেছিলেন তপস্বীর বেশে, পরিবেশও তপস্যার। মনোময় বনভূমি। প্রকৃতি যেন সেইভাবে সাজিয়ে রেখেছিলেন তাঁর পরিবেশ। জানতেন রাম আসবে। বসেছিলেন রামেরই অপেক্ষায়। এলেনও। মাতৃস্তনের দুধ যেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই আয়োজন শেষ।

আমরা দু'জনেই হাঁটছি ধীর পদক্ষেপে, কোনও কথা বলছি না। কথা বললে তাড়াতাড়ি হাঁপিয়ে যেতে হয়। এখন অনেকটাই বেলা হয়েছে। সকাল থেকে আনন্দ আর জনকোলাহলে মুখরিত চিত্রকূট। দলে দলে চলেছে তীর্থযাত্রী। চলেছে গান গাইতে গাইতে।— সীয়ারাম সীয়ারাম— জয় জয় সীয়ারাম। বাচ্চা থেকে বুড়ো আছে সব বয়সের। বয়স্কের সংখ্যাই বেশি। এসেছে শেষ বয়সে পরপারের পাথেয় সংগ্রহ করতে।

অন্তরে কষ্ট হয় যখন দেখি প্রায় উত্থানশক্তিরহিত বৃদ্ধা মাকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে চলেছে তাঁর মধ্যবয়স্ক সন্তান। কোনও দ্বিধা নেই— নেই সংকোচ লজ্জা, চলেছে আপন মনে। কোথা থেকে এসেছে ওরা বলতে পারিনে, সাঁওতাল রমণীর পিঠে বাঁধা শিশু যেন। অস্থিচর্মসার দেহ, কোটরগত চোখ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

মা-ও তো আমার এমনই বৃদ্ধা। কই, আমি তো পারিনে! কীসের অভিমান, কেন পারিনে? কোথায় যেন বাধে! সন্তান পরিচয় দেওয়ার অযোগ্য যারা আমার মতো বৃদ্ধা মাকে ফেলে তীর্থে বেরোয় বাড়িতে পাহারাদার রেখে।

পথের দু-পাশে সারি সারি দোকান। চলেছি রামঘাটে। অনেকটাই এসেছি। আর সামান্য একটু পথ। একটা পুল পেরিয়ে এলাম। ছিলাম মধ্যপ্রদেশে, এলাম উত্তরপ্রদেশে। এক প্রদেশ থেকে আর এক প্রদেশে আসতে সময় লাগল না দু'মিনিটও। আরও কিছুটা এগিয়ে গেলাম। এবার দেখছি চিত্রকূটের বুক চিরে তরতর করে বয়ে চলেছে মন্দাকিনী। ছোট্ট নদী। রামপ্রেমিক সাধককবি তুলসীদাস। এলাম তাঁরই [illegible] পর সাধুবাবা

মুখ খুললেন। বললেন,

—বেটা, তখনও তুলসীদাস চিত্রকূটে আসেননি। যুবক তুলসী অবস্থান করছেন কাশীতে। নিয়মিত ভজনে কোনও আলস্য নেই তাঁর। প্রতিদিন ভোরেই ওঠেন। শৌচকর্ম সারেন। শৌচকর্মের অবশিষ্ট জলটুকু ফেলে দেন না যেখানে সেখানে। ঢেলে দেন একটি গাছের গোড়ায়। প্রতিদিন এমনই করেন তিনি। এটাও যেন তাঁর নিত্যকর্ম। ভাবেন না কিছু। রাম ছাড়া তুলসীদাসের আর কাউকে ভাবার অবকাশ নেই যে, ওই গাছে বাস করত একটি প্রেতযোনি। হঠাৎ একদিন আত্মপ্রকাশ করল তুলসীদাসের সামনে। জানাল, গাছের গোড়ায় প্রতিদিন জল ঢালায় সে বড়ই প্রসন্ন। তাই জিজ্ঞাসা করল, তুলসীদাসের কোনও উপকারে আসতে পারে কি না?

একমন, একচিন্তা, একই ধ্যান তুলসীদাসের, রাম। জানতে চাইলেন প্রেতের কাছে, কীভাবে সে পেতে পারে প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত ধন প্রভু রামের দর্শন?

সাধুবাবা চলতে চলতে একটু ধরা গলায় বললেন,

—খুশি হয়ে উত্তর দেয় প্রেত, প্রতিদিন রামায়ণপাঠ হয় দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে। সেখানে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে আসেন মহাবীর হনুমানজি। ভক্তিভরে শোনেন রামায়ণের রাম-গুণ কথা। একমাত্র তিনিই এ পথের দিশারি। তাঁর কাছে গেলে রামচন্দ্রকে লাভ করার পথ বলে দিতে পারবেন তিনি।

প্রেতযোনির উপদেশে আনন্দিত হলেন ভক্তকবি তুলসীদাস। একদিন গেলেন রামায়ণপাঠ আসরে। দেখা পেলেন মহাবীর হনুমানজির। তপনিষ্ঠ তুলসী জানালেন তাঁর মনের আকুল আকুতি, প্রভু রামচন্দ্রের দর্শন পেতে চান তিনি।

অর্থের খোঁজে ফেরে মানুষ, রামের খোঁজে ফেরে কই! এমন ভক্তের দেখা পেয়ে নিজেও খুশি হলেন মহাবীরজি। প্রসন্নচিত্তে বললেন, শ্রীরামের অবতারলীলার শুরু হয়েছে চিত্রকূট থেকে। তাঁরই পাদস্পর্শে ধন্য চিত্রকূটের জলমাটি বৃক্ষলতাদি। সাধনজীবনের পক্ষে সেখানকার পরিবেশও অতুলনীয়। চিত্রকূটের মনোরম বনে নিত্যখেলা করেন প্রভু রামচন্দ্র। সেখানে কিছুদিন তপস্যা করলেই মিলবে প্রভুর দর্শন।

একথা শুনে বেটা, আনন্দে বিগলিত হয়ে ওঠে তুলসীদাসের মনপ্রাণ। প্রণাম করলেন মহাবীরজিকে। ফিরে গেলেন ভজনকুটিরে। কাশীতে বাস করলেন আরও কিছুদিন। কর্ণঘণ্টা নামক স্থানের এক গুরুআশ্রমে সন্ন্যাসগ্রহণ করলেন তিনি। তখন বয়স তাঁর একত্রিশ। তারপর একদিন কাশী ছেড়ে পদব্রজে গেলেন চিত্রকূটে।

সাধুবাবা রামঘাটে মন্দাকিনী গঙ্গার পাশ ঘেঁষে নিজে বসলেন। ইশারায় বসতে বললেন আমাকেও। সাধুবাবার ঝোলাটা আমার পাশে রেখেই বসলাম। তরতর করে বয়ে চলেছে মন্দগতির মন্দাকিনী। বাতাস বইছে ফুরফুরিয়ে। রোদ আছে তবে তেমন তাপ নেই। আজ যেন মন্দাকিনীর এক [illegible]

করলেন, তবে থামলেন না। একনাগাড়ে বলে চললেন,

—প্রতিদিন সকালে স্নান সেরে ইষ্টপুজো করেন তুলসীদাস। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না কখনও। রাম-নাম গানে সদাই থাকেন আত্মমগ্ন হয়ে। তবুও প্রভুর দর্শন পান না তিনি। এইভাবে কাটতে থাকে প্রেমিক সাধকের একদিন দু'দিন করে দিনের পর দিন।

কোনও একদিন সকালে রামঘাটে মন্দাকিনীতে স্নান সেরেছেন। ঘাটে বসে আয়োজন করছেন ইষ্টপুজোর। ভাবতন্ময় হয়ে চন্দন ঘষছেন মরমীয় সাধক তুলসীদাস।

এমন সময় এসে উপস্থিত হলেন সুন্দর দুটি বালক। অপরূপ লাবণ্যময় সুঠাম দেহ। কী অদ্ভুত এক আকর্ষণ বালক দুটির। এমন রূপ কি কোনও মানুষের হতে পারে! দেখে তন্ময় হয়ে গেলেন ভক্তকবি। কোনও কথা সরল না মুখ থেকে। হঠাৎ বালক দুটি বললেন, তুলসীদাসকে চন্দন দিয়ে তিলকসেবা করিয়ে দিতে।

এ কথায় মুহূর্তমাত্র দেরি হল না তুলসীদাসের। বুঝতে পারলেন, এ বালক দুটি আর কেউ নয়, তাঁরই প্রাণের ধন, পরম সাধনার বস্তু, স্ত্রী পরিত্যক্ত হওয়ার পর একমাত্র কাম্য ইষ্টদেব রাম-লক্ষ্মণ এসেছেন দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করতে।

ভাবাবিষ্ট হলেন তুলসীদাস। পরমানন্দচিত্তে প্রেমিকভক্ত বালক দুটির মুখমণ্ডল সাজিয়ে দিলেন চন্দন দিয়ে। গলায় পরিয়ে দিলেন বনফুলের মালা। তারপর হারিয়ে ফেললেন বাহ্যজ্ঞান। কেটে গেল অনেকটা সময়। জ্ঞান ফিরে এল। দেখলেন কোথায় যেন অন্তর্হিত হয়ে গেছেন বালকদুটি। হতবাক হয়ে বসে রইলেন তুলসী। আনন্দে চোখের জলে বুক ভেসে গেল গোস্বামী তুলসীদাসের।

তুলসীদাসের জীবনী থেকেই জানা যায় চর্মচক্ষে তিনি রামচন্দ্রের স্থূলমূর্তিতে দর্শন পেয়েছেন তিনবার।

রমণীয় চিত্রকূট পর্বত, মাল্যবতী নদী, ফল, ফুল, মৃগ পাখিতে সুশোভিত বাগান আর বায়ুপ্রবাহ থেকে সুরক্ষিত পর্ণকুটির, এসব লাভ করে ভুলে গেলেন নির্বাসনের দুঃখ। আনন্দে দিনযাপন করতে লাগলেন সকলে।

সাধুবাবা থামলেন। দেখছি দু-চোখ বেয়ে নেমে চলছে অশ্রুধারা। আবেগে যেন খানিকটা নুয়ে পড়েছেন সাধুবাবা। আনন্দে আমার চোখে জল এল। বার বার প্রণাম করতে লাগলাম সাধুবাবাকে। ঠিক মানুষটাকে ধরেছি। ভুল হয়নি এতটুকুও। সাধারণ মানুষের বাহ্যিক ব্যবহার আর কথায় বিশ্বাসটা আছে বলে আমার বড্ড ভুল হয় মানুষ চিনতে। তবে আনুমানিক সাড়ে পাঁচ হাজার পথচলতি রমতা সাধু চিনতে ভুল হয়নি কখনও। যাইহোক, চিত্রকূটে মন্দাকিনীর এই রামঘাটে রামচন্দ্রের দর্শন পান তুলসীদাস, তাই ঘাটটি রামঘাট নামেই প্রসিদ্ধ। এ ঘটনার সময়কাল আনুমানিক ১৫৬৪ সাল।

সাধুবাবা হঠাৎ বললেন,

—বেটা আবার কবে আসবি, বা আর আসা হবে কি না রামজি জানে। চল বেটা, তুলসীদাসজির সাধনক্ষেত্র আর আশ্রমটা দেখে আসি বলে উঠে পড়লেন। আমিও ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

সুন্দর বাঁধানো রামঘাট ছুঁয়ে বয়ে চলেছে মন্দাকিনী। ঘাটের পাশে বেশ খানিকটা উঁচু জায়গা। পরপর সারি দিয়ে অনেকগুলি মন্দির। এরই মাঝে মহাত্মা তুলসীদাসজির প্রাচীন আশ্রম ও মন্দির। ঘাট থেকে অল্প কিছু সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম মন্দিরে। ভিতরে একটি গুহা। বয়স কম হল না গুহার। তুলসীদাসের আমল থেকে আজও আছে একই অবস্থায়। তখনকার দিনে এত লোক সমাগম ছিল না চিত্রকূটে। নির্জনে গুহাতে বসেই পরমানন্দে ভজন করতেন তুলসীদাস। আত্মহারা হতেন রামপ্রেমে।

ছোট্ট মন্দির তুলসীদাসের। কোনও আড়ম্বর নেই মন্দিরে, মন্দিরের গায়ে। আসলে তুলসীর মন আর মন্দিরে কোনও তফাৎ ছিল না যে! রাম-লক্ষ্মণ আর সীতার অষ্টধাতুর বিগ্রহ আছে মন্দিরে। গোস্বামী তুলসীরও সুন্দর একটি পাথরের মূর্তি রামচন্দ্রের বাঁ পাশে।

আশ্রম মন্দিরের কাছে আছে আর একটি মন্দির। আকারে বড় নয়, মাঝারি। উঠতে হয় সিঁড়ি ভেঙে। চারদিকে খোলা বারান্দা। গম্বুজযুক্ত মন্দিরের মাঝামাঝি জায়গায় গর্ভমন্দির। উঁচু বেদিতে রামসীতার মূর্তি। রামচন্দ্রের পর্ণকুটির নামে প্রসিদ্ধ মন্দিরটি। এর ডানপাশে আর একটি ছোট্ট মন্দির। একটি লক্ষ্মণের পর্ণকুটির নামেই পরিচিত। মন্দিরে পাথরের সুদর্শন বিগ্রহটি লক্ষ্মণের।

তুলসীদাসের সাধনগুহা ও আশ্রম দেখার পর আমরা দু-জনে এসে আবার বসলাম রামঘাটে মন্দাকিনীর তীরে। এবার বললাম,

—বাবা, সারাটা জীবন তো কাটালেন সাধন-ভজন আর গুরুর সান্নিধ্যে যোগ সাধনায়। চিত্রকূটে আসার পর থেকে আপনার সব ধ্যান জ্ঞান রাম ছাড়া আর কিছু নেই। আমার একটা আন্তরিক জিজ্ঞাসা আছে। দয়া করে তার উত্তর দেবেন।

একথা শুনে সাধুবাবার মুখখানা হঠাৎ কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অন্তর্যামী বুঝে গেছেন আমি কি জিজ্ঞাসা করতে চাইছি। কিছুতেই হ্যাঁ বা না বলতে চাইছেন না। আমি পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বললাম,

—বলুন না বাবা, এতে কি আপনার ক্ষতি কিছু আছে?

সাধুবাবা খালি বলছেন,

—ছাড় না বেটা, পা ছেড়ে দে, লোকে দেখলে কী বলবে? ছাড়, পা ছেড়ে দে।

এইভাবে কাটল প্রায় মিনিট পাঁচেক। পা ছাড়ছি না দেখে কথা দিলেন,

—কী জানতে চাস বল, উত্তর দেব।

এবার পা'দুটো ছেড়ে দিয়ে প্রণাম করলাম। মাথায় হাত দিয়ে বললেন,

—জয় হো বেটা, সদা আনন্দ মে রহো, আনন্দ মে রহো।

এখন সরাসরি প্রশ্ন,

—বাবা, রামপ্রেমিক তুলসীদাস আর শ্রীরামের পদধূলিপূত এই চিত্রকূটে পড়ে রয়েছেন বছরের পর বছর ধরে। এই পড়ে থাকার ফলস্বরূপ রামজির দর্শন লাভ কি হয়েছে? এই যেমন আপনার সামনাসামনি বসে কথা হচ্ছে, এইরকম। স্বপ্নেটপ্নে দর্শনলাভের কথা বলছি না আমি।

আমার একথা শোনার পর হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন সাধুবাবা। ঝরঝর করে সমানে বয়ে চলেছে অশ্রুধারা। মুখ থেকে কোনও কথা সরছে না। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটার পর সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, নৈমিষারণ্যে গুরুজির সঙ্গে বেশ কয়েক বছর থাকার পর একসময় তাঁর দেহান্ত হয়। তারপর বেনারসে বাবা বিশ্বনাথ আর মা অন্নপূর্ণার দর্শন সেরে 'পয়দল' এলাম চিত্রকূটে। এখানে অত্রিআশ্রমের পাশে একফালি জায়গায় জীবনটা আমার কেটে গেল। আমি তো সাধু। আমার তো

বিলাসের দরকার নেই। দিনটা রামজির কৃপাতে কেটে গেলেই হল।

থামলেন। মিনিট পাঁচেক চুপচাপ বসে থাকার পর বললেন,

—বেটা, একদিন বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। বিছানা ছেড়ে ওঠার শক্তি হারিয়ে ফেললাম। এইভাবে অভুক্ত অবস্থায় পড়ে রইলাম তিনদিন। কারও কাছে গিয়ে হাত পাতার শক্তিটুকুও আমার ছিল না। ছেঁড়া কম্বলের উপর পড়ে রইলাম মড়ার মতো। চতুর্থ দিন গভীর রাতে, আমি মূর্খ লোক। ঘড়িটড়ি নেই। তখন কটা বাজে জানি না। হঠাৎ ঘুমটা আমার ভেঙে গেল। প্রায় লোকালয় শূন্য আমার এখানটায় আলোয় আলোময় হয়ে গেল। দেখছি, রামজি আর সীতা মাইয়া রক্তমাংসের দেহে বসে আছেন আমার বাঁ-পাশে। হনুমানজি মাথার কাছে। সীতামাইয়া সন্তান স্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। কপালজুড়ে হাত বোলালেন রামজি। সে যে কী রূপ আর দিব্য আলো তা তোকে বলে বোঝাতে পারব না। দু-জনেরই বনবাসী পোশাক। হনুমানজির সারা দেহে সোনালি লোমে ঢাকা। আমার এইটা হয়েছিল খুব বেশি হলে এক মিনিট। দিব্য আলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। আমি সুস্থ ও সবল হয়ে উঠলাম। ভোরের আলো ফুটতেই মাথার কাছে দেখলাম প্রচুর সুমিষ্ট ফল।

কথা শেষ হতে না হতেই কেঁদে ফেললাম। আনন্দে বারবার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিতে থাকলাম। এই ঘটনা শোনার পর আমার কেমন যেন বাহ্যজ্ঞান লোপ পাওয়ার মতো হতে লাগল। সাধুবাবা সমানে মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। জীবন মন ধন্য হল আমার।

দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। আমরা আগের জায়গায় এসে বসেছি। সাধুবাবার মুখমণ্ডলটা যেন এক দিব্য আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে। সাধুবাবাকে বললাম,

—বাবা, এখানে তো পুরি-সব্জির দোকান আছে। কিছু খাবার কিনে আনি।

ইশারায় বললেন, মুখেও,

—না বেটা, এখন পেটে খিদে নেই। কিছু আনতে হবে না।

এবার সাধুবাবাকে আমার মনের আসল কথাটা বললাম,

—বাবা আমি একান্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে। আজ পর্যন্ত ভালো খাবার জুটল না কপালে। লোকে খায় আর আমি শুধু ভিখারিদের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। আপনি তো যোগী গুরুর শিষ্য। নিজের গুরুর কাছে থেকে হাতেনাতে যোগ শিক্ষা লাভ করেছেন। প্রায় নির্জন নৈমিষারণ্যে আপনার গুরুজি মহারাজ কী সুন্দরভাবে অতি সহজে নানান ধরনের সুখাদ্য নিয়ে আসতেন। বিশেষ কোনও যোগবিদ্যা ছাড়া এ কাজ করা একেবারেই অসম্ভব। আর এ বিদ্যা আপনাকে আপনার গুরুজি দিয়ে যাননি, একথায় আমার মোটেই বিশ্বাস নেই। আপনি কি পারেন না, এই বিদ্যাটুকু আমাকে শিখিয়ে দিতে? যখন একটু ভালোমন্দ খেতে ইচ্ছে করবে তখন এই বিদ্যা প্রয়োগ করে মনের খাওয়ার স্বাদটুকু মেটাতে পারি। জীবনের আঠাশটা বছর কেটে গেল। কিছুই করতে পারলাম না। না ভালো খাওয়া, না ভালো পরা, কিছুই হল না। ছোট্ট ঘরে জায়গার অভাবে রাতে ঘুমাই রাস্তার রকে। এইভাবেই জীবন কাটছে। একটু ভালো-মন্দ খাওয়া যদি আপনার জন্যে কপালে জোটে, সারাটা জীবন আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

এই পর্যন্ত কথাটা বলতে বলতে কেঁদে ফেললাম। সাধুবাবা কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন। মুখে কিছু বললেন না। চুপচাপ বসে রইলেন। আমার কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য এমনভাবে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন চোখের ক্যামেরায় দেখে নিলেন ভিতরটা।

আমি চুপচাপ বসে রইলাম উত্তরের অপেক্ষায়। ধীরে ধীরে সময়টা কেটে যাচ্ছে। বেলা আরও পড়ে এল। মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলাম। ধর্মশালায় ফিরতে হবে। সাধুবাবা কিছু বলছেন না। আমি এবার মনে মনে স্থির করে নিলাম, দরকার হলে রাতটা থেকে যাব সাধুবাবার সঙ্গে। করুণায় ভরা সাধুবাবার হৃদয়। এটা ভালো করে বুঝে গেছি। সুতরাং ছাড়া নেই। এ দিকে সন্ধ্যা প্রায় লেগে এল। সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, বাস চলা বন্ধ হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে। উঠে পড়। এরপর যেতে পারবি না।

আমি এ ব্যাপারে হ্যাঁ বা না কিছুই বললাম না। শুধু বললাম, আমি যে কথাগুলো বললাম, তার উত্তর দিলেন না তো? সাধুবাবা এবার গম্ভীর সুরে বললেন,

—না বেটা, এ বিদ্যা দেওয়া যাবে না। অনেক অসুবিধা আছে আমার।

আমি বললাম,

—বাবা, কোনও কথা শুনতে চাই না আপনার। এ বিদ্যাটা শেখাতে হবে আপনাকে। আপনার পা ছুঁয়ে কথা দিচ্ছি, জীবনে যতদিন বেঁচে থাকব, নিজের প্রয়োজনটুকু ছাড়া অন্য কোনও কারণে, কোনভাবেই এ বিদ্যার অপব্যবহার করব না আমি। যদি ভুল করে বা ইচ্ছা করে এই বিদ্যার অপব্যবহার করি তা হলে তৎক্ষণাৎ যেন এ বিদ্যা নিষ্ফল হয়ে যায়।

এ কথা শোনার পর সাধুবাবার মুখখানা দেখে মনে হল যেন কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন। তবে বাক সংযমী সাধুবাবা মুখে হ্যাঁ হুঁ কিছু করলেন না। বললেন,

—বেটা, আশ্রমে যাওয়ার বাস এখন আর পাবি না। আমার কাছে রাতটা কাটিয়ে কাল ধর্মশালায় ফিরে যাস।

কথাটুকু বলে উঠে দাঁড়ালেন। অন্ধকার হয়েছে বনভূমি নিস্তব্ধ। একটা মানুষকেও দেখা যাচ্ছে না। আবছা অন্ধকারে অনুসরণ করে ধীরে ধীরে ফিরে এলাম অত্রিআশ্রমের কাছে তবে পথটা কিন্তু কম নয়। দেখলাম, অত্রিআশ্রমের প্রায় গা ঘেঁষেই একেবারেই ছোট্ট একটা ঝুপড়ি। অন্ধকারটা বেশ খানিকটা গাঢ় হয়ে এসেছে। সাধুবাবা ঝুপড়িতে ঢুকতেই বললাম

—বাবা, আমি তো বিড়ি খাই। দেশলাই আছে আমার কাছে।

সাধুবাবা আমার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে লম্ফটা ধরালেন ফুঁ দিয়ে। অন্ধকারটা কেটে গেল। ঝুপড়িতে দেখলাম একটা কম্বল বিছানো। বালিশ আছে তবে সেটা ইটের। মাটির একটা জলপাত্র আছে। পাশের থালাটি অ্যালুমিনিয়ামের। সাধুবাবার ৯৬ বছরের পার্থিব জীবনের সহায় সম্বল ও সম্পত্তি এই-ই।

আমার হাতঘড়ি নেই। তাই রাতটা আন্দাজ করতে পারলাম না। বাবার পাতা কম্বলের উপরেই বসলাম বেশ জুত হয়ে। বললাম,

—বাবা, আমার কথাটা কি একটু বিচার বিবেচনা করেছেন?

সাধুবাবা মাথা নেড়ে; হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়ে মুখে বললেন,

—বেটা যোগের মাধ্যমে সবকিছুই সম্ভব। সংসারে থাকলেও তোর পক্ষেও এটা করা সম্ভব। তবে পাঁচটা শর্ত

• চিত্রকূটের উপবনে স্ফটিক শিলা

সাধুবাবা বললেন,

—এখন লোকজন নেই সুতরাং ভালোই হল। লোকজন থাকলে এসব কাজে বেশ দেরি হয়। এখন একবার পরীক্ষা করে দেখ।

সাধুবাবা যে নিয়ম ও পদ্ধতিতে এই বিদ্যা প্রয়োগ করতে বলেছিলেন, নিষ্ঠার সঙ্গে সেই নিয়ম ও ক্রিয়াদি পালন করলাম সাধুবাবার সামনে। দেখলাম মিনিট দশেকের মধ্যে এক ভদ্রলোক এলেন ধুতি পাঞ্জাবি পরা। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। দু'হাতে দুটো খাবারের বাক্স। আমাদের সামনে রেখে প্রণাম করলেন সাধুবাবাকে। কৌতূহলের বশে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় থাকেন? ভদ্রলোক জানালেন, তাঁরা থাকেন খাজুরাহের পথে পান্নায়। এসেছেন ২২ জন। সাধুভোজন করিয়ে তারপর আমরা খাবো। এখানে একটা মন্দিরে খবর পেলাম দু'জন সাধু আছে অত্রিআশ্রমের কাছে, তাই এলাম। কালকে চিত্রকূটের সবকিছু দর্শন করে বিকালে ফিরে যাব বাড়িতে।

কথাগুলো শুনে আমি আর সাধুবাবা খুশিতে হাসলাম। ভদ্রলোক চলে গেলেন। বাক্সটা খুলেই দেখলাম পাঁচটা গরম পুরি, শুকনো কষা আলুর দম। বড় বড় দু'খানা ঘি-এ ভাজা বোঁদের লাড্ডু আর লঙ্কার আচার— আনন্দে সাধুবাবার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। সাধুবাবা বললেন,

—ঠিক হ্যায় বেটা, ঠিক হ্যায়, আনন্দমে রহো।

আমাদের দু'জনের খাওয়া শেষ হতে সাধুবাবার পাতা কম্বলের উপরেই ঘুমিয়ে পড়লাম। সাধুবাবা 'জয় গুরু মহারাজ কি জয়' ধ্বনি দিতে দিতে ইটের বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন পরমানন্দে।

সকাল হল। খুব ভোরেই উঠলাম, সাধুবাবাও। দু-জনেই জপতপ সেরে নিলাম। কাছাকাছি একটা দোকান থেকে আটার পুরি আর সব্জি কিনে আনলাম। দু-জনেই খেলাম। এবার আমার যাওয়ার পালা। চিত্রকূটে আরও অনেক দেখার জায়গা আছে। সেগুলো দেখে ধর্মশালায় ফিরব। বাড়ির পথে যাত্রা করব আগামীকাল।

সাধুবাবার পায়ে মাথাটা রেখে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম। বৃদ্ধ সাধুবাবা বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সারা গা দিয়ে চন্দনের গন্ধ ভুরভুর করে বেরোচ্ছে। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললাম কৃতজ্ঞতায়। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সাধুবাবার কোটরাগত দু-চোখ ভরা জলে। যেই পদক্ষেপ করেছি তখনই উচ্চস্বরে বৃদ্ধ বললেন, 'জয় হো বেটা, তেরা জয় হো।' তিনবার একই কথা বললেন, আমি ততক্ষণে আরও কয়েক পা এগিয়েছি। পিছন ফিরে দেখলাম, তখনও সাধুবাবা ডানহাতটা তুলে আছেন আশীর্বাদী মুদ্রায়।

আছে। নিঃশর্তভাবে সেই শর্তপালন করতে পারলে তবেই আমি গুরুর কাছ থেকে অর্জিত বিদ্যা দিতে পারি। তবে শর্তগুলির কোনও একটা অমান্য করলে এই বিদ্যার কার্যকরী শক্তিটা নষ্ট হয়ে যাবে। এবার তুই ভেবে বল কী করবি। তবে একটা কথা আছে, প্রার্থিত খাবার কোথা থেকে এল, কে দিল— এসব প্রশ্ন করবি না। উত্তর দেব না। আর ও সব তোর জানার প্রয়োজনও নেই। অনেক সময় খাবারটা ক্রিয়া করার কিছুক্ষণের মধ্যে এসে যাবে। সেটা তোর পরিচিত কিংবা অপরিচিত কারও মাধ্যমে। তোর পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে খানিকটা দেরি হতে পারে তবে খাবার তোর কাছে আসবেই।

সাধুবাবা সঙ্গে সঙ্গেই বললেন,

—তোর দীক্ষা হয়েছে?

ঘাড় নেড়েও মুখে বললাম,

—হ্যাঁ বাবা, এখন আমার বয়স আঠাশ। দীক্ষা হয়েছে চব্বিশে। খাই আর না খাই, গুরু প্রদত্ত নিয়মগুলি পালন করি যথাযথভাবে।

কথাটা শুনে সাধুবাবা দেখলাম বেশ খুশিই হলেন, এবার সাধুবাবা তাঁর শর্তগুলি বলে বুঝিয়ে দিলেন। আমি বেশ ভালোভাবে বুঝে নিলাম। এবার সাধুবাবা মন্দাকিনীর জল নিজের পরে আমার মাথায় একটু ছিটিয়ে দিলেন। বললেন, পদ্মাসন করে বসতে। আমি সেইমতো বসলাম। ছোট্ট একটা বীজমন্ত্র বলে সেটার উচ্চারণও মুখস্থ করিয়ে দিলেন। পরে যোগের একটা প্রক্রিয়া শিখিয়ে দিলেন। আমি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে দক্ষিণা দিলাম এগারো টাকা। সাধুবাবা বললেন, অত দিতে হবে না। একটা টাকা দিলেই হবে।

আমি এ কথায় মোটেই আমল না দিয়ে ওই টাকাটাই দিলাম। আর প্রণাম করলাম পায়ে হাত দিয়ে। দু-জনেই চুপচাপ বসে আছি। বেশ খিদেও পেয়েছে। সাধুবাবাই বললেন,

—বেটা, সংসারে অর্থহীন মানুষের সমস্ত কর্মই বিফল হয়ে যায়। এমন একটা দিন আসবে যখন তোর এই কষ্টের দিন থাকবে না। তোর তো খিদে পেয়েছে। কিছু খাবি?

আমি মাথাটা নেড়ে বললাম,

—হ্যাঁ বাবা খাব। বেশ খিদে পেয়েছে। তবে আপনার কাছে তো তিনটে পুরি সব্জি আছে। দুটো আপনি খান, একটা আমি খাই।

ছবি: লেখক

সমাপ্ত

• গল্প

বাবুইবাসা

অমর মিত্র

লেখক নিখিল দত্তর পরিবারের কারও খোঁজ জানেন স্যার? আমি ত্রিদিব বলছি।

ত্রিদিবের মুখে নিখিল দত্তর কথা শুনে একটু অবাক হল সমীরণ। ত্রিদিব থিয়েটার লাভারস গ্রুপের ছোটখাট এক অভিনেতা। থিয়েটার দলের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সাহিত্যপাঠ নিয়ে ওর আগ্রহের কথা সমীরণ শোনেনি কোনওদিন। সমীরণের একটি গল্প নাট্যরূপ দিয়ে ওদের থিয়েটারের দল অভিনয় করেছিল, তখন থেকে যোগাযোগ। সমীরণ গল্প ও উপন্যাস লেখে। তার বেশ নাম হয়েছে। প্রকাশক তার কাছে এসে বসে থাকে বই করবে বলে। সেমিনারে ডাক পায় অনেক। ইউনিভার্সিটির সিলেবাসে তার গল্প ঢুকে গেছে। নিখিল দত্ত এককালের নামী লেখক। অসাধারণ প্রেমের গল্প লিখতেন। মানুষে মানুষে সম্পর্ক নিয়ে লিখতেন। তাঁর লেখার পটভূমি ছিল পশ্চিম। এই ঝাঁঝা, শিমুলতলা, গালুডি, রাঁচি, যেখানে দুর্গাপুজোর সময়ই শীত নেমে আসে। নিখিল দত্তর ছেলেবেলা কেটেছে ওইদিকে। বাবা রেলে চাকরি করতেন। নিখিল তাঁর ছেলেবেলার কথা বলতেন তন্ময় হয়ে। সেই পাহাড়ি জনপদ, আদিবাসী গ্রাম, তাদের কুটিরে রঙের প্রলেপ। ওদিকে মিশনারিদের খুব প্রভাব ছিল। তখন ব্রিটিশ আমল। বড়দিনের কথা বলতেন নিখিল। যিশুর কীর্তন। সব মনে পড়ে গেল অনেক বছর বাদে। সমীরণ তাঁর সঙ্গে তরুণ বয়সে অনেক মিশেছে। সমীরণের মনে পড়ে ধুতি এবং পাঞ্জাবি পরিহিত নিখিলদাকে। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। মাথার চুলে ব্যাকব্রাশ। তা পাকেনি। হ্যাঁ, নিখিল দত্তর চুল পাকেনি। তাঁর মায়ের ৮৫ বছর বয়সেও চুল পাকেনি যে তা দেখেছিল সমীরণ। শীর্ণকায় ছিলেন তিনি। একেবারে শাল গাছের মতো সিধে, টানটান। থিয়েটার লাভার দলের ত্রিদিব তার শরণাপন্ন হয়েছে। লেখক বলতে তাকেই চেনে ত্রিদিব।

সমীরণ জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ নিখিলদার খোঁজ করছ যে?

তাঁর একটি উপন্যাস, 'বাবুইবাসা' আমরা নাট্যরূপ দিয়েছি, অনুমতি দরকার, আমাদের নেক্সট প্রোডাকশন এইটি।

সমীরণ বলল, তিনি তো বেঁচে নেই।

ত্রিদিব বলল, তা জানি, কিন্তু তাঁর পরিবারের অনুমতি ব্যতীত নাটকের শো নামাতে পারব না, উনি কোথায় থাকতেন, মানে ওঁর বাড়ি ছিল?

সমীরণ বলল, পাইকপাড়ার নর্দার্ন এভিনিউ, ওখানে বেঙ্গল সুইটস বলে একটি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার আছে, তার ঠিক অপজিটে, জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে।

যাব কী করে?

সমীরণ বলল, উবার ধরে যাও, পাইকপাড়া নর্দার্ন এভিনিউ লিখবে বুক করার সময়, বেঙ্গল সুইটস জিজ্ঞেস করবে, পেয়ে যাবে, বাগান ঘেরা বাড়ি করেছিলেন নিখিলদা, কত আড্ডা দিয়েছি ব্যালকনিতে বসে, শীতের সময় বাগানে রোদে পিঠ দিয়ে।

আপনি একবার যাবেন স্যার?

আমি! আমি কেন? সমীরণ অবাক হল।

হ্যাঁ, আসলে লেখকদের বাড়ি যেতে আমার ভয় করে, একবার দীপিতা দেবীর বাড়ি গিয়েছিলাম ওঁকে দিয়ে আমাদের নাট্যোৎসব উদ্বোধন করাব বলে, উনি আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন ওঁর কোন কোন উপন্যাস আমি পড়েছি, তারপর তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ নিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, স্যার আপনি চলুন।

সমীরণ বলল, সে ভয় তোমার নেই, উনি ১৫ বছর চলে গেছেন।

তাহলেও, লেখকের স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, আমার চেয়ে তাঁরা কত বেশি জানেন, আমি রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি গিয়েছিলাম একবার, ওঁর একটা গল্প পছন্দ হয়েছিল আমাদের, তাঁর মেয়ে কী জেরাই না করতে লাগলেন, বললেন স্ক্রিপ্ট ওঁর কাছে নিয়ে যেতে, তিনি পড়ে অনুমতি দেবেন, আমাকে জিজ্ঞেস করলেন গল্পটা আমি কী বুঝেছি, আমি বলতে উনি মন্তব্য করলেন, আমি কিছুই বুঝিনি, আমার মাথায় ওই গল্প ঢোকেনি, কী অপমান বলুন, তিনি বলেছিলেন, স্ক্রিপ্ট না দেখে অনুমতি দেওয়ার কথাই ওঠে না।

সমীরণ বলল, রাজমোহনের খুব অহংকার ছিল, মনে করতেন, তিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, উনি গ্রাহাম গ্রিন, সলবেলো, আর তাঁর সমকালের লেখকরা কিছু নন তাঁর কাছে, মনে করতেন তিনি নোবেল পাওয়ার যোগ্য লেখক, ওঁর মেয়েরাও তাই মনে করে।

ত্রিদিব বলল, আমার ভয় করে লেখকের বাড়িতে যেতে, আমি তত পড়িনি, অবশ্য সব জায়গায় তা হয় না, আপনার কাছে অনুমতি নিতে আমিই গিয়েছিলাম।

আমি তোমাকে পড়া জিজ্ঞেস করেছিলাম?

ত্রিদিব বলল, না স্যার, বরং আপনি আমাকে একটা বই উপহার দিয়েছিলেন, তার ভিতরে আমার ও আমার বউ মণিকার নাম লিখে সই করে দিয়েছিলেন, আমরা যত্ন করে রেখে দিয়েছি, কতজনকে দেখিয়েছি, বলি আপনি আমাকে কত ভালোবাসেন!

আমার লেখা পড়ে লোকে? লেখক সমীরণ বসু জিজ্ঞেস করল।

কী যে বলেন স্যার, আপনার কত পাঠক, আমাদের চন্দনা ম্যাম, বিখ্যাত অভিনেত্রী চন্দনা সরকার আপনার লেখায় মুগ্ধ, আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন কতবার, আপনার বাড়ি একবার যাবেন, জিজ্ঞেস করবেন আপনার লেখা তাঁর জীবনের সঙ্গে এত মিলে যায় কী করে?

সমীরণের শুনতে ভালো লাগল। সমীরণ এখন সফলতার স্বাদ পেয়েছে। লেখক হিসেবে তার চাহিদা হয়েছে। পুজো সংখ্যায় তার লেখা ছাপার জন্য পত্রিকা সম্পাদক তার বাড়িতে এসে বসে থাকে। সমীরণের প্রকাশিত লেখা আবার ছাপতে রাজি তারা। অথচ সেই অল্প বয়সে সে ভাবেইনি, এই জায়গায় কোনওদিন পৌঁছতে পারবে। এর জন্য সমীরণকে অনেক হিসেব করে এগতে হয়েছে। সম্পাদক লেখকের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে হয়েছে, সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়েছে। মনে পড়ল এসব কথা। নিখিল এখন বেঁচে নেই। খুবই মান্য লেখক ছিলেন নিখিল। ক্ষমতাবান ছিলেন। তিনি এক বড় পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর প্রধান ছিলেন। গল্প নির্বাচনের দায়িত্বে ছিলেন। সমীরণ বসুর মনে পড়ল তাঁর লেখক জীবনের আরম্ভে, কতবার গল্প জমা দিয়েছেন নিখিলের হাতে। পত্রিকা দপ্তরে নিখিল ছিলেন রাজা। তখন সমীরণ কুড়ি একুশ। শুনেছিল নিখিল দত্তের স্নেহভাজন হলে সে দ্রুত এগতে পারবে। নিখিল তরুণ লেখকদের খুব পছন্দ করেন। নিখিল লেখক হিসেবেও বড়। তরুণ লেখকরা তাঁকে ঘিরে থাকে। সেই তরুণরা তিরিশ বা তার উপরে। গল্পের আন্দোলন করেছিলেন নিখিল তাদের নিয়ে। গল্পের কথন ভঙ্গি বা ফর্ম বদলে দিতে ডাক দিয়েছিলেন। কত কথা উড়ে বেড়াত নিখিল দত্তকে নিয়ে। প্যান্ট শার্ট, শীতে শ্যুট, দামি সোয়েটার। ধুতি পাঞ্জাবি পরলে তা-ই বা কত দামি। নিখিল খুব শৌখিন মানুষ ছিলেন। নিখিল খুব ভালো গান গাইতেন। রবীন্দ্রনাথের গান। যাই হোক সমীরণের প্রথম অভিজ্ঞতা ভালো ছিল না। একের পর এক গল্প জমা দিয়েছে, ছাপা হয়নি। নিখিল বলতেন কপি নিজের কাছে রেখে জমা দিতে। তখন ফোটোকপিয়ার মেশিন আসেনি। পরে তা জেরক্স কোম্পানি নিয়ে আসে। তখন কপি রেখে জমা দেওয়া মানে লেখার সময়ে কার্বন কপি করতে হতো। এখন তো হার্ড কপি, প্রিন্টেড কপি দিতেই হয় না। সফট কপি মেল করলেই হয়। লেখা হারায় না মেল করলে। সমীরণ এখন ফাউন্টেন পেনে লেখে না। ল্যাপটপ তার সঙ্গী। কলকাতার বাইরে গেলেও ল্যাপটপ সঙ্গে থাকে। হ্যাঁ, অচেনা লেখকের লেখা হারিয়ে যেত নিখিল দত্তের সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে। সমীরণের অন্তত তিনটি লেখা হারিয়েছে। শোনা যায় নিখিল দত্ত কয়েকটি পংক্তি কিংবা একটি পরিচ্ছেদ পড়েই গল্প জঞ্জালের বাক্সে ফেলে দিতেন। হ্যাঁ, আবার তিনিই তো সমীরণের চতুর্থ লেখাটি বাম হাতে তুলে নিয়ে জঞ্জালের বাক্সে না ফেলে চিঠি পাঠিয়েছিলেন দেখা করার জন্য। সেই চিঠি পেয়ে তার কী উত্তেজনা! নিজহাতে পোস্ট কার্ড লিখেছিলেন নিখিল দত্ত। সমীরণ দুরু দুরু বুকে দেখা করলে নিখিল তাকে বসতে বলে সমীরণের গল্পের পাণ্ডুলিপি খুলে দিয়েছিলেন। কয়েকটি জায়গার উল্লেখ করে বলেছিলেন সংস্কার করতে। আবার লিখে আনতে। গল্পটি তাহলে আরও ভালো হবে। সমীরণ তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। সেই গল্প ছাপা হলে তার সুনাম হয়েছিল। সে নিখিল দত্ত মশায়ের বৃত্তের ভিতরে প্রবেশ করতে পেরেছিল। তখন নিখিল দত্ত মশায়ের বৃত্তে প্রবেশ করা মানে লেখক হওয়ার পথে এক ধাপ এগোন। কিন্তু সমীরণ বুঝেছিল, তাকে আরও অনেকদূর যেতে হবে। উপন্যাস লিখতে হবে, প্রকাশক পেতে হবে সেই উপন্যাসের। সে ধীরে ধীরে নিখিল দত্তর ঘনিষ্ঠ বৃত্ত থেকে সরে এসেছিল, কিন্তু সম্পর্ক ত্যাগ করেনি।

ত্রিদিব জিজ্ঞেস করে, স্যার যাবেন কি নিখিল দত্তর বাড়ি?

কী মনে হতে সমীরণ বলল, যাব, সেই যে চলে গেলেন নিখিলদা, আর যাওয়া হয়নি, শান্তা বউদির সঙ্গে একবার

দেখা হয়েছিল আকাডেমি মঞ্চে তাঁর জন্মদিন পালনের এক অনুষ্ঠানে। মৃত্যুর পরের বছরে মনে হয়। তারপর আর জানি না।

জন্মদিনের অনুষ্ঠান হয়তো হয়েছে, সে আমন্ত্রিত হয়নি। কিন্তু হলে তার কি কোনও রিপোর্ট বেরত না? জন্মদিন পালিত হলে সে কি খবর পেত না? জন্মদিন পালন করবে কারা? পরিবার? নিখিলদার পুত্র অর্ডিনারি কমার্স গ্রাজুয়েট। কন্যা সাহিত্যের ছাত্রী ছিল। নন্দিনী। ছিপছিপে। শ্যামলা মেয়ে। মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল, কালো হরিণ চোখ। সাহিত্যের পাঠ ছিল খুব ভালো। ভারতীয় এবং বিশ্ব সাহিত্য। তার মুখেই প্রথম হান্ড্রেড ইয়ারস অফ সলিচিউড ও গ্যাব্রিয়েল গারসিয়া মার্কেজের কথা শুনেছিল সমীরণ। সম্ভবত ১৯৮৫ নাগাদ। লোকমুখে প্রচলিত ছিল, নিখিল দত্ত তাঁর দপ্তরে জমা পড়া গল্প প্রাথমিক ভাবে নন্দিনীকে দিয়ে দেখিয়ে নিতেন। নন্দিনী অধ্যাপনা করত। আচমকা হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মারা যায়। খুব বেদনাদায়ক ছিল সেই মৃত্যু। নিউ দিল্লি স্টেশনে ফ্লাই ওভারে উঠতে উঠতে আচমকা বুক চেপে বসে পড়েছিল সে। দম নিতে নিতে ঢলে পড়েছিল নিখিলদার সামনেই। সেই মৃত্যু কাটিয়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছিল তাঁর। মৃত্যুচেতনা নিয়ে পরপর কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন তিনি। একটি গল্পে ঈঙ্গমার বার্গম্যানের সেভেন্থ সিল ছবির ছায়া পড়েছিল। সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে দাবা খেলা নয়, মৃত্যুর সঙ্গে সাঁতার কাটতে কাটতে নিজের কন্যার মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে চাইছে প্রধান চরিত্রটি। মৃত্যুকে আটকে দিয়েছে লোকটি। সেই গল্প তাঁকে শেষ জীবনে খুব খ্যাতি দিয়েছিল। আবার মনে করিয়েছিল সেভেন্থ সিল ছবির কথা। তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। নিখিল দত্ত তাকে বলেছিলেন, 'আমার সামনে মেয়েটা চলে গেল, আমার প্রথম সন্তান, আমি যেন মৃত্যুকে দেখতে পাচ্ছিলাম সমীরণ, আমার কিছুই করার ছিল না, কী নিষ্ঠুর মুখ তার, নিয়ে গেল, নিয়ে গেল...।'

নিখিল দত্তর কথা কতদিন বাদে মনে করছে সমীরণ বসু। নিখিল দত্তর বই সংগ্রহ ছিল ঈর্ষণীয়। দোতলা বাড়ির একতলার পনেরোশো বর্গফুটে একটি বসার ঘর, বাকি সবই বইয়ে ভর্তি। দেওয়ালজুড়ে তাক। বইয়ের পাশে বই। সাজিয়ে দিয়েছিল তাঁর অনুরাগী এক গ্রন্থাগারিক। ক্লাসিকের সংগ্রহ, দেশি বিদেশি লেখকদের অনুবাদ, ইংরেজি ভাষার বই কত! নিখিল তার শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। কত বই তাকে পড়তে বলতেন। শিক্ষকের কাজ করেছিলেন নিখিল। তখন তার আরম্ভের দিন। কোন বই পড়তে হবে, তা বলে, তাক থেকে বের করে দিতেন নিখিল। লেখা এবং পড়া, দুই নিয়েই থাকতে হয় লেখককে। সমীরণের মনে হল সে নিখিল দত্তর বাড়ি যাবে। সেই লাইব্রেরি, ঘরে ঘরে বই, গল্প উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদ, দেশি বিদেশি...বই আর বই, ভালো বই ভালো বই। তার নিজের বইও ছিল তার ভিতরে।

ত্রিদিব বলল, দুদিন বাদে রবিবার, বিকেলে সে গাড়ি নিয়ে আসবে, নিয়ে যাবে সমীরণকে।

এল ত্রিদিব। সমীরণ গড়িয়ায় থাকে। গড়িয়া থেকে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস ধরে অনেকটা পথ পাইকপাড়া। দক্ষিণ থেকে উত্তর। মধ্যে বিধান নগর রোড স্টেশন, একটি খালের পাশের রাস্তা, বেলগাছিয়া রেলওয়ে ব্রিজ, বাম দিকে জলাধার, টালা পার্ক... সব বদলে গেছে। বাইপাসে বড়বড় বিজ্ঞাপনের হোডিং। হাস্যোজ্জ্বল রঙিন মুখেরা শহরের

চেহারা বদলে দিয়েছে। দূরে, বহুদূরে উপনগরের বহুতল। রাস্তার ধারে বড় বড় অফিস বিল্ডিং, শপিং মল। ধাপার পাহাড়। পাহাড় নয়, জঞ্জাল। কলকাতার সব জঞ্জাল ধাপায় গিয়ে পাহাড় হয়ে গেছে। কতদিন সমীরণ এদিকে আসেনি। এখন বেরনো হয় কম। লেখা পাঠায় মেল করে। কিংবা পত্রিকা অফিসের লোক এসে নিয়ে যায়। সমীরণের অচেনাই লাগছে এই মহাসড়ক। এখন সভা-সমিতি ব্যতীত যায় কোথায়? বেড়াতে। মধুপুর যশিডি, হাজারিবাগ, কিংবা গোপালপুর চিল্কা হ্রদ, অজন্তা, ইলোরা। বিদেশেও। আমেরিকা গিয়েছিল গত বছর। মার্চের শেষেও ভার্জিনিয়ার পথের দুপাশ তুষারাচ্ছন্ন দেখেছিল সে। সব গাছের পাতা ঝরে গেছে। কত নির্জন সেই পথ! আমরা অমন নির্জনতা পাব না। একশো ত্রিশ কোটি মানুষ। পথে ঘাটে, বনে জঙ্গলেও মানুষ গিজগিজ করছে। নিখিল দত্তর বাড়িটি ছিল সুন্দর। সামনে ফুলের বাগান ছিল। পেছনে কেরল দেশীয় নারকেল গাছ, পেয়ারা, জামরুল, আমের ছায়া। কতদিন এসে দেখেছে নিখিল দত্ত সামনের বাগানে ডেক চেয়ারে আধশোয়া হয়ে বই পড়ছেন। একদিন, সেই তার লেখালেখির আরম্ভের দিনে দেখেছিল তারই সদ্য প্রকাশিত গল্প সংকলন, 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ' পড়তে। সমীরণ বইটির প্রচ্ছদ দেখে একটু তফাতে দাঁড়িয়েও চিনতে পেরেছিল। আহা অমন সুন্দর মুহূর্ত সেইটুকু জীবনে যেন আর কখনও আসেনি। সমীরণ দাঁড়িয়েই ছিল। একটি গল্প পড়া শেষ করে মুখ তুলেছিলেন তিনি। পায়জামা, পাঞ্জাবি, সাদা শাল গায়ে নিখিল দত্তকে বড় আপনার মনে হয়েছিল সেদিন। নবীন লেখকের বই কে পড়ে! সেই বই এখন তার কাছে একটি কপিও নেই। প্রথম বই। মনে পড়ছিল সমীরণের। সেই নর্দার্ন এভিনিউ, বেঙ্গল সুইটস, টালার বিখ্যাত জলাধার, সব স্পষ্ট মনে নেই। বেঙ্গল সুইটসের ডানদিকের রাস্তা। না এসে ভুলে গেছে পথ। সব অন্যরকম লাগছে। জিজ্ঞেস করে করে সেই বেঙ্গল সুইটসের সামনে পৌঁছল তারা। মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মুখোমুখি রাস্তার শেষে সেই দোতলা বাড়ি। কই? গাড়ি থেকে নেমে সমীরণ বেঙ্গল সুইটসে গেল। মিষ্টি নেবে বউদির জন্য। কত বয়স হতে পারে এখন? পঁচাত্তর। নিখিলদার চেয়ে বছর বারোর ছোট ছিলেন। বেঁচে থাকলে নিখিলদা এখন সাতাশি-অষ্টআশি। কত দিন চলে গেছে। মস্ত একটি বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। বাড়ির নাম ছিল বাবুইবাসা। বাবুই ছিল তাঁর কনিষ্ঠ সন্তানের নাম। পুত্র। বাড়িটি কি ওইটি, না তার ভুল হচ্ছে? মিষ্টান্ন ভাণ্ডারকে নিখিল দত্তর বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করতে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন সমীরণ তাঁর কে হয়? কেউ হন না, লেখকের বাড়ি এসেছে সে তাঁর পরিবারের খোঁজ নিতে। সমীরণ তার নাম বলতেই, দোকানের কর্মচারী জিজ্ঞেস করল, আপনিও স্যার লেখক, আমি টেলিভিশনে আপনাকে দেখেছি মনে হয়।

তারপর সে ঈষৎ বিস্মিত হয়ে বলল, ওঁরা তো এখানে নেই স্যার, ওই দেখুন আটতলা বিল্ডিং, সেই জমির উপর, প্রমোটিং হয়েছে।

নেই! প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে সমীরণ, বাবুইবাসা ভেঙে ফেলেছে?

ইয়েস স্যার, তিন কোটি টাকার ডিল হয়েছিল, রাইটার স্যারের মৃত্যুর বছর পাঁচ বাদে, তারপর সবাই চলে যান।

ত্রিদিব জিজ্ঞেস করল, কোথায় গেছে, ঠিকানা?

তা জানি না স্যার, কত বাড়ি ভাঙা পড়ছে, বাড়ি ছেড়ে সব চলে যাচ্ছে লরিতে জিনিসপত্র নিয়ে, আমার বাড়ি এই পাইকপাড়াতেই, এখানে পুরানো কোনও বাড়িই নেই প্রায়, ঝড় উঠেছে স্যার, ফ্ল্যাটবাড়ির ঝড়।

আর কোনও কথা হয় না। সমীরণ একবার ভাবে যায় বহুতলটির সামনে। সেই বাড়ি, বাগান, বাবুইবাসার লাইব্রেরি, মন খারাপ হয়ে গেল। না এলেই হতো।

ত্রিদিব জিজ্ঞেস করল, কী করব স্যার?

সমীরণ ফিরতে ফিরতে কোনও কথারই জবাব দিল না। বাড়ি পৌঁছতে সেই অন্ধকার আর আলোয় ঝলমল ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস পার হতে কত সময় যে লাগল। জ্যাম। মানুষে মানুষে ছয়লাপ। কত মানুষ। এদের ভিতরে নিখিল দত্তর পরিবার, শান্তা বউদি আর বাবুই মিশে গেছে। মিশে কি গেছে? তিন কোটি টাকার চুক্তিতে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে সব নিয়ে। নিয়ে গেছে সেই সব বই, সেই সব পাঁচমুড়ার ঘোড়া, হাতি। শান্তা বউদি খুব পড়তেন। বাবুই অবশ্য সামনে তেমন আসত না। কথা কম বলত। বাবুইয়ের বিয়ের সময় এক জোড়া পাঁচমুড়ার ঘোড়া উপহার দিয়েছিল সমীরণ। কত বড় ছিল সেই আয়োজন। বাড়ির সামনের চওড়া রাস্তা জুড়ে প্যান্ডেল হয়েছিল। রাস্তাটি গাড়ি চলাচলের নয়, এবং ওই বাড়ির সামনে গিয়েই থেমে গেছে বলেই সম্ভব হয়েছিল। গড়িয়ায় পৌঁছে সমীরণ বলল, কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে অজন্তা প্রকাশনীতে খোঁজ করো, ওঁদের কাছেই তো নিখিল দত্তর সব বই।

দিন কয় বাদে আবার ত্রিদিবের ফোন, স্যার খোঁজ পেয়েছি, নিউ টাউনে কোঅপারেটিভ ফ্ল্যাট পেয়েছে ছেলে, সেখানে থাকে, আপনি যাবেন তো স্যার, লেখকের বাড়ি একা যেতে কেমন লাগে!

নিউ টাউন সল্টলেক সিটি পেরিয়ে। নতুন নগর পত্তন হয়েছে। সরকার সস্তায় জমি দিয়েছে বসতবাটির নানা সমবায় সমিতিকে। সেখানে সব বহুতল। খাস কলকাতা, গড়িয়া, পাইকপাড়া যেমন জনাকীর্ণ, এই নতুন টাউনশিপ তা নয়। পরিকল্পিত নগর। ভারী সুন্দর এই পরিকল্পনা। সেই যে হাউজিং কোঅপারেটিভ, তার বিস্তার অনেক। খুঁজতে হল এফ-ব্লক। এখন বিকেল। রবিবার। ত্রিদিব ফোন করে আজই সময় নিয়েছে। ফোন নং পেয়েছিল প্রকাশকের কাছ থেকে। নিঝুম বিকেলে তারা লিফট বাহিত হয়ে সেভেন্থ ফ্লোরে উঠল। ফ্ল্যাটের দরজার মাথায় লেখা রয়েছে বাবুইবাসা। বুক ধক করে উঠল। বাবুইবাসার বাগানে বসে নিখিল দত্ত তার প্রথম গল্পের বই, 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ' পড়ছেন, ভাবতেই এখন গায়ে কাঁটা দেয়। ডোর বেলে আঙুল ছোঁয়ায় ত্রিদিব। সমীরণের মনে হল, পায়জামা পাঞ্জাবি পরিহিত নিখিল দত্ত এসে দরজা খুলবেন। আরে সমীরণ, তুমি! কতকাল তোমাকে দেখিনি সমীরণ, তোমার এখন কত নাম, আমাকে কি ক্রমশ সকলে ভুলে যাচ্ছে, আমি কি কিছুই লিখিনি সমীরণ!

মৃত্যুর পর নিখিল যেন এখানে এসে উঠেছেন। সমীরণ তার প্রথম বই 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ'-এর সেই কপিটি চেয়ে নেবে বাবুই-এর কাছ থেকে। নিজের কাছে রেখে দেবে কপি। প্রথম বই প্রথম সন্তানের মতো। নিখিল দত্ত প্রথম সন্তান হারিয়ে এক বছর প্রায় কিছুই লিখতে পারেননি। দরজা খুলল যে সে তো সত্যিই নিখিল দত্ত। বাবুই পরিণত বয়সে একেবারে বাবার মতো হয়ে গেছে। প্যান্ট হাওয়াই শার্ট, চোখে দামি ফ্রেমের চশমা। বাবুই আহ্বান করল তাদের। সমীরণ বলল, আমি পাইকপাড়ার বাড়িতে খুব যেতাম, আমার নাম সমীরণ বসু, চেনা যাচ্ছে?

বাবুই হাসে, চিনেছি, বসুন, আপনিও কি নাটকের দলে আছেন, অ্যাক্টর?

সমীরণ অবাক। তার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। বাবুই তার নামই জানে না। সমীরণ কিছু বলার আগে ত্রিদিব তার পরিচয় দিতে বাবুই বলল, অনেকদিনের ব্যাপার, ভুল হয়ে গেছে, স্যরি।

শান্তা বউদি?

মা চলে গেছেন বাবার চার বছর পর, তারপরই আমরা চলে আসি, মা ওই বাড়ি ছেড়ে আসতে চাইছিলেন না, চা না কফি?

ত্রিদিব তখন তার সাইড ব্যাগ থেকে টাইপ করা অনুমতিপত্র বের করল, আর দশ হাজার টাকার একটি চেক। বাবুইয়ের স্ত্রী এসে দাঁড়িয়েছে। বাবুই আলাপ করিয়ে দিল। তাদের একটি সন্তান, দার্জিলিং বোর্ডিং ইস্কুলে পড়ে। তারা বছরে একবার যায়, সেও আসে সামারে, ক্রিসমাসের ছুটিতে। কী করে বাবুই? বাবুই বলল, ঘরে বসে ইনকাম ট্যাক্স, জি এস টি, অ্যাকাউন্টসের কাজ করে সে। বাবুইয়ের স্ত্রী গোপা একটি কনভেন্ট ইস্কুলে পড়ায়। অনুমতি নেওয়া হয়ে গেল। কফি মুখে ছুঁইয়ে সমীরণ বলল, আপনার বিয়ের সময় আমি বড় বড় দুটি পাঁচমুড়ার ঘোড়া এনে দিয়েছিলাম, আছে?

বাবুই হাসে, বলে, শিফটিঙের সময় সব আনা যায়নি।

আমি এসেছিলাম আপনাদের সেই বিখ্যাত লাইব্রেরিতে রাখা আমার প্রথম বইটি যদি পাই, আমার কাছে নেই, ... বই কোথায় আছে, নিখিলদার সেই সংগ্রহ?

বাবুই বলল, আনা যায়নি, আমরা ফার্নিচারস নিয়ে এসেছিলাম শুধু, তাও সব না, বাকি সব রেখে এসেছিলাম, প্রমোটার যা করার করেছে।

বই!

হ্যাঁ। বাবুইয়ের স্ত্রী বলল, আমাদের এগারশো স্কোয়ার ফিট ফ্ল্যাটে ওসব এনে রাখব কোথায়...।

সমীরণ আর বসেনি। প্রমোটারের হাতে জ্ঞানভাণ্ডার সঁপে দিয়ে বাবুই তার বাসা বদল করেছিল। তার প্রথম বই, হারানো বইও ছিল তার ভিতরে। সমীরণ আর ত্রিদিব ফিরছিল মহাসড়ক দিয়ে। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস। নিজ মনে বিড়বিড় করছে সমীরণ, 'হেরে গেলেন নিখিলদা, হেরে গেলেন। মৃত্যুর সঙ্গে সাঁতরে শেষ পর্যন্ত দম ফুরিয়ে ফেললে গো নিখিলদা!'

বাইপাসের ডান দিকে বহুদূর অন্ধকারে ধাপার মাঠ। কলকাতা শহরের সব জঞ্জাল সেখানে জমে জমে পাহাড়। অন্ধকারে সেই পাহাড়ে আগুন জ্বলছে। আগুনে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেওয়া হয় বাতিল সামগ্রী। বই। পাঁচমুড়ার ঘোড়া। প্রমোটার তিন লরি বই এনে ধাপার মাঠে ফেলে আগুন জ্বালিয়ে ফিরে গিয়েছিল একদিন। ৪৫১ ডিগ্রি ফারেনহিট তাপমাত্রায় বই পুড়ছিল। রে ব্র্যাডবেরির বই নিখিল দত্তই তাকে পড়িয়েছিলেন প্রথম। তার প্রথম বই 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ' পুড়ছে। রে ব্র্যাডবেরি পুড়ছে। বইগুলি নষ্ট করতেই যেন বাড়ি ভেঙে এমন বহুতল নির্মাণ যার কোনও তলেই কোনও বই নেই। সেই আগুন জ্বলছে ওই দূরে জঞ্জালের পাহাড়ে। সমীরণের মনে হয়, তার বই পুড়ছে। সমীরণ নিজের প্রথম বইটির নাম উচ্চারণ করতে করতে প্রজ্জ্বলিত পাহাড় পার হয়ে যেতে থাকে। যেতেই থাকে। পাহাড়ও বইয়ের আগুন নিয়ে চলতে থাকে তার সঙ্গে। ♠♠

অলংকরণ: প্রণব হাজরা

• গল্প

রণকৌশল

সমরেশ মজুমদার

সপ্তাহে ছয়-ছয়টা হাট ঘোরার পর ছুটির দিন সকাল দশটার আগে চোখ খুলতে পারে না কানাই রায়। ঘুম ভাঙার পর বড়জোর দু'ঘণ্টা চা খেতে খেতে একটু বিশ্রাম। কিন্তু বিশ্রাম মাথায় ওঠে যখন কমলা এসে সামনে দাঁড়ায়। গত ছয়দিনের যাবতীয় অসুবিধে প্রায় একসঙ্গে উগরে দিয়ে শেষ করে নিজের বাবাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে। মানুষটা খুঁজে খুঁজে এমন একটা লোকের সঙ্গে বিয়ে দিল যার হাত থেকে সে কবে নিষ্কৃতি পাবে তা একমাত্র ভগবানই জানেন। কোনওরকমে এই সব কথার ঝড় সহ্য করে বাড়ি থেকে বের হয় কানাই রায়। সামনের ছ'দিন হাটগুলোতে যেসব মাল বিক্রি করবে তার ব্যবস্থা করে। গত সপ্তাহের বাকি টাকা শোধ করে সামনের সপ্তাহের অগ্রিম মহাজনকে ধরিয়ে দেয়।

তামাক পাতা। মহাজন নিয়ে আসে কুচবিহার থেকে। এই অঞ্চলে তামাক চাষ হয় না। কয়েকজন চেষ্টা করেছিল, তাদের পাতা বাজারে বিকোয়নি। কুচবিহার থেকে তামাকের

পাতা আসে দুই ধরনের। বিড়ির পাতা এবং খইনির পাতা। ছয়দিনের ছয় হাটের খদ্দেরদের জন্যে মাল কিনে রিক্সার ওপর চাপিয়ে যখন সে বাড়ি ফিরে আসে তখন তার বউ উঠোনে বসে আছে গালে হাত দিয়ে। স্নান খাওয়া সারতে সূর্য পশ্চিমে।

খাওয়াদাওয়ার পর একটু গায়ে পড়েই স্ত্রীর সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করে কানাই রায়। দু'দুটো কচি বাচ্চাকে পাশে বসিয়ে আদর করে। সেই আদর দেখতে দেখতে কমলার মুখের চেহারায় একটু সরল ভাব ফুটে ওঠে। তখন তার চাহিদাগুলো সে একের পর এক বলে যায়। সম্মতির মাথা নাড়ে কানাই রায়, 'হবে, হবে, যা চাইছ সব পাবে। একটু সবুর করো, আর ধরো, বড় জোর এক মাস।'

'চার মাস ধরে এক কথা শুনছি। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না' গলায় অভিমান ছিটকে ওঠে কমলার।

বাচ্চাদের চুমু খেয়ে কানাই রায় বলে, 'এইবার বিশ্বাস করো, পিলিজ।'

শেষ শব্দটি কানে যেতেই কমলা ফিক করে হেসে ফেলল।

সাইকেলের পেছনে ত্রিপলে মুড়ে তামাকের প্যাকেট আর রুটি তরকারি নিয়ে ভোর ভোর বেরিয়ে পড়ল কানাই রায়, রোজ যেমন বের হয়। সাইকেলের পেছনে ওজন থাকলে বেশি জোরে চালানো যায় না বটে কিন্তু চালাতে আরাম লাগে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গঞ্জ ছাড়াতেই পিচের রাস্তা যা চা-বাগানের বুক চিরে চলে গিয়েছে। এই রাস্তায় ভোরবেলায় গাড়ি নেই বললেই চলে, মানুষ তো নেই। দুলে দুলে প্যাডেলে চাপ দিচ্ছিল কানাই। কাল রাত্রে বউ-এর কাছে অনেক ক্ষমা চেয়েছে সে। সপ্তাহের ছ'দিন দুটো বাচ্চাকে নিয়ে বেচারা বাড়িতে একা থাকে। কষ্টটা বুঝতে পারে কানাই রায়। কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে এই ব্যবসা না করে উপায় নেই। তবে হ্যাঁ, যে টাকা জমেছে তাতে সামনের বছরের মধ্যে চৌমাথার হারু মণ্ডলের বন্ধ চায়ের দোকানটা কেনা সম্ভব হবে। ভগবান নিশ্চয়ই মুখ তুলে তাকাবেন।

হাওয়া দিচ্ছে পেছন থেকে, ফলে সাইকেলের গতি বাড়ছে। সামনেই তিকমারির জঙ্গল। জঙ্গল পার হলেই তিকমারির হাট। কানাই রায় দেখল কাঁধে বাঁক নিয়ে কয়েকজন দুলে দুলে হেঁটে যাচ্ছে। বাঁকের দু'পাশে দড়িতে বাঁধা মাল ঝোলানো। এরা সব হাটে যাচ্ছে। আশপাশের গঞ্জ থেকে হেঁটেই মাল বিক্রি করতে হাটে যায় এরা। হাটের আসল বিক্রেতারা আসে বড় ছোট লরিতে মাল বোঝাই করে। সপ্তাহের এক এক দিনে এক এক হাটে ভিড় জমায় তারা।

জঙ্গলের গায়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিল চারজন লোক। এদের চেনে কানাই রায়। তিকমারির জঙ্গলে আস্তানা গাড়ে হাটের দিন। যেসব লরি শহর থেকে মাল নিয়ে আসে তাতেই গায়ের জোর দেখিয়ে চলে আসে কিন্তু এরা হাটে ঢোকে না। হাট থেকে কয়েক মাইল দূরে জঙ্গলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। হাটুরেরা এদের চেনে।

কানাইকে দেখে চারজনের একজন হাত তুলল, 'এই যে দাদা, সমস্যা কী?'

'আর সমস্যা? সমস্যার কি শেষ আছে? পেছনে যারা মাল নিয়ে আসছে তাদের চারজনই পুলিসের লোক। ধমক দিয়ে বলেছে, ওরা আজ মাছ ধরতে এসেছে, আমি যেন জল ঘোলা না করি।'

'গুল মারছ না তো?' লোকটা চোখ ছোট করল।

'সন্দেহ হচ্ছে?' সাইকেল দাঁড় করিয়ে কথা বলছিল কানাই রায়, এবার নামার ভঙ্গি করল, 'বেশ, তোমাদের সঙ্গে দাঁড়াচ্ছি। ওরা সামনে এলে দেখিয়ে দেব ভাই।'

'আরে তা না। তোমাকে দাঁড়াতে হবে না। প্রতিবার ফেরার পথে তুমি যা দিয়ে যাও তাই দিও। তোমার সঙ্গে আমাদের ভালো সম্পর্ক আছে, তুমি হাটে চলে যাও।' হাত নাড়ল লোকটা।

তিকমারির জঙ্গলটার অন্তত মাইল দেড়েক অত্যন্ত ঘন। বনবিভাগের লোকজন কদাচিত ওর ভেতরে ঢোকে। হাতি, হায়না, হরিণ তো আছেই মাঝে মাঝে গণ্ডার বেরিয়ে আসে ওই জঙ্গল থেকে। কানাই রায় এবার শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিল। এখন সদ্য সকাল। কয়েকটা হরিণ ওপাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এপাশের জঙ্গলে ঢুকে গেল।

এই সকালেই তিকমারির জঙ্গলে বিক্রেতাদের ভিড় জমতে শুরু করেছে। প্রতি হাটে যারা নিয়মিত আসে তাদের জায়গা নির্দিষ্ট থাকে। কানাই সাইকেল দাঁড় করিয়ে মাল নামিয়ে ত্রিপল বিছিয়ে তামাকের দুটো পেটি দু'পাশে রেখে বসতে না বসতেই একটি পুরুষ এবং একটি নারী তার সামনে এগিয়ে এল। পুরুষটি প্রৌঢ়, নারীর বয়স তিরিশের নীচে।

নারী জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার জন্যে তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। আপনি তো এইসব তামাক আজ এখানে বিক্রি করবেন! তাই না?'

'হ্যাঁ।' হকচকিয়ে গেল কানাই রায়। কী চায় এরা?

'কত টাকার তামাক আছে? মানে সব বিক্রি হয়ে গেলে আপনি কত টাকা পাবেন?' মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল।

'কেন? একথা আপনি জিজ্ঞাসা করছেন এইসব তামাক কি কিনতে চাইছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বলুন, কত দাম নেবেন?' মেয়েটি এবার হাসল।

এবার মাথাটা যেন ঈষৎ ঘুরে গেল। কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিল সে। গতবার এই হাটে প্রায় পঁচিশ শতাংশ তামাক বিক্রি হয়নি। কানাই রায় দ্রুত হিসাব করতে লাগল মনে মনে। বারংবার গুলিয়ে যাচ্ছিল। তাই সময় নেওয়ার জন্যে জিজ্ঞাসা করল, 'এত তামাক নিয়ে আপনি কী করবেন?'

'পয়সা দিয়ে মাল কিনে যা ইচ্ছে তাই করব, তার কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি! বিক্রি করতে না চাইলে বলে দিন।' মেয়েটি গম্ভীর হল।

হিসেব যা মনে মনে করল তার সঙ্গে পঞ্চাশ টাকা যোগ করে বলে দিল কানাই রায়। বলেই ভাবল না বাড়িয়ে বললেই ভালো হতো। সাধা লক্ষ্মী সে বোধহয় পায়ে ঠেলল।

মেয়েটির সঙ্গে আসা প্রৌঢ় বলল, 'এ তো বেশ বেশি বলে মনে হচ্ছে।'

'আচ্ছা, বিশ টাকা কম দেবেন।' চটপট বলল কানাই রায়।

মেয়েটি হাত তুলে থামতে ইশারা করে মনে মনে হিসেব করে বলল, 'আপনি যা বললেন তার ষাট ভাগ টাকা নগদ দেব। বিক্রি করতে রাজি থাকলে বলুন। আপনি ছাড়া এই হাটে আর কেউ তামাক নিয়ে বসে না বলে যা ইচ্ছে দাম নেবেন, তা তো বেশিদিন চলবে না। বলুন রাজি আছেন?'

'মরে যাব। খুব ক্ষতি হয়ে যাবে।' হাত জোড় করল কানাই রায়।

'তাহলে বেঁচে থাকুন। চলো বাবা।' মেয়েটি পাশ ফিরল।

'আচ্ছা আচ্ছা, আর একটু বাড়িয়ে দিন।' অনুরোধ করল কানাই রায়।

শেষ পর্যন্ত একটা রফা হল। নগদ টাকা গুনে গুনে মেয়েটির বাবা তার হাতে তুলে দিলে কানাই রায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এত তামাক নিয়ে কী করবেন?'

'খাব!' মেয়েটি গম্ভীর গলায় বলল।

'ত্রিপলটা কি নিয়ে যাবেন ভাই?' মেয়েটির বাবা জিজ্ঞাসা করল।

'ওঁর জিনিস উনি নেবেন না কেন? আমাদের পলিথিনটা বের কর। ওঁর ত্রিপল উনি নিয়ে যান, অন্য হাটে তো যেতে হবে ওঁকে।'

ত্রিপল গুটিয়ে চায়ের দোকানে যেতে না যেতেই প্রশ্ন শুনতে হল, 'তুমি দোকান বিক্রি করলে না ভাড়ায় দিলে দাদা?'

'মাল কিনে নিয়েছে। মেয়ে আর তার বাপ। চেনো নাকি?' জিজ্ঞাসা করে কানাই রায়।

'না গো, আজই প্রথম এই হাটে এসেছে।'

চা খেতে খেতে খবরটা পেল তার কাছ থেকে কিনে তামাক বিক্রি করছে মেয়ে আর তার বাবা। একজন চেনা খদ্দের বলল, 'তোমার থেকে বেশি দাম নিচ্ছে গো। হাটে আর কারও কাছে তামাক নেই বলে কিনতে হচ্ছে। তুমি থাকলে পয়সা কম লাগত।'

ব্যাপারটা বুঝতে পারল কানাই রায়। একেই বলে পরের ধনে পোদ্দারি।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে দূর থেকে দেখল সে, তামাকের দোকানের সামনে বেশ ভিড় জমেছে। সে যখন বিক্রি করত তখন এই ভিড়টা হতো না। তবু সারাদিন পরিশ্রম করে রাত গড়ালে বাড়ি ফিরতে হতো, শরীরে বল থাকত না এক ফোঁটাও। আজ সকাল ফুরোবার আগেই সে জঙ্গল পার হয়ে এল। বিকেলে ওই জঙ্গলের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবে ওরা, হাত পাতবে। না দিলেই ছুরি বের করবে। এখন তারা এই তল্লাটে নেই বলে নিশ্চিন্তে জঙ্গল পেরিয়ে চলে কানাই রায়।

চোখ কপালে উঠল কমলার, 'এ কী? কী হয়েছে? নিশ্চয়ই শরীর খারাপ! তামাকের ব্যাগগুলো গেল কোথায়?'

যথাস্থানে সাইকেল দাঁড় করিয়ে কানাই রায় হাসিমুখে কমলার সামনে এসে বলল, 'দোকান খুলতে না খুলতেই সব মাল বিক্রি হয়ে গেল। তাই বাড়ি ফিরে এলাম।'

'ওমা? এমন ভাগ্য কী করে হল? লোকটা তোমার নতুন শ্বশুর নাকি?' ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল কমলা।

'কী যা তা বল! তবে যিনি সব কিনে নিলেন তিনি একজন মেয়েমানুষ। সঙ্গে তার বাপ ছিল। এতদিন হাটে যাচ্ছি এমন কখনও হয়নি। যাকগে, আমায় চারটি খেতে দাও, তারপর সময় যখন পেলাম তখন কয়েকটা কাজ সেরে আসব। আঃ, এরকম দিন যদি রোজ আসত!' কুয়োর দিকে এগিয়ে গেল কানাই রায়।

কিন্তু চিঁড়ে ভাজা আর চা খেয়ে কানাই রায়ের মনে হল দিনের এই সময়ে অনেকদিন আরাম করে শোওয়া হয়নি। আর শুতে গিয়ে কখন যে দুপুর প্রায় শেষ হয়ে এল তা কমলা না ডাকলে টের পেত না। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সে বলল, 'এহে! কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টেরই পাইনি। আমাকে আগে ডাকনি কেন?'

'কোনওদিন তো এই সময় ঘুমাও না। আজ কোন সুন্দরীকে দেখে এসে স্বপ্ন দেখছ, ঘুম ভাঙিয়ে সেটা নষ্ট করব? মনে মনে তো আমায় গালি দিতে। যাও, ঝট করে চান করে এসো, আমি ভাত বাড়ছি।'

কানাই রায় বুঝল সে ভুল করে ফেলেছে, আজ একটি মেয়ে এসে তার দোকানের সব তামাক কিনে নিয়েছে। প্রতিদিন তো কত লোক তামাক কেনে। সেসব কথা তো বউকে বলে না বাড়ি ফিরে। একটা মেয়ে কিনেছে বলে বলতে গেল কেন?

ভাত খেয়ে গঞ্জের চৌমাথায় এল সে। এখনও রোদ মরে যায়নি। সব দোকান খোলেনি। হারু মণ্ডল বসে আছে নাপিতের সামনে। এই অবেলায় দাড়ি কামিয়ে নিচ্ছে। কানাই রায় অপেক্ষা করল। কামানো শেষ হলে সে বলল, 'নমস্কার দাদা। ভালো আছেন তো?'

'আর ভালো! তুমি এ সময় এখানে? হাট নেই?' হারু জিজ্ঞাসা করল।

'তাড়াতাড়ি মাল বিক্রি হয়ে গেল, তাই! আপনার বাড়িতে কবে যাব দাদা?'

'আজ কোথায় হাট ছিল?' হারু মণ্ডলের চোখ ছোট হল।

'তিকমারিতে।'

'বাঃ। কপাল দেখছি বেশ ভালো। ও হ্যাঁ, আমার বাড়িতে এখনই যেতে হবে না। মন স্থির করা মাত্র তোমাকে খবর দেব। চিন্তা করো না।' হারু মণ্ডল বলল।

'তার মানে? আপনি তো মন স্থির করেই আমাকে বলেছিলেন।' অবাক হয়ে বলল কানাই।

'বলেছিলাম।' মাথা নাড়ল হারু, 'এখনও তো না বলছি না। তবে কিনা মেয়েটা এসেছিল তার বাপকে নিয়ে। বলল, ওখানে চায়ের দোকান করতে চায়। আমাদের এই তল্লাটে কোনও মেয়ে চায়ের দোকান চালায় না। তাই একটু ভাবছি। তুমি বরং দিন তিনেক পরে খবর নিও।'

হারু মণ্ডল চলে যেতে নিজেকেই গালাগাল দিল কানাই রায়। কয়েক সপ্তাহ হয়ে গেল হারু মণ্ডলের সঙ্গে প্রথম কথা হয়েছিল। তখনই যদি ওর হাতে টাকা ধরিয়ে দিতে পারত তাহলে আজ ঝামেলায় পড়তে হতো না। আর এই যে মেয়ে তার বাপকে নিয়ে দোকান চালাতে চাইছে সে কে? আজ হাটে যারা তার সব তামাক কিনে নিয়েছে তারা নয়তো? দুশ্চিন্তা বাড়ল। এই মেয়েটা যেন প্ল্যান করে তার পেছনে লেগেছে। তার হাটের দোকান কিনে নিতে চাইছে, হারু মণ্ডলের দোকান হাতাতে চাইছে! হঠাৎ তার মনে হল, হাটে গিয়ে তার কাছ থেকে না কিনে কাল বিকেলে মহাজনের কাছ থেকে যদি ও তামাক কিনত তাহলে অনেক বেশি লাভ করতে পারত। সেটা না করে হাটে গিয়ে তার কাছ থেকে দাম বেশি দিয়ে কিনল কেন? ওদের মতলবের মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছিল না কানাই রায়।

ভোর সাড়ে চারটের সময় সাইকেলে তামাকের ব্যাগ চাপিয়ে বাড়ি থেকে বের হল কানাই রায়। এখনও আলো ফোটেনি, যদিও পুবের আকাশ প্রায় ফর্সা হয়ে এসেছে, রাস্তায় কোনও লোক নেই। আজ যেতে হবে উল্টোদিকে ডিমগুড়ির হাটে। এই অঞ্চলের বেশ বড় হাট। যেতে অন্তত তিনঘণ্টা লাগে সাইকেলে।

যেতে যেতে আলো ফুটল। কানাই রায় লোকগুলোকে দেখতে পেল। মাল মাথায় চাপিয়ে হনহনিয়ে হাটে যাচ্ছে।

তারপরই ছোট হাতিদের আসতে দেখল। এরা মাল বোঝাই করে আসছে শহর থেকে। চেনা মানুষ হাত নাড়ল, হাত নেড়ে তাতে সাড়া দিল কানাই রায়।

ডিমগুড়ির এই হাটের নামডাকের একটা কারণ হল, এখান থেকে বাংলাদেশ বর্ডার বেশি দূরে নয়। সেখান থেকে বর্ডার পেরিয়ে মাল নিয়ে আসে অনেক ব্যাপারী, মাল কিনে নিয়ে যায় এখান থেকে। এই কারণে ডিমগুড়ির হাটের এত রবরবা। কোনও সপ্তাহে বিক্রি না হওয়া তামাক নিয়ে ফিরতে হয় না কানাই রায়কে। বর্ডারের ওপাশের মানুষ এই তামাকের জন্যে মুখিয়ে থাকে।

দোকান সাজিয়ে বসল কানাই রায়। চা-ওয়ালা চা এনে ভাঁড়ে ঢেলে হাতে ধরিয়ে দিলে চোখ বন্ধ করে চুমুক দিল সে। আঃ!

'না বাবা, আগে ওঁকে চা খেতে দাও তারপর কথা বলব?' মেয়েলি গলায় বলা কথাগুলো কানে যেতেই চোখ খুলল কানাই রায়। ভাঁড় নামিয়ে সামনে তাকাল কানাই রায়। সর্বনাশ। তিকমারির হাটে তার দোকান যে মেয়েটা কিনেছিল সে আজ এখানে বাবাকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছে! বেশ গম্ভীর মুখ করে কানাই রায় জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন, কোন তামাক দেব?'

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল মেয়েটি। বলল, 'আজ কত কেজি আছে?'

'কী বলতে চাইছেন তার মানে বুঝলাম না।'

'ওম্মা! আমাদের চিনতে পারছেন তো? কাল আপনার তামাক কিনেছিলাম।'

'কাল তো এখানে হাট ছিল না।'

এবার প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করল, 'কাল যত তামাক এনেছিলে ঠিক সেই পরিমাণই আজ এনেছ বলে মনে হচ্ছে। কাল যা দাম নিয়েছিলে আজ তাই নিয়ে বাড়ি চলে যাও ভাই। আর পরিশ্রম করতে হবে না।'

অভিনয় করার চেষ্টা করল কানাই রায়। বলল, 'কাল তামাক বেচতে গিয়েছিল আমার যমজ ভাই। একরকম দেখতে আমরা। ছেলেটা সরল বলে কাল খুব ঠকে গিয়েছে। আপনারা যান, আমাকে মাল বেচতে দিন।'

মেয়েটি গালে হাত দিল। 'ওম্মা। আপনারা যমজ নাকি? একদম একরকম দেখতে। এমনকী আপনার ডান ঠোঁটের ওপর যে ব্রণ উঠেছে ওটা তার ঠোঁটের ওপরেও ছিল। ঠিক আছে, কাল যে দামে দিয়েছেন তার ওপর আরও একশো টাকা বেশি দেব। রাজি আছেন তো?'

ঠোঁট বন্ধ করে অন্যদিকে তাকাল কানাই রায়। বলে কী মেয়েটা? সে মাথা নাড়ল, 'কাল যত তামাক এনেছিলাম আজও তাই এনেছি। কিন্তু একশো টাকায় হবে না, দুশো টাকা দিতে হবে।'

'বেচারা!' বলল মেয়েটি।

'মানে?'

'যারা তামাক কিনবে তাদের কথা ভেবে বললাম। কী আর করা যাবে, আপনি যা চাইছেন তাই পাবেন। দিয়ে দাও বাবা।' বাবার দিকে তাকিয়ে বলল মেয়েটি।

গুনে গুনে টাকা দিল প্রৌঢ়। আজ সে ত্রিপল দিল না। সাইকেলের পেছনে ভাঁজ করে ত্রিপল রেখে হাট থেকে ইলিশ মাছ কিনল। অনেকদিন বাড়িতে ইলিশ রান্না হয়নি। মাছ দেখে বউ খুব খুশি হবে।

ইলিশের ঝোল আর ভাত খেয়ে দুপুরের ঘুমটা বেশ ভালো হল। কিন্তু ঘুম ভাঙল একটা খারাপ স্বপ্ন দেখে। যে মহাজনের কাছ থেকে সে তামাক কেনে সেই মহাজনের কাছ থেকে সরাসরি মাল কিনছে মেয়ে এবং তার বাবা। সেই মাল হাটে নিয়ে গিয়ে তার পাশে বসে ওরা বিক্রি করছে অনেক কম দামে। ফলে খদ্দেররা ভিড় করেছে ওদের সামনে। বিকেল হলে যে পরিমাণ তামাক নিয়ে গিয়েছিল প্রায় তার কাছাকাছি নিয়ে ফিরে আসছিল যখন তখন তার ঘুম ভেঙে গেল।

কীরকম অসহায় বোধ হওয়ায় চটজলদি সে রওনা হল মহাজনের সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে দেখল মহাজনের বাড়ির সামনে ভিড় জমেছে। ভেতর থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। বাইরে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের মুখ গম্ভীর, কেউ কথা বলছে না। উসখুস করে পাশে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধকে কানাই রায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

'বুঝতে পারছ না? এরকম কান্না মরে না গেলে কেউ কাঁদে? অদ্ভুত!' বৃদ্ধ সরে গেল।

শেষ পর্যন্ত পরিচিত এক ব্যবসায়ীর কাছে জানতে পারল কানাই রায়। আজ সকালে নদীতে প্রাতঃকৃত্য করতে গিয়ে সাপের কামড়ে মারা গিয়েছেন মহাজন। দড়ি বাঁধার জায়গা পাওয়া যায়নি।

সর্বনাশ হয়ে গেল। বাইরে বেরিয়ে এল কানাই রায়। কুচবিহার থেকে তামাক সংগ্রহ করে নিয়ে এসে এই জেলার বাজার ভাগ করে তিনজনকে তামাক বিক্রি করত লোকটা। সেই তিনজনের একজন কানাই রায়। লোকটার ব্যবসার হাল এরপরে কে ধরবে? মুখ কালো করে বসেছিল সে?

'কী হে! এখন কী করবে?' হারু মণ্ডল সামনে এসে দাঁড়াল।

মাথা নাড়ল কানাই রায়। তারপর বলল, 'আপনি এখন ভরসা।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু মেয়েটা আর তার বাপ খুব জ্বালাচ্ছে যে। দেখি।'

'এই মেয়ে কোথায় থাকে দাদা?'

'তা তো জানি না, দু'দিন আগে এসে ওর বাপ পায়ে পড়ল। দেখি।' দুলতে দুলতে চলে গেল হারু মণ্ডল।

শালা খেলাচ্ছে। এরপরে বেশি টাকা চাইবে। দু-দুটো বিয়ে করেছিল, দুটো বউই মারা গিয়েছে। বয়স চলে না গেলে আবার করত।

মন-মেজাজ খুব খারাপ। পরের ভোরে হাটে গেল না কানাই রায়। পাঁচ ক্রোশ দূরে মণ্ডলগঞ্জে হাট ছিল। কমলা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল। 'কী হল? তোমায় দেখে তো মনে হচ্ছে না শরীর খারাপ হয়েছে।'

'শরীর না, মন খারাপ। মহাজনকে সাপে কামড়াল।'

'এ্যাদ্দিন তো মানুষটাকে কষাই, চামার বলে গালি দিতে। সে মরল বলে মণ্ডলগঞ্জের খদ্দেরদের কাছে গেলে না নাকি অন্য কিছু?' বলতে বলতে বাঁকা চোখে তাকাল কমলা।

'অন্য কিছু মানে?' খেঁকিয়ে উঠল কানাই রায়।

'তা আমি বলব কী করে!' সামনে থেকে সরে গেল কমলা।

মাথায় বাজ পড়ল দুপুরবেলায়। সবে খেয়েদেয়ে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে মৌজ করে বিড়ি ধরিয়েছে কানাই রায়, ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। তার বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে সেই প্রৌঢ়, সঙ্গে অবশ্য মেয়ে নেই।

'ওঃ। খুব চিন্তা হচ্ছিল আমাদের। মেয়ে বলল, দ্যাখো গিয়ে, নিশ্চয়ই খুব শরীর খারাপ হয়েছে। তা আজ হাটে যাননি কেন?' প্রৌঢ় হাসতে হাসতে সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল।

'ইচ্ছে হয়নি তাই যাইনি। আমি তো কারও চাকর নই, নিজেই মালিক।'

'তা তো ঠিকই। তবে ব্যবসার একটা নিয়ম তো আছে। যারা নেশা করে তারা দোকান বন্ধ দেখে দুশ্চিন্তা করছিল। মেয়ে বলল, বাবা, গিয়ে দেখে এসো মানুষটার কিছু হল কি না। তাই চলে এলাম।' হাসল প্রৌঢ়।

'আর কিছু বলবেন?'

'এ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।' প্রৌঢ় বলল, 'আজকের মাল দিয়ে দিতে বলল মেয়ে। ওই দু'দিন যে পরিমাণ দিয়েছিলেন তাই দিন। আমি টাকা নিয়ে এসেছি।'

'এখন মাল নিয়ে কোন হাটে বিক্রি করবেন?'

'আহা, এখন আর হাট কোথায় পাব! কাল যদি হাটে গিয়ে না দেখতে পাই তখন না হয় আজ যা দেবেন তা বিক্রি করব।'

শুনে মজা লাগল। এ তো মন্দ ব্যাপার নয়। কিন্তু কতদিন?

দেবে কি দেবে না ভাবতে ভাবতেও কাল যে তামাক নিয়ে যেত তাই বিক্রি করল কানাই রায়। প্রৌঢ় খুশি হয়ে বলল, 'আবার কাল দেখা হবে।' বলে তামাক নিয়ে চলে গেল।

মহাজন মারা গিয়েছে। তার জায়গায় কুচবিহার থেকে তামাক নিয়ে এসে সাপ্লাই দেবে কে? বাড়িতে যেটুকু তামাক আছে তা শেষ হয়ে যাওয়ার পর তো বেকার বসে থাকতে হবে।

রাত্রে অনেক চিন্তা করে কানাই রায় স্থির করল সে আগামীকাল সকালের বাস ধরে কুচবিহার যাবে। মহাজনের মতো সেখান থেকে তামাক কিনে এনে যারা হাটে গিয়ে বিক্রি করতে চায় তাদের মুনাফা কম রেখে বিক্রি করবে। মহাজন মারা গিয়েছে, তার জায়গা যদি সে একটু একটু নিয়ে নিতে পারে—। উত্তেজিত হল কানাই রায়।

ভোর ছ'টার বাসে উঠল কানাই রায়। কুচবিহারে পৌঁছাতে ন'টা বেজে যাবে। তা বাজুক। তামাকের আড়তে সে এর আগে একবার এসেছিল। যে মানুষটা তাকে এই ব্যবসায় এনেছিলেন তিনিই চিনিয়েছিলেন। তারপর আর আসার প্রয়োজন হয়নি। জানলার বাইরে তাকাল কানাই রায়। চায়ের বাগানের ভিতর দিয়ে পিচের রাস্তায় বাস ছুটছে। দু'ধারে কোনও বাড়িঘর নেই। সে চোখ বন্ধ করল।

কুচবিহারে পৌঁছে বাস থেকে নেমে তার মনে হল প্রথমে কিছু খেয়ে নেওয়া উচিত। সামনেই একটা একচালার দোকান দেখতে পেয়ে ঢুকে গিয়ে রুটি-তরকারি খেয়ে পেট ভরিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিল সে। যদি সব ঠিকঠাক এগয় তাহলে তার খাটনি অনেক কমে যাবে। সে নিজেই এখন তাদের গঞ্জের মহাজন হয়ে যাবে। হাটে গিয়ে যারা তামাক বিক্রি করবে তাদের মাল দিয়ে সারাদিন বিশ্রাম। হপ্তায় একবার কুচবিহারে এসে মাল নিয়ে যাওয়া। ব্যাস। এর সঙ্গে যদি হারু মণ্ডলের ঘরটা পাওয়া যায় তো কথাই নেই। দু'বছরে বড়লোক হয়ে যাবে সে।

চা খেয়ে দোকান থেকে বের হতেই চোখ বড় হয়ে গেল কানাই রায়ের। সর্বনাশ! সেই মেয়েটি যে এখানেও হাজির হয়েছে! আড়ালে যাওয়ার চেষ্টা করেও নজর এড়াতে পারল না কানাই রায়। তাকে দেখে দ্রুত কাছে চলে এল মেয়েটি। হেসে বলল, 'ওই দোকানে ছিলেন বুঝি। তাই আপনাকে দেখতে পাইনি। আপনার জন্যে আমি কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি।' হাসল সে, 'চলুন।'

'তার মানে?' হকচকিয়ে গেল কানাই রায়।

'মানে তো সোজা। আপনি তো তামাকের আড়তে যাচ্ছেন। চলুন, আমিও যাব।'

অবাক হয়ে কানাই রায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এদিকে, এই সময়ে?'

'বারে! আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানে আমি যাব না? আপনি তামাক কিনে আমাকে সাপ্লাই দিচ্ছিলেন। এই ব্যবসা আরও ভালোভাবে করার জন্যে কুচবিহারে এসেছেন, আমি পেছনে পড়ে থাকি কী করে!' হাসল মেয়েটি।

সর্বনাশ হয়ে গেল। এই মেয়ে খবর পায় কী করে! সে বলল, 'দেখুন, আপনি আপনার পথ দেখুন। আমার সঙ্গে ঘুরে কোনও লাভ হবে না।'

'তা কি হয়? তাহলে এত কষ্ট করে কুচবিহারে এলাম কেন?' বলে দু'পাশে চোখ বুলিয়ে হাত তুলে কাউকে ইশারা করল কাছে আসতে। দু'পাশের কিছু লোকজনের মধ্যে একটি যুবককে এগিয়ে আসতে দেখল কানাই রায়।

মেয়েটি বলল, 'আপনার তো হারু মণ্ডলের দোকানের ওপর খুব লোভ। আমি ওটা আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি। তোয়াজ করলে হারু মণ্ডল হয়তো আমাকেই দিয়ে দিত। আপনি নিন, তার বদলে আপনার ছ'টা হাট আমাদের ছেড়ে দিন।'

'আমাদের মানে?'

সঙ্গে সঙ্গে কাছে এসে দাঁড়ানো যুবক আর নিজের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মেয়েটি, 'দোকান সামলে তো আপনি হাটে হাটে ঘুরতে পারবেন না।'

'হারু মণ্ডল যদি না দেয়—!'

'দেবে। ওর বাপ দেবে!'

'কিন্তু হাটে হাটে ঘুরে তামাক বিক্রি করার ধকল সইতে পারবেন?'

'একদম না। আমি কেন হাটে হাটে ঘুরব? ও আছে না!' ইশারায় যুবককে দেখিয়ে দিল মেয়েটি। বলল, 'তাহলে এই কথাই পাকা থাকল। এসো।' ছেলেটির হাত ধরে হাসতে হাসতে মেয়েটি সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

হারু মণ্ডল আজ যেন মাটির মানুষ। বলল, 'যা ভাড়া আগে চেয়েছি তাই দিও। তবে ঘরটাকে নিজের ঘর ভেবে যত্ন নিও। তবে একটা কথা, ওখানে চা বিক্রি করা চলবে না। আমার বউ-এর খুব আপত্তি ছিল।'

এত সহজে দোকান পেয়ে যাবে ভাবতেই পারেনি কানাই রায়। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করে সন্ধের মধ্যেই দু'মাসের ভাড়ার টাকা জমা দিয়ে চাবি নিয়ে গেল। রাতের বেলায় কাজ শেষ হলে স্ত্রীর পাশে শুয়ে তাকে মতলবটা বলল কানাই রায়। শোনামাত্র লাফিয়ে উঠল কমলা, 'পারব, খুব পারব। কিন্তু একটা কথা, আমি কিন্তু মাথায় ঘোমটা পরেই দোকানে বসব। তুমি যদি আমাকে শিখিয়ে দাও তাহলে ঠিক পারব।'

কুচবিহার থেকে তামাক এনে দোকান সাজাতে ভোর ভোর রওনা হল কানাই রায়। শহরে পৌঁছে দোকানের সাইনবোর্ডে কী লিখতে হবে তার অর্ডার দিয়ে তামাক কিনতে গেল। বিকেল বিকেল ছোট হাতিতে সেসব তুলে ফিরে এল দোকানে। দোকান সাজিয়ে সামনে সে বোর্ড টাঙাল, 'কমলার তামাকের দোকান। উৎকৃষ্ট তামাক। মহিলাদের তামাক বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।'

দোকানের সামনে ভিড় জমেছে। ♦♦

অলংকরণ: প্রণব হাজরা

• উপন্যাস

ঋজুদা কাহিনী

অষ্টম রিপু

বুদ্ধদেব গুহ

প্রথম অধ্যায়

আমি আর ভটকাই অনেকদিন পরে বিশপ লেফ্রয় রোডে যাচ্ছি। আমাদের শেষ অভিযান মহারাষ্ট্রের 'ফোটা কার্তুজের গন্ধ'-এর পরে এই আসা। ঋজুদাই ফোন করেছিল পরশুদিন। আমাদের আজ বিকেল পাঁচটা নাগাদ ঋজুদা আসতে বলেছিল। ঋজুদার পাঁচটা মানে তো কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা। আমি পৌঁছে দেখি, ভটকাই আমার জন্য নীচে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনে মিলে ওপরে উঠলাম।

ওপরে উঠে বেল টিপতেই গদাধরদা এসে দরজা খুলে বলল, "বাবা! কী ব্যাপার! তোমাদের তো দেখাই পাওয়া যায় না!"

আমি বললাম, "ঋজুদা না ডাকলে কি আর আমরা আসি?"

"তোমাদের না আসাই ভালো। তোমরা এলেই তো বাবুকে নিয়ে যেখানে-সেখানে চলে যাও আর তারপর একটা কাণ্ড বাধিয়ে আসো। লোকটা এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়নি। টুটিলাওয়া না ফুটিলাওয়া, কোন একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে বাবুকে গুলি খাওয়ালে। কতদিন হাসপাতালে থাকল মানুষটা। ভালো হওয়ার পরেও তো আর একবার নিয়ে গেলে। কাজেই, তোমরা আসা মানেই তো বিভ্রাট! ভেতরে এস! তোমাদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখলে আমার তো চাকরি যাবে!"

আমরা হেসে বললাম, "তোমার চাকরি কে খায়? বাবু কোথায়?"

"বাবু তো তৈরি হয়ে বসে আছেন তোমরা আসতিছ বলে। আমি খবর দিতেছি। বোসো বোসো।"

"তারপর, আজ কী খাওয়াবে!"
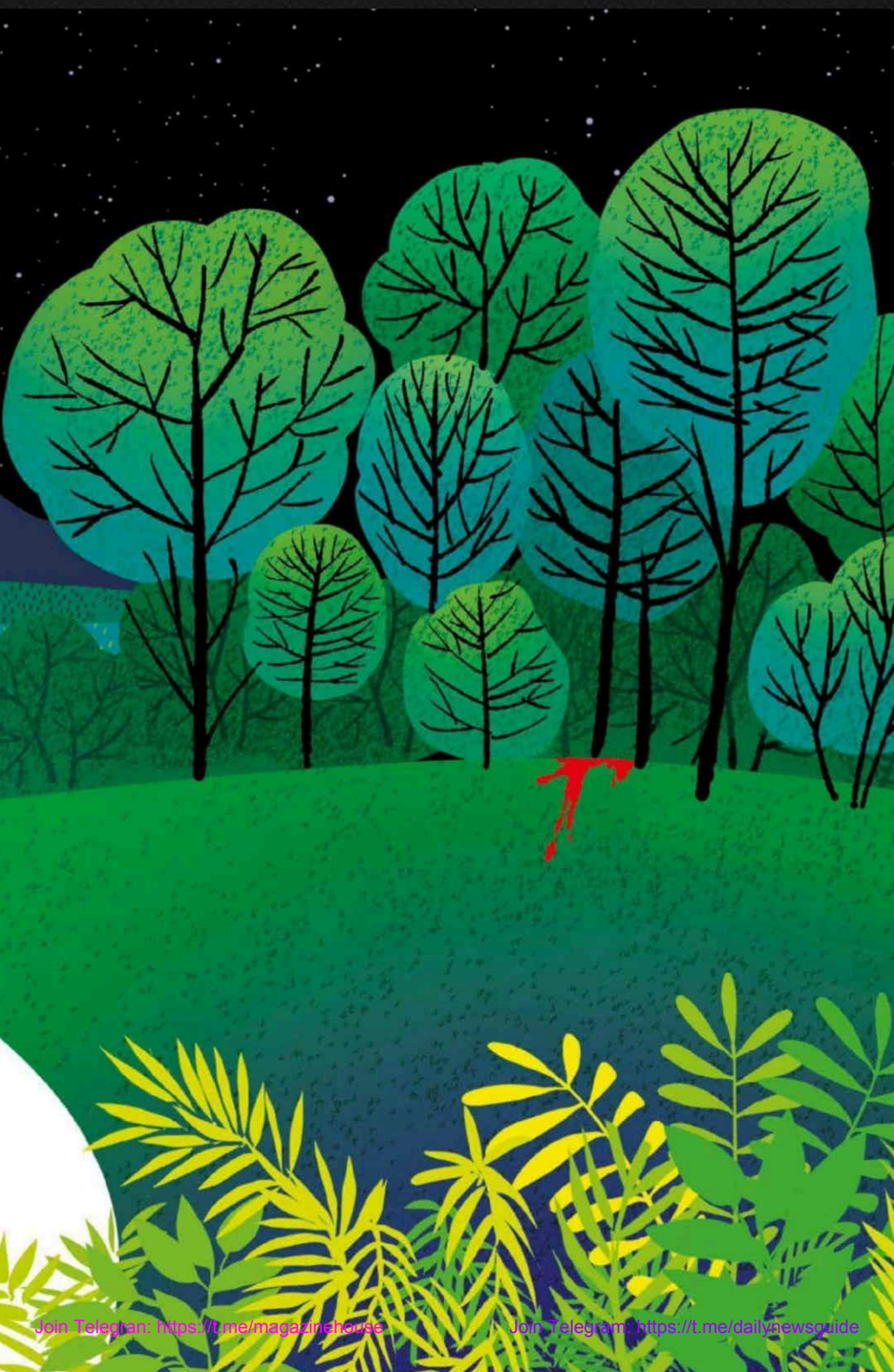
"আজ্ঞা হোক!"

"তুমি আমাদের পেটুক বলো, অথচ আমরা এলেই নিজে আমাদের গুচ্ছের খাওয়াও, তারপর দোষ হয় আমাদের।"

ঋজুদা তৈরি হয়েই ছিল। সময়ের ব্যাপারে ঋজু বোসের হেরফের হয় না। পাঁচটা মানে পাঁচটা। আর্মির ভাষায় যাকে বলে ফাইভ ও ক্লক শার্প। ঋজুদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ভেতর থেকে বাইরের ঘরে এসে বলল, "কী রে, তোরা তো আজকাল ডুমুরের ফুল হয়েছিস!"

"টেলিফোনে তো কথা বলিই! তুমি না ডাকলে আর আসি কী করে। তুমি তো আর আমাদের ইয়ার নও যে যখন-তখন এসে আড্ডা দেব তোমার সঙ্গে! তেমন ফালতু আড্ডা তুমি কারুর সাথেই দাও না। তা বলো, এবারে আবার কী ঝামেলা হল।"

"কথা কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হবে! বোস আগে! গদাধর জানে তোরা এসেছিস?"

"বাঃ! সেই তো দরজা খুলল!"

"তাহলে কী খাবি-টাবি সব বলে দিয়েছিস?"

"এই তো এলাম। গদাধরদা কি না খাইয়ে ছাড়বে?"

ভটকাই বলল, "আসলে আমরা তো খেতেই আসি তোমার বাড়িতে। সে কথা তুমিও জানো, আমরাও জানি।"

ঋজুদা বলল, "অনেকদিন পর আজ ক্যালকাটা ক্লাবে গেছিলাম। প্রতি রবিবার বন্ধুরা সেখানে জমায়েত করে। বহুদিন যাই না বলে ওরা ডেকেছিল। তা তোরা আসবি বলে তোদের জন্য চিকেন প্যাটিস, লেমন টার্ট, আর কিছু প্যাস্ট্রি নিয়ে এসেছি। আজ তোরা এগুলোই খা।"

ভটকাই বলল, "যা খাওয়াবে তুমি।"

ঋজুদা বসতে আমরাও বসলাম। তারপর বললাম, "বলো, কেন ডেকেছ?"

"ওড়িশাতে একবার যাবি নাকি? বেশিদিনের জন্য নয়।"

"সেখানে আবার কী ঝামেলা হল?"

"তোদের কি অম্বিকা পানিগ্রাহীর কথা আগে বলেছি?"

"না, এর নাম তো আগে কখনও শুনিনি!"

"অম্বিকা আমার অনেকদিনের পরিচিত। যখন আমি নিয়মিত ওড়িশার বিভিন্ন জায়গায় শিকারে যেতাম, তখন সে আমার শিকারসঙ্গী হত। আমরা যখন নিনিকুমারীর বাঘ মারার জন্য গিয়েছিলাম, তখনও অম্বিকার সঙ্গে তোদের আলাপ হয়নি?"

আমরা সমস্বরে বললাম, "না।"

"অম্বিকার বাবা ছোটখাটো ব্যবসাদার ছিলেন। কিন্তু অম্বিকা সেই ব্যবসা বিরাট করে ফেলে। ফুলে-ফেঁপে একেবারে ঢোল। ওড়িশার বিভিন্ন জঙ্গল নিলামে ডেকে নেয় প্রতি বছর। তারপর সেই জঙ্গলে রাস্তা বানিয়ে, ডেরা বানিয়ে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে গিয়ে জঙ্গল থেকে সেই সব কাঠ কেটে ওর ফ্লিট অফ মার্সিডিজ ট্রাকে করে কটকের কাঠের মন্ডিতে এনে ফেলে। বাঁশ এনে চৌদুয়ারের পেপারমিলে ডেলিভারি দেয়। এখন অম্বিকা কোটিপতি মানুষ। কটকের বজ্রকপাটি রোডে ওর প্রাসাদোপম বাড়ি। একটি বি.এম.ডব্লিউ ও একটি মার্সিডিজ গাড়ির মালিক। ওর স্ত্রী ওড়িশার এক করদ রাজ্যের রাজকুমারী। দুই ছেলেই আমেরিকায় পড়াশোনা করে।"

"ওড়িশায় কি এখনও করদ রাজ্য আছে?"

"করদ রাজ্য ওড়িশায় কেন, কোথাওই নেই। সমস্ত প্রিন্সলি স্টেটই এখন অ্যাবোলিশড হয়ে গেছে। তবে ওড়িশা আর বিহারে যত সংখ্যক করদ রাজ্য ছিল, এত সংখ্যক করদ রাজ্য খুব কম জায়গাতেই ছিল। নিনিকুমারীও তো এরকমই এক রাজ্যের ছোট রাজকুমারী ছিল। তোরা ভুলে গেছিস?"

ভটকাই বলল, "না না, ভুলব না। সেই তখনই তো আমি তোমাদের দলে ভিড়ি। সেই প্রথমবার।"

আমি বললাম, "সে কি আমিও কখনও ভুলি? খাল কেটে কুমির এনেছিলাম! মি. খাইখাইকে আনাটাই ভুল।"

ভটকাই বলল, "হ্যাঁ, বদনাম আমার করিস, আর খাস তো বেশি তুই!"

ঋজুদা একটু বিরক্ত হয়েই বলল, "তোদের এই পুরনো পাঁচালি রাখ। খাই তো আমিও। সত্যিই, শুধু ভটকাইকে কেন দোষ দিস?"

আমি বললাম, "অম্বিকাবাবু সম্পর্কে আরও কিছু বলো! ব্যাপারটা খুলেই বলো আমাদের।"

ঋজুদা বলল, "অম্বিকার এক ম্যানেজার ছিল। তার নাম রামডাকুয়া। সে-ই পুরো জাঙ্গল অপারেশনটা দেখত। বলতে গেলে সে একাই পুরো কাঠের ব্যবসাটা সামলাত। অম্বিকার কাঠের ব্যবসা ছাড়াও যেমন সিভিল কনস্ট্রাকশন, পেট্রোল পাম্পের চেন, রেফ্রিজারেটরের কারখানা, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

"তারপর?"

"অম্বিকার সেই ম্যানেজার রামডাকুয়া দিনসাতেক আগে মারা গেছে বিড়িগড়ের জঙ্গলে। বিড়িগড় হল দশপাল্লা জেলার মধ্যে খুব উঁচু পাহাড়ের ওপরে একটি ছোট্ট জনপদ। এখানে খন্দ আদিবাসীদের বাস।"

"খন্দরা তো খন্দমালে থাকে!"

"হ্যাঁ, তা তো বটেই! কিন্তু খন্দমাল তো একটি পাহাড় নয়! অনেক পাহাড়ের সমষ্টির নাম হল খন্দমাল।"

"তারপর?"

"রামডাকুয়া মারা গেছে সাপের কামড়ে। কিন্তু বিড়িগড়ের মানুষদের নাকি সন্দেহ— রামডাকুয়াকে খুন করা হয়েছে। সেই সন্দেহটা এতই জোরালো হয়েছে যে সেখানে অম্বিকার ব্যবসা প্রায় বন্ধ হওয়ার জোগাড়। আদিবাসীরা সন্দেহ করছে যে রামডাকুয়াকে অম্বিকাই খুন করিয়েছে।"

"খুনের মোটিভটা কী? রামডাকুয়াই যখন তার এত বড় ব্যবসা একা হাতে সামলে নিত, তখন তাকে মারার পেছনে অম্বিকাবাবুর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে!"

"এই কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু স্থানীয় মানুষদের সাহায্য ছাড়া বিড়িগড়ের মতো উঁচু পাহাড়ি জায়গায় অগণ্য বড়বড় গাছ কাটা, তাদের পাহাড় থেকে নামিয়ে এনে কটক অবধি পৌঁছনো অসাধ্য। যা শুনলাম অম্বিকার মুখে, এই বিড়িগড়ে কাজ করতে গেলে বহু লক্ষ টাকার ইনভেস্টমেন্ট প্রয়োজন। হাতিদের চলা রাস্তা দেখে সেভাবে পাহাড়ের ওপরে ওঠার খাড়া রাস্তা বানিয়ে সে সব কাঠ পাহাড় থেকে নামাতে হয়। যদিও জঙ্গলের নিলাম হয় প্রতি বছর, এবং এক বছরেরই জন্য, প্রতি জঙ্গলেই বহু লক্ষ টাকার লগ্নি করতে হয়। মুনাফাও হয় কোটি টাকার মতো। সে জন্যই অম্বিকার মতো আরও অনেক বড় কাঠের ব্যবসায়ী এ ব্যবসায় লেগে আছেন।"

"কাঠের ব্যবসার ইতিবৃত্ত জেনে আমরা কী করব? আমাদের কী করতে হবে তাই বলো। আর তুমিই বা কী করতে সেখানে যাবে!"

"না, কাঠের ব্যবসার ইতিবৃত্তে আমারও কোনো ইন্টারেস্ট নেই। যেহেতু আদিবাসীরা প্রায় বিদ্রোহ করার মতো অবস্থা করেছে সেখানে এবং রামডাকুয়ার অবর্তমানে সেখানে

অম্বিকার ব্যবসা চালানোই মুশকিল হয়ে পড়েছে। অথচ লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠ বর্ষার আগে পাহাড় থেকে নামিয়ে নিয়ে আসতে না পারলে অম্বিকার সমূহ ক্ষতি। তাছাড়া বদনামও তো বটে।"

"বদনাম কেন?"

"রামডাকুয়ার মৃত্যুর পেছনে অম্বিকার হাত আছে— এমন কথা উঠছে বলেই বদনামের আশঙ্কা। শুধু বদনামই নয়, এই অভিযোগ হাওয়া পেলে অম্বিকার বিরুদ্ধে মার্ডার কেস অবধি হতে পারে। অম্বিকার জেল বা ফাঁসি হতেই পারে। সেক্ষেত্রে তার এত বড় সাম্রাজ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে।"

"তা ঠিক। তা, এই অম্বিকা পানিগ্রাহী তোমাকে ডাকছে কেন?"

"আমায় ডাকছে কারণ গোয়েন্দা হিসেবে তোদের কল্যাণে আমার তো কিছু নামডাক হয়েছে! কলকাতা থেকে আমাকে নিয়ে গিয়ে তদন্ত করিয়ে রামডাকুয়াকে যে অম্বিকা খুন করেনি— এই সার্টিফিকেট যদি ও আমার থেকে জোগাড় করতে পারে, তবে পুলিশ আর এই ব্যাপারটাকে বাড়তে দেবে না। সব অনুযোগ, অভিযোগ চাপা পড়ে যাবে। এই জন্যই এত বছর পরে অম্বিকা আমার শরণাপন্ন হয়েছে।"

"তুমি কি রাজি হয়েছ যেতে? এখনও তোমার শরীর কিন্তু পুরোপুরি ভালো হয়নি!"

"এ তো আর জঙ্গলে কোনো অভিযান নয়! একটা মৃত্যুরহস্যের কিনারা করা মাত্র। আর অম্বিকা আমার জঙ্গলের বন্ধু, ও বিপদে পড়ে আমাকে তলব করলে ওকে বিমুখ করি কী করে! ফর ওল্ড টাইম'স সেক।"

"তাহলে যাবেই ঠিক করেছ?"

"হ্যাঁ। সেরকমই তো মনস্থির করেছি। তিতির ফিরবে কবে?"

"মাসদুয়েক আগেই তো ওর বরের কাছে ফিরে গেছিল নিউজার্সিতে। গেল হপ্তায় ফোনে কথা হয়েছে ওর সাথে। আগামী চার-পাঁচ মাসের আগে ফিরবে না।"

"তাহলে তো তিতিরকে বাদই দিতে হবে। দেখ, ক্যালেন্ডার দেখ। আগামী সপ্তাহে তোদের কবে সুবিধা। আমরা পুরী এক্সপ্রেস ধরে রাতে যাব, একদম ভোরে কটকে নামব। তারপর তো অম্বিকার অতিথি। তোরা তারিখ বললে সেই মতো আমি অম্বিকার এখানকার এজেন্টকে বলে দেব। সে আমাদের ফার্স্ট ক্লাস এসি টিকিট পৌঁছে দেবে। বিড়িগড়ে কিন্তু ঠান্ডা হবে। অক্টোবরেই ভালো ঠান্ডা থাকবে। সেই মতো গরম জামাকাপড় নিস।"

ভটকাই বলল, "আর যন্তর-টন্তর?"

"তুই তোর পিস্তলটা নিয়ে নিস, আমি আমারটা নিয়ে নেব। তাহলেই হবে। তাহলে তারিখটা বল জলদি!"

আমরা দু'জন ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে বললাম, "শুক্রবার রাতে যদি যাই?"

"বেশ তো, আমার কোনো অসুবিধে নেই।"

ভটকাই বলল, "যদি ট্রেনের টিকিট না পাওয়া যায়?"

"সে দায়িত্ব অম্বিকার। ট্রেনের টিকিট না পেলে প্লেনের টিকিট করে দেবে। আমরা ভুবনেশ্বরে গিয়ে নামব। ভালোই হবে। ওখানকার ওবেরয় ভুবনেশ্বর চমৎকার হোটেল। সেখানে ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ খেয়ে আমরা রওনা দেব বিড়িগড়ের দিকে। আর কটকে নামলে কি অম্বিকা আর ছাড়বে? ওর বাড়িতে একবার যেতেই হবে। সেখানেই চান-টান করে, খাওয়া-দাওয়া সেরে গাড়ি নিয়ে বেরোব। সেসব নিয়ে আমাদের ভাবার দরকার নেই। যার মাথাব্যথা, সেই বুঝবে। তবে তোরা কাল বিকেলে একবার ফোন করে জেনে নিস যে আমরা ট্রেনে যাচ্ছি না প্লেনে। প্লেনে গেলে শনিবার সকালে যাব। ভুবনেশ্বর হয়ে যে প্লেনগুলো ভাইজ্যাগ যায়, সেই প্লেনে যেতে হবে। আর ট্রেন হলে তো আগেই বলেছি, রাতের বেলা পুরী এক্সপ্রেস।"

ভটকাই চেঁচিয়ে বলল, "কী গো গদাধরদা, তুমি কি আমাদের ভুলেই গেলে!"

গদাধরদা ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলল, "ভুলি নাই গো, আসতিচি। এই প্যাটিসগুলো একটু গরম কইরে নে আসতিচি। একটু সউর ধরো। এই এলেম বইলে।"

একটু পরেই গদাধরদা ট্রে-তে করে প্যাটিস, প্যাস্ট্রি আর লেমন টার্ট নিয়ে এসে বলল, "এগুলো সাবড়ে দাও, তারপর চা আনব।"

ঋজুদা বলল, "আমাকেও দেবে তো একটা?"

গদাধরদা বলল, "একটা কেন, ঢের আছে তো! যতগুনো ইচ্ছে খান। আপনারা খাবেন বলেই তো কেলাব এত যত্ন কইরে বাইনেছে।"

তিনটে প্লেট, ন্যাপকিন, কাঁটাচামচ আর জলের গ্লাস দিয়ে গদাধরদা ভেতরে চলে গেল। ভটকাই ঋজুদার জন্য প্লেটে কয়েকটা করে প্যাস্ট্রি, প্যাটিস, আর টার্ট তুলে দিতে ঋজুদা বলল, "আমি কি রাক্ষস নাকি তোদের মতো ছেলেমানুষ? কমিয়ে দে কমিয়ে দে! একটা করে দে।"

ভটকাই অতিরিক্ত খাবার নামিয়ে নিল।

একটু পরে গদাধরদা ট্রে-তে করে চায়ের পট, আর পেয়ালা-পিরিচ নিয়ে এল।

ভটকাই বলল, "এই ক্রকারি কি হিটকারি কোম্পানির?"

"না রে। এগুলো জাপানিজ। হাজিমিসো টোকিও থেকে পাঠিয়েছে আমার জন্মদিনে।"

চা-টা খাওয়া শেষ হয়ে ঋজুদা বলল, "তোরা এবার পালা। আমার একটা ফোন আসবে অস্ট্রেলিয়া থেকে। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে হবে। কাল মনে করে বিকেলে আমায় একবার ফোন করবি। আমি বলে দেব কীসে যাওয়া হচ্ছে— ট্রেনে না প্লেনে। ট্রেনে হলে শুক্রবার রাত, প্লেনে হলে শনিবার সকাল— মনে থাকে যেন। লটবহর বেশি নিবি না সঙ্গে। রুদ্র, বাইনোকুলারটা নিতে ভুলিস না।"

ভটকাই বলল, "আমি ক্যামেরা নেব তো?"

"সে তোর খুশি। বিড়িগড়ে একবার গেছিলাম অনেক বছর আগে। সেখানে প্রচুর স্বাস্থ্যবান হনুমান ছিল। ভটকাইয়ের যদি সেই দলে কোনো ক্লাসফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাহলে তুই ছবি তুলে আনতে পারিস।"

আমরা উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "আমরা তাহলে আজ যাই ঋজুদা?"

"যাই নয়, বলো আসি।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমরা পুরী এক্সপ্রেসেই শেষমেষ গেলাম। কটক স্টেশনে যখন ট্রেনটা পৌঁছল, তখন সবে ভোর হয়েছে। ঠান্ডা ভালোই আছে। ট্রেনের সামনে এক সুদর্শন, দীর্ঘাকৃতি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঋজুদাকে দেখেই বললেন, "এসো এসো ঋজু বোস, তুমি এখন মস্ত বড় গোয়েন্দা, এদিকে আসা তো ছেড়েই দিয়েছ। তাও আমার অনুরোধে তো দয়া করে এলে! আমার সৌভাগ্য।"

ঋজুদা বলল, "তুমি তো সাহেব হয়ে গেছ হে অম্বিকা!"

"কেন, সাহেব কেন?"

"হাবভাব, হ্যান্ডশেক করার ধরণ, এ সবই তো সাহেবের মতো হয়ে গেছে।"

অম্বিকাবাবুর সঙ্গে দু'জন উর্দিধারী লোক ছিল, তারাই আমাদের মালপত্র তুলে নিল। আমরা প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে দেখলাম একটি কালোরঙা বড় মার্সিডিজ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তার পেছনে একটি মাহিন্দ্রার জিপ। মালপত্র নিয়ে তারা সেই জিপে উঠল। আর আমরা অম্বিকাবাবুর সঙ্গে এসে তাঁর মার্সিডিজে উঠলাম। সামনে বাঁদিকের দরজাটি ঋজুদার জন্য খুলে দিয়ে, আর আমাদের পেছনে বসতে বলে উনি নিজে ড্রাইভিং সিটে বসলেন। ভটকাই মুখটা প্রায় আমার কানের কাছে এনে বলল, "বড় হলে আমিও এরকম একটা মার্সিডিজ কিনব।"

আমি চাপা গলায় বললাম, "চুপ কর।"

কিছুক্ষণ পরেই আমরা রাস্তায় এসে পড়লাম। চওড়া রাস্তা। ঋজুদা বলল, "তোরা কি পুজো-টুজো দিবি নাকি? এখানকার কটকচণ্ডী খুব জাগ্রত। মা দুর্গার অপর রূপ হল কটকচণ্ডী। সেই কটকচণ্ডী মন্দিরের পাশেই কলকাতার মৃগাঙ্কমোহন সুরের ছোটভাই রায়সাহেব নরেন্দ্রনাথ সুরের বাড়ি। তাদের আরও এক ছোট ভাই আছে। তার নাম ধীরেন্দ্রনাথ সুর। নরেন্দ্রনাথ আর ধীরেন্দ্রনাথ— দু'জনেই কটকের বাসিন্দা। নামি ঠিকাদার।"

অম্বিকাবাবু বললেন, "ভুবনেশ্বর শহরের অনেকখানিই এঁদের বানানো। তাছাড়া এঁদের জঙ্গলের কাজও ছিল।"

ঋজুদা বলল, "নিলামে ডাকা ওদের বিভিন্ন জঙ্গলেই তো একসময় জ্যেঠুমণির সঙ্গে শিকারে আসতাম আমরা। ওরা অঙ্গুল ডিভিশনের জঙ্গলই প্রতি বছর নিলামে ডাকতেন। সে সব জঙ্গলে নিজেদের রাস্তা বানিয়ে ক্যাম্প করে কাঠ কাটার কাজ করতেন। তাই না, অম্বিকা?"

"নিশ্চয়ই। আমি তো দু'দিনের চিড়িয়া। এরাই আমাদের পথিকৃৎ।"

ঋজুদা আমাদের দিকে ফিরে বলল, "জানিস তো, অম্বিকা র‍্যাভেনশ কলেজের ছাত্র! এই কলেজেই নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস পড়তেন, তাছাড়া পড়তেন অন্নদাশঙ্কর রায়। এঁরা দু'জনেই পরে আইসিএস হয়েছিলেন। তবে আইসিএস পরিচয়টা এঁদের দু'জনের জীবনেই পরে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছিল। তোরা যদি কখনও মহানদী পেরিয়ে টিকরপাড়ার দিকে যাস, তবে পথে পড়বে ঢেঙ্কানল। এই ঢেঙ্কানলের সদর রাস্তার উপরেই অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছোট্ট বাড়ি। জানি না এখনও সে বাড়ি আছে কি না। আর নেতাজির বাবা জানকীনাথ বোসের বাড়ি কোথায় তা অবশ্য আমি জানি না।"

বজ্রকপাটি রোডে ঢুকে দূর থেকেই অম্বিকাবাবুর প্রাসাদোপম বাড়িটি চোখে পড়ল। অম্বিকাবাবু বললেন, "এই আমার পর্ণকুটির।"

ঋজুদা বলল, "পর্ণকুটিরই বটে! এ তো রাজবাড়িকেও হার মানায়। আচ্ছা, বজ্রকপাটি মানে কী? ইনকাম ট্যাক্স অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালের মেম্বার এস. এন. রোথো সাহেবের বাড়ি ছিল এই রাস্তাতে। খুব সজ্জন মানুষ। ওঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বজ্রকপাটি মানে কী? উনি বলেছিলেন জেনে বলবেন। তা, তোমার কি জানা আছে অম্বিকা?"

"আমি কোনোদিন এই নিয়ে ভাবনাচিন্তা করিনি। তবে বজ্রের মতো কপাটওয়ালা কোনো বাড়ি থেকে থাকবে হয়তো এখানে। তাই হয়তো নাম হয়েছে বজ্রকপাটি।"

বাড়ির বিরাট গেট দিয়ে গাড়ি ভেতরে ঢুকল। গেটে দু'জন সিকিউরিটি গার্ড। ড্রাইভওয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পোর্টিকোর নীচে গাড়ি দাঁড়াল। পেছনের জিপ থেকে একজন উর্দিধারী নেমে দৌড়ে এসে অম্বিকার হাত থেকে গাড়ির চাবিটি নিল। বুঝলাম, সে এই গাড়ির ড্রাইভার। বসবার ঘরের দরজাটি খুলে এক সুন্দর ফিগারের সুন্দরী মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর কোমরের রুপোর চাবির রিং গোঁজা, তাতে চাবির গোছা রাখা আছে, মাথায় ঘোমটা। নমস্কার করে বললেন, "আসন্তু, আসন্তু।"

অম্বিকাবাবু ঋজুদাকে দেখিয়ে বললেন, "এই আমার বন্ধু ঋজু বোস।" তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমাদের নাম কী ভাই?"

ঋজুদা আমার দিকে দেখিয়ে বললেন, "এর নাম রুদ্র রায়", তারপর ভটকাইয়ের দিকে দেখিয়ে বললেন, "আর এ হল শুধু ভটকাই। এর পাসওয়ার্ড হল 'ভটকাই ভটকাই, আয় তোকে চটকাই।'"

রূপবতী হেসে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। দোতলায় উঠে ঋজুদার জন্য একটি ঘর ও আমাদের জন্য

একটি ঘর দেখিয়ে বললেন, "আপনারা ফ্রেশ হয়ে নিন। ব্রেকফাস্ট লাগিয়ে দিচ্ছি। আপনারা দয়া করে ডাইনিং রুমে আসুন।"

ঋজুদা অম্বিকাবাবুকে বলল, "ছেলেরা তো দুজনেই বাইরে। তোমার মেয়ে নেই অম্বিকা?"

"না ভাই, আমার মেয়ে নেই।"

রূপবতী ঋজুদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কি কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট খাবেন, না দিশি ব্রেকফাস্ট খাবেন?"

পেছন থেকে অসভ্যের মতো ভটকাই বলে উঠল, "যা দেবেন, তাই খাব।"

এই অসভ্যতার জন্য ঋজুদা চোখ দিয়ে নীরবে ভটকাইকে ধমকাল। তারপর আমরা দু'জন এক ঘরে ঢুকে গেলাম, আর ঋজুদা গেল অন্য ঘরে। বাথরুমে ঢুকে আমাদের চক্ষুস্থির। এতদিন জাকুজির নাম শুনেছিলাম। বিদের নামও শুনেছিলাম। বাথরুমে দেখলাম সে সবই আছে। বিদের পাশেই কমোড।

ভটকাই বলল, "এ কী বিপদে পড়লাম রে রুদ্র! কমোডের উপরে এত ফুল! এই পরিবেশে তো আমার আটকে যাবে!"

"ছ্যাবলামি করিস না।"

"কমোডের পাশে ওটা কী রে? কমোডের মতো দেখতে, কিন্তু কমোড নয়!"

"একে বলে বিদে। তুই তো অনেক কিছু জানিস না! এবার শেখ। বিদে একটা ফরাসি শব্দ। এই বিদে মেয়েদের ব্যবহারের জন্য। তুই আবার এর মধ্যে হিসি-টিসি করিস না!"

"আরে হিসু করব কী! কাণ্ড দেখে তো আমার হিসু বেরোবেই না! আর এই সব জাকুজিতে চান করতেই তো পারব না!"

"পাশে তো একটা ছোট শাওয়ারের চেম্বার আছে। ওখানে চান কর!"

"তাই করব। তুই আগে করে নে! তারপর আমি যাব।"

"ঠিক আছে। তাই হবে।"

আমরা তৈরি হতে হতেই ঋজুদা আমাদের ঘরে এসে বলল, "কী? রেডি? তাহলে চল।"

ডাইনিংরুমটা বিশাল বড়। চন্দনকাঠের টেবিল। তাতে প্লেটে কর্নফ্লেক্স, পাশে গরম দুধের জার, টেবিলে নানারকমের ফল সাজানো আছে।

রূপবতীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন অ্যাটেন্ডেন্টের একজন বলল, "স্যার, আপনারা কি ব্রাউন ব্রেড খাবেন, না হোয়াইট ব্রেড?"

ভটকাই আবার নির্লজ্জের মতো বলল, "যা দেবেন তাই খাব।"

টেবিলে অ্যাপ্রিকট জ্যাম, পাইনআপেল জ্যামের শিশি, কাঁচের আলাদা আলাদা পাত্রে মাখন, চিজ রাখা আছে।

একজন অ্যাটেন্ডেন্ট প্রশ্ন করল, "ডিম কী খাবেন?"

ভটকাই একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল, "ডিম কী খাব মানে?"

ঋজুদা বলল, "গাধা, অমলেট খাবি, না স্ক্র্যাম্বলড এগ খাবি, না পোচ খাবি; পোচ খেলে কী পোচ, ওয়াটার পোচ, নাকি অয়েল পোচ— তা বলবি তো?"

ভটকাই অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "তুমি যা খাবে, আমি তাই খাব।"

অ্যাটেন্ডেন্ট আবার প্রশ্ন করল, "স্যার, হ্যাম খাবেন না সালামি খাবেন, নাকি বেকন খাবেন?"

আর একজন অ্যাটেন্ডেন্ট বলল, "চিলি পর্ক খাবেন কি স্যার?"

ঋজুদা অম্বিকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, "কী হে, তোমার মতলবটা কী? আমাদের কি খাইয়েই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটাতে চাও? আমাদের এখানেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে গেলে যে কাজে এসেছি সে কাজ হবে কী করে?"

অম্বিকাবাবু কপট রাগের সুরে বললেন, "বাজে কথা বোলো না তো! আমার বাড়িতে পদধূলি দিলে, সামান্য একটু অতিথিসেবাও করব না!"

তিনটি আলাদা জামবাটিতে করে একটায় সাদা রাজভোগ, একটায় কালো পান্তুয়া, আর অন্যটায় পোড়পিঠা রাখা। পোড়পিঠার দিকে দেখিয়ে ভটকাই গলা নামিয়ে বলল, "অচেনা বস্তু খাওয়া কি ঠিক হবে?"

আমি বললাম, "অচেনা আবার কী? এদের নাম হল পোড়পিঠা, বা ছানাপোড়া।"

আমাদের সকলের কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে বেয়ারারা একটার পর একটা পদ আনতে লাগল, আমরা খেতে লাগলাম। অম্বিকাবাবু আমাদের সঙ্গে বসলেও ওঁর স্ত্রী বসলেন না। তিনি বললেন, "সবাই একসাথে বসলে কী করে হবে! আপনার আগে খেয়ে নিন! আপনাদের খাওয়া দেখি। আমি পরে বসব।"

ঋজুদা বলল, "আপনি হোস্টেস, আপনি যা বলবেন, তাই হবে।"

আমাদের খাওয়া শেষ হতেই একজন বেয়ারা বলল, "স্যার আপনারা চা খাবেন, কফি খাবেন, ওভালটিন খাবেন, নাকি ড্রিঙ্কিং চকলেট খাবেন?"

আমরা "চা" বলতে সে আবার প্রশ্ন করল, "চা কি গ্রীন টি খাবেন?"

আমরা যার যার পছন্দ অনুযায়ী অর্ডার দিলাম।

ঋজুদা বলল, "খাওয়া-দাওয়া তো হল। তুমি তো দেখছি বিশ্বাস করো, দ্য অনলি ওয়ে টু দ্য হার্ট ইজ থ্রু দ্য স্টম্যাক।"

অম্বিকাবাবু বললেন, "কী যে বলো! চলো, তোমার ঘরে গিয়ে যে কাজে আসা, সে ব্যাপারে তোমায় একটু ব্রিফ করি।"

ঋজুদা বলল, "হ্যাঁ। আমি তাই ভাবছিলাম। যে কাজে আসা, সে কাজটাই তো হল না! আমরা ক"টায় বেরোব এখান থেকে?"

"আর ঘন্টাখানেকের মধ্যে বেরোতে পারো! তবে আমি যাব না সঙ্গে।"

"কেন?"

"ওখানে আমার বিরুদ্ধে প্রচুর বিদ্বেষ জমে আছে। এমনকি, আমার প্রাণসংশয়ও হতে পারে। কাজেই, আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না। তবে তোমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। তোমরা আমার ইম্পোর্টেড তাঁবুতে থাকবে, আমার বাবুর্চি, বেয়ারা— সব ওখানে আছে। আমার জিপ এবং ড্রাইভারই তোমরা নিয়ে যাবে। ওখানকার খবরাখবর এবং পালস সম্বন্ধেও তোমরা সহজে জানতে পারবে দুর্গা মোহান্তির কাছ থেকে।"

"কোন দুর্গা?"

"আরে, তুমি তো তাকে খুব ভালো করেই চেনো! নরেনবাবুদের মুহুরী ছিল সে আগে। সেখান থেকে রিটায়ার করার পরে আমি ওকে ডেকে নিয়ে এসেছি।"

"সেই দুর্গা! তার তো এখন অনেক বয়স হয়েছে নিশ্চয়ই!"

"তা হয়েছে, তবে বেশ কর্মঠ আছে।"

বিশ্রামের জন্য ঋজুদাকে যে ঘরটি দেওয়া হয়েছিল, সেই ঘরে পৌঁছে আমরা বসলাম। ঋজুদা অম্বিকাবাবুকে বললেন, "এই রামডাকুয়া ছেলেটি সম্পর্কে কিছু বলো।"

"রামডাকুয়ার বাড়ি নোয়াগড়ে। নোয়াগড় একসময়ে বেশ বড় করদ রাজ্য ছিল। ওরা জাতে নাপিত। নোয়াগড় বাজারে রামডাকুয়ার বাবার এখনও চুলদাড়ি কাটার একটা ছোট দোকান আছে।"

"কদ্দুর পড়াশোনা এই রামডাকুয়ার?"

"ও অষ্টম ফেল।"

ভটকাই বলল, "অষ্টম ফেল মানে?"

ঋজুদা বলল, "অম্বিকাকে ইন্টারাপ্ট করিস না! ওকে বলতে দে। অষ্টম ফেল মানে ক্লাস এইটের পরীক্ষায় ফেল করেছিল।"

ভটকাই বলল, "তবে তো পণ্ডিত!"

ঋজুদা বলল, "তুমি বলো অম্বিকা।"

"অষ্টম ফেল হলে কী হয়, রামডাকুয়া ছেলেটা ছিল খুব বুদ্ধিমান এবং ওর মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। তবে ওর মধ্যে একটু নকশাল নকশাল ভাবও ছিল। তুমি মধ্যপ্রদেশের ডেলিরাজহারার রুনু গুহ নিয়োগীর নাম শুনেছ তো? সেও কয়লাখাদানের শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিয়ে নেতা হয়েছিল, এবং সেই কারণেই পরে তাকে মরতেও হয়েছিল। রামডাকুয়ার মধ্যে একটা "ডোন্ট কেয়ার" ভাব ছিল। বিশেষ করে আমার বিরুদ্ধে ও করাতিদের উসকোত। তাদের মজুরি বৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে গুজগুজ ফুসফুস করত। রামডাকুয়াকেই ওরা ওদের অঘোষিত নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছিল। ওর প্রতাপ ক্রমশই বাড়ছিল। শুধু বিড়িগড়ের মানুষদের মধ্যেই নয়, অন্যান্য জঙ্গলে আমাদের যেসব কাঠের ঠিকাদারি ছিল, সেই সব জায়গার মানুষদেরও ও সংগঠিত করে আমার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের মতো আবহ সৃষ্টি করছিল।"

"রামডাকুয়াই তো দেখছি তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু। তাহলে ওকে মারল কে? মারলে তো তোমারই মারার কথা।"

অম্বিকাবাবু হেসে বললেন, "সেটা ঠিক, কিন্তু আমি ব্যবসাদার মানুষ। ওই সব ট্যাক্টিক্যাল ভুল আমি কখনোই করতে যেতাম না। ওরকম ভুল গাধারাই করে। আসলে বিড়িগড় বস্তিতে একটি টেঁটিয়া ছেলে ছিল। তার নাম মুরলি প্রধান। সেই ছেলেটি রামডাকুয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছিল ক্রমশ। রাম তো ছিল বহিরাগত। বহুদূরের নোয়াগড়ের মানুষ। আর মুরলি ছিল ওদেরই একজন। ওর অনুগামীও কম ছিল না। আমার মনে হয় করাতিদের দলের নেতৃত্ব দেওয়ার এক প্রতিযোগিতা চলছিল। তাই, রামকে মারলে ও-ই মারতে পারে।"

"তোমার লেবার ফোর্সে সবাই-ই কি বিড়িগড়ের খন্দ ছিল!"

"না না। বিড়িগড় তো ছোট একটা গ্রাম মাত্র। কিন্তু ওদের মধ্যে মিলমিশও ছিল। আমাকে অন্যান্য জায়গা, যেমন ঢেঙ্কানল, হিন্দোল, এসব জায়গা থেকেও লেবার আনতে হয়েছিল। সংখ্যায় খন্দের চেয়ে তারাই ভারী ছিল।"

ঋজুদা বলল, "অ। তা এই মার্ডারটা হল কীভাবে? ওকে কি কুড়ুল দিয়েই খুন করল, নাকি বন্দুক দিয়ে গুলি করল, নাকি বিষ খাইয়ে মারল?"

"এসব কিছুতেই ওর মৃত্যু হয়নি। তোমায় তো আগেই বলেছি, ওর মৃত্যু হয়েছিল সাপের কামড়ে।"

"কী সাপ? কখন কামড়াল?"

"কান্বখুন্টা।"

ভটকাই বলল, "এ আবার কীরকম নাম?"

"চুপ করে শোন, কথার মধ্যে কথা বলবি না। কান্বখুন্টা এই পাহাড়ি অঞ্চলের একপ্রকার সাপ। কান্বখুন্টা মানে হল কানখুঁচনি।"

অম্বিকাবাবু বললেন, "তুমি এই সাপ দেখেছ কখনও?"

"আমি একবারই দেখেছি।"

"কোথায়?"

"আমরা সেবারে শিকারের ক্যাম্প করে রয়েছি উরুনাকোটে বিমল ঘোষের তৈলাতে। কোনো বাংলোয় সেই শীতে আমরা জায়গা পাইনি।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তৈলা কী জিনিস?"

ঋজুদা বলল, "জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গল কেটে যে ফার্মিং করা হয়, তাকেই উড়িয়া ভাষায় তৈলা বলে। বিমল ঘোষ ছিলেন সুরবাবুদের কাঠের কাজের ম্যানেজার। তার বাড়ি ছিল অঙ্গুল শহরের এক প্রান্তে শিমলিপদাতে। সেবার খুব শীত। আমি আর চাঁদুবাবু—"

"কোন চাঁদুবাবু?"

"আরে চাঁদু দে! সম্বলপুরের কাছে বামরা রাজ্যের দেওয়ান অমলবল্লভ দে-র বড় ছেলে। চাঁদুবাবুদের কটকের বাড়ি ছিল কাঠজুরি নদীর পাশে বাখরাবাদে। চাঁদুবাবু খুব সাহসী শিকারি ছিলেন। শুধু শিকারিই নন, উনি ছিলেন একজন ন্যাচারালিস্ট। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তেমন ছিল না। তবে প্রচুর পড়াশোনা করতেন। বনজঙ্গল, বন্যপ্রাণী, বন্য আদিবাসী সম্পর্কে খুবই আগ্রহ ছিল তাঁর। তাছাড়া তুমি শুনলে অবাক হবে অম্বিকা, এই চাঁদুবাবুই কটক থেকে আমাকে চিঠি লিখে জানান: একটা বই পড়লাম। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের জীবনী। আমেরিকান জীবনীকার প্রফেসর কার্লোস বেকারের লেখা। সেই সূত্র থেকেই বইটা জোগাড় করেছিলাম। এমন অসাধারণ জীবনী খুব কমই পড়েছি। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের ওপরে আরও অনেকের লেখা আছে। যেমন, এ ই হচনারের পাপা হেমিংওয়ে, কিন্তু সেসব কোনো বই-ই বেকার সাহেবের বইয়ের মতো নয়। এই বইটা লেখার জন্য বেকারসাহেব প্রায় তিন-চারশো লোককে ইন্টারভিউ করেছিলেন।"

ভটকাই বলে উঠল, "তুমি চাঁদুবাবুর কথা বলতে গিয়ে তো সারা পৃথিবীর কথা এনে ফেললে!"

"সরি, সরি ভটকাই। তুমি বলো অম্বিকা।"

অম্বিকাবাবু বললেন, "আমি আবার কী বলব? তুমিই তো বলছিলে!"

"হ্যাঁ। তো আমরা একদিন বোষ্টমনালাতে চান করে তৈলার দিকে হেঁটে আসছিলাম। দু'পাশে বাঁশঝাড়। এমন সময় রাস্তায় দেখলাম শুকনো খড়ের মতো কী একটা পড়ে আছে। পা-টা ওর ওপর ফেলতে গেছি, এমন সময় চাঁদুবাবু আমাকে সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'সর্বনাশ! এ যে সাংঘাতিক সাপ!' তারপর চাঁদুবাবু একটা বাঁশের কঞ্চি কুড়িয়ে নিয়ে তা দিয়ে খড়টায় মারতেই একটা আধইঞ্চি চওড়া সাপ হয়ে লেজের ওপর ভর দিয়ে ফনা তুলে দাঁড়াল। চাঁদুবাবু কঞ্চিটা দিয়ে সাপটাকে বাঁশঝাড়ে ফেলে দিলেন। তখন এই সাপের নাম জেনেছিলাম— কান্বখুন্টা। সেই একবারই দেখা। তা, এই জাতের সাপই কি রামডাকুয়াকে ঘুমের মধ্যে কামড়েছিল?"

"তাই তো শুনেছি। ঘুমের মধ্যেই কানের মধ্যে ঢুকে গিয়ে কামড়েছিল।"
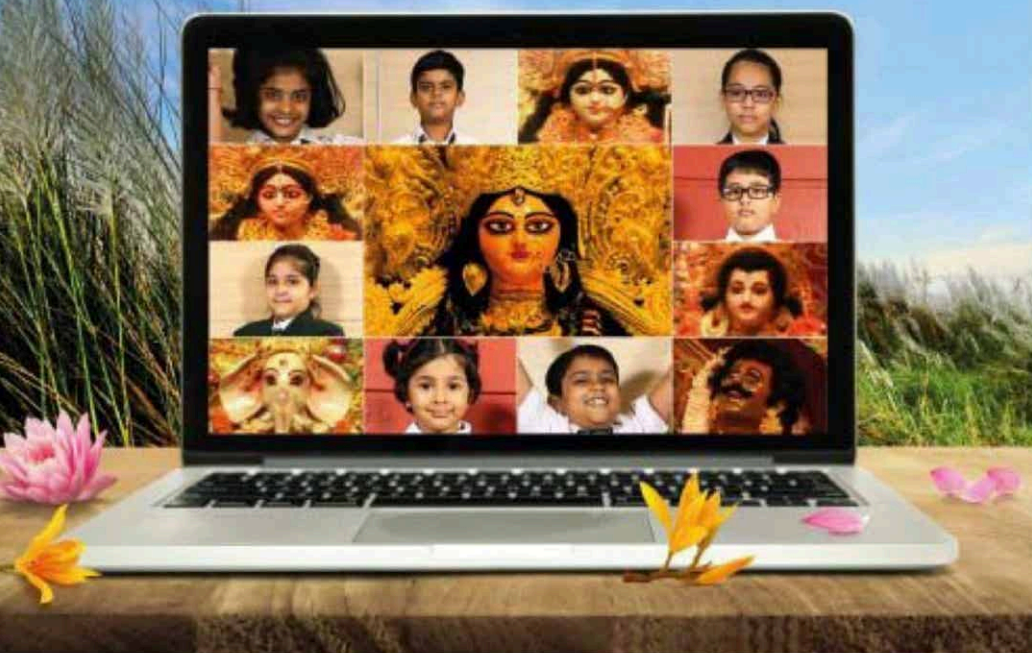
ঋজুদা স্বগতোক্তি করল, "আই সি।"

"এই হল ব্যাপার। সংক্ষেপে বললাম। আমার এই রামডাকুয়ার ইমপার্টিনেন্স একেবারে অসহ্য লাগত। বয়সও বেশি ছিল না। ত্রিশ মতো হবে। ঔদ্ধত্যের সীমা ছিল না। আর তুমি তো জানো, আমি এসব টলারেট করিনি কোনোদিন।"

"বুঝলাম।"

ঋজুদা বলল বটে, তবে কী যে বুঝল, সেটা আমরা আর বুঝলাম না।

অম্বিকাবাবু বললেন, "রাস্তায় তো ভালো খাবারের দোকান নেই! কিছু চিকেন স্যান্ডউইচ আর ফল প্যাক করে দিই! তোমরা কোথাও কফি খেয়ে নিও!"

"একদম নয়। তোমার এই সেভেন স্টার হোটেলের কাণ্ডকারখানা দেখে আমাদের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম। দশপাল্লায় ননার দোকান আছে। সেখানে ফার্স্টক্লাস বিরিবড়া আর পোড়পিঠা খেয়ে নেব। সঙ্গে কফি। ওতেই চলবে। আর রাতে তো তোমার তাঁবুতে ম্যাজেস্টিক ডিনার খাবই। বাবুর্চি যখন সেখানে রেখেই দিয়েছ।"

তারপর ঋজুদা ঘড়ি দেখে বলল, "আর দেরি নয়! এবার বেরিয়ে পড়তে হবে। পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে।"

"সে তো হবেই।"

অম্বিকাবাবু একজন বেয়ারাকে ডাকলেন। তারা আমাদের সামান্য মালপত্রগুলো নিয়ে নিল। আমরা নেমে গিয়ে জিপে উঠলাম। জিপ রেডি হয়েই ছিল নীচে। মালপত্র, আমি আর ভটকাই পেছনে বসলাম। ড্রাইভারকে ঋজুদা বলল, "চাবি মতে দিয়ন্তু। তমে যাইকি পিছে বসো।"

অম্বিকাবাবু হাঁ করে বললেন, "কী ঋজু, তুমি চালাবে?"

"হ্যাঁ। কতদিন এসব রাস্তায় জিপ চালাই না! ভালোই লাগবে।"

"ক'দিন পর ফিরবে?"

"আগে তো পৌঁছই! মনে হয় দিন দু'তিন থাকব। কবে ফিরব তোমায় মোবাইলে বলে দেব। তুমি সেই মতো টিকিট কেটে রেখো। কলকাতায় আমার জরুরি কাজ আছে। বেশিদিন থাকা হবে না। নইলে তোমার এই সেভেন স্টার হোটেলে ক'দিন আরাম করে যেতাম।"

অম্বিকাবাবু বিনয় দেখিয়ে বললেন, "কী যে বলো!"

অম্বিকাবাবুর স্ত্রী রূপবতী দেবীও এসে আমাদের নমস্কার করে বিদায় দিলেন। ঋজুদা জিপ স্টার্ট করল।

জিপ স্টার্ট করে পথে পড়েই প্রশ্ন করল, "ভদ্রমহিলাকে কেমন দেখলি?"

"সুন্দরী! কী সৌজন্যবোধ!"

"আর কিছু দেখলি না?"

"আর কী দেখব?"

"দেখলি না, ওর হাসি ঝলমলে মুখের আড়ালে একটা বিষাদ! দোর্দণ্ডপ্রতাপ স্বামীর আড়ালে এক বঞ্চিত, অত্যাচারিত মহিলার মুখ তোদের চোখে পড়ল না।"

"তুমি যা দেখো, সেটা আমরাও দেখতে পেলে তো আমরাই ঋজু বোস হয়ে যেতাম।"

"হুঁ।"

তৃতীয় অধ্যায়

দশপাল্লায় বিকেল বিকেল পৌঁছে ননার দোকানে কাঁচালঙ্কা আর তেঁতুলের চাটনি দিয়ে গরম গরম বিরিবড়া ও পোড়পিঠা আর কফি খেয়ে যখন রওনা হলাম, তখনও সন্ধে নামতে একটু দেরি আছে। টাকরা নামের একটা ছোট্ট গ্রামে পৌঁছে আমরা বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকে একটা কাঁচা রাস্তায় পড়লাম। রাস্তার ডানদিকে একটি পাহাড়ি নদী ভারী সুন্দর নদী— খুব সরু নয়, চওড়াই বলতে গেলে।

ঋজুদা বলল, "এই নালার নাম বুতরং।"

ভটকাই বলল, "এই যে বিড়িগড়ে আমরা যাচ্ছি, এর পটভূমিতে বুদ্ধদেব গুহর একটা উপন্যাস আছে। তার নাম পারিধি। তার নায়কের নাম চন্দ্রকান্ত আর নায়িকা একটি সুন্দরী খন্দ ধাঙ্গুড়ি, নাম চন্দনী। এখানে এক পাগলা হাতির কথা আছে। আর আছে এক পাগল প্রেমিকের কথা। সেই প্রেমিক চন্দনীকেই ভালোবাসত। কিন্তু চন্দনীর সঙ্গে চন্দ্রকান্তর বিয়ে হয়ে যাওয়ায় তার পাগলামি আরও বেড়ে গিয়েছিল। সে চাঁদের রাতে একা একা মালভূমির গভীর জঙ্গলে গান গেয়ে ফিরত।"

"কী গান? তোর মনে আছে?"

"বিলক্ষণ। ওরে মুর সজনী ছাড়ি গল্বা গুণমণি কা কর ধরিবি— এই একই লাইন বারবার গাইত। একদিন রাতে হাতির পায়ের তলায় পিষ্ট হয়েই সেই প্রেমিক পাগলের প্রাণ যাবে।"

"গানের মানে কী হল?"

"মানে হল, ওরে আমার প্রেয়সী, তুই আমায় ছেড়ে চলে গেলি! এখন আমি কার হাতে হাত রাখব!"

ঋজুদা জিপ চালাতে চালাতে বলল, "তুই কি প্রেম-ট্রেম করছিস নাকি ভটকাই?"

"আমি করলেই বা কী! আমার সাথে কে প্রেম করছে! তবে সময় হলেই সব হবে! তাড়া কীসের?"

"বাবা! তুই তো দেখছি খুব জ্ঞানী হয়ে গেছিস!"

"জ্ঞানী না হলে কি তুমি আমায় তোমার চেলা করতে? জ্ঞানহীন কোনো লোকের স্থান নেই তোমার কাছে।"

ঋজুদা হাসল। আমরা নালা বরাবর একটি ছোট্ট গ্রামে এসে পৌঁছলাম। এই রাস্তা দিয়েই একটা জায়গায় যেতে হয়— তার নাম টিটিচিকোরি। এই নামে বুদ্ধদেব গুহর একটা উপন্যাস আছে। সেই উপন্যাসে নায়িকার নাম ইলিশি। ঋজুদা বলল, "এই গ্রামের নাম বুরুসাই। এখান থেকে রাস্তা উঠে গেছে পাহাড়ে।"

তখন সন্ধে নেমে এসেছে। বুরুসাই গ্রামের মাথার উপরে নীলাভ এবং সবুজাভ দ্যুতি ছড়িয়ে সন্ধ্যাতারাটি সবে উঠেছে। জিপের গিয়ার বদলাতে বদলাতে ঋজুদা বলল, "বেশ খাড়া পথ রে!"

ড্রাইভার বলল, "হ বাবু। ই পথ এমিতি খাড়া যে খালি ট্রাক পাহাড়ে উঠিবা পাঁই বড্ড বড্ড পাথর ভর্তি করিকি যান্তি।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তাহলে নামার সময় কী করে?"

"নামার সময় তো কাঠে ভর্তি থাকে। কাঠ আনতেই তো ট্রাক যায়। জানিস, জঙ্গলে যখন রাস্তা বানায়, তখন হাতিদের চলার পথ ধরেই রাস্তা বানায়। হাতিরা খুব বড় ইঞ্জিনিয়ার। সব পাহাড়েরই গ্র্যাডিয়েন্ট সম্পর্কে তাদের জ্ঞান একেবারে টনটনে।

ভটকাই বলল, "পারিধিতেও এসব কথা আছে।"

আমি বললাম, "এই পারিধি শব্দটার মানে কী? তুই পরিধির ভুল বানান বলছিস না তো?"

"আজ্ঞে না। পারিধি একটি খন্দ শব্দ। এর সঙ্গে আমাদের পরিধির কোনো মিল নেই। খন্দ ভাষায় এই শব্দের মানে হল

মৃগয়া।"

"এত সব তুই জানলি কী করে?" ঋজুদা বলল।

"ওই উপন্যাসেই পড়েছি। নাহলে আর জানব কী করে?"

পথটি সত্যিই এত খাড়া যে মাঝে মাঝে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি, সত্তর ডিগ্রি গ্র্যাডিয়েন্ট। এমন সময় দেখা গেল একদল ঘন কালো বিরাটাকৃতি বাইসন তাদের কপালের সাদা লোমের রেখা, আর হাঁটু, আর গোড়ালির সাদা লোমের মোজা পরে দাঁড়িয়ে আছে। জিপটা দাঁড় করাল ঋজুদা এবং একবারের জন্য "পিঁক" করে হর্ন বাজাল।

পেছন থেকে ড্রাইভার বলল, "এ গল্প বহতই ডেঞ্জারাস অছি।"

ঋজুদা বলল, "মু জানিছি। বাইসন যদি জিপে এক গুঁতো মারে, জিপ ছিটকে গিয়ে খাদে পড়ে যাবে। এতই শক্তি এরা ধরে। তাদের বিরাট বিরাট চোখগুলি বড় বড় গোলাকার পান্নার মতো সবুজ হয়ে জিপের হেডলাইটে জ্বলতে লাগল। হেডলাইট না নিভিয়ে জিপ স্টার্ট রেখেই ঋজুদা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর বাইসনরা নিজেরাই ডানদিকের উঁচু জমিতে একে একে উঠে গেল। সব শুদ্ধু প্রায় আট-দশটি বাইসন ছিল। দু'একটি প্রাচীন বাইসনের গায়ে লাল মাটি লেগে থাকায় তাদের লালচে মনে হচ্ছিল।

পাহাড়ের মাথায় চড়তে প্রায় ঘন্টাখানেক লাগল। স্পেশাল গিয়ারেই চড়তে হচ্ছিল। ওপরে উঠে দেখা গেল একটি সমতল মালভূমিতে পৌঁছেছি আমরা। নিবিড় জঙ্গল, চারিদিকে গাছ।

ঋজুদা বলল, "এসব গাছের নাম জানিস?"

"কী? তুমি বলো!"

"টেঁতরা, মিটকুনিয়া, রস্‌সি, শাল, সেগুন, প্রাচীন আম, বহু প্রাচীন তেঁতুল, শিমূল, কনকচাঁপা—ইত্যাদি সব গাছ।"

"এত সব সুন্দর গাছ— এগুলো কেটে ফেলে!"

"সেটাই ট্র্যাজেডি। এসব গাছ বহুমূল্য। গাছ যখন কেটে ফেলে, একটা মহীরুহ যখন হাত-পা ছড়িয়ে আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে, কতশত পাখি, কাঠবিড়ালি, সাপ উদ্বাস্তু হয়ে যায়, তখন তাদের ঘর হারানোর আর্তস্বর বড় ব্যথিত করে। তোরা এমার্সনের সেই কবিতাটা পড়েছিস?

'Bold as the Engineer who fells the wood
Love not the flower they pluck
And all their botany is latin names.'"

"তা হলেই বা কী বল, কাঠের যে অনেক দাম! সুন্দর গাছের চেয়ে মানুষের কাছে কাঠের দাম অনেক বেশি। তাই এইসব প্রাচীন বনভূমিকে উৎখাত করে মানুষ বড় বড় লগ নামিয়ে নিয়ে চলে যায় কটকের কাঠের মন্ডিতে। তারপর লক্ষ লক্ষ টাকায় সেসব কাঠ বিক্রি হয়।"

"যারা এভাবে গাছ কাটে, তাদের ওপর এই গাছেদের অভিশাপ লাগে না ঋজুদা?"

"লাগে রে লাগে! আমি অনেক ঠিকাদারকে জানি, যারা নির্বংশ হয়ে গেছে। এই বনভূমিকে নিঃস্ব, রিক্ত করে যারা কোটি কোটি টাকা রোজগার করে, সেই টাকা ভোগ করার জন্য তাদের পরিবারে আর কেউ থাকে না। এ সবই আমার নিজের চোখে দেখা।"

আমরা যখন মালভূমির ওপরে পৌঁছে আধমাইলটাক এগিয়ে গেলাম, দূরে দেখি একাধিক হ্যাজাক জ্বলছে, তখনই ড্রাইভার বলল, "আম্মোমানে অস্যি গ্যালা।"

দেখা গেল সারি সারি চালাঘর কাঠের তৈরি। ওপরে বাঁশ এবং পাতা ছাওয়া। আর একটি তাঁবু। ওপরে কাঠের স্তম্ভের ওপর হ্যাজাক জ্বলছে। হেডলাইটের আলোয় দেখা গেল ডানদিকে বেশ কিছুটা দূরে একটি বস্তি। মাটির ঘর, কাঠের চাল, এবং ঘরগুলির সামনে চওড়া মাটির বারান্দা। আমরা গিয়ে নামতেই ঘরগুলি থেকে চার-পাঁচজন লোক বেরিয়ে এসে আমাদের নমস্কার করে বলল, "প্রণাম আইঙ্গা।"

আমাদের মালপত্র তারা সবাই ঘরে বয়ে নিয়ে গেল। ড্রাইভারও ওদের সঙ্গে গেল। সাদা চুলের একজন বেঁটেখাটো বুড়ো লোক, পরনে ধুতি আর নীল রঙের একটি শার্ট, পায়ে টায়ার সোলের চটি, আমাদের নমস্কার করল। লোকটির চোখ দু'টি ছোট ছোট আর কপালে অনেক বলিরেখা। ঋজুদা তাকে দেখেই বলল, "আরে দুর্গা! তু কিমিতি আছন্তি?"

দুর্গা মুহুরী ঋজুদাকে চিনতে পেরে বলল, "ঋজুবাবু! আপনি কুয়াড়ে আসিলা?"

ঋজুদা হেসে বলল, "আও কঁড় করিবি। তম মানে রামডাকুয়াকো মারি দিলি। সেই পাই আসিবা হেলা।"

দুর্গা জোরে দু'দিকে মাথা নাড়িয়ে বলল, "আম্মো মানে মারিনান্তি।"

"হ। সেসব কথা পরে হেব্ব। এবে চালন্তু আম্মো মানে কুয়াড়ে রহিবি চলো দেখিবি।"

দুর্গা আমাদের নিয়ে তাঁবুর মধ্যে গেল। ঋজুদা বলল, "একী রে! এ তো সত্যিই ইম্পোর্টেড তাঁবু! এরকম তাঁবু তো কানহার রিসর্টে আছে! অম্বিকা পানিগ্রাহীর কায়দাকানুনই আলাদা।"

তাঁবুতে ঢুকে দেখা গেল দারুণ খাট, দারুণ টেবল, দারুণ আয়না, এবং বাথটাব লাগানো বাথরুম।"

আমি বললাম, "জলের তো কোনো বন্দোবস্ত নেই! এই পাহাড়ে জল আসে কোথা থেকে?"

"কোত্থেকে আর আসবে! লোকে কুয়ো থেকে বয়ে বয়ে নিয়ে আসে। তোরা কি জানিস ঢেঙ্কানলের রাজার বাড়ি উঁচু পাহাড়ের মাথায়। সেই বাড়ি বানাবার সময় প্রজারা আর হাতিরা বড় বড় পাথর বয়ে ওপরে নিয়ে গিয়েছিল। সেই পাথর দিয়ে রাজার বাড়ি তৈরি হয়। এই বাড়ি করার জন্য যে কত প্রজার প্রাণ গেছিল, তার ইয়ত্তা নেই। ওড়িশায় করদ রাজাদের যেমন চাল-চালিয়াতি ছিল, প্রজাদের ছিল তেমনই দুর্দশা।"

এমন সময় সাদা উর্দি পরা বাবুর্চি এসে সেলাম করে বলল, "খাইবা-পীবা কন হেব্ব?"

ঋজুদা বলল, "যা খাওয়াবে বাবা, তাই খাব।"

দুর্গা বলল, "এটি বরফ নাই। কিন্তু হুইস্কি অছি।"

"এসব বাচ্চা ছেলেরা হুইস্কি-ফুইস্কি খায় না। আমি একটু খাব। ডিনারের আগে।"

বহুদিন সুরবাবুদের কাছে কাজ করায় দুর্গা বাংলা শিখে গেছিল। ভালো বলতেও পারত।

ঋজুদা বলল, "রাতে বেশি ঝামেলা কোরো না। একটু মুচমুচে করে পরোটা, আর মুরগির কষা মাংস করে দিও। পোড়পিঠা আমরা দশপাল্লা থেকে নিয়ে এসেছি। আচার থাকলে আচার দিয়ো একটু। ব্যস। এতেই হবে।"

তারপর ঋজুদা দুর্গাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি কাল কাজে যাবে? মানে কাঠ কাটতে?"

দুর্গা বলল, "আমি নিয়মিত কাঠ কাটতে যাই না। হিসাবপত্র রাখি"

"ভালোই হল। এরা যাবে কীভাবে কাঠ কাটে, তা দেখতে, আমিও যেতে পারি সঙ্গে। তুমিও যেও।"

দুর্গা বলল, "হু।"

চতুর্থ অধ্যায়

এরপর পটে করে চা নিয়ে এল একজন। আমি আর ভটকাই ঋজুদাকে বললাম, "আজ আর এত রাতে চান করব না।"

ঋজুদা বলল, "হ্যাঁ, আমিও আর চান করব না। গা-টা ম্যাজম্যাজ করছে।"

চা খাওয়া শেষ হওয়ার পর আমি আর ভটকাই ঋজুদা আর দুর্গার সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা মারতে বসলাম।

ঋজুদা দুর্গাকে বলল, "রামডাকুয়া কেমন লোক ছিল?"

"চমৎকার ছেলে। বাচ্চা ছেলে। বছর চব্বিশ-পঁচিশ বয়স হবে! অষ্টম ফেল হলে কী হবে! খুব বুদ্ধিমান ছেলে ছিল। আর সকলের সঙ্গে ব্যবহারও ছিল খুব ভালো। কাঠ কাটার কাজের তদারকি করত বটে, কিন্তু প্রত্যেক কাবাড়ির প্রতি খুব দরদ ছিল। তাদের সকলের সুখসুবিধার প্রতি খেয়াল রাখত। বাবুকে বলে দু'-দু'বার ওদের হপ্তা বাড়িয়ে দিয়েছিল।"

ভটকাই বলল, "কাবাড়ি কাদের বলে?"

"যারা কাঠ কাটে, তাদের কাবাড়ি বলে, করাতিও বলে, কাবাড়িও বলে। আচ্ছা এই হপ্তা বেড়ে কত হয়েছিল?"

"সে কথা কী বলব ঋজুবাবু, এ বড় লজ্জার ব্যাপার!"

"তোমাদের হপ্তা দেওয়ার যে মালিক, তারই যদি লজ্জা না করে, তবে তোমার কীসের লজ্জা? তোমার আগের মালিকের কাছে কি এখানের চেয়ে বেশি পেতে?"

"সামান্যই বেশি। কিন্তু আগের মালিকের কাছে তো বহু বছর আগে কাজ করেছি। এই সব জঙ্গলের কাজেই ঠিকাদারেরা সকলেই প্রায় একই রকম দরমার ব্যাপারে।"

ভটকাই প্রশ্ন করল, "দরমা মানে কী?"

"কথার মধ্যে বারবার প্রশ্ন করে ইন্টারাপ্ট করিস না ভটকাই। তোর যা যা প্রশ্ন, সব জমিয়ে রাখ, পরে আমি উত্তর দিয়ে দেব। দরমা মানে হল স্যালারি।"

ভটকাই বলল, "অ।"

ঋজুদা বলল, "খাওয়াদাওয়া কী ব্যাপার?"

"খাওয়াদাওয়া সব জায়গায় যেমন হয়, সেরকমই। এরকম জঙ্গলে তো আনাজ পাওয়া যায় না, মাছও পাওয়া যায় না। নদী থাকলে একটু-আধটু পাওয়া যেত, কিন্তু পাহাড়ের ওপরে নদী তো নেই। আর মাংস বলতে তো একমাত্র শিকার।"

ঋজুদা ভটকাইয়ের দিকে ফিরে বলল, "জানিস তো ভটকাই, ভারতবর্ষের সমস্ত জঙ্গলে শিকার শব্দটার মানেই হচ্ছে মাংস। জঙ্গলের মধ্যে বাস করা এসব গরিব-গুর্বো লোকের কাছে অ্যানিম্যাল প্রোটিন বলতে শুধুই শিকার করা মাংস। বন্য বরাহ, হরিণ, এমনকি বাইসনের মাংসও এরা কাড়াকাড়ি করে খায়। মাংস বলতে তোরা যেমন তেল, ঘি, মশলা দিয়ে সঙ্গে ডুমো ডুমো করে আলু কেটে জমিয়ে রান্না করে খাস, তেমন মাংসের কথা এরা ভাবতেও পারে না। এদের মাংস বলতে হলুদ, নুন, আর লঙ্কা দিয়ে সেদ্ধ করা অথবা আগুনে ঝলসানো মাংস। এরা বাঘের মাংসও খায়, জানিস!"

"কী যে বলো! তুমি কখনও খেয়েছ?"

"কেমন লাগে তা দেখার জন্য একবার খেয়েছিলাম।"

"কেমন লেগেছিল?"

"অখাদ্য। একে তো প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। বাঘের তো মাংস বলতে কিছুই নেই! যা আছে সামান্য, তা তলপেটে। আর সবই দড়ির মতো পাকানো পাকানো মাসল। তাতে কামড় দিলে দাঁত লাফিয়ে ওঠে। তোদের প্রিয় লেখকের একটা বই আছে। নাম, 'বাঘের মাংস ও অন্য শিকার'। পড়েছিস?"

"না আমি পড়িনি।"

আমি বললাম, "আমি পড়েছি।"

"লেগেছে কেমন?"

"গা শিউরে ওঠে। যে বাঘ তার স্বামীকে মেরেছে, সেই বাঘেরই মাংস খাওয়ার জন্য তার বৌ কাড়াকাড়ি করছে, এ ভাবা যায় না।"

"এ বড় বিচিত্র দেশ সেলুকাস। এখানে এরকম মানুষেরা থাকে, আবার অম্বিকা পানিগ্রাহীর মতো মানুষরাও থাকে। এই বৈষম্য আজও চোখে পড়ে। এই কারণেই বনে জঙ্গলে শিকারীদের এই সব মানুষরা ভগবান জ্ঞানে পুজো করে। নীল গাইটা এরা খায় না। যদিও, নীল গাই আসলে অ্যান্টেলোপ, কিন্তু নামের শেষে গাই আছে বলে এরা খায় না। অ্যান্টেলোপ আসলে হরিণই, তবে এরা আকারে অনেক বড় হয়। জুওলজিক্যাল স্পিসি হিসেবে এরা আলাদা।"

আমি বললাম, "কথাটা গুলিয়ে গেল। এরা কী খায়, সে কথা হচ্ছিল।

"এরা সকালে উঠে বেড টি, ব্রেকফাস্ট— এসব কিছুই খায় না। লাঞ্চও খায় না। এরা মাটির হাঁড়িতে মোটা লাল চালের ভাত ফুটিয়ে নেয়। সঙ্গে এক মুঠো আফিংয়ের গুঁড়ো দিয়ে দেয়।"

ভটকাই প্রশ্ন করল, "আফিং কেন?"

"আফিং এদের শক্তিবৃদ্ধি করে। সারাদিন কাঠ কাটতে তো অনেক পরিশ্রম হয়, তাছাড়া হয়তো একটু নেশাগ্রস্তও করে। সন্ধ্যের মুখে ওরা কাঠ কেটে ফিরে আসে, মাটির হাঁড়িতে আবার ভাত চাপায়, তার মধ্যেও আফিং দিয়ে দেয়। রাতে এদের গভীর ঘুম হয়। একে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম, তায় আফিংয়ের নেশা। তোরা এদের দিকে তাকালে লক্ষ্য করবি, এদের টিঙটিঙে শরীরে পেটটা অনেক বড়। আফিং খেয়ে খেয়ে এদের পেটটা বড় হয়ে যায় এবং পিলে বড় হওয়ার কারণে এরা অনেকে অকালে মারাও যায়। শীত, গ্রীষ্ম— সবসময় এদের পোশাক বলতে খাটো ধুতি। কাঁধে একটি গামছা। শার্ট প্রায় কারুরই নেই। বেশি শীত পড়লে তাঁতে বোনা মোটা সুতির চাদর গায়ে দেয়। পাও খালি। এক জোড়া জুতোও এদের প্রায় কারুরই নেই।"

ভটকাই বলল, "এই যে এরা গাছ কাটে, কখনও কি অ্যাকসিডেন্ট হয় না! গাছ চাপা পড়ে এরা কেউ মরে যায় না?"

"হয় বৈকি।"

"তারপর কী হয়?"

"এইসব জায়গায় তো হাসপাতালও নেই, ডাক্তারবদ্যিও নেই। গ্রামে কোয়াক থাকে, বা ওঝা। অবশ্য কলকাতার বড় হাসপাতালে গেলে তাদের যা অবস্থা হত, এখানেও একই অবস্থা। গরিবদের অবস্থার কোনো তারতম্য নেই। পঁচাত্তর বছর হল দেশ স্বাধীন হয়েছে। তারপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দেশ শাসন করেছে। ভঙ্গিমা ও ভাষার তফাৎ হয়েছে। কিন্তু দেশের গরিবদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। এ কথা

সত্যি, যাঁরা দেশ শাসন করেন, তাঁরা স্বীকার করুন আর নাই করুন, এ দেশে অম্বিকা পানিগ্রাহীর সংখ্যা ক্রমশ বেড়েছে আর এই রামডাকুয়া বা দুর্গাদের জীবনের কোনো উন্নতি হয়নি। এটা বড় দুঃখবহ সত্য। দুর্গা, রামডাকুয়া সম্বন্ধে কিছু বলো!"

দুর্গা বলল, "রামডাকুয়াকে বাবু একেবারেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু ও এতই কাজের ছিল এবং সব কাবাড়িরা ওকে এতটাই মানত এবং ভালোবাসত যে বাবুর নিজেরই স্বার্থের কারণে ওকে সরানো সম্ভব ছিল না।"

"ও মরল কী করে সে কথা বলো।"

"সে এক রহস্য ঋজুবাবু! আমরা এখনও সে রহস্য পুরোপুরি ভেদ করতে পারিনি।"

"রহস্য কেন?"

"রামডাকুয়া যেদিন মারা গেল, তার আগের রাত থেকেই ওর জ্বর এসেছিল। বাবুই ওকে দুটো জ্বরের গুলি খেতে দিয়েছিলেন। রাতে সে ভাত খায়নি।"

ভটকাই বলল, "ভাতের বদলে খিচুড়ি বা টোস্ট জাতীয় কিছু খায়নি?"

ভটকাইয়ের এ কথায় দুর্গা মোহান্তি ফ্যালফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল।

ঋজুদা বলল, "বোকা বোকা কথা বলিস না ভটকাই। শুনছিস খাবার বলতে দু'বেলা ওরা ভাত সেদ্ধ করে খায়, তাতে না দিতে পারে আলু, না করতে পারে ডাল, এখানে কি বেকারি আছে যে টোস্ট খাবে? আর যারা ডালই খেতে পায় না, তারা খিচুড়ি কোত্থেকে খাবে? তুই যে সব জায়গায় গিয়ে খাওয়া নিয়ে বায়নাক্কা করিস, এদের দেখে শেখ এদের মতো গরিব-গুর্বো মানুষেরা কেমন করে বেঁচে থাকে। এদের গ্র্যাচুইটি নেই, প্রভিডেন্ড ফান্ড নেই, পেনশন, ইনসিওরেন্স কাকে বলে এরা জানে না, এরা কিছুই জানে না! গাছ কাটতে এসে মরে গেলে তার কিশোর বয়সী ছেলে খেঁটো ধুতি পরে, খালি গায়ে, কাঁধে একটি গামছা চাপিয়ে বাবারই কুড়ুলটি কাঁধে নিয়ে জঙ্গলের ঠিকাদারের কাছে একটি কাজ ভিক্ষা চাইতে আসে। যে কাজ করতে গিয়ে তার বাবা মারা গিয়েছিল, সেই কাজই পেলে তার বিধবা মা, ও ছোট ভাইবোনেরা দু'বেলা দু'মুঠো ভাত খেয়ে বাঁচতে পারে। আর কাজ না পেলে মরে! এই ওদের নিয়তি। এই স্বাধীন ভারতের গরিব মানুষদের ভবিতব্য। দুর্গা, তুমি রামডাকুয়ার মৃত্যুর আগের দিনের কথা বলেই থেমে গেলে। তারপর কী হল বলো!"

"পরদিন সকালে আমরা সকলেই কাজে গেলাম। জ্বরে রামডাকুয়ার গা পুড়ে যাচ্ছিল। সে শুয়ে রইল। দু'গ্লাস জল ছাড়া আর কিছুই খেল না। বাবু তাঁবুর বাইরে ইজিচেয়ারে বসে কাঠের হিসাব দেখছিলেন। বাবুর্চি আর বেয়ারা তাঁর সকালের খাওয়ার আয়োজন করছিল। আমরা সবাই কাজে চলে গেলাম। সন্ধের আগে আগে কাজ থেকে যখন ফিরলাম, তখন চালাঘরে ঢুকে দেখি রাম শুয়ে আছে কিন্তু ওর মুখের পাশে মাথাতে রক্ত প্রায় জমে গিয়ে থকথক করছে। আমরা চিৎকার চেঁচামেচি করে উঠতে দেখলাম বাবু বেয়ারা, বাবুর্চি আর ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে এলেন। অন্য সব কাবাড়িরা তো ছিলই। বুঝলাম যে রামডাকুয়া মারা গেছে কিন্তু কীসে মারা গেল এটাই আমরা ঠাহর করতে পারলাম না। কে যেন একটা লন্ঠন জ্বালিয়ে আনতে দেখা গেল রামের বাঁ কান থেকে এই রক্ত বেরিয়েছে। বাবু বললেন, 'আরে! এ নিশ্চয়ই কান্বখুন্টা সাপের কাজ! পরশুদিনই আমার তাঁবুর কাছে সকালে একটি সাপকে দেখেছিলাম। তখনই কৃপাসিন্ধুকে বললাম ওটাকে মেরে দিতে, কিন্তু ও রান্নায় ব্যস্ত ছিল বলে এল না, হারিবন্ধুও এল না।' বাবুর এই কথা শুনে ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। 'এ নিশ্চয়ই ওই সাপেরই কাজ। কেউ রামডাকুয়াকে গুলি করতে শোনেনি, অন্য কোনো জন্তু যে এসে ওকে মেরে থাকবে, তারও কোনো আওয়াজ বা আভাস আমরা কেউই পাইনি। তাই নিঃশব্দে এই কাণ্ড ঘটানো এই কান্বখুন্টা সাপ ছাড়া কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। অন্য সাপ হলে পায়ে বা গায়ে কামড়াতে পারত। ছেলেটা জ্বরে বেহুঁশ ছিল, তাই খেয়াল করেনি। নইলে কান্বখুন্টা সাপকে মেরে ফেলা বা দূরে ছুঁড়ে ফেলা তো কোনো কঠিন কাজ নয়! আমি নিজেও কিছু বুঝতে পারিনি।' চারদিকে গুঞ্জন উঠল। সেদিন আমাদের ভাত চাপাতে অনেক দেরি হয়ে গেল। তবে রামের এই অবস্থা দেখে খাওয়াতে আমাদের কারুরই কোনো রুচি ছিল না।

"রামের বাড়ি ওর মৃত্যুর খবর পৌঁছতে পৌঁছতেই পুরো একদিন লেগে যেত। এখানে কেন, এই পুরো অঞ্চলেই তো লাশকাটা ঘর নেই! ওর মৃতদেহ রাখা যাবে কোথায়! সকলে মিলে পরামর্শ করে আমরা এই বিড়িগড় দুর্গের কাছেই একটা সদ্য কাটা চন্দন গাছের কাঠ দিয়ে চিতা সাজিয়ে রামডাকুয়াকে দাহ করে দিলাম। মুখাগ্নি করল রামডাকুয়ারই গ্রামের একটি অল্পবয়সী ছেলে।"

ঋজুদা গলা নামিয়ে বলল, "সেদিন সকালে তুমি তো তাঁবুর সামনে ছিলে না, বাবু ছিলেন আর ওঁর সঙ্গে কৃপাসিন্ধু আর হারিবন্ধু ছিল। আর ছিল জিপের পাল্ব ড্রাইভার। এই ড্রাইভারই তো আজ আমাদের নিয়ে এল, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"এই যে রামডাকুয়া মারা গেল, তোমার বাবু কি পুলিশ-টুলিশ ডেকেছিলেন? কোনো তদন্তই কি হল না এই নিয়ে?"

"এখানে কী তদন্ত হবে বাবু! আর পুলিশ বলুন, আর যাই বলুন, সবই তো বাবুর পকেটে। দশপাল্লা তো ছার, বাবুর কথায় ভুবনেশ্বরও ওঠে-বসে। সান্ত্রী-মন্ত্রী অনেকের সঙ্গেই বাবুর দহরম-মহরম। শুনেছি তো বাবু এবার নির্বাচনে দাঁড়াবেন মন্ত্রী হতে।"

"কোন দলের হয়ে দাঁড়াবেন?"

"অত সব আমি জানি না ঋজুবাবু। শুনছি, এই যা।"

"রামডাকুয়ার সঙ্গে কি তোমার বাবুর ঝগড়া-টগড়া হয়েছিল?"

"ঝগড়া হয়নি, তবে রামডাকুয়াও ঢেঁটিয়া ছিল। বাবুকে গণ্যমান্য করত না। বাবুর সামনে জামার কলার তুলে চলাফেরা করত। এবং আমরা সবাই যেখানে বাবুর সামনে মাথা উঁচু করে কখনও দাঁড়াইনি, সব সময়েই জোড়হাত করে কথা বলেছি, আঁইজ্ঞা-আঁইজ্ঞা করেছি, রামডাকুয়া কোনোদিন তা করেনি। রামডাকুয়ার হাবভাব এমন ছিল যেন ও-ও বাবুর সমান। আমাদের সবাইকে ও বলত, 'এত বিনয় কীসের দুর্গাদাদা? আমরা খেটে খাই, প্রাণপাত পরিশ্রম করি। আমাদের পাওনার দশভাগের একভাগও বাবু আমাদের দেন না। তারপরেও অত আঁইজ্ঞা কীসের? বাবুর চারখানা ট্রাক প্রতিদিন পাহাড়ে আসে এবং কাঠ ভর্তি করে নেমে চলে যায় কটকের কাঠের মন্ডিতে। তুমি তো চিরদিন কাঠেরই হিসাব রেখে গেলে। কত বর্গফুট কাঠ কাটা হল, আর চলে গেল কটকের কাঠের মন্ডিতে। তোমার কি ধারণা

আছে, একদিন যে কাঠ যায় তার দাম কত হতে পারে? বাবুর লাভের পরিমাণ সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই। সেই মানুষকে বড়লোক করতে আমরা যারা জীবন দিয়ে সাহায্য করছি, তাদের ন্যায্য পাওনাটা তো দেওয়ার কথা! সামান্যতম দরমাও আমাদের দেন না। এই মানুষের কাছে মাথা নীচু করব কীসের জন্য? উনি কি আমাদের দয়া করছেন? বরং আমরাই ওকে দয়া করছি। ওর লাজ-লজ্জা নেই বলে দিনের পর দিন আমাদের ঠকিয়ে এসেছেন, এবং আসছেন।'"

ঋজুদা জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা দুর্গা, তুমি কি কান্বখুন্টা সাপের কামড়ে আর কাউকে মারা যেতে দেখেছ?"

"তিনজনকে দেখেছি।"

"যেখানে কামড়েছিল, সেখান থেকে কি খুব রক্ত বেরিয়েছিল?"

"বেশি রক্ত তো বেরোয়নি! কোনো সাপের কামড়েই তো বেশি রক্ত বেরোয় না! ছোট ফুটো হয়, আর মরে তো মানুষ বিষে।

"এখানকার সব কাবাড়িরা যারা সেদিন ছিল, তারা কি এই মৃত্যু নিয়ে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেছিল?"

"হ্যাঁ সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিল এবং কেউই বিশ্বাস করেনি যে রামডাকুয়া কান্বখুন্টা সাপের কামড়ে মারা গেছে।"

"কীভাবে মারা গেছে সে সম্বন্ধে কি কেউ কোনো ধারণা করতে পেরেছিল?"

"না, কেউ কিছু ধারণা করতে পারেনি বলেই তো এটা একটা রহস্য রয়ে গেছে। আর যেহেতু বাবু সেদিন এখানে ছিলেন, বাবুর ওপর ওদের সকলেরই সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু বাবু যদি বন্দুক দিয়েই ওকে মেরে থাকেন, তবে তো শব্দ হবে, রামের চিৎকারও তো শোনা যাবে! যারা এখানে ছিল, বাবুর্চি, বেয়ারা, ড্রাইভার— তাদের কেউই কোনো শব্দ শোনেনি। আজও এরা বিশ্বাস করে না যে কান্বখুন্টা সাপের কামড়ে রামডাকুয়া মারা গেছে। আচ্ছা ঋজুবাবু, আজ আমি যাই। অনেক হিসাব করা বাকি আছে। বাবু হঠাৎ চলে এলে হিসাব দেখতে চাইবেন। বাকি পড়ে গেলে মুশকিল।"

"ঠিক আছে তুমি যাও।"

দুর্গা চলে গেলে আমরাও খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। অনেকখানি পথ জিপে এসেছি। গা-হাত-পা ব্যথা করছিল। ঋজুদা বলল, "আরে, দুর্গা কি চলে গেল? ওকে একবার ডাক তো!"

তাঁবুর বাইরে গিয়ে ওকে ডেকে আনতে ঋজুদা বলল, "কাল কখন বেরোবে তোমরা?"

"আমরা ওই ছ"টা নাগাদ বেরোব। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে।"

"আমরাও তাই বেরোব। এখন যেখানে কাঠ কাটছ, সেই জায়গাটা এখান থেকে কত দূর?"

"বেশি না, আধমাইলটাক হবে। গড়ের নীচে।"

"বেশ। আমরা তৈরি হয়ে থাকব, তুমি যাওয়ার সময় আমাদের নিয়ে যেও।"

দুর্গা চলে যেতে আমরা জামাকাপড় বদলে খেতে বসলাম। গরম গরম পরোটা, আর মুরগির কষা এনে দিল কৃপাসিন্ধু। সঙ্গে একটু লেবুর আচারও দিল। আর দশপাল্লা থেকে আনা পোড়পিঠাও টুকরো করে কেটে আলাদা করে প্লেটে দিল।

মাঝরাতে অস্বস্তিতে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল।

ইংরেজিতে যাকে বলে সিক্সথ সেন্স, তা দিয়ে আমাদের মনে হল তাঁবুর বাইরে কোনো জন্তুর আবির্ভাব হয়েছে। আমাদের সঙ্গে আমেরিকান বন্ড কোম্পানির পাঁচ ব্যাটারির টর্চ ছিল। সেই টর্চ জ্বালিয়ে তাঁবুর পর্দা খুলতেই দেখি বাইরে জমাট বাঁধা অন্ধকার। তারপরেই দেখি অন্ধকার নড়ছে-চড়ছে। ঋজুদা আমাদের বলল, "লাইট নেভা। ভেতরে চলে আয়।"

ভটকাই উত্তেজিত হয়ে বলল, "ওটা কী ঋজুদা।"

"কথা বলিস না। এসে শুয়ে পড়।"

আমরা তাই করলাম। কিন্তু উদ্বেগে ঘুম আসছিল না। মিনিট পনেরো-কুড়ি বাদে হারিবন্ধু এসে জিজ্ঞাসা করল, "বাবুরা কি বাইরে বেরিয়েছিলেন?"

"বেরোইনি, তবে বেরোতে যাচ্ছিলাম।"

সে তখন মাথা চুলকে বলল, "আমাদেরই অন্যায় হয়েছে। আপনাদের আগে বলে দেওয়া উচিত ছিল।"

ঋজুদা জিজ্ঞাসা করল, "কী?"

হারিবন্ধু বলল, "হাতি।"

এমন সময় কৃপাসিন্ধুও তাঁবুর পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল। ওরা বলল, "এখান থেকে কুয়োটা বেশি দূরে নয়। খুব বড় নয় যদিও, কিন্তু বিড়িগড় মালভূমিতে ওই একটিই কুয়ো। এখান থেকে পুরো বস্তির পানীয় জল ওরা নিয়ে যায়। চানও করে কুয়োর বাঁধানো পাড়ে, কাপড়ও কাচে। মেয়েদের জন্য সময় ঠিক করা আছে। তারা দল বেঁধে আসে। আসার আগে "বিচার" "বিচার" বলতে বলতে আসে।"

"কেন এরকম বলে?"

"মেয়েরা যখন চান করবে, কোনো পুরুষ মানুষ যেন কাছে না আসে, সে জন্য সকলকে সাবধান করতে করতে যায়। রাতের বেলায় এই কুয়োতেই হাতিরাও আসে জল খেতে। তবে তারা কারও ক্ষতি করে না। কুয়োতে শুঁড় ডুবিয়ে জল খেয়ে চলে যায়।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তাহলে অন্য জানোয়ারেরা কোথায় জল খায়?"

"পাহাড়ের মধ্যে ঝর্ণা আছে। অন্যরা পানীয় জল সেখান থেকেই পায়। তবে হাতিদের তো আর অল্প জলে চলে না, তাই ওরা জল খাওয়ার জন্য এখানেই আসে।"

উত্তেজনায় ঘুম আসতে আসতে আধ ঘন্টাখানেক লাগল। বাইরে থেকে একটা কোটলা হরিণ "বাক" "বাক" করে অ্যালসেশিয়ান কুকুরের মতো ডাকতে ডাকতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে দৌড়ে গেল। বাইরে একজোড়া ওয়াটেলড ল্যাপউইং 'ডিড ইউ ডু ইট', 'ডিড ইউ ডু ইট' করে ডাকতে লাগল। ওদের ডাকে রাতের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে যেতে লাগল।

পঞ্চম অধ্যায়

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই হারিবন্ধু ট্রে-তে টিপট আর পেয়ালা পিরিচ সাজিয়ে সঙ্গে চকলেট ক্রিমের বিস্কুট নিয়ে ঘরে এল। তাঁবুরই এক পাশে বাথরুম ছিল। সেখানে বেসিনে মুখ ধুয়ে, বাথরুম করে আমরা তৈরি হয়ে নিলাম।

কৃপাসিন্ধু এসে বলল, "আপনারা ব্রেকফাস্ট কখন খাবেন? কী খাবেন?"

ঋজুদা বলল, "আজ আমরা ব্রেকফাস্ট খাব না। জঙ্গল থেকে ঘুরে এসে একেবারে লাঞ্চ খাব। তোমার যা মনে হয় করে রেখো। আমরা হয়তো লাঞ্চ করেই চলে যেতে পারি।"

"সেকি! বাবু কাল রাতে আমায় ফোন করেছিলেন। আপনাদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা জানার জন্য। তারপর বললেন, "বিড়িগড় বস্তিতে বলে যদি কোনো পাঁঠার বা শুয়োরের মাংসের বন্দোবস্ত করতে পারো, তাহলে কোরো। আর দুর্গাকে বোলো কাল সকালে আমাকে ফোন করতে। ও মনে হয় ফোনটা বন্ধ করে রেখেছে। লাইন পেলাম না। ওকে বোলো যে ও যদি ফোনটা বন্ধই করে রাখবে, তাহলে ফোনটা কিনে দিলাম কেন?"

পাল্থ ড্রাইভার গাড়ি লাগবে কিনা জিজ্ঞাসা করতে ঋজুদা বলল, "আমরা হেঁটেই যাব, তুমি বরঞ্চ এগারোটার সময় জিপটা নিয়ে এসো, তাঁবুতে ফেরার সময় আমরা জিপে ফিরব। তুমি বরং দুর্গাকে ডেকে নিয়ে এসো। আমরা ওর সঙ্গেই বিড়িগড়ে যাব।"

পাল্থ ড্রাইভার চলে গেল। একটু পরে দুর্গা মোহান্তি এসে যেতে ওর সঙ্গে আমরা বিড়িগড়ের দিকে এগোলাম। আমাদের আগে আগে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশজন কাবাড়ি টাঙি নিয়ে খালি গায়ে, খালি পায়ে পিঠের উপর গামছা ফেলে যাচ্ছিল। পথের দু'পাশে নানা গাছ। অল্প কয়েকটারই নাম আমরা জানি। ঋজুদাকে জিজ্ঞাসা করতে ঋজুদা একে একে গাছ চিনিয়ে দিতে লাগল। ঋজুদা বলল, "এখানে অনেক বড় বড় মহানিম গাছ আছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছও আছে।"

একটা গাছের দিকে আঙুল তুলে ঋজুদা বলল, "এর নাম রস্‌সি। এর কাঠ খুব শক্ত হয়। এই গাছের কাঠ দিয়েই গোরুর গাড়ির চাকা বানানো হয়। ওই দূরের গাছটার নাম তেঁতরা। ডানদিকে এই বড় গাছটার নাম বিটকুনিয়া।"

তারপর পায়ে চলা পথের পাশে কতকগুলো ঝোপ দেখিয়ে বলল, "এর নাম অর্বুন। এদের গায়ে সবুজ রঙের গোলগোল ফল হয়। সেই ফল বিছানায় ও বালিশের তলায় রাখলে ছারপোকা হয় না।"

একটু দূরে ডানদিকে বড় বড় গাছগুলোয় ধনেশ পাখিরা 'হ্যাঁকো' 'হ্যাঁকো' করে ডাকাডাকি করছিল। ঋজুদা বলল, "এরাই হচ্ছে গ্রেট ইন্ডিয়ান হর্নবিল। যে গাছে ওরা বসে আছে, তার নাম নাক্সভোমিকা।"

ভটকাই বলল, "পেটের গোলমাল হলে মা আমাদের একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়াতেন। তার নাম ছিল নাক্সভোমিকা।"

"ঠিক বলেছিস। এই গাছের ফল খেতে ধনেশ পাখিরা খুব ভালোবাসে। এই গাছটার স্থানীয় নাম কুচিলা। এই ধনেশরা কুচিলা গাছে বসে এই ফল খায় বলে এদের নাম কুচিলাখাঁই। এই বনেই আরও একরকম গাছ আছে। তারা অত বড় নয়। তাদের নাম ভালিয়া। তাতে ছোট ছোট ফল ধরে। আর সেই ফল খায় ছোট ধনেশ পাখিরা। সেই পাখির গায়ের রঙ ছাই-ছাই। তাদের নাম লেসার ইন্ডিয়ান হর্নবিল। এই ভালিয়াখাঁই পাখিরা খুব সুন্দর গ্লাইডিং করে। সন্ধ্যের আগে আগে অস্তগামী সূর্যকে ধাওয়া করে যখনই ছাইরঙা পাখিরা তাদের লম্বা লেজ নিয়ে ভেসে যায়, তখন মনে হয় ওরা যেন দুরন্ত লাল সূর্যের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবে।

ভটকাই বলল, "বাঃ! দারুণ বর্ণনা দিলে তো তুমি!"

আমি ঋজুদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এরা কি শুধু কুড়ুল দিয়েই গাছ কাটে!"

দুর্গা বলল, "না না বাবু! বড় বড় করাতও আছে। এত বড় করাত, যে তা চালাতে চারজন লাগে। দু'জন সামনের দিকে ধরে, দু'জন পেছনের দিকে ধরে।"

ঋজুদা বলল, "আজকাল ব্যাটারি ড্রিভেন করাতও

পাওয়া যায়। বড় বড় গাছ সেই সব করাত দিয়েই কাটা হয়। গাছ কেটে নীচে ফেলার পরে সেই সব ডালপালা কুড়ুল দিয়েই কাটে। একেকটা বড় গাছ যখন হাত-পা ছড়িয়ে আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে, নানা পাখির আর্তনাদের মধ্যে, তখন বড় কষ্ট হয়। একেকটি বড় গাছ কত রকম প্রাণীর আশ্রয়! পাখি, কাঠবিড়ালি, নানা জাতের সাপ— এ সবেরই আশ্রয় বড় বড় গাছ। একটি গাছ মহীরুহ হতে কত দীর্ঘ সময় লাগে। কিন্তু তা কেটে ফেলতে লাগে কয়েক ঘন্টা। আমাদের এই পৃথিবী ভারী সুন্দর জায়গা ছিল। এই পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষই তাদের সর্বগ্রাসী লোভে এই পৃথিবীকে প্রতিদিন তিলে তিলে ধ্বংস করে তার সর্বনাশ সম্পূর্ণ করল। অথচ বুঝতেও পারল না, এই প্রকৃতি ধ্বংসের সাথে সাথে মানুষ নিজেকেও ধ্বংস করছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আছে না, "দাও ফিরে সে অরণ্য!" সে কবিতার কথা মনে পড়ে।"

তারপর দুর্গার দিকে ফিরে বলল, "দুর্গা কিন্তু একজন গাছমানুষ। তোরা কি দেবেশ রায়ের তিস্তা পারের বৃত্তান্ত উপন্যাসে একটি চরিত্র আছে, যার নাম বাঘারু। সেও ছিল দুর্গারই মতো একজন গাছমানুষ।"

তারপর হেসে ঋজুদা স্বগতোক্তি করল, "একবার দুর্গা তার এই গাছপ্রীতির জন্য আমায় যা বিপদে ফেলেছিল, তা আর বলার নয়।

দুর্গা একটু লজ্জা পেয়ে নীরব প্রতিবাদের সঙ্গে ঋজুদার দিকে চাইল।

ঋজুদা বলল, "একবার উরুনাকোটের জঙ্গলে মাঝরাতে মস্ত বড় বাইসনকে গুলি করে আমি জিপ থেকে নামি। সেখানে সুরবাবুদের অতিথি হয়ে গিয়েছিলাম। দুর্গা আমার সঙ্গে নামল। ওর হাতে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ। আন্ডারগ্রোথ ভর্তি গভীর জঙ্গলে কয়েক পা গিয়েই দেখলাম অতিকায় বাইসনটির বুকের বেশ ওপরে গুলি লেগেছে। রাইফেলটার বোর ছিল .৩৬৬। সেটা বাইসন মারার উপযুক্ত ছিল না। বাইসন কিংবা বাঘ কম করে .৪০০ বোরের আগ্নেয়াস্ত্র দিয়েই মারা উচিত। আমার সঙ্গে কটকের চাঁদুবাবুও ছিলেন। বাইসনটার বুক থেকে ফোয়ারার মতো রক্ত বেরোচ্ছিল। আর সেই রক্ত ঝরঝর করে ঝরে পড়ছিল বনের ঘাস-পাতায়। গুলি খাওয়া বাইসন গুলি খাওয়া বাঘেরই মতো অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রাণী। চাঁদুবাবুর হাতে ছিল বারো বোরের দোনলা বন্দুক। বাইসন চার্জ করলে আমাদের তিনজনকেই মুহূর্তের মধ্যেই লন্ডভন্ড করে দিতে পারত। সে সময় টর্চের আলো স্থিরভাবে বাইসনের ওপরে ফেলে রাখার কথা ছিল। কিন্তু টর্চ ছিল দুর্গার হাতে। দুর্গা টর্চের আলো আমাদের পাশের একটি প্রকান্ড সেগুন গাছের ওপর ফেলে আমার হাত ধরে বলল, 'বাবু, বাবু, এ গচ্ছটা দেখিলে?' সামনে আহত বাইসন দাঁড়িয়ে, আর দুর্গা তার ওপর থেকে টর্চ সরিয়ে পাশের গাছের ওপর ফেলে আমার বাহু ধরে তার শোভা দেখাচ্ছিল। আমি আমার বাঁ কনুই দিয়ে দুর্গাকে এক গুঁতো মেরে সংবিৎ ফেরালাম। দুর্গা তখন ফের আলো ফেরাল বাইসনের গায়ে। আমি তার ঘাড়ে গুলি করে তাকে ধরাশায়ী করলাম। বাইসনের প্রাণ গেল, আমাদের প্রাণ বাঁচল। তবে দুর্গার কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় সেদিন আমাদের প্রাণ যাওয়ারই কথা ছিল। হাতে খুব ভারী এবং দামি রাইফেল থাকলেও গুলি খাওয়া বাঘ বা বাইসনের হাত থেকে বাঁচা ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া হয় না। মাটিতে দাঁড়িয়ে, বিশেষ করে রাতের বেলায় এই সব জানোয়ারদের মুখোমুখি হওয়াটা প্রচণ্ড নির্বুদ্ধিতার কাজ। তাও তিস্তাপারের বৃত্তান্তের এই বাঘারুরই মতো উরুনাকোটের এই দুর্গা মোহান্তি আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

কাবাড়িরা কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিল।

ভটকাই বলল, "এই দুর্গ, মানে বিড়িগড়ের ভেতরে তুমি কখনও গেছ ঋজুদা?"

"না। যাইনি।"

"আজ যাবে?"

"না।"

"কেন?"

"অন্ধকার গুহার ভিতরে বাঘ আছে না ভালুক আছে, তার তো কোনো ঠিক নেই! না বন্দুক, না রাইফেল— কোনো আগ্নেয়াস্ত্রই এবার আনা হয়নি। এই .২২ পিস্তলের ওপর ভরসা করে গুহায় ঢোকা আর আত্মহত্যা করা একই কথা। আর গুহায় ঢোকামাত্র শ"য়ে শ"য়ে দুর্গন্ধ বাদুড় এমনভাবে বেরিয়ে আসবে যে তাদের স্রোতে তুই উল্টে পড়ে যাবি। তারপর সেই গুহার অধিবাসী— সে বাঘ হোক, কি ভাল্লুক— তুই কিছু বোঝার আগেই তোকে ছিঁড়ে ফালাফালা করে দেবে। জানোয়ারদের পালাবার পথ যদি কেউ আটকায়, তবে সংস্কারবশে মুহূর্তের মধ্যে সে আগন্তুককে আক্রমণ করে। এটাই তাদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। গুহায় ঢুকতে হলে যথাযোগ্য হাতিয়ার নিয়ে ঢুকতে হত। টর্চও তো তাঁবুতে ফেলে এসেছিস। কাজেই, এসব ভাবনা এখন বন্ধ কর।"

আমরা তিনজনেই যেহেতু অম্বিকা পানিগ্রাহীর কাছের লোক, তাই কাবাড়িরা কেউই আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখছিল না। দুর্গা মোহান্তির সঙ্গে ঋজুদার অনেক দিনের পরিচয়। সে ঋজুদার সঙ্গে অনেক জায়গায় ঘুরেছে। তাই ঋজুদার প্রতি তার একটা বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার জায়গা ছিল। আমাদের মতো দুই উচ্চিংড়ের প্রতি তার শ্রদ্ধা বা ভালোবাসা থাকার কথা নয়।

ভটকাই বলল, "তুমি কৃপাসিন্ধুকে আজই ফিরে যেতে পারি বললে কেন? আমরা কি আজই ফিরে যাব?"

"ফিরে যাব যে, সে কথা বলিনি। বলেছি, ফিরে যেতে পারি। এখানে থেকেই বা কী হবে? আমার কাজ তো শেষ হয়ে গেছে।"

"রহস্যের সমাধান করে ফেলেছ? কই, আমরা তো কিছুই বুঝতে পারলাম না!"

"হ্যাঁ, সমাধান প্রায় করেই ফেলেছি। বোঝার ক্ষমতা যদি সকলেরই সমান থাকত, তবে তো হয়েই যেত।"

"কী যে হেঁয়ালি করো, বুঝি না।"

"সবকিছুই যে সকলকে বুঝতে হবে, তার কোনো মানে নেই। কিছু জিনিস না বুঝলেও চলবে। কাবাড়িদের ধুতির কোমরে গোঁজা পাকানো খইনি থেকে একটু ছিঁড়ে তারা ঠোঁটের নীচে দিচ্ছিল। আর তুমুল বিক্রমে কাঠ কাটছিল। একটু দূরেই একটি মস্ত বড় তেঁতুল গাছ আর চারজন করাতি। সেই করাত চালানোর ঘ্যাঁচর ঘ্যাঁচর শব্দে বনভূমি মথিত হয়ে যাচ্ছিল। কাছেই একটি বড় পাথরের ওপর বসে আমরা কাঠ কাটা দেখছিলাম। ওরা আমাদের দিকে বেশ তাচ্ছিল্যের চোখেই তাকাচ্ছিল। আমাদের তো বটেই, ঋজুদাকেও বিশেষ পাত্তা দিচ্ছিল না। বেশ কিছুক্ষণ পর পান্ডু ড্রাইভার জিপ নিয়ে সেখানে এল এবং আমরা তিনজনে জিপে উঠে পড়লাম। ঋজুদা দুর্গাকে বলল, "দুর্গা, তুমি আজ রাতে আমাদের সঙ্গে খেও।"

পাছে কেউ এই নিমন্ত্রণের কথা জানতে পারে, তা ভেবে দুর্গা অন্য কাবাড়িদের দিকে একটু তাকিয়ে নীচুগলায় বলল, "সে দেখিবি। সূর্য বুড়িলে সে দেখা জিবে।"

ঋজুদা বলল, "হৌ। আম্মো মানে এবে চালিলি।"

"হৌ।"

পাম্ব ড্রাইভার জিপ ঘুরিয়ে নিল। জিপ এগোতেই ঋজুদা বলল, "মাচ্ছ খাইবি ভাকুড়, ঘইতা করবি ড্রাইভর। মাচ্ছ খাইবি ইলিশি, ঘইতা করবি পুলিশি।"

পাম্ব ঋজুদার এই কথা শুনে হেসে উঠল। ভটকাই বলল, "এর মানে কী হল ঋজুদা?"

"এখানে জঙ্গল পাহাড়ের লোকেদের মধ্যে এই প্রবাদটা চালু আছে। মেয়েরা বলে বোয়াল মাছ যদি খেতে হয় তবে ড্রাইভারকে বিয়ে করো। মাচ্ছ খাইবি ভাকুড়, ঘইতা করবি ড্রাইভর। আর যদি ইলিশ মাছ খেতে হয়, তবে পুলিশকে বিয়ে করো। মাচ্ছ খাইবি ইলিশি, ঘইতা করবি পুলিশি।"

ঋজুদার কথায় আমি আর ভটকাই হেসে উঠলাম।

পাম্ব বলল, "রামডাকুয়ার হত্যার কোনো কিনারা হল বাবু?"

"কিনারা কী করে হবে বলো, তোমরা যা বুঝলে, আমিও তাই বুঝলাম। তার বাইরে তো কিছু বোঝা গেল না।"

তাঁবুতে পৌঁছে হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে কৃপাসিন্ধুকে বললাম, আমাদের খাবার লাগিয়ে দিতে।

ঋজুদা জিজ্ঞাসা করল, "কী রেঁধেছ?"

সে বলল, "মাছ-মাংস তো এখানে কিছু পাওয়া গেল না! পাঁঠা এরা বিশেষ পোষে না। শেয়াল আর চিতাবাঘের ভয়ে শুয়োরও পোষে না। তবে পরব-টরবে এরা শুয়োর খায়। সে জন্য একটা বড় দাঁতাল শুয়োর এরা পুষে রেখেছে। সে রাতে ওরা ভাত খাবে, শল্যপ রস খাবে, আর শুয়োরের মাংস খাবে। আপনাদের খাওয়ানোর মতো ছোট শুয়োর বস্তিতে নেই। এখানে শুয়োর, হরিণ, এসব খেতে হলে শিকার করেই খেতে হয়। আপনারা তো বন্দুক, রাইফেল কিছুই আনেননি। তবে বস্তি থেকে একটু ক্ষীরের বন্দোবস্ত করেছি। তা দিয়ে পায়েস রান্না করেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ক্ষীরের পায়েসটা কেমন?"

ঋজুদা বলল, "আরে, ওড়িয়াতে দুধকে বলে ক্ষীর। দুধের পায়েস আর কী!"

কৃপাসিন্ধু আবার বলল, "বাবু আপনাদের জন্য একটু বেকন আর সালামি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমি একটু পোলাও করেছি আর পনশর তরকারি। সেই সঙ্গে বেকন আর হ্যাম ভাজা, আর ক্ষীরের পায়েস।"

ভটকাই বলল, "পনশ কী বস্তু?"

"ওড়িয়াতে কাঁঠালকে বলে পনশ। এঁচোড় আর কী, বুঝলি না! তবে এখন তো আর এঁচোড় পাওয়া যায় না, কাঁঠালই হয়ে গেছে। তবে রান্নার গুণে কাঁঠালও এঁচোড় হয়, আর এঁচোড়ও কাঁঠাল হয়। কী আর করা যাবে! তোরা কি মুরগি খাবি নাকি? কাল যখন মুরগি করেছিল, আজও করে দিতে পারত। তোরা খেলে বল, এখনও করে দেওয়া যায়।"

আমি বললাম, "না না, এই তো অনেক পদ আছে। তাছাড়া পোড়পিঠাও তো এখনও আছে।"

"তাহলে ঠিক আছে! কিন্তু, ভটকাইয়ের কি শরীর খারাপ নাকি রুদ্র? খাইখাই মাস্টার এসে অবধি একবারও খাওয়ার কথা বলছে না!"

"তাই তো দেখছি! কী রে ভটকাই, তোর জ্বর-টর হয়নি তো?"

ভটকাই বলল, "দেখ, ইয়ার্কি মারবি না। সবসময় ইয়ার্কি ভালো লাগে না।"

"অল রাইট বাবা!"

ঋজুদা কৃপাসিন্ধুকে বলল, "কৃপা, তুমি রাতে মুগের ডালের ভুনি খিচুড়ি করো। ওর মধ্যে একটু কিসমিস আর চিনাবাদাম দিয়ে দিও। আর কাঁঠালের বিচি ভাজা যদি থাকে, তাও দিও। ওর সঙ্গে কড়কড়ে করে আলুভাজা কোরো। সুইট ডিশ বলতে পোড়পিঠা তো আছেই!"

কৃপাসিন্ধু বলল, "হৌ।"

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর আমি আর ভটকাই একটু শুয়ে নিলাম। কাল রাতে হাতিরা আসায় ঘুমের একটু ব্যাঘাত হয়েছিল। ঋজুদা অবশ্য শোয়নি। ঋজুদা তাঁবুর বাইরে একটা অর্জুন গাছের নীচে ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসে ছিল। আমরা সাড়ে তিনটে-চারটে নাগাদ উঠতেই ঋজুদা বলল, "চা দিতে বল রে!"

চা দেওয়ার কথা বলে আমরা দু'জনেও ভেতর থেকে দু'টো ক্যাম্পচেয়ার নিয়ে এসে ঋজুদার পাশে বসলাম।

ভটকাই বলল, "কী ঋজুদা, সত্যি সত্যিই ফিরে যাবে নাকি?"

"এখানে থাকতে তোর খুব ভালো লাগছে?"

"জায়গাটা তো ভালোই! তবে অনেক জায়গা দেখা হল না, খন্দ বস্তিতেও যাওয়া হল না।"

ঋজুদা বলল, "এই খন্দরা বিশ্বাস করে ওদের পূর্বপুরুষরা মেঘে করে এসে এই উঁচু পাহাড়ে নেমেছিল। এই বিড়িগড় এত দুর্গম যে দশপাল্লার রাজাও বহুদিন খোঁজ রাখতেন না যে এই পাহাড়চূড়োতে খন্দরা বসবাস আরম্ভ করেছে। বহুদিন বসবাস করার পর এই খন্দরা নিজেরাই পাহাড় থেকে পাকদণ্ডী বেয়ে নেমে দশপাল্লার রাজার কাছে গিয়ে তাদের অস্তিত্ব জানায়। তখন রাজা তাদের ওপরে অতি সামান্য খাজনা লাগু করেন। প্রতি বছর সৎ খন্দরা পাহাড় থেকে নেমে গিয়ে রাজার খাজাঞ্চিখানায় সেই কর জমা করতে থাকে। এই অঞ্চলে এরকম পাণ্ডব বর্জিত জায়গা সত্যিই আর দু'টো নেই। ভারতের প্রত্যেক বনাঞ্চলেই ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর অবধি কাজকর্ম সব বন্ধ থাকে। সে সময় বনবাসীরা ছাড়া আর কেউই বনে আসে না। তখন কাঠের কাজও হয় না। চোরাশিকারীরা হয়ত আসে তবে সব জায়গার বনপথই এত খারাপ হয়ে যায় যে যাতায়াতও প্রায় সম্ভব হয় না। যে কাজে এসেছিলাম, সেই কাজে যখন আর এগোনো সম্ভব নয়, তখন অম্বিকা পানিগ্রাহীর অন্ন ধ্বংস না করে আমাদের তো চলে যাওয়াই উচিত।"

ভটকাই বলল, "কোনো কাজই তো আমরা করলাম না। এলাম, খেলাম, শুলাম, তারপর চলে যাচ্ছি।"

"When there is nothing to be done, there is no point in trying to do something. আমরা একটা bottleneck-এ আটকে গেছি। এখন পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে একটা ওয়াইল্ড গেস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই গেসটা যদি সত্যি হয়, তবেই এই রহস্যর ফয়সালা হবে। আচ্ছা, তোদের কী মনে হয়, দুর্গা যা বলছে, এবং আমারও যা ধারণা তাতে মনে হয় না যে রামডাকুয়া কান্বখুন্টা সাপের কামড়ে মারা গেছে। কিন্তু তাহলে সে মরল কীসে? তোরা কি কিছু ভাবছিস?"

আমি বললাম, "ভাবছি না, তা নয়, কিন্তু ভেবে কোনো কুলকিনারা পাচ্ছি না। তুমি কী ভাবছ?"

"আমি যা ভাবছি, তা এখন তোদের বলব না। ভাবনাটা আর একটু দানা বাঁধুক, তার পরেই বলব।

দেখতে দেখতে বেলা পড়ে এল। নানা পাখির কলকাকলিতে বিড়িগড়ের মালভূমি মুখর হয়ে উঠল। কয়েক জোড়া ভালিয়াখাঁই পাখি গ্লাইডিং করে অস্তগামী সূর্যের দিকে ভেসে যেতে লাগল। সত্যিই, ঋজুদা যেমন বলেছিল, তেমনই মনে হল। ওরা যেন অস্তগামী লাল সূর্যের মধ্যে গিয়ে সেঁধোবে। এই সময় দেখা গেল কাবাড়িরা দল বেঁধে ফিরে আসছে বিড়িগড়ের দিক থেকে। ওরা বড় গাছ কেটে ফেলার পর টুকরো টুকরো করে। এমন টুকরো, যাকে ট্রাকে লাদাই করা যায়। তারপর মালভূমির একাধিক উঁচু জায়গায় সেই কাঠগুলিকে ওরা জড়ো করে রাখে এমন করে যাতে সে জায়গায় মার্সিডিজ ট্রাক দাঁড় করালে সে ট্রাকে কাঠগুলি ওপর থেকে ধাক্কা দিয়ে সহজে ফেলা যায়। তবে ট্রাকে লাদাই করার আগেই দুর্গা মোহান্তির কাজ সারতে হয়। সে ফিতে দিয়ে কাঠখণ্ডগুলিকে মেপে তাদের আয়তন এবং পরিমাণ— সবটা নোটবুকে লিখে রাখে। সে হিসাব সে ড্রাইভারদের হাতে দিয়ে দেয় যাতে কটকে পৌঁছে তারা অম্বিকাবাবুর মন্ডিতে যেসব কর্মচারী আছে তাদের কাছে দিতে পারে।

এখন একটিও ট্রাক নেই পাহাড়ের ওপরে তবে কাল ট্রাকগুলি আসবে এবং কাঠ লাদাই করে তারা বিড়িগড় মালভূমি থেকে নেমে বুনশাই হয়ে বুতরং নালা পেরিয়ে টাকরা হয়ে দশপাল্লার দিকে চলে যাবে। সেখানে ননার দোকানে খাওয়াদাওয়া সেরে কটকের দিকে রওনা হবে।

মহানদীর ওপারে এবং কটকের কাছেই চৌদুয়ার নামে একটি জায়গা আছে। সেখানে কাগজকল আছে। যখন কাঠের ঠিকাদারেরা মিলে বাঁশ সরবরাহ করে, তখন সেই বাঁশ সোজা কাগজকলে পৌঁছে দেয়। হাজার হাজার বাঁশ আবার আসে মহানদীর বুক বেয়েও। মহানদীর বুকে হাজার হাজার বাঁশের ভেলা বানিয়ে জঙ্গল থেকে তারা ভাসিয়ে দেয়। সেসব ভেলার ওপরে মাঝিরা থাকে, রান্নাবান্না করে, অনেকসময় সঙ্গে গরুও নিয়ে যায়। এই জলপথেও যোগাযোগ অটুট থাকে।

কৃপাসিন্ধু এবং হারিবন্ধু তাঁবুর মধ্যে পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে রেখে এল। তাদের বাবুর্চিখানায় লণ্ঠনের কাঁচ ছাই দিয়ে ঘষে-মেজে ঝকঝকে করে আবার সেই কাচ পরিয়ে লণ্ঠন জ্বেলে আবার যেখানে যেখানে রাখার, সেখানে রেখে এল। তাঁবুর বাইরে স্তম্ভের ওপর একটি পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে রেখে দিল। তাতে চারদিক আলোয় ভরে উঠল। চারপাশ থেকে একটানা ঝিঁঝির ডাক শুরু হল।

কিছুক্ষণ পর দুর্গা মোহান্তি অন্যদের সঙ্গেই হাত-পা-মুখ ধুয়ে তাঁবুর কাছে এসে ঋজুদাকে বলল, "মু অসি গলা ঋজুবাবু।"

ঋজুদা বলল, "হৌ। ভিত্যরকো চলো।"

তারপর ঋজুদা গলা তুলে কৃপাসিন্ধুকে বলল আমাদের জন্য আর এক প্রস্থ চা আর দুর্গার জন্য কিছু খাবার পাঠিয়ে দিতে। তারপর আমরা সকলে গিয়ে তাঁবুর মধ্যে ঢুকলাম।

ঋজুদা জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, মুরলি প্রধানকে তো দেখলাম না!"

"না। মুরলি প্রধান এখানে নেই। সে বিশেষ কাজে টাকরাতে গেছে। ফিরতে ফিরতে আরও দু'দিন লাহবে।"

"সে ছেলেটি কেমন?"

"ভালো ছেলে। তবে সে রামডাকুয়ার মতোই টেঁটিয়া বলে সে বাবুকেও মানে না, রামকেও মানে না। মাঝেমাঝেই তার সঙ্গে রামের খটাখটি লেগে যায়। তবে কুলি-কাবাড়িরা রামকে যেমন মানে, ওকেও তেমনই মানে।"

"তাই?"

"হ বাবু।"

কৃপাসিন্ধু দুর্গার জন্যদু'টো হাতে গড়া রুটি ডিম দিয়ে ভেজে মোগলাই পরোটার মতো করে তার মধ্যে পেঁয়াজ কুচি, কাঁচালঙ্কা ইত্যাদি দিয়ে নিয়ে এল আর আমাদের জন্য একটু পেঁয়াজি আর চা নিয়ে এল।

ভটকাই মনমরা হয়ে একপাশে বসে ছিল। খাদ্যপানীয়র এত অভাব হচ্ছে এখানে যে ভটকাই তার স্বাভাবিক ছন্দে নেই। সে না পারছে শেফের মতো বিভিন্ন জিনিস অর্ডার করতে, না পারছে নিজের হাতে কিছু কেরদানি দেখাতে। তিতির থাকলে বলত, "ওরে ওরে ভটকাই / অবিরাম খাইখাই / আয় তোকে চটকাই।" তিতির না থাকায় ওর পেছনে লাগার কেউ ছিল না। তাই ও অমনোযোগের সঙ্গে আমাদের কথা শুনছিল।

এবার ঋজুদা জিজ্ঞাসা করল, "কী বুঝছ দুর্গা? এই কাবাড়িদের কি আমাদের খুব অপছন্দ হয়েছে! একজনও তো কথা বলল না! হাসলও না কেউ।"

দুর্গা কপালের কুঁচকোনো বলিরেখা আরও কুঁচকে বলল, "হ বাবু। আপনারা আমার বাবুর লোক। সে জন্যই। একটা কথা বলব ঋজুবাবু?"

"হ্যাঁ বলো!"

"আপনারা কাল সকালেই চলে যান এখান থেকে।"

"কেন বলো তো?"

"আপনাদের বিপদ হতে পারে।"

"তার মানে?

"এই মানুষগুলোর তো হারাবার কিছুই নেই! বাবুর ওপর তাদের এমনই রাগ জমেছে যে বাবুর অতিথিদেরও ওরা কুড়ুল দিয়ে মাথাগুলো নামিয়ে দিতে পারে। এখানে তো আইনকানুনের বালাই নেই। না আছে পুলিশ, না আছে কোতোয়ালি, থাকবেই যদি, তাহলে কি আর রামডাকুয়ার মৃত্যুটা এভাবে চাপা পড়ে যায়! আমার মনে হয় না আপনাদের এখানে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।"

"রামের মৃত্যুর পর এখানকার কেউ খোঁজখবর করতে আসেনি!"

"না। পুলিশের টিকি বাঁধা তো আমার বাবুর আঙুলে। তাই কিছুই হল না। এনকোয়ারি হল না, পোস্টমর্টেম হল না, ডেডবডি পুলিশে নিয়েও গেল না, রামডাকুয়ার মৃত্যুর কয়েকঘন্টার মধ্যেই তার শব জ্বালিয়ে দেওয়া হল বিড়িগড় দুর্গের নীচে। আরও একটা কথা, আপনারা ফিরে গিয়ে বাবুকে বলবেন, উনি যেন বেশ কিছুদিন এখানে আর না আসেন। বাবুরা প্রায় সকলে একই রকম হন। কিন্তু তাদের মধ্যেও এই পানিগ্রাহীবাবু একেবারে অন্যরকম। রামডাকুয়ার ওপর ওঁর একটা ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল। অথচ ও যা করত, তা এদের সকলের জন্যই। সে কেবল নিজের ভালো চাইলে বাবুর আজ্ঞাবহ হয়ে অনেক কিছুই তার নিজের জন্য বাগিয়ে নিতে পারত। কিন্তু সে তা নেয়নি। এই মানুষগুলোর এত অভাব, এত অসুবিধা, এবং এদের সঙ্গে বাবুর এই অমানুষিক ব্যবহার ও সহ্য করতে পারত না। সে জন্যই বেচারার নিজের প্রাণটি দিতে হল।"

"সবই তো বুঝলাম, কিন্তু রামডাকুয়া মরল কী করে? তোমরা বলছ সাপে কামড়ায়নি, কৃপাসিন্ধুরা কোনো শব্দও শোনেনি, একটা জলজ্যান্ত মানুষকে যদি অন্য কেউ খুনও করে, তবে একটু ধ্বস্তাধ্বস্তি, একটু চেঁচামেচি তো শোনা যেত! কেউ কিছু দেখল না, শুনল না! তাহলে কি ভূতে এসে মারল রামডাকুয়াকে!"

"ভূতে মারলে তো রক্ত বেরোত না। রক্তও তো অনেক বেরিয়েছে। অথচ তাকে না মারল বাঘে, না পারল সাপে, অথচ সে মরল কীসে?"

"হুঁ। সেটাই তো রহস্য। আচ্ছা, তোমার মেয়ে কেমন আছে? তার বিয়ে দিয়েছ?"

"আপনার মনে আছে?"

"মনে থাকবে না! খুবই মনে আছে। তবে আমি ভুলে গেছিলাম যে এর মধ্যে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর চলে গেছে।"

দুর্গা হেসে বলল, "আমার নাতনির বিয়ে হল সেদিন।"

"তোমার জামাই কী করে?"

"জামাইও কাবাড়ির কাজই করত। বিশু সাঁই ঠিকাদারের কাছে। সেও দু'দিনের জ্বরে মারা গিয়েছিল।"

"তোমার নাতজামাই কী করে?"

"রাজমিস্ত্রির কাজ করে। নাতজামাই আমাদের মতো নয়। সে বড়লোক। তার রোজ দিনে পঞ্চাশ টাকা।"

"বাঃ বাঃ! খুব ভালো। তোমার মেয়েকে আমার কথা বোলো যে আমি মনে রেখেছি। তোমার মেয়ে তো খুব সুন্দরী ছিল!"

"সুন্দরী দিয়ে কী হবে বাবু! কাবাড়ির মেয়ে। কাবাড়ির সাথেই বিয়ে হয়েছিল, সে অল্প বয়সেই মরে গেল।"

ঘন্টাখানেক পরে কৃপাসিন্ধু আমাদের খাবার দিয়ে গেল। দুর্গা বলল, "আমি বাবুর্চিখানায় গিয়ে মেঝেতে বসে খাব।"

ঋজুদা বলল, "না। তুমি আমাদের অতিথি। তুমি আমাদের সঙ্গেই বসে খাবে।"

খাওয়াদাওয়ার পরে ঋজুদা গলা নামিয়ে বলল, "আমরা তোমার কথামতো কাল সকালেই চলে যাবে।" তারপর পকেট থেকে একটা পাঁচশো টাকার নোট বের করে দুর্গাকে দিয়ে বলল, "এটা তোমার বউকে দিও।"

"এত টাকা! না বাবু। আমি নেব না।"

"আলবাত নেবে! আমি তো টাকাটা তোমাকে দিইনি! তোমার বউকে দিয়েছি। কাল সকালে তোমরা তো কাজে চলে যাবে, আমাদের তৈরি হয়ে নাস্তা করে বেরোতে বেরোতে দেরি হবে। তোমার সঙ্গে তো আর দেখা হবে না! তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে খুবই ভালো লাগল। কত জঙ্গলের ঘটনার তুমি সাক্ষী। কত সুখদুঃখের ঘটনা ভাগ করে নিয়েছি আমরা। ভালো থেকো দুর্গা।"

দুর্গা মোহান্তি হাতজোড় করে নমস্কার করে ঋজুদাকে বলল, "আপনিও ভালো থাকবেন বাবু। আপনার তো বয়স হয়েছে এখন। সেই আগের ঋজুবাবু তো আপনি নেই!"

"হ্যাঁ। বয়স কাউকেই ছাড়ে না। ভালো থেকো।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

সকালে ব্রেকফাস্ট করে তৈরি হয়ে বেরোতে বেরোতে প্রায় আটটা বেজে গেল। পাল্প ড্রাইভার জিপ স্টার্ট করতে ঋজুদা স্বগতোক্তি করল, "কিং কর্তব্যম?"

ভটকাই বলল, "মানে? কটকে যাবে না?"

"সেই কথাই তো ভাবছি। গিয়ে তাকে কোন সুখবরটা দেব? তবু, না গেলেও না। তাই চল। দু'দিন তোর খাওয়াদাওয়ার বড় কষ্ট হল। অম্বিকার বাড়িতে গিয়ে আবার চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খেয়ে আবার ফর্মে ফিরে আসবি।"

ভটকাই বলল, "যত দোষ নন্দ ঘোষ।"

সকালের রোদ্দুরে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে নামতে গিয়ে নানা পাখির শব্দ, জন্তুর শব্দ কানে আসতে লাগল। ভটকাই স্বগতোক্তি করল, "জঙ্গল মে মঙ্গল।"

পাহাড় থেকে নামতে আমাদের ঘন্টাখানেক লাগল। বুরুশাই গ্রামের পাশ দিয়ে বুতরং নালার ডান পাড় ঘেঁষে আমরা চলতে লাগলাম টাকরার দিকে। সেখানে পৌঁছে

একজিমাতে জীবনে লক ডাউন নয়

ফেলে আসা দিনগুলিতে একজিমা রোগী লজ্জা পেতেন আর প্রতিবেশীরা পেতেন ভয়। এই নেটের যুগেও অবস্থা বিশেষ বদলায়নি। অথচ একজিমা ছোঁয়াচে নয়, সঠিক চিকিৎসায় এই রোগ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে জানালেন— কলকাতার ইন্সটিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ-এর অধ্যাপক, ইনডিয়ান সোসাইটি ফর পেডিয়াট্রিক ডার্মাটোলজির প্রেসিডেন্ট ও ওয়ার্ল্ড একজিমা কাউন্সিলের ভারতীয় প্রতিনিধি **ডা. সন্দীপন ধর।**

প্রশ্ন : একজিমাতে কি ধরণের অসুবিধা হয়?

ডা. ধর : একজিমার প্রাথমিক পর্যায়ে শরীরের এখানে ওখানে চুলকানি দেখা দেয়। থামে না, চুলকাতে চুলকাতে লাল র‍্যা শ বেরিয়ে যায়, কেটে বা ফেটে গিয়ে রস বেরোতে পারে, রক্তও বেরোয় কখনও। এই চুলকানি ছড়িয়ে পড়তে পারে সারা শরীরেও। গোড়াতে ত্বকের এই রোগ সাধারণত হাঁটুর পেছন দিক, কনুই, বগল বা থাইতে দেখা দেয়, তবে দেহের অন্য অংশেও দেখা দিতে পারে। শিশু বা কিশোরদের ক্ষেত্রে অনেক সময় আক্রান্ত স্থানে রঙিন বা সাদা প্যাচ দেখা যায়। কখনও বা ত্বকটি গোটা আঁচিলের মতো ফুলে ওঠে। অনেক সময়ে ওখান থেকে শুকনো খোসার মতো ছাল উঠতে পারে। এই ধরণের কোন সমস্যা দেখা দিলে দেরী না করে অবশ্যই ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিৎ। অবহেলা করলে একজিমা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে বা সেকেন্ডারি ইনফেকশন হতে পারে। এক্ষেত্রে সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন : একজিমা কি রোগ না অন্য কোন রোগের উপসর্গ?

ডা. ধর : একজিমার সঠিক কারণ জানা যায় না। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটি অ্যাটপিক ডার্মাটাইটিস (এডি) নামের একটি অসুখের প্রধান উপসর্গ। শতকরা আশি শতাংশ ক্ষেত্রে এডি হলে একজিমা হয় বলে বর্তমানে এডি ও একজিমাকে সমার্থক ধরা হয়। এডি আসলে একজিমা, হে ফিভার, হাঁপানি, অ্যালার্জি, সর্দি প্রভৃতি অনেকগুলি অসুখের সমন্বয়। আবার বহু এডি রোগী এক সঙ্গে হাঁপানি ও একজিমাতে ভোগেন বলে আগের দিনে মনে করা হত একজিমা হলে হাঁপানি হয়। তবে একথা সত্য যে এডি বা একজিমা সবই শুষ্ক ত্বকের রোগ। এডি বা অ্যাটপিক ডার্মাটাইটিস কথাটির অর্থ 'অজানা ত্বকের অসুখ'। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে এর কথা জানা যায়। পরিবেশ দূষণ, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে শুধু আমাদের দেশেই নয় সারা পৃথিবীতেই এডি বাড়ছে।

প্রশ্ন : শুনেছি একজিমা নাকি সারে না?

ডা. ধর : ঠিকই, ডায়াবিটিস, হাইপারটেনসান বা অন্য অনেক লাইফ স্টাইল ডিজিজের মতোই এডি বা একজিমা সারে না কিন্তু সঠিক ও যথাযথ চিকিৎসায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে। এজন্য এই ধরনের অন্য অনেক অসুখের মতো সারা জীবন ওষুধও খেতে হয় না। তবে দৈনন্দিন জীবনে কিছু নিয়ম মেনে চললে এডি বা একজিমা রোগীরা সারাজীবন ভালো থাকতে পারেন।

প্রশ্ন : ছোটদেরও কি একজিমা বা এডি হতে পারে?

ডা. ধর : একজিমা বা এডি কোন বয়স মানে না, ছোট থেকে বড় সকলেরই ত্বকের এই অসুখ হতে পারে। আবার এডি জনিত একজিমা সারা বিশ্ব জুড়েই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছোটবেলায় শুরু হয়, এই রোগীদের অর্ধেকই আক্রান্ত হয় পাঁচ বছরের নিচে। দুই বছরের বাচ্চাকেও এডিতে আক্রান্ত হতে দেখা গেছে।

প্রশ্ন : কি ধরণের নিয়ম মেনে চলতে হয়?

ডা. ধর : ছোট বড় সব বয়সের এডি বা একজিমা রোগীরা প্রাত্যহিক জীবনে এই নিয়মগুলি মেনে চললে ভালো থাকবেন :

- এই অসুখে আক্রান্ত সকলেরই শীত, গ্রীষ্ম সারা বছরই সামান্য উষ্ণ জলে স্নান করা উচিৎ।
- স্নানের পর খুব নরম তোয়ালে বা গামছা দিয়ে না ঘষে স্পঞ্জ করে জল মুছতে হবে।
- স্নানের তিন মিনিটের মধ্যে সারা শরীরে নারকেল তেল বা ডাক্তারবাবু নির্দেশিত কোন ময়েশ্চারাইজার দিয়ে ম্যাসেজ করতে হবে। এটি ত্বকে ভেজা ভাব বা জল ধরে রাখতে সাহায্য করে। এর ফলে শুষ্ক ত্বক নরম থাকে।
- অতিরিক্ত শীতল বা উষ্ণ আবহাওয়া এড়িয়ে চলতে হবে।
- যত দূর সম্ভব অল্প ডিটারজেন্ট যুক্ত সাবান ও শ্যাম্পু বড়রা সপ্তাহে দুই দিন ও ছোটরা সপ্তাহে একদিন ব্যবহার করবেন।
- এডির কারণে একজিমা হলে রোগীকে ধুলো, ধোঁয়া ইত্যাদি অ্যালার্জেন এড়িয়ে চলতে হবে। ফুড অ্যালার্জি থাকলে ডিম, চিংড়ি, কাঁকড়া জাতীয় খাবার ও বিশেষ কোন খাবার সহ্য না হলে সেগুলিকে ডায়েট থেকে বাদ রাখতে হবে।
- একজিমাতে ভালো থাকতে হলে নিজের শুধু শরীর নয় মনকেও ভালো রাখতে হবে। কারণ একজিমা অনেকটা সাইকোসোমাটিকও। তাই কোন রকম মানসিক চাপ বা টেনশন চলবে না।
- এই ধরনের ত্বকের অসুখ থাকলে কখনও গ্লিসারিন ব্যবহার করা উচিৎ নয় কারণ গ্লিসারিনে প্রথমে ত্বক কিছুটা ভিজে থাকলেও পরে শুষ্ক হয়ে যায়।

প্রশ্ন : একজিমা কি কোন ভাবে ছোঁয়াচে অসুখ?

ডা. ধর : একজিমা কোন জীবাণু ঘটিত অসুখ নয় তাই এই রোগ কোনভাবেই সংক্রামক না। এজন্য একজিমা রোগীকে ভয় পাবেন না, একজিমা রোগীর পাশে দাঁড়ান। মনে রাখবেন এই অসুখের কোন লক্ষণ দেখলেই ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিৎ। কোভিডের জন্যও ভয় পাবেন না। সব চিকিৎসা কেন্দ্রেই নিয়মমতো সুরক্ষার বিধি মেনে চলা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বাজার চলতি ক্রিম বা লোশনের সাহায্যে নিজে ডাক্তারি করলে ক্ষততে ব্যাক্টেরিয়া বা ফাঙ্গাসের আক্রমণে সেকেন্ডারি ইনফেকশন হয়ে অবস্থা জটিল উঠতে পারে। আজকের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থায় ছোট বয়সে একজিমা কমে গেলে সাধারণত বড় হলে আর ফিরে আসে না। তাই একজিমা হয়েছে বলে নিজেকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠাবেন না। সাবধানে থাকুন, ভালো থাকুন। লক ডাউন নয় নিয়ম মেনে জীবন থাকুক আনন্দে। যথাযথ বিধি মেনে পুজো উপভোগ করুন।

হেল্পলাইন 9874968139 / 8777644497

সকাল ১১টা থেকে রাত্রি ৯টা

দশপাল্লার রাস্তা ধরলাম। ভটকাই বলল, দশপাল্লাতে বিরিবড়া আর পোড়পিঠা হবে তো?"

"তুই তো ব্রেকফাস্ট করেছিস একঘন্টাও হয়নি। এর মধ্যেই তোর খিদে পেয়ে গেল!"

"খিদে! পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে। তোর আর আমার লিভার তো এক নয়! তোর ফ্যাটি লিভার, আমার হেলদি লিভার। তাই খাবার হজম হতে দেরি হয় না।"

পাম্ব ড্রাইভার বিশেষ কথাবার্তা বলছিল না, তবে তার হাবভাবে বোঝা যাচ্ছিল যে সে তার বাবুর দলে না, আমাদের দলে। তার বাবু প্রচণ্ড বড়লোক এবং প্রচণ্ড ক্ষমতাবান। কিন্তু তিনি তাঁর কর্মচারীদের কারোর মনের ওপরই কোনো প্রভাব ফেলতে পারেননি। আমরা যে যার মতো নিজের নিজের ভাবনা ভাবছিলাম, হঠাৎ ভটকাই বলল, "মানুষ দুই প্রকার। ভালো এবং মন্দ।"

আমি বললাম, "তুই থাম তো, মাঝেমাঝে তোর এই জ্ঞানদান আমার একেবারেই অপছন্দ।"

"তোর জ্ঞান থাকলে তবে তো তুই দিবি! আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার উপচে যেটুকু পড়ে, সেটুকু তোদের কাছে গিয়ে পড়ে।" আমি আর ঋজুদা দু'জনেই ওর কথায় হেসে উঠলাম।

ঋজুদা পাম্বকে জিজ্ঞাসা করল, "এই কাঠের ব্যবসা তো তোমার বাবুর একটা ব্যবসা। বড় বড় ব্যবসার মধ্যে আর কী কী আছে?

"মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং বানানোর ঠিকাদারি আছে, কোল-ওয়াশারি প্ল্যান্ট আছে, ওষুধের কারখানা আছে, মোটর লঞ্চ বানাবার কারখানা আছে, আরও কত কী আছে, সেসব কি আমি জানি! বাবুর সব কারখানা মিলিয়ে শুনেছি প্রায় হাজার তিনেক লোক কাজ করে।"

"এতগুলো ব্যবসা সামলায় কে? বাবুর ছেলেরা তো এখনও বিদেশে পড়াশোনা করে।"

"বাবুর অনেক ম্যানেজার-ট্যানেজার আছেন। একজন পাঞ্জাবী, একজন মাদ্রাজি, আর দু'জন বাঙালি।"

ভটকাই বলল, "ছেলেরা বিদেশে কী পড়তে গেছে?"

"তা তো আমি জানি না বাবু।"

ঋজুদা বলল, "উরুনাকোটে শিকারে গিয়ে অম্বিকা আমার পিস্তলটা দেখেছিল। ওর খুব পছন্দ হয়েছিল।"

"কোন পিস্তলটা?"

"আমার তো একটাই পিস্তল! .২২।"

"ও সেই স্প্যানিশ পিস্তলটা না? লামা!"

"ইয়েস। সেই পিস্তলটা দেখে অম্বিকার রোখ চেপে গেল ওকে ওরকম একটা পিস্তল কিনতেই হবে। আমার সাউথ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের বন্ধু শ্যামল চন্দ্র দাঁয়ের আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবসা ছিল। তোরা দেখে থাকবি, ধর্মতলা আর চৌরঙ্গীর মোড়ে জি সি লাহার যে রঙের দোকান আছে, তার উল্টো দিকেই এ টি দাঁয়ের বহু পুরনো বন্দুকের দোকান রয়েছে। সেটি ছিল শ্যামলদের পারিবারিক ব্যবসা। ওদের কোম্পানির একটা ব্রাঞ্চ ছিল কটকে। শ্যামল সেই ব্রাঞ্চটারই দেখাশোনা করত। তার ছিল মাথাজোড়া টাক। শ্যামলের ছেলে বাবার টাকা কী পেয়েছিল জানি না, তবে টাকটা একশোভাগ পেয়েছিল। ওদের যৌথ পরিবারের বাড়ি জোড়াসাঁকোয়। দাঁ বাড়ির দুর্গাপুজো এখনও বিখ্যাত। উরুনাকোট থেকে ফিরে আমিই অম্বিকাকে নিয়ে গিয়ে শ্যামলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। বছর তিন-চারেক হল শ্যামল ওপরে গেছে এবং তার ছেলেও অকালে তার বাবার খোঁজে ওপরে চলে গেছে। এই শ্যামলই খোঁজখবর করে একটি .২২ পিস্তল এনে দিয়েছিল— কোন কোম্পানি আমার মনে নেই— সম্ভবত আমেরিকান কোল্ট হবে। এই পিস্তলগুলির গুলির দাম যেহেতু কম, ছোট ছোট গুলি, তাই অনেকেই এই পিস্তল পছন্দ করেন। খুবই ছোট গুলি হলেও মানুষের মতো নাজুক প্রাণী মারতে এই পিস্তলই যথেষ্ট। তোদের হয়তো জানা নেই, লি হার্ভি অসওয়াল্ড হুডখোলা গাড়িতে সফররত আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জন কেনেডিকে গুপ্তস্থান থেকে গুলি করে মারে। কেনেডির সঙ্গে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত সুন্দরী স্ত্রী জ্যাকলিনও সেই গাড়িতেই ছিলেন। জন কেনেডির মাথায় গুলি লেগেছিল। একাধিক গুলি। কিন্তু জ্যাকলিনের কিছু হয়নি। কেনেডির মৃত্যুর কিছুদিন পরেই তিনি পৃথিবীর অন্যতম ধনী শিল্পপতি গ্রিক টাইকুন আর ই ওনাসিসকে বিয়ে করেন। সেসব অনেক ঘটনা। তোদের এসব জানার কথা নয়। তোরা তখন জন্মাসনি, আর জন্মালেও হামাগুড়ি দিচ্ছিস। কেনেডির মৃত্যুর কিছুদিন পরেই আমেরিকান অ্যাটর্নি-জেনারেল, কেনেডির ছোটভাই রবার্ট কেনেডিকে এক পার্টিতে মাথায় .২২ পিস্তল দিয়ে গুলি করে খুন করে আততায়ী। তাই ঘাতক অস্ত্র হিসেবে .২২ পিস্তলের বিশেষ দুর্নাম আছে।"

আমি বললাম, "তুমি কি রামডাকুয়ার মৃত্যুর সঙ্গে পিস্তলের কোনো সাযুজ্য দেখছ?"

"দেখছি না, তবে সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছি না। তুই তো আমার পিস্তলটা দেখেছিস। আমাদের সঙ্গেই তো আছে। তার গুলিও তুই দেখেছিস। কত ছোট গুলি হয়। সেই পিস্তল যদি কারুর কানের ফুটোতে ঢুকিয়ে ট্রিগার টেনে দেওয়া হয়, তাহলে কি তার মৃত্যু হতে পারে?"

ভটকাই বলল, "অবশ্যই মৃত্যু হতে পারে।"

আমি বললাম, "যত ছোট গুলিই হোক, তা যদি কান দিয়ে মগজে প্রবেশ করে, তবে মৃত্যু তো অবধারিত। রক্তপাতও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু শব্দ?"

"শব্দ ঢাকার উপায় নেই। তাই পিস্তল দিয়েই যে রামডাকুয়াকে মারা হয়েছিল, এ ধারণা হয়তো পুরোপুরি ভুল। তবে, শব্দকেও নিঃশব্দ করার যন্ত্র আছে।"

"কী যন্ত্র?"

"সাইলেন্সার। পিস্তলের মুখে সাইলেন্সার ফিট করে নিলে কেবল একটা সংক্ষিপ্ত "ঢপ" করে আওয়াজ হবে। পাশে শুয়ে থাকা লোকও সে আওয়াজ শুনতে পাবে না।"

"তাহলে তুমি কি বলতে চাইছ—"

"আমি কিছুই বলতে চাইছি না। খালি সম্ভাবনাগুলোকে মাথার মধ্যে নাড়াচাড়া করছি। তাছাড়া অম্বিকা সেই পিস্তলে পরে সাইলেন্সার লাগিয়েছিল কিনা, তাও তো আমাদের জানা নেই!"

"কিন্তু রামডাকুয়ার মৃত্যুর দিন অম্বিকাবাবু ছাড়া আর কাউকে সেখানে সন্দেহ করা যাচ্ছে না!"

"হ্যাঁ। ওর প্রতিদ্বন্দ্বী মুরলি প্রধানও যে সেদিন বিড়িগড়ে ছিল না সে খোঁজও আমি করেছি। এখন রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য এই সাইলেন্সার রহস্যটাই আগে উদঘাটন করতে হবে। অম্বিকা কিন্তু আগে এরকম ছিল না। তবে এই আমিময়তা ওর মধ্যে ছিলই। সেটা বোধ হয় এত বছরে আরও বেড়ে গেছে। দেখবি, এক ধরনের লোক থাকে, তারা আত্মবিশ্বাসী। আত্মবিশ্বাস খুব ভালো গুণ। কারুর মধ্যে থাকাটাও দোষের না। কিন্তু আত্মবিশ্বাস যদি বাড়াবাড়ি রকমের থাকে, সেটা

নিন্দার। সেটাকেই হিন্দিতে বলে 'ঘামন্ড' আর ইংরেজিতে বলে মেগালোম্যানিয়া। সেটা অ্যারোগেন্সের চরম এবং সেটা দূষণীয়। আমাদের দেশের অনেক নেতানেত্রী কীভাবে নমস্কার করেন দেখেছিস? নমস্কার মানুষ করে বিনয় সহকারে, হাসিমুখে। ওঁরা এমনভাবে নমস্কার করেন, মনে হয় যেন যাদের নমস্কার করছেন, তাদের ধন্য করে দিচ্ছেন। যখন থ্যাঙ্ক ইউ বলেন, তখনও তেমনই মনে হয়। এই অতিমাত্রায় আমিময়তা, অ্যারোগ্যান্স, এবং মেগালোম্যানিয়া অন্য মানুষকে আহত করে— এই সাধারণ বুদ্ধিটুকুও বোধহয় এই অসাধারণ মানুষদের লোপ পেয়ে যায়। এই ধরণের মানুষরা মনে করেন, তাঁরা যা ভাবেন, তাঁরা যা বলেন, এবং তাঁরা যা করেন, সেটাই শেষ কথা। অন্যের মতামতের কোনো ভূমিকাই তাদের কাছে নেই। কথায় বলে 'বিদ্যাং দদাতি বিনয়ং'। এই বিদ্যার অভাবই হয়তো এদের এই দুর্বিনয়ের কারণ। তোরা কোনোদিন কোনো মুসলমানকে সামনে বসে নামাজ পড়তে দেখেছিস?"

"না।"

"কেন দেখিসনি জানি না। তোরা কি চোখ-কান খুলে চলিস না! রাস্তায় অনেক জায়গাতেই তো মুসলমানদের নামাজ পড়তে দেখা যায়। চোখ-কান খুলে রাখলে দেখবি আশপাশের মানুষের থেকেও আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। লক্ষ্য করে দেখবি, এই নামাজও একরকমের যোগব্যায়াম। নামাজ পড়ার সময় বেশি সময় ওঁরা নেন না, কিন্তু কতগুলি অতি সহজ আসন ওঁরা করেন, তাতে শরীর ও মনের খুবই উপকার সাধিত হয়। খাঁটি মুসলমানদের দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার কথা।"

"ওয়াক্ত মানে কী?"

"আরে গাধা, ওয়াক্ত একটা উর্দু শব্দ। মানে হল সময়। পাঁচ ওয়াক্ত মানে পাঁচ বার। সকালবেলা ফজিরের নামাজ দিয়ে শুরু হয়, শেষ হয় ঈশার নামাজে। আমাদের হিন্দুধর্মটি অত্যন্ত শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন। এই ধর্মাচরণ অত্যন্ত প্রলম্বিত। হিন্দুদের মধ্যে যে ব্রাহ্মণ্যবাদ দেখা যায়, তা কিন্তু এই রীতিনীতি আচার-আচরণের থেকে অনেকটাই উদ্ভূত। অথচ মুসলমানদের দেখ, তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হল ঈদ। অনেকগুলো ঈদ আছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান কলকাতায় ময়দান ও রেড রোডে সকালবেলায় অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে হাজার হাজার মুসলমান সেদিন ধবধবে সাদা পোশাকে নামাজ পড়তে আসে। মুসলমানরা যেখানে নামাজ পড়ে, সেই জায়গাটিকে বলে ঈদগা। স্বল্প সময়ে তারা নামাজ পড়ে, এবং তারপর হয় খুটবা, অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে দোয়া প্রার্থনা। তারপরই অত হাজার হাজার মানুষের প্রার্থনাসভা সাঙ্গ হয়। সকলেই দাঁড়িয়ে একে অন্যের সঙ্গে কোলাকুলি করে। এই সৌহার্দ্য ইসলাম ধর্মের মধ্যে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রোথিত আছে। আমরাও কোলাকুলি করি না, তা নয়, কিন্তু কোলাকুলি করি বিজয়া দশমীর পরে। প্রতিমা যখন ভাসান যান, তখনই সামান্য ক্ষণের জন্য একে অন্যকে আলিঙ্গন করি আমরা। আমাদের এই ধর্মাচরণে দীর্ঘসূত্রিতা আমাদের চরিত্রের মধ্যেও আমাদের অজ্ঞাতে চারিয়ে গেছে। আমি হয়তো মূর্খ অথবা ভুল, কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতার পুজোয় আমরা যা সময় এবং উদ্যোগ খরচ করি, সেটা অন্যত্র করলে আমাদের অশেষ উপকার হত। বেরাদরি ব্যাপারটা আমাদের মধ্যে তেমন দেখি না। খয়রাত, জাকাত— এই সব ওদের ধর্মে গভীরভাবে আছে। আমাদের জমিদারবাড়িতে যে প্রচুর অর্থব্যয়ে রাজসূয় আয়োজনে পাঁচদিনব্যাপী পূজা সাধিত হয়, তখন সেই জমিদারীর অধীন হাজার হাজার গরিব-গুর্বো মানুষ অপার বিস্ময়ের সঙ্গে দেব-দেবতা এবং জমিদারদের অর্চনা করে।"

"হঠাৎ তুমি এই বিষয়ে চলে এলে কেন? হচ্ছিল রামডাকুয়ার মৃত্যুরহস্যের কথা, এর মধ্যে এই সব প্রসঙ্গ!"

"চলে এল এই জন্য যে অম্বিকা পানিগ্রাহীর যে ঘামন্ড, বা আমিময়তা এবং মেগালোম্যানিয়া— তা রামডাকুয়ার মতো একটি সৎ ছেলের প্রাণ নিয়ে নিল। এর জন্য আমাদের উচ্চমন্যতা একাংশে দায়ী। অম্বিকা অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু। আমার মনে হয়, ওর এই আমিময়তার জন্মের জন্য ওর এই গোঁড়া হিন্দুত্ব অনেকাংশে দায়ী। স্বয়ম্ভু না হয়েও আমি যেন অবিসংবাদী, অজেয়, এবং অমোঘ— এরকম একটু বোধ যখন নিজের অজান্তে নিজের মনে জন্মে যায়, তখন মানুষ এরকম হয়ে যায়। আমাদের দেশে বহু যুগ ধরে ক্ষমতাবানদের হাতে ক্ষমতাহীনরা বঞ্চিত, নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত হয়ে এসেছে তাদের নিজেদের দোষে। এই মেগালোম্যানিয়া একসময় এনডেমিক ছিল। তারপর এপিডেমিকে পর্যবসিত হল, এখন এটা প্যান্ডেমিক। রামডাকুয়া কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের সভ্য ছিল না। এদেশের রাজনীতিও আমাদের এই অন্ধ ধর্মাচরণের মতো এক নীতি। এর সঙ্গে দেশবাসীর শুভর যোগ খুব কমই আছে। যত না আছে বিভিন্ন নেতাদের ধন, মান, ও ক্ষমতার লোভ। এই মুষ্টিমেয় অসাধারণ মানুষদের আমিময়তার নীচে অগণ্য সাধারণ মানুষদের এবং দেশবাসীর উন্নতি এবং স্বাচ্ছন্দ্য চাপা পড়ে গেছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঋজুদা বলল, "যেদিন এ দেশে রামডাকুয়ার মতো শ্রমিক নেতারা আসবে, যারা অন্য শ্রমজীবীদের জন্য নিজের প্রাণ হেলায় বিসর্জন দেবে, সেদিন হয়তো এ দেশের ট্রেড ইউনিয়নিসম সার্থক হবে। আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে মনে হয়, এ সমস্ত ব্যাপারই অসংলগ্ন। কিন্তু আদতে তা নয়। এদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সংযোগ আছে। এবং কান টানলে মাথা আসার মতো এদের একটিতে টান পড়লে অন্যটি আন্দোলিত হয়।"

আমি বললাম, "ঋজুদা, আমার কিন্তু অম্বিকা পানিগ্রাহীর বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করছে না।"

"কেন?"

"আমাদের সকলেরই মনের কোণে যখন একটা সন্দেহ দানা বাঁধছে যে রামডাকুয়ার মৃত্যুর জন্য অম্বিকাবাবু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী, তার বাড়িতে গিয়ে আতিথেয়তা নিতে আমার বাধো বাধো ঠেকছে।"

"তুই তো একমাত্র মহৎ প্রাণ নোস! মন আমার আর ভটকাইয়েরও আছে। আমাদের মনেও এরকম কোনো ভাবনা নড়াচড়া করছে। কিন্তু কটকে না গেলে এই রামডাকুয়ার মৃত্যু রহস্যের কিনারা তো হবে না। অম্বিকাই পারে এই রহস্য সমাধানে সাহায্য করতে।"

"তা ঠিক। কিন্তু ওঁর ওই উগ্র আতিথেয়তা গ্রহণ করতে আমার কেমন যেন সংকোচ লাগছে। ভটকাই বলল, তুই কি "বর্বরস্য ধনক্ষয়" কথাটা শুনিসনি? বর্বরের ধনক্ষয় করায় কোনো দোষ নেই। তাছাড়া, আমাদের উপায়ই বা কী?"

"বেশ। তোমরা যা ভালো মনে করো।"

কিছুক্ষণ পরে বেশ কিছু দূর থেকে দশপাল্লা শহর দেখা গেল। যে দোকান থেকে বিরিবড়া খেয়েছিলাম, সেখানে পাল্ব

ড্রাইভার জিপটা দাঁড় করাল। আমি বললাম, "আমি বিরিবড়া খাব না। আমার পেটে কলাইয়ের ডাল স্যুট করে না।"

"তবে তুই কী খাবি?"

"আমি প্লেন দোসা সম্বর আর রসম দিয়ে খাব। আর একটা কফি খাব।"

"আর ভটকাই?"

"আমি বিরিবড়াও খাব, দোসাও খাব। বিড়িগড় পাহাড় থেকে নামতে নামতেই তো সকালের খাবার হজম হয়ে গেছে।"

"আর পোড়পিঠা খাবি না?"

"আহা, ওটা তো খেতেই হবে! নাহলে হজম হবে কী করে!"

দোকানে গিয়ে খাবারের অর্ডার দেওয়ার পর ঋজুদা পাল্ব ড্রাইভারকে বলল, "পাল্ব, তুমি তো জিপ চালাচ্ছ। পরিশ্রম তো তোমারই হচ্ছে। ভালো করে খাও। যা কিছু তোমার খেতে ইচ্ছে করে।"

সপ্তম অধ্যায়

আমরা যখন কটকে অম্বিকা পানিগ্রাহীর বাড়িতে এসে ঢুকলাম, তখন সন্ধে হতে বেশি দেরি নেই। যদিও ঋজুদা কৃপাসিন্ধুকে বলে এসেছিল, "অম্বিকাবাবুকে খবর দিয়ে রেখো যে আমরা আজ ফিরছি।"

অম্বিকাবাবু বাড়িতে ছিলেন না। ওঁর অনুচরেরা আমাদের সযত্নে নিয়ে গেল। গত পরশু যে ঘরদু'টোয় আমরা ছিলাম, সেখানেই আমাদের স্থান হল। অম্বিকাবাবুর স্ত্রী রূপবতী এসে একবার আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। ঋজুদা ও আমরা চান করে, চেঞ্জ করে যখন তৈরি হয়েছি, তখনই অম্বিকাবাবু ফিরলেন।

উনি এসে বললেন, "সরি সরি! দু'টো কনফারেন্স ছিল বলে ফিরতে দেরী হয়ে গেল। তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি তো?"

"কীসের অসুবিধা! তোমার এই প্যালেসে অসুবিধা হবে কী করে!"

"রাতে কী খাবে বলো।" আমাদের দিকে চেয়ে অম্বিকাবাবু বললেন, "কী, তোমরা কি চাইনিজ খেতে ভালোবাসো? আমার বাবুর্চি খুব ভালো চাইনিজ রাঁধে। ফ্রায়েডরাইস, চাউমিন, ক্র্যাব, প্রণ, আর পর্ক। সবক"টাই করতে বলছি। স্যুপটা ও দুর্দান্ত করে। আগে স্যুপ খেয়ো। আর সুইট ডিশ কী খাবে বলো! মুম্বইয়ের তাজমহল হোটেলে যেমন চাইনিজ খাওয়ার সময় লিচি উইথ আইসক্রিম দেয়, তাই খাবে? নাকি ওর বানানো ডেলিশাস পুডিং খাবে?"

আমরা কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলাম।

ঋজুদা বলল, "যা খাওয়াবে, তাই খাব। এত জিজ্ঞাসা করার কী আছে? তবে এমন খাইও না, যে কাল কলকাতা ফিরতে না পারি।"

"তা জানোয়ার-টানোয়ার দেখলে? অবশ্য দেখেই বা কী হবে? তোমরা তো রাইফেল বা বন্দুক কিছুই নিয়ে যাওনি। তুমি বললে আমার একটি ওয়েপন তোমাদের দিয়ে দিতাম।"

"ওয়েপন দিয়ে কী করতাম! আমরা তো শিকারে যাইনি! আমরা কেবল হত্যাকারীকে ধরতে গেছিলাম।"

"তা ঠিক।"

"সঙ্গে কিছু ছিল না, তা নয়। আমার আর ভটকাইয়ের কাছে পিস্তল ছিল। তবে .২২ পিস্তল দিয়ে তো আর কিছু শিকার করা যায় না!"

"তোমার সেই পিস্তলটা? স্প্যানিশ লামা? যেটা দেখে আমিও .২২ পিস্তল কিনব বলে লাফিয়ে উঠেছিলাম!"

"হ্যাঁ। তোমায় যে পিস্তলটি কিনিয়ে দিয়েছিলাম, সেইটা আছে না বেচে দিয়েছ?"

"না না! সাধের ওয়েপন বেচে দেব, এমন দুরবস্থা আমার এখনও হয়নি। ভগবান না করুন, এমন অবস্থা যেন কখনও না হয়। তবে সেই পিস্তলটাতে একটি সংযোজন করেছি।"

ঋজুদা চকিতে একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "সেটা কী?"

"একটা সাইলেন্সার।"

"সাইলেন্সারের লাইসেন্স তো দেয় না! তুমি কোত্থেকে জোগাড় করলে?"

"আরে, আমরা রামরাজ্যে বাস করি। এখানে সব পাওয়া যায়।"

"কোথায় পেলে? কটকেই?"

"কটকে এসব কমপ্লিকেটেড জিনিস পাওয়া যায় না। এটা এনেছিলাম তোমাদের কলকাতা থেকেই।"

"কলকাতাতেই বা কোথায় পেলে? কোনো দোকান তো বন্দুকের সাইলেন্সার বিক্রি করে না!"

"দোকানে যাব কোন দুঃখে! খিদিরপুরের যে বাজারে শুধুই স্মাগলড জিনিস কিনতে পাওয়া যায়, সেই দোকান থেকেই কিনেছিলাম। ফার্স্ট ক্লাস জিনিস।"

"হঠাৎ সাইলেন্সার কিনতে গেলে কেন? তুমি তো শিকারের জন্য কিনেছিলে পিস্তলটা। মানুষ তো সাইলেন্সার কেনে চোরাগোপ্তা খুনের জন্য। তোমার আবার কাকে গোপনে খুন করার দরকার হল?"

"সবই কি মানুষ প্রয়োজনে কেনে? শখেও কেনে। প্রাইড অফ পজেশন।"

"কীরকম শব্দ হয়? বেশি?"

"আরে, শব্দকে সাইলেন্ট করানোর জন্যই তো সাইলেন্সার। শব্দ হয় টুপ করে। পাশের লোকও শুনতে পাবে না।"

"তাই তো হওয়ার কথা। তা সেটা কি কখনও ব্যবহার করেছ?"

"হ্যাঁ তা করেছি। কেমন আওয়াজ হয়, তা দেখার জন্য। এখানকার ডিআইজি আমার বন্ধু। পুলিশের রেঞ্জে গিয়ে ব্যবহার করেছি। ওই রেঞ্জে আমি সময় করতে পারলে প্রতি রবিবার যাই পিস্তলের হাতটা ঠিক রাখার জন্য পিস্তল ছুঁড়তে। তুমি তো জানো, যথেষ্ট প্র্যাকটিস না থাকলে তুমি পাঁচ ফিট দূর থেকেও গুলি ফসকাবে। লোকে ভাবে কোমরে পিস্তল থাকলেই তুমি নিরাপদ।"

"তা ঠিক।"

"জ্যেঠুমণির এক মক্কেলকে নকশালরা মারবে বলে চিঠি দিয়েছিল তিনদিন আগে, তিনি প্রতি সকালে সপারিষদ ধুতি-পাঞ্জাবী পরে মর্নিং ওয়াকে বেরোতেন। তাঁর পকেটে থাকত লোডেড রিভলবার। সেই চিঠি দেওয়ার তিনদিন পরেই এক সকালে পাঁচ-ছ"জন অল্পবয়সী ছোঁড়া রাস্তায় তাঁকে ঘিরে ধরে প্রথমেই ভোজালির কোপ দিয়ে তাঁর রিভলবার বের করার জন্য পকেটে ঢোকানো ডান হাতের কব্জি থেকে হাতের পাতা আলাদা করে দেয়।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী! সারা শরীরে বত্রিশটি ক্ষত হয়েছিল।

সকলে মিলে তাঁর শরীরের নানা জায়গায় স্ট্যাব করেছিল।"

"বাঁচানো গেল না?"

"না। তাঁর জামাই তাঁকে মেডিক্যাল কলেজ অবধি নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু রেসিডেন্ট ডাক্তার তাঁকে ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখেননি।"

"কেন?"

"তাহলে পরদিন নকশাল ছেলেরা তাঁর হালও জ্যেঠুমণির ওই মক্কেলের মতো করত। তখন কলকাতা ছিল আতঙ্ক নগরী। এসব গল্প পরে আবার শোনাব। তোমরা তো গেছিলে রহস্যভেদ করতে। তা সমাধান হল?"

"না। সমাধান তো করতে পারলাম না। সব কাবাড়িরাই, এমনকি দুর্গা মোহান্তিও বলল যে রামডাকুয়ার কানে প্রচুর রক্ত ছিল। এমনকি রক্ত বেরিয়েও এসেছিল। সাপের কামড়ে মরলে অত রক্ত আসার কথা নয়।"

"বাজে কথা। ও সাপ ওরা দেখেইনি কখনও। তুমি তো এত ঘুরেছ উড়িষ্যার জঙ্গলে। তুমি দেখেছ?"

"হ্যাঁ। উরুনাকোটে যে একবারই দেখেছি তা তো বলেইছি।"

"তাহলে কি রামডাকুয়াকে ভূতে মারল?"

ভটকাই বলে উঠল, "ওরকম জঙ্গুলে জায়গা, ওখানে ভূত, প্রেত তো থাকতেই পারে।"

অম্বিকাবাবু ভটকাইয়ের পাকামিটা বিশেষ পছন্দ করলেন না। কিন্তু ওর দিকে চেয়ে বললেন, "হ্যাঁ, তা তো হতেই পারে। তা ঋজু, যদি সাপ না-ই হয়, তবে কী হতে পারে? কোনো গেস কি করেছ?"

"তখন থেকে তো নানারকম গেস করছি। তবে তোমায় একটা কথা বলি, তুমি আর বিড়িগড়ে যেও না।"

"কেন বলো তো?"

"তুমি তো আগেই জানতে যে ওরা খুব খেপে আছে। যে জন্য তুমি আমাদের সঙ্গে গেলে না। গিয়ে দেখলাম, ওরা সত্যিই খুব অ্যাজিটেটেড। ওরা মনে করে তুমিই রামডাকুয়ার হত্যার জন্য দায়ী।"

"আমি দায়ী মানেটা কী? আমি কি মাইনে করে ভূত-প্রেত পুষে রেখেছি? নাকি আমি নিজে রামডাকুয়াকে খুন করেছি? যদি গুলি করেও মেরে থাকি, কেউ তো তার শব্দ পাবে!"

ভটকাই বলে উঠল, "সাইলেন্সার থাকলে তো শব্দ পাওয়ার কথা নয়।"

অম্বিকাবাবু চটে গিয়ে বললেন, "তুমি কী বলতে চাইছ?"

"আমি কিছুই বলতে চাইছি না। আপনারা যেমন রহস্যের কিনারা করার চেষ্টা করছেন, আমিও তাই করছি।"

"আমার বিরুদ্ধে তাহলে ওরা কেস করছে না কেন? এফআইআর করুক!"

ঋজুদা বলল, "ডেডবডি তো সেই সন্ধ্যায় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল অম্বিকা! পোস্টমর্টেম করা তো সম্ভব ছিল না। আর যদি ওরা করত, তবে তার ফল কিছুই হত না। এই দেশটার নাম ভারতবর্ষ। তুমিও জানো, আমিও জানি। এখনও এর সব রাজ্যে এমন অনেক প্রত্যন্ত জায়গা আছে, যেখানে থানা-পুলিশ, আইন-কানুন— এ সব বাতুলতা। এ অবস্থার পরিবর্তন হতে আরও অনেক সময় লাগবে। তাছাড়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমবাবু লিখে গিয়েছিলেন, 'আইন! সে তো তামাশা মাত্র! একমাত্র বড়লোকরাই পয়সা খরচ করিয়া সে তামাশা দেখিতে পারে।' এ কথা তাঁর আমলেও যেমন সত্য ছিল, এখনও তেমনই সত্যি। কাজেই, তোমার কোনো ভয় নেই অম্বিকা। আমি বলছি না যে তুমিই খুন করেছ। কিন্তু যদি তুমিই তোমার ওই সাইলেন্সার লাগানো .২২ পিস্তল দিয়ে খুন করে থাকো, তাহলে কারুর পক্ষে শব্দ শোনা সম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রামডাকুয়ার মৃত্যু যে কীসে হয়েছে, তা তো পোস্টমর্টেম রিপোর্ট ছাড়া জানা সম্ভব নয়! তাই আজ কোনোভাবে কেউই প্রমাণ করতে পারবে না যে তুমিই রামডাকুয়াকে খুন করেছ। কাজেই, এ নিয়ে তোমার বিন্দুমাত্র চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। রামডাকুয়াকে যদি কবরও দেওয়া হত, তবে তার শরীরকে কবর থেকে তুলে তদন্ত করা যেত। কিন্তু এখানে তো সে ছাই হয়ে গেছে। কাজেই, তুমি টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেফ। বাড়িতে হুইস্কি থাকলে দু'টো হুইস্কি খেয়ে সেলিব্রেট করো। আমিও আজ তোমার সাথে খাব। এই ব্যাপারে তোমার কোনো চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই। আই অ্যাম সরি অম্বিকা, তোমার কোনো উপকার আমি করতে পারলাম না। পুরী-হাওড়া এক্সপ্রেস কটকে কখন আসে? এখন কি স্টেশনে গেলে ট্রেন পাওয়া যাবে?"

"না। ট্রেন চলে গেছে।"

"তাহলে তো আজ তোমার সঙ্গে এখানে থেকে সেলিব্রেশনটা করতেই হয়।"

আমরা পরেরদিন পুরী-হাওড়া এক্সপ্রেসের জন্য অপেক্ষা না করে ব্রেকফাস্ট করার পরেই যে ট্রেন ছিল, তা ধরে কলকাতা ফিরে আসার জন্য ট্রেনে উঠলাম। অম্বিকাবাবু ছাড়তে এসেছিলেন। ট্রেন ছাড়ার আগে উনি খামে করে একটি একলাখ টাকার চেক ঋজুদার হাতে দিয়ে বললেন, "ঋজু, তুমি অনেক বড় মাপের গোয়েন্দা। প্রায় আড়াই দিন তুমি আমার কাজে এসে নষ্ট করলে। আমি জানি, এটা তোমার ন্যায্য ফি নয়, এর চেয়ে আরও বেশি তোমায় দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, ফর ওল্ড টাইম'স সেক, একটু কমই দিলাম। এটা নিয়ে আমায় ধন্য কোরো।"

ঋজুদা বলল, "তুমি আমার শিকারের বন্ধু। ফর ওল্ড টাইম'স সেক, আমি তোমার থেকে টাকা নিতে পারি না। এ তো এক নম্বরের টাকা! তোমার ট্যাক্স দেওয়া টাকা! তোমারই সামনে চেকটা ছিঁড়ে ফেললাম। তবে আমার অনুরোধ, তুমি তোমার দু' নম্বর টাকা থেকে এক লাখ টাকা রামডাকুয়ার বৃদ্ধ বাবা দশরথ ডাকুয়াকে নোয়াগড়ে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কোরো। তাতে তোমার পাপের সামান্য স্খালন হবে।"

ট্রেন ছেড়ে দিলে ঋজুদা আমাকে বলল, "তুই কী একটা লেখা লিখেছিলি না আমাদের অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে? সপ্তম রিপু নাম দিয়েছিলি? সপ্তম রিপু কেন দিয়েছিলি?"

"কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য— এই ছ"টি রিপুকেই আমরা জানি। এর নাম সপ্তম রিপু দিয়েছিলাম কারণ এ ছিল ঈর্ষার রিপু। ছোটভাই স্রেফ ঈর্ষার কারণে দাদাকে গুলি করে মেরে দিল। আর এই গল্প যদি লিখি, তবে এর নাম দেব অষ্টম রিপু। আমিময়তা, ঘামন্ড, গর্ব, মেগালোম্যানিয়া— এ সবই হল অষ্টম রিপু।"

অলংকরণ: রঞ্জন দত্ত

সমাপ্ত

বেড়ানোর পাগলামি

সব্যসাচী চক্রবর্তী

আমরা এত রকম জায়গায় বেড়াতে গেছি যে সব জায়গাগুলোর কথা মনেও নেই। মাঝে মাঝে আড্ডা'র মধ্যে দিয়ে কারও কারও মনে পড়ে যায়। তারপর আবার ভুলে যাই। তাই বেড়ানোর এ কথা সে কথা গল্পাকারে লিখব কীভাবে, সেটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হল চেষ্টা করে দেখি কীভাবে স্মৃতিরোমন্থন করা যায়। সেইসব অদ্ভুত কাণ্ডগুলোর কথা কীরকম করে লেখা যায়। সাধারণ বেড়ানো, ওখানে গেলাম, সেখানে গেলাম, ওইখানে থাকলাম, এই এই খেলাম, এই এই দেখলাম— এসব তো অনেক লিখেছি, অন্যরকম কোনও স্বাদ বার করা যায় কিনা ভাবতে ভাবতে এই লেখা।

আমার বাবা সাধারণত খুব ভেবে-চিন্তে, ঠিকঠাক আয়োজন করে বেড়ানোটা পছন্দ করতেন না। হঠাৎ ইচ্ছে করল তো বেরিয়ে পড়তেন। কে যাবে? চলো জামাকাপড় ভরে নাও, আমি একটু ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিচ্ছি আর গাড়িতে পেট্রোল ভরে নিচ্ছি, চলো একটু ঘুরে আসি। মা জিজ্ঞেস করতেন— 'কোথায় যাচ্ছি?' তাতে বাবা বলতেন— 'দিল্লি।' অথবা বলতেন— 'দার্জিলিং।' তারপর বলতেন, — 'না থাক। পুরীই যাই।' মা বুঝে যেতেন জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। আমরাও লাফাতে লাফাতে ব্যাগ গুছিয়ে গাড়িতে উঠে পড়তাম। এইভাবে আমরা কলকাতা থেকে অনেক জায়গা ঘুরে এসেছি। দিল্লিতেও বহু বছর ছিলাম আমরা,

• উপরে: সিমলিপালে হাতির পিঠে গৌরব ও অর্জুন
• নীচে: সারিসকায় সম্বর হরিণ পশুপালন ক্ষেত্র

সেখান থেকে সিমলা, জয়পুর, আগরা, নৈনিতাল ইত্যাদি হঠাৎ হঠাৎ করে বেড়িয়ে নিয়েছি সুযোগ পেলেই। বাবা'র কাছে একটা অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশনের মোটোরিং গাইড ছিল, সেটা দেখে রাস্তা ঠিক করতেন।

আমার একটা বেড়ানোর কথা মনে পড়ে। তখন আমরা দিল্লিতে থাকি। একদিন বাবা'র খুব দাঁতে ব্যথা, আমাকে বললেন, একটা পাবলিক কল অফিস থেকে বাবা'র অফিসে ফোন করে খবর দিয়ে দিতে যে আজ ছুটি নিচ্ছেন। তখন আমাদের বাড়িতে ফোন ছিল না। আমি ফোন করে ফিরে দেখি আমার মা আর বোন খুব উত্তেজিত। জানতে চাইলাম কী হয়েছে, তারা বলল— 'আমরা কলকাতা যাচ্ছি!' আমি তো অবাক! বাবা'র নাকি এক চেনা দাঁতের ডাক্তার আছেন কলকাতায়, তার কাছেই যেতে হবে। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আমাদের মেরুন রঙের ছোট্ট 'স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড' গাড়িতে বেরিয়ে পড়লাম। বাবা অবশ্য পরে অফিসে ফোন করে বেশি করে ছুটি নিয়ে নিলেন। আমাদের চারদিন লাগল কলকাতা পৌঁছতে। কারণ প্রথম দিন আমরা কানপুরে থাকলাম, পরদিন এলাহাবাদ, সেখানে মাসিদের বাড়িতে এক রাত বেশি থাকা হল। পরদিন ধানবাদ, আমাদের ফুলজ্যাঠার বাড়িতে। তারপর দিন আমরা কলকাতা পৌঁছলাম। কলকাতায় সবাই আমাদের দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। চারদিন কলকাতায় থেকে, দাঁতের ডাক্তার দেখিয়ে, আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করে, গাড়িটা কলকাতায় পিসিদের বেচে দিয়ে আমরা ট্রেনে ফিরলাম। গাড়ির দাম ছিল চারটে রাজধানী এক্সপ্রেসের চেয়ার কারের টিকিট। তখন সবে রাজধানী এক্সপ্রেস চালু হয়েছে আমরা তাতেই ফিরে এলাম দিল্লি।

কলকাতায় থাকাকালীন বাবা-মা মাঝে-মাঝেই পিকনিক করব বলে বেরিয়ে পড়তেন। কখনও মহেশতলার দিকে কখনও দিঘার উদ্দেশ্যে, কখনও মালদা, আবার কখনও ধানবাদ। যখন তখন রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে শতরঞ্চি পেতে বসে পড়তাম। গাড়ির লাগেজ-বুটে স্টোভ, বাসন, তরি-তরকারি, ডিম-মাংস, চাল, ডাল, তেল-মশলা সবই থাকত। রাত হয়ে গেলে কোনও একটা পিডব্লুডি বা ইরিগেশান বাংলো খালি পেয়ে গেলে, রাত কাটিয়ে আবার পরের দিন কলকাতা ফিরে আসতাম। কোনও ঠিক ছিল না আমরা কোথায় থাকব, কী খাব, কখন ফিরব। এই অনিশ্চয়তাটা বাবার খুব ভালো লাগত। বলতেন, 'হিসেব করে চললে তো আর বেড়ানো হবে না। তাহলে না বেড়িয়ে টাকাটা বাঁচিয়ে সম্পত্তি করতাম। ওসব আমার ধাতে নেই।' রবীন্দ্রনাথ-এর কথা উল্লেখ করে বলতেন বাবা গেয়ে উঠতেন— 'ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভোলো, পথ ভোলো পথ ভুলে মর ফিরে, ওরে সাবধানী পথিক—'

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই আমার অত সাহস নেই। তাই আমি পূর্ব-পরিকল্পিত ব্যবস্থা ছাড়া বেড়াতে যাই না। তখন দিনকাল অন্যরকম ছিল। এখন রাতে হাইওয়েতে বিপদ অনেকরকম। আমার বেশ মনে আছে আমরা একবার বাবা'র সঙ্গে হুট করে দিঘা চলে গিয়েছিলাম, কোনও বুকিং ছিল না। একটা হোটেলের একটা ঘরও খালি ছিল না। একজন ভদ্রলোককে অনুরোধ করে তাঁর বাড়ির বারান্দায় শুয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছিলাম। একবার দার্জিলিং গিয়ে জায়গা না পাওয়ায় একজনের বাড়ির একটা ঘরে আমাদের থাকতে দিয়েছিলেন। তাঁরা রান্না করে খাইয়েওছিলেন। তাঁরা সচ্ছল ছিলেন না, তাই ব্যবস্থাপনাও সেরকমই ছিল। বাবা-মা'র কোনও অসুবিধেই হতো না, আমাদের হওয়া তো দূরের কথা। বাবা একটা বহুজাতিক সংস্থা'র বড় কর্মী ছিলেন, তাই অফিসের কাজে গেলে সাধারণত পাঁচতারা হোটেলে থাকতেন, কিন্তু বেড়াতে গিয়ে ওসব ভাবতেন না। যখন যেরকম, তখন সেরকম। দিল্লি থেকে একবার শীতকালে বুকিং ছাড়া করবেট জাতীয় উদ্যানে গিয়েছিলাম। একটাও জায়গা না থাকায় একজন ফরেস্ট গার্ডকে জিজ্ঞেস করে গভীর জঙ্গলের ভেতর এক অখ্যাত বাংলোয় অনেক রাতে পৌঁছে, নিজেরা রান্না করে খেয়ে একটা ছোট্ট ঘরে ছ'জন রাত কাটিয়েছিলাম। রাতে বাংলোর বাইরে বাঘের ডাক শুনেছিলাম। আমি ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম— 'বাবা, বাঘ।' বাবা বলেছিলেন— 'হ্যাঁ। বেচারার শীত করছে।' তো অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে এইভাবেই আমাদের বড় হয়ে ওঠা।

আমি আমার বাবা'র মতো হতে পারিনি, পারবও না। তা বলে বেড়ানো বাদ দিইনি। আমি আমার মতো করে বেড়ানোর আয়োজন করে ফেলেছি। এখন আমি আগে থেকে বুকিং করে নিই। রাস্তা'র ব্যাপারে আগে থেকে খবর নিয়ে রাখি। সঙ্গে মোবাইল ফোন, জিপিএস আছে। সবরকম রোডম্যাপ আছে। রাস্তা হারানোর কোনও সুযোগ নেই। আগে থেকে টাকা জমা করে রসিদ নিয়ে নিই। কখন বেরব, কটার সময় কোথায় পৌঁছতে হবে সেটা ঠিক করে রাখি। মাঝে যেখানে থামব, ও রাতে থাকব সেখানে যোগাযোগ করে ঘর ঠিক করে রাখি। গাড়িতে সব ব্যবস্থা থাকে। শুকনো খাবার, জল, শতরঞ্চি, ওষুধ ইত্যাদি। এখন তো অনেকরকম সুবিধে হয়ে গেছে। টাকা লাগলে যে কোনও জায়গায় এটিএম থেকে টাকা তুলে নেওয়া যায়। বড় হোটেল বা রেস্তোরাঁয় ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড চলে। পাম্প থেকে তেল ভরাতে গেলেও তাই। যেখান সেখান থেকে সেলফোনে যোগাযোগ করা যায়। নেটওয়ার্ক না থাকলে কোনও এসটিডি বুথ থেকে ফোন করা যায়। তবুও সাবধানী হতে হয় কারণ এখন রাস্তা-ঘাটে চুরি-ডাকাতি হয়েই থাকে। ঠকিয়ে দেওয়ার লোকও অনেক। অভাবের তাড়নায় মানুষ অসৎ কাজে নেমে পড়েছে। সহজ উপায়ে টাকা যারা উপার্জন করছে, তারা অন্যায় কাজ করতে ভয় পায় না।

একটা ঘটনার কথা বলি। সেবার আমার একটা সুমো গাড়ি নিয়ে আমরা কলকাতা থেকে কানহা ব্যাঘ্র-প্রকল্পে বেড়াতে যাচ্ছিলাম। জানুয়ারি মাস, বেশ ঠান্ডা। সম্বালপুর থেকে বেরিয়ে চিলপি পৌঁছতে রাত সাড়ে আটটা বেজে গেল। আমরা একটা ধাবাতে চা খেয়ে বিছিয়ার দিকে রওনা হলাম। খুব খারাপ রাস্তা। বুঝলাম আজ রাতে আর কানহা ঢোকা যাবে না। মান্ডলাতে গিয়ে হোটেল খুঁজতে হবে। আমার বন্ধু ভানু চালাচ্ছিল, আমি পাশে বসেছিলাম। হঠাৎ রাস্তায় একটা মোটরসাইকেল খুব জোরে চালিয়ে আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমার ব্যাপারটায় খটকা লাগল, আমি আমার বন্ধু ভানু'র দিকে তাকাতেই সে মাথা নেড়ে গাড়িটা ভাঙা রাস্তা দিয়েই জোরে চালাতে লাগল। কোনওমতে মোটরসাইকেলটার পেছন পেছন এসে আমরা বিছিয়ার থেকে পাঁচ কিলোমিটার আগে তাকে ওভারটেক করে বেরিয়ে গেলাম। গাড়ির বাকিরা সে ব্যাপারে কিছু জানতেই পারল না। তারা ভাবল মান্ডলা পৌঁছনোর তাড়া করছি আমরা। রাত একটা নাগাদ মান্ডলা পৌঁছে একটা হোটেলের লোকজনকে ঘুম থেকে তুলে দুটো ঘর পেলাম আমরা। রাতে

আর খাওয়া হল না। পরদিন সকালে যখন মান্ডলা থেকে কানহা যাচ্ছি। পথে পুলিস থামাল। মান্ডলা থেকে ৫-৭ কিলোমিটার পরে। গাড়ির কাগজ দেখত চাইল। আমি দেখালাম, তারা কিছু প্রশ্নও করল। আমি জানতে চাইলাম আমাদের থামানো হল কেন? তারা বলল গতকাল রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ তিনটে লরি আর দুটো প্রাইভেট গাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। সর্বস্ব লুট করে নিয়েছে এবং মারধোর করেছে। একজনকে মেরেও ফেলেছে। এই বিষয়ে জানতে চাইছিল আমরা কিছু দেখেছি কিনা। আমি বললাম—'না'। এবং মনে মনে বুঝলাম আমাদের সন্দেহ ঠিক ছিল। যারা আমাদের পাশ দিয়ে মোটরবাইক নিয়ে গিয়েছিল, তারা ডাকাতদের খবর দেওয়ার জন্যেই তাড়াহুড়ো করছিল। তখন তো সেলফোন ছিল না!

সুন্দরবনের মতো আর একটা জায়গা আছে কলকাতা থেকে খুব কাছে। ওড়িশা'র ভিতরকণিকা। কলকাতা থেকেই গাড়ি নিয়ে ভদ্রক হয়ে চাঁদবালী পৌঁছে, সেখানে পুলিস স্টেশনে অনুরোধ করে গাড়ি রেখে, আমরা মোটর লঞ্চে করে গেলাম ডাংমাল দ্বীপ-এ। সাইলেন্ট ভ্যালির উদ্যোগে ঘর বুক করা ছিল। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল ভালো। তবে আমরা সময়টা ভুল বেছেছিলাম। অক্টোবর মাসে পুজোর ছুটির সময়। ডাংমাল-এ মশা'র উপদ্রবে কাহিল হয়ে, শেষে মশারির ভেতরে বসেই আড্ডা মারতে হয়েছিল সেবার। মশা তাড়ানোর ধূপ, গায়ে মাখার মলম, কোনও কিছুই মশাদের ঘায়েল করতে পারেনি। গরমও যথেষ্ট ছিল। সেখান থেকে আবার ৪/৫ ঘণ্টার নদীপথে আমরা পরদিন গিয়ে পৌঁছলাম একাকুলা সমুদ্র সৈকতে। নৌকো থেকে নেমে একাকুলা বনবাংলো'র দিকে যেতে হল নিজেদের মালপত্র মাথায় তুলে আর কাঁধে ঝুলিয়ে। আধ কিলোমিটার দূরে বাংলোয় পৌঁছে আমরা ভীষণ আনন্দিত হয়ে পড়লাম। দুটো বড় শোবার ঘর আর মাঝে একটা খাবার ঘর। সামনে ও পেছনে ঢাকা বারান্দা ও দুটি বাথরুম। পেছনে বাইরে একটা হ্যান্ড-পাম্প ও দূরে একটা রান্নাঘর। সামনের বারান্দায় একটা আরামকেদারা। চারদিকে তালগাছ। ভাবলাম দারুণ কাটবে ছুটি। আসার পথে মাছধরা নৌকো থামিয়ে প্রচুর মাছ কেনা হয়েছিল। সেই মাছ সকাল-বিকেল খেয়েও শেষ করা যায়নি। সমুদ্রে স্নান করা হল, ছবি তোলা হল, আড্ডাও হল।

হঠাৎ একটা বিপদ ঘটল। আমাদের মতো আরেকটি দল ওই দ্বীপের আরেকটা বন-বাংলো বুক করেছিল। সেই বাংলোর কেয়ারটেকার হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে বাড়ি চলে যায়। তাই সেই বনবাংলো আপাতত বন্ধ। সেই দলটি আমাদের সঙ্গে এসে থাকতে পারি কি না সেই অনুমতি চাইতে এল ভ্রমণ সংস্থা। আমরাও 'হ্যাঁ' বললাম। এই অবস্থা তো হতেই পারে, আমাদেরও হতে পারত। তারা পাঁচজন ছিলেন। মাঝের খাওয়ার ঘরটায় তাদের ফোল্ডিং খাট পেতে শোবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। ওই বনবাংলোটিতে ইলেক্ট্রিসিটি ছিল না ডাংমাল-এর মতোই। সারাদিন হই হই করে কাটিয়ে রাতে ঘুমোতে গেলাম মশারির তলায়। রাত বাড়তেই ভ্যাপসা গরম বাড়তে থাকল। খানিক পরে আমি উঠে পড়লাম। নিশ্বাসের কষ্ট হতে আরম্ভ করল আর তার সঙ্গে ঘাম। মশারির তলা থেকে বেরিয়ে বাইরে এসে আরাম-কেদারায় বসলাম। মিনিট খানেক-এর মধ্যেই মশার আক্রমণে উঠে পড়লাম। একটা খবর-কাগজের পাতা ভাঁজ করে পাখা বানিয়ে আবার গিয়ে শুলাম। নিজেকে হাওয়া করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরদিন সকালে অন্য দলটির নৌকো এল এবং তারা বেরিয়ে গেল। আমরাও ঠিক করলাম ফিরে যাব। দুপুরের মধ্যেই নৌকোয় মাল তুলে আমরা ফিরে গেলাম। তারপর থেকে ভিতরকণিকা যাওয়া আর হয়নি।

কলকাতায় ফিরে এসে ঠিক করলাম দুর্গা পুজোর বেড়ানোটা ভালো হয়নি, তাই কালীপুজোয় কোথাও যেতে হবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ, কালীপুজোয় আমরা গেলাম কুইলাপাল। কুইলাপাল যাওয়া ঠিক করেছিলাম পশুপাখি দেখব বলে। কলকাতা থেকে রাত দুটোয় বেরিয়ে সোজা খড়্গপুর-মেদিনীপুর মোড় হয়ে লোধাসুলির জঙ্গল, সেখান থেকে ঝিলিমিলি হয়ে কুইলাপাল বনবাংলো পৌঁছে গেলাম সকাল সাড়ে দশটায়। রাত দুটোয় বেরনো হয়েছিল কারণ লোধাসুলি জঙ্গলটা সকালবেলা পেরনোর ইচ্ছে ছিল। দ্বিতীয়ত রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ ছিল, সময় লাগবে জানতাম। বাংলোর কাছেই একটা হাট বসেছে দেখে কেয়ারটেকারকে বললাম দেশি মুরগি কিনে আনতে। দুপুরে মুরগির ঝোল আর ভাত খাওয়া হল। আবার গরম আবহাওয়া। সেই বিকেলে আমরা কাছের জঙ্গলে বেড়িয়ে এলাম। পরদিন আমরা বান্দোয়ান হয়ে নান্না ঘুরে এলাম। একটা ছোট ঝর্ণা আর জলাশয়ের মধ্যে সবাই পা ডুবিয়ে বসে আর হাত-মুখ ধুয়ে, কাছের একটা ঝুপড়ি-দোকানের চা আর বিস্কুট খেয়ে কুইলাপাল বনবাংলোয় ফিরে এলাম। বান্দোয়ান থেকে সোজা চলে গেলে দলমা অভয়ারণ্য ঘুরে আসা যেত, কিন্তু আমাদের হাতে সময় কম ছিল। তবে যে কারণে এই বেড়ানোটা করা হল সেই উদ্দেশ্যটাই সফল হল না। পশু-পাখির দেখা পেলাম না। তাই ঠিক করলাম পুজোর সময় জঙ্গল বেড়াতে যাওয়াটা বন্ধ করতে হবে। পাগলামি করে জেদ ধরে বেড়াতে যাওয়াটা ঠিক নয়।

আর একবার গরমে আমরা ঠিক করলাম তেরো জন মিলে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প বেড়াতে যাব। রসিকবিল এবং জলদাপাড়াও যাব বলে ঠিক হল। যেহেতু তিনটেই এক রাস্তায়। প্রথমে রসিকবিল তারপর বক্সা, শেষে জলদাপাড়া ঘুরে কলকাতা ফিরব, এই প্রস্তাবটা সকলেই সমর্থন করল। দুটো সুমো গাড়ি নিয়ে কলকাতা থেকে রওনা দিলাম। ছেলেরা তখন যথেষ্ট ছোট। আগে থেকেই বুক করে নিলাম রসিকবিলের ডর্মিটরি, বক্সা'র বনবাংলো 'লিও হাউস' আর মাদারিহাটের স'মিলের বাংলো। অর্থাৎ করাতকল লাগোয়া বাংলো। আমরা জানতাম যে মে মাসে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হয়, তাই একটা মোটা দড়ি কিনে নিয়েছিলাম। একটা গাড়ি যদি কাদায় আটকে যায় অন্য গাড়িটা টেনে তুলবে, এই ভেবে। আবার রাত দুটোয় বেরনো হল। বিকেল বিকেল রায়গঞ্জ পৌঁছে গেলাম। রায়গঞ্জ ট্যুরিস্ট লজে চারটে ঘর নিয়ে রাত কাটিয়ে পরদিন সকাল সাতটায় বেরিয়ে রসিকবিল পৌঁছে গেলাম বিকেলে। সেই রাতে বাগানে খড়ের চাল-এর নীচে বসে আমরা বৃষ্টি উপভোগ করেছিলাম আর লিমকা মিশিয়ে দেশি মদ খেয়েছিলাম। একজন স্থানীয় লোক দোতারা বাজিয়ে লোকসঙ্গীত শুনিয়েছিলেন। পরদিন জলাশয়ে নৌকো চড়া আর সাঁতার কাটা। আমার ছোট ছেলে সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল একটা রাজহাঁসের তাড়া খেয়ে। অভিজ্ঞতা এতই ভালো যে আবার যাওয়ার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যাওয়া আর হচ্ছে না।

তার পরদিন আমরা গেলাম বক্সা। লিও হাউস ছিল
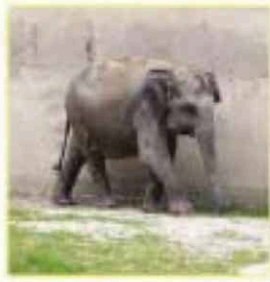
বেঙ্গল সাফারী পরিদর্শনের জন্য

স্বাগতম

উত্তরবঙ্গের উন্মুক্ত অরন্যে বন্য পশু-পাখীদের দেখার জন্য চলে আসুন শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারী পার্কে। বাস বা হাতীর পিঠে চেপে খুব কাছ থেকে দেখুন বাঘ, গন্ডার, চিতা, ভালুক সহ নানান রকমের হরিন, বনবিড়াল, কুমীর এবং রঙ-বেরঙের পাখি।

"You can book online tickets"

SAVE FORESTS AND WILDLIFE

WEST BENGAL ZOO AUTHORITY
ARANYA BHAWAN, LA-10A, SECTOR-III,
KOLKATA-700106

রাজাভাতখাওয়া রেল স্টেশনের খুব কাছে। চারটে ঘর বুক করা ছিল। সেখানকার বয়স্ক নেপালি এক রাঁধুনি আমাদের রান্না করে খাইয়েছিলেন। কী অপূর্ব সেই রান্না। তিনি নাকি জ্যোতি বসুকেও রান্না করে খাইয়েছিলেন। পরদিন দুটো গাড়ি নিয়ে আমরা জঙ্গলের ভেতর বেড়াতে গেলাম। অসাধারণ জঙ্গল। শুকিয়ে যাওয়া বালা নদী পেরিয়ে যখন জঙ্গলের ভেতর ঢুকলাম, মনে হল এইরকম একটা জঙ্গলে আমরা আগে আসিনি কেন? জঙ্গলের যে কোনও জায়গায় চুপ করে বসে থাকা যায়। চতুর্দিকে নানারকম পাখি আর পোকামাকড়। মাঝে মাঝেই হাতি, শুয়োর বা হরিণ। আমাদের গাইড যিনি ছিলেন তিনি সব রাস্তা চিনতেন না। তাই সন্ধে নামার একটু আগেই আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেললাম। এবার সবাই ভয় পেয়ে গেল। এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে আরও গুলিয়ে যাচ্ছিলাম। সন্ধে হওয়ার সঙ্গেই একটা বড় হাতির পাল আমাদের গাড়ির সামনে দিয়ে পার হয়ে গেল। আমার বন্ধু ভানু আর আমি অনেক চেষ্টা করে শেষে সঠিক রাস্তা চিনে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমি ভয় পেলেও, প্রকাশ করিনি।

তার পরদিন একজন অভিজ্ঞ গাইড নিয়ে যাওয়া হল। সেদিন আবার অন্য ব্যাপার ঘটল। একটি চৌমাথায় পৌঁছে দাঁড়ালাম। একজনের বেগ এল, সে জলের বোতল নিয়ে জঙ্গলের ভেতর চলে গেল। একজন ঝিঁঝির ডাক রেকর্ড করবে বলে টেপ রেকর্ডার হাতে অন্যদিকে হাঁটা দিল। একজনকে জোঁকে ধরল। হঠাৎ জঙ্গল থেকে দুটো মাকনা হাতি বেরল। (মাকনা মানে যে পুরুষ হাতির দাঁত হয় না, যারা অন্য পুরুষ হাতিদের সঙ্গে লড়তে পারে না বলে খেপে থাকে) হঠাৎ আমাদের গাইড বিপদ দেখে সবাইকে গাড়িতে উঠতে বলল। যে যেরকম অবস্থায় ছিল, সে সেরকম অবস্থায় তাড়াহুড়ো করে গাড়িতে উঠে পড়ল। মাকনা হাতি দুটো আমাদের পেছনে ধাওয়া করল। আমরা পালিয়ে বাঁচলাম। কিছু দূর যেতেই দেখলাম রাস্তা বন্ধ! রাস্তায় আড়াআড়ি একটা গাছ পড়ে আছে। সর্বনাশ! এবার যদি হাতি দুটো চলে আসে! এক বন্দুকধারী গার্ড তার বন্দুক বাগিয়ে সজাগ হয়ে থাকল। আমাদের গাইড একটা খুকরি বার করে অতি কষ্টে গাছটা কাটল। ভাগ্য ভালো যে হাতি দুটো আর আসেনি। আমাদের গাড়ির ক্যারিয়ারে বসা বন্দুকধারী বনরক্ষী ছিল ঠিকই, কিন্তু পরে জেনেছিলাম তার বন্দুকটা কাজ করলেও সবকটা টোটা নাকি জলে ভিজে ফুলে-ফেঁপে রয়েছে, একটাও কাজের নয়! অতএব শুধু আমরাই পাগল নই, যাদের ভরসায় জঙ্গলে ঢুকেছিলাম, তারাও। ফিরে এলাম লিও হাউসে। সেই রাতে গরম লাগছিল বলে আমরা তোষকগুলো নিয়ে বনবাংলোর বারান্দায় শুয়েছিলাম। রাতে একটা তুমুল ঝড় উঠল আর বৃষ্টি হল। আমরা জেগে বসে রইলাম সেই ঝড় দেখার জন্যে। প্রকৃতি উপভোগ করাকে কি পাগলামি বলে?

পরদিন বক্সা থেকে বেরিয়ে মাদারিহাট। বেলা সাড়ে দশটায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। বিকেলে জলদাপাড়া অভয়ারণ্য বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল। এখানে মোটা দড়িটা কাজে লেগেছিল। একটা গাড়ি ঠিক কাদায় আটকে গেল এবং অন্য গাড়িটা সেটাকে টেনে বার করল। আমরা গাড়িতে তো ঘুরেইছিলাম কিন্তু হাতি চড়ার সুযোগও হয়েছিল। দারুণ লেগেছিল জলদাপাড়া। সেই রাতে আবার দু-একজনের সুরাপান একটু বেশি হয়ে যাওয়াতে তারা আবার হাঁটতে বেরিয়ে গিয়েছিল বড় রাস্তায়! কেউ কেউ গান-বাজনায় মেতে উঠেছিল, কেউ বিদঘুটে নাচে। তবে আনন্দ করেছিল সবাই, অসভ্যতা নয়। অবস্থা আবার স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল খানিক পরেই। আমাদের যিনি জঙ্গল ঘুরিয়েছিলেন, তিনি আবার দরকারের থেকে বেশি ইংরেজি বলছিলেন বলে হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তার ভুল ইংরেজি শুনলে যে কোনও লোকেরই হাসি পাওয়ার কথা। আমরাও বাঙালি তিনিও তাই, তবুও কেন ইংরেজি বলছিলেন জানি না। হয়তো পশু-পাখির নাম বলতে সুবিধে হচ্ছিল তাই। আমাদের

• ভিতরকণিকার একাকুলা বিচে

পুত্ররা আমাদের এবং আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের কাণ্ডকারখানা দেখে কতটা হাসাহাসি করেছিল জানি না, কারণ আমরাও যথেষ্ট হাস্যকর হয়ে উঠেছিলাম।

আরও একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল যখন আমরা রণথম্ভোর, সারিস্কা আর ভরতপুর বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমরা এই বেড়ানোটার সঙ্গে দিল্লি আর আগরাও জুড়ে নিয়েছিলাম। গাড়ি করেই গেলাম। রাত বারোটায় বেরনো হল কলকাতা থেকে কারণ বিহার পেরতে চাইছিলাম দিন থাকতে থাকতে। ভোর সাড়ে ছ'টায় বিহার ঢুকলাম আর বিহার পেরিয়ে উত্তরপ্রদেশ ঢুকলাম সন্ধে আটটায়। রাত সাড়ে দশটায় বেনারস। পরদিন সকাল আটটায় বেনারস থেকে বেরিয়ে আগরা পৌঁছলাম রাত বারোটায়। পথে রাতের খাবারের জন্যে একটা ধাবায় দাঁড়ালাম। সেই ছোট অখ্যাত ধাবার মালিকের থেকে অনুমতি নিয়ে আমরা বসে 'রাম' খাচ্ছিলাম। হঠাৎ এক বাঙালি ভদ্রলোক উদয় হলেন। আমাকে দেখে সেই ভদ্রলোক তো উচ্ছ্বসিত আর আমি মদের গেলাস হাতে বেশে বিব্রত। তবে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম— 'এই একটু বেড়াতে যাচ্ছি আমরা। এখানে বসে একটু খানা-পিনা করে নিচ্ছি।' উনি উল্টে বললেন— 'খুব ভালো। এনজয় করুন।' বলে চলে গেলেন।

• ভিতরকণিকা বোট ট্রিপ

রাত আড়াইটের সময় ভরতপুর পৌঁছে একটাও থাকার জায়গা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ গেট খুলবে না। শেষে 'হোটেল ব্রিজ বিহার' নামক একটা ছোট গেস্ট হাউসের সামনের গেটে ঠকঠক করাতে একজন বেরিয়ে এলেন। ভাবলাম ভাগিয়ে দেবেন, কিন্তু তিনি হাসিমুখে আমাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে দুটো ঘর খুলে দিলেন। আমরা শান্তিতে রাতে শুয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে ভরতপুর পক্ষীরালয়ে ঢুকে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এত সুন্দর একটা অভয়ারণ্য হতে পারে সেটা ভাবিনি। দু'দিন ধরে ঘুরে উপভোগ করলাম আর অনেক ছবি তুললাম। লজ-এর মালিক-এর সঙ্গে আলাপ জমে উঠল। খুব আন্তরিক ভদ্রলোক।

রণথম্ভোর-এ থাকার জন্যে আমাদের পূর্ব-পরিচিত পিকে সেন-এর পরামর্শ নিয়েছিলাম। উনি তখন ভারত সরকারের 'প্রোজেক্ট টাইগার'-এর ডিরেক্টার। উনি আমাদের 'রণথম্ভোর রিজেন্সি'-তে দুটো ঘর বুক করে দিয়েছিলেন। বেলা এগারোটায় ভরতপুর থেকে বেরিয়ে বিকেল পাঁচটায় সাওয়াই মাধোপুর পৌঁছলাম। হোটেল দেখে তো আমরা ভীত হয়ে গেলাম। সে তো একটা বিলাসবহুল হোটেল। আমাদের হাতে তো অত টাকা তখন ছিল না। ভয়ে ভয়ে ঢুকলাম। সব ঠিক ছিল, কিন্তু দেখলাম বুফে ডিনার আছে। তাতে এক-একজনের যা টাকা দিতে হল তাও আমাদের ক্ষমতার বাইরে ছিল। ছ'জনের মধ্যে দু'জন খেলাম না। পরদিন সকালে আর বিকেলে জঙ্গল বেড়ালাম, সেটাও ছিল খরচ সাপেক্ষ। সে রাতে আমরা ঠিক করলাম কাল আর থাকব না। তারপর দিন সকালে হোটেলের বিল মিটিয়ে সারিস্কার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। সারিস্কায় সরকারি বনবাংলো বুক করা ছিল, যেটা ছিল সাধ্যের মধ্যে। আবার জঙ্গল ঘোরা হল, অনেক পশু-পাখির দেখা পেলাম, কিন্তু বাঘ বা লেপার্ড পেলাম না। দুপুরের খাওয়া টাইগার ডেন-এ খেতে হল সেই সাওয়াই মাধোপুরের মতো দামে। সেদিন মহাষষ্ঠী ছিল, আমাদের বন্ধু শিবু হঠাৎ পায়েস খাওয়ার জন্যে পাগলের মতো খুঁজতে লাগল। শেষে 'রায়তা' দিয়েই আহ্লাদ সারল। সেই রাতে আর না থেকে সন্ধে সাতটায় দিল্লির দিকে বেরিয়ে পড়লাম।

দিল্লি পৌঁছলাম রাত সাড়ে বারোটায়। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি অত রাতেও আমাদের জন্যে জেগে বসেছিলেন। তারা আমাদের জন্যে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আমরা আধঘণ্টা গল্প-গুজব করে ঘুমিয়ে পড়লাম। তার পরের দিন, অর্থাৎ সপ্তমী, অষ্টমী আর নবমী আমরা দিল্লির বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে ঘুরলাম। গ্রেটার কৈলাস, চিত্তরঞ্জন পার্ক, কাশ্মীরি গেট, জনকপুরী, সফদরজং এনক্লেভ, করলবাগ, ইত্যাদি। অনেক পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হল। দশমীর দিন শ্বশুর-শাশুড়িদের প্রণাম করে আগরা'র উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম বেলা পৌনে এগারোটায়। দুপুর আড়াইটে নাগাদ আগরা ফোর্ট ঘুরলাম ও তারপর তাজমহল। সন্ধে সাড়ে ছ'টায় আকবর হোটেলে গিয়ে দুটো ঘর নিয়ে ঢুকে পড়লাম। সেই হোটেলটা ও খাবার-ও ছিল সাধ্যের মধ্যে।

পরদিন সকাল সাতটার মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম। ফিরোজাবাদ পৌঁছলাম ন'টার মধ্যে। সেখানে আমার বউ কাচের চুড়ি কিনল। তারপর জসওয়ান্তনগর, ফতেপুর ও সাহিদাবাদ হয়ে বেনারস পৌঁছলাম রাত দশটায়। হোটেল মালতি। আমার বউ মিঠু অনুরোধ করল পরদিন সকালে মন্দির দর্শন করে তারপর বেরনো হোক। আমি তাকে বোঝালাম যে তাহলে দেরি হয়ে যাবে। পরদিন রাতের মধ্যে কলকাতা ঢুকতে পারব না। অতএব পরদিন ভোর ছ'টায় বেরিয়ে পড়লাম বেনারস থেকে। সাড়ে দশটায় জোগিয়া, তিনটেয় ঘাংরি, আটটায় আসানসোল, তারপর বর্ধমান হয়ে রাত আড়াইটেয় কলকাতা পৌঁছলাম। মন্দির যেতে না দিয়েও দেরি হল, তাহলে মন্দির দর্শন করলে তো ভোর হয়ে যেত কলকাতা ঢুকতে। সকাল ছ'টা থেকে রাত আড়াইটে অবধি একটু একটু থেমে থেমে গাড়ি চলেছিল। কখনও চায়ের জন্যে, কখনও খেতে, কখনও আবার হাত-পা ছাড়িয়ে নিতে। অর্থাৎ সাড়ে কুড়ি ঘণ্টার ড্রাইভ। পাঁচ ঘণ্টা করে চিত্রভানু আর আমি গাড়ি চালিয়েছিলাম। আমরাও আনন্দে

একবার গাড়ির ইঞ্জিনের গ্যাসকেট কেটে গিয়েছিল বলে গাড়ি গরম হয়ে যাচ্ছিল। মাঝেমাঝেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেডিয়েটারে জল ঢালতে হচ্ছিল। সেইরকম অবস্থায় জঙ্গলের ভেতর অন্ধকারে গাড়ি থামিয়ে জল ঢালতে গিয়ে লেপার্ড-এর মুখোমুখি হতে হয়েছিল আমার দুই বন্ধু চিত্রভানু ও সুবীরকে।

চালিয়েছিলাম, আমাদের যাত্রীরাও সফর করেছিল কোনও বিরক্তি প্রকাশ না করে। এটা পাগলামি না তো কী? এখন করতে চাইলে হয়তো শক্তিতে কুলোবে না। আমরা আবার সেই পুজোর সময় গিয়েছিলাম বলে বিশেষ পশু-পাখির দেখা মেলেনি, কিন্তু বেড়ানোর আনন্দটা তো ভোলার নয়।

আরও অনেকরকম পাগলামি করেছি আমরা। একবার গাড়ির ইঞ্জিনের গ্যাসকেট কেটে গিয়েছিল বলে গাড়ি গরম হয়ে যাচ্ছিল। মাঝেমাঝেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেডিয়েটারে জল ঢালতে হচ্ছিল। সেইরকম অবস্থায় জঙ্গলের ভেতর অন্ধকারে গাড়ি থামিয়ে জল ঢালতে গিয়ে লেপার্ড-এর মুখোমুখি হতে হয়েছিল আমার দুই বন্ধু চিত্রভানু ও সুবীরকে। লেপার্ড খানিক পরেই অবশ্য পালিয়ে গিয়েছিল। গাড়ি মেরামত করাতে হল বন্ধু'র থেকে টাকা ধার করে। এক রাতে শুধু চানাচুর-বাদাম খেয়ে ঘুমোতে হয়েছিল।

একবার খুব খারাপ রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে, হঠাৎ করে বাঁদিকের চাকার টাই-রড ভেঙে গিয়েছিল এবং খানিক ঘষটে চলার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি থামিয়ে দিয়েছিলাম। ভাগ্যিস গতি কম ছিল। গতি বেশি থাকলে গাড়ি উল্টে যেতে পারত। কাছাকাছি কোনও মেরামতির জায়গা না থাকায়, চিত্রভানু গাড়িটা জ্যাক-এ তুলে টাই-রডটা গুনোর তার দিয়ে কষে বেঁধে দিয়ে গাড়ি চালিয়েছিল আরও দশ কিলোমিটার দূরের মেরামতির দোকান পর্যন্ত। একটা রাস্তার ধারে লোহার গ্রিল তৈরির দোকানে টাইরড ঝালাই করে নিয়েছিলাম।

কানহার জঙ্গলে একবার একটা বাজপাখির ছবি তুলতে গিয়ে ব্যাটারির চার্জ গেল শেষ হয়ে। চিত্রভানু ব্যাটারিটা ক্যামেরা থেকে বার করে নিজের জামায় ঘষে ঘষে চার্জ করে নিয়েছিল। অবশ্য অল্প চার্জ হয়েছিল কারণ তিন-চারটে ছবি তোলার পর আবার ব্যাটারি বসে গিয়েছিল। কিন্তু ছবি তো পেয়েছিলাম। সেই জঙ্গলেই আবার একটা হনুমানের বাচ্চা গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল। তার দলের কেউ সেটা লক্ষ করেনি। তারা চলে গিয়েছিল। আমরা হাঁক-ডাক করে তাদের ডেকে আনলাম এবং আনন্দিত হলাম যখন তারা বাচ্চাটাকে আবার তুলে নিয়ে গেল।

সুন্দরবন বহুবার গিয়েছি। আমরা চেষ্টা করেছি লঞ্চে থাকার, মাঝ-নদীতে নোঙর ফেলে। প্রত্যেকবার সেটার অনুমতি জোগাড় করার চেষ্টা করতাম এবং পেয়েও যেতাম। অবশ্যই বন-দপ্তরের লোকজনকে বিরক্ত করতে হতো, কারণ সুন্দরবনের মাঝ-নদীতে নোঙর করা মানে ডাকাতির সম্ভাবনা থাকবেই। অতএব সঙ্গে আরেকটা লঞ্চ ও তাতে বন্দুকধারী বনকর্মী। আমরা কৃতজ্ঞ বন-দপ্তরের কাছে যে তাঁরা আমাদের সেই সুযোগটা করে দিয়েছিলেন। একবার নেতিধোপানি'র কাছে নোঙর করে আমরা রাতে রয়ে গেলাম। বনকর্মীদের লঞ্চ আমাদের পাশেই নোঙর করল। আমরা রাতের খাওয়া শেষ করার সময় লক্ষ করলাম দূরের দ্বীপগুলো কালো হয়ে চারদিকে ঘিরে রয়েছে দিগন্তে। আকাশটা ছাই রঙের এবং সেখানে অসংখ্য তারা, যা শহরে থাকলে একেবারেই দেখা যায় না। চারদিক নিস্তব্ধ আমরা একটা ওয়াকম্যানে খুব নিচু মাত্রায় দেবব্রত বিশ্বাস-এর রবীন্দ্রসঙ্গীত চালিয়ে দিলাম। প্রথম গান ছিল— 'আকাশভরা সূর্য-তারা'। আমি খাওয়া ছেড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে হল— 'বিস্ময়ে, তাই জাগে, জাগে আমার গান...'। বন্ধুদের কথায় চমক ভাঙলো। 'কী হল? খাওয়া শেষ কর।' সেই রাতে আমার বাথরুমে যাওয়ার জন্যে ঘুম ভাঙল রাত তিনটেয়। বাথরুমে যেতে গিয়ে শিশির-ভেজা নৌকোর পাটাতনে পা পিছলে আছাড় খেলাম। ভাগ্য ভালো চোট লাগেনি। বাথরুম সেরে ফিরে আসতে গিয়ে থমকে গেলাম। দূরের দ্বীপ থেকে ভেসে আসছিল একটি বাঘের গর্জন! আমি মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। খানিক পরেই পাশের দ্বীপ থেকে অন্য একটি বাঘের গর্জন। বুঝলাম একটি বাঘ, অন্যটি বাঘিনি। মিলন-সংকেত। মিনিট দুয়েক শুনে শুতে চলে গেলাম। আবার এক রাতে, যখন হলদি ক্যাম্পের কাছে নোঙর করেছিলাম, তখন রাতে উঠে নদীতে কুমিরের দেখা পেয়েছিলাম। লঞ্চের কাছে এসে আমাকে দেখে আবার ডুবে গেল। আমি রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। নদীর জলে সবুজ রং দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। পরে জেনেছিলাম নোনা জলে ফসফরাস থাকার জন্যে ওইরকম সবুজ রং দেখা যায়। একবার ঘরের মধ্যে না শুয়ে বাইরের ডেকে বিছানা পেতে শুয়েছিলাম। ভোরে উঠে দেখলাম সবটা ভিজে গেছে শিশির পড়ে। তবুও আনন্দ হয়েছিল। রোদ ওঠার পরে সব শুকিয়েও গিয়েছিল। একবার ঘন কুয়াশায় প্রায় হারিয়ে যেতে যেতে যাইনি। রাতে একটা মোটর-বোট-এর আওয়াজ পেয়ে ভয় পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ডাকাত। তারা কাছে আসাতে বুঝলাম তারা সাধারণ লোক, তারাও কুয়াশায় হারিয়ে গেছে। মাঝ-নদীতে মাছ ধরার নৌকো থামিয়ে, তাদের থেকে মাছ আর কাঁকড়া চেয়ে নিতাম। বিনিময়ে পয়সা দিতে চাইলে অনেকেই নিতে চাইত না। আমরা জোর করে টাকা হাতে দিয়ে দিতাম। আমরা চাল-ডাল, নুন-তেল, ফল-সব্জি, চা-বিস্কুট সব নিয়েই যেতাম। সকালে লুচি, আলুর দম, ডিম ভাজা, ফল। দুপুরে ভাত-ডাল, আলু-কপির সব্জি, চিংড়ি মাছ। বিকেলে মুরগির টিকিয়া, মুড়ি-বেগুনি, চা। রাতে রুটি, ডিমের ঝোল, চিকেন কারি, চাটনি। যেন বিয়েবাড়ির ভোজ। এর সঙ্গে চা-পান, সুরাপান ও ধূমপানও চলত। তবে আমরা সজাগ থাকতাম আবর্জনা নিয়ে। কোনও রকম জিনিস নদীতে ফেলা চলবে না। সেসব সযত্নে ব্যাগে ভরে শহরে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হতো। মাঝে-মধ্যে কোনও ক্যাম্পে

নেমে হ্যান্ড-পাম্প পেলে অথবা পুকুরে নেমে চান করে নিতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওয়াচ-টাওয়ারে বসে মিষ্টি-জল খেতে আসা পশুদের অপেক্ষায় বসে থাকতাম ও ছবিও তুলতাম। সুন্দরবনে ব্যাটারি চার্জ করাটা মুশকিল ছিল। ক্যামেরা'র ব্যাটারি ফুরিয়ে গেলে বিপদে পড়তে হতো। তবে আজকাল লঞ্চে ব্যবস্থা আছে। পাওয়ার পয়েন্ট আছে, টিভি আছে, নানারকম বই আছে, রেডিও ট্রান্সমিটার আছে ইত্যাদি। আমরা মাঝ-নদীতে চরে আটকে পড়েছি বহুবার। সেখানে চরে নেমে হেঁটে ঘুরেও এসেছি, বাঘের ভয় থাকা সত্ত্বেও। অনেক সময় জলের অভাবে বাথরুম ব্যবহার কম করেছি। চান বর্জন করেছি, বা নদীর নোনা জলে চান করেছি। সেটা অনেকের কাছে পাগলামি হলেও, আমাদের কাছে পুরোপুরি উপভোগ্য। অনেকক্ষণ ক্যাম্পে বসে বনরক্ষীদের গল্প শুনেছি। তাদের নানান অভিজ্ঞতা, তাদের সুবিধে-অসুবিধে, তাদের দুঃখ-কষ্ট, তাদের সুখ-আনন্দ, এবং আরও অনেক কিছু। সুন্দরবন এক অনন্য অভিজ্ঞতা। সে ভোলার নয়।

অনেকে আমাদের জিজ্ঞেস করেন 'জঙ্গলে যান, বন্দুক নিয়ে যান? ভয় করে না? বাঘ-ভালুকের উপদ্রব হয় না?' আমরা খুব আশ্চর্য হয়ে যাই এই প্রশ্নগুলো শুনে। লোকে কি ভাবে যে জঙ্গলে গেলেই হাতি-বাঘ এসে আক্রমণ করবে? সাপ-বিছে এসে ছোবল মেরে দেবে? আমার মনে হয় পশু-পাখিরা সবাই নিরীহ। তাদের বিরক্ত না করলে বা ভয় না দেখালে তারা আমাদের কোনও ক্ষতি করবে না। তারা মানুষকে ভয় পায় এবং এড়িয়ে চলে। মনে রাখতে হবে যে আমরা তাদের বাসস্থানে তাদের অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করেছি। অতএব তাদের অগ্রাধিকার থাকবে। আমরা অতিথির মতো ব্যবহার করলে কোনও অসুবিধে হয় না। আমরা তাদের ভয় পাব কেন? ভয় তখনই পায় লোকে যখন তাদের মন পরিষ্কার থাকে না। মানুষ জন্তুদের সঙ্গে যুগ যুগ ধরে এমন খারাপ ব্যবহার করে এসেছে যে জন্তুরা মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। তাদের সেই বিশ্বাসটা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে বন বিভাগের কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। তাদের কথা মেনে চলতে হবে। প্রকৃতি আমাদের জন্ম দিয়েছে, তাই প্রকৃতিকে রক্ষা করা আমাদের কাজ। আমাদের বেড়ানোর পাগলামি চলতেই থাকবে যতদিন শক্তি আছে। সেই পাগলামির কুপ্রভাব যেন প্রকৃতির ওপর না পড়ে। 'কোরনা' হয়তো প্রকৃতির মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার একটা পদ্ধতি। লকডাউনে প্রকৃতি আবার স্বমহিমায় ফেরার চেষ্টা করছে, সেটাকে সম্মান করলে আমরা হয়তো আগামী দিনগুলোতে ভালো থাকতে পারব।

ছবি: লেখকের পারিবারিক অ্যালবাম থেকে
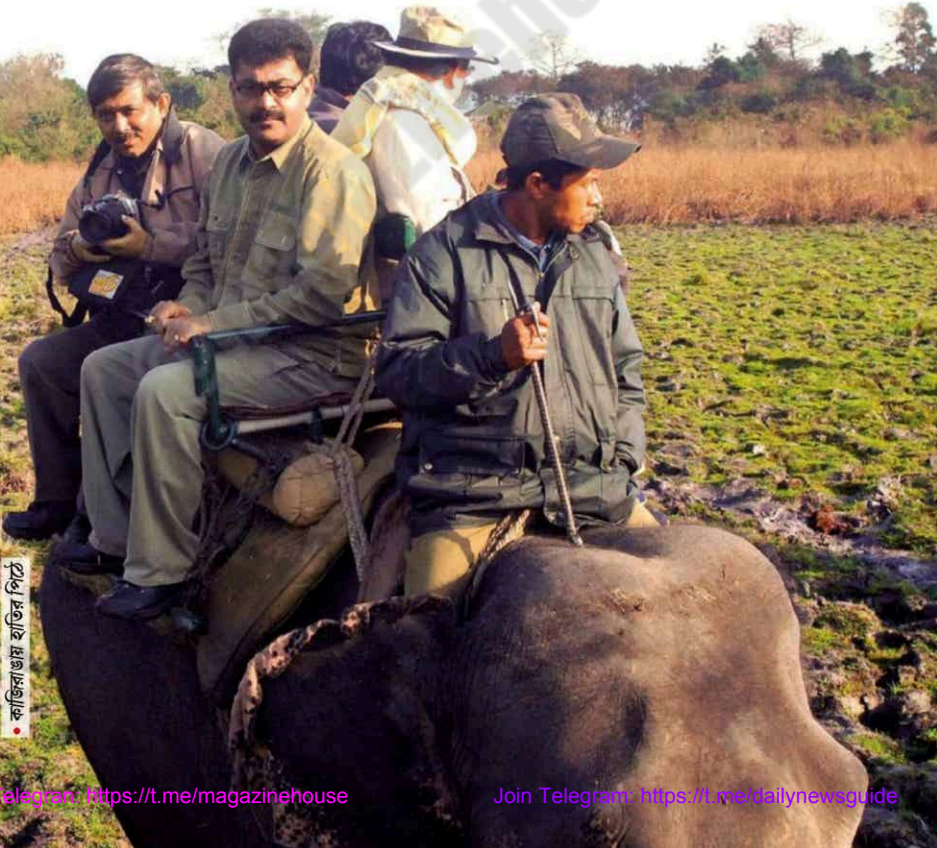
কাজিরাঙায় হাতির পিঠে
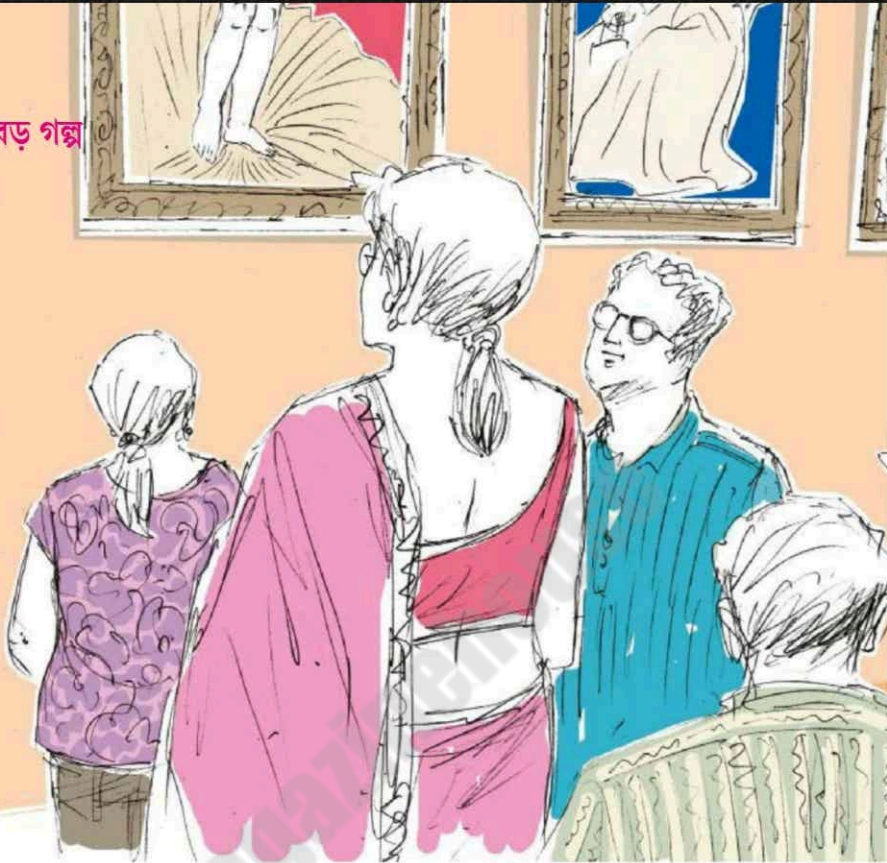
‘দি ভেনাস’ অন্তর্ধান রহস্য

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

টিফিন আওয়ারের পর গার্গী একটু নিশ্চিন্তে বসে, একটু আগেই সায়নের সঙ্গে বসে ডেকার্স লেনের বিখ্যাত চিকেন পকৌড়ার স্বাদ নিয়েছে, তা এখনও জিভে লেগে, সুইংডোর ঠেলে সোনালিচাঁপাকে চেম্বারে ঢুকতে দেখে গার্গী ভুরু নাচায়, কী খবর?

রূপবানের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার পর সোনালিচাঁপার জীবনটা এখন রঙে রং। সারাক্ষণ ঠোঁটের কোণে হাসি টইটম্বুর, কথাবার্তাও রঙিন-রঙিন। সামনের চেয়ারে বসেই বলল, দিদি, রূপবানের খুব ইচ্ছে আগামী ৩১ মে বেঙ্গল আর্ট মিউজিয়ামের এগজিবিশন শুরু হচ্ছে, তুমি যদি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকো, তাহলে ও খুব খুশি হবে।

গার্গী ভাবল এক মুহূর্ত, বলল, কলকাতা শহরে প্রচুর আর্ট গ্যালারি, রোজই তো বহু প্রদর্শনী হচ্ছে, এখানে কি স্পেশাল কিছু আকর্ষণ আছে?

—আছে বলেই তো তোমাকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। পারির লুভ মিউজিয়ামে ‘ভেনাস দি মিলো’র একটা বিশাল ভাস্কর্য আছে, সেই ভাস্কর্য দেখে পারির একজন তরুণ শিল্পী ফাটাফাটি ছবি এঁকেছেন। সেই ছবি আসছে কলকাতার এই এগজিবিশনে, তার সঙ্গে তাঁর আরও চব্বিশটি ছবি আসছে।

—কী নাম সেই শিল্পীর?

—একদম অনামী শিল্পী। কিন্তু তাঁর ছবি পারিতে ব্যাপক দর্শক টেনেছে। এখন কলকাতা তোলপাড় হবে। পারি থেকে সোজা কলকাতা এসেছে, এখানে এগজিবিশন শেষ হলে পরদিন সকালেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে ইতালিতে। সেখানে আর একটা এগজিবিশন ঠিক হয়ে রয়েছে।

সোনালিচাঁপার উচ্ছ্বাস গার্গী খুব উপভোগ করে বলল, আর এক পৃথিবীখ্যাত শিল্পী বতিচেল্লিও তো একটা ভেনাস এঁকেছেন, সেই ভেনাসকে দেখে আরও বহু শিল্পী ভেনাস

এঁকেছেন, কিন্তু বতিচেল্লির ভেনাসকে কেউ টপকে যেতে পারেননি আজও।

— রূপবান বলেছে, এই শিল্পীর নাম জ্যাক ডেভিড। বতিচেল্লির মতো বিখ্যাত নন, কিন্তু ফাটাফাটি এঁকেছে।

ফাটাফাটি শব্দটার দু'বার ব্যবহার গার্গীর মনে জড়ো করল এক আশ্চর্য কৌতুক। বলল, কীরকম ফাটাফাটি?

সোনালিচাঁপার মুখটা বোধহয় আরও একটু ফুলো-ফুলো হয়েছে ইদানীং, বলল, মানে যেমন রঙের ব্যবহার, তেমনই ব্রাশের কাজ। লাল রঙের ব্যবহার যে এভাবেও করা যায় তা ছবিগুলো না দেখলে ভাবতে পারবে না।

সোনালিচাঁপা কিছুকাল আগেও ছবির ক-খও বুঝত না, এখন বেশ ছবি-বিশেষজ্ঞের মতো কথা বলে। সবই সঙ্গগুণ।

গার্গী বলল, বতিচেল্লির ভেনাসে নীল রঙের ছড়াছড়ি। ভেনাস মানেই তো সেই নীল সমুদ্র থেকে স্নান করে উঠে আসছে এক অপরূপা নারী। সমুদ্র কি লাল রঙের এঁকেছে!

—হ্যাঁ। ছবিটা লাল রঙে এঁকে তরুণ শিল্পী এক অন্য মাত্রা যোগ করেছেন ছবিটায়।

—তাহলে তো দেখতে যেতেই হয়।

গার্গী ক্যালেন্ডারে তাকিয়ে দেখল, দিনটা রবিবার। যাওয়াই যায়। বলল, তুই বরং তোর সায়নদাকে বলে দ্যাখ, যাবে কি না।

—দিদি, [illegible]জন শিল্পীর বেশ কয়েকটা নতুন ছবি এসেছে ফ্রান্স থেকে। ওখানকার ইয়ং জেনারেশন এখন খুব ভালো কাজ করছে। তুমি তো জানোই পারি হল সারা বিশ্বের পেইন্টিং-এর রাজধানী। সেখানকার নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা কীরকম আঁকছে তার একটা ধারণা হবে প্রদর্শনী দেখতে গেলে।

গার্গী মিষ্টি করে হাসল সোনালিচাঁপার বক্তৃতা শুনে। সোনালিচাঁপা এখন দিব্যি শিল্প-বিশেষজ্ঞের মতো ছবি বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করে। প্যারিস এখন তার ভাষায় পারি। বলল, প্রদর্শনীতে রূপবানের ছবি আছে তো?

সোনালিচাঁপা আনন্দে ডগমগ হয়ে বলল, আছেই তো। দুটো বড় মাপের ছবি আছে। ফোর্টিন বাই টুয়েলভ। অ্যাক্রিলিকে আঁকা। বেঙ্গল আর্ট মিউজিয়ামে বছরে দু'বার করে এগজিবিশন হয়। পনেরো দিন ধরে। এখানে চান্স পাওয়া খুব কঠিন।

—তাহলে তো যাওয়া মাস্ট, গার্গী হাসি-হাসি মুখে বলল, আমরা পাঁচজনে একসঙ্গেই যাব।

সোনালিচাঁপা খুশিতে শরীর দুলিয়ে বলল, কী মজা! তবে রূপ বোধহয় আমাদের সঙ্গে যাবে না। ওকে আগে গিয়ে প্রদর্শনী সাজানোর কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে।

—বেশ তাই হবে।

সোনালিচাঁপা এতদিন সিঙ্গল ছিল, ডাবল হওয়ার পর তারই পরামর্শে রূপবান কসবার কাছেই একটা অ্যাপার্টমেন্টে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। সোনালিচাঁপার কাছেই গার্গী শুনেছে রূপবানের ছবি বিক্রি হতে শুরু করেছে। ছবির দাম এখন অনেক। রূপবানের একটা ছবি এক লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

সোনালিচাঁপা এগুলো বলে আর ঝলমল করতে থাকে খুশিতে।

রবিবার আসতে তখনও তিনদিন বাকি। সোনালিচাঁপা রোজই একবার করে এ-কথা ও-কথার মধ্যে স্মরণ করিয়ে দেয় প্রদর্শনীর কথা। তারমধ্যে এসে গেল ৩১ মে।

জায়গাটা গোলপার্কের কাছাকাছি, ছুটির দিন বলে সায়ন ঠিক করল সে নিজেই ড্রাইভ করে নিয়ে যাবে। কিছুদিন ধরেই বলছিল ড্রাইভিংটা ভুলে যাচ্ছি, আবার রপ্ত করে নিতে হবে। ক'দিন ভোরে ঘণ্টাখানেক করে গাড়ি চালিয়ে বলল, নাহ্, সাঁতার আর ড্রাইভিং, একবার শিখলে কেউ ভোলে না।

আজ তার গাড়িতে গার্গী, লুনা আর সোনালিচাঁপাকে তুলে নিয়ে চলল গোলপার্ক অভিমুখে।

লুনা কখনও তার বাবার ড্রাইভিং-এ গাড়িতে চড়েনি, আজ সে রীতিমতো রোমাঞ্চিত, বলল, তোমার হাত তো দারুণ, বাবা! এতদিন কেন চালাতে না!

সায়ন নিখুঁতভাবে স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, অফিসের কাজে এত খাটতে হয়, এত ট্যুর করতে হয়, তখন সারাদিন কাজের পর আর গাড়ি চালাতে ইচ্ছে করে না! তবে এখন মনে হচ্ছে ছুটির দিনগুলোয় জয় রাইড করতে বেরিয়ে নিজে ড্রাইভিং করলে অনেকটা প্রাইভেসি বজায় রাখা যায়। ড্রাইভারের সামনে সব আলোচনা করাও যায় না।

লুনা বলল, মা, তুমিও তো ড্রাইভিং শিখছিলে, আবার একটু চর্চা করতে পারো।

গার্গী সজোরে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, এখন আর পারব না। বরং তোর আঠারো বছর হলেই তুই শিখে নিবি।

—সে তো একশোবার, বলে হতাশ গলায় বলল, সে এখনও দু [illegible]।

লুনার এখন ক্লাস টেন, সিক্সটিন প্লাস, পারলে এখনই গাড়ি চালাতে শেখে।

সোনালিচাঁপা এত সময় চুপচাপ শুনছিল, এখন বলল, রূপও ভালো চালায়, আমাকেও বলেছে শিখিয়ে দেবে।

সায়ন বলল, তাহলে বেশ ভালোই হবে। সবাই চালাতে পারলে একদিন দল বেঁধে লং ড্রাইভে কোথাও যাব। চাঁদিপুর কিংবা গোপালপুর অন সি। পালা করে স্টিয়ারিং ধরব।

লুনা লাফিয়ে উঠে বলল, গ্রেট আইডিয়া।

আলোচনা চলাকালীন তারা পৌঁছে গেল বড়সড় চেহারার বাড়িটার সামনে। সামনে বেশ অভিজাত চেহারার গেট, গেটের উপরে চমৎকার আর্চ, তার উপরে সোনালি রঙের ইংরেজিতে বড় করে লেখা 'বেঙ্গল আর্ট মিউজিয়াম'। তার নীচে ছোট আকারে লেখা— 'এস্টাব্লিশড— নাইনটিন নাইনটি এইট।'

বাড়িটা পুরনো আমলের, অথচ মাত্র বাইশ বছর আগে মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা! নিশ্চয় আগে এ-বাড়িতে অন্য কিছু ছিল।

গাড়িটা জায়গামতো পার্ক করে ওরা গেটের ভিতর ঢুকে চমৎকৃত। বড় আকারের লনে মিহি কোরিয়ার ঘাসের দৃশ্যে এক আশ্চর্য সবুজ আরাম। মাঝখানে ছোট-ছোট নুড়ি পাথর ছড়ানো সরু রাস্তা। তারপর সাদা ধবধবে বেশ পেল্লায় চেহারার বাড়ি। বিকেল চারটে পঁয়ত্রিশ। এখনও পঁচিশ মিনিট বাকি প্রদর্শনী উদ্বোধন হতে। সামনে একটা বড় ফেসিয়া, তাতে লেখা উদ্বোধক কার্তিক আইচের নাম। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট শিল্পী, তাঁর একটা পোর্ট্রেট আঁকা নামের পাশে। শুভ্র এলোমেলো কেশ, শুভ্র শ্মশ্রুময় মুখমণ্ডল।

তাঁরা ছবি দেখছে, তার মধ্যে এক ঝাঁকড়া-চুলো দাড়ি-গোঁফ মুখে যুবক এসে সোনালিচাঁপাকে বলল, আপনি নিশ্চয় সোনালিদি? আর আপনারা নিশ্চয় সায়নদা আর গার্গীদি?

যুবকটির পরনে মোরগফুল রঙের পাঞ্জাবির সঙ্গে সাদা পাজামা। গার্গীরা অবাক হচ্ছিল অচেনা যুবকের কণ্ঠে নিজেদের নাম শুনে। পরের মুহূর্তে শুনল, আমার নাম রোহিতাক্ষ আচার্য। রূপদা আমাকে পাঠালেন আপনাদের ভিতরে নিয়ে যেতে। উনি এখন প্রদর্শনীতে ফিনিশিং টাচ দিতে ব্যস্ত। বিখ্যাত শিল্পী কার্তিক আইচ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এসে পড়বেন।

রোহিতাক্ষর পিছু পিছু গার্গীরা ঢুকল বিশাল একটা ঘরের ভিতর। দরজার উপরে লেখা গ্যালারি-এ। ব্যাডমিন্টন খেলা যায় এমন মাপের ঘরের চার দেওয়ালে শুধু ছবি আর ছবি। কত আকারের, কত বিভিন্ন ধরনের ছবি টাঙানো, প্রতি ছবির নীচে শিল্পীর নাম লেখা। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে চার-পাঁচজন শিল্পী-চেহারার যুবক। তাদের মধ্যে একজন রূপবান। সে তখন খুব নিবিষ্ট হয়ে দু'জন তরুণের সঙ্গে আলোচনা করছে কোন কোন ছবি এবার নতুন এল, কার কার আঁকা সেই সব ছবি, কোন-কোনটা বিদেশি ছবি। জ্যাক ডেভিডের ছবির জন্য একটা পুরো দেওয়াল।

হলের মাঝখানে প্রদর্শনীর উদ্বোধনের আয়োজন। সেখানেই দাঁড়িয়ে রূপবান।

বলল, সায়নদা, এই দেখুন এখানে উদ্বোধন হবে প্রদর্শনীর।

হলের মাঝখানে একটা বড় আকারের তামার পাত্র, তাতে জল ভর্তি। তার সামনে আরও একটা পাত্র লাল গোলাপের পাপড়িতে ভর্তি।

—উদ্বোধক কার্তিক আইচ ফুলের পাপড়ি দুই অঞ্জলি ভরে জলে ভাসিয়ে দিলেই উদ্বোধন।

—বাহ্, বেশ অভিনব উদ্বোধন তো, দৃশ্যটি বেশ মুগ্ধ করল গার্গীকে।

খুশি-খুশি মুখে রূপবান বলল, গার্গীদি, সায়নদা, আমি কী যে খুশি হয়েছি আপনারা আসাতে। আমি তীর্থপতি স্যারকে বলে রেখেছি আপনারা আসবেন আজ।

লুনা অমনি মুখে আঁধার মেখে বলল, বাহ্, আমি এসেছি বলে বুঝি তুমি খুশি হওনি, রূপদা?

রূপবান অমনি লুনার গালে একটা টোকা দিয়ে বলল, আরে, তুই তো আজকের প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণ। কার্তিক আইচের হাতে তোর হাত দিয়েই ফুলের বোকে তুলে দেওয়া হবে এরকমই আলোচনা হয়েছে তীর্থপতি স্যারের সঙ্গে। এই দ্যাখ, মিনিট টু মিনিট প্রোগ্রাম।

রূপবানের হাতের প্রোগ্রামে তার নাম দেখে লুনার মুখে একরাশ হাসি। সে ভাবতেই পারেনি আজ তার ভূমিকা হবে এত গুরুত্বপূর্ণ।

হলঘরের মধ্যে নানা টুকিটাকি কাজে তখনও ব্যস্ত থাকা দু'জন যুবকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল রূপবান, সায়নদা, এরা দু'জনেই মিউজিয়ামের অ্যাসিস্ট্যান্ট কিউরেটর, একজন রোহিতাক্ষ আচার্য, মাইকেলেঞ্জেলোর মতো দাড়ি রেখেছে, আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু, আর অন্যজন মনোজ শর্মা, ক্লিন-সেভড ইউপি-র ছেলে। দু'জনেই ভালো শিল্পী।

লম্বা গড়নের রোহিতাক্ষ উজ্জ্বল মুখে হাসল, কিন্তু সাধারণ উচ্চতার মনোজ শর্মা লাজুক মুখে বলল, আমি সেই অর্থে শিল্পী নই—

গার্গী হাসিমুখে বলল, শিল্পী নও?

মনোজ শর্মার পরনে ব্ল্যাক ট্রাউজার্সের উপর অফ হোয়াইট শার্ট। বলল, না ম্যাডাম, আমি প্রতিলিপি আঁকি।

—দিদি, এই দু'জনেই মিউজিয়ামের দুই স্তম্ভ। কাল এয়ারপোর্ট থেকে একটা বড় গাড়িতে করে মিউজিয়ামের ছবি এসেছে, এরা দু'জনেই ছবি নামিয়ে স্টোর রুমে নিয়ে যাওয়া, স্টক রেজিস্টারে তোলা, তারপর গ্যালারিতে টাঙানো— সবই দায়িত্ব নিয়ে করেছে।

আর এক ছটফটে তরুণকে দেখিয়ে রূপবান বলল, এ হল বিধু মালাকার। মিউজিয়ামের শিরা-উপশিরার মধ্যে সারাক্ষণ ছুটে কাজ করে। স্প্রিন্টারদের মতো গতি। এগজিবিশন হলে তো একশো মিটার দৌড়োয়।

এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, তীর্থপতিদা বোধহয় কার্তিক আইচকে অভ্যর্থনা জানাতে বাইরে প্রধান দরজার কাছে অপেক্ষা করছেন। পরে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।

তীর্থপতি শ্রীমল মিউজিয়ামের কিউরেটর। তিনিই এই কর্মকাণ্ডের প্রাণপুরুষ। তিনি নিজে একজন নামী শিল্পী, নিজের হাতে সংস্থাটি গড়ে তুলেছিলেন বাইশ বছর আগে।

রূপবান কব্জির দিকে তাকিয়ে বলল, শুনলাম রাস্তায় খুব জ্যাম। এখনও মিনিট দশেক লাগবে কার্তিক আইচের পৌঁছতে। চলুন, চট করে পুরো মিউজিয়ামটা এক ঝলক দেখিয়ে দিই আপনাদের। যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, এটা 'গ্যালারি-এ'। চলুন, আপনাদের পিছনের গ্যালারিটা দেখিয়ে নিয়ে আসি।

পিছনের হলের দরজার উপরে লেখা 'গ্যালারি-বি'। সেখানে ঢুকে রূপবান ধারাবিবরণীর মতো বলে চলেছে

সুস্থতায়, সতর্কতায় কাটুক উৎসবের দিনগুলি

শারদ শুভেচ্ছায়

ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদ

নির্মল ঝাড়গ্রাম, সুন্দর ঝাড়গ্রাম

আমাদের লক্ষ্য ঃ–

- প্রতিটি পরিবারে শৌচাগার নির্মাণ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
- সম্পদকর্মীদের মাধ্যমে সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান ও রোগপ্রতিরোধ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।
- গ্রামপঞ্চায়েত ভিত্তিক চিকিৎসালয়গুলিতে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান।
- কঠিন ও তরল আবর্জনার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।

বৃষ্টির জল ধরুন
জল সংরক্ষণ করুন
জলাশয় বাঁচিয়ে রাখুন
জলের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করুন
জলের গুণগত মান বজায় রাখুন
ব্যবহৃত জল পুনর্ব্যবহার করুন
জল অপচয় বন্ধ করুন
ভূজল পুনর্ভরণ করুন

সাবান দিয়ে ধুলে হাত
করোনা হবে কুপোকাত

পরিচ্ছন্নতাই পরিচয়, যেখানে সেখানে আবর্জনা নয়।

মিউজিয়ামের কার্যাবলি।

মিউজিয়ামটির দুটি গ্যালারিতেই সারা বছর টাঙানো থাকে মিউজিয়ামের নিজস্ব ছবিগুলি। তার মধ্যে গ্যালারি এ-তে বছরে দু'বার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, তাতে কিছু ছবি থাকে মিউজিয়ামের নিজস্ব, কিছু ছবি আসে বিদেশ থেকে, এই দু-রকম ছবিতেই লেখা থাকে 'নট ফর সেল'। সেই সঙ্গে কিছু ছবি থাকে এ-রাজ্যের ও ভিন-রাজ্যের প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের, সেগুলি প্রদর্শিত হয় বিক্রির জন্য।

গ্যালারি-বি আকারে আরও বড়, চার দেওয়াল জুড়ে অজস্র ছবি। এগুলো মিউজিয়ামের নিজস্ব সম্পত্তি। দেশ-বিদেশ থেকে বেশ মোটা টাকায় এই ছবি সংগ্রহ করে আনেন তীর্থপতি শ্রীমল।

গ্যালারি-বি-এর পিছনদিকে একটা স্টোররুম আছে সেখানে প্রচুর ছবি আছে স্টক হিসেবে। কিছুদিন পর পর গ্যালারি দুটির কিছু ছবি স্টোররুমে এনে, স্টোররুমের কিছু ছবি বাইরের গ্যালারিতে নিয়ে গিয়ে টাঙানো হয় যাতে সব ছবি দর্শকদের দেখানো যায় পর্যায়ক্রমে।

সারা বছর প্রচুর দর্শকের সমাগম হয় মিউজিয়ামে। দর্শকদের টিকিট কিনে ঢুকতে হয় মিউজিয়াম দেখতে। সেই টাকাই মিউজিয়ামের আয়। বছরে দু'বার প্রদর্শনী হয় গ্যালারি-এতে, সেখানে বেশ কিছু ছবি বিক্রি হয়, তার একটা অংশ পান শিল্পী, অন্য অংশ মিউজিয়াম।

গ্যালারি-বি আর স্টোররুম এক ঝলক দেখা হলে রূপবান তাদের আবার নিয়ে এল গ্যালারি-এতে। হলের মুখে এখন দাঁড়িয়ে আছেন শিল্পী-শিল্পী চেহারার মধ্যবয়সি একজন, তাঁকে গিয়ে রূপবান কিছু বলতেই তিনি এসে হাতজোড় করে নমস্কার করে বললেন, আমার নাম তীর্থপতি শ্রীমল। আপনাদের কথা রূপবানের মুখে অনেক শুনেছি, খুব ভালো লাগছে আপনারা আসায়।

গার্গী খুঁটিয়ে দেখছিল এত বড় প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারকে। একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি, চোখে সোনালি রঙের সরু ফ্রেমের চশমা, চোখদুটো বেশ ভাবালু ধরনের। বলল, এতদিন কেন যে এরকম একটা চমৎকার মিউজিয়ামের সন্ধান পাইনি তাই ভাবছি।

তীর্থপতি শ্রীমল খুশি হয়ে বললেন, আপনাদের পছন্দ হয়েছে? অনেক ঝড়জল সয়ে তৈরি করতে পেরেছি এই মিউজিয়ামটা। কেউ কিছু একটা গড়তে চাইলে তার পরিকল্পনা বানচাল করতে এতজন চেষ্টা করে যে, আমার মতো নাছোড় একজন না-হলে ছেড়ে পালিয়ে যেত অনেক আগেই। কী যে কঠিন কাজ—

তাদের কথোপকথনের মধ্যে বিধু মালাকার প্রায় ছুটে এসে খবর দিল, স্যার উদ্বোধক এসে গেছেন।

তীর্থপতি শ্রীমল কথা অসমাপ্ত রেখে জোরে পা চালিয়ে বেরিয়ে গেলেন গেটের বাইরে। একটু পরেই যাঁকে নিয়ে হলের ভিতরে ঢুকলেন, তাঁকে চিনল গার্গী। দেখে এসেছে বাইরে টাঙানো তাঁর স্কেচ। কার্তিক আইচকে ঘিরে তখন অনেক শিল্পীর ভিড়, সবটাই তাঁর বিপুল খ্যাতির কারণে।

ঘড়িতে তখন পাঁচটা দশ, তীর্থপতি শ্রীমল বললেন, কার্তিকদা, আমরা আর একটুও দেরি না করে শুরু করে দিতে চাই আজকের উদ্বোধন অনুষ্ঠান। রূপবান, তুমি শুরু করো।

রূপবান অমনি ঘোষণা করল, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আজ বেঙ্গল আর্ট মিউজিয়ামের একটা লাল অক্ষরের দিন। বিখ্যাত ফরাসি শিল্পী জ্যাক ডেভিডের পাঁচিশটি দুর্ধর্ষ ছবি প্যারিস থেকে এনেছেন আমাদের তীর্থপতিদা, বিশিষ্ট শিল্পী তীর্থপতি শ্রীমল, সেই ছবির প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে এসেছেন আমাদের সবার প্রিয় শিল্পী কার্তিক আইচ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই শিল্পীর পেইন্টিং এখন ছড়ানো আছে বিশ্বের বহু আর্ট গ্যালারিতে। তাছাড়াও পৃথিবীর তাবড় তাবড় শিল্প-সংগ্রাহকদের সংগ্রহে আছে তাঁর আঁকা বহু অয়েল পেইন্টিং। আজ তাঁর ব্যস্ত সময়ের মধ্যে একটু ফুরসত খুঁজে নিয়ে এসেছেন এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে। উদ্বোধন

করার আগে তাঁকে ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে লুনা চৌধুরি।

লুনা তখন হাসি-হাসি মুখে মস্ত একটা ফুলের তোড়া তুলে দিচ্ছে কার্তিক আইচের হাতে। কার্তিক আইচ সেটি গ্রহণ করে, আবার লুনার হাতেই দিয়ে বললেন, এটি তোমাকেই উপহার দিলাম।

লুনা মুখের হাসি আরও দ্বিগুণ করে ফিরে এল বোকেটা দু-হাতে উঁচু করে।

তারপর উদ্বোধন পর্ব। কার্তিক আইচ জলে ফুল ভাসিয়ে দেওয়ার পর এলেন আর এক অভিজাত চেহারার শিল্প-রসিক। রূপবান তাঁর নাম ঘোষণা করে বলল, এবার পুষ্পপ্রদান করছেন বিখ্যাত শিল্প-সংগ্রাহক মনোজিৎ শ্রীবাস্তব।

তারপর একে-একে সায়ন চৌধুরি, গার্গী চৌধুরির নামও ঘোষণা করল রূপবান।

জলে ফুল ভাসানোর পর্ব শেষ হলে কার্তিক আইচ আগে-আগে, তাঁর পাশে তীর্থপতি শ্রীমল, অন্য সবাই তাঁদের পিছনে হেঁটে দেখতে শুরু করলেন বিদেশি ও দেশি ছবিগুলি। তীর্থপতি শ্রীমল একটু-একটু করে বলতে লাগলেন ছবিগুলির বিবরণ। পারির পঁচিশটি ছবির মধ্যে ভেনাসের ছবির সামনে একটু বেশি সময় নিয়ে দাঁড়ালেন ওঁরা। এই ছবিটি অন্যগুলোর চেয়ে একেবারেই পৃথক, তার কারণ ছবিটিতে ঘন লাল রঙের প্রাধান্য, বিশাল সমুদ্রের জলের রং টকটকে লাল, লাল জলের মধ্যে থেকে স্নান করে উঠে আসছে নগ্ন ভেনাস। এত চমৎকার তার শরীরের গঠন, তার শরীরের বিভঙ্গ যে, একবার দেখলে আরও বহুবার দেখতে মন চায়। লাল রঙের মধ্যে তাকে দেখাচ্ছে ভারী অপরূপ। নগ্নিকার শরীরে যেন একটুকরো কবিতা মেশানো।

মিনিট পঁচিশের মধ্যে উদ্বোধন পর্ব শেষ। কার্তিক আইচ সবাইকে হাতজোড় করে নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন তাঁর গাড়ি করে।

রূপবানের মুখ তখন খুবই উজ্জ্বল দেখাচ্ছে কেননা কার্তিক আইচ তাঁর ছবি দুটির সামনে একটু বেশি সময় নিয়ে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন। এখন আরও অনেকে তার ছবি দুটি নিয়ে আলোচনা করছে।

কব্জিতে তখন পৌনে ছ'টা, সায়ন চাইছিল এবার ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নেবে, কিন্তু রূপবান বলল, সায়নদা, আর আধঘণ্টা সময় দিতে হবে আপনাদের। তীর্থপতি স্যার চাইছেন, ওঁর অফিসঘরে আপনাদের নিয়ে কিছু সময় বসবেন, চা খাওয়াবেন।

অতএব বসতেই হল আরও আধঘণ্টা। দুই সহকারী কিউরেটরও বেশ জমিয়ে রাখল নানা অভিজ্ঞতার কথা বলে। চায়ের শেষে সহকারী কিউরেটর মনোজ শর্মা কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, স্যার, আমি আজ আর কাল দু'দিনই পৌনে আটটা নাগাদ বেরিয়ে যাব। দেশে যাব, একটু কেনাকাটা করার আছে। পরশু থেকে আবার ফুল টাইম থাকব।

তীর্থপতি শ্রীমল বললেন, নো প্রবলেম। এ ক'দিন যা খেটেছ, এটুকু ফেবার চাইতেই পারো।

মনোজের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল আমাদের স্যার একেবারে আইডিয়াল স্যার।

অফিসঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে এসে ওরা আলোচনা করছিল রূপবানের ছবি নিয়ে। রূপবানের একটা ছবির নীচে লাল টিপ পড়ে গেছে দেখে সোনালিচাঁপা খুব উচ্ছ্বসিত। লাল টিপ মানে 'সোল্ড'।

রূপবান বলল, আমি একটু পরে যাব সায়নদা। একেবারে প্রদর্শনীর সবাই বেরিয়ে গেলে—

সোনালিচাঁপা খুশিতে ডগমগ, বলল রূপ, তোমাকে একটা ভালো গিফট দিতেই হবে এবার। কী গিফট তা এখনই বলছি না। সারপ্রাইজ দেব।

রূপবান বলল, তোমাকে এ ক'দিন রোজ মিউজিয়ামে যেতে হবে। আমার ছবি দুটোর কাছাকাছি থেকে শুনবে কে কী বলছেন ছবি দেখে।

সোনালিচাঁপা বলল, আমি শুনছিলাম, তোমার অন্য ছবিটা দেখে এক সাউথ ইন্ডিয়ান দম্পতি বলাবলি করছিলেন দামটা যদি একটু কম হতো, 'ইনডিফারেন্ট লাভ' ছবিটা কিনে নিতাম।

রূপবান বলল, ছবিটা বিক্রি হলে ভালো হতো। ঠিক আছে, আবার যদি তাঁরা এগজিবিশন দেখতে আসেন, আমাকে বোলো। আমি দাম কমানোর পক্ষপাতী নই, তাতে শিল্পীর দর কমে যায়। কিন্তু আমার এখনই কিছু টাকার দরকার। এক লাখ টাকা লেখা আছে, আশি কি সত্তর হাজার পেলেও বিক্রি করে দেব।

সেদিন বেশ মনোরম একটি স্মৃতি নিয়ে ফ্ল্যাটে ফিরে এল ওরা। লুনা তো ফুলের বোকেটি নিয়ে খুবই রোমাঞ্চিত। এত বড় একটা ফুলের বোকে তাকে আর কখনও কেউ দেননি।

অনেক রাত পর্যন্ত তারা আলোচনা করল প্রদর্শনী নিয়ে।

॥ দুই ॥

প্রথমদিনের প্রদর্শনীর এই উচ্ছ্বাস, উল্লাস কিন্তু পরের দিন থাকল না। পরের দিন বেলা দুটোয় প্রদর্শনীর দরজা খোলার একটু পরেই সোনালিচাঁপার ফোন পেল গার্গী, দিদি সর্বনাশ হয়েছে।

গার্গী উৎকণ্ঠিত, কী হয়েছে?

—ভয়ঙ্কর চুরি। সিকিউরিটি গার্ড অচিন দাস ভয়ার্ত মুখে ছুটে এসেছে কিউরেটর তীর্থপতি শ্রীমলের কাছে, 'স্যার কী হল বুঝতে পারছি না। জ্যাক ডেভিডের বেস্ট ছবিটা দেওয়ালে নেই।' তীর্থপতি স্যার বিশ্বাসই করলেন না, বললেন, 'কোন ছবিটা?'

গার্গীও জিজ্ঞাসা করল, 'কোন ছবি চুরি গেল?'

—দিদি, 'দি ভেনাস'।

গার্গী চমকে উঠে বলল, সে কী!

সোমবারে অফিসে খুব চাপ গার্গীর। মাঝে ছুটির দিন থাকে বলে সোমবারে ইচ্ছে করেই কর্মব্যস্ততা রেখে দেয় যাতে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পারে। কিন্তু কী করে জানবে হঠাৎ বিনা মেঘে এরকম একটা বজ্রপাত হতে পারে তীর্থপতি শ্রীমলের মিউজিয়ামে!

সোনালিচাঁপা বলে রেখেছিল আজ অফিসে আসবে না, রূপবানের সঙ্গে মিউজিয়ামে যাবে।

সোনালিচাঁপার কণ্ঠ কাঁদো-কাঁদো, দিদি, তীর্থপতি স্যার, একেবারে পাগলের মতো চেঁচাচ্ছেন, বলছেন, 'কী করে হতে পারে! কাল যখন এগজিবিশন বন্ধ হল, তখনও ছবিটা যথাস্থানে ছিল।' রূপবান বলছে, সেও তো গেট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত হলে ছিল। কী করা যায়, দিদি? রোহিতাক্ষদা বলছে, নিশ্চয় কোনও ভূতের কাণ্ড!

ভূতের কথা শুনে গার্গী বলল, ভূতরা ছবিপ্রেমিক তা কে কবে জেনেছে!

—দিদি, আমি জানি তোমার অনেক কাজ, তবু যদি একবার আসো এখানে। রূপবানও খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

ফার্স্ট আওয়ারে পর পর তিনটে মিটিং করে একটু ক্লান্ত গার্গী, পরের হাফে খুব জরুরি কাজ নেই, অতএব মিউজিয়ামের এত বড় একটা সমস্যা শুনে না গেলে নিজের কাছে অপরাধী মনে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সায়নকে বিষয়টা বলে বেরিয়ে পড়ল গোলপার্কের উদ্দেশ্যে।

ডেকার্স লেন থেকে বেরিয়ে সোজা রেড রোড ধরে আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড, সেখান থেকে এসএসকেএম হাসপাতালের পাশ দিয়ে হরিশ মুখার্জি রোড ধরে গোলপার্ক পৌঁছাতে আধঘণ্টা। দুপুরের দিকে রাস্তাটা ফাঁকাই পাওয়া যায়। মিউজিয়ামের ভিতর ঢুকে দেখল প্রথমদিনের চেয়ে আজ একটু বেশিই ভিড়। রূপবান আর সোনালিচাঁপা অপেক্ষা করছিল তার জন্য, গার্গীকে নিয়ে গেল গ্যালারির সেই জায়গাটায় যেখানে কাল দুপুরে আলো করে ছিল ফরাসি শিল্পীর গ্যালারি-আলো-করা ছবি, 'দি ভেনাস'। এখন সেই জায়গাটা হা হা শূন্য।

শূন্য মানে এমন শূন্য যে, দৃশ্যটা চোখে পড়তে গার্গীর বুকের ভিতরটাও ফাঁকা। কীরকম হু হু করে উঠল মনটা।

কিছুক্ষণ থম হয়ে দাঁড়িয়ে সোনালিচাঁপাকে বলল, কিন্তু ছবিটা এখান থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়াও তো অসম্ভব ব্যাপার।

রূপবান বলল, দিদি, চলুন আপনাকে নিয়ে যাই তীর্থপতি স্যারের কাছে। উনি ভীষণ আপসেট হয়ে পড়েছেন।

—ন্যাচারালি। চলো—

—বলেছি একমাত্র আপনিই পারেন ছবির হদিশ করতে।

গার্গী বিব্রত হয়ে বলল, আগে সমস্ত বিষয়টা বুঝি—

তীর্থপতি শ্রীমল তাঁর অফিসঘরে বসে আছেন টেবিলের উপর দু'কনুই রেখে, হাতের দুই তেলোর উপর মাথাটা ঝুঁকিয়ে রেখে। চশমাটা টেবিলের উপর উল্টে রাখা। মাথার চুল এলোমেলো। গার্গী যেতেই মাথা তুলে বললেন, আপনি বসুন, ম্যাডাম, আমি একেবারে পপার হয়ে গেছি। বাইশ বছর হয়ে গেল মিউজিয়ামের বয়স, কখনও এরকম ঘটনা ঘটেনি।

—কিন্তু মি. শ্রীমল, আমি শুনলাম এগজিবিশন বন্ধ করে যখন আপনারা বাড়ি যান, তখনও ছবিটা গ্যালারিতে টাঙানো ছিল।

—ছিলই তো।

—তাহলে কী করে ছবি চুরি হল তা আন্দাজ করতে পারেন?

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকালেন তীর্থপতি শ্রীমল, বললেন, কোনও ধারণাই হচ্ছে না। এই বিল্ডিং থেকে একটা মাছিও গলতে পারবে না।

গার্গী হাসল, বলল, ওরকম অনেক সময় মনে হয়। আপনার মেন গেটের চাবি কার কাছে থাকে?

আবার মাথা নাড়লেন তীর্থপতি শ্রীমল, আপনি যা ভাবছেন তা ঠিক নয়। আমাদের সিকিউরিটি গার্ড অচিন দাস এই মিউজিয়ামের জন্মলগ্ন থেকে আছে। ওড়িশায় বাড়ি, কলকাতায় আছে প্রায় ত্রিশ বছর, এই মিউজিয়ামকে প্রাণের প্রাণ ভালোবাসে। দুটো চাবির একটা তার কাছে, একটা আমার কাছে। তার নাকের ডগা দিয়ে কেউ ছবি খুলে নিয়ে চলে যাবে তা অসম্ভব।

গার্গী বলল, কিন্তু সম্ভব তো হয়েছে।

—তাই তো দেখছি।

—মি. শ্রীমল, প্রদর্শনী থেকে কীভাবে একটা ছবি বাইরে যেতে পারে তার কোনও আন্দাজ আপনি দিতে পারেন? বাইরে বেরনোর রাস্তা ঠিক ক'টা?

—দুটোই রাস্তা। একটা মেন গেট, যেখানে সারাক্ষণ পাহারাদার বসে থাকে, নজর রাখে প্রতিটি দর্শকের দিকে। অন্যটা পিছনদিকে। সেই গেটের দু'দিকে দুটো লোহার ভারী দরজা। কোনও ম্যাটাডোর বা বড় গাড়িতে ছবি এলে তখনই দরজাটা খোলা হয়।

—সাধারণ সময়ে গেটে তালাবন্ধ থাকে?

—হ্যাঁ।

—তার চাবি কার কাছে থাকে?

—একই ব্যবস্থা। একটা পাহারাদার অচিন দাসের কাছে, অন্যটা আমার কাছে।

—কখনও কি এমন হয় আপনার চাবি কাউকে দিলেন দরজা খোলার জন্য?

তীর্থপতি শ্রীমল কিছুক্ষণ ভাবলেন, হ্যাঁ। আমার দুই লেফটেন্যান্ট, মনোজ শর্মা আর রোহিতাক্ষ আচার্য—তাদের কাছে কখনও দিতে হয় মাল আনলোড করার সময়।

—গত পরশু যখন নতুন ছবি এসেছিল, তখন কাকে চাবি দিয়েছিলেন?

তীর্থপতি শ্রীমল মনে করলেন সময়টা, বললেন, মনে পড়েছে। রোহিতকে।

—রোহিতাক্ষ আচার্য?

—হ্যাঁ। নতুন ছবি এলে রোহিতের হাতেই চাবি দিই। রোহিত ছবি আনলোড করে স্টক মিলিয়ে স্টোররুমে রেখে গেট বন্ধ করে আবার চাবি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

—আপনার ঠিক মনে আছে?

—হ্যাঁ। এ বিষয়ে রোহিত একশো পারসেন্ট পাংচুয়াল।

—ছবিটা পাওয়া যাচ্ছে না যখন দেখলেন, আপনি কি পিছনের গেটে গিয়ে দেখেছেন ঠিকঠাক লাগানো আছে তালা?

—একটা নয়, তিনটে তালা আছে গেটে।

—তাহলে কী মনে হয় আপনার? সামনের গেট দিয়েই বেরিয়ে গেছে ছবিটা?

—যখন আর কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছি না, তখন সামনের গেট দিয়ে বেরিয়েছে।

—রাত আটটায় গেট বন্ধ হয়। তখন কতজন দর্শক ছিলেন বলে আপনার মনে হয়?

—কাল ওপেনিং ডে। প্রায় একশো জনের মতো দর্শক এসেছিল। যখন গেট বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হল, তখনও পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন জন দর্শক ছিলেন বলে আমার ধারণা।

—ভিড়ের মধ্যে কেউ ছবিটি দেওয়াল থেকে পেড়ে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

তীর্থপতি শ্রীমল একটু ভেবে নিয়ে বললেন, দেখুন, আপনাকে বলেছি বাইশ বছর হয়ে গেল এই মিউজিয়াম গড়েছি, কখনও এরকম ঘটনা ঘটেনি।

—মিস্টার শ্রীমল, এত বড় একটা প্রদর্শনী, নিশ্চয় সিসিটিভি-র ব্যবস্থা আছে। ক'টা সিসিটিভি বসানো আছে গ্যালারিতে?

তীর্থপতি শ্রীমল চুপ করে রইলেন, একটু পরে বললেন, ম্যাডাম, ব্যবস্থার কোনও ত্রুটি নেই। 'গ্যালারি-এ'-তে

আগুন থামান
জীবন ও
সম্পত্তি বাঁচান

ঢোকার মুখে একটি বসানো আছে যা থেকে কে কখন ভিতরে ঢুকছে, কে বাইরে বেরচ্ছে সব রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে।

—আর?

—'গ্যালারি-এ'র ভিতরে দু-দুটো ক্যামেরা বসানো আছে। তাতে গোটা ঘর দেখা যায়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কাল গ্যালারির ভিতরের দুটো ক্যামেরা কাজ করেনি।

—সে কী!

—ম্যাডাম, কী বলব! যখন বিষয়টা আমার কানে এল, তখন এগজিবিশন শুরু হয়ে গেছে। মেকানিক ডেকে মেরামত করে নেব তার সময় ছিল না। রোহিতকে দায়িত্ব দেওয়া আছে সিসিটিভি ঠিক রাখার জন্য। তাকে বলেছি এগজিবিশনের পরে তোমার চাকরি না-ও থাকতে পারে। তবু তখন একবারও ভাবিনি ছবি চুরি হতে পারে! এত বড় আকারের একটা ছবি কেউ সবার অলক্ষ্যে নিয়ে যাবে তা ভাবা যায়!

—তা ভাবা যায় না।

—ম্যাডাম, আপনাকে গেটের বাইরের ক্যামেরার ছবি দেখাই।

মি. শ্রীমলের টেবিলের পাশেই কোথাও সুইচ টিপতে টেবিলের স্ক্রিনে ভেসে উঠল ছবি। বার দুই দেখার পরেও সন্দেহজনক কিছু দেখা গেল না স্ক্রিনে।

—মি. শ্রীমল, অনেক সিনেমায়ও তো এর চেয়ে বড় চুরির ঘটনা দেখেছি আমরা। ধুম-টু নামে একটা ছবিতে কাচঘেরা একটা জায়গা থেকে কী অসাধারণ কৌশলে চোর হীরে চুরি করেছিল, আপনি হয়তো দেখেননি ছবিটা?

—না, দেখিনি, ম্যাডাম। আঁকা-ছবির মধ্যে কেটে গেল একটা জীবন, সেলুলয়েডের ছবি দেখার সময় কোথায়?

গার্গী সামান্য হাসল, তা ঠিক, কিন্তু আমি মাঝেমধ্যে দেখে ফেলি দু-একটা। অনেক সময় কাজে লেগে যায় সেই অভিজ্ঞতা।

—সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা লেগে যায় গোয়েন্দাগিরিতে!

—না, মানে গোয়েন্দাগিরির কাজে লাগবে বলে সিনেমায় যাই তা নয়। এন্টারটেইনমেন্টের জন্যই যাই। আপনার এখানে এসে হঠাৎ মনে পড়ে গেল ওই সিনেমাটার কথা। সে যাইহোক, আমি আগে মিউজিয়ামের অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টারটা একবার দেখতে পারি?

—নিশ্চয়ই পারেন।

বলে তাঁর টেবিলের ড্রয়ার খুলে বার করে দিলেন রেজিস্টারটি।

গার্গী রেজিস্টারের পাতা উল্টে কিছু দেখল, ডায়েরিতে কিছু নোট করল, ডায়েরি বন্ধ করে তাকায় তীর্থপতি শ্রীমলের দিকে, প্রত্যেকের নামের পাশে তার বাড়ির কনট্যাক্ট নম্বরও লেখা থাকে?

—লিখে রাখি যাতে কেউ মিউজিয়ামে কাজে না-এলে বা আসতে দেরি করলে প্রথমে তাঁর মোবাইলে ফোন করি, সেখানে উত্তর না-পেলে তার বাড়িতে ফোন করে দেখে নিই সে আসছে কি না!

—আমি কি আপনার দুই সহকারী কিউরেটর, সিকিউরিটি গার্ড অচিন দাস আর বিধু মালাকারকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি?

—অবশ্যই। আমি এখনও থানায় কোনও রিপোর্ট করিনি। রূপবান বলছিল আপনার এ-বিষয়ে প্রবল খ্যাতি। আপনার ওপর ভরসা করে আছি। আমি কিছুক্ষণের জন্য এগজিবিশন হলে যাচ্ছি, আপনি ওদের সঙ্গে কথা বলুন। আমি এক-এক করে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তীর্থপতি শ্রীমল উঠে বাইরে চলে যাওয়ার একটু পরেই ঘরে এল রোহিতাক্ষ আচার্য। আটত্রিশ চল্লিশের মধ্যে বয়স, একমুখ ঘন কালো দাড়িগোঁফ, গতকাল তার পরনে ছিল মোরগফুল রঙের পাঞ্জাবির সঙ্গে সাদা পাজামা, আজ অফ হোয়াইট প্যান্টের উপর ঘন নীল শার্ট। শিল্পীরা একটু আলাভোলা ধরনের হয়ে থাকে বলে সবার ধারণা, সে তুলনায় রোহিতাক্ষ বেশ স্মার্ট। গার্গীর থেকে একটু দূরত্ব রেখে একটা চেয়ারে বসে হাসি-হাসিমুখে বলল, বলুন, ম্যাডাম।

গার্গী সরাসরি প্রশ্নে ঢুকে যায়, রোহিতাক্ষ, আপনি গত পরশু ছবিগুলো গাড়ি থেকে আনলোড করেছিলেন, তারপর ছবিগুলো সরাসরি গ্যালারিতে টাঙানো হয়েছিল?

—না ম্যাম, প্রথমে ছবিগুলো আমাদের স্টোররুমে রাখা হয়েছিল, সেগুলো স্টক রেজিস্টারে তুলে মিউজিয়ামের লোগো লাগিয়ে পরশু বিকেল থেকে শুরু করে কাল সারা দুপুর ধরে ছবিগুলো টাঙিয়েছি।

—স্টক রেজিস্টারে কি আপনিই তোলেন?

—না আমার দায়িত্ব রিসিভ করা, স্টকে তোলে মনোজ, এগজিবিশন হওয়ার পর আনসোল্ড ছবি স্টক রেজিস্টার থেকে মাইনাস করে আবার ফেরত পাঠানো আমার দায়িত্ব।

—কাল যখন প্রদর্শনী শেষ হয়, আপনি কোথায় ছিলেন?

ম্যাম, আটটা বাজার পর সবার সঙ্গে আমিও বেরিয়ে এসেছিলাম গ্যালারির গেটের বাইরে— লনে। সেখানে বেশ আড্ডা হচ্ছিল।

—ভিতরে কেউ কি থেকে গিয়েছিলেন?

—ম্যাম, আমি অত খেয়াল করিনি। বহু বছর ধরে এগজিবিশন করছি, কখনও এরকম সমস্যার মুখোমুখি হইনি।

—কিন্তু সিসিটিভি যে খারাপ হয়ে আছে তা আপনি নিশ্চয়ই জানতেন?

রোহিতাক্ষ মাথা নিচু করে বলল, ম্যাম, কাল সকালেও দেখেছি ক্যামেরা চলছিল, কখন যে বন্ধ হয়ে গেছে আমি খেয়াল করিনি।

—দেখা উচিত ছিল আপনার। মিস্টার শ্রীমল এখনও পুলিসে খবর দেননি। তারা কিন্তু প্রথমেই আপনাকে সন্দেহ করবে।

—ম্যাম, শুনেছি আপনি বড় ডিটেকটিভ। আপনি নিশ্চয়ই খুঁজে বার করতে পারবেন কে এই অপরাধ করেছে।

—ঠিক আছে, আপনি এবার মনোজ শর্মাকে আসতে বলুন।

মনোজ শর্মা রোহিতাক্ষের মতো অনতিচল্লিশ যুবক, ব্ল্যাক ট্রাউজার্সের উপর অফ হোয়াইট শার্ট। ফর্সা গায়ের রং। রোহিতাক্ষের মতো অতটা স্মার্ট নয়, কাল যে-পোশাক পরেছিল, আজও সেই একই পোশাক। তাতে পোশাকটা ম্যাড়মেড়ে লাগছে।

—মি. শর্মা, আপনি কাল একটু আগে বেরিয়ে গিয়েছিলেন এগজিবিশন থেকে।

—হ্যাঁ, ম্যাম, আমার দেশের বাড়ি থেকে খবর এসেছে আমার বাবা অসুস্থ। তাকে দেখতে যেতে হবে। তাই কিছু শপিং করার প্রয়োজন ছিল।

—ও, তাই নাকি! খুব অ্যাংজাইটিতে আছেন তা হলে!

—খুবই। মাই ফাদার ইজ নাউ এইট্টি ফাইভ।

—ওহো। আপনি একা যাবেন?

—না ম্যাম, আমার ওয়াইফ আর ছেলেও যাবে। বাবা দেখতে চাইছেন।

—ওহ। কোথায় আপনার বাড়ি?

—পাঞ্জাবে, ম্যাম।

—কবে যাচ্ছেন?

—আমার কাছে খবর এসেছে পাঁচ দিন আগে। কিন্তু এখন এগজিবিশন চলছে, চোদ্দো তারিখে এগজিবিশন শেষ, আমি পনেরো তারিখে রাতের ট্রেনে যাব।

বলে পকেট থেকে ট্রেনের টিকিট বার করে দেখাল গার্গীকে।

গার্গী একঝলক টিকিটটা দেখে বলল, হ্যাঁ, দায়িত্ববান চাকুরে মানুষদের এই এক শৃঙ্খল। আপনার উপর বিশাল দায়িত্ব। এত ছবির হিসেব রাখা।

—যা বলেছেন, ম্যাম। গত ডিসেম্বরে আমরা কুমায়ুন যাব বলে সব ঠিকঠাক, টিকিটও কাটা ছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা জরুরি এগজিবিশন পড়ায় সব টিকিট ক্যানসেল করতে হল।

—ইস। তাহলে তো গৃহবিবাদ হয়েছিল নিশ্চয়ই।

মনোজ শর্মা কাঁচুমাচু মুখে হাসল একটু।

—ঠিক আছে, মি. শর্মা। শুনলাম আপনি আজও একটু আগে বেরিয়ে যাবেন!

—হ্যাঁ, ম্যাম, প্রায় দেড় বছর পরে বাড়ি ফিরছি। অনেক কেনাকাটা করতে হচ্ছে।

—ঠিক আছে, বিধু মালাকারকে একটু পাঠিয়ে দেবেন।

বিধু মালাকার সম্পর্কে গার্গী আগেই শুনেছে, কাল দেখেছিল সত্যিই ছুটে কাজ করে, এখন দেখল ছোটখাট চেহারার ছেলেটির মুখ শুকিয়ে একশা। চেয়ারে বসতে চাইছিল না, বলল, বলুন, ম্যাডাম।

—কাল প্রদর্শনী বন্ধ হওয়ার সময় তুমি কোথায় ছিলে?

—গ্যালারিতেই ছিলাম, ম্যাডাম।

—তুমি কি মনে করতে পারো, শেষ দর্শকও যখন গ্যালারি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, তখন ছবিটি দেওয়ালে টাঙানো ছিল কি না!

বিধু মালাকার চুপ করে রইল, একটু পরে শুকনো গলায় বলল, আমি তখন ছিলাম না ম্যাডাম।

—কোথায় ছিলে?

—স্যার তখন একজন গেস্টের সঙ্গে গল্প করতে করতে বাইরের দিকে যাচ্ছেন, আমি তাঁর পাশে পাশে হাঁটছিলাম। যদি স্যারের হঠাৎ কিছু দরকার হয়। সবসময় তাঁর কাছেই থাকতে হয় আমাকে।

—হুঁ। তাহলে তুমি বলতে পারবে না প্রদর্শনীর শেষে ছবিটা দেওয়ালে ছিল কি না।

বিধুর গলা শুকিয়ে গেছে, কোনওক্রমে বলল, না, ম্যাডাম।

—কে বলতে পারবে বলতে পারো?

বিধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। কোনও কথা বলতে পারে না।

—রোহিতাক্ষ, মনোজ, আর তুমি ছাড়া আর কোনও স্থায়ী কর্মী আছে এখানে?

—হ্যাঁ, ম্যাডাম, সিকিউরিটি গার্ড অচিন দাস। তারই তো

সব দর্শককে চেকিং করার কথা।

—তুমি কি বলতে পারো, দর্শকরা যখন বেরচ্ছিল, অচিন দাস মেন গেটে ছিল কি না।

বিধু মালাকার চুপ করে থাকে, একটু ভেবে বলল, বলতে পারব না ম্যাডাম। স্যার আমাকে অফিসঘরে পাঠালেন ওঁর চশমাটা পড়ে আছে বলে। আমি কিছু সময় ছিলাম না লনে।

—তুমি যাওয়ার আগে অচিন দাস গেটে ছিল।

বিধু মালাকার চুপ করে থাকে, কিছু সময় পরে বলল, ম্যাডাম, খেয়াল নেই।

—ঠিক আছে, তুমি এখন যাও অচিন দাসকে পাঠিয়ে দাও।

অচিন দাস আসতে দেরি করছিল, সোনালিচাঁপার দিকে তাকিয়ে গার্গী বলল, কী রে, কিছু বুঝতে পারছিস?

সোনালিচাঁপা ঘাড় নাড়ে, শেষদিকটা বেশ ভিড় ছিল, সবাই একসঙ্গে বেরচ্ছিল, ভিড়ের মধ্যে তিন-চারজন একসঙ্গে যদি একটা সার্কেল করে তার মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে যায়, গেটম্যানের পক্ষেও ধরা মুশকিল।

গার্গী বলল, এখন ঘোর গ্রীষ্মকাল, কেউ যে কোট পরে আসবে, কিংবা গায়ে চাদর দিয়ে আসবে, সেই সম্ভাবনাও নেই।

সোনালিচাঁপা জিভে চুকচুক শব্দ করে বলল, কী যে হয়ে গেল! রূপ এই প্রথমবার ছবি দিল এখানে, আর এবারই এরকম গোলমাল। দিদি, তুমি এবার কিছু করো।

গার্গী চিন্তিত হয়ে বলল, দেখি—

একটু পরেই ঢ্যাঙা চেহারার এক প্রৌঢ় ভয়ে-ভয়ে মুখ বাড়াল ঘরে, ম্যাডাম, আসব?

—হ্যাঁ আসুন।

অচিন দাসও কিছুতেই চেয়ারে বসতে রাজি হলেন না, ভিতরে এসে দু'হাত তুলে নমস্কার করলেন।

—অচিনবাবু, আপনি এই মিউজিয়ামে কতদিন চাকরি করছেন?

—আমি সেই গোড়া থেকে আছি এখানে। যেদিন প্রথম উদ্বোধন হয়—

—কে উদ্বোধন করেছিলেন মনে আছে?

—শ্যামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। খুব বড় শিল্পী।

—তারপর তো বহু প্রদর্শনী হয়েছে এখানে?

—হ্যাঁ ম্যাডাম।

—আজ সকালে যে ঘটনাটা ঘটেছে, এরকম ঘটনা আগে নিশ্চয়ই ঘটেনি!

অচিন দাস কিছু সময় থামলেন, তারপর বললেন, ম্যাডাম, এই মিউজিয়ামে ভূত আছে।

গার্গী চমকে উঠে বলল, কী বলছেন আপনি? কোনও শব্দটব্দ শোনা যায় রাতের বেলা?

—আমি তো রাতের বেলা এখানে থাকি না। সব ক'টা গেটে তালা বন্ধ করে আমি ঘরে যাই। মোট তেরোটা তালা দিতে হয়, সবকটা গেট মিলিয়ে।

—তা তো হবেই। এত বড় মিউজিয়াম। তাতে ভূত এল কোত্থেকে।

—এর আগেও তিন-চারবার এরকম ঘটেছে।

—সে কী! মিস্টার শ্রীমল তো সেসব বললেন না আমাকে! কী ঘটেছিল?

—ম্যাডাম, সব তো বলিনি স্যারকে। আমি রোজ বারোটায় মিউজিয়ামের গেট খুলি। রোজ দুটোয় গ্যালারি খোলে, তার আগে সব ঘরে ঝাড়ু দিই। দুটো গ্যালারির ছবিগুলো ঠিকঠাক করি। কোনও কোনওটা বেঁকে থাকে, কোনওটা ঝুলে থাকে। এক-একদিন দেখি দেওয়াল খালি। পরের দিন দেখি আবার দেওয়ালে ফিরে এসেছে ছবিটা। তখন এগজিবিশন থাকে না বলে কেউ জানতে পারে না।

—সে কী! গার্গীর ভুরুতে সন্দেহের ছাপ, বলল, মি. শ্রীমল জানেন না এসব?

—স্যার তো প্রায়ই কাজে চলে যান দিল্লিতে, মুম্বাইয়ে, ভোপালে। কখনও বিদেশেও যান। দশ দিন-বারো দিন পরে ফেরেন। ছবিগুলো একবার উধাও হয়ে আবার ফিরে আসে বলে আমি আর স্যারকে জানাই না। শর্মাবাবুও আমাকে বলেছেন এই মিউজিয়ামে ভূত আছে। উনি একদিন দেখেছেন সন্ধের পর একটা ছবির মেয়েমানুষ ছবি থেকে বেরিয়ে মেঝেয় নাচছে।

—কী বলছ তুমি? তা আবার হয় নাকি? শর্মাবাবুকে আমি যখন জেরা করছিলাম, উনি তো কিছু বললেন না!

—স্যার, উনি বলেন এসব কথা কেউ বিশ্বাস করবেন না। কী দরকার সবাইকে বলে!

গার্গী কিছু সময় ভাবল বিষয়টা। সোনালিচাঁপার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে হঠাৎ বলল, সেই ছবিগুলো তুমি আমাকে দেখাতে পারো?

অচিন দাস ভাবল চোখ বুজে, তারপর বলল, একটা ছবি বিক্রি হয়ে গেছে। আরও কয়েকটা ছবি এখনও আছে।

—চলুন তো দেখি কোন ছবিগুলো?

অচিন দাসকে নিয়ে গার্গী আর সোনালিচাঁপা চলল বড় গ্যালারিটার দিকে। একটা ছবি বেশ বড় আকারের, বিখ্যাত ফরাসি চিত্রকরের আঁকা এক ফরাসি নারীর পূর্ণাবয়ব। খুবই সুন্দরী নারী। চমৎকার আঁকা। এই নারী রাতের বেলায় ছবি থেকে বেরিয়ে নাচে!

—আর কোন কোন ছবি উধাও হয়ে গিয়েছিল গ্যালারি থেকে!

অচিন দাস ঘুরে ঘুরে কয়েকটা ছবি দেখায়। গার্গী তার ডায়েরিতে নোট করল ছবির নীচে লেখা নম্বরগুলো।

গ্যালারির ছবিগুলো দেখে আবার ওরা ফিরে এল অফিসঘরে। তীর্থপতি শ্রীমলকে খবর দিতে তিনি ফিরে এসে জানতে চাইলেন, কিছু বুঝতে পারলেন, ম্যাডাম?

গার্গী মাথা নেড়ে বলল, এখনও সবটা বুঝিনি। তবে বুঝতে হবেই। কাল আর একবার আসব।

তীর্থপতি শ্রীমলকে ভারী বিষণ্ণ দেখাল, বললেন, জ্যাক ডেভিডের এই ছবিগুলো আনতে আমাকে বিস্তর পাবলিক রিলেশন করতে হয়েছে। প্যারিসের এক নামী গ্যালারিতে জ্যাক ডেভিডের প্রদর্শনী হচ্ছিল। আমি এক বিশেষ সোর্স ধরে যোগাযোগ করি উদ্যোক্তাদের সঙ্গে। শর্ত হয় কলকাতায় পনেরো দিন ছবিগুলো দেখিয়ে পরের দিনই এয়ারে পাঠিয়ে দিতে হবে সব ছবি। এখন তো মনে হচ্ছে আমি ইলেকট্রিকের তারে হাত দিয়ে ফেলেছি। আসলে কী জানেন, ভুল করেছি ছবিগুলো সম্পর্কে বেশি করে পাবলিসিটি করেছি। তাতেই কেউ প্রলুব্ধ হয়ে চুরি করার লোভ সামলাতে পারেনি।

গার্গী তাঁর কথায় সায় দিয়ে বলল, ঠিক আছে, মি. শ্রীমল, খুঁজে বার করতেই হবে অপরাধীকে। যখন একবার সমস্যার ভিতরে ঢুকেছি, কিছু একটা সূত্র খুঁজে বার করব।

মিউজিয়ামের বাইরে বেরিয়ে সোনালিচাঁপা জিজ্ঞাসা করল, দিদি খুব জটিল বিষয়। ভিড়ের মধ্যে কে ছবি খুলে

OVER 25 YEARS OF TRUST
অঙ্কুর লবণ
আসল লবণ™
Ankur SALT
अंकुर
লবণ কম খান
কিন্তু ভাল খান...
Ankur Salt Pvt. Ltd. CALL : 033 2242

নিয়ে চম্পট দিয়েছে তা এখন কী করে জানা যাবে!

—হ্যাঁ গেটের বাইরে একটা সিসিটিভি আছে, কিন্তু তাতে দু'বার দেখেও তো বোঝা গেল না! আবার ভিতরের সিসিটিভি দুটোই খারাপ তা কেউ মি. শ্রীমলকে রিপোর্ট করেনি।

সোনালিচাঁপা জিভে চুকচুক শব্দ করে বলল, দিদি সিসিটিভি দেখার দায়িত্ব রোহিতাক্ষের। নিশ্চয় স্যার অ্যাকশন নেবেন ওর বিরুদ্ধে।

গার্গী বলল, নেওয়াই উচিত। এত বড় একটা এগজিবিশন হচ্ছে, অন্তত কয়েক কোটি টাকার ছবি আছে এখানে। তার আগে সব দিক দেখে নেওয়া উচিত ছিল।

॥ তিন ॥

গার্গী ফ্ল্যাটে ফিরল রাত্রি আটটা নাগাদ। লুনা পড়ছিল তার ঘরে বসে, বেল শুনে দরজা খুলে দিয়ে বলল, ছবি পাওয়া গেল, মা?

গার্গী ভিতরে ঢুকে বলল, তোর মা কি ম্যাজিক জানে যে, মিউজিয়ামে গেল আর খুঁজে পেল ছবিটা!

—ম্যাজিক না জানলেও লোকের ধারণা হয়ে গেছে গার্গী চৌধুরি বিষয়টার মধ্যে ঢুকেছেন মানে কেস অটোমেটিক্যালি সলভড।

গার্গী হেসে বলল, তাতেই তো আরও চাপ পড়ছে আমার উপর। আজকাল ছোটখাট দোকানেও সিসিটিভি বসায় যাতে কেউ পাঁচ টাকার মালও চক্ষুদান না করতে পারে! আর এতবড় একটা এগজিবিশনে নো সিসিটিভি!

লুনা হঠাৎ বলল, কেউ ইচ্ছে করে সিসিটিভি খারাপ করে দেয়নি তো!

—নট আনলাইকলি। হয়তো চিত্রচোর মিউজিয়ামের কোনও কর্মীর সঙ্গে যোগসাজস করে ছবিটা সরিয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে রোহিতাক্ষ আচার্যের উপর সন্দেহের তির ছুটবে।

লুনা ঠোঁটে বিচিত্র ভঙ্গি করে বলল, তাই নাকি!

—হ্যাঁ, সিসিটিভি চালু রাখার দায়িত্ব তার উপর।

সায়ন এতক্ষণ কী একটা কাগজ খুলে পড়ছিল মনোযোগ দিয়ে, গার্গীর শেষ কথা শুনে বলল, তাই নাকি! রোহিতাক্ষকে দেখে তো খুব স্মার্ট মনে হচ্ছিল!

—আমারও তাই মনে হচ্ছিল, কিন্তু এখন তো ছবি চুরির দায় সে এড়াতে পারছে না।

লুনা মুখ অন্ধকার করে বলল, কী হবে, মা। উনি আবার রূপদার খুব ফেবারিট।

গার্গী ততক্ষণে ওয়াশরুমে ঢুকে গেছে সারাদিনের ঝড় ধুয়েমুছে সাফা করতে।

লুনা সায়নকে বলল, বুঝলে বাবা, কখনও খুব স্মার্ট লোকেরাও কেমন আনস্মার্ট হয়ে যায় বড় কাজের দায়িত্ব পেলে।

সায়ন মৃদু মৃদু হাসছিল লুনার বিজ্ঞ-বিজ্ঞ কথা শুনে, বলল, কথাটা মন্দ বলিসনি!

লুনা ভুরু কুঁচকে বলল, কথাটা 'ভালোই বলেছিস' না বলে 'কথাটা মন্দ বলিসনি' কেন! আমার বয়স কম বলে আমাকে আন্ডার এস্টিমেট করলে?

সায়ন হাতের কাগজ রেখে তখনই সোজা হয়ে বসে বলল, ঠিকই বলেছিস। আমার কথাটা নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ হয়ে গেছে। বিষয়টা তুই বেশ ধরেছিস। এত বড় একটা এগজিবিশন, সেখানে সিসিটিভি খারাপ মানে বেশ বড় ধরনের গাফিলতি। একটা প্রাইভেট অর্গানাইজেশনের সঙ্গে সঙ্গে ওই কর্মীকে ফায়ার করাই নিয়ম।

গার্গী তখন বেরিয়ে এসেছে সাবানের টাটকা জুঁইফুলের গন্ধ ছড়িয়ে। সায়ন এই সাবানটা লক্ষ করেছে মাস তিনেক হল। কিছু সময় গন্ধটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে বলল, এখন রোহিতাক্ষ আচার্যকে ফায়ার করা হবে কি হবে না তা নির্ভর করছে তোর মায়ের উপর।

লুনা তার মধ্যেই গার্গীর জন্য এক কাপ চা করে নিয়ে এসেছে। বলল, রূপদার ছবি এগজিবিশনে ঢুকেছে রোহিতাক্ষদার সুপারিশে। নইলে শ্রীমল স্যার তো রূপদাকে চিনতেনই না।

গার্গী তখন চায়ের কাপে গলা ভেজাতে ভেজাতে ভাবছিল সারাদিনের অভিজ্ঞতার কথা। মাত্র ক'দিন আগে বেঙ্গল আর্ট মিউজিয়ামের নামও জানত না, তাদের কর্মকাণ্ড বিষয়ে তো নয়ই। হঠাৎ তাদের পুরো পরিবার এক ঘোরতর সমস্যার মধ্যে ঢুকে পড়েছে এক অভাবনীয় পরিস্থিতিতে।

একটু পরেই ফোন এল গার্গীর মোবাইলে, সোনালিচাঁপা বেশ চিন্তিত গলায় বলল, দিদি, রূপ খুব ভেঙে পড়েছে। বলল, যাও বা একটা ব্রেক পেলাম তাও এমন সমস্যার মধ্যে পড়লাম!

গার্গী সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে, এত সহজে ভেঙে পড়লে চলে! জীবনের পথ কখনও সরলরেখায় চলে না, মাঝেমধ্যে বাঁক নেয়, তখন একটু সাবধানে চলতে হয়।

—কী মনে হচ্ছে দিদি, ছবি পাওয়া যাবে?

গার্গী অনেক ভেবে বলল, মনে হচ্ছে পাওয়া যাবে।

সোনালিচাঁপার কণ্ঠে উল্লাস, তুমি বলেছ মানেই পাওয়া যাবে। দাঁড়াও, ওকে বলি।

সোনালিচাঁপা ফোন রাখতেই আরও একটু চাপে পড়ে গেল গার্গী। সায়নকে বলল, মিউজিয়ামের সিকিউরিটি গার্ড একটা অদ্ভুত গল্প শোনাল, মিউজিয়ামে নাকি ভূত আছে।

লুনা চোখ বড় বড় করে তাকায়।

সায়নও আগ্রহী হতেই অচিন দাসের গল্পটা ছোট্ট করে বলল।

—মিউজিয়ামের বাড়িটা কি খুব পুরনো?

—হ্যাঁ। পুরনো। কোনও এককালে নাকি এক বিত্তবানের বাড়ি ছিল, তার একটা অংশ ধসে যাওয়ার পর পরিত্যক্ত ছিল বহুদিন। তীর্থপতি শ্রীমল সেই ধ্বংসাবশেষ কিনে রেনোভেট করে তৈরি করেছেন এই মিউজিয়াম।

—তাহলে তো ভূতের গল্পটা যথোচিত।

—হ্যাঁ। গল্পটা অবশ্য সিকিউরিটি গার্ড অচিন দাস ছাড়া আর কারও মুখে শুনিনি।

—অচিন দাসের কাছে গেটের চাবি থাকে। একমাত্র তার পক্ষেই ছবি সরানো সম্ভব।

গার্গী একটু ভেবে বলল, মন্দ বলনি তুমি।

সায়ন হেসে বলল, মন্দ কথাটা ব্যবহার করার জন্য একটু আগে লুনা আমাকে যা বলেছিল, এখন তোমার কথা শুনে আমিও তাই বলছি। তুমি কি আজকাল নেগেটিভ অ্যাঙ্গেল থেকে কথা বলছ? 'ভালো বলেছ' না বলে বলছ 'মন্দ বলনি'!

গার্গী এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, ঠিকই তো বললে। কেন এরকম বলছি। এই সমস্যাটা বেশ ঝামেলায় ফেলেছে বলে আমি নেগেটিভ কথা বলছি!

সায়ন তাকে উদ্বুদ্ধ করতে বলল, তোমাকে ঝামেলায়

ফেলবে এমন সমস্যা আছে নাকি! দেখো কাল নিশ্চয় কিছু একটা সমাধান মাথায় খেলে যাবে।

—হুঁ। ভূতের গল্পটা নিয়ে একটু ভাবতে হবে। মনোজ শর্মা অচিন দাসকে এই গল্পটা বলেছিল কি না তা আজ যাচাই করতে হবে।

সেদিন রাতে গার্গীর ঘুমে কিছু ঝঞ্ঝাট হল। খুব দ্রুত ক্যামেরা চালিয়ে মেন গেটে লাগানো সিসিটিভি দেখে বুঝে উঠতে পারেনি গেট দিয়ে কোনও ছবি পাচার হয়েছে কি না, অথচ দেওয়ালে ছবিটা নেই।

পরদিন অফিসে গিয়ে দ্রুত কাজ করার ফুরসতে ভাবার চেষ্টা করছিল বিষয়টা। এক, ছবিটা সামনের গেট দিয়ে পাচার না হলে পিছনের গেট দিয়েও তো হতে পারে। সেক্ষেত্রে একমাত্র সিকিউরিটি গার্ড অচিন দাসকে সন্দেহ করতে হয়। চাবি তো তার কাছেই থাকে। দুই, এর আগেও কয়েকবার এরকম উধাও হয়েছে ছবি, পরে আবার ফিরে এসেছে। যদি কেউ চুরি করতেই চায়, তাহলে ফিরে আসবে কেন! তিন, তাহলে কি ভূতের থিয়োরিটাই সত্যি হতে চলেছে! চার, ভিতরের সিসিটিভি দুটো খারাপ তা তীর্থপতি শ্রীমলকে জানানো হয়নি। কেউ কি ইচ্ছে করে সিসিটিভি খারাপ করে দিয়েছে ছবিটা চুরি করবে বলে!

এত সব প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, আর ভুরুতে কোঁচ বাড়ছে গার্গীর। বেলা দুটো বাজতেই অফিসের কাজ মিটিয়ে গোলপার্কের উদ্দেশে রওনা হবে, সেই মুহূর্তে সোনালিচাঁপার ফোন, দিদি, গুড নিউজ। তুমি যা বলেছিলে তাই হয়েছে।

গার্গী নিশ্চিত হল না সোনালিচাঁপা কী বলতে চাইছে! বলল, কী হয়েছে তা বলবি তো!

—ছবি আবার যথাস্থানে ফিরে এসেছে।

—তাই নাকি! স্ট্রেঞ্জ!

—তুমি স্ট্রেঞ্জ বলছ কেন? তুমিই তো বলেছিলে ছবি ফিরে পাওয়া যাবে।

—তা বলেছিলাম। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।

সায়নকে ফোন করে বিষয়টা জানিয়ে গার্গী বেরিয়ে পড়ল বিষয়টার রহস্য উদ্ঘাটনে। মিউজিয়ামে পৌঁছে দেখল আজ প্রচুর দর্শকের সমাগম। প্রদর্শনী থেকে কাল একটি বিখ্যাত ছবি উধাও হয়ে গেছে এ-খবর পৌঁছে গেছে গোটা চিত্ররসিক মহলে। তাতে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে সবার মধ্যে। রসিকরা দেখতে এসেছেন কীভাবে ঘটল ঘটনাটা, কেনই বা! কে চুরি করতে পারে এত দামি একটা ছবি।

রূপবান আর সোনালিচাঁপা অপেক্ষা করছিল বাইরে, ভিড় ভেদ করে ভিতরে ঢুকতে বেশ হিমশিম খেয়ে গেল তিনজনে।

হলের ভিতরে ঢুকতেই দেখা তীর্থপতি শ্রীমলের সঙ্গে। হেসে বললেন, আপনাকে অনেক থ্যাংকস, ম্যাডাম। আপনি ঘটনাটার ভিতরে ঢুকলেন বলেই ছবিটা ফেরত পেলাম।

গার্গী তখনও ধাঁধার মধ্যে, বলল কী করে ফেরত এল তা শুনিনি এখনও।

—আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। অচিন রোজকার মতো হলের দরজা খুলে ঝাড়পোঁছ করছে, হঠাৎ দেখে কী, ভেনাসের ছবি যেখানে ছিল সেখানেই আছে।

—কী আশ্চর্য, কী করে ফেরত এল তা বুঝতে পারছেন না!

—বুঝলেন ম্যাডাম, অচিন বলছে নির্ঘাৎ ভূতের কাণ্ড।

—আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন?

—কখনও করতাম না। কিন্তু এবার যা কাণ্ড ঘটল তাতে বিশ্বাস করতে হচ্ছে।

গার্গী হেসে বলল, যাক। আপনার মিউজিয়ামে এসে একটা নতুন অভিজ্ঞতা হল।

তীর্থপতি শ্রীমল বললেন, তবে আমারও এবার একটা অন্য অভিজ্ঞতা হল। যা টিকিট বিক্রি হতো, তার দ্বিগুণ টিকিট বিক্রি হয়েছে আজ।

—বাহ্, তাহলে তো আপনার লাভই হল।

—আসলে কী জানেন, বাঙালি হুজুগে জাতি।

এগজিবিশনে ভেনাসের নতুন ছবি এসেছে এই বিজ্ঞাপনে খুব একটা সাড়া পড়েনি। জ্যাক ডেভিডের নাম এখনও শিল্পানুরাগী মানুষদের কানে যায়নি। সুদূর পারি থেকে জ্যাক ডেভিডের পঁচিশটা ছবি এসেছে তা আলোড়ন না-তুললেও তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ছবিটা উধাও হয়ে গেছে এ খবর কলকাতায় ছড়িয়ে পড়তেই দল বেঁধে দেখতে এসেছে। তাদের মধ্যে সবাই যে শিল্পানুরাগী তা নয়, হুজুগে এসেছে সবাই। এখন চলুন, আপনাদের চা খাওয়াই—

গার্গীও একটু বসতে চাইছিল, এমন সময় খবর এল বিখ্যাত শিল্প-বিশেষজ্ঞ অনুপ ভট্টাচার্য এসেছেন ছবি দেখতে।

তীর্থপতি শ্রীমল ব্যস্ত হয়ে বললেন, ম্যাডাম, আপনি এখানে বসতে পারেন। আমি অনুপ ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলে আসি। উনি কখনও আমাদের এগজিবিশন দেখতে আসেননি। কাল কলকাতায় খুব হইচই হয়েছে শুনে বোধহয় চলে এসেছেন।

তীর্থপতি শ্রীমল উঠে হনহন করে চলে গেলেন হলের দিকে। গার্গী বলল, সোনালিচাঁপা, চল, এখানে বসে আর কী হবে।

সোনালিচাঁপাকে নিয়ে গার্গীও হাজির হল হলের মধ্যে। হলে তখন বেজায় ভিড়। ভেনাসের ছবি দেখতেই ভিড় বেশি। গার্গী বলল, দ্যাখ অবস্থা। উদ্বোধনের দিন যা ভিড় হয়েছে, আজ তার একটা ছবি হারিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসায় তার মূল্য অনেক বেশি।

ভিড় দু'পাশে সরিয়ে তীর্থপতি শ্রীমল তখন জায়গা করে দিচ্ছেন অনুপ ভট্টাচার্যকে ছবিগুলো দেখার জন্য। পরপর সাজানো ছবিগুলো দেখতে দেখতে তারিফ করছেন আর বলছেন, এগুলো আমি প্যারিসে গিয়ে দেখে এসেছিলাম। আবার এতদিন পরে কলকাতায় নিয়ে আসতে পেরেছ শুনে ভাবলাম, যাই দেখে আসি। এ সব ছবির তো তুলনা নেই। জগদ্বিখ্যাত।

'দি ভেনাস' ছবিটার কাছে এসে অনেকক্ষণ দেখলেন খুঁটিয়ে, হঠাৎ কী দেখে বললেন, তীর্থপতি, এই ছবিটা বোধহয় অরিজিনাল নয়।

তীর্থপতি শ্রীমল চমকে উঠে বললেন, অরিজিনাল নয়! কী বলছেন আপনি?

—হ্যাঁ, আমি প্যারিসে এই ছবিটা দেখেছিলাম ওখানকার এক গ্যালারিতে। বতিচেল্লির ছবিটা দেখে এঁকেছে জ্যাক ডেভিড। একেবারে ইন টো টো। বতিচেল্লির ছবি এত খুঁটিয়ে দেখেছি যে, প্রতিটা রেখা আমার মুখস্থ। জ্যাক ডেভিড শুধু রংটা বদলেছে। নীলের বদলে লাল। লাল রঙেও যে এই ছবি আঁকা যায় তা জ্যাক ডেভিডের ছবি না দেখলে আন্দাজ করতেই পারতাম না। তুমি এর পায়ের রেখাগুলো দ্যাখো। এই টান বতিচেল্লির বা জ্যাক ডেভিডের অরিজিনাল ছবিতে ছিল না! এই নকল ছবি তোমরা কার্তিক আইচকে দিয়ে উদ্বোধন করিয়েছ?

তীর্থপতি শ্রীমল ঝুঁকে পড়ে দেখলেন ছবিটা, তারপর কী মনে হতে ছবিটা উল্টে দেখে বললেন, এই দেখুন, আমাদের মিউজিয়ামের নম্বর পড়েছে রেজিস্টারে এন্ট্রির সময়।

বলেই হাঁক দিলেন, মনোজ, মনোজ—

মনোজ শর্মা ছিল আশপাশে কোথাও, মুহূর্তে হাজির হল সেখানে, বললেন, হ্যাঁ, স্যার। এই ছবিটাই তো এসেছে প্যারিস থেকে।

অনুপ ভট্টাচার্য তখনও ঘাড় নাড়ছেন, না তীর্থ, আমি জ্যাক ডেভিডের নাম শুনেই ভাবছিলাম ওরা কি এত সাড়া জাগানো ছবি ইন্ডিয়ায় ছাড়বে?

তীর্থপতি স্তম্ভিত হয়ে রইলেন ছবিটির দিকে তাকিয়ে। বললেন, অনুপদা, আমি কিন্তু এখনও বিশ্বাস করছি না ছবিটা অরিজিনাল নয়। এই দেখুন না, এরা কয়েকজন মিলে কী পরিশ্রম করে এগজিবিশনটা সাজিয়েছে, মনোজ সবকটা ছবি স্টক রেজিস্টারে তুলেছে, রোহিতাক্ষ, মনোজ আর রূপবান মিলে এ ক'দিন নাওয়াখাওয়ার সময় পায়নি।

গার্গী দেখছিল রোহিতাক্ষ আজ নতুন একসেট পাজামা-পাঞ্জাবি পরে এলেও মনোজ আজ তৃতীয় দিনেও পরে এসেছে একই পোশাক। শার্টটা আজ আরও কোঁচকানো, ট্রাউজারটাও তথৈবচ। তার মুখচোখের চেহারা কীরকম কালচে মেরে গেছে।

অনুপ ভট্টাচার্য হঠাৎ বললেন, বাজারে তোমরা কী একটা গুজব ছড়িয়েছ, কোন ভূত নাকি সরিয়ে ফেলেছিল ছবিটা! তা সেই ভূতই কি আবার নকল ছবিটা টাঙিয়ে দিয়ে গেছে দেওয়ালে?

অনুপ ভট্টাচার্য খুব বিখ্যাত শিল্পী, তাঁকে দেখতেই সাধারণত ভিড় জমে যায়, সেই অনুপ ভট্টাচার্য হঠাৎ আবিষ্কার করেছেন মিউজিয়ামে নকল ছবিকে আসল ছবি বলে চালাতে চাইছেন তীর্থপতি শ্রীমল, তাতে খুব ক্ষুব্ধ ছবি-প্রেমী দর্শকরা।

তারা টাকা দিয়ে টিকিট কেটেছে আসল ছবি দেখতে, নকল ছবি দেখতে নয়।

মুহূর্তে দর্শকরা খুব রুষ্ট হয়ে নানারকম উক্তি করতে শুরু করল যা তীর্থপতি শ্রীমলের মতো শিল্পীর পক্ষে মোটেই সম্মানের নয়।

সোনালিচাঁপা ফিসফিস করে গার্গীকে বলল, দিদি কী প্রেস্টিজের ব্যাপার। দেখুন, রূপ কীরকম মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওপাশে!

গার্গী বলল, আগে ভিড় কেটে যাক। আমি আর একবার সবাইকে জেরা করতে চাই। কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে এখানে।

—কী গোলমাল বুঝতে পেরেছ?

—কিছুটা।

ছবিটা নকল জেনে ফেলে কিছু সময় দর্শকদের মধ্যে টিপ্পনী ও কটূক্তির ঝড়, তার কিছু পরে ব্যাঙ্গোক্তি উদ্গার করে সবার প্রস্থান।

হল খালি হতে তীর্থপতি শ্রীমলকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। কীরকম শূন্য লাগছিল তাঁর চাউনি। তিলে তিলে তৈরি করা প্রতিষ্ঠানের সুনাম হঠাৎ একদিনের মধ্যে ধূলিসাৎ। কারও দিকে তাকাতে পারছিলেন না। গার্গী পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তবু যেন দেখতে পাচ্ছেন না। অথবা তাকাতে লজ্জা করছে। কেউ কেউ এও বলে গেলেন, এতদিন বোধহয় ফেক ছবি দেখিয়ে পয়সা নিয়েছেন।

গার্গী বলল, মি. শ্রীমল, চলুন আপনার ঘরে বসি।

তাঁকে নিয়ে অফিসঘরে বসে বলল, আপনার এখানে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের সঙ্গে আর একবার কথা বলি। আজ আপনার সামনে।

তীর্থপতি শ্রীমল বললেন, আপনার যা খুশি করুন। আমার আর এই প্রতিষ্ঠানের উপর কোনও টান নেই।

অফিসঘরে বসে গার্গী বলল, আগে রোহিতাক্ষ আচার্যকে

আসতে বলুন।

রোহিতাক্ষ আজও অন্যদিনের মতো ফিটফাট। তবু তাকে আজ বিমর্ষ দেখাচ্ছে অন্যদিনের চেয়ে। সে চেয়ারে বসতে গার্গী বলল, বলুন তো রোহিতাক্ষ, এত বড় একটা এগজিবিশন, আপনার উপর দায়িত্ব সিসিটিভি সচল রাখার জন্য, অথচ এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে হলের ভিতর দুটো সিসিটিভি থাকার কথা, একটিও নেই। এটা কী করে হল?

রোহিতাক্ষ মুখ নিচু করে বলল, ম্যাম, বিশ্বাস করুন, এগজিবিশন হবে বলে আমি বাইরের একটা, ভিতরের দুটো, তিনটে সিসিটিভি-ই পরীক্ষা করে দেখেছি ভালোই চলছে। কী করে এগজিবিশনের দিনেই খারাপ হল তা আমার কাছে অবিশ্বাস্য।

—সিসিটিভিটা ঠিক কখন খারাপ হল?

—রাত আটটার একটু আগে।

—তখনও তো ছবিটা দেওয়ালে টাঙানো?

—হ্যাঁ ম্যাডাম। আমার ধারণা আটটায় প্রদর্শনী শেষ হওয়ার একটু আগেও ক্যামেরা দুটো সচল ছিল। প্রদর্শনী শেষ হওয়ার আগে কোনওভাবে—

—বলছেন ক্লোজিং-এর সময় ভিড়ের মধ্যে কেউ খুলে নিয়েছে?

রোহিতাক্ষ ইতস্তত করে বলল, ম্যাম, ছবিগুলো যেভাবে আমরা টাঙিয়েছিলাম, তাতে অত দ্রুততায় ছবি খোলা খুব কঠিন।

—তার মানে বলতে চাইছেন, প্রদর্শনী শেষ হওয়ার পর ফাঁকা ঘরে কেউ এই কাজটা করেছে?

রোহিতাক্ষর মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

—আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?

রোহিতাক্ষ আরও সাদা হয়ে গেল, তার ঠোঁট কেঁপে উঠে বলল, না।

—ঠিক আছে, আপনি যান। অচিন দাসকে পাঠিয়ে দিন।

রোহিতাক্ষ চলে যাওয়ার পর তীর্থপতি শ্রীমল দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, ননসেন্স।

অচিন দাস ঢুকলেন খুবই পাংশু মুখে। বসলেন না চেয়ারে। একবার তাকিয়ে দেখলেন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছেন তাঁর চেয়ারে।

গার্গী বলল, অচিনবাবু, আপনি কাল বলেছিলেন দুই গ্যালারির কয়েকটা করে ছবি হঠাৎ-হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছিল, আবার দু'একদিন পরে যথাস্থানে ফিরে এসেছিল।

অচিন দাস শুকনো গলায় বললেন, হ্যাঁ ম্যাডাম।

—কোন হলের কোন ছবি চলে গিয়ে আবার ফিরে এসেছিল তা আমাদের দেখিয়ে দিতে পারবেন?

অচিন দাস ঢোক গিলে বলল, পারব, ম্যাডাম।

—আপনি কাল আরও একটা কথা বলেছিলেন, ছবি থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে মেঝেয় নাচ করেছিল।

অচিন দাস চুপ করে থাকেন।

—কে শুনিয়েছিল গল্পটা?

—ম্যাডাম, শর্মাবাবু।

—ঠিক আছে, আপনি এই দু'জনকে নিয়ে গ্যালারিতে যান। কোন কোন ছবি উধাও হয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসেছিল তা এদের দেখিয়ে দিন।

বলে রূপবান আর সোনালিচাঁপাকে বলল, তোমরা গিয়ে ছবির নাম আর শিল্পীর নাম লিখে নিয়ে এসো একটা ডায়েরিতে। আর মনোজ শর্মাকে পাঠিয়ে দাও এখানে।

মনোজ শর্মাকে খুবই পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল, চেয়ারে বসতে বললে বসল। গার্গী জানতে চাইল, শর্মাবাবু, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে কত রাত ঘুমোননি!

মনোজ শর্মা হাসার চেষ্টা করে বলল, ম্যাডাম, বড় এগজিবিশন হলে আমার খুব টেনশন হয়। মনে হয় সব ঠিকঠাক উতরোতে পারব তো?

—আপনার উপর বাড়ির চাপও আছে। দু'দিন ধরে আগে-আগে বেরিয়ে কেনাকাটা করতে হচ্ছে।

—হ্যাঁ, ম্যাডাম। দেড় বছর পরে বাড়ি ফিরছি। আমার বাবা খুব অসুস্থ।

—কী অসুখ আপনার বাবার?

—খুব শক্ত অসুখ। বাবা বাঁচবেন কি না সন্দেহ।

—কী অসুখ তা তো বললেন না!

মনোজ শর্মা একটু ভেবে বলল, আসলে বাড়ির লোক আমার কাছে ভাঙতে চাইছে না কী অসুখ। শুধু বলছে, ভারী অসুখ।

—কেন ভাঙতে চাইছে না?

—জানে আমি শুনলে কান্নাকাটি করব।

—আচ্ছা, শর্মাবাবু, আপনি কি জানেন হলের কোনও কোনও ছবি মাঝেমধ্যে উধাও হয়ে যায় গ্যালারি থেকে, আবার ফিরে আসে?

—না, ম্যাডাম।

—আপনি কি সিকিউরিটি গার্ড অচিন দাসকে বলেছিলেন, গ্যালারির ছবি থেকে কেউ বেরিয়ে এসে রাতের বেলা মেঝেয় নাচ করে?

মনোজ শর্মা ভীত চোখে তাকিয়ে থাকেন গার্গীর দিকে। বলল, ম্যাডাম, একদিন গ্যালারি বন্ধ হওয়ার আগে আমি ছবি গুছোচ্ছি স্টোররুমে, হঠাৎ ঘুঙুরের শব্দ শুনে স্টোররুমের বাইরে বেরোতে শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল। আর নড়ে উঠল ওই ছবিটা।

—তাতেই মনে হল মেঝেয় একটা মেয়ে নাচছে!

মনোজ শর্মা চুপ করে থাকে।

তীর্থপতি শ্রীমল হঠাৎ দু'হাত দিয়ে ঢাকা মুখ তুলে তাকালেন মনোজ শর্মার দিকে।

—শর্মাবাবু, আপনাদের প্রতিষ্ঠানে এত বড় একটা এগজিবিশন হচ্ছে, অন্য সবাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আসছেন, শুধু আপনি তিনদিনই একই পোশাকে কেন আসছেন তা বুঝতে পারছে না কেউ।

মনোজ শর্মা নিচু হয়ে নিজের পোশাকের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সচেতন হয়ে গেলেন, শার্টের ক্রিজগুলো যেন ঠিকঠাক করে নিচ্ছেন এমনভাবে বললেন, ম্যাডাম, ক'দিন পরেই লম্বা জার্নিতে বেরোব, তাই নতুন শার্ট আর ভাঙতে চাই না।

গার্গী অবাক হয়ে বলল, পনেরো দিন এগজিবিশন চলবে, এই একই পোশাক পরে থাকবেন নাকি?

—না ম্যাডাম, এই সেটটা তিনদিন পরলাম, পরের সেট তিনদিন, তার পরের সেট আরও তিনদিন— এভাবেই চলবে।

—আপনার হাতে রং লেগে, শার্টে রং লেগে। এত স্যাবি পোশাকে এগজিবিশনে আসছেন কেন!

—ম্যাডাম, ৩০ মে বিকেল থেকে ৩১ মে দুপুর পর্যন্ত এত ছবি ঘাঁটাঘাঁটি করেছি তাতেই এই অবস্থা। নতুন শিল্পীদের কয়েকটা ছবির রং এখনও কাঁচা।

—এগজিবিশন বলে কথা। আপনার উচিত ছিল আরও পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকা।

মনোজ শর্মা চুপ করে থাকেন।

—ঠিক আছে শর্মাবাবু, আপনি এখানেই বসুন। অচিন দাসের সঙ্গে রূপবান আর সোনালিচাঁপা ফিরুক। তারপর আপনাদের সবাইকে একটা গল্প শোনাব।

তীর্থপতি শ্রীমল মুখ তুলে একবার তাকালেন মনোজ শর্মার দিকে, তারপর গার্গীর দিকে। হঠাৎ বললেন, ম্যাডাম, আমার একটু বিশ্রাম চাই। পাশেই আমার একটা প্রাইভেট চেম্বার আছে, আমি কিছুক্ষণের জন্য একা থাকতে চাই।

গার্গী বলল, মিস্টার শ্রীমল, আর আধঘণ্টা বসুন। আপনার সিকিউরিটি গার্ড অচিন দাস এখনই ফিরবেন। তার সঙ্গে রূপবান আর সোনালিচাঁপা আছে। ওরা এ-ঘরে এলেই রোহিতাক্ষ আর বিধু মালাকারকে এ-ঘরে আসতে বলছি।

তার কথা শেষ হতে রূপবান আর সোনালিচাঁপার সঙ্গে ফিরে এলেন অচিন দাস।

সবাই এ-ঘরে আসতে গার্গী বলল, মিস্টার শ্রীমল, আমি এই নিয়ে পরপর তিনদিন মিউজিয়ামে এলাম। আপনি বাইশ বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যা জানেন না, আমি কিন্তু তিনদিনেই তা বুঝতে পেরেছি।

তীর্থপতি শ্রীমল চমকে উঠে বললেন, কী বুঝতে পারলেন, ম্যাডাম?

—মিস্টার শ্রীমল, বাইশ বছর আগে যে-প্রতিষ্ঠানটি নিজের হাতে গড়েছিলেন, আপনার প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে তৈরি এর সব গ্যালারি, যাবতীয় সংগ্রহ, আমি তিনদিন ঘুরেই বুঝতে পেরেছি আপনার পরিশ্রম ও ভালোবাসার চিহ্ন। সারা বছর ঘুরে ঘুরে কত ছবি আনেন, কত শিল্পানুরাগীকে আনন্দ দেন। অথচ—

তীর্থপতি শ্রীমল মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, আর বলবেন না ম্যাডাম, আমার সব শেষ হয়ে গেল।

—মি. শ্রীমল, সব শেষ হয়েও কিন্তু শেষ হয় না। তিনদিনে আপনার মিউজিয়ামের অনেক কিছু দেখলাম ও শিখলাম। এমন কিছু শিখলাম যা আপনার জানারও বাইরে।

—আমার জানার বাইরে! তীর্থপতি শ্রীমল বিস্মিত হলেন, এই মিউজিয়ামের প্রতিটি ধুলো আমার চেনা।

—কিন্তু এখন আপনাকে যে গল্প শোনাতে বসেছি তা আপনার জানা নেই। কেন নেই তা একটু পরেই বলছি। মি. শ্রীমল, মাত্র কয়েকজন কর্মী নিয়ে আপনি যে এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন, তার একটাই কারণ, এই কর্মীরা আপনাকে ভালোবাসে, এই প্রতিষ্ঠানকে খুব ভালোবাসে। আপনিও এদের প্রত্যেকের উপর খুব ভরসা করে থাকেন। কিন্তু কোনও একদিন হয়তো কোনও একজন বা দু'জন কর্মীর আচরণ বদলাতে শুরু করে, কিন্তু সেই পরিবর্তন আপনার বা অন্য কারও চোখে পড়ল না।

—সত্যিই কি কারও আচরণ বদলেছে!

—বদলেছে বলেই আজ আপনাকে সবার সামনে নির্মমভাবে অপমানিত হতে হল। হঠাৎ তাদেরই একজন এগজিবিশন শেষ হওয়ার ঠিক আগে সিসিটিভি ক্যামেরা খারাপ করে দিল।

—কী বলছেন আপনি, ম্যাডাম? তীর্থপতি শ্রীমলের গলায় অপার বিস্ময়।

—একটু আগে আমরা শুনলাম কোনও কোনও ছবি হঠাৎ উধাও হয়ে যায় গ্যালারি থেকে, আবার এক কি দু'দিন পরে ফিরে আসে গ্যালারিতে। এ-তথ্য আপনি বোধহয় জানতেন না!

—আমাকে কেউ বলেনি।

—জানত দু'জন, তাদের মধ্যে একজন আপনার সিকিউরিটি গার্ড অচিন দাস। আপনাকে সে কোনওদিন বলেনি ঘটনাটা— কেননা তার ধারণা হয়েছিল, যে পুরনো বাড়িটি আপনি কিনেছেন, সেখানে ভূত আছে।

—রাবিশ! তীর্থপতি আগুনের গোলার মতো চাউনি দিয়ে ভস্ম করতে চাইলেন অচিন দাসকে।

—তার উপর মনোজ শর্মা ভূতের গল্প শুনিয়ে অচিন দাসের মনে ভূত বিষয়ে আরও বদ্ধমূল ধারণা তৈরি করে দিয়েছেন।

তীর্থপতি শ্রীমল তখন মনোজ শর্মাকে ভস্ম করে দিতে চাইছেন।

—তবে মিউজিয়ামের এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত যদি রোহিতাক্ষ আচার্য আর একটু সতর্ক থাকতেন। সিসিটিভি চলছে কি না এটা খেয়াল করা উচিত ছিল তাঁর। কিউরেটর নিজে সিসিটিভি মনিটরিং করতেন, কিন্তু তার দেখভাল করার দায়িত্ব ছিল রোহিতাক্ষর উপর।

রোহিতাক্ষ মাথা নিচু করে বলল, আই ফিল গিল্টি, ম্যাম।

—মি. শ্রীমল, আপনি কি এখনও বুঝতে পেরেছেন কেন জ্যাক ডেভিডের আলোড়ন তোলা ছবি 'দি ভেনাস' একদিনের জন্য গ্যালারি থেকে উধাও হয়ে গেল, আবার পরে ফিরে এল? আপনি তো বিদেশ থেকে অরিজিনাল ছবি এনেছিলেন, কী করে তা একদিনের মধ্যে নকল বলে চিহ্নিত হল?

তীর্থপতি শ্রীমল বললেন, আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। মাথার ভিতরটা জাস্ট ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে।

—আপনি বিদেশ থেকে অরিজিনাল ছবি এনেছেন তা হঠাৎ রাতারাতি নকল বলে প্রমাণিত হল একটাই কারণে সেটি গ্যালারি থেকে খুলে নিয়ে এক বা দু'রাতের মধ্যে নকল করে নিয়ে আবার নকলটিই মাউন্ট করে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে গ্যালারিতে। অনুপ ভট্টাচার্যের মতো গুণী শিল্পীর চোখে ধরা না-পড়লে এখানে জানাই যেত না ওটা নকল। ধরা পড়ত বিদেশে ফেরত দেওয়ার সময়। অনুপ ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ তিনি এখানেই বিষয়টা ধরে ফেলেছেন, না হলে বিষয়টা ধরা পড়ত বিদেশে গিয়ে। তখন লজ্জার আর সীমা থাকত না।

—আপনি বলছেন আসল ছবিটা থেকে নকল করে নিয়ে নকল ছবিটা টাঙানো হয়েছে?

—ঠিক তাই ঘটেছে।

—তাহলে আসল ছবিটা গেল কোথায়? সেটা কি বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে? তীর্থপতি শ্রীমলের গলায় আর্তনাদ।

—আমার মনে হয় আসল ছবিটা মিউজিয়ামের মধ্যেই আছে।

—কোথায় সেই ছবি? তীর্থপতির গলায় বাজ ডাকছে, আপনি জানেন কোথায় আছে?

—আমি বলতে পারব না, তবে অনুমান করছি মিউজিয়ামের মধ্যেই আছে। আর কোথায় আছে তা বলতে পারবেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কিউরেটর মনোজ শর্মা।

মনোজ শর্মা চমকে উঠে বললেন, আমি? আমি কী করে জানব?

—আপনিই জানেন শর্মাবাবু। কারণ আপনি এমন

Federation of West Bengal Urban Co-operative Banks & Credit Societies Limited

119,B.B. Ganguly Street(1st Floor), Kolkata-700012

SHARODIYA GREETINGS

APPEAL TO ALL NON-AGRICULTURAL CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETIES

The Federation of West Bengal Urban Co-operative Banks and Credit Societies Limited was registered in the year 1969. It is an apex Co-operative Organisation of the Urban Co-operative Credit Sector of the State. Urban Co-operative Credit Sector covers the following types of societies:-

(a) Urban Co-operative Banks, (b) Mahila Co-operative Banks, (c) Employees Co-operative Banks, (d) Urban Co-operative Credit Societies, (e) Employees Co-operative Credit Societies and (f) Mahila Co-operative Credit Societies.

-:The Federation takes up the following activities:-

(i) To promote and develop non-agricultural credit movement in the State, to propagate and educate the principles of Co-operation, (ii) To provide a Common forum for discussing technical and practical problems of its members and to devise ways and means to solve those problems, (iii) to organise Co-operative Education and training programmes for the Members, members of the Board, Employees, (iv) To organise Conference, Conventions, Seminar etc. at State Level and District Level, (v) To assist member Banks and Credit Societies in the matters relating to management, recruitment and allied matters, (vi) To arrange publication of Books, Periodicals, Journals etc. (viii) To organise primary Co-operative Banks and Credit Societies etc.

The Urban Co-operative Credit Societies, Mahila Co-operative Credit Societies and Employees Co-operative Credit Societies which have not yet taken membership of the Federation are requested to take membership and strengthen the Co-operative Movement in the State.

Satyabrata Samanta

CHAIRMAN

একজন শিল্পী যিনি চমৎকার প্রতিলিপি করতে পারেন। আদত ছবিটি গ্যালারি থেকে নামিয়ে নকল করে আসল ছবিটা গোপনে নিয়ে গিয়ে মোটা দামে বিক্রি করেন। এর আগেও এরকম করেছেন, আর অচিন দাস সেই ঘটনা জানতে পেরেছিল বলে তাকে ভূতের গল্প শুনিয়ে বোকা বানিয়েছেন। আপনি কোনও দিন ধরা পড়েননি যেহেতু সেই ছবিগুলো ছিল মিউজিয়ামের নিজস্ব সম্পত্তি। এবার আপনি একটা বড় দাঁও মারার চেষ্টায় বিখ্যাত শিল্পীর বিখ্যাত ছবি চুরি করে এক রাতের মধ্যে নকল করে নকলটা টাঙিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

মনোজ শর্মা তখনও লড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, আপনি ঠিক বলছেন না, ম্যাডাম। আমি নিজের সমস্যা নিয়ে খুব টেনশনে আছি। রোজ পনেরো মিনিট আগে ঘরে ফিরে যাচ্ছি। অনেক কেনাকাটা করতে হচ্ছে। আর আপনি হঠাৎ আমার উপর ব্লেম দিচ্ছেন?

—শর্মাবাবু, এর আগেও এই প্রতিলিপি করার কাজ আপনি অনেক করেছেন। আপনার বেশ খ্যাতি আছে এ বিষয়ে। গ্যালারিতে যে কয়েকটি ছবি এইমাত্র রূপবান আর সোনালিচাঁপা দেখে এল, এগুলো একটাও আসল ছবি নয়, তীর্থপতি স্যার আপনাদের উপর এতটাই নির্ভর করেন যে, কবে আসল ছবি বদলে নকল হয়ে গেছে তা দেখেননি তেমন করে।

তীর্থপতি শ্রীমল চোখ বিস্ফারিত করে শুনছেন গার্গীর কথা, মাঝেমধ্যে তাকাচ্ছেন মনোজ শর্মার দিকে।

—শর্মাবাবু, আপনি এর আগে যে ছবিগুলোর প্রতিলিপি করে আসল ছবিগুলো আত্মসাৎ করেছেন, তখন প্রদর্শনীতে বাইরের ছবি ছিল না। আপনার প্রতিলিপি করার জায়গাটা স্টোররুমে, যেখানে সাধারণত আপনি ছাড়া কেউ যায় না। গ্যালারির সময় শেষ হলে, রাত আটটার পর আপনি সবার অলক্ষ্যে এক একটি ছবি পেড়েছেন গ্যালারি থেকে, প্রায় নিখুঁত প্রতিলিপি করে আসল ছবিটি বার করে নিয়ে নকল ছবি টাঙিয়ে দিয়েছেন, তা কেউ বুঝতে পারেনি এতকাল। কিন্তু এবার এই কাজটি করতে গেলেন বাইরের ছবি নিয়ে প্রদর্শনী চলাকালীন। তার একটাই কারণ আপনি জানেন জ্যাক ডেভিডের এই ছবিগুলো চলে যাবে প্রদর্শনী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। আর কাজটা করতে হবে প্রথমদিনই যাতে লোকে নকল ছবিটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে। আপনি মিস্টার শ্রীমলকে বললেন, পনেরো মিনিট আগে চলে যাবেন, এটাই আপনার প্রথম অ্যালিবাই যাতে সবাই জেনে যায় আপনি প্রদর্শনীর শেষ পর্যন্ত এ বাড়িতেই ছিলেন না। আপনি সবার অলক্ষ্যে, অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টারে সাতটা পঁয়তাল্লিশে সই করে তীর্থপতি স্যারের অনুপস্থিতিতে প্রথমে অফ করে দিলেন তাঁর অফিসঘরে রাখা সিসিটিভি ক্যামেরার সুইচ। কারণ আপনি জানেন স্যার বেরিয়ে গেলে তাঁর অফিসঘরেও তালা পড়ে যাবে। সিসিটিভি অন থাকলে আপনি ধরা পড়ে যাবেন। তারপর লুকিয়ে রইলেন স্টোররুমের ভিতর। তারপর সবাই গ্যালারি থেকে বেরিয়ে গেলে, অচিন দাস বাইরের মেন গেটে তালা দিয়ে চলে গেলে আপনি শুরু করলেন আপনার কাজ। গ্যালারি থেকে জ্যাক ডেভিডের 'দি ভেনাস' ছবিটা পেড়ে বার করে নিলেন ভিতরের ছবিটা। সারারাত ধরে তার প্রতিলিপি আঁকলেন, আপনি ভেবেছিলেন পরদিন প্রদর্শনী শুরু হওয়ার আগেই প্রতিলিপির কাজটা শেষ হয়ে যাবে, আপনি প্রতিলিপিটা মাউন্ট করে টাঙিয়ে দিতে পারবেন যথাস্থানে। সম্ভবত নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অচিন দাস মেন গেট খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ে আবিষ্কার করে ছবিটি যথাস্থানে নেই। তখন আপনিও আর ছবিটি টাঙানোর সময় পেলেন না যেহেতু প্রতিলিপির কাজ তখনও শেষ হয়নি। দ্বিতীয় দিনে প্রদর্শনী শুরু হল, আপনি সরল মুখ করে পুরো ঝামেলাটা ঘটতে দেখলেন, সেদিনও প্রদর্শনী শেষ হওয়ার পনেরো মিনিট আগে আপনি বেরিয়ে যাওয়ার ভান করলেন, কিন্তু লুকিয়ে পড়লেন স্টোররুমে। সেদিন রাতে বাকি কাজটা শেষ করে আপনি প্রতিলিপিটা দেওয়ালে টাঙিয়ে সবাইকে ধোঁকা দিতে চেয়েছিলেন। অনুপ ভট্টাচার্য না ধরতে পারলে আপনি পার পেয়ে যেতেন। কিন্তু আপনার কপাল খারাপ, তাই হঠাৎ এসে পড়েছিলেন অনুপ ভট্টাচার্য।

মনোজ শর্মা হেসে উঠে বললেন, সব আপনার মন গড়া গল্প।

গার্গী বলল, তা হলে বরং আপনাকে নিয়ে যাই স্টোররুমে। দেখে আসি কোথায় সেই আসল ছবিটা রেখেছেন? একটু খুঁজলেই পাওয়া যাবে। চলুন—

গার্গী উঠে দাঁড়ালেও মনোজ শর্মা বসেই থাকেন।

গার্গী বসে বলল, জানতাম আপনার যাওয়ার মুরোদ নেই। অচিনবাবু, আপনি সোনালিচাঁপা আর রূপবানকে সঙ্গে নিয়ে স্টোররুমে যান। একটু খোঁজাখুঁজি করলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

মিনিটি পাঁচেকের মধ্যে অচিন দাস ফিরলেন, হাতে লাল ছবিটা গুটিয়ে রাখা।

সোনালিচাঁপার মুখে যুদ্ধজয়ের হাসি, বলল, দিদি, কী করে বোঝা গেল মনোজ শর্মাই এই কাজটা করেছেন?

গার্গী বলল, দ্বিতীয় দিনেই খেয়াল করি মনোজ শর্মার পোশাকে আর আঙুলে লাল রঙের দাগ।

তখনই মনে হল 'দি ভেনাস' ছবিটা ছিল পুরোপুরি লাল রঙের। তারপর শর্মাবাবুর চোখমুখ দেখে মনে হল ঘুম হচ্ছে না। সঙ্গে উৎকণ্ঠা আছে। তাঁকে সন্দেহ করার আর একটা কারণ উনি আমাকে দেশে ফেরার টিকিট যে দেখালেন সেটা দু'মাস আগে কাটা। অথচ উনি বলছেন মাত্র কয়েকদিন আগে দেশ থেকে সংবাদটা পাওয়ার পর টিকিট কেটেছেন। মুখে বলছেন যাচ্ছেন দেশের বাড়ি, অথচ টিকিট হিমাচল প্রদেশে যাওয়ার। সবমিলিয়ে প্রচুর মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছেন গতকাল।

তীর্থপতি তাকালেন রোহিতাক্ষ আচার্যের দিকে, বললেন, থানার ওসিকে একবার ধরে দাও তো।

ওসি-র সঙ্গে কিছু কথা বলে গার্গীকে বললেন, আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব!

রোহিতাক্ষ বললেন, স্যার, শেষদিনে ওঁদের আমন্ত্রণ জানাই আমাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করতে।

—রাইট ইউ আর, তীর্থপতি শ্রীমল এখন বেশ গায়ের জোর পেয়েছেন, বললেন, এখনই কাগজে একটা খবর পাঠিয়ে দাও, 'দি ভেনাস' হারানো ছবি উদ্ধার।

অলংকরণ: সুব্রত মাজী

সমাপ্ত

• গল্প
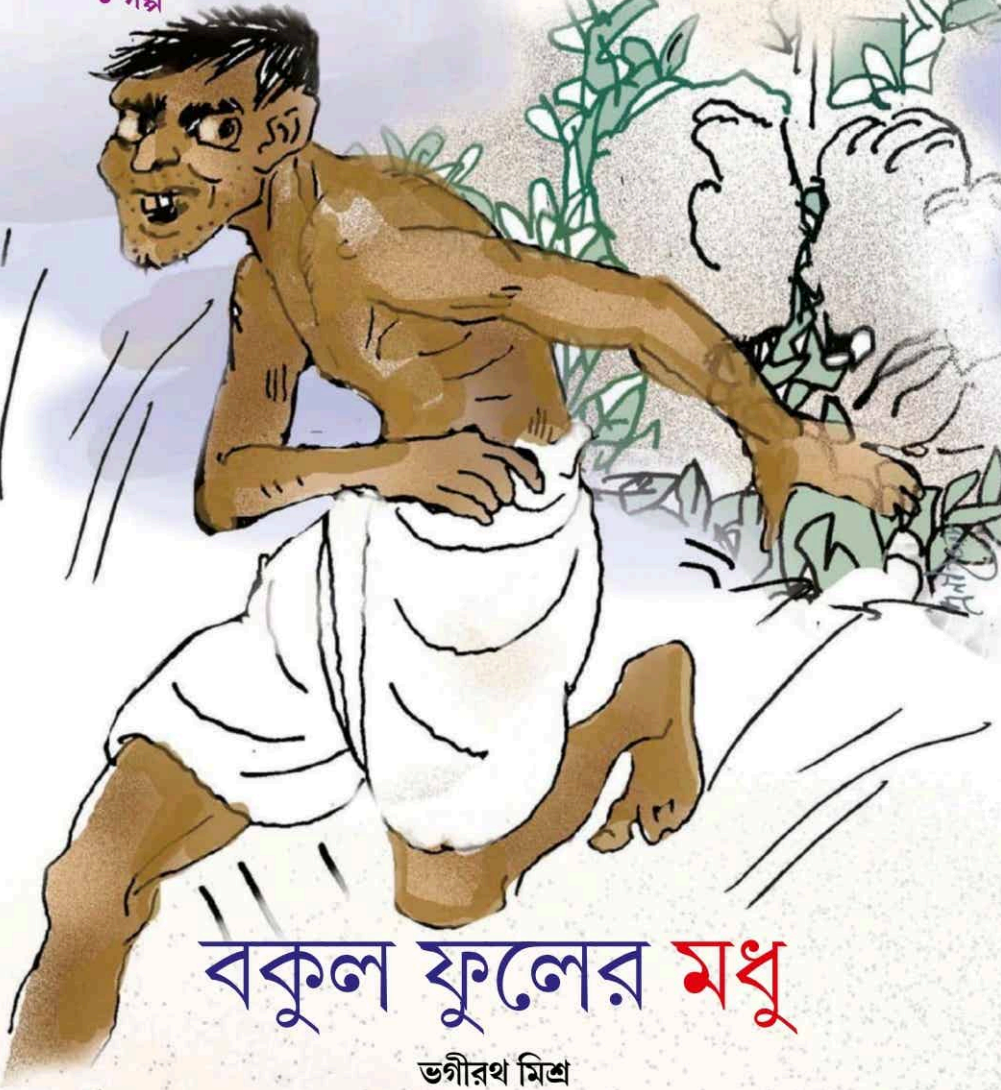
বকুল ফুলের মধু

ভগীরথ মিশ্র

॥ এক ॥

গভীর রাতে রানিদিঘির পাড়ে নিজের ঝোপড়ির সামনে বসে বসে ক্ষণ গুনছিল কুঞ্জ দাস। সুদাম ভক্তা এলেই বেরিয়ে পড়বে কাজে। রাতের কাজে সুদাম ভক্তাই কুঞ্জ'র সাগরেদ।

আচমকা পুরুতপাড়ার দিক থেকে ভেসে আসে অস্পষ্ট পায়ের আওয়াজ।

কেউ একজন এদিকেই আসছে! কুকুরের চেয়েও সজাগ কান কুঞ্জ'র। কান দিয়েই বুঝে ফেলে রাতের দুনিয়ার চোদ্দোআনা। কাজেই, সে একপ্রকার নিশ্চিত কেউ-একজন আসছে, এবং রানিদিঘি'র দিকেই!

আওয়াজটা শোনামাত্তর কুঞ্জ'র সর্ব-ইন্দ্রিয়ে সতর্কতার ঘন্টা বেজে যায়। এতক্ষণ ঝোপড়ির সামনের উঠোনে ফিনফিনে চাঁদের আলোয় বসে বসে মশা তাড়াচ্ছিল। পায়ের

শব্দটা শোনামাত্তর আতাগাছটার ঝিমকালো অন্ধকারে সরে যায়। আওয়াজটাকে সমানে অনুসরণ করে চলে ওর সতর্ক কানজোড়া।

একটুবাদেই আওয়াজটা আরো স্পষ্ট হয়। প্রতিটি পদক্ষেপে মচমচ আওয়াজ উঠছে...। শুনতে শুনতেই কুঞ্জ বারোআনা চিনে ফেলে নিশাচর মানুষটিকে। বাকিটা খোলসা হয়, যখন ছায়া-ছায়া লোকটিকে দেখতে পায় ফিনফিনে চাঁদের আলোয়। আর, তৎক্ষণাৎ তার দু'হাঁটুর গভীরে শুরু হয় একজাতের প্রদাহ। ওইসঙ্গে হাতের আঙুলগুলোতেও চিনচিনে যন্ত্রণা। দূরে অপসৃয়মান লোকটাকে দেখতে দেখতে কুঞ্জ'র প্রদাহ ও যন্ত্রণাটা শনৈ শনৈ বেড়ে যেতে থাকে।

হাঁটু'র গভীরে জমে থাকা ওই প্রদাহ এবং দু'হাতের দশ আঙুলের যন্ত্রণাগুলোকে বিলক্ষণ চেনে কুঞ্জ। অন্তত দশ বছরের পুরোনো ওগুলো। কিন্তু এখনো অবধি বিশেষ-বিশেষ মুহূর্তে চাগাড় দিয়ে ওঠে।

এই মুহূর্তে, রানিদিঘি'র দক্ষিণ পাড়ের পথ ধরে প্রমোদ মুখুজ্জ্যা চলেছে নির্দিষ্ট নিশানায়। নিশানাটিকেও বিলক্ষণ চেনে কুঞ্জ। নিশুতরাতে কায়েতপাড়ায় চলেছে প্রমোদ। বকুল-ফুলের মধু খেতেই যে চলেছে, কুঞ্জ'র কোনো সন্দেহ নেই তাতে। ইদানীং গাঁয়ের অন্য ফুলগুলোকে ছেড়ে বকুল-ফুলে যে অধিক মজেছে প্রমোদ, সেটাও অজানা নেই কুঞ্জ দাসের।

একসময় সামনের কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে পায়ের জুতো মচমচিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় প্রমোদ মুখুজ্জ্যা। ওকে দেখতে দেখতে কুঞ্জ'র হাঁটু'র প্রদাহ আর আঙুলের চিনচিনে যন্ত্রণাটা আরো বেড়ে যায়। একেবারে অস্থির করে তোলে কুঞ্জকে।

সুদামের আসতে অবশ্য দেরি আছে। আগে আসার দরকারই বা কি ওর! গরমের মরসুমে মাঝরাতের পরপরই কাজটা ভালো হয়। গেরস্থরা রাতের প্রথম আধখানা সময় গরমে আইঢাই করতে করতে জেগে থাকে। মাঝরাতের পর, গরমের দাপট কমলে-পরে, ফুরফুরে ঘুমপাড়ানি হাওয়া বইলে পরে, ওদের ঘামে আইঢাই শরীরগুলো অল্পেতেই নেতিয়ে পড়ে ঘুমে। কুঞ্জদের কাজকাম করবার মোক্ষম টাইম ওটাই। কিন্তু তাই বলে কুঞ্জও তো গরমের চোটে ঝোপড়ির ভেতর তিষ্ঠোতে পারছিল না। বাইরে এসে বসে রয়েছে অন্ধকারের মধ্যে। চোখের সুমুখে রানিদিঘির জলে মাছেরা পিঠ ওলটাচ্ছে। চোরের কান তো কুঞ্জ'র, থেকে থেকে ওই আওয়াজ নির্ভুলভাবে সেঁধিয়ে যাচ্ছে কানে।

রানিদিঘিটা এককালে রাঘব মুখুজ্জ্যাদের খাস-মালিকানায় ছিল। এলাকার রাজা ছিল ওরা। দিঘিটা ছিল মুখুজ্জ্যাদের বিশাল চৌহদ্দি'র মধ্যেই। কাকচক্ষু জল ছিল ও'তে। মুখুজ্জ্যাদের রানিরা সিনান করত ওই জলে। বাঁধানো পাকার ঘাট ছিল। ওপর থেকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গিয়েছিল জল অবধি। দু'পাশে বসবার জন্য পাকার বেঞ্চি ছিল। আজকাল ইস্টিশনগুলোতে যেমনটি থাকে, ঠিক ওইরকম। রানিরা বিকাল-প্রহরে ওই বেঞ্চিগুলোতে বসে খোশগল্প করতেন।

কুঞ্জ তখন খুবই ছোটো। তখন সবে বাপের সঙ্গে সঙ্গে থেকে হাত পাকাচ্ছে। বাপ নকুড় দাস ছিল এলাকার পাক্কা সিঁদেল চোর। রাতের সফরে বাপের সঙ্গে থাকত সে। হালকা-পলকা মালগুলো বইত, আসল উদ্দেশ্য ছিল বুকের মধ্যে সাহস পয়দা করা। রাতের কাজকামে সাহসটাই সব। দিনের বেলায় বাপ আরো একটা কাজে লাগাত কুঞ্জকে। কাজকামের সাগরেদ প্রহ্লাদ ভক্তা'র সঙ্গে জুতে দিয়েছিল ওকে। দিনভর আঘাটায়-বেঘাটায় গেরস্থদের আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে সুলুক-সন্ধান জোগাড় করত প্রহ্লাদ। মক্কেল নির্বাচন আর রাতের বেলায় নির্ভুলভাবে কাজটা নামাবার জন্য সেটা ছিল খুবই জরুরি। বাপের হুকুমে কুঞ্জও প্রহ্লাদের সাথে সাথে থাকত সারাটা সময়। চুরি করবার পাশাপাশি সুলুক-সন্ধান নেবার কাজটাও শিখত সে। সেই সুবাদে আড়াল থেকে কতবার দেখেছে, পড়ন্ত বিকেলে, গা'ভর্তি গহনায় মোড়া রাজবাড়ি'র শঙ্খশুভ্র রমণী-শরীরগুলি ঘনঘন হাসিতে ভেঙে পড়ছে! দৃশ্যটা দেখতে দেখতে ওই বয়েসেও রোমাঞ্চ জাগত কুঞ্জ'র শরীরে।

সেইসব রানিরা আজ আর নেই। অন্য অনেক জমি-জিরেত, দিঘি-পুষ্করিণী'র সঙ্গে রানিদিঘিটাও সরকারে খাস হয়ে গিয়েছিল। সাতষট্টি-ঊনসত্তর নাগাদ সহদেব মালাকার ছিল পার্টির নেতা। এই এলাকায় পার্টিটাকে গড়েওছিল সে-ই। গরিব-গুরবোদের প্রতি বড় দয়ামায়া ছিল মানুষটার। মূলত তারই উদ্যোগে রানিদিঘি'র পাড়গুলোতে হরেক পাড়া'র থেকে গরিব-গুরবোদের এনে বসেয়েছিল সে। কুঞ্জ'র বাপ নকুড়ও পেয়েছিল একটুকরো। নকুড়কে বাড়ি তৈরির জন্য সরকারি টাকাও পাইয়ে দিয়েছিল সদানন্দ। নকুড়ের অন্তে সেই ঝোপড়িতেই বসবাস কুঞ্জ'র।

জমিদারি চলে যাবার পরও বেশ কিছুদিন মুখুজ্জ্যারা ছিল গাঁয়ে। সাতষট্টি আর ঊনসত্তরে তৎকালীন পার্টির দাপাদাপির পরপরই একটু একটু করে পাততাড়ি গোটাতে শুরু করে ওরা। শহরে গিয়ে থিতু হয় সবাই। আর গাঁ'মুখো হয়নি। থেকে গিয়েছিল কেবল মুখুজ্জ্যাদের ছোট তরফ। বসন্ত মুখুজ্জ্যা। লোকটা অন্য রাজাবাবুদের মতো অতখানি চালাক-চতুর ছিল না। কাজেই, নিজের ভাগের জমি-জিরেতগুলো নিয়ে তৎকালীন পার্টির লাথিঝাঁটা খেতে খেতেও গ্রামেই থেকে গিয়েছিল সে। কিন্তু তার একার পক্ষে অতবড় বাখুলকে সহি-সলামৎ রাখাটা সম্ভব ছিল না। ফলে, একটু একটু করে ধসতে ধসতে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠছিল ওটা। সাপখোপের আস্তানা হচ্ছিল। দক্ষিণের পুরুতপাড়ায় বসন্ত মুখুজ্জ্যার একটা কাঠা-চারেকের ভিটে ছিল। একদিন ওই ভিটেতেই একটা ছোট্ট কোঠাবাড়ি বানিয়ে ওখানেই উঠে যায় ওরা। বসন্ত'র ব্যাটা প্রমোদ মুখুজ্জ্যা ততদিনে আকাট জোয়ান। বাপের মতো অত ভোঁতাবুদ্ধি ছিল না প্রমোদের। জ্ঞানবুদ্ধির পাশাপাশি জমিদারি রক্তের ধূর্তামোও ষোলআনা ছিল ওর মধ্যে। কাজেই, একসময় বুদ্ধি খাটিয়ে পার্টিতে ঢুকে পড়েছিল সে। নিজের ধূর্ত বুদ্ধিটি ক্রমাগত খাটাতে খাটাতে সদানন্দকে পাকে-প্রকারে একেবারে কোণঠাসা করে দিয়ে একসময় পার্টির সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল ধুরন্ধর প্রমোদ মুখুজ্জ্যা। গোটা এলাকাটাকে একেবারে হাতের মুঠোয় নিয়ে ফেলেছিল। তাই নিয়ে কুঞ্জ দাসের অবশ্য কোনো মাথাব্যথা ছিল না। রামা-শ্যামা-ভীমা যে-ই রাজা হোক না কেন, তাতে করে কুঞ্জ দাসদের বড়-একটা যায়-আসে না কোনোকালেই। বেল পাকলে কাগেদের কী!

সেই থেকে প্রমোদ মুখুজ্জ্যা এখনো অবধি গোটা এলাকা জুড়ে পার্টির সর্বেসর্বা ব্যক্তি। গোটা এলাকার মানুষজন ওর মর্জি-মোতাবেকই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। ওর অনুমোদন ছাড়া এলাকার একটা গাছেরও পাতা অবধি নড়ে না। শরীরে জমিদারি রক্ত বইতে থাকায়, ধূর্তবুদ্ধির পাশাপাশি, লোকটার মধ্যে লাম্পট্যও রয়েছে ষোলোআনা। প্রশ্নহীন ক্ষমতার পাশাপাশি, গৌরবর্ণ, সুদর্শন হওয়ার কারণে এলাকার

একাধিক রমণীর সঙ্গে তার ছিল অবৈধ সম্পর্ক। বিশেষ করে কায়েতপাড়ার গৌরাঙ্গ ঘোষের বিধবা তরঙ্গ'র সঙ্গে একেবারে গলায় গলায় সম্পর্ক ছিল তার। কিন্তু লোকটা এমনই ধূর্ত আর সতর্ক যে, কাকেপক্ষীতেও টের পেত না ওর কুকীর্তির কথা। এখনো পায় না।

কিন্তু এই দুনিয়ায় চোরের নজর এড়িয়ে কারোর পক্ষে রাতের বেলায় কিছু করাটা তো বলতে গেলে অসম্ভবই। কাজেই, প্রমোদ মুখুজ্জ্যা'র ফি'রাতে হরেক পাড়ার রক্ষিতাদের কুঠরিতে ঢোকাটা কুঞ্জ দাসের নজর এড়ায়নি কোনোদিনই। কিন্তু লোকটা স্থানীয় পার্টির মাথা। কাজেই, কথাটা পাঁচকান করতে সাহসই করে না কুঞ্জ। তাবাদে ওই নিয়ে অত মাথাও ঘামায় না সে। এই দুনিয়ায় হরেক গাছে হরেক জাতের ফল পেকে রয়েছে, যার যেটা পছন্দ পেড়ে পেড়ে খাচ্ছে,... খাবে, এটাই তো দস্তুর। কুঞ্জ যেমন রাতের বেলায় সম্পন্ন গেরস্থদের তিজুরি ফাঁকা করছে, প্রমোদ মুখুজ্জ্যাও ফি-রাত্তিরে ফুটন্ত ফুলগুলোর মধু খেয়ে বেড়াচ্ছে। তাতে করে কুঞ্জ'র তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। খামোখা তবে সাপের ল্যাজে পা দেওয়া কেন! খাক, আজ রাতে প্রমোদ মুখুজ্জ্যা যত খুশি বকুল-ফুলের মধু খাক।

কায়েতপাড়ার গোরাঙ্গ ঘোষের বিধবা ছিল বকুলের মা তরঙ্গ। প্রমোদ মুখুজ্জ্যার সঙ্গে তার ছিল ফুল ও ভ্রমরের সম্পর্ক। তবে প্রমোদ যতদিনে ভ্রমর সাজল, ততদিনে তরঙ্গ'র যৌবনে শুরু হয়েছে ভাঁটা'র টান। বকুল তখন বারো কি তেরো। ওই একটিমাত্র মেয়ে ছিল তরঙ্গ'র। যখন সতেরোয় পা দিল, প্রমোদই চেষ্টা-চরিত্র করে ওর বিয়ে দিয়েছিল তুঁতরাঙ্গা'র আশাপাশে কোনো গাঁয়ে। কিন্তু শেষ অবধি সেই বিয়ে টেকেনি। বকুলের বরটা মরে গেল। পাছে বিধবা বকুল মরা-ভাইয়ের সম্পত্তিটা কৌশলে গ্রাস করবার লালসাতেই থাকে, সেই কারণেই নানা অছিলায় ভাসুরেরা ওকে তাড়িয়ে দিল শ্বশুরের ভিটে থেকে। তখন চারপাশে প্রমোদের যা-হাঁকডাক, চাইলে বকুলের ভাসুরদের টাইট করে দিতে পারত। কিন্তু প্রমোদ তা করেনি। কুঞ্জ'র দৃঢ় বিশ্বাস প্রমোদ নিজস্বার্থেই তা করেনি। কাজেই, একদিন ভরা যৌবন নিয়ে বাপের ভিটেতে ফিরে এল বকুল। সেই থেকে বাপের ভিটেতে তরঙ্গের সঙ্গেই থাকত ও।

একদিন তরঙ্গও চলে গেল ওপারে। তাতে করে বকুল যে একেবারে অগাধ জলে পড়ল, তা কিন্তু নয়। কারণ, খোদ এলাকার মুরুব্বি প্রমোদ মুখুজ্জ্যা যার সহায়, তার দিকে চোখ তুলে তাকাবার হিম্মৎ হবে কার!

হ্যাঁ, বাইরে থেকে প্রমোদ মুখুজ্জ্যা অসহায় বিধবা বকুলের সহায়ই বটে। কারণ, প্রমোদের ভাষায়, এই গাঁয়েরই মেয়া সে, আমাদের চক্ষের সুমুখেই বড় হয়েছে। বলতে গেলে, আমাদের কন্যাতুল্য সে। স্বামীকে হারিয়ে, ভাসুরদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে সে এখন নিজের পিতৃগৃহেই আশ্রয় নিয়েছে। কাজেই, তার সুরক্ষার ব্যবস্থা করাটা তো পার্টির কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।

ঠিক, বাইরে প্রমোদ মুখুজ্জ্যার কন্যাতুল্যই বটে বকুল। কিন্তু ইদানীং প্রমোদ যে প্রায় ফি-রাতেই বকুলের কুঞ্জে আনাগোনা করছে, গাঁয়ের কাক-পক্ষীটি টের না পেলেও কুঞ্জ'র কাছে তো তা অজানা নেই। অবশ্য তাই নিয়ে কুঞ্জ'র কোনো মাথাব্যথাও নেই। মৌচাকটা যখন ওর নয়, তো এই দুনিয়ায় যে-ই ওই মৌচাকের থেকে মধু খাক না কেন, কুঞ্জ'র

তাতে কী! কিন্তু তাও কুঞ্জ দীর্ঘকাল প্রমোদের ওপর চণ্ডাল-রাগটা পুষেই রেখেছে।

তার অবশ্য সঙ্গত কারণ রয়েছে।

তখন ফি-রাতেই গেরস্থের বাড়িতে হানা দিচ্ছে কুঞ্জ। সেই বাবদ আয়-উপায়ও মন্দ হচ্ছে না। কিন্তু কথায় বলে, চোরের সাতদিন তো গেরস্থের একদিন। পঞ্চানন মল্লিকের বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে একদিন বমাল ধরা পড়ে যায় কুঞ্জ। রাত পোহাতেই বিচারসভা বসে পার্টি-অফিসে। 'এই তল্লাটে কোনো চোরের ঠাঁই নাই' এই ধুয়ো তুলে সেদিনকার তাবৎ বিচারের ভার নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছিল প্রমোদ মুখজ্জ্যা। ফলে, মূলত তারই উদ্যোগে, কুঞ্জকে একসময় পিছমোড়া বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় পার্টি-অফিসের কড়িকাঠে। ঝুলন্ত রশিতে আজন্ম কোলকুঁজো কুঞ্জ ঠিক চামচিকার পারা দোল খেয়েছিল সারাটা সকাল-প্রহর। ওই অবস্থায়, প্রমোদের নির্দেশেই তার পিঠে পড়ছিল ক্রমাগত বেতের বাড়ি। সেদিন সারাটা সকাল-প্রহর সমানে আর্তনাদ করেছিল কুঞ্জ দাস। কিন্তু এতেও থেমে থাকেনি প্রমোদ মুখুজ্জ্যা। শেষ অবধি চোরকে শায়েস্তা করবার জমিদারি তরিকাগুলোই প্রয়োগ করেছিল সে কুঞ্জ'র ওপর। ওর হুকুমে হাতুড়ি দিয়ে কুঞ্জ'র হাঁটু'র মালাইচাকিদুটো কুচো কুচো করে দিয়েছিল নগেন বাগ। দু'হাতের দশটা আঙুলও হাতুড়ি মেরে মেরে থেঁতলে দিয়েছিল। বিচারান্তে কুঞ্জ'র পঙ্গু শরীরটাকে প্রমোদের আশ্রিত লোকজনেরা ফেলে গিয়েছিল ওর ঝোপড়ির সুমুখে।

কুঞ্জ বোঝে, সেদিন বিচারের নামে সবটাই নিজের গরজে করেছিল প্রমোদ মুখুজ্জ্যা। সরকারি চাল-গম-টাকা নিজে পাইকারি হারে সাবাড় করলেও কুঞ্জকে অক্ষম বানাতে, বাস্তবিক, বাধ্য ছিল সে। কারণ, এই দুনিয়ায় চোর আর নিশাচর লম্পট চিরকালই পরস্পরের শত্রুপক্ষ। যেমন কিনা সাপ আর নেউল। কারণ, গাঁয়ের মধ্যে এদের আনাগোনাটা কোনো পক্ষেরই অজানা থাকে না। চোর বরং নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে। দূরে কারোর পায়ের আওয়াজ পেলে, কুকুরের চেয়েও সজাগ কান তার, তৎক্ষণাৎ ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু লম্পটদের পক্ষে তো তা সম্ভবই নয়। কাজেই, বাইরে যতই নিজের শ্বেতশুভ্র ইমেজটি বজায় রাখুক না কেন, যতই সন্তর্পনে রক্ষিতা-গমন করুক না কেন, কুঞ্জ'র মতো ধুরন্ধর চোরেরা নিজেকে আড়ালে রেখেই তার হাঁড়ির খবর পেয়ে যাবেই। কাজেই, কুঞ্জ দাসকে অক্ষত অবস্থায় গাঁ'ময় ঘুরে বেড়াতে দিলে প্রমোদ মুখুজ্জ্যার যে সমূহ সর্বনাশ, এটা তার চেয়ে কে আর বেশি বোঝে। আর, একটা এতবড় পার্টি'র নেতা সে, কোনোগতিকে তার রক্ষিতা-গমনের কথাটা কুঞ্জ মারফৎ পাঁচকান হয়ে গেলে তো সর্বনাশের সাতকাহন।

এত পীড়নের পর দু'পায়ে সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারবে, কিংবা আঙুলগুলো দিয়ে গলা-ভাতটুকুও চটকে খেতে পারবে, এমন আশা তিলমাত্র ছিল না কুঞ্জ'র। কিন্তু ভেলকি দেখাল পারিজাতপুরের সনাতন কোবরেজ। জড়িবুটি, সেঁক-পুট, মলম-মালিশ দিয়ে ছ'মাসের মধ্যেই খাড়া করে দিয়েছিল কুঞ্জকে। প্রথম-প্রথম হাঁটাহাঁটি করতে কষ্ট হলেও কিছুদিন বাদে এক্কেবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছিল কুঞ্জ দাস। এখন তো দিব্যি হেঁটে-চলে বেড়ায়। আঙুলগুলোও আগের মতোই কর্মক্ষম। তবে, সর্বসমক্ষে ওই কম্মোটি করে না কুঞ্জ। মানুষজনের সুমুখে এখনো অবধি লেংচে লেংচেই হাঁটা-চলা করে সে। আর, সারাক্ষণ হাতের আঙুলগুলোকে কাঁপাতে থাকে। মানুষজনের সাক্ষাতে সেই ল্যাংচানি ও আঙুলের কাঁপুনিটা বহুগুণ বেড়ে যায়। দেখতে দেখতে মানুষজনের মনে নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মায় যে, সিঁদ কেটে চুরি করা তো দূরের কথা, ওই হাত দিয়ে কুঞ্জ'র পক্ষে স্বাভাবিকভাবে ভাত মেখে খাওয়াটাই সম্ভব নয়। ফলত,

ইদানীং কুঞ্জ'র মনে হয়, ওইদিনের বিচারসভাটা ওর পক্ষে শাপে বরই হয়েছে। কারণ, ইদানীং গাঁয়ে-ঘরে চুরি-হারি হলে আর যাই হোক, অন্তত কুঞ্জ দাসকে কেউ সন্দেহ করে না। পুলিশও এলাকায় ঢুকে লোধাপাড়ার থেকে একে-তাকে তুলে নিয়ে যায়, কিন্তু কুঞ্জ'র বাড়ির দিকে ভুলেও তাকায় না।

॥ দুই ॥

প্রমোদ মুখুজ্জ্যা চলে যাবার পর আতাগাছের ঘেরাটোপ থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে পুনরায় উঠোনে বসে কুঞ্জ। এতক্ষণে অল্প অল্প হাওয়া বইতে শুরু করেছে। প্রমোদ মুখুজ্জ্যা এতক্ষণে নির্ঘাত পৌঁছে গিয়েছে কায়েতপাড়ায়। এতক্ষণে বকুল-ফুলের মধুটুকু নির্ঘাত আকণ্ঠ পান করে চলেছে শালা।

প্রমোদ মুখুজ্জ্যার মধু পান নিয়ে ভাবতে ভাবতে আচমকা মগজে একটা বুদ্ধি খেলে যায় কুঞ্জ'র। কিনা, এই ফাঁকে প্রমোদের তিজুরিটা সাফ করে দিয়ে এলে কেমন হয়! কুঞ্জ নিশ্চিত, বাড়ি থেকে বেরোবার কালে সদর-দরজাটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে এসেছে প্রমোদ। রক্ষিতার বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেবার কালে কে আর বাড়ির অন্যদের জাগিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দিয়ে আসে ! কাজেই, ওই বাড়িতে ঢুকবার জন্য কুঞ্জকে তিলমাত্র কাঠখড় পোড়াতে হবে না। ভেজানো দরজাটায় সামান্য ঠেলা দিয়ে নিঃশব্দে সেঁধিয়ে যাওয়া যাবে অন্দরে। আর, একটিবার সেঁধালে-পরে প্রমোদের তিজুরিটির খোঁজ পেতে অধিক কাঠখড় পোহাতে হবে না। কারণ, চুরি করুক চাই না-করুক, স্রেফ পেশার প্রয়োজনে, গোটা এলাকার সম্পন্ন বাড়িগুলোর অন্দরের ছবিগুলি কুঞ্জ'র মগজে মানচিত্রের মতো আঁকা রয়েছে। কোন বাড়ির অন্দরের ছবিটি কেমন, কোথায়-কোথায় দরজা কিংবা জানালা, কোন বাড়িতে কে-কোথায় শোয়, কোন বাড়ির কোন ব্যক্তিটি শুয়েই মড়া, আর কোন ব্যক্তিটি ঘনঘন পিসাব সারতে বেরোয়, কোন বাড়ির ধন-সম্পদ সম্ভাব্য কোন জায়গায় মজুত রয়েছে,... এবংবিধ তাবৎ তথ্যাদি কুঞ্জ'র মগজের মধ্যে গিজগিজ করছে সারাক্ষণ। সেই সুবাদে কুঞ্জ জানে, বাড়ির অন্যেরা দোতলায় শু'লেও প্রমোদ কিন্তু একতলার একটা ঘরেই শোয়। কারণ, প্রমোদের নিজের বয়ানে, নেতা মানুষ সে, রাতে-ভিতে কত-কত মানুষ কত কিসিমের দুর্বিপাকে পড়ে ছুটে আসতে পারে নেতার কাছে। দোতলায় শু'লে-পরে আধা-ডজন দরজার খিল-হুড়কো-ছিটকিনি খোলো রে... সিঁড়ি ভেঙে নামো রে... কাজ ফুরোলে-পর আবার আধা-ডজন দরজায় খিল-ছিটকিনি-হুড়কো লাগাও রে...। বহুৎ হ্যাপা তাতে। কাজেই, নেহাৎই জনসেবার স্বার্থেই প্রমোদ মুখুজ্জ্যার একতলায় শয়ন, যাতে করে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লে-পর সদর-দরজাটি নিঃশব্দে খুলে, বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়া যায়। আর, এলাকার মুকুটহীন রাজা সে, দরজা ভেজানো থাকলেও রাতের বেলায় তার বাড়িতে সেঁধাবে, এমন জাঁহাবাজ চোর এখনো অবধি পয়দা হয়নি এই দুনিয়ায়।

ভাবতে ভাবতে একসময় উঠে দাঁড়ায় কুঞ্জ। কোলকুঁজো শরীরটাতে দু'চারবার আড়মোড়া ভাঙে। তারপর, সুদাম ভক্তা'র জন্য অপেক্ষা না-করে একা-একাই হাঁটা দেয় প্রমোদ মুখজ্জ্যার বাড়ির দিকে।

সুদাম ভক্তার জন্যে অপেক্ষা না-করবার একাধিক কারণ রয়েছে। একে তো এমন সহজ-সরল কাজে সহকারী'র দরকারই নেই, কাজেই, দাঁওটা একলা মারতে পারলে সুদামকে আর বখরাটা দিতে হয় না। তার চেয়েও বড় কারণ, খোদ বাঘের গুহায় সেঁধিয়ে কাজ হাসিল করা, ষোলোআনা'র জায়গায় আঠারো আনা ঝুঁকি রয়েছে এতে। কাজেই, যত বিশ্বাসীই হোক না কেন, এমন কাজের কোনো সাক্ষী রাখাটা বিপজ্জনক। নেতার বাড়িতে চুরি, পুলিশ তো কোমর বেঁধে নামবেই। কাজেই, বলা যায় না, সুদামকে কোনোগতিকে ধরতে পারলে, ওর পেট থেকে কথা আদায় করবার জন্য কিছুই বাকি রাখবে না পুলিশ। আর, পুলিশের হুড়কো খেতে খেতে সুদাম যদি ওলাওঠা'র ভেদবমি'র মতো কোনোগতিকে সবকিছু কবুল করে বসে, তবে বিপদ রাখবার ঠাঁই থাকবে না।

পুরুতপাড়ার দিকে দু'চার কদম এগিয়েই কী ভেবে থমকে থেমে যায় কুঞ্জ। ততক্ষণে অন্য-এক ভাবনা ঘাই মারতে লেগেছে তার মগজে। সেই ভাবনায় বুঁদ হয়ে সে নিমেষের মধ্যেই দিক বদলায়। পুরুতপাড়ার বদলে হাঁটতে থাকে কায়েতপাড়ার দিকে।

খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘর বকুলের। সাকুল্যে দুটিমাত্র কুঠরি। সামনে সরুপানা দাওয়া। তারপর একচিলতে উঠোন। উঠোনের এককোণে একটা সন্ধ্যামালতীর গাছ পুঁতেছে বকুল। বেশ বাহারি মাচান বেঁধে গাছটাকে তুলে দিয়েছে ওই মাচানে। উপস্থিত মালতী গাছটা গোটা মাচানময় লতিয়ে গিয়েছে। আর ফুলও ফুটেছে এন্তার।

একসময় বেড়ার আগড় ঠেলে নিঃশব্দে উঠোনে পা রাখে কুঞ্জ। মাচানের তলার গাঢ় অন্ধকারে গিয়ে খানিক দাঁড়ায়। চারপাশটা শুনশান। হাওয়া বইছে ফুরফুরিয়ে। মালতী ফুলের

সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে হাওয়ায়।

মাচানের তলার অন্ধকারে বেশ কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে কুঞ্জ। চারপাশটা চোখ আর কান দিয়ে একপ্রস্থ জরিপ করে নেয়। একসময় মালতী-লতার থেকে একটা সরু লিকলিকে ডাল ছিঁড়ে নিয়ে গুঁজে রাখে কোমরে। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে দাওয়ায় পা রাখে। দুটি কুঠুরির মধ্যে কোন কুঠুরিতে শোয় বকুল, কুঞ্জ'র তা বিলক্ষণ জানা। পায়ে পায়ে ওই কুঠুরির সামনেটিতে গিয়ে দাঁড়ায় সে। নিঃশব্দে কান পাতে দরজায়।

অল্পক্ষণ কান এড়েই কুঞ্জ নিশ্চিত হয়, কুঠুরির ভেতর থেকে ভেসে আসছে দুজন মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ। ঘুমন্ত মানুষের সঙ্গে জাগ্রত মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের অনেক ফারাক। কুঞ্জ ওই ফারাকদুটো বোঝে। সেই সুবাদে সে বুঝতে পারে, কুঠুরির মধ্যে ঢ্যামনা-ঢেমনি এখনতক্ক জেগে রয়েছে। ওইসঙ্গে ফিসফিসে গলায় কথাও বলে চলেছে দুটিতে।

তার মানে, এখনো অবধি ঘুমোয়নি ওরা। ঘুমোবেই বা কেমন করে! এই তো খানিক আগে সেঁধিয়েছে প্রমোদ। এরপর কাজকাম সারবে... তারপর না দুটি ক্লান্ত শরীর তলিয়ে যাবে ঘুমের অতলে।

কুঞ্জ আন্দাজ করে, এই মুহূর্তে দুটিতে গা'জড়াজড়ি করে কাজেকামে মত্ত রয়েছে। তারই ফাঁকে ফিসফিসিয়ে কথা বলছে।

কুঞ্জ আর দাঁড়ায় না। যেজন্যে এতখানি ঝুঁকি নিয়ে আসা তার, ওই কাজটাই দ্রুত সেরে ফেলে সে। প্রথমেই বকুলের কুঠুরির দরজায় লাগানো লোহার শেকলটা আংঠার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। তারপর আংঠাটার মধ্যে মালতী লতার লিকলিকে ডালটি ঢুকিয়ে শেকলসহ ওটাকে বেশ শক্ত করে বেঁধে দেয়। কুঠুরি'র বাসিন্দারা টেরও পায় না।

কাজ শেষ করে দ্রুত উঠোনে নামে কুঞ্জ। তারপর নিঃশব্দে উঠোন পেরিয়ে আগড়ের বাইরে চলে আসে।

আর কেবল একটি কাজই বাকি। সেই কাজটা সাঙ্গো করতে দ্রুতপায়ে পুরুতপাড়ার দিকে হাঁটতে থাকে কুঞ্জ।

॥ তিন ॥

কুঞ্জ'র আন্দাজটাই ঠিক। প্রমোদ মুখুজ্জ্যার বাড়ির সদর দরজাটি সত্যি সত্যিই বাইরের থেকে ভেজানো। সামান্য ঠেলা মারতেই খুলে যায়। সামান্য আওয়াজ হয় বটে, কিন্তু সেজন্য কুঞ্জ তিলমাত্তর চিন্তিত হয় না। কারণ, সে তো জানেই, ওই একচিলতে আওয়াজ দোতলা অবধি পৌঁছবে না। পৌঁছলেও ঘুমের অতলে তলিয়ে থাকা মানুষগুলোর কানের মধ্যে সেঁধাবে না।

কাজেই, কুঞ্জ নিঃশব্দে ভেতরে ঢোকে। পূর্ব-অর্জিত তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রথমেই প্রমোদের বালিশের তলার পুরু তোষকটি তোলামাত্রই একতাড়া নোটের গায়ে হাত ঠেকে যায় ওর। নোটগুলো চটপট ট্যাঁকে গুজে নেয় কুঞ্জ। তারপর ডান-পা দিয়ে পালঙ্কের তলাটা সামান্য হাতড়াতেই পায়ে ঠেকে একটি টিনের তোরঙ্গ। তোরঙ্গটা বের করে আনতে সাধ জাগছিল কুঞ্জ'র। কিন্তু অনেক ভেবেটেবে নিজেকে গুটিয়ে নেয় সে। থাক, আজ আর অধিক ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই। আসল কাজটা তো সেরে এসেছে বকুলের বাড়িতে। এটা ছিল নেহাৎই উপরি।

অর্থপ্রাপ্তির উল্লাসটা তো ছিলই, কুঞ্জ'র খুব মজা লাগছিল আরও একটি কারণে। রাত পোহালে প্রমোদ মুখুজ্জ্যা তোষকটি তুলে দেখবে, ভেতরের মালকড়ি-সব পাখনা মেলে ফুড়ুৎ! অথচ ওই নিয়ে শালা উচ্চবাচ্য কিছুই করতে পারবে না! করলেও কেউ বিশ্বাসই করবে না ওর কথা। কারণ, সদর-দরজা ভাঙাভাঙি নেই, জানালা'র শিকগুলোও অক্ষত, অথচ বিছানার তলায় টাকা নেই, এটা কেমন করে সম্ভব! বাইরের চোর তো আর মাছি হয়ে সেঁধাতে পারবে না ঘরের মধ্যে! কাজেই, বাড়ির কারোরই কাজ এটা। তখন তো প্রমোদ-শালা খুলে বলতেও পারবে না যে, সদর-দরজাটি বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে সে বকুল-ফুলের মধু খেতে বেরিয়েছিল! বাস্তবিক, টাকাটা না-পেয়েও সে-এক সাপের-ছুঁচো-গেলা অবস্থা হবে শালার। বাস্তবিক, এতখানি নিরাপদ চুরি কুঞ্জ তার বাপের জন্মেও করেনি।

একসময় সদর দরজাটি সাবধানে ভেজিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে কুঞ্জ। দ্রুতপায়ে পথে নেমে হাঁটতে থাকে রানিদিঘি'র পানে। হাঁটতে হাঁটতে নিজের অজান্তেই বাঁ'হাতটা চলে যাচ্ছিল ট্যাঁকের ওপর। হাতের আন্দাজে কুঞ্জ মালুম পায়, কোঁচড়ে-তার টাকার অঙ্কটি কম হবে না।

ততক্ষণে মনের মধ্যে অবোধ পাখিটা স্ফূর্তিতে গান ধরেছে। একলপতে এতগুলো টাকা! স্ফূর্তি তো হবেই। কিন্তু এই মুহূর্তে আরও একজাতের স্ফূর্তিতে ডগোমগো হচ্ছিল মনটা। টাকা পাওয়ার স্ফূর্তিকে টেক্কা দিয়ে আরো এক ভিন্ন জাতের স্ফূর্তিতে একটু একটু করে মজে যাচ্ছিল সে।

রাতভর বকুলের যুবতী শরীরটাকে চটকে-মটকে ব্রাহ্মমুহূর্তে বেরিয়ে আসার কথা প্রমোদের। আজ কিন্তু ঘটবে একটি বিপরীত ঘটনা। বেরিয়ে আসার জন্যে বকুলের কুঠুরির দরজাটাতে টান মেরেই প্রমাদ গুনবে প্রমোদ মুখজ্জ্যা। এ কী! দরজা যে বাইরের থেকে বন্ধ! ততক্ষণে নির্ঘাত খোয়ারিটা কেটে যাবে নেতার-পো'র। মনে মনে প্রমাদ গুনতে গুনতে জোরসে ধাক্কাতে লাগবে দরজা। ইস, প্রমোদ মুখুজ্জ্যা'র মতো জাঁহাবাজ নেতাটি ওই মুহূর্তে ঠিক যেন ফাঁদে-পড়া মুষাটি!

এর পরের ঘটনাটি হবে আরো মজাদার।

গাঁয়ে-ঘরে সকাল অবধি শুয়ে থাকবার রেওয়াজ বড়-একটা নেই। ব্রাহ্মমুহূর্তেই জেগে যায় অনেকেই। দরজা খুলে বাইরে আসে পিসাব সারতে। কেউ কেউ নিত্যকর্ম সারতে পুকুরপাড়ের দিকে পা বাড়ায়। ঠিক সেই মুহূর্তে বকুলের বাড়িতে দরজা ধাক্কাধাক্কির আওয়াজ পেয়ে ওরা দৌড়ে আসবে চারপাশ থেকে। আর, তখনই দেখবে কুঠুরির দরজা বাইরের থেকে আটকানো। চটজলদি শেকলের বাঁধন খোলামাত্রই যা-এক দৃশ্য দেখতে পাবে সবাই, তাতে করে এলাকার মুকুটহীন রাজাটি এক্কেবার ন্যাংটো হয়ে যাবে। সযত্নে লালিত তার এতকালের ব্যক্তিত্ব, প্রশ্নহীন নেতাগিরি নিমেষের মধ্যে একেবারে চিঁড়ে-চৌপট! আর, গাঁ'ঘরে যা হয়, ডালেপালায় রোদ্দুর ছড়াবার আগেই কথাটা রাষ্ট্র হয়ে যাবে চতুর্দিকে। চৈত্রের দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে।

কল্পনয়নে দৃশ্যটা দেখতে দেখতেই কুঞ্জ'র বুকের ভেতরটা খুশির চোটে নৃত্য জুড়ে দেয়! আর, ওই মুহূর্তে কুঞ্জ অনুভব করে, তার হাঁটুর গভীরে এবং হাতের আঙুলগুলোতে এতক্ষণ চাগিয়ে থাকা প্রদাহ ও চিনচিনানি যন্ত্রণাগুলি বেমালুম উধাও! ♠♠

অলংকরণ: প্রণব হাজরা

মা

জয়ন্ত দে

মা কে নিয়ে কোনওদিন কোনও গল্প লিখিনি। খুব সাধারণ আটপৌঢ়ে মা আমার। সারা গায়ে রান্নার গন্ধ। আগে নাকি মায়ের গায়ে নদীর গন্ধ ছিল। লোনা গন্ধ। এ কথা আমার বড়দি আমাকে বলেছিল। বড়দি প্রথম এসেছিল, তাই হয়তো মায়ের গায়ে নদীর লোনা গন্ধ পেয়েছিল। আমি অনেক পরে এসেছি, ততদিনে হয়তো এ-শহর সেই গন্ধ শুষে নিয়েছে।

শহর খুব কঠিন। কঠিন দেওয়াল ফুঁড়ে জল আর আলোর খেলা। তোলা উনুনের কালো ধোঁয়া মেঘের মতো জিলিপি প্যাঁচে গলিপথে জমা হতো। সারাদিন ঘরকন্নার শেষে আমাদের ছোট্ট-বাড়ির রুমালের মতো ছাদে ছিল আমার মায়ের আকাশ। মায়ের ছবিটিও সাদা কালো। তাতে রং বলতে দুটো— সিঁথিতে লাল, আঁচলে হলুদ। সেই দুটো রঙেই আমার মা আঁকা ছিল আমার মনে। সেই মাকে আমি অনেকটাই দেখতে পাইনি, বা দেখলেও টের পাইনি। অনেকদিন পরে মাকে দেখলাম সেদিন। হঠাৎই। মা মারা যাওয়ার চব্বিশ বছর পর...।

একসময় এদিকটা আমি কখনও কখনও এসেছি। তারপর আর আসা হয়নি দীর্ঘ দীর্ঘ বছর। আর ইদানীং এত বাড়িঘর ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে ছয়লাপ, ভোলই বদলে গেছে জায়গাটার।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে ভবানীপুরের মতো জায়গায় থেকেছি। হার্ট অব দ্য সিটি। শহর বাড়ছে। বড় লোকজন দামি জায়গার দখল নিচ্ছে। ভাড়াবাড়িগুলো দ্রুত বদলে যাচ্ছে ফ্ল্যাটবাড়িতে। যেটুকু ভাড়া আছে, তারও ভাড়া বাড়ছে হু হু করে। নিম্নবিত্তের মানুষজন শহর ছেড়ে পিছু হটছে। সেসময় আমার বাবা আয়ের সঙ্গে সংগতি না রাখতে পেরে চলে এসেছিলেন কলকাতার বাইরে। গড়িয়া স্টেশনের এদিকটা। বাবা ছোট একটা জায়গা কিনেছিলেন মায়ের সব সোনাটুকু খুইয়ে। জলা জমি। মাটি ভরে তিল তিল করে সেখানে বাড়ি উঠেছিল। ছোট বাড়ি। সাদা দেওয়াল। মাথায় অ্যাসবেসটস। বাবা নিজের হাতে বাড়ির চারধারে বাঁশের বেড়া দিয়েছিলেন। তাতে ঘন সবুজ রং। বেড়ার গায়ে উচ্ছে গাছ। উঠোনে শিউলি আর কাশীর পেয়ারা, ভেতরে লাল।

কিন্তু বাড়িটার দু দিকে দুটো পুকুর। পিছনের পুকুরটা মজা। কচুরিপানায় বারোমাস ছেয়ে থাকত। বছরের একটা সময় বেগুনিরঙের আশ্চর্য ফুল হতো সেখানে। সারা পুকুর জুড়ে বেগুনিরঙের মেলা! কিন্তু সে ফুলের কদর ছিল না, সে ফুলের পাশে দিয়ে জলঢোঁড়ার দল এঁকেবেঁকে আলপনা দিত।

আর সামনের পুকুরটাকে ঘিরে অনেকগুলো ঘাট। চারদিকের সব বাড়ির একটা করে। এই পুকুরের দখিন পাড় পুরো আমাদের জমির বাউন্ডারি। ঠিক তার ধারেই একটা ঘাট ছিল, সেটা বারোয়ারি। সারা গ্রীষ্মকাল দলে দলে লোকে এসে স্নান করে। সে করুক গে। সবাই আমাদের পাড়ার লোক, পাড়া-প্রতিবেশী।

আমরা শহর থেকে এসেছিলাম। আমরা পুকুরে চান করতাম না। সাঁতার জানি না। জলে নামলে হাবুডুবু খেতাম। কিন্তু এখানে আসার কিছুদিনের মধ্যে মাকে দেখতাম, সারাদিনে একবার হলেও পুকুরে দুটো ডুব দিত। মা পুকুরে স্নান বা চান করত না, দুটো ডুব দিত।

বাবা কখনও দেখলে বলত— দেখ দেখ নদীর দেশের মেয়ে! আমরা দেখতাম—গ্রামের মেয়ে!

জলে ডুব দিয়ে মায়ের মুখে চুলের আলপনা। কপালে সিঁদুর লেপটে যেত। আগেই বলেছি, আমরা কোনও ভাইবোন সাঁতার জানতাম না। কোনও কোনওদিন সারা পুকুর দাপিয়ে মা সাঁতার কাটত, আর মুগ্ধ হয়ে আমরা ভাইবোনেরা দেখতাম। এখন সে সব কথা মনে হলে মনে হয়, মা হয়তো ভবাণীপুরের ভাড়া বাড়িতে হারিয়ে যাওয়া জীবন আবার খুঁজে পাচ্ছিল একটু একটু করে। আর দেওয়াল টিপে আলো নেই। আবার ঘাট সরতে পারত। ডুব দিতে পারত। সেই সঙ্গে বড় সুখ ছিল পায়ের তলায় মাটি, ঘাসজমি। শান বাঁধানো পৃথিবী নয়। তার নিজের বাড়ি, ভাড়াবাড়ি নয়। ভাড়াবাড়ির জীবন বড় গ্লানির। মা এখানে এসে বড় সুখে ছিল। আড়াই কাঠা জমির এই ভূখণ্ড মাকে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছিল। এই বাড়িতেই মা মারা যান। চব্বিশ বছর আগে। তার আগেই বাবা মারা গিয়েছিলেন। দিন বদল হয়। এই জমি বিক্রি হয়ে যায়। আমরা ভাইবোনেরা সবাই যে যার মতো এই শহরেই ছড়িয়ে পড়ি। আমি সল্টলেকে এক ফ্ল্যাটে চলে যাই। এ কাহিনীর শেষ এখানেই।

কিন্তু মা মারা যাওয়ার চব্বিশ বছর পরে আমি অদ্ভুতভাবে মাকে আবিষ্কার করলাম।

আমার এ গল্প সেই আবিষ্কারের কাহিনী।

•••

নেমেছিলাম যখন ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। চারদিক অন্ধকার করে আছে। আরও জোরে বৃষ্টি নামতে পারে। এসব কাজে দুপুরবেলাটাই সেরা সময়। তখন রিকশচালকদের অখণ্ড অবসর। সওয়ারি থাকে না। হয় তাস খেলে, নয় রিকশয় বসে ঝিময়।

এই সময়টাই একটু বাড়তি ভাড়ার কথা বললে খুব তাড়াতাড়ি তাদের সঙ্গে ভাব হয়ে যায়। যত দ্রুত ভাব হবে, তত তাড়াতাড়ি কাজ হবে। আমি এখানে একটা জরুরি কাজে এসেছি।

দাঁড়িয়েছিলাম একটা দোকানের শেডের নীচে। অপেক্ষা করি কে টোপ খায়! সিগারেট ধরিয়ে চারদিক মাপছি। এক্ষেত্রে একটু মদোমাতাল নেলাখেপার মতো রিকশচালক হলেই ভালো। দিনে দুপুরে মদ খাওয়া মাতাল কোনও রিকশচালক পেলে আরও ভালো হয়। দেখা যাক, একটু অপেক্ষা করি, কিছু একটা পাব— এই বিশ্বাস ছিল মনে।

এসেছি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে। নিজের পরিচয়টা এই মুহূর্তে নাইবা দিলাম। শুধু জেনে রাখুন আমি কিছু খুঁজছি, এই খোঁজাটাই আমার কাজ। আমার কাছে সে অর্থে কোনও ঠিকানা নেই। দরকারও নেই। তবে আপাতত আমি একটা ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছি। খুব কমন একটা ঠিকানা। ধরুন রিকশায় বসে বলব— হরিসভা যাব।

রিকশচালক বলবে, কোন হরিসভা?

আমি হরিসভাতেই থেমে থাকব না। বলব, আরে ওই যে একটা মোড় আছে। সেই মোড়ের মাথা পেরিয়ে—।

রিকশচালক আমার সঙ্গে ভাববে। বলবে—ব্যানার্জিপাড়া?

—হ্যাঁ, ব্যানার্জি পাড়া? তাহলে তাই হবে।

রিকশচালক বলবে, নিয়ে গেলে চিনতে পারবেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ পারব, খুব পারব, কেন পারব না? ততক্ষণে আমি রিকশয় উঠি উঠি করছি।

অসময়ের প্যাসেঞ্জার রিকশচালক ছাড়তে চাইবে না, হোক অনির্দিষ্টযাত্রা, ঠিকানাবিহীন, কিন্তু টাকা তো মিলবে।

সে আকাশের দিকে তাকাল।

আমি বলব, বৃষ্টির আগে আগে পৌঁছাতে হবে।

সে বলবে, চলেন, এ মেঘে বৃষ্টি হবে না। দেখেন না, মেঘ উড়ে যায়—।

এবার রিকশচালক চালাতে শুরু করেছে। বলবে, ব্যানার্জিপাড়া হরিসভা চোদ্দো টাকা ভাড়া কিন্তুক—।

আমি বলব, টাকার জন্য চিন্তা করো না, তোমাকে আমি বেশি দেব, খুশি করে দেব। এই দুপুরবেলা তুমি রেস্ট নিচ্ছিলে—আমি তোমাকে পুষিয়ে দেব ভাই।

ভাই শুনে সে শান্তি পেয়েছে। রিকশ চলছে।

প্যাডেলে চাপ দিয়ে ও রিকশটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একটা অবাধ্য কোঁচ কোঁচ শব্দ।

আমি ওকে দেখি, শীর্ণ চেহারা। প্যাডেল চাপার সময় পিঠের হাড়গুলো যেন উঠে আসছে। পরনে স্যান্ডো গেঞ্জি আর ঢোলা বারমুডা। মাথার চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা। এবড়ো খেবড়ো দাড়ি না কাটা গাল, ভাঙাচোরা মুখ।

দাঁড়িয়েছিলাম শেডের নীচে। রিকশ নিয়ে ও এসে আমার সামনে দাঁড়াল। মুখে একগাল হাসি। যেন কত চেনা। বলল, বাবু ভালো আছেন? কোথায় যাবেন?

বুঝলাম, এ আমার থেকেও সরেস। সওয়ারি নেওয়ার জন্য চেনা পরিচিতির ভাব করছে। আমি ওকে বধ করতে চাইছি, আর চেনা হাসি হেসে ও এসেছে আমাকে বধ করতে।

শেয়ানায় শেয়ানায় কোলাকুলি তাহলে। আচ্ছা, শুরু করা যাক—

আমি বললাম, তুমি আমাকে খুঁজে বার করে দাও দিকি—শম্ভুনাথ পালের বাড়ি। আগে কত এসেছি।

—আগে এসেছেন? তালে তো চিনে নেবেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ একবার গেলেই ঠিক চিনে নেব। আগে কত এসেছি।

রিকশা চলছে। বললাম, কতটা দূর হবে এখান থেকে?

—এই তো, এরপরের মোড় পেরিয়ে ডাইনে হরিসভা।

আমি বুঝলাম এসে গেছি।

এবার বলতে শুরু করব, এদিকটা মনে হচ্ছে না। কিছুই তো চিনতে পারছি না। সব পালটে গেছে।

রিকশচালক বলবে, কত্তদিন আগে এয়েছেন?

—উমম, তা বছর কুড়ি বাইশ আগে।

—বচ্ছর কুড়ি-বাইশ! সে তো অনেকদিন গো। তারপরে আর আসা হয়নি?

—হ্যাঁ, বারো বছরে এক যুগ। প্রায় দু যুগ!

—এই তো হরিসভা। কী নাম বললে— শম্ভুনাথ পাল?

—হ্যাঁ, একটা ইনসিউরেন্স কোম্পানির দালালি করত, শম্ভুনাথ পাল।

—তালে এখানে হবে না বলছ?

—এখানে কী করে হবে? আমি জায়গাটাই তো চিনতে পারছি না। এটা হরিসভা?

—ওই তো হরিসভা। ব্যানার্জি পাড়া হরিসভা। ওই যে বোড লেখা। হরিসভা।

আমি সামনে তাকিয়ে দেখি। একটা মন্দির। তার গায়ে বোর্ড: হরিভক্তি প্রদায়িনী সমিতি। ব্যানার্জিপাড়া। হরিসভা।

আমি মুখ ব্যাজার করি— কী জানি? চেনা লাগছে না। ঠিক আছে একবার জিগ্গেস করো তো কাউকে, শম্ভুনাথ পালকে কেউ চেনে নাকি? ইনসিউরেন্সের এজেন্ট। মানে দালালি করতো।

রিকশচালক এদিক ওদিক মুখ বাড়িয়ে শম্ভুনাথ পালের খোঁজ করল। জানি পাবে না। পেতে পারে না। পেলেও সে ইনসিউরেন্স কোম্পানির দালাল নয়। ধুসস শম্ভুনাথ পাল বলে এখানে কেউ নেই। কস্মিনকালেও কেউ ছিল না। আর থাকলেও ইনসিউরেন্স কোম্পানির দালাল নয়, হলেও শম্ভুনাথ নয়।

আমার ভাবনা মতো সে পেল না। একে তাকে জিজ্ঞাসা করে সে আমার দিকে মুখ ফেরাল। কালো ঠোঁট উলটে বলল,

—কেউ যে চেনে না।

এখন আমি চুপ করে বসে। এখন দায় রিকশচালকের। বুঝতে পারছি ও আমাকে নিয়ে বেশ আতান্তরে। চেনা হাসি দিয়ে রিকশায় তুলেছিল। ফ্রি হাসির জন্য ভেবেছিল দু চার টাকা বাড়তি পাবে, এখন যদি বাড়িই না পাই, কাজই না হয়, ভাড়া পাবে, কিন্তু বাড়তি মিলবে না।

বৃষ্টি আসেনি। সত্যি সত্যি মেঘ উড়ে গেছে। তবে ঘোর ঘোর চারদিক।

দু কদম রিকশ এগোচ্ছে, আর যাকে পাচ্ছে তাকে জিজ্ঞেস করছে। আমি ওকে মৃদু গলায় আবারও আশ্বস্ত করলাম, ভাড়া নিয়ে চিন্তা নেই। বেশিই দেব। খুশি করে দেব।

শুনে ও তেড়েফুঁড়ে উঠল। ও হাল ছাড়েনি, জিজ্ঞেস করছে। করুক, করুক ও খুঁজে না পেয়ে আমার দিকে তাকালে তখন আমি ওকে বধ করব।

—না পাচ্ছি না গো। রিকশচালক বলল।

—তালে কী হবে? আমি শম্ভুনাথকে পাব না?

এবার ও রিকশ দাঁড় করাল, বলল, — ঠিকানা নেই?

—ওই তো হরিসভা। তার আগে একটা মোড়। মোড়ের মাথা পেরিয়ে—

—তালে কি, ওদিকে বটতলার দিকের হরিসভা?

—আমি বললাম, তাই হবে, তাই হবে। হ্যাঁ একটা বট গাছ ছিল বটে।

—সেটা যে বেশ দূর। ভাড়া—

আমি ওকে কথা বলতে দিলাম না। বললাম, তুমি টাকা নিয়ে চিন্তা করো না ভাই। যা হবে তার থেকে তোমাকে আমি বেশিই দেব। ওখানে গেলে আমার কিছু পাওনা হবে। সেখান থেকেই দেব তোমাকে।

—চলুন তালে। রিকশচালক গাড়ি ঘুরিয়ে ছুটে চলে।

আমি বলি, একটু কষ্ট করো। শম্ভুনাথ আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে। আমি গিয়ে তাকে মুক্তি দেব। তোমার তাড়া নেই তো? আমি শম্ভুনাথকে না পেলেও তোমাকে খুশি করে দেব।

রিকশ চলছে।

এবার আমি আস্তে আস্তে বলি, চলো আগে একটা চা খাই। হাই উঠছে। তারপর নয় বটতলার হরিসভায় যাওয়া যাবে। আমার অত তাড়া নেই।

রিকশচালক একটু খুশি হল। টাকা নিয়ে চিন্তা নেই। উপরি হল চা। সে অন্যদিকে রিকশ গড়াল।

একটা চায়ের দোকানে এসে সে থামল। বলল, এখানে চা খেয়ে নিন।

আমি বিশ টাকার একটা নোট এগিয়ে দিয়ে বললাম—দুটো চা, আর দুটো বিস্কুট বলে দাও।

সে তাই করে। আমি রিকশ থেকে নামি না। চা আসে। দুজনে মিলে চুক চুক করে চা খাই। বলি, তোমার বাড়ি কোথায়? বলি, এদিকটা কত পালটে গেছে। বলি, হ্যাঁ গো ইটখোলা এখানে কোথায়?

—কোন ইটখোলা?

—ওই যে যেখানে মেয়েটাকে বাচ্চা সুদ্ধু নিয়ে গিয়েছিল।

—ও সে তো নন্দ ঘোষদের ইটখোলা।

—হ্যাঁ সেটার কথা বলছিল, সেটা কতদূর?

—তা দূর আছে।

চা শেষ করি। বলি, কোনদিকে? আমরা কি ওদিকেই যাব?

—হ্যাঁ ঠিক বলেছেন, ওদিকেও একটা হরিসভা আছে। কালীবাড়ি, মাঝে মাঝে কেত্তন হয়। হ্যাঁ হরিসভা, ঠিক বলেছেন—।

সে ভাবে। আমি বলি, চালাও তো নন্দ ঘোষদের ইটখোলার দিকে। কাগজে পড়েছিলাম। যাওয়ার পথে, একবার দেখে নেব জায়গাটা।

—যাবেন, চলেন।

সে গাড়ি ঘুরিয়ে চলতে শুরু করে।

বলি, কারা করল বলত, কাজটা?

—খুব অন্যায় কাজ। পাপ!

—কাগজে তো লিখেছে, একজন রিকশঅলা নাকি বউটাকে রিকশায় তুলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে এসেছিল। তা কোন রিকশঅলা? তাকে তো পাওয়ায়ই গেল না। তাকে পেলে—সে বলতে পারত?
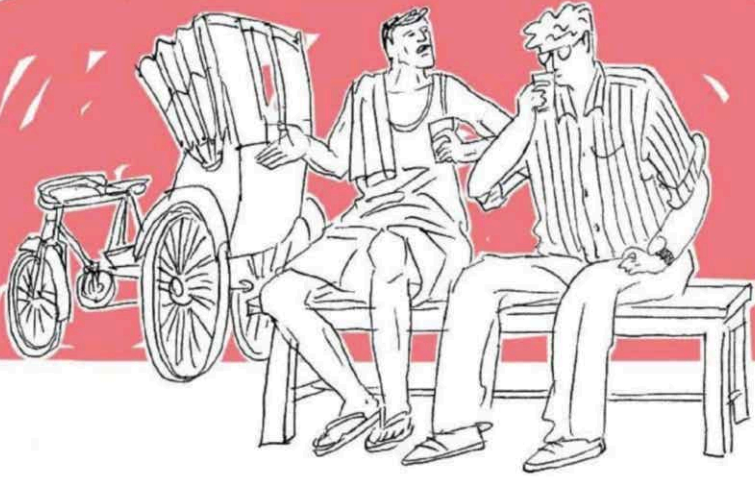
—হুমম। রিকশচালক গাড়ি টানতে টানতে উত্তর দেয়।

আমি বিড়বিড় করি— ওই রিকশঅলা, সে ব্যাটা নির্ঘাত কিছু দেখেছিল। কারা করেছে জানে। কিন্তু ভয় পেয়ে মুখ বন্ধ রেখেছে। ফালতু হুজ্জতিতে কে জড়াতে চায়, গরিব মানুষ।

রিকশ চলছে।

আমি বলি— কিম্বা তার সঙ্গে শয়তানগুলোর যোগসাজস আছে। এক গেলাসের বন্ধু। কী মনে হয় তোমার?

রিকশচালক উত্তর দেয় না। জানি দেবে না।

বলি, কিন্তু সে তো পুলিশের সামনেই এল না। এলে পুলিশ জানতে পারত, কারা করেছে। পুরস্কার পেত। পুলিশ পুরস্কার দেবে। আর যারা করেছে, তাদের যদি ভয় পায়— তাহলে বলব, একদম নয়। পুলিশ তাদের পেলে ফাঁসিতে চড়াবে।

রিকশ টানতে টানতে সে বলল, খুব অন্যায় করেছে। পশুও এমনভাবে মারে না।

আমরা এসে পড়লাম একটা ফাঁকা জায়গায়। পাশাপাশি বিশাল বিশাল দুটো পুকুর। তাতে টলটল করছে জল। সে বলল— নন্দ ঘোষের ইটখোলা।

সে আমাকে বলল। মনে মনে বললাম, আরে ভাই, এসব জায়গাই আমি চিনি। গত দুদিন ধরে কতভাবে যে পাক দিচ্ছি—।

বললাম, কোন পুকুর থেকে বউটার বডি পাওয়া গেছে বল তো?

রিকশচালক আমাকে ডানদিকের পুকুরটা দেখাল। ঠিকই দেখাল। আমি পুকুরটার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলাম। বললাম, আর বাচ্চাটার বডি?

রিকশচালক আমাকে, সামনের একটা ঝোপ দেখাল, ওই ঝোপে পড়েছিল।

এবারও ঠিক দেখাল। যাক এ খোঁজখবর রাখে।

আমি রিকশ থেকে নামলাম। আমি সিগারেট খাই কখনও সখনও। কিন্তু সিগারেটে বন্ধুত্ব করতে বড় সুবিধে হয়। তাই পকেটে এক প্যাকেট কিনে রেখেছিলাম। একটা নিজের মুখে তুলে, ওর দিকে আর একটা এগিয়ে দিলাম। বললাম, আগুন দাও।

ও লাইটার বের করে দিল। ধরালাম। বললাম, রিকশাটা কে চালাচ্ছিল? চেনো?

ও ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আমাদের লাইনের না।

—তবু, কে হতে পারে? লাইনের না হলেও তোমাদের চেনা হবে। কিছু শোনোনি? কে?

ও খুব আয়েশ করে ধোঁয়া ছাড়ল। অন্যদিকে তাকিয়ে আছে।

বললাম, কাগজে পড়ে আমার খুব কষ্ট হয়েছে। মানুষ পশুর থেকেও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মানুষ তার মনুষ্যত্ব হারাচ্ছে। পৃথিবীতে কি কেউ কাউকে সাহায্য করবে না।

এই ধরনের কথা যাত্রার ডায়লগ। এক্ষেত্রে ডায়লগই দিতে হয়। ভোকাল টনিক!

বললাম, একটা বউ, তার কোলে দুধের শিশু। সে রিকশয় উঠল। রিকশঅলা তাকে অন্ধকার এই পুকুরের ধারে নিয়ে এসে ছেড়ে দিল দুষ্কৃতীদের হাতে। আর পশুগুলো তাকে খুবলে খুবলে খেয়ে পুকুরে ডুবিয়ে মারল। বাচ্চাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঝোপে। তাকে কুকুরে খেলো। উঃ! এমন মানুষ করে? ইমপসিবল। কে বল তো রিকশঅলাটা? নাম কি? কেউ তাকে চেনে না। ওই চায়ের দোকানের বউটা বলেছিল, সে তখন দোকান বন্ধ করছে, ঠিক সাড়ে নটা। তখন একটা রিকশাঅলা চিৎকার করছিল বউটার ওপর— বউটা কোথায় যাবে বলতে পারছিল না। তার কাছে ভাড়ার টাকাও ছিল না। টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। চায়ের দোকানের বউটা চলে যায়। সে আর কিছু বলতে পারেনি। ওদিকে রিকশঅলাকেও খুঁজে পাওয়া গেল না। দুজন মানুষ এভাবে মরে যাবে! বিচার পাবে না? কোলে বাচ্চা ছিল। যারা করেছে তাদের ধরে গুলি করে মারতে হয়।

এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে আমি থামলাম। শ্বাস নিলাম। আড় চোখে রিকশচালককে দেখলাম।

বললাম, আর একবার চা খাবে? চলো সামনে বউদির দোকান থেকে আর একটা চা খাই।

আমি জানি ওই দোকানটা একটা বউ চালায়। তাকে সবাই বউদি বলে। আগে আমি দুবার এসে চা খেয়ে গেছি।

—চা খাবেন? চলেন, আগে ওখানে গিয়ে বসি।

পুকুর ধারে রিকশ পড়ে থাকল। আমরা দুজনে চায়ের দোকানের সামনে পেতে রাখা বেঞ্চে বসলাম। বউটার থেকে মুখ ফিরিয়ে আছি, বউটার না আমাকে আবার চেনা চেনা লাগে...।

চা এল। বৃষ্টি আর আসবে বলে মনে হয় না। তবে অন্ধকার মাথার ওপর ঝুঁকে আছে। হয়তো অন্য কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে।

আমি ফিসফিস করলাম, রিকশওয়ালাকে পেলে— সব জানা যেত—

রিকশচালক আমার দিকে না তাকিয়ে বলল, অনেকদিন আগে আমার কাছে এমন একটা কেস এয়েছিল বুঝলেন। কথাটা বলে ও আয়েশ করে বসল।

—মানে? আমি ওর দিকে তাকালাম। অনেকদিন আগে?

চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে ও বলল, 'হ্যাঁ সত্যি বলছি, ভরা বর্ষাকাল তখন। সারাদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। বাসস্ট্যান্ডের ব্রিজের ওপাশ থেকে ফিরছি। বিষ্টিও হচ্ছে, খুব বাজও পড়ছে। এমন সময় হঠাৎ একটা বউ আমাকে হাত দেখাল। বউটাকে দেখে আমি থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম বউটা একা নয়, কোলে একটা বাচ্চা। পরে অবশ্যি সে বলেছিল, সে হাত দেখায়নি। আমি তাকে দেখেই তার সামনে রিসকা লাগিয়েছিলাম। তো বউটা উঠে এল আমার রিসকায়। উঠে এসে একটা ঠিকানা বলল, শেতলা মন্দির। নানু মাইতির বাড়ি। কত শেতলা মন্দির চারদিকে। একটার পর একটা শেতলা মন্দিরে তাকে নিয়ে ঘুরলাম। বিষ্টি পড়ছে। বাজ পড়ছে। আমি তাকে নিয়ে ঘুরছি। সে কিছুতেই চিনতে পারছে না। সব মন্দির দেখে আর সে বলে, এটা না। আমি ঘুরছি তো ঘুরছি। সেই শেতলা মন্দির আর নানু মাইতিকে আর পেলাম না। কী করব? এদিকে রাত হয়েছে। বউটিকে বললাম, চলো আমার বাড়িতে। কাল সকালে খুঁজে দেব। নিয়ে তুললাম আমার বাড়িতে। আমি আর মা থাকি।

রিকশচালক থামল। চায়ের গ্লাসে আবার চুমুক দিল। আমি বললাম, 'পরেরদিন শীতলা মন্দির-নানু মাইতিকে পেলে?'

'নাহ্! পরেরদিনও অনেক খুঁজলাম কিন্তুক তার সেই শেতলা মন্দির আর নানু মাইতিকে খুঁজে পেলাম না।'

'তাহলে?'

'তাহলে আর কী? বউটা আমার কাছেই থেকে গেল।'

চায়ের দোকানের বউটা কখন এসে আমাদের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। সে হাসতে হাসতে বলল, 'ওরে ও গোবরা তুই বেস্পতির কথা বলছিস। গোবরা সুযোগ পেলেই বউয়ের গপ্পো করে! বাব্বা তোর মতো কেউ বউ-পাগল হয় না। বেস্পতির কী কপাল রে—।'

আমি বললাম, 'সেই মেয়েটিই তোমার বউ? বাহ! আর বাচ্চাটা?'

'সেও আমার কাছে। মা ছেড়ে যাবে কোথায়? এখন ক্লাস টেন, এবার পরীক্ষা দেবে।'

গোবরা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। ওর হাতের চায়ের গ্লাসে শেষ চুমুক দিল, ওর চোখ মুখ চকচক করছে। বলল, 'কেন করলাম জানেন?'

'মানুষের কাজ করেছ?'

'সেই মানুষটা আমাকে কে করল?'

আমি ওর দিকে তাকিয়ে আছি। গোবরা কী বলবে এবার—।

গোবরা নড়ে বসল, 'তালে আর একটা ঘটনা বলি—। কাউকে তো বলিনি, কোনওদিন আপনাকেই বলি—শোনেন—।'

চায়ের দোকানের বউটা চায়ের গেলাস ধোয়া বন্ধ করে গোবরার পিছনে সেঁটে দাঁড়িয়েছে। আমার হাতে চায়ের গ্লাস। একটা চুমুক দিয়েছিলাম। হাতে ধরাই আছে।

গোবরা বলল, 'আমি তখন গড়িয়া স্টেশনের দক্ষিণ পাড়ায় থাকি। দুপুর হলেই চান করতে যেতাম ডাক্তারদের পুকুরে। আসলে চান নয়। একটা ছিপ নিয়ে যেতাম। বড্ড মাছ ধরার নেশা ছিল আমার। বঁড়শিতে আরশোলা বেঁধে ফেলে মাছ ধরতাম। একদিন চান করার আগে বঁড়শিতে একটা আরশোলা গেঁথে ফেলে দিলাম ঘাটের একধারে। দুপুরবেলা। চুপ করে বসে আছি। হঠাৎ দেখি ফাতনা নড়ছে। আরশোলার টোপটা খেয়েছে একটা বড় শোল মাছ। আমি সঙ্গে সঙ্গে ছিপের দখল নিয়ে মাছটাকে দিলাম এক টান। মাছটা বেশ বড় খেলিয়ে তুলতে হবে। মাছটাকে টেনে তুলছি। এমন সময় একটা বউ এসে পিছন দিক থেকে খপ করে আমার চুলের মুঠি চেপে ধরল। কী তার তেজ। বলল, তুই এই মাছটা ধরবি না।

আমি বললাম, কেন? তুমি আমার চুল ছাড়ো।

সে আমাকে ঝটকা দিল। বলল, সেটা পরে বলব, আগে মাছটা টেনে তুলে ওর মুখ থেকে বঁড়শি ছাড়া। তবে তোর চুল ছাড়ব। নইলে এই পুকুরে তোকে মেরে রেখে দেব।

আমার রোখ চেপে গেছে। আমি বললাম, এটা তোমাদের পুকুর নয়, এটা ডাক্তারদের পুকুর, মাছও তোমাদের নয়।

ততক্ষণে আশপাশের চারদিকে থেকে আরও মেয়ে বউরা সব হইহই করছে? কী হল, কী হল? করছে?

বউটা বলল, আরে যে শোল মাছটা গাদাখানিক বাচ্চা নিয়ে পুকুরে ঘোরে— এই ছেলেটা তাকেই বঁড়শিতে গেঁথেছে। তুই যদি মাকে ধরে নিয়ে যাস, তাহলে ওর ছানাপোনাগুলো বাঁচবে কী করে?'

রিকশচালক এক নিঃশ্বাসে কথাটা বলে থামে।

খুব আস্তে আস্তে বলে, '—সেদিন আমি মাছটা তুলে তার মুখ থেকে বঁড়শি খুলে আবার পুকুরে ছেড়ে দিলাম। তারপর বউটা আমাকে ছেড়ে দিল। সেই বউটা আমাকে সেদিন একটা শিক্ষা দিয়েছিল—।' গোবরা হাসল। বলল, 'বউটা ছিল আপনার মা।'

আমি গোবরার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। না, চিনতে পারলাম না। চিনতে পারার কথাও না। তবে চব্বিশ বছর পরে হঠাৎ যেন মাকে চিনতে পারলাম।

আমার মা!

মায়ের সেই সাদা কালো ছবিটা আমার মনে পড়ে গেল। তাতে রং বলতে দুটো— সিঁথিতে লাল, আঁচলে হলুদ। সেই দুটো রঙেই আমার মা আঁকা ছিল আমার মনে। সেই মাকে আমি অনেকটাই দেখতে পাইনি, বা দেখলেও টের পাইনি। অনেকদিন পরে মাকে দেখলাম সেদিনই। হঠাৎই। ভিন্ন রঙে উজ্জ্বল। মা মারা যাওয়ার চব্বিশ বছর পর...।

একটা খুনের তদন্ত করতে আমাদের পুরনো এলাকার লাগোয়া এদিকটা তিন দিন ধরে ঘুরছি, কিন্তু আজ এভাবে নিজের মাকে আবিষ্কার করব ভাবতে পারিনি।

গোবরা ফিসফিস করল, 'আমি কিন্তুক আপনাকে দেখেই চিনেছি। ভালো করে খোঁজেন স্যার, পেলে ছাড়বেন না। আর আমি যদি তাকে পাই, এই পুকুরের ধারেই মেরে রেখে দেব।'

অলংকরণ: সুব্রত মাজী

• উপন্যাস
খিদের
পুতুল
স্বপ্নময় চক্রবর্তী

কী আছে পণ্ডিতচেরিতে? অনেক পণ্ডিত থাকে বুঝি? —রামবাবু জিজ্ঞাসা করল।

'দেশ বিদেশ' ট্যুরিজমের ট্যুর ম্যানেজার পল্টুবাবু বলল ওটা স্যার পণ্ডিচেরি। পণ্ডিতচেরি না। —পণ্ডিচেরি... কী নাম মাইরি হি হি। উত্তম পোদ্দার চন্দন মল্লিককে কনুই খোঁচা দিল। চন্দন মল্লিক জানালার ধারে সিটে বসেছিল। বাসটা তখন একটা ছোট শহুরে এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। চন্দন বলল এদিকে সব আন্ডিব্যান্ডি লটঘট নাম। কোন শহর পাস কচ্চি বোঝার চেষ্টা কচ্চিলাম, কেন্নো পোকার মতো, ওদের গুটলি পাকানো অক্ষরে সব সাইনবোর্ডগুলো লেখা। দু'একটা ইংলিশেও আচে, কিন্তু এত বড় বড় নাম যে পড়তে পড়তেই বাসটা হুস করে বেরিয়ে যায়। এই জায়গাটার কী নাম পল্টুবাবু? বিরাট বিরাট কলা বিকোচ্ছে... কি সাইজ গো... তা এক একটা ন'দশ ইঞ্চি হয়ে যাবে। দুটো খেলেই পেট ভরে যাবে।

ম্যানেজার পল্টু ব্যানার্জি বলল— আমি কি সব জানি নাকি, বিদঘুটে নাম সব।

সামনের একটা সিট থেকে কমবয়সি ছেলেটা বলে দিল— আরেকামেড়ুপারদা। ওইতো লেখা আছে।

চন্দন মল্লিক বলল— এইসব আদরা-পাদরা উণ্ডি-বুণ্ডি আমরা উচ্চারণ করতে পারব না। আমাদের বাঙালি জিভ এসব পারে না। ডেলি তেঁতুল না খেলে এসব উচ্চারণ করা যায় না।

পিছনের সিটে বসেছিল সজল মিত্র। বাচিক শিল্পী। গোটা গোটা করে উচ্চারণ করেন। ওঁর কণ্ঠে শোনা গেল— 'যে ভাষায় আমের নাম হিমসাগর, গ্রামের নাম হৃদয়পুর, ফুলের নাম অপরাজিতা আর দুলের নাম ঝুমকো, মিষ্টির নাম অমৃতি আর বৃষ্টির নাম ইলশেগুড়ি, মাছের নাম রূপচাঁদা আর গাছের নাম শিশু। মাসের নাম শ্রাবণ আর ঘাসের নাম দূর্বা, দাদার নাম ফেলু আর ধাঁধার নাম শুভঙ্করী, প্রেমের নাম দেবদাস আর ট্রেমের নাম পরকীয়া...।'

ট্রেমের নাম পরকীয়া শুনে আলোছায়া জগন্নাথের হাতে চিমটি কাটল। সজল মিত্র বলে চলেছে— 'নদীর নাম কীর্তনখোলা আর যদির নাম দিবাস্বপ্ন... সেই ভাষা বাংলা

ভাষা, এই ভাষাকে কি ভালো না বেসে পারি?'

পল্টু ব্যানার্জি বলল, একদম ঠিক। ইউনেস্কো বলে দিয়েছে ওয়ার্ল্ড-এর মধ্যে সবচেয়ে সুইট ভাষা হল বাংলা।

সদানন্দবাবু বলল— একদম রাইট। সেই ছোটবেলায় ইস্কুলের বইতে ছিল না— মোদের গরম মোদের আশা আমার বাংলা ভাষা। মোদের গরম না... গরব গরব। আলোছায়া সরব হল। সামনের সিট থেকে ওই কমবয়সি ছেলেটা বলল— এটা একদম গুজব। হোয়াটস অ্যাপ-এ ঘুরছে মিথ্যে কথাটা। সুইটেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দি ওয়ার্ল্ড। এরকম কোনও বিচার হয় নাকি? সবার কাছেই নিজেদের ভাষা মিষ্টি।

রামবাবু উসখুস করছিল। বাসের এই সিটে ভারী চেহারা নিয়ে বেশিক্ষণ বসে থাকা মুশকিল। বসে বসে কতক্ষণ ঘুমোনো যায়? বুকিং-এর আগে বলেছিল ফাসক্লাস বাস, এরোপ্লেনের চেয়েও ভালো সিট, হেলিয়ে দেবার সিস্টেম আছে, এক্কেবারে ঘুমিয়ে যাবেন। কোথায়? বাসের সিট হেলে না। একদম টাইট। ম্যানেজারকে বলাতে বলেছিল— ওইতো, সিটগুলো হেলানোই তো। টানটান সোজা তো নয়, তারওপর মাথার কাছে গদি...। হেলানো সিট শেখাচ্ছে। ডানলপের আইনক্স হলে মহাবলী সিনেমাটা দেখা আছে। রামবাবু জিজ্ঞাসা করল আর কতক্ষণ?

—এইতো, এসে গেছি, আর আধঘণ্টার ভেতরই পণ্ডিচেরি পৌঁছে যাবো।

—কী আছে ওখানে দেখার?

—সমুদ্র আছে, সমুদ্র... তা ছাড়া...

কথা শেষ হল না, তার আগেই চেঁচিয়ে উঠল রামচন্দ্র মোদক। আবার সমুদ্দুর এ্যা? ভেবেছেন কী?

সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোই ফুঁসে উঠল। কেবল সমুদ্দুরই দেখাবেন? পুরী নিয়ে গেলেন, সমুদ্দুর। সেখানে না হয় বাবা জগন্নাথের পুজোটা দিলাম তারপর ভাইজাগ, তারপর চেন্নাই। সেখানেও দু'দিন ধরে খালি সমুদ্দুর দেখালেন। মহাবলীপুরম না কোথায় নিয়ে গেলেন। ভাবলাম ওখানে মহাবলী সিনেমাটার ঘরবাড়ি রাজ বাড়িটা এইসব থাকবে, যাঃ লাড়া, ওকেনেও সমুদ্দুর! এবার পণ্ডিতচেরি নিয়ে যাচ্ছেন, সেখানেও সমুদ্দুর?

একটা গুঞ্জন উঠল এবার। তিন-চারজন ভ্রমণ বিলাসী একসঙ্গে কথা বলা শুরু করে দিল। সবারই অভিযোগ আছে। রামবাবু এবার একটু গলা চড়াল। বলল— এরকম তো কথা ছিল না। খালি সমুদ্দুরই দেখাবেন? মামদোবাজি নাকি? সব সমুদ্দুর সেম সেম। এধারে বালি ওধারে জল। ঢেউ আসচে। ব্যাস। সেম সেম ঢেউ। একইরকম। এজন্য পয়সা খচ্চা করে এয়েচি? বলুন চন্দনবাবু, ওদের কিছু বলুন... ব্যাটারা ঠকাচ্ছে।

চন্দন মল্লিক বলল— আরে, ব্যাপারটা বুঝুন রামবাবু, সব সমুদ্র এক নয়। সব বিচগুলোর তফাৎ আছে। কোনওটা সোজা লম্বা, কোনওটা হাফ চাঁদের মতো, কোথাও হলদে বালি... যেমন ধরুন আপনার আলুর চপ, আলুর দম, আলুকাবলি, আলুর দোলমা। আলুচোখা সবই আপনার গুদোমের আলু দিয়েই তো হয়। সব কি এক টেস্ট? ব্যাপারটা বুজ্জেন না কেন বলুন তো?

রাম মোদক বলল— বলি চন্নবাবু, আপনি কেন ওদের সাপোর্ট করে বলছেন? কিছু একটা রহস্য আছে।

চন্দনবাবু একটু রেগেই উঠে দাঁড়াল। বাসটা ব্রেক কষলে সামনের সিটে ঠোক্কর।

ম্যানেজার বলল— দেখুন— ইটারানারি আগেই দিয়ে দিয়েছিলাম।

—ওসব কোনও নারী দেখবেন না। নিমাই পাল তেড়ে উঠল। বলল দেখুন স্যার, আমরা বেড়াতে যাবার ফাঁকফোকর পাই না। একদিন বাজারে না বসলে সে দিনটা ভোঁ। বহুত আশা নিয়ে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম নানারকম কিছু দেখাবেন। পাহাড় পর্বত, জঙ্গল, সমুদ্র, দুর্গম গিরি কান্তার মরু মন্দির, বাঘ সিংহ কত কী দেখার, অথচ আপনারা খালি সমুদ্রই দেখাচ্ছেন। খেটে পয়সা রোজগার করতে হয়...।

ম্যানেজার পল্টু ব্যানার্জি হাত জোড় করল। বলল— দেখুন, ইটারানারির সরি, প্রোগ্রাম চার্ট অনুযায়ীই তো আমরা যাচ্ছি। যাচ্ছি কি না বলুন?— বাচিক শিল্পী সজল মিত্রর দিকে তাক করে বলল, পল্টু ব্যানার্জি। কী সজলবাবু, সব লেখা ছিল না?

সজল মিত্র বলল, হ্যাঁ, যা লেখা ছিল প্রায় সেটাই হচ্ছে। যদিও উদয়গিরি খণ্ডগিরি দেখাননি, চিল্কাতে থাকার কথা ছিল, সেটা হয়নি। দূর থেকে দেখিয়ে দিয়েছেন তবে পাহাড়েও নিয়ে যাবার কথা। উটি। কী উটিতে নিয়ে যাবেন তো ম্যানেজারবাবু? ম্যানেজার বলল, নিশ্চয়ই যাব স্যার। ফেরার পথে। পণ্ডিচেরির পর আমরা সোজা রামেশ্বর যাব।

ওখানে কী? রামবাবুর প্রশ্ন।

ওখানে সমুদ্র স্যার। মন্দিরও আছে...

—তারপর?

—কন্যাকুমারী।

—ওখানে কী?

—সমুদ্র।

—আবার সমুদ্দুর? এ্যাঁ? পেইচোটা কী বাঁ? এ্যাই, ফেরত চলো। হাফ টাকা করে ফেরত দিয়ে দাও। এসব ফাঁকিবাজি চলবে না।

সজল মিত্র এবার আসরে নামল। গোটা গোটা করে বলতে লাগল— দেখুন, ভারতবর্ষের মানচিত্রটা মনে মনে ভাবুন। আমরা পূর্ব উপকূল দিয়ে যাচ্ছি। সমুদ্র তো পাবই। তবে আলাদা আলাদা রূপ। এই নীল, রৌদ্র ঝিলমিল, ডানা মেলা সমুদ্রের চিল। কোথাও দজ্জাল যদি, কোথাও শান্ত খুব, কোথাও পান্না রং কোথাও নীল ঘন রূপ। জীবনানন্দ লিখেছিলেন— দু'এক মুহূর্ত শুধু রৌদ্রের সিন্ধুর কোলে তুমি আর আমি, হে সিন্ধু সারস মালাবার পাহাড়ের কোল ছেড়ে অতি দূর তরঙ্গের... তারপর কী যেন... নতুন সমুদ্র এক সাদা রৌদ্র, সবুজ ঘাসের মত প্রাণ...

—এই, থামুন তো। আপনি মাইরি বাসে ওঠার পর থেকেই বহুত নকশা করে যাচ্ছেন। সাদা রদ্দুর দেকাচ্ছেন... ওসব আপনি দেখুন, আমরা দেখব না। বিদ্যুৎজন না কি যেন বলে, আপনি ওদের মধ্যে পড়েন, তাই না?

নিমাই পালও বাসের সিট ছেড়ে এক হাতে রড ধরে অন্য হাত নাড়িয়ে বলল, এসব টিক্কিবাজি চলবে না। যা বলছি শোন। এই ম্যানেজার! বাস থামাও। ফেরত চলো। সিধে কলকাতা। হাফ টাকা এখনই ফেরত দিয়ে দাও। খালি সমুদ্দুর দেখিয়ে টুপি পরানো?

রামবাবু এবার বলল— না। ফেরত যাব না। যাব কেন? সতেরো দিনের কনট্যাক। সাতদিন মোটে হল। কেন হাফ, নিয়ে ছেড়ে দোবো? নিমাইটার মুণ্ডুতে একদম বুদ্ধি নেই। পেদোর আবার বুদ্ধি কোত্থেকে হবে?

নিমাই এবার বলল, কতবার বলেছি আমরা আসলে পাণ্ডু। পাণ্ডুয়ায় বাড়ি ছিল, তাই। লোকে ছোট করে পেদো করে দিয়েছিল। কোর্টে এপিটওপিট করে পাল হয়েছি। আগের পদবিতে ডেকোনা। এদের লিস্টিতে তো পালই আছে।

—আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু কথাটা ঘুরে যাচ্ছে। আমাদের টুপি পরানো মানছি না। এই ম্যানেজার, মালিককে ফোন করুন।

কমবয়সি ছেলেটা এবার পিছনে তাকাল। বলল আপনারা তো জেনে শুনেই এসেছেন। বড্ড ঝামেলা করছেন। ওরা তো লিফলেটে সবই লিখে দিয়েছিল। ভূগোল টুগোল কিচ্ছু না পড়ে বেড়াতে চলে এসেছেন।

ঠিক বলেছেন, ভাইটি। আরও দু'একজন বলে উঠল।

একটা বিভাজন তৈরি হয়ে গেল বত্রিশ জনের দলে। যাব আর যাব না।

যারা এই ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে তাদের মধ্যে ষোলোজনই আড়িয়াদহ বাজারের লোকজন। রামচন্দ্র মোদকের বাজারের মধ্যে একটা আলুর গুদাম আছে। হোলসেলের সঙ্গে খুচরো বিক্রিরও একটা দোকান আছে। উনি ব্যস্ত লোক। নানা ঝামেলায় বেরনো হয় না। উনি বাজার কমিটির প্রেসিডেন্ট। বাজারে বছরে একবার অষ্টপ্রহর হরিসংকীর্তন হয়, রামবাবু ভিয়েন বসিয়ে বোঁদে, পান্তুয়া খাওয়ায়। রামবাবুর বাবা আসলে মেঠাই কারিগর ছিল। বিখ্যাত মিষ্টির দোকান সত্যভামা সুইটস-এর কারিগর ছিল। জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র লেখাপড়ায় অমনোযোগী হওয়ায় ওই মিষ্টির দোকানেই কাজে ঢুকিয়ে দেয় রামের বাল্য বয়েসেই। রামচন্দ্রকে দুধ-ছানা সেকশনে হেল্পারের কাজ না দিয়ে আলু-ময়দা সেকশনে দেওয়া হয়। এরমধ্যে পড়ে কচুরি, নিমকি, গজা, জিবে-গজা, খাস্তা কচুরি এবং শিঙাড়া। ডাক্তারবাবুরা যেমন স্পেশালিস্ট হন— চোখ, কান লিভার ইত্যাদি বিষয়ে পৃথক পৃথক বিশেষজ্ঞ। অর্থনীতিতে যেমন বিজনেস ইকনমিক্স, কালচারাল ইকনমিক্স, পুয়োর ইকনমিক্স ইত্যাদি বিষয়ে পৃথক বিশেষজ্ঞ তৈরি হয়, রাম মোদকও ক্রমে শিঙ্গাড়া বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে। শিঙাড়ার মূল উপাদান আলু। একটা প্রবাদই তৈরি হয়ে গিয়েছিল সিঙারামে আলু, বিহার মে লালু। লালুপ্রসাদজি বিহারে নেই, কিন্তু শিঙাড়ায় রয়ে গেছে আলু। রামচন্দ্র মোদকের কারণেই সত্যভামার শিঙাড়া বিখ্যাত হয়ে যায়। শুধু ওই তল্লাট কেন, দু'চার কিলোমিটার দূর থেকেই সত্যভামার শিঙাড়ার জন্য খদ্দের আসতে থাকে। শিঙাড়াচর্চার কারণে রামচন্দ্রকে আলুচর্চাও করতে হয়েছিল। আলু দেখেই বুঝতে পারত জ্যোতি, না চন্দ্রমুখী, না নৈনিতাল, না পাটনাই। শুধু তাই কেন, সিঙুরের আলু না তারকেশ্বরের না গুসকরার— এত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। শিঙাড়ার আলু বেশ নরম হতে হয়। কিন্তু আঠালো নয়। সহজে খোসা ছাড়ানো যাবে এমন হতে হবে। ফাঁকে ফাঁকে নারকোলের টুকরো, বাদাম, কিসমিস এবং শীতকালে ফুলকপির ছোট ছোট টুকরো আঁকড়ে রাখার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া চাই। আবার কচুরির জন্য যে তরকারি হয়, সে আলু আলাদা হবে। দেখতে হবে যেন গলে না যায়। যেন টুকরোগুলো গোটা গোটা দেখা যায়। খদ্দেররা বারবার তরকারি চায়। বিরিয়ানির আলু আবার আলাদা। নিজের মনে হল আর কর্মচারী কেন থাকা, নিজের ব্যবসা করতে হবে। কিন্তু মিষ্টির দোকান করতে অনেক পুঁজি লাগে। আলুর ব্যবসায় পুঁজি কম লাগে। খুচরো বিক্রি দিয়ে শুরু। ক্রমাগত আলুচর্চার ফলে সে এখন আলুবিশারদ। রামবাবু এঁড়েদা বাজারে একজন সম্মানিত ব্যবসায়ী। উনি কিছু বললে, বাজারের লোকজন শোনে। মঙ্গলবার বাজার বন্ধ থাকে। বিকেলে অনেকেই আসে। সমিতির ঘরে তাস খেলা হয়। ক্যারাম বোর্ডও একটা আছে। এরকম একটা তাস খেলার আসরেই রামবাবু বলেছিল— আলু ঘেঁটে ঘেঁটে এক্কেবারে হেঁদিয়ে গেচি। চলো সবাই মিলে একটু বেড়িয়ে আসি।

বাড়ির গিন্নিরাও এরকম কথা বলে বটে, কিন্তু কর্তারা বলে— কাজকর্ম বন্ধ করে যাই কী করে? তবু ওদের কেউ কেউ সপরিবারে দীঘা টিঘা ঘুরেছে, পুরী। কাশীধাম হরিদ্বারেও দু'একজন। কিন্তু বাজারের বন্ধুরা মিলে এরকম ঘোরার কথা মনে হয়নি। নিমাই লাফিয়ে ওঠে। দাদা ব্যবস্থা করুন। আপনিই ঠিক করুন কোথায় যাব। তবে আমরা নিজেরা নিজেরা কিন্তু। ফ্যামিলি নেবো না। ওরা বহু পব্লেম করবে। ক'টা দিন বহুত মস্তি করব, এ্যাঁ! একেবারে ন্যাজা মুড়ো এক করে দেব শালা।

এমন সময় বাজার এলাকা জুড়ে পোস্টার দেখা গেল 'সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ! ভারত ভ্রমণের জন্য দেশ বিদেশ ট্যুরিজমের শরণাপন্ন হোন। এত অল্প টাকায় কেউ ভ্রমণ করাইবে না। মাছের ঝোল, আলু-পোস্ত সমেত বাঙালি রান্না। সঙ্গে ডাক্তার এবং গাইড। সীমিত সিট। সত্বর যোগাযোগ করুন।' হ্যান্ডবিলে ফোন নম্বর দেওয়া ছিল, অফিসের ঠিকানাও ছিল। টবিন রোডে ওদের অফিস। এ তো পাড়ার কাছেই। রাম মোদক ফোন করেছিল। ওধার থেকে বলা হয়েছিল কাছাকাছি থাকেন যখন চলেই আসুন না।

তো রামবাবু গিয়েছিল একদিন। সঙ্গে নিমাই পেদো। রামবাবু পাজামা আর টেরিকটের পাঞ্জাবিতে কারুকাজ করা। ঠিকানা খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না, কারণ এই অফিসের পাশেই বাবলুর দোকান। ওর দোকানে দু'রকমের আলুর দম। রসা আর কষা। রসাটা পাঁউরুটি ঝোলে ডুবিয়ে খাওয়ার জন্য, আর কষাটা রুটি-পরোটার জন্য। ডেলি বিশ কেজি আলু লাগে ওর। রামবাবুই সাপ্লাই করে। রামবাবু অফিসে ঢুকে নিজের পরিচয় দিয়েছিল— আমি রাম মোদক, এঁড়েদা বাজার সমিতির...। ওপাশের টাকমাথা লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, বসুন স্যার, আপনি ফোন করেছিলেন, মনে আছে। আমার নাম দিলীপ ব্যানার্জি। এই সমাজসেবা মূলক ভ্রমণ সংস্থাটা খুলেছি। অনেকেরই ইচ্ছে হয় একটু তীর্থ ভ্রমণ করে আসি, একটু ইট-কাঠ-লোহা-কংক্রিট-এর একঘেয়েমির বাইরে; এই উনুন থেকে, আনাজ থেকে, বঁটি থেকে বাইরে; এই হিসেব থেকে, ফর্দ থেকে, তাগাদা থেকে, আদায় থেকে বাইরে; এই রুটিন থেকে, হোমওয়ার্ক থেকে, টিফিন থেকে বাইরে— একটু নদী-সমুদ্র- জঙ্গল- পাহাড়- টিলা- ঘাস দুব্বোর ভিতরে ক'দিন কাটিয়ে আসি, কিন্তু বেরুতে গেলে অনেক হ্যাপা। টিকিট কাটো রে, হোটেল বুক করো রে, গাড়ি ভাড়া করো রে, গাইড ফিট করো রে...। এত ঝামেলার জন্য অনেকেরই ঘোরা হয় না। কেউ কেউ বাক্স-প্যাটরা নিয়ে পুরীটুরি যায় বটে, ওদের তো সমুদ্র ছাড়া কিছু দেখা হয় না। তাই আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই কোম্পানি খুলেছি। বড় চাকরি করতাম। বাবা-মাকে পাহাড়-জঙ্গল দেখাতে পারিনি। ওরা দু'জনই চলে গেছেন। আমি সেই

পাপ-স্খালন করছি। মানুষকে ঘুরিয়ে দেব, দেখিয়ে দেব। খুব নামকরা ভ্রমণ সংস্থা থেকে দু'জন লোক আনিয়ে আমার এই কোম্পানিতে চাকরি দিয়েছি। ভালো মাইনে দিচ্ছি। চা খাবেন তো?

কী অমায়িক হাসি লোকটার। লোকটাকে বেশ ভালো লেগে যায়।

কোথায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? রাম মোদক জিজ্ঞেস করে।

—আমাদের নানারকম প্যাকেজ আছে স্যার। পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র, ঝর্ণা, তীর্থস্থান সবই আছে। একটা তিন ভাঁজ করা কাগজ দিয়ে বলল— এখানে সবই আছে।

সবরকমের দেখবার জায়গা আছে তো? রামবাবু আবার জিজ্ঞাসা করল।

—সবরকম স্যার। ডিফারেন্ট। দেখুন না। তিনভাঁজ করা কাগজটা খুলে দিল রামবাবু।

পড়েছিল— • পুবের পাঁচ বোন। গৌহাটি, শিলং, চেরাপুঞ্জি, কাজিরাঙা, হাজো, সঙ্গে কামাখ্যা। জঙ্গল, পাহাড়, ঝর্ণা। তীর্থস্থান। দশ রাত নয়দিন • সপ্ততীর্থ। গয়া, কাশী, সারনাথ, প্রয়াগ, বিন্ধ্যাচল, হরিদ্বার, হৃষিকেশ। সপ্ততীর্থর সঙ্গে গঙ্গা-যমুনা ইত্যাদি নদী, অরণ্য, নৌকা ভ্রমণ, এগারো রাত্রি দশ দিন।

এরকম আটরকম প্যাকেজ। এরমধ্যে সতেরো আঠারো দিনের প্যাকেজগুলির মধ্যে আছে সমগ্র উত্তর ভারত, সমগ্র দক্ষিণ ভারত, সমগ্র পশ্চিম ভারত।

রামবাবু আর নিমাই গুনে দেখল ষোলোটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ ভারতের প্যাকে। পশ্চিম ভারতে তেরোটা, উত্তর ভারতে বারোটা। কিন্তু খরচ তিনটেতেই একরকম। রামবাবু বলল— ঠিক আছে, কাগজটা নিয়ে যাচ্ছি, নিজেরা আলোচনা করে বলব। চা-মুড়ি ফুলুরি সমেত আলোচনায় বসা হল। সদানন্দবাবু বলল— বেরুব যখন বেশিদিনের জন্যই বেরুব। বেরুনো তো হয় না আমাদের, বোয়েচো! নানা হ্যাপা পোয়াচ্চি সারা বছর। ওই বেশি দিনের একটা বেছে নাও। দশকর্মা দোকানের মালিক গোপাল সাহা বলল— এক্কারে মনের কথাখানই কইছেন দাদা, কিন্তু একটু অসুবিধার কথা কই। যামু তো নিশ্চই, কিন্তু কম দিনের ট্যুরে। এতদিন বাইরে থাকা যাবে না। আমার ছেলেমেয়ে দুটোই তো ইংলিশ মিডিয়াম...।

রামবাবু হেঁকে উঠল— ইংলিশ মিডিয়াম দেকাবি না। আমারও ছেলের ঘরের মেয়ের ঘরে নাতি-নাতনি সব ইংলিশ মিডিয়াম। তুই কি ওদের পড়াস নাকি? জানি তুই বিকম পাশ। কিন্তু ইংলিশে অ্যাপ্লিকেশন লিখতে বলেছিলাম, তুই কেঁতিয়ে মেতিয়ে ডিক্সোনারি দেখে হেগেপেদে একাকার। তুই না থাগলে ওদের কোনও ক্ষেতি হবেনে। চল।

ও বলেছিল— বাচ্চাদের টিপিনের স্যান্ডউইচ— কখনও চিজ দিয়ে, কখনও চিকেন-মাখন দিয়ে আমাকেই বানিয়ে দিতে হয়। ইস্কুল বাসে ওঠাতে হয়। বউ পুজো ছেড়ে ওঠে না। তাছাড়া আমি ওদের অঙ্ক করাই না নাকি? টিউশন টিচারের ভরসায় রেখে দিলে হান্ড্রেডে নাইনটি নাইন পেত?

রামবাবু বলে— যে চায় না, অসুবিধা আছে, সে যাবে না। এতে এত প্যাক প্যাকানির দরকার নেই।

রামবাবু বলল গুনে দেকেছি দক্ষিণ ভারতে ষোলোটা এস্পট, পশ্চিম ভারতে তেরোটা। আমার তো মনে হয় সবচে বেটার দক্ষিণ ভারত। জায়গাগুলোতে কেউ যায়নি অবিশ্যি পুরীটা ধোরো না।

এইভাবেই 'সমগ্র দক্ষিণ ভারত' ঠিক হয়। প্রথমে দু'হাজার টাকা করে বুকিং ফি, যাত্রার দিন ফুল পেমেন্ট।

বাজারের কুড়ি জন প্রথমে আগ্রহ দেখিয়েছিল। নিজেরাই বলাবলি করছিল বাজারটাই উঠে যাবে। রামবাবু ডান হাতটা বাড়িয়ে হাতের পাঁচ আঙুল জুড়ে কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক বানিয়ে সামনে ধরল। গুরুদেবরা এ ভাবেই অভয় দান করেন। হাতটা সামনে বাড়িয়ে বলল— আরে যারা নাচছে তার অর্ধেকও যাবে না। টাকা দেবার সময় নানা ভ্যানতাড়া করে যাবে না— বলে দিলুম। শেষ অবধি তাই হয়েছিল। দশজন বুকিং করেছিল। সবাই ব্যাটাছেলে। বাকি যারা এই দলে, তাঁদের কেউ কেউ বুকিং করেছিল সিঁথির সার্কাস মাঠের শিল্প মেলায়, ওখানে দেশ-বিদেশ একটা স্টল দিয়েছিল। কেউ বুকিং করেছিল বরাহনগর উৎসবে। দক্ষিণভারত ভ্রমণের বাসটা ছেড়েছিল ডানলপ থেকে রাত্তিরে। এ বছর শীতটা যাব যাব করেও যাচ্ছিল না। পরদিন সকালে পুরী। বাস টার্মিনাসের কাছেই একটা হোটেল। ধর্মশালার মতোই লম্বা বারান্দা আর একটা করে খুপরি ঘর। কয়েকজন বিরক্তি দেখাল। ম্যানেজার বলল, একটা তো রাত। এখন স্নান করে জগন্নাথ দর্শন, বিকেলে সি বিচ। ম্যানেজ করে নিন স্যারেরা। হই হই করে কেটে যাবে। স্নানটান করে একজন পান্ডা হাজির হয়ে গেছে। বলে দিল চামড়ার বেল্ট, মোবাইল, চামড়ার ব্যাগ সব ঘরে রেখে দাও। উঠোনে সব জড়ো হল। পরিচয় পর্ব।

আমি ট্যুর ম্যানেজার পল্টু ব্যানার্জি। ষোলো বছর এ লাইনে কাজ করছি। এই দেশ বিদেশ সংস্থায় নতুন জয়েন করেছি। ফোনে কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ রাখি। যার যা অসুবিধা আমাকে বলবেন। এই গাড়ির নম্বরটা সবাই নোট করে নেবেন। আর বাসের নামটা তো জানেন— মুনমুন। আমার বলা শেষ। আপনারা একে একে নিজেদের পরিচয় দিন।

কমবয়সি ছেলেটাই প্রথমে শুরু করল। আমার নাম ঝংকার। আমি মাস কম্যুনিকেশন নিয়ে এমএ পড়ি। এই যে আমার বাবা শ্রীবিলাসচন্দ্র শীল, মা আলপনা শীল।

—আমি সজল মিত্র। আমি আবৃত্তি শেখাই, এলআইসি'র এজেন্ট। মাকে নিয়ে এসেছি।

—জয় জগন্নাথ। আমি কৃপাসিন্ধু রথ। আমি তিনপুরুষ ধরি কিরি এই বরাহনগরে অছি। পূজা কাজ করি। বাজারের সবাইকে ফুল চন্দন, মঙ্গল তিলক দি। দোকানে দোকানে সব্বু দেব-দেবীর ছবিতে পুষ্পমাল্য দি। যার যেমন লাগে। কালীর ছবিতে জবা, শিবের ছবিতে আকন্দ, কৃষ্ণ-নারায়ণের যে কোনও মালা— এই সবই। আমার কোথাও বেড়ানো হয় না। বাজারের প্রেসিডেন্ট রামবাবু বললেন, চলুন ঠাকুরমশাই, ক'দিন ঘুরে আসি, সবাই যাচ্ছি। আমি বললাম, আমি গেলে পূজা-অর্চনা কী হবে? শনি পূজাও করি। উনি বললেন, কিছু একটা বেবস্থা করুন। আমার ভাইপোটার চাকরি চলে গেছে, কিন্তু এই কাজ জানে। ওকে বললাম। ব্রাহ্মণীকেও নিয়ে আসিচি আইজ্ঞা। সব্বু প্রভুর ইচ্ছা।

—আমি ভাই সুধীর মজুমদার। বাপছেলে এসেছি। স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে বাইশ বছর হয়ে গেল। রিটায়ার করেছি ছ'বছর। এই আমার ছেলে। অপরূপ। একটু সরল প্রকৃতির ছেলে। আপনারা ওকে একটু দেখবেন ভাই।

The West Bengal State Handicrafts Co-Operative Society Limited

(Under Joint Management of Central & WB Govt.)

- Head Office : BANGASREE BHAVAN, 4D/23/1 DHARMATALA ROAD, PO- TILJALA, PS- KASBA NEW, KOLKATA- 700039, WEST BENGAL, INDIA
- Phone : +91 33 2343 1935/1965
- E-mail : bangasree.hqwb@gmail.com

The institution that representing the whole Bengal under a roof. In was established in the year 1973 with the objective of offering marketing, design and technology support on the Primary Handicrafts Co-operative Socities, S.S.I. Units, weavers co-op societies & weavers. The Marketing Outlets of the Society is known in the Trade name as "Bangasree".

Goddess Durga with her family made up by brass metal called Dokra, this product with its beautiful carving will blend well with the modern interiors of your house. Add this beautiful product in your home decor collection so as to enhance the overall look of your living space.

Exclusive handloom saree Tangail, Murshidabad Silk, Baluchuri, Dhakai which representing whole Bengal specially Santipur, Fulia, Begampur, Murshidabad, Bardwan.

15% Discount
Form 01-09-2020
To 30-11-2020

Our Showrooms is at:-

State	City	Complete Address with contract No. of the Retail outlets
Gujrat	BANGASREE Ahmedabad	Ashram Road, Bhagabati Chember (Opp. Gujrat Vidyapith), Ahmedabad 380014, Land-line: 079-27543843
Andhra Pradesh	BANGASREE Secunderabad	94, Sarojini Devi Road, Minarva Complex, Secunderabad-500003 Land-line: 040-42010434
Orissa	BANGASREE Cuttack	Baxibazar Market Complex, First Floor, Cuttack- 753001
West Bengal	BANGASREE Durgapur	Benachiti Market, Nachan Road, Durgapur- 7132132 Land-line: 0343-2586583
West Bengal	BANGASREE Haldia	Durgachak Super Market, Stall No. C-9 & C-10, P.O. Durgachak, Haldia, Purba Medinipur, PIN- 721602, Land-line: 03224-276959
West Bengal	BANGASREE Jhargram	Jhargram Main Road, P.O. Jhargram, Paschim Medinipur, PIN-721507, Land-line: 03221-259487
West Bengal	BANGASREE Contai	Hataban Market Complex, Stall No. HAC 19, 20 & 21, Purba Medinipur PIN- 721401, Land-line: 03220-256789
West Bengal	BANGASREE Shyambazar	22-A, Bhupen Bose Avenue, Shyambazar, Kolkata-700004 Land-line: 033-2530-0031
West Bengal	BANGASREE Dhakuria	15, Gariahat Road (South), P.O. Dhakuria, Kolkata-700031 Land-line: 033-40068965
[illegible]	[illegible] Behala	[illegible] Super Market, [illegible] 4971

—আমি দাদা গান্ধীকুমার দাস কী করব বলুন আমার দাদু আমার নাম রেখে দিয়েছিল গান্ধী। শুধু গান্ধী ভালো শোনায় না বলে ইস্কুলে ভর্তির সময় বাবা গান্ধীকুমার করে দিল, যেমন স্বপনকুমার, তপনকুমার হয় আরকী। ইংলিশে জিএএনডিএইচআই লিখতে হয় তো, তাই গন্ধীও হয়। আমার নাম তো গান্ধী হতে পারে ভাবেনি, তাই ম্যানেজারবাবু মিস্টার গন্ধীকুমার ডাকছিলেন। আমি বাজারে বরফ সাপ্লাই করি। বরফ কল থেকে ভ্যানে করে নিয়ে আসি। মাছে লাগে। সকালে বরফটা এনে তারপর মাছের মাথা থেকে মটরদানা তুলেনি, ওটা আবার ওদের সাপ্লাই করি। মটরদানা মানে পিটুইটারি নামে একটা দানা। মাছের হিট করাতে লাগে। কৃত্তিম প্রজনন। আমি এখনও ব্যাচেলার। দাদারা বলল চ গান্ধী, তাই চলে এলাম।

—আমি চন্নন মল্লিক— মানে চন্দন মল্লিক। কলকাতার পুরনো লোক। মল্লিক ফ্যামিলি। রণজিৎ মল্লিক, কোয়েল মল্লিক সব এক বংশের। আমার ওয়াইফ আশালতা মল্লিক এককালে রেডিও আর্টিস্ট ছিল। আশালতা, তুমি কই গো?

—আজ্ঞে, আমার নাম সদানন্দ ভুরি। এই ভুঁড়ির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই কিন্তু। ওই যে মল্লিকবাবুরা যেমন বললে খানদানি বংশের লোক, আমরা তারও আগে থেকে খানদানি বংশ। ভুরসুট রাজ্যের নাম শুনেচেন আপনারা? বেদে আছে। হাওড়া জেলায় ছেলো। ভুরসুটের রানি ছেলো রানি ভবশঙ্করী। আকবর বাদশার কাছ থেকে রায়বাঘিনী উপাধি পেইচিলেন। সেই ভুরসুটের রাজা-রানিরা আমাদের খাতির করতেন। আমরা বিজনেস করতাম। ওরা আমাদের ভুরিশ্রেষ্ঠী উপাধি দিইচিলেন। শ্রেষ্ঠী মানে হল গে বিজনেস ম্যান। এতবড় কথা লোকের কইতে কষ্ট হত বলে ছোট করে ভুরি বলত। ইংলিশে লিখতে গেলে কিন্তু বিএইচইউআরআই। আমাদের এককালে নিজস্ব সওদাগরি নৌকো ছিল। ফরিদপুর বরিশাল এসব বাঙাল দেশ থেকে চাল, খটুয়া দেশ থেকে ছোলা কড়াই এসব ডালের আনা নেওয়া করা হতো। একুনো সেই চালডালের বিজনেসই করচি বরানগর বাজারে। আমার দুই ছেলের কারুর কিন্তু ভুঁড়ি নেই। একদম পেটানো বডি, ওরা দোকানে বসে না কেউ। চাগরি করে...

—ঠিক আছে ঠিক আছে বুঝে গিয়েছি... ম্যানেজার সদানন্দকে থামিয়ে দেয়।

...এবার নেক্সট।

—আমি স্যার নিমাই পাল। মাছ। ব্যাস, আর কী বলব!

—আমি আলোছায়া। ইনি জগন্নাথ প্রামাণিক। ব্যাস হয়ে গেল। আর ডিটেল বলতে যাব কেন?

আমি কিন্তু মোসলমান। মানে মোসলমান ঘরে জন্ম। আমার নাম মতিউর রহমান। মতি বলেই বাজারের সবাই ডাকে। আমার মাংসর দোকান। আমার বাবাই দোকানটা করেছিলেন। সব বন্ধুরা বলল— চল মতি, ঘুরে আসি। আমি বললাম, বালবাচ্চা ছাড়া বেড়াতে ভালো লাগে? ওরা বলল, আমরা কেউ বউ-বাচ্চা নেব না। খুব ঝামেলা। ওরা সবাই আমাকে খুব ভালোবাসে। খুব করে বলল চ'মতি চ। আমি বললাম, আমি তো মোসলমান..., ওরা বলল, তোর অসুবিধা আছে? আমার কী তকলিফ আছে? কিছু নেই তুমাদের... তো নাই? ওরা বলে তা হলে তোকে বলতাম? এই হল ব্যাপার। চলে এলাম স্যার। ওরা বলে তোকে দেখে একদম মোসলমান লাগে না। ঠিক বাত। কাউকেই দেখে তার ধরম বুঝা যায় না। তবে হাঁ, আমি আমার বাবার মতো নামাজি না। মাঝে মাঝে যখন মনের ইচ্ছা হয় নামাজটা পড়ি। আর বিসমিল্লা বলে জবাইটা করি। এইটুকু। তাই বলে আমি কিন্তু পুরীর মন্দিরে ঢুকব না। আমার গালে দাড়ি-নুর নাই, মাথায় টুপি নাই, ফুল প্যান্ট শার্ট গিঞ্জি। দেখে কেউ কিছু মালুম পাবে না। কিন্তু আমি জানি পুরীর মন্দিরে লিখা আছে হিন্দু ছাড়া কেউ ঢুকবে না। আমি কেন ঢুকতে যাব।

এমনি করে সবার শেষে সুশীলবাবু বলল— আমি সুশীলচন্দ্র রায়। কী আর বলব। আমার স্ত্রীর নাম অণিমা। এই আমাদের মেয়ে সুনেত্রা। বিএসসি পড়ছে, ম্যাথমেটিক্স অনার্স নিয়ে। খুব ভালো গান গায়। কবিতা আবৃত্তিও করে। অনেক প্রাইজ পেয়েছে।

মেয়েটা তখন ওর বাবার জামা টেনে ধরে। ও বাবা থামো না...।

সুশীল বলতে থাকে আসলে মেয়েটার জন্যই আমাদের এই বেড়াতে আসা। আমাদের মেয়েটাকে ভগবান এই খুঁতটুকু দিয়েছেন, কী করব? কিন্তু মেয়ে আমাদের খুব গুণের।

মেয়েটি আবার বলে, একটু উঁচু স্বরে বলে— উঃ কী হচ্ছে, বলছি থামো।

মেয়েটিকে দেখেছে সবাই। একটু চুপচাপই থাকে। ওর বাবা কিংবা মায়ের হাত ধরে হাঁটে অনেক সময়। পুরীর মন্দিরে, সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ওর বাবা হাত ধরে টেনে তুলছিল। শিশুদের যেমন করে তুলতে হয়। শিশুদের কাছে সিঁড়ির ধাপগুলো বড় উঁচু উঁচু। এই মেয়েটিরও পা দুটো বেশ ছোট। মেয়েটি বামন। ইংরেজিতে যাদের বলে ডোয়ার্ফ।

সুনু ছোটবেলায় বেশ ছটফটে ছিল। শীতের রোদে উঠোনে অয়েলক্লথে শুয়ে শুয়ে কী সুন্দর নিমগাছের উঁচু ডালটাকে, আকাশের মেঘটাকে ও লাথি মারত। উথাল পাথাল দুই হাত। উপুড় হল ঠিক সময়ে। হামাগুড়ি দিত গোটা বারান্দা। সুশীলের মা তখন বেঁচে। বলত তোর মেয়ে হবে দপদপানি। তোর মেয়ে হবে পাড়াবেড়ানি। যখন হাঁটি হাঁটি পা-পা করে টাল মাটাল হাঁটতে হাঁটতে টেবিলের ঢাকনা টেনে ফেলে দিত, টেবিলে রাখা জিনিসপত্র পড়ে যেত। হাত দিয়ে একদিন মাকড়সা ধরেছিল। সুশীল বলত মেয়ে তো নয় ঝানসি কা রানি। সুশীলের বউ অণিমা তখন স্কুলে পড়া ইতিহাসের বইয়ের ঘোড়ায় চড়া তরোয়াল হাতে ঝাঁসির রানির ছবিটা দেখতে পায়। কার সঙ্গে যেন যুদ্ধ করেছিল ঝাঁসির রানি? মোগলদের সঙ্গে নাকি ইংরেজদের সঙ্গে ঠিক মনে নেই। তবে বেশ সাহসী ছিল। পরীক্ষাতেও বোধহয় এসেছিল একবার। কী লিখেছিল এখন আর মনে পড়ে না। লক্ষ্মীবাঈ, লক্ষ্মীবাঈ। রানির নামটা মনে পড়েছে। লক্ষ্মীরা তো শান্তশিষ্ট মেয়ে হয়। চুপ করে থাকা মেয়ে হয়। সংসারের কাজ করে যাওয়া, স্বামীর সেবা করে যাওয়া, শাশুড়ি-ননদের মুখে মুখে তর্ক না করা মেয়ে হয়। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ তো ও'রম ছিল না। মেয়ে যেন সত্যিই ঝাঁসির রানি হয়। কিংবা ইন্দিরা গান্ধী। আর কে কে সাহসী নারী আছে ভাবছিল অণিমা। তখন তো রানি রাসমণি সিরিয়ালটা ছিল না। তাই রাসমণির নামটা মনে আসেনি। সুনুর জন্ম ১৯৯৯ সালে। ততদিনে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হয়ে গেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম লোকে জানে, তবে উনি যে মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন কেউ ভাবেনি। আরও সাহসী মেয়ের কথা ভাবতে গিয়ে মাতঙ্গিনী হাজরার কথা মনে পড়েছিল। কিন্তু মাতঙ্গিনী নামটা আজকাল আর চলে
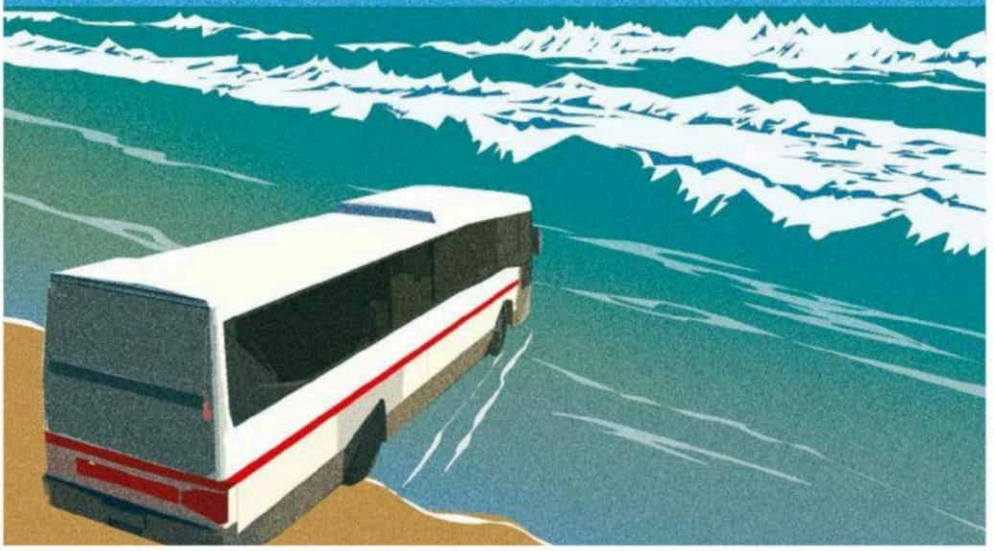
না। সবাই বলেছিল মেয়ের চোখ দুটো খুব সুন্দর। তাই সুনেত্রাই রাখা হয়েছিল। সবাই সুনু বলেই ডাকত। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত তোমার নাম কী ও ছুনু না বলে বলত ছু। রাস্তায় যখন কেউ কুকুরদের বলত ছু-ছু-ছু, মেয়েটা খুশি হতো। হাসত। ভাবত ওর নাম বলছে। সব ছেলে মেয়েরা যেভাবে বড় হয়, সুনেত্রাও তেমনই বড় হচ্ছিল হাত ঘুরোলে নাড়ু দেব করেছিল, আয়রে পাখি লেজ ঝোলা করেছিল, অ-অজগর করেছিল, ব্যা ব্যা ব্ল্যাকশিপও। নার্সারিতে ভর্তি করে দিয়েছিল মেয়েকে। ওখানে ছোট্ট মাঠে দোলনা ছিল, ছোট্ট মাঠটায় একটা ঢেকুচকুচও ছিল। তুরুক করে লাফিয়ে উঠে যেত ওটায়। বলত ঢে কুচুকুচু ঢে কুচুকুচু তুই ছোট আমি উঁচু। তখন তো কিচ্ছুটি বোঝা যায়নি। তবে কেউ কেউ বলত শরীরের তুলনায় মাথাটা বড় লাগছে। মাথা বড় হওয়া তো ভালো। বুদ্ধি হয় বেশি। বিদ্যাসাগরমশাইয়ের মাথাটা বড় ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ-এর মাথাটা বড় ছিল কিনা কে জানে? সুশীল দেখে মেয়ে দিব্যি মাথা দুলিয়ে পড়ছে ব্যা ব্যা ব্ল্যাকশিপ হ্যাভ ইউ এনি উল? বইতে কালো রঙের একটা ভেড়াও ছিল। সুশীল ওর মেয়েকে সত্যিকারের ভেড়া দেখাতে পারেনি অনেকদিন, কিন্তু টুইংকিল টুইংকিল লিটল স্টার দেখিয়েছিল, আকাশে সিক্কি সিক্কি মুন দেখিয়েছিল, হুইলস্ অন দ্যা বাস গো রাউন্ড গো রাউন্ড দেখিয়েছে, কিন্তু সত্যিকারের ব্যা ব্যা ব্ল্যাকশিপ দেখাতে পারেনি। একদিন ওর অফিসের মালিক বলল— আমরা বুঝে গেছি আপনিই ব্ল্যাকশিপ। আপনি আমাদের সিক্রেট লিক করে দিয়েছেন। সুশীল ওদের হিসেবের খাতা লিখত। অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক। এটা একটা পার্টনারশিপের ব্যবসা ছিল। এক মাড়োয়ারির সঙ্গে। চিৎপুর রেল ইয়ার্ডে মার্বেল এবং অন্যান্য পাথর আসে, উল্টোডাঙার গুদামে যায়। সুশীলের কাজ ব্যাঙ্কের কাজকর্ম করা। চালান ইত্যাদি এন্ট্রি করে অ্যাকাউনট্যান্ট সাহেবকে দেয়।

মাড়োয়ারি পার্টনার একদিন খাতাপত্রগুলো দেখে খুব হম্বিতম্বি করেছিল। এরপর একদিন ইনকাম ট্যাক্সের লোকজন আসে। কোনওভাবে ম্যানেজ করেছিল হয়তো। বেশ কিছু গচ্চা গিয়েছিল। কিন্তু ভিতরের কথা বাইরে যাচ্ছে কী করে— এই সন্দেহটা কেন সুশীলের উপরই পড়ল সুশীল জানে না। 'আপনিই তাহলে ব্ল্যাকশিপ' বলার দিন দশেকের মধ্যেই মালিক বলল, এই মাসের মাইনেটা নিয়ে আর আসতে হবে না। চাকরি চলে গেল।

মেয়ে পড়ে ব্যা-ব্যা ব্ল্যাকশিপ। সুশীল শোনে বা-বা ব্ল্যাকশিপ। ব্ল্যাকশিপের অন্য একটা মানে আছে সেটা ডিকসেনারি দেখে জেনে নিয়েছিল সুশীল। 'নিন্দার যোগ্য', 'নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তি বিশেষ', 'চিহ্নিত'। এই পাইওনিয়ার মার্বেল-এর দশ বছরের চাকরিটা চলে গেল। ওর শরীরের কালো কালো লোম বেরচ্ছে— অনুভব করতে পারে সুশীল। বাবা ব্ল্যাকশিপ হ্যাভ ইউ এনি উল? হ্যাঁরে মেয়ে, হ্যাঁরে মেয়ে করিসনি তো ভুল। এইতো আমার গা থেকে কালো কালো রোঁয়া বেরিয়েছে। আমি ব্ল্যাকশিপ।

চাকরিটা চলে গিয়েছিল, সুনুর বয়েস তখন ছয়। দশ বছরের চাকরি। এর আগে এই মার্বেল লাইনেই চাকরি করেছে। উল্টোডাঙারই অন্য কোনও গুদামে। আসলে, মার্বেল লাইনে ও ঢুকেছিল মার্বেল বিক্রি করতে এসে। ওদের বাড়ির মার্বেল। পূর্ব পুরুষের শখের মার্বেল। সুশীলের বাবার নাম কপিলচন্দ্র। ধনী বাড়ির গরিব ছেলে। কপিলের বাবার নাম ছিল ভৈরবচন্দ্র। মানে, তিনি সুশীলচন্দ্রের পিতামহ। ভৈরবচন্দ্রের বিরাট ছবিটা যাদের ভাগে আছে, ওরা ওটা দিয়ে এখন বেড়াল আটকায়। ভেঙে যাওয়া কপাট খোলা জানলায় ছবিটা ফিট করে রেখেছে।

ভাগাভাগির জটিল অঙ্কে সুশীল শেষ অবধি বাইরের বাড়ির বারান্দাসমেত দুটি ঘর পায়। এবং ফাউ হিসেবে শ্বেতপাথরের দুটি টেবিলও জুটে যায়। ঘর ও বারান্দা ছিল শ্বেত পাথরের।

সুশীলচন্দ্রের বাবা কোনও চাকরি বাকরি করতেন না। ব্যবসাও নয়। অলস প্রকৃতির লোক। এমনিতেই রায় বাড়ির ছেলেদের চাকরি করার চল ছিল না। কেন অন্যের অধীনে কাজ করবে রায় বংশের ছেলে? নিজের অংশের যা ছিল বেচেবুচে দিয়েছিল। বাকি যা ছিল তা ছেলেদের মধ্যে ভাগ হয়, এবং সুশীল এটুকুই পেয়েছিল।

সুশীল বিকম পাশ করেছিল। ওর লেখাপড়ার ব্যাপারে তেমন উৎসাহ দেখায়নি ওর বাবা। যেটুকু বিদ্যে এসেছে যেন এমনি এমনি এসেছে, হাওয়া যেমন আসে। কপিলচন্দ্র কখনও বলেনি এটা পড়, ওটা পড়। মাস্টারমশাই রাখেনি। পাড়ার স্কুলে পড়াশুনো। সুশীলও প্রথমদিকে খুব একটা চাকরি বাকরির চেষ্টা করেনি। ভেবেছিল ওটাও এমনি এমনি হয়ে যাবে।

সুশীল ছিল ওর বাবার ছোট ছেলে। বাবার মৃত্যুর পর সুশীলের মা ছোট ছেলের কাছেই থাকলেন। জমানো টাকাও

বেশি ছিল না। সেটা চারভাগ হয়েছিল। মরুব্বিরা বিধান দিয়েছিল মেয়েদের দেওয়া হবে না। তিন ছেলে এবং মা নগদ টাকা পাবে।

এই টাকা দিয়ে চলবে কী করে? সুশীল চাকরি বাকরি খুঁজতে থাকে। টিউশনি করার এলেম ওর ছিল না। এ সময় কেউ একজন বলে তোমাদের শ্বেতপাথরের টেবিলটা কিনতে চাই। যা পাবে তা দিয়ে সানমাইকা বসানো বাদাম কাঠের টেবিল কিনে নাও, হাতে বেশ কিছু টাকা থেকে যাবে। এইভাবে টেবিল দুটো গেল। তারপর ঘরের মেঝের পাথর। এই পাথরগুলি নাকি খুব দামি পাথর ছিল। ধবধবে সাদা মাকরানা পাথর। মানুষের বডি দেখা যেত মেঝেতে, এমন চকচকে। গরমকালে একটা মাদুরও না পেতে পাথরের উপর শুয়ে থাকলে কী ঠান্ডা, কী আরাম। সেই পাথর বিক্রি করতে গিয়েই উল্টোডাঙার পাথরপট্টিতে আলাপ। ম্যানেজার সুশীলের স্কুলেরই ছাত্র। দুটো ঘরের পাথর বেচে লাল সিমেন্টের করে নিল। সুশীলের মা বলেছিল লাল সিমেন্টের ঘরে আর এক রকমের সুখ। কতদিন পর কেমন বাপের বাড়ি বাপের বাড়ি লাগে।

জ্ঞাতিদের মধ্যে যে বলেছিল— কাজটা ভালো করলি না রে, পূর্বপুরুষের পায়ের ধুলো আছে এই পাথরে, রায় বাড়ির পেস্টিজ পাংচার করে দিলি, ছ্যাঃ, সেই জ্ঞাতি ভাইটাই একদিন সুশীলকে ডেকে বলল ভেবে দেকলুম ফালতু সেন্টিমেন্ট রেখে কাজ কী। আমার কারবারে টান পড়েছে, পয়সা ঢালতে হবে। আমুও ভাবচি পাথর বেচে দোবো।

ও জ্যাঠার ছেলে। জ্যাঠাও পাশের ঘরটা ভাগে পেয়েছিল। জ্যাঠার এই ছেলেটা সেটা পেয়ে গেছে। পাথর বেচে দিয়ে ডেকরেটারের বিজনেস করে। ভাঁজ করা হলুদ চেয়ার আর চলে না। ফাইবারের যুগ এসেছে। বউভাতের দিনে নতুন বউ খাটে বসে না সিংহাসনে। সব পাল্টে গেল বড় তাড়াতাড়ি। পুঁজি ঢালতে হবে।

উল্টোডাঙার পাথরপট্টিতে আলাপ গাঢ় হল চাকরিও হয়ে গেল সেই দোকানে। ম্যানেজারই মালিককে বলে চাকরিটা করে দিল। জানা গেল এই ম্যানেজার আর সুশীল একই বছরের উচ্চমাধ্যমিক। আসলে একবছর সিনিয়ার ছিল। সেবার ফেল হওয়ায় পরের বছরে...।

এইভাবে মার্বেল লাইনে ঢোকা। কয়েক বছর পর বেটার চান্স পেয়ে পাইওনিয়ার মার্বেল। ওখানকার চাকরিটা চলে যাবার পর নিজেই বিজনেস করছে। মার্বেল লাইনেরই। কারণ সুশীল এখন জানে কত রকমের মার্বেল আছে। জয়পুরী, মাড়োয়া, মাকরানা, বালুচি, জয়পুরীর মধ্যে ফ্যাসা, ন্যাবা, এসব কমদামি, আবার ভালো পালিস খায় এমন মাকরানা, আবার পালিস মারলেও জেল্লা না খোলা চিমটে মার্বেল, যেমন মানুষের মধ্যেও হয়, যতই দুধ, ঘি মাখন খাওয়াও চিমসেই থাকে। এমনিতে ফকফকে, কিন্তু ভারী জিনিস পড়লে ফেটে যায় এমন জব্বলপুরি মার্বেল— কত রকমের ভেনস হয় মার্বেলে, ব্রাউন, পিংক, হলদে কতরকমের... পাথরটা জেনে গেছে বলে এই লাইনেই ব্যবসাটা করছে সুশীল। এখন নতুন নতুন ফ্ল্যাটবাড়ি উঠছে। ওরা এখন আর মোজাইক চাইছে না। মার্বেল চাইছে। একটা মোটর গ্যারেজের কিছুটা ভাড়া নিয়ে মার্বেলের ব্যবসা করছে সুশীল। 'সিন্ডিকেট' হয়েছে একটা, ওদের সঙ্গে ভাবসাব রেখেই চলে। ডাল-ভাত হয়ে যাচ্ছে। ডাল-ভাত কেন, মাছ-ভাতই হচ্ছে। হপ্তায় একদিন করে বিরিয়ানিও। মেয়েটা ভালোবাসে। মেয়েটা ফল খেতেও ভালোবাসে। ও যখন ছোট ছিল, তখন ভালো খাওয়াদাওয়া দিতে পারেনি, তাই কি ও এমন ছোটখাট হল? এখন মেয়েটার যা শখ, মেটাচ্ছে সুশীল। গানে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল, সাঁতারেও। এই ছোট ছোট পায়ে নাকি ও খুব ভালো সাঁতার দিতে পারে।

মা বড্ড তাগাদা দিচ্ছিল। বিয়ে কর, বিয়ে কর...। চোখ বুঁজলে কে রেঁধে দেবে দুটো ভাত? রায় বাড়িতে আবার অনেকেই বে'থা করে না। রায় বাড়ির ব্যাটাছেলেদের অভ্যেস ভালো না। বেলা ন'টা-সাড়ে ন'টায় ঘুম থেকে ওঠে ওরা, বাসিমুখে চা খায়। মুড়ি, ফুলুরি ব্রেকফাস্ট। পাজামা হাওয়াই শার্ট পরে আড্ডায় যায়। বিয়ে না করা ওরকম টাইপের অনেকেই সোনাগাছি যায়টায়। সুশীলের এক জ্যাঠা একটা খারাপ রোগ বাঁধিয়েছিল। সুশীলের মায়ের ওই চিন্তাটাই ছিল খুব, যদিও বিশ্বাস ছিল ওর সুশীল ওরকম নয়। বউ আনা হল ঘরে। মার্বেলে চাকরি করে তখন। সেটা ফাল্গুন। দুধ-সাদা বারান্দায় বসে কথাবার্তা। বৈশাখে বিয়ে। তদ্দিনে বারান্দাটাও লাল সিমেন্ট হয়ে গেছে। বিয়েতে কিছু খরচপাতি তো আছে। জর্দা পোলাও আর পাঁঠার কোর্মা খাওয়াতেই হয়। সুশীলের মা মেয়ে বাড়ি থেকে কিছু পণ চেয়ে নিয়েছিল। বলেছিল, বড় বাড়ি আমাদের। রায়বংশ, এখন না হয় পড়তি, কিন্তু বাড়ির মাথায় একুনো সিংহ আছে।

মেয়ের নার্সারির পড়া শেষ হলে মেয়েকে আবার ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করানোর সাহস পায়নি। সারদা বিদ্যাপীঠে ভর্তি করিয়েছিল। মেয়ের যখন ফাইব-সিক্স, তখনই মনে হচ্ছিল মেয়ে যেন লম্বা হচ্ছে না। মনে হচ্ছিল পা দুটো যেন ছোট। হাতও কি ছোট? স্কুলে ওকে ফার্স্ট বেঞ্চিতে বসানো হয়েছিল। পড়াশুনোয় ভালো বলে ততটা নয়, যতটা বেঁটে বলে। সুশীল নিজে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। পাঁচফুট আট ইঞ্চি হাইটকে বাঙালিরা লম্বাই বলে। অণিমা পাঁচফুট তিন ইঞ্চি। ওদের মেয়ে বেঁটে হওয়াটা বেশ অস্বাভাবিক। সবাই বলত চিন্তা কোরো না, লম্বা হয়ে যাবে। সুশীলের মা বলল কিছু ভাবিসনে, কুঁড়ি যখন কয় কথা, তরতরিয়ে বাড়ে লতা। অপরাজিতার লতা দেখনা, কুঁড়ি যেই না আসতে লাগে, লতা তখন বাড়ে। কুন্দ, মাধবী সব। আমাদের সুনুও লম্বা হবে। যৈবনের ফুল ফুটতে দে...। আস্তে আস্তে একটু একটু যৌবনের লক্ষণ এল। মেয়ে কিন্তু লম্বা হল না।

সুশীলের মা দুই চোখ বুঁজল। মা দেখে যেতে পারেনি সুনুর শরীরের ফুল। অণিমা একদিন আলমারির শাড়ি কাপড় বাছাবাছি করছিল। একটা নতুন কোরা কাপড় পেল। মায়ের রেখে যাওয়া। নতুন কাপড়টা ছিঁড়ছিল অণিমা। ওর মুখে কেমন একটা লালচে আভা। বিকেলের সূর্যের আলো মুখে পড়লে যেমন হয়। দুঃখ আর আনন্দ মিশে থাকা। যেন কিশোরবেলা। পয়সা শেষ, চারটে ফুচকা খাওয়া হয়ে গেছে, তারপর শালপাতায় একটু টকজল ফাউ পেলে যে আনন্দ হয়, দুঃখর উপর একটা আনন্দের পর্দা, ওরকম যেন ওর মুখ। জিজ্ঞাসা মেশানো দৃষ্টিতে তাকালে অণিমা বলেছিল— সুনুর আজ ইয়েটা শুরু হল। প্রথমবার নতুন কাপড় দিতে হয়। তারপর তো প্যাকেটের জিনিস আনতে হবে। আজকালকার মেয়ে কিনা, খরচ বাড়ল। কুঁড়ি যখন কইল কথা তরতরিয়ে বাড়ল লতা— মিলল না গো মিলল না।

বছর তিনেক আগে জ্বর হয়েছিল সুনুর, হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। হোমিওতে খরচাপাতি

কিছুটা কম হয়। ডাক্তার কিন্তু বলেছিল বডিটা একটু কেমন ডিসপ্রোপরশনেট লাগছে। আপনারা বুঝছেন না? সুশীল বলেছিল— হ্যাঁ, এরকম মনে হচ্ছে, কিন্তু সবাই বলছিল আর একটু বড় হলেই....। ডাক্তারবাবু দাঁড় করিয়ে ওজন আর উচ্চতা নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, হাইট চারফুট তিন ইঞ্চি। ওজন সাড়ে আঠাশ কেজি। হাইট অনুযায়ী ওজন ঠিকই আছে। তখন ওর এগারো বছর বয়েস ছিল। ডাক্তারবাবু একটা বই খুলে বলেছিলেন— ওর এই বয়সে চার ফুট দশ ইঞ্চি হওয়া উচিত ছিল। আপনি তো লম্বা লোক।

আপনার স্ত্রীর হাইট কত?

সুশীলের তখন মনে পড়েনি অণিমার উচ্চতা, উঠে দাঁড়িয়ে কাঁধের একটু উপরে। কানের লতির তলায় হাত রেখে বলেছিল আমার এখানে পড়ে।

—তাহলে তো লম্বাই।

ডাক্তারবাবু একটা বই খুলে টাক চুলকে সুনেত্রাকে দেখলেন। বললেন, তোমার শ্বাস নিতে কষ্ট হয় মা?

সুনেত্রা বলল— না তো।

খেলাধুলো করো?

এক্কাদোক্কা, স্কিপিং...।

ভালো স্কিপিং ভালো। লম্বা হয়। শ্বাসকষ্ট নেই তো?

না।

উঠে দাঁড়াও তো...।

বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়েছিলেন সুনেত্রার দিকে।

তারপর বললেন— আপনারা আগে বোঝেননি?

দেখছেন না হাঁটুর কতটা উপরে ওর হাত। মেয়েটি তো ডোয়ার্ফ।

সুশীল তাকিয়েছিল। হাঁ করেই।

হোমিওডাক্তার সুশীলকে বাইরে নিয়ে বলেছিল ডোয়ার্ফ বোঝেন না। বামন। সার্কাসে দেখেননি ক্লাউন?

তাহলে কী হবে? সুশীল অসহায়ভাবে জিজ্ঞাসা করে।

হোমিওডাক্তার বলেন— আমাদের খুব ভালো ওষুধ আছে হোমিওপ্যাথিতে। কাল আসুন, আমি ভেবেচিন্তে একটা ওষুধ সিলেক্ট করে রাখব।

হোমিও চিকিৎসা চলতে লাগল। সপ্তাহে একদিন করে জল ওষুধ, আর রোজ দু'বার করে বড়ি ওষুধ। কিছুদিন পর পরই। ফিতে দিয়ে মাপত। ফিতেটা টানটান করে একটু কম হয়, ঢিলে দিলে বেশি। টানটান মাপত না সুশীল। বিশেষ কিন্তু তফাৎ বুঝতে পারতো না। ছ'মাস পরে নিয়ে যেতে বলেছিলেন ডাক্তার। ডাক্তার মেপে বললেন, এইতো চার-চার হয়েছে। এক ইঞ্চি বেড়েছে তো গত ছ'মাসে। ওষুধে কাজ হচ্ছে।

চলতে লাগল হোমিও ওষুধ। কিন্তু কেমন যেন মনে হতো। গলাটা ছোট লাগছে। পা কি একটু বেঁকা মতো? অণিমা বলল— হোমিওপ্যাথিতে ঠিক কাজ হচ্ছে না গো। মেয়েসন্তান বলে কথা। বিয়ে দেবো কী করে? ভাবতে পারছি না আমাদের সন্তান মেয়ে জোকার হবে? বড় কোনও ডাক্তারের কাছে চল।

ভালো করেই বুঝতে পারছে ও খুঁতো মেয়ে। স্কুলে কেউ কেউ ওকে টুরটুরি বলে ডাকে। ক্লাস টিচার বাণীদি জেনেছিলেন ব্যাপারটা। ক্লাসে বলেছিলেন— সবাই শুনে রাখো বেঁটে বা লম্বা হওয়া কোনও মানুষের দোষ কিংবা গুণ নয়। ফর্সা-কালো হওয়া কোনও দোষ বা গুণ নয়। কেউ যদি সুনেত্রার হাইট নিয়ে কিছু আজেবাজে বলো বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দেব। তারপর সুনেত্রাকে টিচারস রুমে নিয়ে গিয়েছিলেন ক্লাশ টিচার বাণীদি। বলেছিলেন তুমি তো ক্লাশে ভালোই রেজাল্ট করো। ফোর্থ-ফিফথ্ এরকম থাকো, তাই তো? আরও ভালো করে পড়াশুনো করো। ফার্স্ট-সেকেন্ড হও। ওদের দেখিয়ে দাও বেঁটে-লম্বা কিচ্ছু নয়। আমি তো বাংলা পড়াই, ছুটির পরে টিচার্স রুমে এলে আমি মাঝে মাঝে তোমাকে পড়িয়ে দেব। সত্যিই আলাদা করে পড়াত বাণীদি। কী সুন্দর করে ব্যাকরণ বোঝাতেন, আর বলতেন রচনা বই থেকে নয়, তুমি এক্কেবারে তোমার নিজের মতো ভেবে লিখবে। এইতো, এখন শরৎকাল। আমাদের ইস্কুলের মাঠের পুবদিকে পাঁচিলের পাশে দেখেছ কাশফুলের ঝোপ? পুজোর ছুটি পাবে, ঠাকুর দেখবে— এইসব, একদম নিজের মতো করে লিখে দেখাও তো?

হোমিওপ্যাথিই চলছিল। কিছুদিন পর পরই সুশীল মেয়েকে মাপত। বাড়ছিল না বলে মন খারাপ করত। ওদের বাড়ির সবচেয়ে বয়স্ক যিনি বেঁচে ছিলেন, উনি সুশীলের এক জ্যাঠা। উনি বলেছিলেন, মন খারাপ করিস না, এই যে বামন মেয়ে, জেনে রাখ এ হল তোর লক্ষ্মী। আমাদের এক পূর্বপুরুষ দিনেমারদের কল্যাণেই পয়সাকড়ি করেছিল। শোনা কথা, আমাদের ঠাকুরদার ঠাকুরদা কিংবা তার বাবা ডাচ কুঠিতে কাজ করত। কোথা থেকে পর্তুগিজরা ধরে নাকি ডাচদের বেচে দিয়েছিল। আমাদের আদি দেশ কোথায় ছিল জানা নেই। আমার ঠাকুরদা বলতেন আমরা নাকি কচ্ছপ গোত্র। আমার বাবার আমল থেকে আমরা কাশ্যপ গোত্র হয়েছি। আমার ঠাকুরদার বাবা, যাকে ভালো কথায় বলে প্রপিতামহ, তিনিই এইসব সম্পত্তি করেছিলেন। তিনি হলেন, বটুকচন্দ্র। মহালয়ার দিনে তিল-জল দান করার সময় তাঁদের নাম গোত্তর বলতে হয়। বটুকচন্দ্রের স্ত্রী, যাকে প্রপিতামহী বলে, তিনি ছিলেন এরকম ছোট হাইটের মানে বামন। কিন্তু শুনিচি লক্ষ্মীদেবী তাঁকে কোজাগরী পূর্ণিমার আগের রাতে স্বপন দিলেন যে ভোরবেলায় গঙ্গায় ভাটার টানে একটা কাঠের পিপে ভেসে যাবে। আমি সেখানে অবস্থান করব। ভোরবেলা সূয্যি ওঠার আগে উনি গঙ্গার পাড়ে গিয়ে দেখলেন সত্যই একটা কাঠের পিপে ভেসে যাচ্ছে। পাড় থেকে বেশি দূরেও নয়। উনি ঝাঁপিয়ে পড়ে পিপেটা নিয়ে আসেন। ছোট্ট শরীরটা পিপের আড়ালে ছিল। কেউ দেখতে পায়নি। ঢাকা খুলে দেখে ওতে অনেক মোহর। সেই কাঠের পিপেটাকেই লক্ষ্মী মেনে আমাদের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো হতো। হাতিবাগানে বোমা পড়ল, তারপর কলেরার মারি হল, তখন বাড়ির অনেকে এদিক-ওদিক চলে যায়। তারপর থেকেই রায় বংশের লক্ষ্মী চলে যায়। সেই বামনলক্ষ্মীর জন্যই আমাদের এইসব বাড়ি ঘরদোর। সেই মোহরকে পুজ্যি করে বটুকচন্দ্র ব্যবসাপাতি শুরু করে। বড় বড় নৌকো কেনে। সাহেব-সুবোদের সঙ্গে বিজনেস করে। রায় উপাধি পেয়ে যায়। এর আগে আমরা কী ছিলাম, কোন জাত ছিলাম, কিছুই জানি না। এই বরানগরই আমাদের দেশ। এখানে নল ঘাসের জঙ্গল ছিল। এখানে অনেক ময়ূর ঘুরে বেড়াত। ময়ূরের অপর নাম বরহা। রানি রাসমণি জানবাজার থেকে এই পাড়া দিয়েই দক্ষিণেশ্বর যাতায়াত করতেন। শুনিচি আমাদের লক্ষ্মী ঠাকুরানি রানিকে আর তাদের লোকজনকে জল মণ্ডা বাতাসা খাওয়াতেন। সেই লক্ষ্মীঠাকুরানি আবার ফিরে এলেন তোর ঘরে।

তোর উন্নতি হবে, দেখে নিস। এই গপ্পের কিছুটা শুনেছিল সুশীল ওর বাবার মুখে। সেই ছোটবেলায়। এসব বেঁটে লক্ষ্মী

এ যুগে হয় নাকি?

সুশীল সুনেত্রাকে নিয়ে এক বড় ডাক্তারের কাছে গেল। বিলিতি ডিগ্রিওলা। এই ডাক্তারের খোঁজ দিয়েছিল ওর অঙ্ক দিদিমণি।

ডাক্তার অনেকরকম রক্ত পরীক্ষা করতে বললেন। করা হল। জিজ্ঞাসা করেছিলেন বংশে কেউ ডোয়ার্ফ, মানে এরকম বেঁটেখাট ছিল কি না।

সুশীল বলেছিল— তিন-চার পুরুষ আগেকার সেই মহিলার কথা।

ডাক্তারবাবু শিশুকালের খাওয়া দাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বলতেই হয়েছিল তেমন ভালো খাবার দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না, তবে ডাল ভাত তেলাপিয়া মাছ, পাকা কলা এসব তো দিয়েছে। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন— না, পুষ্টির অভাবের জন্য এমন হয়েছে বলছি না, গ্রোথ হরমোন বলে একটা জিনিস আছে। ওটা কম হলে হয়। তবে আরও কারণ আছে। নানারকমের ডোয়ার্ফিজম আছে, বুঝলেন...

কত কী বললেন ডাক্তারবাবু, পিটুইটারি, স্কেটান, একেন্ড্রোপ্লাসিয়া... সব কঠিন কঠিন কথা। যেটা সুশীল মোদ্দা কথা বুঝেছিল, তা হল দেরি হয়ে গেছে, অনেক আগে আসা উচিত ছিল। রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট গ্রোথ হরমোনের ঘাটতি দেখাচ্ছে। হরমোন থেরাপি আরও কম বয়স থেকে করতে হয়। তবে খুব খরচ সাপেক্ষ। আসলে, স্তন্যপায়ী প্রাণীর বাড়া মানে হাড় বাড়া। হাড়ের সঙ্গে সঙ্গে মাংসপেশি বাড়ে। একটা বয়স পর্যন্তই হাড় বাড়তে পারে। তাছাড়া ওর ট্রাঙ্ক অলমোস্ট নর্মাল। ট্রাঙ্ক মানে বডির উপরের পার্ট। সুনেত্রা চোখ নামিয়েছিল ভুঁইয়ে।

ডাক্তার বলেছিল— কোমর থেকে গলা পর্যন্ত অংশটা হল ট্রাঙ্ক। আরও সব টিবিয়া, ফেবুলা, অটোজম— সব আগডোম বাগডোম বকে গেল। তারপর বলল— মেয়েকে লম্বা করা যাবে এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। তবে কিছুদিন হরমোন থেরাপি করা যেতে পারে। করেছিল কিছুদিন। ছ'মাস মতো। বড্ড খরচ। টানা মুশকিল, কিন্তু উপকার হচ্ছিল না। তাই ছেড়ে দিতে হল হরমোন থেরাপি।

হোটেলে উঠিয়ে ভোজন পর্ব এবং বিশ্রামের পর ম্যানেজার খুব সলজ্জ ভঙ্গিতে অপরাধীর মতোই বলল— আবার একটু সমুদ্রের ধারে নিয়ে যাব। কী করব বলুন, আমাদের ইটারানারির মধ্যেই আছে। তবে যারা যারা আর সমুদ্র দেখতে চাইছেন না, হোটেলেই বিশ্রাম করুন। এই এলাকাটা ফ্রেঞ্চদের দখলে ছিল। শহরটা ফ্রেঞ্চরাই বানিয়েছে, তাই ফ্রেঞ্চ স্টাইলের কিছু বাড়িটাড়ি দেখতে পাবেন। একটা ফ্রেঞ্চ চার্চও দেখাব। কাল যাব অরোভিলে। ঋষি অরবিন্দের তৈরি করা আশ্রম।

কেউ কেউ উঠল না। আর সমুদ্র দেখতে চায় না। সদানন্দবাবু কোথায় যেন শুনেছেন পন্ডিচেরিতে ভালো স্টিলের বাসন কিনতে পাওয়া যায়। দু'চার পিস নিয়ে গেলে গিন্নি খুশি হবেন। চন্দন মল্লিকের যাবার ইচ্ছে, কিন্তু ওঁর স্ত্রী মার্কেটিং করতে চাইছে। ওদের মধ্যে মৃদু ঝগড়া হল। চন্দনবাবু বলল— দ্যাকো, পয়সা দিয়ে যখন বেইরেছি, সব দেখব। সমুদ্র কখনও পুরনো হয় নাকো। সবকটা ঢেউ নতুন ঢেউ। ওঁর স্ত্রী বলল— ওসব বুগ্‌নি দিও নাতো, আমি বুঝি না ভেবেচো? মার্কেটিংয়ে গেলে তোমার পয়সা খসবে, এজন্য সমুদ্দুর দ্যাকাচ্চো। আরে কিছু গিফট কিনতে হবে না? আমার ভাইপো ভাইঝিগুলো...। চন্দনবাবু বলল— সে তো বুজলুম। কিন্তু কেন বোঝা বইব বলত? কলকাতায় সব পাওয়া যায়। কী পাওয়া যায় না বলো? বাঘের দুধও পাওয়া যায়। চন্দন গিন্নি বলল— এখানে যেমন বাগবাজারের রসগোল্লা পাওয়া যায় না, কলকাতায় তেমন কুডালোরি শাড়ি, তাঞ্জোরি চাদর পাওয়া যায় না। আমি মার্কেট, যাব। চন্দনবাবুর আর পয়সা উসুল করা হল না। এরকম আট-দশজন বাদে বাকি সবাই বাসে উঠল।

রাস্তাগুলো বেশ সোজা সোজা। আড়াআড়িভাবে অন্য রাস্তাগুলো চলে গেছে। পণ্ডিচেরি পরিকল্পিত শহর। ঝংকার গুগুল খুলেছে, গুগুলে পণ্ডিচেরি সার্চ দিয়েছে। শহরটির ইতিহাস জানতে চায়। কিন্তু মোবাইলে চোখ রাখলে জানালায় চোখ রাখা যায় না। জানালার ওপাশে ফরাসি দেশ। চন্দননগরও ফরাসি শহর। কিছুদিন আগেই চন্দননগরে গিয়েছিল ঝংকার। চন্দননগরের গঙ্গার ধারের পাড়, ঘাট, ঘাটের উপর পিলারওলা ঘরগুলো, গির্জা, আরও কতসব ছিল ফরাসি আমলের। ওরা তিনজন ছিল। সুলগ্না বলে মেয়েটা জগদ্দলে থাকে। ওদের সঙ্গে পড়ে। বলেছিল ওদের বাড়ি গেলে নৌকো করে ওপারে গিয়ে চন্দননগর দেখাবে। ঝংকার আর সৃজন ছিল। গঙ্গারধারে স্ট্যান্ডের বেঞ্চিতে বসেছিল ওরা। সুলগ্না মাঝখানে। আইসক্রিমের কাপ কিনেছিল তিনটে। সুলগ্নার হাত থেকে কাপটা পড়ে গিয়েছিল, চামচটা হাতেই ছিল। তখন ওর ডানদিকে বসা সৃজন ওর কাপটা বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল এটা থেকে খা। সুলগ্না ওর থেকে দু'চামচ নিয়েছিল, কিন্তু ঝংকারের কাপ থেকে চার চামচ। ঝংকারের কাছে এটা একটা প্রাপ্তি ছিল।

সুলগ্নার দাদুর কাকা বোধহয় ছিল কানাইলাল দত্ত। বিপ্লবী। সে সময় চন্দননগর ফরাসিদের ছিল বলে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবীরা চন্দননগরে আশ্রয় নিত। সুলগ্নাই বলেছিল— চন্দননগরে আগে দিনেমার মানে ডাচরা এসেছিল। এখনও দিনেমার ডাঙা নামে একটা পাড়া আছে। যেখানে ওর মামার বাড়ি। ডাচদের হারিয়ে ফ্রেঞ্চরা এই এলাকা দখল করেছিল।

পণ্ডিচেরি তো নয়, পি, ইউ, ডি, ইউ। একজন বলল। বলল ইংলিশ সাইনবোর্ডে তো তাই আছে। অন্য একজন বলল— পুদুচেরিও হয়। কী নাম মাইরি। ঝংকার শুনল কেউ বলছে পুদু তো চেরাই হয়। ওসব ঠিক আছে।

ঝংকার ফ্রেঞ্চ ইন্ডিয়া সার্চ দিয়েছে গুগুলে। দেখল ১৬২৫-৩০ থেকেই ফরাসিরা ভারতে আসার চেষ্টা করেছে। ১৬৫৮ সালে একজন ফরাসি পরিব্রাজক, সে নিজে ডাক্তার ছিল, আওরঙ্গজেবের একটা বিদঘুটে অসুখ সারিয়ে দেয়। বিনিময়ে নিজের জন্য চাননি, ফরাসি জাতির সুবিধার জন্য ভারতে কুঠি তৈরি করে ব্যবসা করার ফরমান চেয়েছিলেন।

তাঁর নাম ছিল ফ্রাঙ্কোস বের্নিয়ান। সুরাটে কুঠি করে। তারপর মাহে, পদুচেরি, কারাইকেল, চন্দননগরে কুঠি তৈরি হয়। ব্রিটিশরা আসে পরে। ব্যবসাপাতি নিয়ে ওদের নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি হতেই থাকে। ১৭৫৭ সালে সিরাজদৌল্লাকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিল ফরাসি জেনারেল দুপ্লে। ব্রিটিশরা এর বদলা নিয়েছিল। যা হোক করে ব্রিটিশ আমলে পুদুচেরি, যা সাহেবি উচ্চারণে পণ্ডিচেরি, মাহে, চন্দননগরে ফরাসি শাসন টিমটিম করে টিকে ছিল। স্বাধীনতার পর একে একে ভারতের ভিতরে ঢুকে যায়।

ঝংকার রাস্তা দেখছিল ফরাসি শহরের। ফুটপাথ, ছাতা বসানো কাফে, লাইটপোস্ট, এরই মাঝে মাঝে জেগে উঠেছে

ভারত। হনুমান মন্দির, ভেঙ্কটেশ মন্দির, নেতাদের কাটআউট, কামরাজের মূর্তি, গান্ধীজির...।

সিরাজদৌল্লা যদি জিতে যেত, তাহলে কী হতো? ক্লাইভের বদলে দুপ্লে? আমরা কি ইংরাজি না শিখে ফরাসি শিখতাম? মিস্টারকে মঁসিয়ে বলতাম? চার্চ-এর সামনে বাস থামল। সামনে যীশুর মূর্তি। খুব সুন্দর। ঝংকার ক্যামেরা বাগিয়ে ছবি তুলছিল। ঝংকারের বাবা তাড়াতাড়ি এসে সামনে দাঁড়াল। কীরে— আমাকে ছাড়া তুলছিস যে?

সুনেত্রা একটা সেলফি তোলার চেষ্টা করছিল। ও একটু আড়ালে গিয়ে ছবি তোলে। চেন্নাই-মহাবলীপুরমেও লক্ষ করেছে ঝংকার। ঝংকার বলল আমি তুলে দিচ্ছি। দেখি ক্যামেরাটা...।

ঝংকার এমন করে ছবিটা তুলল যেন ওর উচ্চতার ধারণাটা না করা যায়। উচ্চতা তখনই বোঝা যায় যখন তুলনা করার মতো হয়। যদি দুটি অসম উচ্চতা একসঙ্গে তোলা হয়। আলাদাভাবে ষাঁড় ও শুয়োরের ছবি তুললে বোঝা যায় না ষাঁড় বড় না শুয়োর বড়। ছবিটায় সুনেত্রাকে একদম বেঁটে লাগছে না। ওকে কী স্বাভাবিক এবং সুন্দরী লাগছে। কী সুন্দর লাগছে চোখ দুটো। সুশীল বলল, তুমি খুব ভালো ছবি তোলো। আর একবারও ছবি তুলে দিয়েছিল ওদের। চেন্নাইতে। সমুদ্রের ধারে। তিনজনই দাঁড়িয়েছিল, সুনেত্রা মাঝখানে, দু'ধারে বাবা-মা। ঝংকার বলেছিল তিনজনই বসুন, বেঞ্চিতে। সুনেত্রাকে বলেছিল তুমি বাবা-মা'র কাঁধে হাত দাও। সুনেত্রা মাঝখানে ছিল। দু'হাত দু'জনের কাঁধ ছাড়িয়ে। ঝংকার পায়ের দিকটা বাদ দিয়েছিল। বাস্ট ফটো। বোঝাই যায়নি সুনেত্রা ডোয়ার্ফ। কারণ ওর তো হাত-পা ছোট। কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত তো ঠিকঠাক। সুনেত্রা ঝংকারকে একটু পরে বলেছিল কারিকুরি করে কী লাভ। ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট। আমি যা, আমি তাই। ঝংকার কিছুই বলেনি যে আমি কায়দা করে অ্যাঙ্গেলটা বেছেছি, কিন্তু মেয়েটা ঠিক বুঝে নিয়েছে। চার্চের ভিতরে ঢুকেছিল ওরা। সুশীল দেখছিল মার্বেলগুলো। কী কোয়ালিটির মার্বেল। কিছু মার্বেলে একদম ভেইনস নেই, দুধের মতো সাদা। তাজমহলের টাইপ। ফ্রান্সে কি মার্বেল হয়? হতে পারে ইতালিয়ান। সুনেত্রা ওর বাবাকে বোঝাচ্ছিল— দেখ বাবা, ওয়েট ধরে রাখার জন্য পিলার নেই একদম, আর্চ। যাকে বলে খিলান। এরকম হাফ রাউন্ড শেপ লোড ডিস্ট্রিবিউট করে দেয়। যদি একটা উল্টে থাকা ভাঁড়ের উপর এক পায়ে দাঁড়াই, ভাঁড়টা কিন্তু ভাঙবে না। আমি না হয় ছোট, ওয়েট কম। তুমি দাঁড়ালেও ভাঁড়টা ভাঙবে না। কেন বলতো বাবা? সুশীল বলল, এটাও কি অঙ্কের ব্যাপার? সুনেত্রা বলল, সেটাই তো বলছি। একটা ডিমের কথা ভাবো, কী পাতলা খোলা, টোকা দিলেই ভেঙে যায়, অথচ এক হাতের তালুর উপর ডিমটা রেখে অন্য হাতে চাপ দিও, দেখো ভাঙবে না...

জগন্নাথ প্রামাণিক আলোছায়ার কানে কানে কী একটা বলল। আলোছায়া ভ্রু ভঙ্গি করে তেরচা তাকাল। জগন্নাথ আবার কিছু বলল। আলোছায়া কনুই দিয়ে জগন্নাথের গায়ে ঠোসা মেরে বলল শখ কত। চার্চে খুব সুন্দর বাগান। বাগানে ফুল। ঝংকারের বাবা আবার একটা ঝাঁকড়া মোরগঝুঁটি গাছের ঝাড়ের সামনে ফুলের গোছায় হাত দিয়ে হাঁকে ঝংকার, আমার এখানে একটা তুলে দে। ঝংকার একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। একটু জুম করতে হল। জুম করতেই ক্যামেরায় জগন্নাথবাবুকে দেখল, জগন্নাথবাবুর হাত ওই ভদ্রমহিলার কোমরে। ক্যামেরা সরাল। ঝংকারের বাবা বলল রেডি? ঝংকার কপাল কুঁচকে বলল হ্যাঁ। ভদ্রলোক ফুলের দিকে তাকিয়ে একটা বিস্ময় ভরা চাহনি দিল। ঝংকার শাটার টিপল।

কই দেখি দেখি করতে করতে এগিয়ে এলেন উনি। দেখে খুশি হল বেশ। ছেলেকে বলল, থ্যাঙ্কউ। পাঠিয়ে দিস। ফেসবুকে দোবো। কী ক্যাপসন লাগানো যায় বল তো? ফুলে ফুলে দুলে দুলে ভালো হবে? নাকি, ফুল তোমার নাম কী? নাকি, কত রঙে সেজেছ ধরণী— কী যেন নাম চার্চটার...।

ম্যানেজার তাড়া দিল। চলুন চলুন। আকাশে সান থাকতে থাকতে সি-বিচে যেতে হবে।

অপরূপ নামে ছেলেটা বলল, চলো বাবা তাড়াতাড়ি চলো সানসেট দেখব। ছবি তুলব, এ্যাঁ? ম্যানেজার বলল— সানসেটটা কী করে দেখাব? গান্ধীকুমার বলল, কেন দেখাবেন না। এখনও সূর্য অস্ত যেতে দেরি আছে তো।

ঝংকার সুনেত্রার দিকে তাকাল। সুনেত্রা এই চোখের ভাষা পড়ে ফেলেছে। বলছে কী সব পাবলিক এসেছে মাইরি। পূর্ব উপকূল থেকে সানসেট দেখবে। সুনেত্রা ঝংকারের কাছে এল। বলল, সি-বিচ যদি একটু গোল টাইপ হয় তাহলে সমুদ্রের এক প্রান্তে সানরাইজ, অন্য প্রান্তে সানসেট দেখা যেতে পারে। আর যদি ফ্ল্যাট হয়, তাহলে ডিসেম্বর আর জুনেও দেখা যেতে পারে। কারণ সূর্য তখন মকরক্রান্তি আর কর্কটক্রান্তির কাছে থাকে কিনা...।

ঝংকার এতশত ভূগোল বোঝে না। ঝংকার বলল— তোমার সাবজেক্ট তো ম্যাথস্। ভূগোলেও খুব ফান্ডা দেখছি...।

সুনেত্রা বলল ভূগোলে অঙ্ক আছে তো। আবার অঙ্কে ভূগোল। অ্যাস্ট্রোনমিটা তো পুরোটাই অঙ্ক। কথাটা ঝংকারের বাবা শুনল। বলল দ্যাখ, মেয়েটাও তো বলছে। তুই বিশ্বাস করিস না আমি যখন বলি, জ্যোতিষ বিদ্যাটা পুরো অঙ্ক। ঝংকার বলল, অ্যাস্ট্রোলজি আর অ্যাস্ট্রোনমি আলাদা। কতবার বলেছি।

—তুই বললেই হবে? টিভি দেখিস না, ওরা কত কী ক্যালকুলেশন করে, ল্যাপটপ থাকে সামনে। সব তো হিসেব করেই বলে।

ভাগ্যটাও হিসেবে হয়? কোনও জ্যোতিষী ক্যালকুলেশন করে বলতে পারবে আমরা শেষ অবধি বাড়ি ফেরত যেতে পারব কি না... এখানকার বত্রিশজনের তো বত্রিশটা কোষ্ঠী। বত্রিশ রকম গ্রহ-নক্ষত্র। বত্রিশ রকম ভাগ্যফল। যদি সবারই একই রকম একটা দুর্ভাগ্য হয়ে যায়...

ঝংকারের মা আলপনা প্রায় তেড়ে এল ঝংকারের দিকে। কী অলক্ষুণে কথা বলছিস তুই, ছি ছি ছি। তোর মুখ খুব খারাপ। খারাপ কথা ফলে যায়।

হ্যাঁ, ঝংকারের অনেক ভবিষ্যৎবাণী ফলেছে। ওর মাকে বলেছিল এত জল ঘেঁটোনা আঙুলে হাজা হবে। —হয়েছে। বলেছিল —এ বাড়িতে ডেঙ্গি হবেই। সবার হয়েছিল।

ঝংকারের মা বলল— শোন বাবা এবার বল আমরা সব ঠিকঠাক নির্বিঘ্নে ফিরে যাব। তোর কথা ফলে যায় বাবা। বল...

ঝংকার বলে আমি কি বলেছি নাকি ফিরব না। আমি তো বলেছিলাম যদি...।

—না কোনও যদি নয়। বল নির্বিঘ্নে ফিরব...।

পুদুচেরির সমুদ্রের ধার দিয়ে রাস্তা। সমুদ্রটা বাঁধানো।

কিছুটা সামনে এগিয়ে এক টুকরো বেলাভূমি পাওয়া গেল। পাথর ছড়ানো। পাথরে ধাক্কা লেগে জল ফুঁসে উঠছে। জলে ফেনা তৈরি হচ্ছে। অনেকে খুব একটা ভক্তিশ্রদ্ধা নিয়ে সমুদ্র দেখছে না। যেন— তোর কায়দা বহুত দেখেছি, আর নতুন কী দেখাবি। সমুদ্র তবু নতুন দেখাতে চায়। সুধীর মজুমদার আর ওর ছেলে সমুদ্রের সামনে, ছেলের হাত বাবার কাঁধে। বাবার থেকে ছেলেই লম্বা যদিও। ছেলে বাবাকে বলল— বাবা, দেখো, সমুদ্র আর আমি এক।

বাবা বলল কেন খোকা?

—আমার নাম অপরূপ, সমুদ্রও অপরূপ। সুধীরবাবু আটত্রিশ বছর বয়সি ছেলের থুতনি নাড়িয়ে দিলেন।

সজল মিত্র একটা পাথরের উপর দাঁড়ানো। আবার বিলাসচন্দ্রও অন্য পাথরের উপর। বিলাসচন্দ্র ছেলেকে আঙুলের সঞ্চালনে ডাকতে থাকল।— এই ঝংকার...। ক'টা ছবি তোল, ব্যাকগ্রাউন্ডে সমুদ্র রেখে একটা, এদিক থেকে, একটা ওদিক থেকে। ঝংকার তুলে দেয়। এবার জুম করে একটা, ব্যাকগ্রাউন্ডে আকাশ। ঝংকার রেগে যায়। বলে ধুর! পারব না। সেলফি তোলো। বলেই ঝংকার বলল— থাক, সেলফি তুলতে গিয়ে পড়ে যাবে আবার সেদিনের মতো।

বিলাসবাবুর স্ত্রী আলপনার হাঁটুতে ব্যথা। কোমরেও। আর্থ্রারাইটিস। উনি অনেক সময় বাসেই বসে থাকেন। এখন নেমেছেন যদিও। পাড়ে, একটা বেঞ্চিতে সুশীলবাবুর স্ত্রী অণিমার পাশে বসে, অণিমাকে বললেন— উনি, একদম শিশুর মতো, জানেন দিদি। ঝংকার ওর বাবার ছবি তোলে, জুম করে, পিছনে একটু লনে আভা মাখা আকাশ। অন্য একটা পাথরে দাঁড়িয়ে সজল মিত্র একটা হাত লাল আভার আকাশের দিকে তুলে বলছে— হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার... ঘুমন্ত পৃথ্বীরে অসংখ্য চুম্বন কর সর্ব অঙ্গ ঘিরে তরঙ্গ বন্ধনে বাঁধি...। জগন্নাথ প্রামাণিক আর আলোছায়া কর্মকার একটু আলাদাভাবে, ভিড় থেকে সরে সমুদ্রের কাছাকাছি, বেনি ভিজাব, চুল ভিজাব না টাইপের ভান করে জলের কাছে। জল ওদের কখনও পদস্পর্শ করছে। কখনও করছে না। পিছনে জলের নীল রেখে সেলফি তুলল আলোছায়া। এবার একটু আলোছায়া ছল করে জলে গেল, জগন্নাথ হাত ধরে টেনে আনল। এবার জগন্নাথ। আলোছায়া জগন্নাথকে জিজ্ঞাসা করল— এই যে সমুদ্দুর, যদি সোজা ওদিক পানে যাই, একবার তো শেষ হবে, আবার তো ড্যাঙ্গার দেখা মিলবে, ওটা কোন দেশের ড্যাঙ্গা গো? জগন্নাথ কী বলল যেন, সেটা, হাওয়ায় ভেসে গেল। আলোছায়া বলল— আচ্ছা এত যে জল, খালি জল, কেবল জল, এত জল কী করে থাকে গো সমুদ্দুরে? এ জল কক্ষণও শুকোয় না? আচ্ছা, এই জল এত নোনতা কেন গো? আর সমুদ্দুরের জল এত নীল দেখায় কেন গো? বালতিতে রবিন বুলু গুলে দিলে যেমন নীল হয়, তার চেয়ে বেশি নীল। এই যে আঁজলা ভরে জল তুললাম, আজলার জলটা কিন্তু নীল নয়, দেখো, টলটলে কলের জলের মতুন একদম।

এতগুলো জটিল প্রশ্নের উত্তরদাতা হিসেবে জগন্নাথকে মনোনীত করেছে আলোছায়া, জগন্নাথকে এর উত্তর দিতেই হবে। জগন্নাথ ভাব দেখাল প্রশ্নগুলো কঠিন, কিন্তু উত্তর সব সোজা। জগন্নাথ সব কৌতূহল মেটাচ্ছিল। কিন্তু শুধু বাক্য দিয়ে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। দূর থেকে দেখলে দেখা যাচ্ছে জগন্নাথ দু'হাত উপরে তুলছে, হাতের তলায় হাত রাখছে, হাত কাঁপাচ্ছে, টাক চুলকোচ্ছে, ঘাড় নাড়ছে, মাথা নাড়ছে...। মাঝে মাঝে আলোছায়াও মাথা নাড়াচ্ছে। মানে বুঝতে পারছে। প্রায় সাত মিনিটব্যাপী এই বিশ্লেষণের শেষ বাক্যটি ছিল শ্রীকৃষ্ণ হলেন যে ঘনশ্যাম— প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম একটা গান ছিল না? সেই ঘনশ্যাম— মানে নীল। দুনিয়াটাই কৃষ্ণের লীলা। আকাশ নীল, সমুদ্র নীল। বোয়েচো? আলোছায়া সন্তুষ্টির মুদ্রাজ্ঞাপক শিরসঞ্চালন করলে জগন্নাথ আহ্লাদের বশবর্তী হয়ে আলোছায়ায় আলোছায়ার থুতনি নাড়ায়।

সবই কৃষ্ণের লীলা। জগন্নাথ তো কৃষ্ণেরই একটি রূপ। এই ভ্রমণসঙ্গীরা আগেই বুঝে গেছে— ওরাও লীলা করতেই এখানে এসেছে। চেন্নাইতে একটু মেঘ করেছিল, মাঝে মাঝে সূর্য উঁকি দিচ্ছিল। মেঘ-রোদ্দুরের খেলা। দু'জনের হাতের সাদা থার্মোকলের বাটির কাঁকড়াভাজার উপর আলো ও ছায়া। জগন্নাথ গেয়ে উঠেছিল— এত মেঘ, এত যে আলো এ জীবনে ছড়িয়ে আছে-এর আলোটুকু তোমায় দিলাম, ছায়া থাক আমার কাছে।— সিনেমায় যেমন হয় আর কী।

মতিউর দুই পাথরের ফাঁকে দাঁড়িয়ে সমুদ্রকে পিছনে রেখে দু'হাত উপরে তুলেছে। নামাজের ইচ্ছে জেগেছে বোধহয়।

অপরূপ জলে মাথা তুলে থাকা একটা টিলা পাথরে উঠতে চাইছিল। ওর বাবা পাড় থেকে হাত নাড়িয়ে বলছিল উপরে উঠিস না বাবুসোনা, পড়ে যাবি। ছেলেটা বলছিল— আমি অভিযাত্রী। আমি তেনজিং। এই যে পাহাড়ে উঠছি। থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে দেখবো এবার জগৎটাকে। কেমন করে বীর ডুবুরি সিন্ধু থেকে মুক্তো আনে। তারপর কী বাবা? সুধীরবাবু চিৎকার করে— পড়ে যাবি বাবা, নেমে আয়...। অপরূপ বলে না, আমি যাবই। এবং উপরে উঠে দাঁড়িয়ে হাত দুটো বুকের উপর আড়াআড়ি সেট করে স্বামী বিবেকানন্দের কায়দায় বীরদর্পে দাঁড়াল। পাথর চূড়া খুব উঁচু নয়, কিন্তু কয়েকটা ভাঙা পাথরের উপর দিয়েই উঠতে হয়। একটু আগে ঝংকারের বাবা একটা পাথরের উপরে উঠেছিল। জগন্নাথ, সজল মিত্র অনেকেই। সুনেত্রা তাকিয়েছিল— কয়েকবার। ওই ভাঙা পাথরের ধাপগুলো ওর পায়ের দৈর্ঘ্যের তুলনায় বেশ উঁচু। সুনেত্রা আর পাথরপুঞ্জের দিকে তাকাচ্ছিল না। বরং আকাশে। ঝংকারের ইচ্ছে হয়েছিল পাথরের উপরে ওঠার। কিন্তু চেষ্টা করল না। চেন্নাইতে সি-বিচে উট ছিল। অনেকেই উটে চড়েছিল। উটের উপরে উঠতে অসুবিধে নেই। বালক-বালিকাও উঠতে পারে। উটওয়ালারাই উঠিয়ে দেয়। সুনেত্রা চড়েনি। দেখতে খারাপ লাগবে ভেবেছিল নিশ্চয়ই। বিরাট উটের পিঠে বসবে, ছোট পা দুটো একটু করে দু'পাশে। সুনেত্রার কোমর থেকে মাথা তো প্রায় ঠিক। উটের কুঁজ ঢেকে রাখে না যেমন শিশুদের। কিন্তু সুনেত্রা তো...। ঝংকারের বাবা উঠেছিল। ছবিও তুলিয়েছিল। কিন্তু ঝংকার ওঠেনি। এখানে এই পুদুচেরির সি-বিচেও যখন ঝংকার পাথরে উঠল না, সুনেত্রার একবার মনে হয়েছিল এই ইয়ং ছেলেটা কি ভীতু টাইপ? উটের উপর ওঠেনি, এখানেও উঁচু পাথরের উপর উঠল না। জিজ্ঞাসাই করে ফেলল— ওখানে উঠবে না? একটু নিঃশব্দ থেকে ঝংকার মাথা নাড়াল। সুনেত্রা বলল কেন? ঝংকার বলল এ-এমনি। এ আর ম ধ্বনি দুটির অনেকটা সুর ও স্বর ঢেলে দিল যাতে এমনিটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।

পরদিন এই শহরের হোয়াইট সিটি এবং অরোভিল। বাস চলতে শুরু করার কিছুক্ষণ পর সুনেত্রা প্রায় আর্তনাদের

মতোই বলল— এমা কী হবে? মোবাইলটা চার্জে দেওয়া ছিল, ফেলে এসেছি। কী হবে? ঝংকার বলল— কেন, কী হয়েছে, আমি তো এনেছি। চেন্নাইয়ের পর থেকে বাসের দুটো সিটে ঝংকার আর সুনেত্রাকে পাশাপাশি বসতে হচ্ছে। প্রথমে সুনেত্রা আর ওর মা একটায় বসেছিল, সুনেত্রার বাবা কখনও নিমাইবাবু, কখনও বচনলাল, বা অন্য কোনও একা আসা মানুষের পাশে বসেছে। জল, ওষুধ বা অন্যকিছুর জন্য সুনেত্রার মায়ের কাছে আসতে হয়েছে। তারচেয়ে ভালো সব স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি বসা। ঝংকারের বাবা-মা বিলাস আর আলপনাও একটা সিটে পাশাপাশি। আর ওদের সন্তানরা বাপ-মা'র সঙ্গে বসতে পারছে না। দুই সিটের বাসে ওরা চেন্নাই থেকেই পাশাপাশি। ওরা টফি দেওয়া নেওয়া করে, মোবাইলের ব্লু-টুথ-এ ছবি দেওয়া নেওয়া করে। জোকসও দেওয়া নেওয়া করে। 'না-এটা না। এটা দেবো না, এটা অ্যাডাল্ট জোক'— ঝংকার বলেছিল। সুনেত্রা বলেছিল তুই বুঝি আমাকে অ্যাডাল্ট মনে করিস না? আমি সাড়ে চার ফুট মানে কি বড় হইনি? এত অবধি কথা হয়েছে। ঝংকার বলতে পারত— কী করে বুঝব যে তুই অ্যাডাল্ট? বলার জন্য মুখ নিসপিস করলেও বলেনি। ততটা ইয়ে তৈরি হয়নি। ও যদি ঠিকঠাক হতো হয়তো বলে দিত কী দেখতে চাস? ওর উচ্চতাবোধ সবসময়েই দমিয়ে রাখে।

গুগ্‌লে অরোভিল। ১৯৬৮ সালে তৈরি হয়। মীরা আলফাসার উদ্যোগে তৈরি হয় এই উপাসনা স্থল। একেই মাদার বলা হতো। এখানে সারা পৃথিবীর মানুষ অরবিন্দের ধ্যান-ধারণায় উৎসাহী মানুষেরা আসে। এখানে একটা বিরাট মাতৃমন্দির আছে। 'দ্যাট ইজ এ সিম্বল অফ ডিভাইনস্ অ্যানসার টু ম্যানস অ্যাসপিরেশন ফর পারফেকশন...।' মানে বোঝা গেল না। ঝংকার মীরা আলফাসা সার্চ দিল। জন্ম ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮, মৃত্যু নভেম্বর ১৯৭৩ স্পিরিচুয়াল গুরু। ফাউন্ডার অফ দি অরবিন্দ আশ্রম। জন্মসূত্রে ফরাসি।

কিন্তু বাবা তুর্কী ইহুদি, মা মিশরীয় ইহুদি। ১৯১৪ সালে তাঁর স্বামীর সঙ্গে ভারতে আসেন। পণ্ডিচেরিতে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হয়। উনি তখন বিপ্লবী নন। ঋষি। মীরা আলফাসার মনে হল ইনিই সেই প্রাচ্যের দার্শনিক, যাকে তিনি খুঁজছেন। অরবিন্দের লেখাজোখার সঙ্গে পরিচয় ঘটে, বেশ কিছু ফরাসিতে অনুবাদ করেন। উনি পণ্ডিচেরিতে থেকে যান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে উনি দেশে ফিরে যান, কিন্তু ১৯২০ সালে আবার ফিরে আসেন পণ্ডিচেরিতে। অরবিন্দ আশ্রমে মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। এখানে স্কুল তৈরি করলেন। দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতা চর্চার প্রসার ঘটালেন। একটু দূরে, অরোভিল নামে টাউনশিপ তৈরি করলেন ১৯৬৮ সালে, যেখানে বিশ্বমানবতা, দর্শন এবং যোগচর্চায় উৎসাহীরা থাকতে পারেন।

—তুই এসব জানতিস? ঝংকার জিজ্ঞাসা করে সুনেত্রাকে।

—ধুৎ, আমি এত বড় বড় ব্যাপার কী করে জানব? ছুঁতেই পারব না।

—কী সব যে বলিস? এসব কি উঁচু তাকে ওঠানো থাকে নাকি যে হাত পাবি না। গুগুল খুললেই পাওয়া যায়। আমিও জানি না। আই ক্যান বেট, এই গ্রুপের কেউ জানে না।

সুনেত্রা ওর নীচের ঠোঁটটা উপরের ঠোঁটে স্থাপন করল। মানে অতি নির্লিপ্তিতে চায়। জানাতে চায়।

জানাতে চায়— হয়তো তাই, আমি কী করে জানব কে জানে আর কে জানে না। আমি তো ক্ষুদ্র মানুষ।

ঝংকারের মনে হয়, মানুষই একমাত্র প্রাণী, যে ওষ্ঠ, চক্ষু এবং ভ্রু ভঙ্গিমায় কথা বলতে পারে।

শ্রীমা, মানে মীরা আলফাসা তো দূরের কথা শ্রীঅরবিন্দকেই ঠিকঠাক জানি না। তুই জানিস? সুনেত্রা জিজ্ঞাসা করে ঝংকারকে।

ঝংকার বলে— কিছু কিছু তো জানি। বাবা সাহেবের মতো করে মানুষ করতে চেয়েছিলেন, দার্জিলিং-এর সাহেবি স্কুল, তারপর বিলেত। বাবা আইসিএস করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অরবিন্দ ঘোষ চাননি, তাই ইচ্ছে করে ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষায় ফেল করেন। তারপর ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় ফিরে এসে বরোদার রাজার চাকরি করতেন...

সুনেত্রা বলল— রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে। সুনেত্রা ততক্ষণে নিজের ফোনের ইন্টারনেট খুলে ফেলেছে। বলল এইট্টিন নাইনটি থ্রি থেকে। তখন মাত্র একুশ বছর বয়স। আঠারোশো বাহাত্তরে জন্ম কিনা... এরপর থেকেই কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ, কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনগুলিতে যোগ দেওয়া, এদিকে ফ্রান্স-ইতালির অ্যানার্কিস্ট, নিহিলিস্ট এসব গোপন বিপ্লবী দলগুলির অনুপ্রেরণায় ভারতের গুপ্ত সমিতি তৈরিতে অ্যাকটিভ রোল... আলিপুর বোমার মামলা, জেল, ব্যারিস্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছাড়িয়ে আনলেন, বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাই মার্ডার কেসে আবার জেল, বন্দি জীবনেই মনের পরিবর্তন, স্পিরিচুয়ালিজমের দিকে ইন্টারেস্ট এল। ছাড়া পেলেন, কিন্তু আরও কেস ঝুলছিল, তাই সে সময়ের ফ্রেঞ্চ কলোনি পণ্ডিচেরিতে শেল্টার নেন।

—উনিও কি ব্যাচেলার ছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দর মতো? ঝংকার জিজ্ঞাসা করে।

সুনেত্রা বলে না, লিখেছে তো ম্যারেড উইথ মৃণালিনী দেবী, মৃণালিনী ওয়াজ দেন ফরটিন।

—অরবিন্দ বউ ছেড়ে একা চলে গেলেন?

—ঋষি হয়ে গেলেন কিনা। তোদের রচনা বইতে ঋষি অরবিন্দ ছিল না?

—ইমপর্টেন্ট ছিল না, পড়িনি।

এবার ট্যুর ম্যানেজার বুকপকেট থেকে কাগজ বের করে বলল, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আমরা এখন হোয়াইট সিটিতে। দেখুন একইরকম ডিজাইনের সাদা সাদা বাড়ি। ১৯২৬ সালে ঋষি অরবিন্দ এটা তৈরি করেন। আর ওর ফরেন ওয়াইফ শ্রীমা এটাকে ডেভেলাপ করেন।

সুনেত্রা ঝংকারের হাতে চিমটি কেটে বলে ভুল বকছে লোকটা। পয়েন্ট আউট কর। ঝংকার বলল তুই বলছিস না কেন, বল... সুনেত্রা বলল— ভুল বলছেন। ওয়াইফ নয়, ফলোয়ার। শি ওয়াজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই শ্রীঅরবিন্দ অ্যান্ড হিজ ফিলোজফি। হার নেম ওয়াজ মীরা আলফাসা।

সুশীলচন্দ্র মেঝের পাথরের কোয়ালিটি দেখছিল। মুখচোরা মেয়ের এই স্মার্ট কথায় অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকাল। কে একজন মন্তব্য করল হ্যা-হ্যা-হ্যা, একটা মেম না থাকলে কি বিখ্যাত হওয়া যায়?

ম্যানেজার বলল, আমরা এবার শ্রীঅরবিন্দের সমাধিতে যাব। মোবাইল অফ, কথা বলবেন না ওখানে।

আলোছায়া জিজ্ঞাসা করে ওখানে প্রে কল্লে আশা মেটে? পীরদের সমাধিতে যেমন?

ম্যানেজার উত্তর দেয় না।

একটু নিরিবিলি পেয়ে আলপনা বিলাসচন্দ্রকে বলল

জানো, আমার ভয় করছে।

—কেন গো?— বিলাসচন্দ্র জিজ্ঞাসা করে।

—ওই বাঁটকুল মেয়েটা আমাদের ছেলেটার দিকে কেমন গায়ে পড়া ভাব লক্ষ করোনি? আমাদের ছেলেটাও ওদিকে হেলছে না তো?

—না-না। ওদিকে হেলবে কেন? ওর একটা ইয়ে, কি বলে, গার্লফ্রেন্ড আছে না?

—ধুর, কিছুই খেয়াল করো না। বলছি মেয়েটার আদিখ্যেতাটা দেখছ? ও বাঁটকুলি হলে কী হবে? ডেভেলাপ বডি।

এমন সময় পিছন থেকে শুনল— 'না, কানে কানে বলব কানে কানে।' জগন্নাথের গলা। পিছন দিকে তাকাবার ইচ্ছে দমন করতেই হল। এবার নারী কণ্ঠে সুরেলা 'উঃ' শুনে পিছনে তাকাতেই হল। আলোছায়া নিজের কানের লতিটা দু'আঙুলে আলতো মেসেজ করে দিচ্ছে। আলপনা স্বগতোক্তি করল নির্লজ্জ বেহায়া।

—এবার কোথায়?

—এবার স্যার অরোভিল। দশ কিলোমিটার দূরে যাব।

বাসের খালাসি আর ম্যানেজার মিলে জলখাবারের প্যাকেট বিলি করল। কেউ কেউ কলা পাল্টাল কালো হয়ে গেছে বলে। কেউ বলল বড্ড ছোট। এরকম প্রায়ই হয়। অতিরিক্ত কয়েকটা রাখা থাকে। যারা ডিম খায় না, তাদের জন্য একস্ট্রা কলা।

ব্যানার্জি বলতে লাগল— অরোভিল ছিল একটা পাথুরে জায়গা। দেখুন বাইরেটা কেমন রুক্ষ। কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখবেন কেমন সবুজে সবুজ। শ্রীঅরবিন্দর মৃত্যুর পর শ্রীমা এটা করিয়েছিলেন। কুড়ি স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকা। ওখানে দেখবেন একটা অসাধারণ গোল মন্দির। একজন ফ্রেঞ্চ আর্কিটেক্ট ওটার নকশা বানিয়েছিলেন। ১৯৬৮ সালে ওপেন হয়। ওই দেখুন দেখা যাচ্ছে, গোল মতন, দেখুন কেমন চকচক করছে।

কাছাকাছি গিয়ে বাস থেকে নেমে হাঁটতে হল। বাগানে কত ফুল।

বিরাট একটা সোনালি বল। সূর্যের আলোয় যেন জ্বলছে। জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে। লাইন দিয়ে ঢুকতে হল। ওদের স্বেচ্ছাসেবকরা বলছে কেউ কাছাকাছি থাকবেন না। কারণ করোনার জন্য ডিসট্যান্স রাখতে হবে। ব্যাপারটা বুঝতে পারল না অনেকেই। ঝংকার জানত কিছুটা। একটা রোগ চীনের কোথাও যেন ছড়িয়েছে। সর্দি-কাশি-জ্বর হয়, পরে নিউমোনিয়া টাইপের কিছু হয়। এরকম আরও অসুখ মার্স, সার্স এসবও ছড়িয়েছিল। যেহেতু মাসকমিউনিকেশনের ছাত্র, খবরের কাগজটা পড়তে হয়। ৮ মার্চ ওরা রওনা হয়েছিল। তখন কেরালাতে ৫-৭ জন, কর্ণাটকে একজন না দু'জন মহারাষ্ট্রে ৭-৮ জন, সব নিয়ে ভারতে ২০-২৫ জন করোনা পজিটিভ ছিল। পশ্চিমবঙ্গে একজনও নয়। যারা আক্রান্ত হয়েছিল তাদের সবাই হয় বিদেশ থেকে রোগটা নিয়ে এসেছিল, নইলে বিদেশ থেকে কেউ এসে এখানে রোগটা দিয়েছে। এই অরবিন্দ আশ্রমে বেশ কিছু সাহেব-মেম দেখেছে। চোখ ছোট নাক চ্যাপ্টা। বিদেশের লোকজন আসে বলে এরা বোধহয় সাবধানতাটা নেয়।

ঢুকেই একটা সুগন্ধ, অদ্ভুত একটা আলো। সোনালি চাকতির ফাঁকে রাখা কাচ থেকে বিচ্ছুরিত। মতিউর স্বগতোক্তি করল— নুর! নুর! এই নুর থেকে সৃষ্টি হয়েছিল ফেরেস্তারা।

চারিদিকে অনেকেই স্থির হয়ে বসে আছে। রাম-নিমাই-বচনলালরা দাঁড়িয়ে চুপচাপ। কী করা উচিত বুঝে উঠতে পারছে না। মতিউর বসে পড়ল। নবী মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইওয়া সাল্লান হেরা গুহাতে কি এভাবেই ধ্যান করেছিলেন? একে একে সবাই বসে যায় নিঃশব্দে।

কিছুক্ষণ কেটে যায়। দশ মিনিট না আধঘণ্টা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। নেমে আসে ধীরে ধীরে। কারুর মুখে কথা নেই।

প্রথম কথা বলল চন্দন মল্লিকের গিন্নি— হ্যাগো, ওগুলো

কি সত্যিকারের সোনা?

চন্দন মল্লিক বলল— তা কি হয় নাকি? সোনার জল।

রাম মোদক সদানন্দ ভুরিকে বলল— এমন জায়গায় কিন্তু দু-তিন ঘণ্টা বসে থাকা যায়। এই যে শ্রীঅরবিন্দ, নাম শুনিনি তো তেমন, যেমন রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, স্বামীজি, নেতাজি...।

সদানন্দ বলে— আমুও শুনিনি। তবে একটা অরবিন্দ ইস্কুল আছে না, ডানলপে? এর নামেই হবে।

নিমাই বলে— হ্যা দাদা, হেবি লোক, কিন্তু পোচার পায়নি। কত মেম...। সব জায়গায় দেখেছি পোচার একটা লাক। যেমন ধরুন না কেন পাঙাস মাছ। কী টেস্ট, কিন্তু পোচার নেই।

আলোছায়া কর্মকার জগন্নাথকে বলল, মেমটার ছবি দেখলাম, তেমন তো ইয়ে দেখতে না...।

নিচে একটা গ্যালারি। সেখানে অরবিন্দর ফিলোজফি ব্যাখ্যা করা আছে। সবাই গেল। কতগুলো চার্ট, আর ইংরেজিতে লেখা নানারকম কথা। নানারকমের ভাগ। অরবিন্দ ফিলোজফি অফ লাইফ, ফিলোজফি অফ এডুকেশন, ফিলোজফি অফ ইয়োগা, ফিলোজফি অফ নেচার...। প্রথম গ্যালারিতে গেল ওরা, কতসব লেখা সুপার মাইন্ড, আউটার বিইং, ইনার বিইং, ইলুমিনেটেড মাইন্ড, ওভার মাইন্ড... এখানে ওখানে একটু দাঁড়িয়ে সবাই হাইথট, হাইথট বলে চলে গেল। সুনেত্রা আনমেনুফেস্টেড ব্রহ্ম এবং মেনুফেস্টেড ব্রহ্মর মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত ব্রহ্ম। সুনেত্রা দাঁড়িয়েছিল বলে ঝংকারও ছিল। মিনিট দশেক পর ম্যানেজারবাবু এসে বলল, এবার চলুন, সবাই বাসে বসে আছে। যেতে হল। বাইরের কাউন্টারে অনেক বই বিক্রি হচ্ছে। অরবিন্দের গীতাভাষ্য, উপনিষদ, সাবিত্রী... অনেক দাম। একটা কম দামের সরু বই কিনল ঝংকার। দ্য ডিভাইন সোল। ঝংকার বলল, নে এটা, পরে পড়িস, তোকে দিলাম। সুনেত্রা বলল— এসব কঠিন বই আমার মাথায় ঢুকবে না। তুই জার্নালিস্ট হবি, তোদের কত কী জানতে হয়। তোর কাছেই রাখ। ঝংকার বলল, আরে তুই তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওসব টাফ মালগুলো পড়ছিলি। আমার মাথায় ওসব ট্যান হয়ে যাচ্ছিল। সুনেত্রা বলল, ধুর, আমার ম্যাথস-এর যা পেন্ডিং সিলেবাস, এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার টাইম নেই। বরং তোর কাছে রাখ, পরে এখান থেকে ঝাড়তে পারবি। রেফারেন্স বই। তাছাড়া পণ্ডিচেরির স্মৃতি।

ঝংকার বলল— পণ্ডিচেরির আরও স্মৃতি থাকবে মাথায়। তোর জন্যই নিলাম তো। তুই রাখ। যদি দরকার হয়, পরে তোর থেকে নেব।

সুনেত্রা বলল— পরে? পরে কি দেখা হবে? আমাকে আর মনে রাখতে যাবি কেন?

ঝংকার আর কথা না বলে ওর ব্যাগে ঢুকিয়ে দেয়।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ায় বিনস, ছোট ছোট আলুর ঝাল তরকারি। রাম মোদক বলল, এই আলু হল লাল রঙের। পাওয়া যায় না ওধারে। দমের জন্য এক নম্বর। টাইম থাকলে মহাজনের সঙ্গে কথা বলে নিতাম।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সোজা রামেশ্বরম। সারারাত বাস। গত কয়েকদিন খবর টবর কিছুই শোনেনি হোটেলের ঘরে টিভি হল শোপিস। চালানো যায় না। এ রিমোট, ও রিমোট...।

লোক ডেকে খবরের চ্যানেল বের করে চালাল ঝংকার। দেখল— চীনের পর ইরানেও করোনা ছড়িয়েছে খুব।

ভারতের কেরালা, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং গুজরাত মিলিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা শ'দেড়েক। ইন্দোরে প্রথম মৃত্যুর খবর ছিল ১৩ মার্চ। এ পর্যন্ত করোনায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা মাত্র চারজন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীহর্ষবর্ধন জানিয়েছেন, ভারতবাসীর দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। সত্যিই তাই। দুশ্চিন্তার কী আছে? চীনে যা হচ্ছে হোক। সব রোগ কি সব দেশে হয়? বিলেতে আমেরিকায় কি ম্যালেরিয়া হয়? আফ্রিকায় ইবোলা হয়েছিল বলে কি ইন্ডিয়ায় হয়েছে? মার্স, সার্স, কত কী হয়েছিল অন্যান্য দেশে। এখানে তো হয়নি। ধুস্। ওসব কিস্সু ভারতে হবে না।

এই হোটেলে বাংলা চ্যানেল অনেকগুলোই আসে। একটা চ্যানেলে দেখল ডাক্তার বসেছে দু'জন। সঞ্চালিকা ছাড়া একজন মনোবিদও আছেন। এখন সব চ্যানেলে এক পিস করে মনোবিদ থাকে। সাইকোলজিটা পড়লে মন্দ হতো না। ওদেরই বাজার। মনোবিদ বলছেন আতঙ্কিত হবার মতো কিছু নেই। রিল্যাক্সড থাকুন। ইউরোপের জীবনশৈলী আলাদা। ওরা সহজেই ইয়ে, হাগ করে, ইয়ে, মুখের কাছাকাছি মুখ নেয়, আসলে নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়েই তো রোগটা...।

ডাক্তারবাবু বললেন— সরি, ইন্টার‍্যাপ্ট করছি, নিঃশ্বাস নয়, কথা বললে, হাঁচলে, কাশলে ছড়ায়। ড্রপলেটের মধ্যে ভাইরাস থাকে। ড্রপলেট মানে সূক্ষ্ম, খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জল কণিকা, আমাদের মুখে থাকে লালারসে, ল্যারিংক্স, ফ্যারিংক্স-এর মিউকোসায়... মানুষ বুঝুক না বুঝুক এভাবেই বলে থাকেন ওরা। মিউকোসার মানেটানে বুঝল না ঝংকার। হাঁচি-কাশির ড্রপলেট যদি হাতে লাগে, বা শরীরের কোথাও, ড্রপলেটে থাকা ভাইরাস লেগে যাবে। সেই ভাইরাস যদি অন্য শরীরের মিউকোসায় যায় তবেই করোনা হতে পারে। মুখ, নাক, চোখের ঝিল্লির মাধ্যমে বাহিত হয় এটা।

ঝংকার যেটা বুঝল— অত সহজে সংক্রমিত হয় না।

অন্য একজন ডাক্তারবাবু বললেন, এখন মার্চ মাসের মাঝামাঝি। গরম পড়তে শুরু করে দিয়েছে। আর একটু গরম বেড়ে গেলেই— এই ভাইরাস টিকে থাকতে পারবে না। চীনের উহানে শুরু হয়েছিল যখন, খুব ঠান্ডা ছিল সেখানে। ইরানের যেখানে যেখানে তাপমাত্রা ৩০-৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস উঠে যাচ্ছে সেখানে করোনা যায়নি। ভারতে যে সব করোনা রোগী আছে, সবাই বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছে।

ইন্টারনেটে গতকালকের পণ্ডিচেরির ম্যাক্সিমাম তাপমাত্রা ছিল থার্টি থ্রি ডিগ্রি। আরও বাড়বে এদিকে। ফোরকাস্ট তো তাই বলছে। ধুর, করোনা কী করবে, করোনার বাপও কিছু করতে পারবে না। ইন্টারনেট ঘাঁটতে গিয়ে দেখল ডব্লুএইচও এই রোগটাকে প্যান্ডেমিক ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে গত এগারোই মার্চ। ওরা এই ভাইরাসটার নাম দিয়েছে কোভিড নাইনটিন। করোনা একটা বিশেষ জাতের ভাইরাসের নাম। ফ্লু-ও করোনা জাতের। সার্স, মার্স এসবও নাকি একই জাতের। সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটোরি সিনড্রোমকে ছোট করে সার্স বলে। এই উপসর্গগুলি মিডল ইস্টে হলে মার্স।

ওঃ এই ব্যাপার? গুলি মারো। এটা স্রেফ সর্দি-জ্বর। সঙ্গে একটু শ্বাসকষ্ট হতে পারে। টিভিওলাদের আর কাজকর্ম নেই চার-পাঁচজন মানুষ মারা গেছে বলে প্যানেল ডিসকাশন বসিয়ে দিয়েছে। যদি ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে চাকরি করি, কক্ষনও মানুষকে প্যানিকি করব না। জার্নালিজমের একটা এথিক্স আছে। — ঝংকার ভাবে।

ঝংকারের বাবা বলে— টিভিটা বন্ধ কর না, একটু চোখ

বুজে থাকি, আবার তো বেরুতে হবে ছাই। ঝংকার মিউট করে দেয়। চ্যানেল পাল্টে দিয়ে দেখে তামিল, তেলেগু চ্যানেলগুলিতে কাঁটা কাঁটা বল ঘোরাঘুরি করছে। ঝংকার জানে ওগুলো করোনা ভাইরাস। দেখা যায় না যদিও, কিন্তু ভয়ঙ্কর দেখতে। অ্যানিমেটেড ভাইরাস। মানুষের যত খেলা। যখন রওনা হয়েছিল, হোলির পর দিন, পাড়ায় তো ভালোই হোলি হয়েছিল। খবর কাগজে করোনা নিয়ে একটু-আধটু লেখা হচ্ছিল বটে— বিদেশের খবরের পাতায়। এ ক'দিনে একী হলরে বাবা? যখন বুকিং করা হয়েছিল, তখন তো এসব কোনও ইস্যুই ছিল না। মিডিয়াই নন ইস্যুগুলোকে ইস্যু তৈরি করে।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বাস ছাড়ার কথা ছিল। যা হয় আর কি, সোয়া ছ'টা হয়ে গেল। ব্যানার্জিবাবু বলল, রাস্তায় খেয়ে নেব, কাল ভোরবেলা পৌঁছে যাব আমরা।

হাইওয়েতে উঠে গেল। রাস্তার মোড়ে বেশ বড় বড় হরফে কিছু লেখা। সেই কাঁটাওলা গোল বলের ছবি। কিছু নির্দেশ দেওয়া আছে, পাশে ছবি। থুথু ফেলার ছবিতে কাটাকুটির কাটা চিহ্ন, কলের জলের তলায় হাত, এইসব। ঝংকার ম্যানেজারবাবুকে জিজ্ঞাসা করে— এদিকে করোনাটা কি খুব বেশি হয়েছে? জানেন কিছু? ম্যানেজার বলল— এদিকে কেন, ওদিকেও তো। ইস্কুল টিস্কুল ছুটি করে দিয়েছে। আমাদের দিদিমণি তো চান্স পেলেই ছুটি দিয়ে দেয়। ডেথ ফেথ কিস্‌সু হয়নি।

ঝংকার আর সুনেত্রা পাশাপাশিই যথারীতি। ঝংকার বলে আমি ইচ্ছে করেই কলকাতার সঙ্গে তেমন যোগাযোগ রাখিনি। বেড়াতে এসেছি যখন, কোনও পিছুটান নয়। কোনও খবর কাগজ পড়ছি না। তুই তো মাঝে মাঝেই দেখি কলকাতায় কথা বলিস। ওদিকে কি করোনা হচ্ছে খুব? সুনেত্রা বলে— কই, কিছু বলেনি তো কেউ...।

বাংলা ই-পেপার পড়বে বলে গুগ্‌লে সার্চ দিল ঝংকার। টাওয়ার নেই।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ এলাম্বালুরে এসে বাস রাতের খাওয়ার জন্য থামল। বেশিরভাগ লোকেরই মিল সিস্টেম বেশ পছন্দের। বাজার পার্টির অধিকাংশই বেশ খেতে পারে। ভাতের মাঝখানে হাতকোদালে একটা পুকুর খুঁড়ে সম্বারে পূর্ণ করে চপাং চপাং খাওয়াটা দেখতে বেশ ভালো লাগে। ঝংকারের বাবার আবার রুটিটাই পছন্দ। এদিকে রুটি পাওয়া যায় না। কী করা যাবে। চন্দন মল্লিককে প্রায় রোজই ওর স্ত্রী কনুইয়ের খোঁচা মেরে বলে দেখ, কেমন পয়সা উসুল করছে। চন্দন বলে— রাম মোদক, সদানন্দ, পঞ্চানন ওরা সবাই হাওড়া জেলার লোক।

কতায় বলে না—

> হাওড়ার লোক পেটুক অতি
> ন'দের লোক মেগো
> হুগলির লোক উদার হয়
> বর্ধমান হেগো।

আমরা হলেম গে হুগলির আদিলোক। মল্লিক গিন্নি আস্তে করে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে তুমি কিন্তু নদের মতোই মেগো, বল্লে হবে? চন্দন মল্লিক গিন্নির হাতে টুসকি মেরে বলে তোমার কাছেই মেগো, অন্যের ঘরে নয় কিন্তু।

জগন্নাথ মেনুচার্ট দেখছে। এই হরফে যা লেখা আছে কিস্‌সু বোঝার উপায় নেই। জগন্নাথ প্রায় রোজই কিছু একটা স্পেশাল অর্ডার দেয়। জগন্নাথ চিকেন হ্যায়? ফিস হ্যায় করলে ওরা মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ বলে নাকি না বলে বোঝা যায় না। ওরা রেখে গেল সম্বারের বালতি। থালিতে দু'রকম তরকারি আর পাঁপড়। আলোছায়া বলল, ব্যাটারা বুঝেসুঝেই ভেজ হোটেলে নিয়ে আসে।

ওদিকে রাম মোদক তরকারির আলু নিয়ে পণ্ডিতি করে যাচ্ছে, আর বড় হাঁ করে গিলছে।

ঝংকার দেখল এখানে বেশ জোরাল টাওয়ার আছে। ইন্টারনেটও আছে। পশ্চিমবঙ্গের একটা ই-পেপার পেয়ে গেল। এক আমলা পুত্রের কথা লিখছে। সে বিলেতে গিয়ে একটি মেয়ের সঙ্গে নেচেছিল। আর ছেলেটিরও সর্দি, কাশি হচ্ছিল। ও কিছু না ও কিছু না ভেবে বন্ধুদের সঙ্গে ছেলেটি ঘুরে বেড়িয়েছে, শপিং মলে গেছে। এরমধ্যে খবর পায় যে বিলেতের নাচের পার্টনার মেয়েটির করোনা ধরা পড়েছে। তখন ওই নেচে আসা ছেলেটি নিজের করোনা পরীক্ষা করায়। তখন পজেটিভ আসে, বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি হয়। ওই আমলা এর মধ্যে সরকারি মিটিং করেছেন। একটি সম্পাদকীয়তে ওই আমলার দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নিয়ে লেখা হয়েছে। সারা নবান্নকে স্যানিটাইজ করা হবে। স্বরাষ্ট্র সচিব চোদ্দোদিন কোয়ারিন্টিনে থাকছেন। আরও একজন সম্ভাব্য করোনা রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে, একটি তরুণী, স্কটল্যান্ডে থেকে পড়াশুনো করেন, হাবড়ায় থাকে, তারও উপসর্গ দেখা দেবার পর...

ঝংকারের মা বলে সবার খাওয়া শেষ। তুই কখন খাবি। হঠাৎ এত মোবাইল ঘাঁটার কী হল? ঝংকার খেয়ে নেয় তাড়াতাড়ি। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারে না— কেন দু-একজন মাত্র ইনফেকটেড হয়েছে, এবং তাতেই এত চিন্তার কী হল? পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমস্ত স্কুল-কলেজ মাদ্রাসা ছুটি দিয়ে দিয়েছে। কে জানে বাবা কী ব্যাপার।

বাসে উঠেও করোনা বিষয়ে নানারকম সাইট দেখছিল ঝংকার। সুনেত্রা বলল এত মন দিয়ে কী দেখছিস রে? ঝংকার বলল, তুই তো সায়েন্সের স্টুডেন্ট। আরএনএ নিয়ে একটা ফান্ডা দে তো?

হঠাৎ কী হল? রাত সাড়ে দশটার সময় আরএনএ?

ঝংকার বলল, করোনা ভাইরাসের ব্যাপারটা জানতে চাইলেই কেবল আরএনএ ডিএনএ দেখাচ্ছে। সুনেত্রা বলল— হ্যাঁ, এটা একটি নিউক্লিক অ্যাসিড পলিমার যাতে রাইবো নিউক্লিওটাইড মনোমার থাকে।

—যাঃ বাবা। আরও গুলিয়ে দিলি যে।

—কী করব। আমিও যা পড়েছি মাধ্যমিকে তুইও তাই পড়েছিস। আমি বাংলা মিডিয়ামে, তুই ইংলিশে। তবে হ্যাঁ, অধিকাংশ জীবকোষে আরএনএ, ডিএনএ দুটোই থাকে। করোনা ভাইরাসে খালি আরএনএ ভাইরাস বাড়তে পারে ওদের জন্য সহায়ক জীবকোষ। বাইরে থাকলে জড় পদার্থ মাত্র।

—মুখস্থ আউড়ে দিচ্ছিস তো, ফান্ডা দে।

—ফান্ডা কী করে দেব? এখন তো আমার বায়োলজি নেই। তাছাড়া এসব করোনা ফরোনা নিয়ে জেনেই বা কী হবে? ওসব চীনের ব্যাপার। ছাড় তো... ডেঙ্গিতে এরচেয়ে বেশি লোক মরে। পাত্তা দিস না। ঘুমো। ঘুম কি আসে? করোনা চিন্তা? কে জানে কলকাতা কেমন আছে? সুলগ্নাকে বলে এসেছিল নো কানেকশন উইথ কলকাতা। তাই বলে কি ফোনই করবে না ও! নাকি দেখতে চায় ঝংকার কবে করে?

সুনেত্রা ঘুমোচ্ছে।

ঘুমোলে ওর সারল্য আরও বেশি করে ফুটে ওঠে।

ডোয়ার্ফদের একটা বিশ্বব্যাপী সংগঠন আছে। লিটিল পিপলস অফ ওয়ার্ল্ড। ওদের ওয়েবসাইটও আছে। ঝংকার ওই সাইটে ঢুকল। দেখল কত জ্ঞানীগুণী বড় মাপের মানুষ দর্জির ফিতের মাপে কম। র‍্যাপ গায়ক বুশিক বিল, অ্যানাটমির জনক ভেসালিয়াস, বিখ্যাত ব্যারিস্টার ববি মুর, এমনকী যোদ্ধা মার্শাল ওয়ালডার। একজন বিখ্যাত সার্জেনের কথা মনে পড়ে, ওর উচ্চতা কত কম। ও নাকি টেবিলটা একটু নিচু করে সার্জারি করে। আলোটা নিভিয়ে দিয়েছে। বাসে নীল আলো জ্বলছে। সুনেত্রাকে নীল আলোয় দেখে। আহা, ওকে যদি হাইটটা বাড়িয়ে দেওয়া যেত...।

ডোয়ার্ফিজমের চিকিৎসা নেই? সার্চ দিল ডোয়ার্ফিজম। ট্রিটমেন্ট-এ চলে গেল। উইকিপিডিয়া লিখছে কম বয়সে চিকিৎসা অনেক সময়ে সম্ভব। যদি জেনেটিক কারণে না হয়ে গ্রোথ হরমোনের কারণে হয়, তবে কম বয়স থেকে হরমোন থেরাপিতে অনেক সময় কাজ হয়, কিন্তু ষোলো বছর বয়সের পর আর তাতে কাজ করে না। এরপরে সার্জিকাল টিবিয়াল অস্টেওমি করে তিনচার ইঞ্চি বাড়িয়ে দেওয়া যায়। হাঁটু থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত হাড়টার নাম টিবিয়া। টিবিয়া কেটে ধাতুর রড টুকরো ঢুকিয়ে দিয়ে উচ্চতা বাড়ানো হয়। এক ধরনের ডোয়ার্ফিজম আছে, যেখানে সর্বাঙ্গ ছোট নয়, কেবল পা এবং হাত ছোট, সেক্ষেত্রে পা দুটো বাড়ানো যায়। জটিল এবং খরচা সাপেক্ষ। এসব ভেবে লাভ নেই। ঘুমোনোর চেষ্টা করা যাক। আধো ঘুমের মধ্যে ঝংকার দেখে ও একটা খবর স্কুপ করেছে। ওর কাছে লম্বা গাড়ি করে কারা যেন এসে বলছে ওটা ছাপবেন না স্যার। দশ হাজার ডলার দেব। টাকাটা নিয়ে নেয় ঝংকার। মেয়েটার পা লম্বা করার অপারেশনের জন্য টাকাটা নিয়ে সুনেত্রাকে দেয়। সুনেত্রা তখন টাকাটা দেখে কী সব বলছে। কী বলছে বুঝতে পারে না ঝংকার। ওর মুখ থেকে সাপ ঝরছে, ব্যাঙ ঝরছে। ধুর এসব তো স্বপ্ন। চোখ বোজে, আবার সাপ-ব্যাঙ ঝরা দেখে। তারপর অদ্ভুত ধরনের শব্দ শুনতে থাকে। শব্দ শুনে চোখ খোলে। দেখে ও সমুদ্রের ভিতর দিয়ে উড়ে চলেছে। তখন ভোর। আকাশ একটু একটু ফর্সা। জানলার বাইরে সমুদ্র। দু'পাশেই সমুদ্র। বোঝে সমুদ্র ভেদ করা একটা রাস্তা দিয়ে চলেছে এই বাস। পাশে একটা রেল গাড়ি যাবার লাইনও আছে। সুনেত্রাকে ধাক্কা দিয়ে ওঠায় ঝংকার। সুনেত্রার বিস্ময় দৃষ্টি ঝংকারের দৃষ্টিতে মিশে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ, আধঘণ্টারও বেশি সময় ধরে এই সমুদ্র চিরে যাওয়া রাস্তায় ওদের বাস। তারপর আবার শ্যামল সবুজে আসে। রামেশ্বরম পৌঁছে যায় ওরা।

ম্যানেজার নতুন জায়গায় পৌঁছে বাসের মধ্যেই একটা বক্তৃতা দিয়ে থাকে। কেউ কেউ মন দিয়ে শোনে, কেউ কেউ রাস্তায় নেমে তখন বিড়ি সিগারেট খায়। এখানে ওটা করল না। বরং সকাল থেকেই মোবাইলে ফোন করতে ব্যস্ত হয়ে রইল, সেটা বাসে নয়, আড়ালে গিয়ে— যেন কেউ না শুনতে পায়। পণ্ডিচেরিতেও একটু দূরে দাঁড়িয়ে ফোন করতে দেখেছে। দু-একটা কথা কেউ কেউ শুনে ফেলেছিল, যেমন ঝংকার। ম্যানেজার বেশ উত্তেজিত হয়েই বলছে— আমার অ্যাকাউন্টে টাকা না পাঠালে আমি কী করে এটিএম দিয়ে টাকা ওঠাব? আমি কিন্তু খুব সমস্যায় পড়েছি স্যার...। ...এক একবার এক একরকম বলছেন স্যার... কোথায় কেউ দেয়নি... ভেঙ্কটেশ্বর হোটেল তো বলল আপনার সঙ্গে ওদের কোনও ডিল হয়নি...। ঝংকার বুঝেছিল এসব ওদের ইন্টারনাল সমস্যা। ম্যানেজার বোধহয় বুঝেছিল যে এরকম দূরত্বে থাকলে কেউ শুনতে পাচ্ছে, একটু দূরে সরে গিয়েছিল। কাল রাত্তিরেও খাবার সময় সবার আড়ালে গিয়ে ম্যানেজারবাবু ফোনে কথা বলছিল, আর হাত ছুঁড়ছিল। এখনও তাই করছে।

নতুন জায়গায় পৌঁছে সকলেই কাউকে না কাউকে 'এই পৌঁছে গেছিরে'— জানায়। 'সব ঠিকঠাক তো?'— ইত্যাদি আদান প্রদান হয়। ঝংকার চন্দনবাবুর স্ত্রীর উত্তেজিত গলায় শুনল— কী বলছো গো দিদি? তাই বুঝি? সে কী গো? তারপর হাতে ফোনটা রেখেই স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল— জনতা কারফিউ কী গো? চন্দনবাবু বলল— জনতা স্টোভ জানি, কারফিউও জানি, কিন্তু জনতা কারফিউ জানি না। এটা আবার কে বলল?— চন্দনবাবুর কপালে কোনও কুঞ্চনও নেই। মানে, উনি নিশ্চিত যে ওর গিন্নি কী শুনতে কী শুনেছে। চন্দনবাবুর স্ত্রী হল গিন্নি। গিন্নিরা পান খায়, স্বামী সোহাগী, ওদের স্বামীরা গয়না গড়িয়ে দেয়। সুনেত্রার মা হল সুনেত্রার বাবার স্ত্রী। স্ত্রীরা একটু কাঠখোট্টা। গিন্নিরা ফুচকা খায়, স্ত্রীরা ঝালমুড়ি। ঝংকারের মা কিন্তু ওর বাবার ওয়াইফ। ঝংকারের বাবা সকালে ব্রেড বাটার খায়। ঝংকারের মা ছুরি দিয়ে মাখন মাখিয়ে দেয়। ওধারে একজন লোক আছে, বিমানবাবু। ওর বউ আছে। ওরা আলাদা আলাদা থাকে। বউ হলে এই যা এসব বলে। কোনও মিসেস নেই। এই যে আমার মিসেস— এই টাইপের কেউ নেই। মিসেসদের লিপস্টিক থাকে ঠোঁটে। মিসেসদের কাঁধ ছাঁটা চুল থাকে। হাঁচলে মিসেসরা সরি বলে। জগন্নাথবাবুর সঙ্গে যে মহিলাটি আছে আলোছায়া দেবী তিনিও লিপস্টিক মাখেন, কিন্তু সে কি গিন্নি, ওয়াইফ, বউ, মিসেস?

বচনলাল যদি ওর বউকে আনত, কী বলত? পরিবার! নিমাই পেদো? সে কী বলত! টাকা থাকলে কিন্তু 'পরিবার' বলে না আর। সদানন্দ ভুরির অনেক টাকা। বউকে মিসেস বলতে পারে কিন্তু গিন্নি বলবে না। কিন্তু যদি কোনও লটারি পাওয়া মেথর আসত, সে তাঁর বউকে বলত 'আমার পরিবার'। টাকা হয়ে গেলেও গিন্নি বলতে পারে না। পরিবার যারা বলে ওরা বাংলা খায়। বেটার হাফ যারা বলে, ওরা হুইস্কি খায়। চিপস দিয়ে। কখনও কাজুবাদাম। ওর মা ওয়াইফ। ওয়াইফরা বাড়িতে মদ খেতে দেয় না। 'স্ত্রী'রা তবু এক আধবার দেয়। বেটারহাফরা নিজেও এক চুমুক খায়। মিসেসরা শসা কেটে দেয়। এই গ্রুপে কোনও বেটার হাফ নেই। কোনও মিসেসও নেই।

একটা হলুদ রঙের বাড়ির সামনে ম্যানেজার দাঁড়াল। বলল, এটা স্বামীনাথ লজ। যে যার রুমে যাবার আগে জেনে যান গতকাল প্রধানমন্ত্রী টিভিতে বলেছেন যে আগামী ২২ মার্চ কারফিউ হবে। রাস্তাঘাটে বেরুনো যাবে না। বাইশ তারিখ বাসও চলবে না। একটা দিন নষ্ট, তাই আমাদের ট্যুর প্রোগ্রাম একটু পাল্টে নিতে হচ্ছে। আমরা আজ রাত্রেই মাদুরাই চলে যাব। কন্যাকুমারিকা ক্যানসেল করতে হচ্ছে।

সমবেত জনমণ্ডলীর হাতগুলো এধার ওধার করতে লাগল, মাথা এধার ওধার করতে লাগল। রামবাবুর লোকজনই এখানে বেশি, ফলে রামবাবুরই হ্যাঁ অথবা না বলার অধিকার বেশি ভেবে ম্যানেজার রামবাবুকেই বলল, আপনিই বলুন স্যার কী করব? আপনি বলেছিলেন বারবার সমুদ্র দেখতে আর ভালো লাগছে না। তাই বলছি

কন্যাকুমারিটা বাদ দিয়ে দিন। সোজা মাদুরা চলে যাই। চেন্নাই থেকে নির্দিষ্ট দিনেই আমরা ফিরব। একটা দিন না হয় উটিতে থেকে যাব একস্ট্রা।

—উটিতে কী আছে? রামবাবু জিজ্ঞাসা করে।

—খুব ভালো জায়গা দাদা, পাহাড়, ঝর্ণা, দার্জিলিঙের চাইতেও ভালো।

রাম মোদকের মুখটা ধসা রোগ খাওয়া আলু গাছের গুগ্‌লা আলুর মতো দেখাল। কেন কারফিউ?

কী লাভ তাতে, মাদুরাতে মাদুর ছাড়া আর কী আছে— এতসব বিচার করে একটা কিছু বলাটা বেশ কঠিন। গোপাল সাহার দিকে তাকায় রামচন্দ্র। গোপাল সাহা বিকম পাস। ওকেই বলে রামবাবু। বলো গো গোপাল কী করব?

গোপাল মাথা চুলকে বলল— ফিরার টিকেট কাটা, নইলে দুইদিন আগেই ফিরতে পারতাম। আমার মতে কন্যাকুমারীটা বাদ দেওয়া ঠিক না। কন্যাকুমারী হইতে কাশ্মীর হইল আমাদের ভারত। কাশ্মীর তো যাওয়া ইমপসিবুল, কন্যাকুমারীটাই দেখি। তাছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের একটা ছবি দিয়া নতুনত্ব ক্যালেন্ডার করছিলাম মনে আছে, দুই বছর আগের হালখাতায়। ধ্যানে বসা, ওইডা তো কন্যাকুমারীর সমুদ্রের ভিতরে একটা ছুড পাহাড়ের মাথায়। ক্যালেন্ডারটার হেভি প্রশংসা করছিল লোকজন। ওই জায়গাটা চোখের দেখা করা উচিত।

এইসব শুনে সুনেত্রা ঝংকারের হাতে ছোট করে একটা চিমটি কাটল। ওর মুখে একটা রগড় রগড় হাসি। ঝংকার ওর দিকে তাকিয়ে হাসল।

এটা দেখে ঝংকারের মা ঝংকারের বাবার হাতে চিমটি কাটল।— দেখছ, বাঁটকুল মেয়েটার ঢলানিটা দেখেছ? এবার থেকে মেয়েটাকে বল ওর মায়ের পাশে বসতে। ঝংকারকে বলব ওর বাপের পাশে বসুক।

বিলাসচন্দ্র বলল— এটা বাজে দেখায়। ঝংকার কী ভাববে। আর ঝংকারের সমবয়সি কেউ নেই। মেয়েটার সঙ্গে কথা কইচে, তাতে কী হয়েছে।

—না, মেয়েটার কিন্তু বেশ গায়ে পড়া ভাব। এমনিতে বেঁটে হলে কী হবে, খুব ডেভেলাপ বডি। ছেলেটা ফেঁসে যাবে না তো...

—কী যে বলো, আমার ছেলে কি অত গাড়ল নাকি যে ফেসে যাবে? ওর তো দেকতে ভালো মেয়ে বন্ধু আচে, বাড়িতে এয়েছেল না?

ইতিমধ্যে একটা গুঞ্জন। মতভেদ। কেউ বলছে মীনাক্ষী মন্দিরটা বাদ দেওয়া ঠিক হবে না। ওয়ার্ল্ড ফেমাস। কেউ বলছে দুটোই দেখব, বরং ফেরার সময় তাঞ্জোরটা বাদ দিয়ে দেবেন খনে।

জগন্নাথ কোনও মতামত দিচ্ছে না। আলোছায়া বলল— তুমি কিছু বলছ না কেন গো?

জগন্নাথ বলে— জানোই তো। দরজায় ছিটকিনি থাকলে আমার সব সমান। ম্যানেজার সজলবাবুকেই বিচারক নির্বাচন করে বলল আপনিই বলুন।

সজল মিত্র গলাটা বাঁদিকে করে সামান্য ঝেড়ে, মাইকের সামনে যেমন, বলতে লাগল— ভারতের দক্ষিণ প্রান্তের শেষ বিন্দু যেখানে একই সঙ্গে মিশেছে বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগর, যেখান থেকে একই সঙ্গে দেখা যায় সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত...

—ঠিক আছে, বুঝেছি, কন্যাকুমারিকা। তবে আজ রামেশ্বরমটা ভালো করে এনজয় করুন। কাল কন্যাকুমারিকা যাওয়া যাবে। কিন্তু বাইশ তারিখ কোথাও বেরুনো যাবে না। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কারফিউ। সন্ধের পর দূর থেকে বিবেকানন্দ শিলা দেখে নিয়ে রাত্তিরেই রওনা হব। নিমাই পেদো ম্যানেজারকে বলল, সেই তো সমুদ্দুরই হয়ে গেল স্যার।

হোটেলে চেক ইন করতে গেলে জিজ্ঞাসা করে নিল কারও সর্দিকাশি জ্বর আছে কি না। যদি থাকে, কর্পোরেশনকে জানাতে হবে। সবাইকে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে হোটেলে ঢুকতে হল। রিসেপশনের পিছনে একটা বিরাট ছবি, হনুমান লাফ দিচ্ছে। নীচে সমুদ্র। সমুদ্র থেকে একটা কুমির গলা উচিয়ে হাঁ করে আছে। হাঁয়ের মধ্যে একটা স্টিকার সাঁটা ওয়াশ ইয়োর হ্যান্ড।

ঝংকার প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতাটা শুনল ইন্টারনেটে। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়েছে। সরকার হুঁশিয়ার। তবে এই অসুখটা মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়। মানুষের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। ঘরে থাকাই ভালো। অনুরোধ করা হল একদিন সবাই ঘরে থাকুন। সূর্যোদয় থেকে রাত আটটা। আর বিকেল পাঁচটায় যে যার বাড়ির বারান্দায়, ছাদে বা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, যারা করোনার বিরুদ্ধে লড়ছে, তাদের অভিনন্দন জানিয়ে শাঁখ বাজান, কাঁসর ঘণ্টা বাজান।

এটা মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়। মানে মানুষ নিকটবর্তী হলে কোনও আক্রান্ত শরীরের ভাইরাস সুস্থ মানুষের দেহে চলে যেতে পারে। কিন্তু একদিন ঘরের ভিতরে বসে থাকলে কী লাভ হবে বুঝতে পারল না ঝংকার।

রামেশ্বরের রামনাথ স্বামীর বিরাট মন্দির। সজল মিত্র নিজের মনে মনে বলছে চুল তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য কে জানে কেন? তবে মন্দিরে কারুকার্য প্রচুর। বিরাট বিরাট গোপুরম। গোপুরম মানে গেট। ঝংকার জানে প্রতিটি গোপুরমে ওর বাবার ছবি তুলে দিতে হবে, সেলফিতে পোষায় না বিলাসবাবুর। কন্যাকুমারীতে গিয়ে বিলাসবাবু নির্ঘাত দু'হাত আড়াআড়িভাবে বুকে ফিট করে স্বামী বিবেকানন্দর কায়দায় ছবি তোলাবে— ঝংকার জানে। মল্লিক গিন্নি গরদের শাড়ি পরে এসেছে, লাল পাড় পুজো দেবে। আরও অনেকেই পুজো দেবে। পান্ডারা সাদা ধুতি পরা, কোঁচা নেই, খালি গা, কপালে সাদা সমান্তরাল রেখা। একজন হিন্দি-ইংরেজি জানা পাণ্ডাকে ঠিক করল মল্লিকবাবু। হাত জোড় করে ভারাভেরপু ভারাভেরপু বলতে বলতে প্রথমেই একটা কমণ্ডলু থেকে জল ছিটিয়ে বলল, গঙ্গা থানির। কাশী গঙ্গা কা ওয়াটার। দিস টেম্পল ইজ ভেরি ফেমাস। পিরাপালামানাতু। ওয়ান অফ দি চারধাম। ওয়ান অফ দি বারা জ্যোতির্লিঙ্গম অফ ইন্ডিয়া। রামেশ্বর মে টু টেম্পলস। ইবানতু।

দুটো আঙুল দেখাল পান্ডা।

'মেইন ওয়ান মেড বাই রামচন্দ্র স্বামী। হোয়েন লংকা অ্যাটাক কিয়া, পহেলে শিব পূজাকে লিয়ে আসকড হনুমান টু ব্রিং-এ শিবলিঙ্গম ফ্রম কৈলাস ফর ওয়ারশিপ। লেকিন হনুমান লেট কিয়া, টাইম পাসিং, টাইম পাসিং, নো হনুমান কাম। উসকি বাদ রামচন্দ্র আসকড সীতা টু মেক এ শিভ লিঙ্গম বাই মান্নাল মিনস স্যান্ড। স্যান্ড শিভ লিঙ্গম ওয়ান টেম্পল, বাট থোড়া বাদ মে হনুমান কেম উইথ এ বিগ লিঙ্গম, ব্রট ফ্রম কৈলাস। বাট মান্নাম মিনস স্যান্ড লিঙ্গম ওয়াজ সো স্ট্রাং, সো স্ট্রাং কুড নট রিপ্লেস। এ মেটাল কভার

সেট অন দি স্যান্ড লিঙ্গম। মেন লিঙ্গম কা পূজা পহেলে স্যান্ড লিঙ্গম কা পূজা ইজ মাস্ট।'

উত্তর ভারতীয়দের কাছে গল্পটা এরকম ভাবেই পরিবেশিত হয়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয়রা গল্পটা অন্যরকম ভাবে বলে।

শিবভক্ত রাবণকে মার্ডার করার পর রামচন্দ্রর মনে খুব আফসোস হল। মুনি-ঋষিদের জিজ্ঞাসা করতে লাগল কী করে এর প্রায়শ্চিত্ত করা যায়? বশিষ্ঠ মুনি বললেন, এখানে একটি শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে পূজা করো। এখানে একটা চটি বই কিনেছিল ঝংকার। এক দক্ষিণ ভারতীয়র লেখা কে টি নাগরাজন। সেখানে এরকমটাই আছে। অনুগ্রহ এবং আশীর্বাদের জন্য বিফোর লঙ্কা অভিযান নয়, অনুশোচনা এবং অপরাধবোধে আফটার লঙ্কা অভিযান রামচন্দ্র শিবপুজো করেছিলেন। রাবণকে এদিকের সাধারণ মানুষ বোধহয় অতটা খারাপ চোখে দেখে না।

অনেকেই শিবপুজো দিল। মোদকমশাইয়ের কপালে বেশ চওড়া করে সাদা চন্দন। চন্দন তো নয়, সাদামাটি। আলমবাজার পার্টি বেশ খুশি। মন্দির থেকে বেরিয়ে ম্যানেজারবাবুকে পাওয়া গেল না। দুপুরে খেতে হবে তো...।

ম্যানেজারবাবুকে ফোন করা হল। ম্যানেজারবাবু বলল— আপনারা হোটেলে যে যার মতো খেয়ে নিন, আমি এসে পে করে দেব। আমি এটিএম-এ টাকা তুলতে এসেছি। বিকেলে ধনুষ্কোটি যাবার কথা। যেখানে রাম সেতু আছে। বানর সেনারা সব পাথর বয়ে বয়ে এনে সমুদ্রে সেতু বানিয়েছিল। কাঠবেড়ালিও নাকি বালিতে লুটোপুটি খেয়ে সারা গায়ে আর লোমের ভিতরে বালি বয়ে এনে সেতুতে গা ঝাড়া দিয়ে ফেলেছিল। যতটা পারে করেছিল কাঠবেড়ালি। সীতাদেবী কাঠবিড়ালিকে আদর করেছিল আঙুলে। কাঠবিড়ালির গায়ে নাকি সেই আদরের রেখা ফুটে আছে আজও।

এইসব গল্প শুনে অন্যরা যতটা আহা আহা করে ঘাড় নাড়িয়েছে, মতিউর তারচেয়ে বেশি নাড়িয়েছে। এবং মাশাল্লা, আলহামদুল্লিলা বলেছে। মানে ঈশ্বরের কী মহিমা। রামেশ্বরম মন্দিরে যায়নি যদিও। কারণ ও জানে না মন্দিরের বাইরে লেখা আছে কি না পুরীর মতো হিন্দু ছাড়া কেউ ঢুকবে না।

হোটেলের নীচের বারান্দার টুলে বসে আছে সবাই। কোথায় ম্যানেজার? ফোন সুইচড অফ। হোটেল বলল, চাবিটা রেখে গেছে। হি মাস্ট কাম। ডোন্ট ওয়ারি। আরও মিনিট পনেরো কেটে গেল। ট্যুর ম্যানেজার আসছে না। হোটেল ম্যানেজারের সামনের দেওয়ালে একটা টিভি চলছে। একটা আলোচনাসভা, তামিল ভাষায়। তবে কাঁটাওয়ালা গোল বলটা যখন নাচে, বোঝা যায় করোনা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। হোটেল ম্যানেজার বেঞ্চিতে বসা লোকগুলোকে বলল— কিপ ডিসট্যান্স, মেনটেন ডিসট্যান্স— সোশ্যাল ডিসট্যান্স প্লিজ...।

বচনলাল বাইরে থেকে ঢুকেই বলল কেসমে গড়বাড়ি লাগতা হ্যায়। বাসটা ভি নেই।

রাম মোদক বলল— হয়তো তেল ভরতে গেছে, ঠিক চলে আসবে।

চন্দন মল্লিক বলল, আমারও ভালো ঠেকছে না। মালিকের সঙ্গে গণ্ডগোল হচ্ছে আঁচ করছি। ফোনে হট হট কতাবাত্রা শুনিচি। কাগজে পড়ি তো মাঝেমধ্যে মাঝপথে ফেলে দিয়ে কোম্পানি ভেগেচে। ফোনটোন করা হচ্ছে, ফোন সুইচড অফ। দেশ-বিদেশ কোম্পানির ফোন নম্বর সেভ করা ছিল কারওর মোবাইলে উত্তর দিচ্ছে না।

সুনেত্রা ঝংকারকে এই, এদিকে শুনে যা...। মেয়েটো হাতছানি দিয়ে ডাকে। বেশ সাহস হয়েছে তো মেয়েটার...। ঝংকার কাছে যায়। সুনেত্রা বলে নিচু হ, নিচু হ, নিচু না হলে তো কানে কানে কথা বলা যায় না। ঝংকার কুঁজো হয়। সুনেত্রা বলে বিকেল হয়ে যাচ্ছে, এক্ষুনি না গেলে কিচ্ছু দেখা যাবে না আর। ঝংকার বলে কী করে যাব? সুনেত্রা বাইরে দাঁড়ানো অটোগুলোকে দেখায়। ঝংকারের মা বাঁকা চোখে ওই বেঁটে মেয়েটাকে দেখে। ঝংকার সোজা হয়। কোমরে হাত দেয়। বলে, ম্যানেজারের জন্য অপেক্ষা করলে ধনুষ্কোটি মিস করব। কোনও প্রবলেম হয়েছে নিশ্চয়ই বাস সারাতে গেছে। চলুন অটো নিয়ে চলে যাই, জিপও আছে বোধহয়...।

ঝংকারের মা সবার আগে মাথা জোরে ঝাঁকিয়ে বলল, আমি যাব না। যেন ফোঁস করে উঠল। বচনলাল বলল, যানা তো জরুরি হ্যায় ভাই, হনুমানো কা কামাল দেখনা। আউর তো আসা যাবে না। ঝংকারের বাবা-মাও বলল যাই দেখেই আসি। সদানন্দ, উত্তম ওরা রামবাবুর সম্মতি-অসম্মতির অপেক্ষায়...। সুনেত্রা এগিয়ে গেল। একটা জিপের ড্রাইভারের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। ইংরেজিতেই। মেয়েটা গুনছে ক'জন লোক। বাব্বা, বেশ লিডারশিপ নিতে শিখেছে তো। কয়েকজন রাজি হল না। নিমাই, উত্তম সদানন্দরা নিজেদের মধ্যে কিছু জরুরি কথাবার্তা সেরে নিল। সম্ভবত ওরা বোতল নিয়ে বসবে সেই সময়টাতে। মতিউর পড়েছে মহা মুশকিলে। ওকি রামের কর্মকাণ্ড দেখতে ওদিকে যাবে, নাকি, এদিকে থাকবে? ওদের জুম্মাবারের খুতবায় ইমাম সাহেব বলে যত খারাবি হয়েছে এই হিন্দুস্থানে এর জন্য দায়ী হল রাম। এই রামের কারণেই বাবরি মসজিদ ভেঙেছে, হাজারো দাঙ্গা হয়েছে। কিন্তু এমনিতে কিস্‌সা হিসাবে তো ভালো লাগে বেশ। আদম-হবা, এজিদ-হাসান হুসেনের, ফেরাউনের দাজ্জালের গল্প শুনেছে দাদির কাছে। কিন্তু রামের কিস্‌সা বেশ লাগে। ওর স্পটটা দেখতে যেতে ইচ্ছে করছে। ওখানে কি মন্দিরও আছে? থাকলে ঢুকবো না। জিপ যেখানে থামল, তারপর আর জনবসতি নেই। দু'ধারে সমুদ্র। একটা বালির চরা যেন মাঝখানে জেগে আছে। বালির চরা দিয়ে হেঁটে যাওয়া যায়। কিছুক্ষণ হাঁটল সবাই। ঝংকারের মা আর একটু এসেছিল। হয়তো ছেলেকে পাহারা দেবার জন্য। কিছুটা হেঁটে বলল আর পাচ্ছিনে। চোখের দ্যাকা তো হয়েই গেল পেন্নাম ঠুকে ফিরে চল। বিলাস বলল লাস্ট পয়েন্টে গিয়ে একটা ছবি না তুল্লে এ্যাদ্দুর আসার কী মানে? ঝংকারের মা ভ্রু পল্লবে কারুকাজ রচনা করে ঝংকারের বাবাকে বলল 'খেয়াল রেখো কিন্তু'। ব্যাঞ্জনার্থ বহুধা।

আরও কিছু দূর গেলে ভিউ পয়েন্ট। এখান থেকে চরাটা সরু হয়ে মিলিয়ে গেছে। জোয়ারে ঢেকে যায়। বেশ কিছু শিলাখণ্ড, বোল্ডার বলতে যা বোঝায়, তারচেয়ে অনেকটাই বড়, সমুদ্রে ছড়ানো।

শিলাখণ্ডগুলো যোগ করলে একটা প্রায় সরল রেখা কল্পনা করা যায়।

বচনলাল জয় শ্রীরামজি বলে দু'হাত তুলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল। কৃপাসিন্ধু রথ বলল কে সমুদ্রপুজো দিবে তো কুয়। মন্ত্র পঢ়াই দেবি। ওঁ রুদ্রায় সমুদ্রায়, সর্বপাপ বিনাশায়...। চন্দন মল্লিক বলল, ভাবা যায়, এখানেই জড়ো হয়েছিল হাজার হাজার হনুমান, বাঁদর, নাকি লাখ লাখ? সবার কাঁধে পাথর এইখানে দাঁড়িয়ে ছিল রাম, সুপারভাইজ করছিল। একটা

বালির ঢিপির উপর দাঁড়িয়ে সেলফি তুললেন মল্লিকমশাই। মল্লিকমশাই নেমে গেলে ঝংকারের বাবা ওখানে, সমুদ্রের দিকে মুখ। ঝংকার জানে এবার ওর কী কর্তব্য। আলোছায়া জগন্নাথকে বলল— চলো হেঁটে হেঁটে দু'জনে লঙ্কায় চলে যাই। জগন্নাথ বলল— ওরেবাবা, ওখানে রাক্ষসে ধরবে তোমায়। আলোছায়া বলে তুমি উদ্ধার করবে। জগন্নাথ বলে তাহলে তো একটা বিভীষণ চাই। আলোছায়া বোধহয় মানেটা না বুঝে, নাকি বুঝেই বলল— তুমি আবার রাবণের অন্তঃপুরে গিয়ে সেঁটে যেও না, ওর নাকি অনেকগুলো সুন্দরী সুন্দরী বউ। অবশ্য ওদের তুমি সুবিধে করতে পারবে না। রাক্ষসী তো...। জগন্নাথ বলল, তোমায় পারলে ওদেরও পারব...।

সজল মিত্র চুপচাপ। সমুদ্র সম্পর্কিত কবিতার স্টক বোধহয় ফুরিয়ে গেছে। বচনলাল একমুঠো বালি তুলে নিল। নিজের মাথায় একটু দিল। রামজীউর পায়ের টাচ থা ইস জমিন মে। মতিউরের মাথাতেও একটু দিল। মতিউরের কি এখন মাশাল্লা বা শুভানুল্লা বলা উচিত? ওর কি এখন হাত জোড় করা উচিত? সমুদ্রে ধু ধু। আকাশে ভোঁ ভোঁ। বচনলাল মতিউরের কাঁধ ধরে ঝাঁকাল। এ্যাই, জয় শ্রীরাম বলতে ইচ্ছে করছে না তোর, বল, জয় শ্রীরাম। বল...। মতিউর সামনের অনন্তের দিকে তাকিয়ে বলল, জয় শ্রীরাম। চোখে পানি আসে কেন? খোদা এমন বিপদে কেন ফেলে। চোখে পানি আসার সিস্টেমটা না দিলেই ভালো হতো। পানি না, জল। হাত দিয়ে চোখ মোছা ঠিক হবে না। হাওয়া, বে হাওয়া— শুখা করে দে।

অপরূপ নামের সেই ছেলেটি চারদিকে তাকাচ্ছিল। আপন মনে বলল, সমুদ্রটা যেন দিন-রাত সাবান ঘষছে নিজের গায়ে, ওরও কি করোনার ভয়? তারপর আবার পিছনে তাকিয়ে বলল, এদিকে কিন্তু একদম কলাগাছ নেই। বানর সেনারা কী খেত বাবা?

সুনেত্রা বলল, যাই বলিস ঝংকার, জায়গাটা কিন্তু অ-অ-অসাম। সেলফি তুলি? তুই পাশে আয়।

ঝংকার ওর পাশে এসে নিলডাউন হয়। সুনেত্রা বলে তুই ছোট হয়ে যাচ্ছিস কেন? তুই দাঁড়িয়ে থাক। আমি যা তাই। তুই কেন ছোট হবি? ঝংকার বলে— না-রে, সেম হাইটে ছবির ফ্রেম ভালো হয়। সুনেত্রা বলল— আমি তো তোকে ডেকেছি। তুই উঠে দাঁড়া। ছবিটা তো আমি তুলব। ঝংকার দাঁড়ালে সুনেত্রা ক্লিক করে। এটা ওর সঙ্গে প্রথম ছবি। সুনেত্রা বলল, বেশ থ্রিল হচ্ছে। থ্রিল হবার কারণ জিজ্ঞাসা না করেই ঝংকার বলল, আমারও রে, ভাবা যায় সমুদ্রের উপর দিয়ে এখানে একটা ব্রিজ তৈরি হয়েছিল কত হাজার বছর আগে, এবং র‍্যাপিডলি। সুনেত্রা বলল, তুই সত্যিই বিশ্বাস করিস— বাঁদর আর হনুমানরা এখানে একটা ব্রিজ তৈরি করে ফেলেছিল?

ঝংকার বলে হনুমান না হোক, লোকাল ট্রাইবাল মানুষরা তৈরি করেছিল...।

সুনেত্রা কোমরে হাত দিল। বলল, চুয়াল্লিশ কিলোমিটার ব্রিজ বানিয়ে দিল তিন দিনে? এটা বাঁদর মেড নয়, ম্যান মেডও নয়, ন্যাচারাল। এটা জিওলজিকাল। এটা সাবমার্জড ব্রিজ হতে পারে, শাওন হতে পারে। একসময় ভারত আর সিংহল জোড়া ছিল, মাঝের অংশটা বসে গেছে— সেটাও হতে পারে। মাঝখানে অনেক বড় বড় রকস আছে। জোড়া ছিল হয়তো। মাঝখানে ডেপ্‌থ কিন্তু খুব কম। বড় বড় জাহাজও যেতে পারে না।

ঝংকার বলল— সেটাই তো বলছি। মাঝের ফাঁকা জায়গাগুলোকে পাথর দিয়ে ভরাট করে দিয়েছিল ট্রাইবালরা। শ্রীলঙ্কা যাবার পথটা রিবিল্ড করেছিলেন রাম বা অন্য কেউ— এভাবেও তো ভাবা যায়।

সুনেত্রা বলল, না, যায় না। মাত্র তিনদিনে এই ব্রিজ করতে হয়েছিল। যদি অ্যাভারেজ আটফিটও ডেপথ হয়, আর চুয়াল্লিশ নয়, দশ কিলোমিটারও যদি ভরতে হয়— কত কিউবিক ফিট পাথর লাগে হিসেব করেছিস? ছোটদের রামায়ণে পড়েছিলাম বানর সেনারা চারদিনে এটা বানিয়েছিল— এটা কি সম্ভব? আশপাশে পাহাড়-টাহাড় কিচ্ছু নেই। বলতে পারিস পিরামিডের আশপাশেও তো পাহাড় নেই। দূর থেকে পাথর বয়ে আনতে হয়েছিল। কিন্তু এক একটা পিরামিড বানাতে কত দিন লেগেছিল? বেশ কয়েক বছর।

ঝংকার বলে স্পেশাল টাইপ অফ স্টোন ফেলা হয়েছিল, ঝাঁঝরা, ভিতরে এয়ার স্পেস আছে, ওগুলো জলে ভাসত। একেবারে নিচু থেকে ভরাট করতে হয়নি। তাছাড়া এত বছরের একটা মিথ, যা বিশ্বাস করে মানুষ, আর আমি তো এভিডেন্স দেখতেই পাচ্ছি। সুনেত্রা বলল— মিথ তো মানুষ তৈরি করে। আমার মামার গ্রামের বাড়িতে একটা পুকুর আছে, ওটার নাম অহংকারের পুকুর। বেশ বড় পুকুর। কিন্তু জল নেই। কে যেন কবে তাঁর মায়ের স্মৃতিতে ওই পুকুরটা কাটিয়েছিল। পুকুরে নাকি টলটলে জল ছিল। এই পুকুরটা প্রতিষ্ঠা করে সে বলেছিল— মাতৃঋণ শোধ করলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে পুকুরটার জল কমতে লাগল। এক রাতে পুকুরটা শুকিয়ে গেল। মাতৃঋণ কক্ষণও শোধ হয় না। মাতৃঋণ নিয়ে মানুষের মৃত্যু হয়। লোকটা অহংকার করে কথাটা বলেছিল বলে পুকুরটার নাম হয়ে গেল অহংকারের পুকুর। অনেক পুকুর খুঁড়লেও জল আসে না। জিওগ্রাফিকাল কারণে। একটা ভ্রমণ কাহিনীতে পড়েছিলাম কেওনঝরের কাছে একটা গম্বুজের মতো বিরাট রক পড়ে আছে। ওটার মাঝখানে একটা ফাটল, কিন্তু একটা সমান লাইন। লোকে বলে ওটা ছিল সীতার রসুই ঘর। বাল্মীকির আশ্রম ছিল ওখানে। একটা গুহা আছে, যার ভিতরে দুটো গোলাকৃতি পাথর আছে। লোকে বলে লব-কুশের বালিশ। রাম যখন আবার সীতাকে ডেকে পাঠালেন, সীতা রান্নাঘরটা বন্ধ করে অযোধ্যা গেলেন, তারপর তো সেই অগ্নিপরীক্ষা, সীতা পাতালে গেলেন। রান্নাঘরের দরজাটা বন্ধই রইল। দুই দরজার মাঝখানের দাগটা রয়েই গেল। আসলে তো রক ক্র্যাক। পাথরের ফাটল। কিন্তু গল্পটা? ওটা তো মানুষেরই বানানো। আরও কত গল্প প্রাকৃতিক ব্যাপার নিয়ে। মাটি ফুঁড়ে জল বেরয় এক জায়গায়। আর্টিজিয়ান কূপ— পড়েছিলাম না ভূগোল বইয়ে। দ্রৌপদীর তেষ্টা পেলে মাটিতে বাণ মেরে জল বের করলেন— এরকম একটা আর্টিজিয়ান কূপের কথাও পড়েছিলাম। কূপটা তো সত্যি, ফাটলটা তো সত্যি, কারণটা সায়েন্টিফিক, আমি কিন্তু গল্পগুলো হেলাফেলা করছি না। কিন্তু ওগুলো গল্প।

ঝংকার দেখছিল সুনেত্রা একটা একটা উদাহরণ দিচ্ছে, আর একটু একটু করে লম্বা হয়ে যাচ্ছে।

সূর্য ঢলে আসে। সমুদ্রের একদিকে সোনালি ঝিকিমিকি, সমুদ্রের গভীর থেকে উড়ে আসছে সমুদ্র মরালের ঝাঁক।

ঝংকার বলে— একটা ছবি তুলি? সেলফি। দু'জনের।

একটু নিচুতে ক্যামেরা ধরল। দু'জনের মাথার উপরে কমলা কমলা রং মাখানো মেঘ আর উড়ন্ত মরাল।

ওরা ফিরল। হোটেলের সামনে ওদের দলের কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। বলল, শালারা বোধহয় পালিয়েছে। ব্যানার্জি ম্যানেজার ফোন বন্ধ করে রেখেছে, বাসেরও পাত্তা নেই। মল্লিকগিন্নি মল্লিক মশাইয়ের শার্ট খামচে বলল, তাহলে আমাদের কী হবে গো...। আমি তখুনি বলেছিলুম সস্তা সস্তা কোরো না, ভালো কোম্পানির সঙ্গে চলো... শুনলে না। দেকলে তো..., তোমার কেবল সস্তা-সস্তা। সস্তার সাত অবস্থা।

মল্লিকবাবু বলল, থানায় রিপোর্ট করেছেন?

গান্ধীবাবু বলল, সবাই তো আমনাদের জন্যই তো অপেক্ষা। শিক্ষিত জনের ব্রেনের মটর আর আমাদের মটর কি এক? কী করা বলুন। গান্ধীকুমার সবাইকে ডেকে আনল।

উত্তম বলছিল একটু মুডে থাকার চান্স নেই। কী ট্যুর মারাচ্ছি মাইরি।

নিমাই বলল— এই যে স্যারেরা, এবার আমরা কী করব বলুন।

সুধীরবাবু বলল— এতক্ষণ আপনারা বসে বসে ফুর্তি করছিলেন কেন? থানায় খবর দিতে পারলেন না? বাসের নম্বর রেখেছেন? ওরা একজন অন্যজনের দিকে চেয়ে রইল। গোপাল সাহা মোবাইল বের করে বলল, আমার কাছে আছে। ছবি তুলে রেখেছিলাম।

থানায় রাম মোদককে যেতেই হবে। ওর কথাতেই তো বাজার সমিতি এসেছে। গোপাল সাহা গেল, বিকম পাস। ইয়ং ছেলে হিসেবে ঝংকারকেও নিতে চাইল ওরা। মল্লিকগিন্নি কর্তার শার্ট চেপে ধরল আবার— ওরা যা করে করুক, তোমার থানা পুলিস করতে হবে না। মল্লিক বলল— আমি আর যাচ্চিনে। মাথা ঘুরচে। ঝংকারের বাবাও গেল।

ঝংকারই বেশি কথা বলল। নম্বরটা দিয়ে বলল, কম্যুনিকেট করে দিন পুরো স্টেটে। এই নম্বরটা...।

থানা অফিসার বলল— উই নো আওয়ার জব। নো নিড অফ ইয়োর অ্যাডভাইস। সেই রাত্রেই কন্যাকুমারিকা যাওয়ার কথা ছিল। আজ এখানেই থাকতে হবে। কাল জনতা কারফিউ। প্রধানমন্ত্রীর আবেদন। গাড়ি-ঘোড়া বেরবে না। এখানেই থাকতে হবে। এরমধ্যে যদি পুলিস বাসটার সন্ধান পায়...।

রাতে মিটিং বসল। সুধীরবাবু বলল, আমার মনে হয় আমরা প্রতারিত হয়ে গেছি। ম্যানেজার সম্ভবত প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত নেই। মালিক টাকা পাঠাচ্ছিল না। ওদের ঝগড়া ওভার হিয়ার করেছি। বেগতিক দেখে ম্যানেজার বাস নিয়ে পালিয়েছে। তাহলে এবার কী করা? বিলাসবাবু বলল— যাত্রার টাইমটা নিয়ে আমি কিন্তু আপত্তি করেছিলাম। কালরাত্রি যোগ ছিল। কত করে বলেছিলাম হয় এক ঘণ্টা আগে স্টার্ট কর, নইলে দু'ঘণ্টা পর। কেউ শুনল না। এখন বোঝো...।

উত্তম পোদ্দার বামুন কৃপাসিন্ধুকে বলল, এই যে ঠাকুর, তুমি নাকি গুনতে পারো। বল আমাদের বাস কোথায়?

ঠাকুরমশাই বলে— নাম-গোত্র ছাড়া কিমতি গণনা করা যায়? সদানন্দ বলল, বড্ড তাড়াহুড়ো করে আমরা ঠিক করে ফেলেছি। রামদাকে বললাম, আর একটু খোঁজখবর নাও। রাম মোদক বলল— আমি একাই কেন খোঁজ নেব, তোমরা কী ছিঁড়ছিলে?

সুধীরবাবু বলল, এটা ঝগড়া করার সময় নয়। এবার কী করা উচিত ঠিক করতে হবে। আপনিই বলুন কী করা উচিত? সুধীরবাবু বলল, কাল জনতা কারফিউর মধ্যেই থানায় গিয়ে খোঁজ করা উচিত বাসটার হদিশ পাওয়া গেল কি না। সম্ভবত পাওয়া যাবে না। এরপর আমাদের বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত, যেভাবেই হোক। কাল রাতে যদি চেন্নাইয়ের ট্রেন থাকে, রাতেই। লালবাজারে একটা মেল করে দেওয়া উচিত। মেল আইডি আমার জানা নেই। ঝংকার আর সুনেত্রা এটা করে দিক। আর এটিএম কার্ড দিয়ে এক্ষুনি সবাই দশ হাজার করে তুলে রাখুন।

গান্ধীকুমার বলল, বাড়ি ফিরে প্রথমেই এই ট্যুর কোম্পানির অফিসে পেটো মারব। সবাই যাবে কিন্তু।

ওদের সবকটাকে ন্যাংটো করে অ্যাসিড ঢেলে দেব— এরকম নানারকম প্রতিজ্ঞা চলাকালীন সুনেত্রা কেঁদে ফেলে। ঝংকার দেখল কেউ ওর চোখ মুছিয়ে দিচ্ছে না। ঝংকার নিজেও নার্ভাস হয়ে গেছে। 'ম্যায় হু না'? এরকম বলার মতো মানসিক শক্তি ওর নেই পুরোহিতমশাই জানাল— ওর কোনও এটিএম কার্ড নেই। গান্ধীকুমার বলল, আমারও ওসব নেই। মতিউর বলল— ওর একটা আছে। সঙ্গে এনেছে, কিন্তু পাসওয়ার্ডটা লিখে আনেনি। বচনলালেরও নেই। কেউ হাত খরচা, কেউ মাল খরচা, কেউ বউয়ের জন্য শাড়ি কিনবে বলে কিছু কিছু ক্যাশ টাকা এনেছিল।

উত্তম বলল, খুব বিলা টাইমে আছি। কেউ ঢ্যামনামি করবেন না বলে দিলাম। যা টাকা লাগবে দিতে হবে।

পরদিন দু'বার থানায় যাওয়া হল। বাসের পাত্তা দেওয়া দূরের কথা— লোকগুলিকেই পাত্তা দিল না। বিকেলে পাঁচটার সময় অনেকগুলো শাঁখ বেজে উঠল, কাঁসরঘণ্টাও কোনও কোনও হোটেলে বয়গুলো একটা রগড়ের সুযোগ পেয়েছে। ওরা কেউ গামলা বাজাচ্ছিল খুন্তি দিয়ে, কেউ থালা বাজাচ্ছিল চামচ দিয়ে। কেন বাজাচ্ছে জিজ্ঞাসা করেছিল ঝংকার। ওরা বলল, করুনা করুনা।

বিকেলে অনেকেই বাইরে বারান্দায় ছড়িয়ে। বিমর্ষ। কী টুপি পরিয়ে দিয়ে চলে গেল। অনেকেই ফোন করছে ম্যানেজারকে মালিককে। কোনও সাড়া-শব্দ নেই। ওরা সব সিমকার্ড খুলে নিয়েছে। হোটেল ম্যানেজার সাবধান করে দিল— কিপ সোশ্যাল ডিসট্যান্স। নো ক্লোজ। তুরাম, তুরাম। দু'হাত দু'ধারে নিয়ে দূরত্ব বোঝাল।

চন্দন মল্লিক হাতে মোবাইল ফোনটা নিয়ে উত্তেজিতভাবে এল। আরে, করোনা-ফরোনা সব মিটে যাবে। মোদিজি আবার একটা সার্জিকাল স্ট্রাইক করে দিয়েচে গো। আজ সব শুনসান করিয়ে দিয়ে মিলিটারি দিয়ে ওষুধ স্প্রে করিয়েছে। হেলিকপ্টার থেকে ওষুধ ছড়িয়েছে। এই যে আমার মেজশালা হোয়াটস অ্যাপ করেচে। আর এই যে শাঁখ বাজল না, শঙ্খধ্বনি, হোল ইন্ডিয়া জুড়ে লাখ লাখ শঙ্খধ্বনি হল, এর একটা এফেক্ট আছে না?

সুনেত্রা হঠাৎ বলে উঠল— গোমূত্র আরও ভালো, তাই না? করোনাও প্রতিরোধ করে, তাই না? ক'দিন আগে দিল্লিতে গোমূত্র পান উৎসব হয়েছে। দেখলাম তো।

কী সাহস মেয়েটার, এ্যাঁ?

ঝংকারের বাবা হঠাৎ চুপ করে গিয়ে মেয়েটাকে দেখতে থাকেন। এত ব্যাঙ্গ।

ঝংকারও এই বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা আশা করেনি। কেমন ডেসপারেট লাগল যেন। ঝংকারের সঙ্গে ওর মা-বাবার

আবার অনেক কিছুই মেলে না। মায়ের নির্দেশমতো পার্সে একটা লোকনাথ বাবার ছবি থাকে। আর বাবার নির্দেশমতো একটা আংটি, প্রবাল। মঙ্গল বোধহয় খারাপ। কিন্তু নিজের এসব যুক্তিহীন মনে হয়। খুব একটা তর্কাতর্কির মধ্যে যায় না।

ওরা অনেকেই ভেবে এসেছিল পুরো অন্য মুডে থাকবে। খবর-কাগজ নেই, বিজেপি-তৃণমূল-সিপিএম নেই, সঙ্গে সুমন, দিদি নম্বর ওয়ান, শ্রীমতীর খাবারে বিষ মেশানো হল কি না, কৃষ্ণকলির সারা গায়ে এমন র‍্যাশ কী করে উঠল এসব দুশ্চিন্তা থাকবে না— এরকম সময় কাটাবে। কিন্তু ফোন আসছে কেবল। ঠিক আছো তো? সোশ্যাল ডিসট্যান্স ঠিক রেখো। একদম ঘেঁষাঘেষি কোরো না। কেবল এটা কোরো না-সেটা করো না—। করোনা হবে। সুলগ্নাও ফোন করল— বলল সরি, ডিস্টার্ব করলাম, খুব ভয় করছে রে..., আর ঘুরতে হবে না। আঙ্কেল-আন্টিকে নিয়ে চলে আয়। একটু পরপর সাবান দিয়ে হাত ধুচ্ছিস তো? স্যানিটাইজার কিনেছিস? চীনে সত্তর হাজার ইনফেকটেড হয়ে গেছে অলরেডি, ইরান, হোল ইউরোপ...। ইন্ডিয়াতেও ছড়িয়ে গেছে। ওয়ান নাইনটি সিক্স। দমদমে একজনের হল, বরানগরেও একজনের হয়েছে।

রাত এগারোটায় একটা ট্রেন ছিল, একটা কামরায় সবাই উঠতে পারল না। সুশীলবাবুরা সুনেত্রাকে নিয়ে একটা কামরায় উঠেছিল, বিলাসবাবুরা ঝংকারকে নিয়ে অন্য কামরায় উঠল। সবাই বসার সিট পেল না। বিলাসবাবু সিট পায়নি। ঝংকারও নয়। নিমাই উঠে দাঁড়াল, বিলাসকে বলল, আমনি বসুন স্যার, আমি দাঁড়িয়ে যাচ্ছি। আলমবাজার পার্টিও সবাই বসার সিট পায়নি। টয়লেটের সামনের মেঝেতে বসেছে কেউ কেউ, কেউ বা বাঙ্কে মাথা নিচু করে কোনও মতে। কেউ বলছে জীবনে এরকম কষ্ট করেনি, রিজার্ভ ছাড়া জীবনে উঠিনি, এখন তো এসি টু'টায়ার ছাড়া যেতেই পারি না— বলছে চন্দন মল্লিক। রাম মোদক কাঁচুমাচু মুখে বসে আছে। আলমবাজার পার্টির দুর্দশার জন্য যেন এই লোকটাই দায়ী। কোনওভাবে রাত পোহাল। চেন্নাই শেষ অবধি পৌঁছতে পারল। চেন্নাই থেকে কলকাতার কোনও ট্রেনেই রিজার্ভেশন পাওয়া গেল না। জেনারেল কামরায় আবার গাদাগাদি? দু'রাত? সম্ভব নয়। সজল মিত্র ওর চুপচাপ থাকা বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে বলল, আমরা দু'জন এখানেই থেকে যাচ্ছি। চন্দন মল্লিকও বলল, মল্লিক পরিবারের ভারত কেন, পৃথিবী জুড়ে রিলেটিভ আছে। চেন্নাইতে ওর এক ভাগ্নের সঙ্গে কথা বলা হয়ে গেছে। ওখানে উঠব তারপর দরকার হলে ফ্লাইটে যাব।

রাম মোদক ভয়ার্ত গলায় সুধীরবাবুকে বলল, তাহলে কী করব স্যার? যদি পয়সাকড়ি বেশি লাগে, আমিই না হয়...। আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না, সব একসঙ্গেই যাব। সুধীরবাবুর ছেলে অপরূপ বলল— হাম কভি না ছোড়েঙ্গে...।

সুধীর মজুমদার একটা মোটা টাইম টেবিল বের করল। কিছু হিসেবপত্র করল। তারপর বলল, শুনুন সবাই, চেন্নাই থেকে ভাইজাগ পর্যন্ত লোকাল ট্রেন আছে। আর ভাইজাগ থেকে ভুবনেশ্বর বাসে যাওয়া যায়। ভুবনেশ্বর মানেই তো বাড়ি ফেরা। এই প্রস্তাবটা মন্দ লাগল না। সুনেত্রা ইন্টারনেট ঘেঁটে বলল, একটু কষ্ট করে যদি ভাইজাগটুকু চলে যেতে পারি, আর কষ্ট নেই। এসি বাস আছে। ভুবনেশ্বর থেকেও কলকাতার এসি বাস আছে।

সুধীরবাবুর বলল— পেটভরে সম্বর ভাত খেয়ে কিছু কেক বিস্কুট কলা কিনে নিয়ে চলুন সবাই প্যাসেঞ্জার ট্রেনে বসে পড়ি।

বিলাসচন্দ্র বলল— ভালো প্রপোজাল। কিন্তু ফিরে গিয়ে আমরা ছেড়ে দেব না। এই দেশ-বিদেশের কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করব, আপনিই কিন্তু লিড করবেন। যা লাগবে আমরা চাঁদা করে দিয়ে দেব।

সুনেত্রা ওর ব্যাগ থেকে মুঠো করে টফি বার করে সবার হাতে একটা একটা করে গুঁজে দিল। বলল, রিল্যাক্স, রিল্যাক্স। সব হয়ে যাবে। সবারই সদ্য হাসি ফুটে ওঠা মুখগুলোর হঠাৎ যেন একটা মিউটেশন হয়ে গেল। রাম মোদক, আমার আবার একটু সুগার আছে, বলেই টফিটা মুখে পুরে দিল। একবার হাসির হিল্লোল উঠল। সুনেত্রা বলল, উই শ্যাল ওভারকাম।

ভাইজা— মানে বিশাখাপত্তনম। যাবার সময় একদিন ঘোরা হয়েছিল। কৈলাসগিরি দেখানো হয়েছিল। বলেছিল ফেরার পথে সাবমেরিন মিউজিয়াম দেখিয়ে দেবে। মাথায় থাক সাবমেরিন। এখন বাসের খোঁজ। সুধীর মজুমদার রাম মোদককে বলল— ঝংকার আর সুনেত্রা যাও, ওদিকে বাসের খোঁজ করে এসো, আমরা দেখি ট্রেনের কিছু ব্যবস্থা হয় কি না। রাম মোদক বলল— আমি কী বলব বলুন, আপনারাই যা করার করুন স্যার। রাম মোদক আগে স্যার বলেনি একবারও। অপরূপ মুখটা গোঁজ করে বলল, তাহলে আমি কী করব বাবা? হোয়াট ইজ মাই রোল? সুধীর মজুমদার ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলল, তোমার তো ভাইটাল রোল মালপত্র পাহাড়া দাও, সবাইকে সাহস দাও। অপরূপ দু'বার ঘাড় কাত করে ওকে ওকে। তারপর সাহস দিতে শুরু করে দিল। কেউ ভয় পাবেন না। আমাকে দেখে শিখুন। দেখুন আমি ভয় পাচ্ছি না। নাই নাই ভয়। বাবা যখন আছে সব ঠিক হয়ে যাবে।

লকডাউন কী ব্যাপার ভাই? জগন্নাথ প্রামাণিক জিজ্ঞাসা করল ঝংকারকে।

কোথায় পেলেন ওয়ার্ডটা? ঝংকার জিজ্ঞাসা করে।

—এই যে একটা ভিডিও পাঠিয়েছে আমার এক পার্টি। ইউরোপের কোন শহরের যেন। সব শুনসান। জনতা কার্ফিউকেই কি লকডাউন বলে?

—লকডাউন মানে টোটাল ক্লোজার। দেখো-ভিডিওটা...।

ঝংকার দেখল— মিলান আর লোম্বার্ডি শহরের থামওয়ালা বাড়ির সামনে ভরদুপুরে পাঁয়রার ঝাঁক, খাঁখা ট্রামলাইন, একটা দাড়িওলা ভবঘুরে লোক হাঁ করে তাকিয়ে আছে আকাশে। দুটো অ্যাম্বুলেন্স আর্তনাদ করতে করতে ছুটে গেল। পার্কে শূন্য দোলনা। কতগুলো নিষ্প্রাণ বাইক সার সার দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যান্ডে। স্কুলের বড় ফটকে তালা। সুইমিংপুলের খটখটে খোঁদলে একা একা উড়ছে একটা সাদা কাগজ...।

নিমাই, সদানন্দ, উত্তম, গোপাল সবাই কেমন নির্বাক। রাম মোদক বলছে এই রোগটা কী মায়ের দয়ার চেয়েও ছোঁয়াচে? উত্তম বলল, মায়ের দয়া যেমন শেতলা পুজোয় সেরে গেছে, তেমন করে করুনা রোগের কোনও দেবী নেই?

আলোছায়া জগন্নাথের হাত ধরে বলল— এই, থালে আমাদের কী হবে গো?

জগন্নাথ প্রামাণিকের প্রশ্ন— যদি বাসেই ফিরি, আর তো কোথাও যাচ্ছি না উটি ফুটি, মানে আগেই ফিরে যাব, তাই তো?

বিলাসচন্দ্র বলল, তা তো বটেই, কেন, এই অবস্থায় আপনাদের আরও ঘোরার ইচ্ছে ছিল নাকি?

জগন্নাথ বলল— বেঁকাতেড়া কথা বলছেন কেন, জিজ্ঞেস করছি তো শুধু।

সুশীল রায় বলল— আপনারা তো এই বিপদের দিনেও... কী বলব... বিলাসচন্দ্র বাকিটা শেষ করে— কপোত কপোতি হয়ে...। জগন্নাথ বলে আপনাদের ছেলে-মেয়ে দুটোও তো...। আলোছায়া দূরে টেনে নেয় জগন্নাথকে। —থাক, ঝগড়া কোরো না। আর আস্তে করে বলে তোমার তো ভালোই হল— আগে আগে বউয়ের কোলে ফিরে যাবে।

লাউড স্পিকার আঁটা অটো চলছে কিছু বলতে বলতে। যে ভাষায় বলছে, ওরা কিছু বুঝতে পারছে না। মাঝে মাঝে একটা ইংরেজি শব্দ ছুঁড়ে মারছে ওই মাইক— ডিসট্যান্স, ডিসট্যান্স। কয়েকটা পোস্টারও সাঁটা রাস্তায়। অক্ষরের ভাষা না বুঝলেও ছবির ভাষা বোঝা যায়। মুখে মাস্ক, কারওর মুখের কাছে মুখ এনে ক্রস চিহ্ন, হাতের সঙ্গে হাতের স্পর্শে ক্রস চিহ্ন।

আলোছায়া জগন্নাথের হাত না ধরে, শার্ট খিমচে বলে — থালে আমাদের কী হবে গো?

এ সময় অদ্ভুত একটা ছায়া নেমে এল পৃথিবীর বুকে। ছায়া তো নয়, মায়া। কয়েক ঝলক ঠান্ডা বাতাস বয়ে গেল। বাতাসের মধ্যে ঝুনু ঝুনু ধ্বনি। একটা কেমন গন্ধও।

মজুমদারবাবু পেয়েছি পেয়েছি করতে করতে এগিয়ে এলেন, একটা হাত নিশানের মতো উপরে তোলা। সঙ্গে একটা লোক, মাথায় জরি বসানো পাগড়ি, পাগড়িতে গোঁজা পালক, কাকের না শকুনের কে জানে? গায়ে আধা আলখাল্লা ধরনের ঊর্ধ্বাবাস, বুক চেরা, বোতাম নয়, ফিতে দিয়ে আটকানো। রঙিন পাজামা, পায়ে শুঁড় তোলা জুতো। মজুমদার বলল, গাড়ি পেয়ে গেছি, এই যে বাস ড্রাইভার।

মাথায় ময়ূর পালক গোঁজা লোকটি বলল, বাস নয়, রথ। ড্রাইভার নয়, সারথি।

উরিব্বাবা, আপনি বাংলা জানেন?

বিলাসচন্দ্র অবাক।

সারথি বলে— হ্যাঁ স্যার, ইংরেজি, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, বাংলা, অল্প স্প্যানিশ, সামান্য কোরিয়ান...।

সুনেত্রার ভ্যাবাচাকা চোখ দুটো দেখতে পায় ঝংকার।

আপনার নাম কী?— বিলাসচন্দ্র জিজ্ঞাসা করল।

আমার নাম সারথি। এই নামেই ডাকবেন।

—বাসটা ভালো তো? ঝাঁকুনি-টাকুনি বেশি হবে না তো?— জগন্নাথ জিজ্ঞাসা করে।

—কোনও চিন্তা নেই স্যার। জলে চলছে মনে হবে। বাসটা জলেও চলে।

—কত এইচপি'র ইঞ্জিন?

—তিনশো হর্সপাওয়ার।

—কত সিসি?

—টুয়েলভ হান্ড্রেড।

—পিক আপ?

—হান্ড্রেড টুয়েন্টি বাই এইট্টি এইট সেকেন্ড। আপনি গাড়ির ব্যাপারটা বেশ জানেন, তাই না?

—ওই আর কি, একটু একটু।

রাম মোদক জিজ্ঞাসা করল— একটু ভালো করে হেলান দেওয়া যাবে তো? বয়েস হয়েছে তো একটু?

চলুন গাড়িটা দেখে আসি। এয়ার ইন্ডিয়ার মহারাজার কায়দায় মুণ্ডুটা নোয়াল সারথি। হাতটা এগিয়ে দিল সাদর সম্ভাষণের মুদ্রায়।

মিনিবাসের মতো গাড়িটা, আরও একটু ছোট, দেখতে দারুণ। এরকম রং দেখা যায় না। রামধনুর রংগুলো যেন থরে বিথরে খেলা করছে।

ভিতরের চেয়ারগুলোও বেশ ভালো। রঙের খেলা। সিটগুলোর আলাদা আলাদা রং। ঢুকলে মনে হয় লাল-নীল-সবুজের মেলা বসেছে। কিন্তু গাড়িটা বেশি বড় নয়। ভিতরের আয়তন ছোট। যে ক'জন লোক সে'কটাই সিট।

খাওয়া দাওয়ার পর গাড়ি ছাড়ল।

দুর্গা, দুর্গা আলোছায়া কাঁদো কাঁদো গলায় জগন্নাথকে বলল— আমার কিন্তু সাউথ সিল্ক কেনা হল না। গাড়ি চলছে। সত্যি, গাড়িটা বেশ ভালো। বসে আরাম। ড্রাইভার, সরি, সারথি জিজ্ঞাসা করল কী মিউজিক শুনবেন? বেলা সাড়ে এগারোটা। কোমল ঋষভ চালিয়ে দেব? নাকি গান্ধার? সেতার না বাঁশি? একটু পাহাড়ি এলাকা, বাঁশিই দি, কেমন?

সুনেত্রা বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ বাঁশি।

ঝংকারও বলল অনুপম রায় নেই।

নিমাই বলল— হিন্দি গান চালান।

রাম মোদক বলল— আপনি সারথি, যা খুশি চালান।

বাঁশিই চলল। কী রাগ ওরা জানে না। একটু পরে রাম মোদক কাশল। রাম মোদকের পাশে সদানন্দ ছিল। বলল— মুখে কিছু চাপা দিয়ে, কেমন?

রাম মোদক ব্যাগ থেকে গামছাটা বের করে গলায় ঝোলাল। এবং কাশি এলে একধার মুখে চাপা দিচ্ছিল। সদানন্দ পিছনের সিটে উত্তমের সঙ্গে নিচু স্বরে কিছু বলছিল। উত্তম নিমাইয়ের সঙ্গে, নিমাই কৃপাসিন্ধুর সঙ্গে। কৃপাসিন্ধু গান্ধীকুমারের সঙ্গে। গান্ধীকুমার বিলাসবাবুর সঙ্গে। বিলাসবাবু সুধীর মজুমদারের কানে কানে কিছু একটা বলল। সুধীরবাবুকেই সবাই এখন টিম ম্যানেজার মেনে নিয়েছে। সুধীরবাবু রাম মোদকের কাছে যায়, জিজ্ঞাসা করে— জ্বর জ্বর লাগছে রামবাবু! নিজেই নিজের কপালে হাত দিল। সুধীরবাবু বলল, নিজের হাতে নিজের গা গরম লাগে না। অন্য কেউ গায়ে হাত দিলে বোঝে। কেউ ওদের রামদা'র কপালে হাত দিচ্ছেন। জানা গেল কারওর কাছেই থার্মোমিটার নেই। সুনেত্রা সিট ছেড়ে এসে রাম মোদকের কপালে হাত দিয়েই বলল সে কী? গায়ে তো বেশ জ্বর।

সুশীলবাবু আর অণিমা, দু'জনেরই মাথায় হাত। কী হবে এবার আমাদের মেয়েটার?

হাত ধুয়ে নিলে কিছু হবেনে, সদানন্দ শান্ত গলায় বলে।

এমনি জলে ধুলে হবে? সাবানে ভালো করে কুড়ি সেকেন্ড হাত ধুতে হয়। কী করে হাত ধোবে ও? সুশীল এত জোরে আগে কখনও কথা বলেনি।

বিলাস সুধীরবাবুর কাছে যায়। বলে আপনার ড্রাইভারকে বলুন, এমন কোথাও থামাতে, যেখানে সাবান, স্যানিটাইজার, মাস্ক এসব পাওয়া যায়।

বাস তখন হু হু করে ছুটছে, হাইওয়ে ধরে। একধারের দিগন্ত রেখায় পাহাড়ের সারি, অন্যদিকে সবুজের মাঝে মাঝে লাল। বসন্তের অবশেষ। পলাশ, অশোক। ড্রাইভার বলল, ডোন্ট ওয়ারি। সামনেই একটু পরেই ভেমুলাভাসা পৌঁছে যাব, ওখানে সব পাওয়া যাবে। অণিমা ঝংকারকে
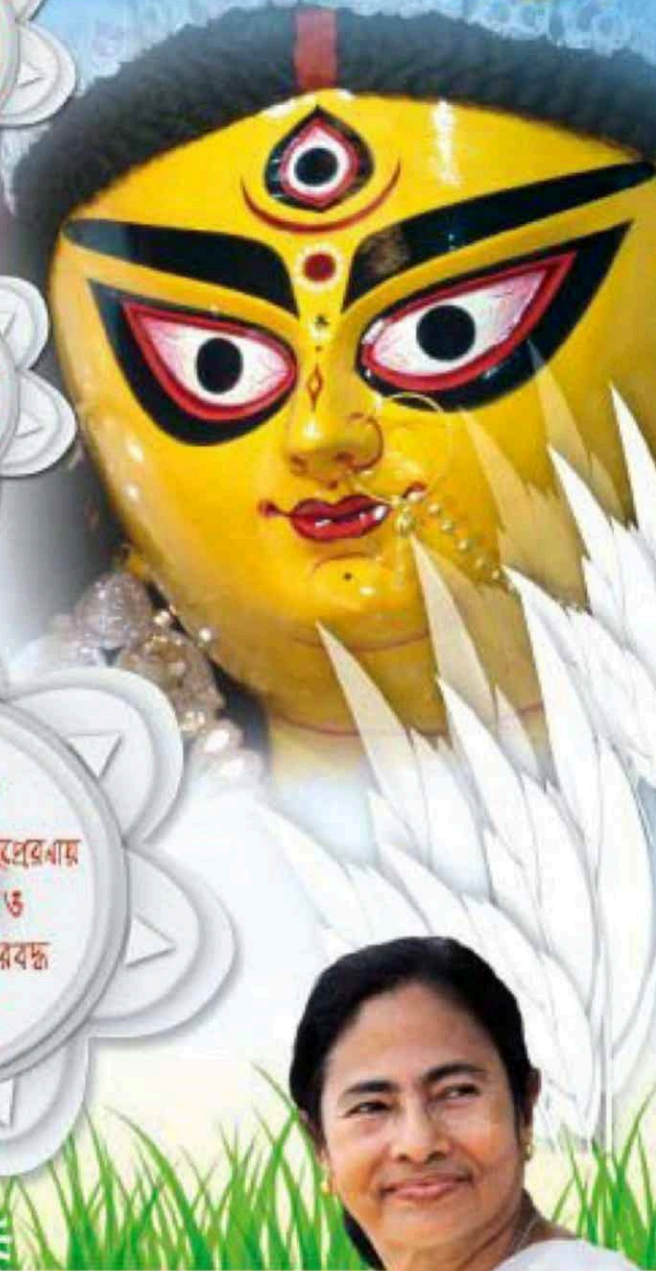
WBAIC
কৃষকদের শারদীয়া শুভেচ্ছা
বাংলার কৃষক বাংলার গর্ব
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়
কৃষির সার্বিক উন্নয়ন ও
আধুনিকীকরণে অঙ্গীকারবদ্ধ
কৃষি শিল্প নিগম
ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন লিমিটেড
২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, ৩য় তল, কোলকাতা – ৭০০ ০০১
দূরভাষ: (০৩৩) ২২৩০-২৩১৪/২৩১৫, দূরবার্তা: +৯১৩৩ ২২৩০০১৫৬
ওয়েবসাইট: www.wbagroindustries.com

বলল— তুই এদিকে চলে আয় ঝংকার। ঝংকার বলল— না যাব না, সিনেমা দেখছি আমরা।

—না সিনেমা দেখতে হবে না। স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে।

সুনেত্রাকে বলল, তুমি কিছু মনে কোরো না। ছোঁয়াচে রোগের সঙ্গে কোনওরকম ইয়ে নয়। তুমি করোনা ধরেছ, একটু আলাদা থাকার চেষ্টা কর। ওকে বল চলে যেতে।

ঝংকার বলল— কোথায় বসব তবে আমি?

—আমাদের সঙ্গেই বোস, ঠেসেঠুসে।

—দু'জনের সিট তিনজন বসা যায়?

আমি কি কোলে বসব নাকি?

অণিমার মাতৃসত্তা জেগে ওঠে। ভাবে নিজের বিপদ হয় হোক, ছেলের যেন না হয়। অণিমা বলে— তুই তবে তোর বাবার পাশে বোসগে যা। আমি ওর পাশে বসছি।

ঝংকার বলে— কেন এরকম প্যানিক করছ মা, ওই লোকটা কাশছে বলেই করোনা। এমনিতে কাশি হয় না? জ্বর হয় না? আমার, তোমার, বাবার, সবারই হয়েছিল অনেকবার। করোনা হয়েছিল? তুমি যাও তো। যত ফালতু চিন্তা।

সুনেত্রা বলল, মাসিমার যখন দুশ্চিন্তা হচ্ছে তুই ওখানেই যা। ঝংকার বলে যাব না।

ভেমুলাভাসা এল ছোট শহর।

একটা ওষুধের দোকান ছিল। ওখানে বেশি মাস্ক ছিল না। মাত্র চারটে মাস্ক পড়েছিল। বিলাস বলল, আমি তিনটে, জগন্নাথ বলল, আমি দুটো, সুশীল বলল, আমি তিনটে, কাড়াকাড়ি হতে লাগল, ঝগড়া হতে লাগল। সুনেত্রা এসে বলল, শুনুন, এভাবে ঝগড়া করবেন না। রামজেঠু অসুস্থ, কাশছেন, উনি সবার প্রথমে, এরপর যাঁরা যাঁরা বয়স্ক, ওঁরা নিক। যেমন সুধীরকাকু, বচনলালবাবু, ঝংকারের বাবা বিলাসকাকু...।

এটাই ঠিক হল।

ওষুধের দোকানে একটা বড় স্যানিটাইজার পড়েছিল। সুনেত্রা বলল, কমন ফান্ড থেকে ওটা কেনা হোক, বাইরের কিছু ধরলে ওটা দিয়ে হাতটা স্যানিটাইজ করা যাবে। তারপর ভুবনেশ্বরে গিয়ে দেখছি কী করা যায়।

ঝংকার দেখল মেয়েটা একটু একটু করে লম্বা হয়ে যাচ্ছে।

একটা মদের দোকান খোলা ছিল। সুনেত্রা ঝংকারকে বলল, মদে তো অ্যালকোহল থাকে, মদ দিয়ে হাত রাব করে নিলেও কিন্তু কাজ হয়। ঝংকার বলল, মাথা খারাপ? যা পার্টি ঢকঢক মেরে দেবে সব।

বিলাসবাবু অন্যান্য দোকানে স্যানিটাইজার খুঁজতে গেল। সুনেত্রা বলল— স্যানিটাইজারের চেয়ে বেশি ভালো সাবান। যে কোনও সাবান। এই ভাইরাসটা লিপিড মানে তেল জাতীয় একটা পদার্থের খোলসে ভরা থাকে। সাবানে তেল জব্দ। সাবান খোলসটাকে ভেঙে দেয়।

ড্রাইভার বলল— এখানে টয়লেট আছে। যাঁদের দরকার চলে যান। মেয়েদেরও আলাদা আছে। বলল— ভুবনেশ্বর পৌঁছতে পৌঁছতে রাত দশটা। মাঝে আর একবার থামব চা খাওয়ার জন্য। এখন দুধ খেয়ে নিন। এখানে একটা দোকান আছে, এক গোপিনী দুধ ক্ষীর বিক্রি করে। বৃন্দাবনের গোপিনী বংশ। এখন যদিও তেলেগু বলে, কিন্তু বৃন্দাবন থেকে এসেছে। শ্রীরাধার অষ্টসখীর একজন চম্পকলতা। এরা হল চম্পকলতার বংশধর। দোকানে নিয়ে গেল সারথি। দেওয়ালে কৃষ্ণের ছবি। রঙিন শাড়ি মুখে পদ্মফুল ফুটে আছে। সুনেত্রা আস্তে করে ঝংকারকে বলল— ভাব, এই মুখগুলো মাস্কে ঢাকা থাকবে। ড্রাইভার বলল, এই দুধে কিন্তু এখনও বৃন্দাবনের মাহাত্ম আছে। এই দুধ পান করলে প্রেম জেগে উঠবে প্রাণে।

ধুস। ড্রাইভারটা পাগলা। কেউ খেল, কেউ খেল না। দুধ খেয়ে কী হবে? এখন একবার চা চাই অনেকের। সুধীরবাবু হিসেব করে বলল— আজ রাত দশটায় যদি ভুবনেশ্বর পৌঁছে যাই, কাল সকাল আটটায় কলকাতা। বিলাসচন্দ্র বলল— গিয়েই প্রথম কাজ থানায় এফআইআর। 'দেশ বিদেশ'কে দেখে নেব।

গান্ধীকুমার বলল— এই মতিউর, তোর মাংস কাটার চপারটা আমাকে দিস তো, শালা ব্যানার্জিকে দেখে নেব।

বাড়ি থেকে ফোন-টোন আসছে অনেকের। হাতে ফোন নিয়ে জগন্নাথ বলছে— না গো, কোনও চিন্তা নেই। সব আলাদা। সোশ্যাল ডিসট্যান্স একদম ঠিকঠাক। সিঙ্গল রুমেই ছিলাম। কাজটা তো কমপ্লিট করতে পারলাম না। কাজ হল না, সাহেব হঠাৎ ছুটিতে, ফিরে আসছি। আগামী মাসে আবার আসতে হবে ছাই। এই কথাটা বলেই আলোছায়ার গায়ে কনুই দিয়ে একটা আদরগুঁতো দিল। মানে আসছে মাসে আবার হবে।

না, না, কোনও ভয় নেই। ট্রেনে আসছি, রিজার্ভ সিট, কারওর সঙ্গে কথা বলছি না।

ঝংকারের মা কাউকে বলছিল— না গো দিদি, এক্কেবারে কেনা হল না। ভেবেছিলাম তো সব ফেরার পথে কিনব। কাঞ্জিভরম? না গো, মাইসোর সিল্ক, চেট্টিনাদ বল, কিচ্ছু না। সব গুবলেট হয়ে গেল। উত্তম বলছিল— আর বলিস না মাইরি, সব বাওয়াল, পুরো ঘেঁটে গেল। আরে এলাম মস্তি করতে, একটা দিনও ভালো করে বসা হল না। গিয়ে দিলীপ শালাকে ক্যালাতে হবে... ও পাড়ায় জানিয়ে রাখিস। নিমাইয়ের গলায় শোনা গেল— বরানগরে আবার? যা বাঁড়া। দমদমেও? হলদিয়ায় সাড়ে পাঁচশো। কী বলছে? দু'মাসের মধ্যে পাঁচ লক্ষ হয়ে যাবে? —ধুর ধুর। পিনিক দিচ্ছে, পিনিক দিচ্ছে সব। দেখিস, লুডোবাবু, গনাদা, বুলু চম্পুরা বেরিয়ে পড়বে বলে দিলাম। পয়দা খাবার চান্স এসেছে নানারকম হিড়িক দেবে। তবে হ্যাঁ, হতে পারে ছোঁয়াচে...।

আকাশে নানা রং মাখিয়ে সূর্য ডুবেছে অনেকক্ষণ।

ড্রাইভার বলল— একটা পটদীপ লাগিয়ে দি, সেতারে। তারপর না হয় জয়জয়ন্তী দিয়ে দেব। আমার কেবিন দিয়ে ছাদে ওঠা যায়। চারিদিকে পোক্ত রেলিং লাগানো আছে। ইচ্ছে করলে অমাবস্যা উপভোগ করতে পারেন। অমাবস্যার রাতে দেখবেন তারাগুলো কেমন গেঁথে থাকে আকাশে। দেখবেন কেমন করে অনন্ত জাগে। বিস্ময়ে প্রাণ জাগবে। আর বুঝবে কত ছোট, কত চূর্ণ, কত দীন আমরা। এইসব উপলব্ধি হয় অমাবস্যায়। ঈশ্বরের ঘন কৃষ্ণরূপও আমাদের প্রণম্য। আবার পূর্ণিমার অন্যরূপ। ওটা হংসধ্বনি রাগ। অমাবস্যা দরবারি। পূর্ণিমা একটু উচ্ছল। পূর্ণিমা নিয়ে সবাই কথা বলে, অমাবস্যাকে নিয়ে বলে না। বাঙালিরা তো কালীর পূজা করে। আপনাদের ইচ্ছে করলে ছাদে চলে যেতে পারেন। একটু পরই আমরা রম্ভা পৌঁছে যাব। ডানদিকে দেখতে পাবেন চিল্কা। উপরে কালো আকাশ, ডানদিকে কালো জল, আর লক্ষকোটি তারা।

সত্যিই একটু পরই চিল্কা। জানালা দিয়ে বেশ বোঝা যাচ্ছে

ডানদিকের জলসম্ভার। জল থেকে মাথা তোলা দু'একটা টিলায় দু'একটা আলো জ্বলছে। সুনেত্রা উসখুস করছে। ঝংকার বোধহয় বুঝতে পারছে ও বাসের ছাদে যেতে চায়। ঝংকার বলল, এরকম করিস না তুই। সিন হবে। চেপে বোস। ড্রাইভারটার সামনে থাকা মাউথপিসটা যত নষ্টের গোড়া। আবার কী একটা রাগ ও চালিয়ে দিয়েছে, সেতার না সরোদ কে জানে? এদিকে রাম মোদক শুকনো কাশি কেশেই চলেছে। উত্তম আর নিমাই একসঙ্গে চেঁচায়— এই ড্রাইভার বাজনা থামা না ক্যাওড়া। স্পিকারে ভেসে এল আমাকে ড্রাইভার না বলে সারথি বললে বেশি খুশি হই।

কী ভাগ্য মাইরি আমাদের প্রথমে এক চিটিংবাজের পাল্লায় পরে এক ছিটেলের পাল্লায় পড়লাম।

ড্রাইভার মিউজিকটা থামায় যদিও কথা থামায় না। গুনগুনানি থামায় না। জানিনে পথ, নাই যে আলো, ভিতর বাহির কালোয় কালো, তোমার চরণ শব্দ বরণ করেছি আজ এই অরণ্য গভীরে। চলব আমি নিশীথ রাতে তোমার হাওয়ার ইশারাতে চলো তোমার বিজন মন্দিরে। রাম মোদক কাশছে। অন্যরা বলছে মুখ চাপা দিন, চেপে কাশুন। বলছে না ধমকাচ্ছে। অনেকেই যতটা পারে দূরে সরে আছে। পারলে দম বন্ধ করে রাখে। রাম মোদকের সামনের সিটে যারা বসেছিল, ওরা সিট ছেড়ে পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ার্ত মুখ। ঝংকার জানে করোনার প্রাথমিক লক্ষণ হল জ্বর এবং শুকনো কাশি। রাম মোদকের আগেই হয়েছিল নিশ্চয়ই, এখন উপসর্গগুলি প্রকাশ পাচ্ছে। তার মানে এখন এই গাড়িতে যারা আছে, তাদের অনেকেই সংক্রামিত। ঝংকার নিজেও হয়তো। বাড়ি পৌঁছলে কি ওরও শ্বাসকষ্ট হবে?

ঝংকার বিব্রত বোধ করল। ড্রাইভারের দিকে এগিয়ে গেল— জিজ্ঞাসা করবে এখানে কোনও হাসপাতাল আছে কি না। এই ফাঁকে সুনেত্রা নিজের সিট ছেড়ে ছাদে ওঠার সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে। ড্রাইভার দেখতে পেয়ে হাতের ইশারায় উৎসাহ দিল উপরে উঠে যেতে। ওর বাবা-মা বোঝেনি ও ছাদে যাবে, ভেবেছিল ঝংকারের কাছেই যাচ্ছে। মেয়েটা হুট করে ছাদে চলে গেল। ঝংকার এখন চেঁচালে একটা সিনক্রিয়েট হবে। ড্রাইভারকে বলল, এক্ষুনি থামিয়ে দিন প্লিজ, মেয়েটা পড়ে যাবে। ও বলল, নিজে ইচ্ছে করে না পড়লে কেউ পড়ে না। এ পর্যন্ত সাতজন উপর থেকে পড়ে, মানে নিজের ইচ্ছায় ঝাঁপ দিয়েছে। ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করেছিল আর কী। ড্রাইভার নিরাসক্ত ভাবে কথাগুলো বলল। ড্রাইভারের কেবিনেই দাঁড়িয়ে রইল ঝংকার। সিঁড়ি দিয়ে কয়েক পা উঠে নেমে এল। দু'জনেই ছাদে গেলে সবাই জেনে যাবে। সুনেত্রার উত্থান পর্ব জানে না এখনও। ঝংকার গেলেই টনক নড়বে। মিনিট দশেক পরে ও নেমে এল। বলল, সত্যিইরে, দারুণ, ভাবা যায় না।

ঝংকার দেখল দশ মিনিটের মধ্যেই মেয়েটা একটু লম্বা হয়ে গেছে।

একটু দূরে অন্ধকারের মধ্যে চাক চাক আলো ছড়ানো ছিটানো। ড্রাইভার বলল, খুরদা আসছে, তারপরই ভুবনেশ্বর।

খুরদা আসতেই অনেকে বলল, চা খাব এখানে। বিলাস, জগন্নাথ, আলোছায়া, সুশীলরা সব বলল, আগে এখানে কোথায় হাসপাতাল আছে খোঁজ করা যাক। সর্বপ্রথম কর্তব্য হল লোকটাকে হাসপাতালে দিয়ে দেওয়া।

—তারপর?

—তারপর আবার কী? লোকটা রইল হাসপাতালে, আমরা বাড়ি চলে গেলাম। রামের বাড়িতে খবর দিয়ে দেওয়া হবে... ওর সঙ্গে যারা এসেছে কেউ যদি থেকে যেতে চায় থেকে যেতে পারে...। বিলাসচন্দ্র প্রস্তাব দেয়।

কী রামদা... খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না। এখানে একটা হাসপাতালে ভর্তি করে দি? উত্তম পোদ্দার বলে। সুশীল রায় বলে— উনি কী বলবেন? যতক্ষণ থাকবে রোগ ছড়াবে। ওঁর মতামত নেওয়ার দরকার নেই। আমাদের সবাইকেই বাঁচতে হবে আগে। এই যে ঠাকুরমশাই—

বিলাসচন্দ্রও বলল ইয়েস ইয়েস। আমাদের বাঁচতে হবে আগে।

নিমাই ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল— এখান থেকে কলকাতা কতক্ষণ লাগতে পারে স্যার?

—দশ ঘণ্টায় নিয়ে যাব।

—তবে আর কেন এখানে ফেলে যাওয়া?

ওর বাড়ি থেকে কে আসবে এখানে, কেউ নেই যে ওর... নিমাই পেদো বলে।

গোপাল সাহা বলল— তাইলে যে রামদা কয় তাঁর ছেলের ঘরের মেয়ের ঘরের নাতি-নাতনিরা সব ইংলিশ মিডিয়াম?

নিমাই বলে— আমি রামদার বাড়ি যাই-টাই, আমি সব জানি। রামদা কিচ্ছু ঝুটঝাট বলেনি স্যার। ওর ছোট মেয়ের ঘরের দুই বাচ্চাই গলায় টাই ঝুলিয়ে টা-টা বলে ইস্কুল যায়, কিন্তু মেয়েটা পুড়ে মরেছে শ্বশুর বাড়িতে। পুড়িয়ে দিয়েছে না পুড়ে গেছে জানা নেই। পুড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বাস করলে মনটা খারাপ হয়ে যায়, প্রতিশোধের কথা মনে হয় বলে মেনে নিয়েছে পুড়েই গেছে অ্যাকসিডেন। নাতি-নাতনির জন্য টাকা পাঠায় ও বাড়ি। ছেলেটারও অপমিত্যু মটোরবাইক অ্যাকসিডেন। ছেলের বউ বাপের বাড়ি চলে গেছে। নাতনি আছে। ও বাড়িও টাকা পাঠায়। বাড়িতে বড় মেয়ে। মাথা পাগল। লালা গড়ায়। জামাকাপড় ঠিক থাকে না। কী বলে... বাদরুমও ঠিক থাকে না। কে আসবে বলুন।

নিমাইয়ের চোখে জল।

—তাই বলে কি এরকম করোনার সঙ্গে আরও দশ-বারো ঘণ্টা কাটানো যায় নাকি? আমাদের সবার হয়ে যাবে। সেরকম হলে তুমি থেকে যাও...। বিলাসচন্দ্র বলল।

ঝংকার বলল— আমাদের পাড়াতেই ঢুকতে দেবে না। রুগির কাছাকাছি যারা এসেছে, সবাইকে আটকে রাখে— দেখেছি তো ইউ টিউবে। তাছাড়া...

আরও কিছু বলতে চাইছিল ঝংকার, সুনেত্রা ওর হাতে চিমটি কাটল, চিমটির ভাষা বুঝে চুপ করে গেল ঝংকার।

সুশীল রায় লোকটা এমনিতে চুপচাপই থাকে। কিন্তু এখন হাত নেড়ে গলা উঁচিয়ে বলল— একটা টাউনে যখন এসেই পড়েছি, হসপিটাল দেখতেই হবে। ওরা দেখে নিক। যদি সার্টিফিকেট দেয় করোনা হয়নি, তাহলে নিয়ে নেব।

ঝংকার বলল— সঙ্গে সঙ্গে কি করোনা কনফার্মড হয় নাকি? ওরা মুখ থেকে স্যালাইভা নেবে, তারপর আবার চিমটি খেল ঝংকার।

মহিলারাও বলল— না, হাসপাতালেই দিয়ে দেওয়া হোক।

ড্রাইভারকে বলা হল— কোথায় হাসপাতাল আছে দেখুন তো...

ড্রাইভারটা কী হারামি, মুচকি মুচকি হাসছে। বলছে আপনাদের প্রধানমন্ত্রী কি ঘোষণা করে দিয়েছে জানেন? ঘোষণা নয়, আদেশ। আজ যেই বারোটা বাজবে, কোনও

গাড়ি রাস্তায় চলবে না। কোনও মানুষ রাস্তায় বেরুবে না। কোনও দোকান খোলা থাকবে না।

—মানে? মানে? মানে?

সমবেত জিজ্ঞাসায় দুষ্টু দুষ্টু হাসছে মাথায় ময়ূর পেখম লাগানো ড্রাইভার।

বলল, লকডাউন। কমপ্লিট লকডাউন। একুশ দিন টানা। থ্রি উইকস।

চায়ের দোকানদারও বলল। একটা অটো রিক্সা মাইকে ওড়িয়া ভাষায় ঘোষণা করতে করতে চলে গেল। সুধীর মজুমদার বললেন— না, আর হাসপাতালের খোঁজ করতে হবে না। কলা পাউরুটি কিনে নিয়ে সিধে চলো।

ড্রাইভার বলল— এখন তো রাত ন'টা বেজে গেছে। আর তো হাতে তিন ঘণ্টা সময়। তিন ঘণ্টায় কত দূর আর যেতে পারব? ভদ্রকও পৌঁছতে পারব না। তারপর কী হবে? সুধীরবাবু বলল— তারপরও চলবে গাড়ি, ট্যাঙ্কি ফুল ফুয়েল নিয়ে নিন। রাতে কেউ আমাদের আটকাবে না। ভোর ভোর কলকাতা পৌঁছে যাব।

আজ্ঞে, যা বলবেন তাই হবে।

গাড়ি চলতে শুরু করল। একটা বেহাগ চালিয়ে দিল সানাইয়ে। সবাই চেঁচাল এসব ফাজলামি বন্ধ কর। গাড়ি চলতে লাগল লোকটা বলতে লাগল— শেরেহস্ত সর্বে পাপমান শ্রমেন প্রপথে হুতাঃ যে নিত্য এগিয়ে চলে, সে খুচরো ঝামেলা নিয়ে বেশি ভাবে না।

চরৈবেতি চরৈবেতি চরৈবেতি। হে রোহিত তুমি চলতেই থাক। মেঘ বলেছে যাব যাব রাত বলেছে যাই...।

চেঁচিয়ে উঠল কেউ— অ্যাই, থামবি?

টাকা নিবি, কলকাতা পৌঁছে দিবি ব্যাস। চুপ থাক।

রাম মোদক কাশছে।

রাম মোদক সিটে এলিয়ে পড়েছে।

রাম মোদক হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ওর আশপাশের সবাই দূরে দাঁড়িয়ে আছে। বিলাসচন্দ্র বলল, যখন রওনা হলাম কালরাত্রি যোগ ছিল বার বার বলেছি টাইম পিছিয়ে দাও, কেউ শুনল না। এখন বোঝো...।

উত্তম বলল— কী ঠাকুরমশাই, তোমার জগন্নাথ কী করছে? ডাকো, ডাকো জগন্নাথকে, খেলাটা দেখাক তোমার জগন্নাথ। আলোছায়া অনেকক্ষণ ধরেই বাবা লোকনাথ লোকনাথ করছিল, এবার চেঁচিয়েই বলল, বাবাকে ডাকুন, ভক্তিভরে ডাকুন বাবা লোকনাথ বাবা লোকনাথ...।

এমন সময় একটা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। গাড়িটা এঁকেবেঁকে কিছুটা গিয়ে থেমে গেল।

ড্রাইভার বলল, টায়ার পাংচার করেছে।

গাম্মারিয়েছেরে— নিমাই আর্তনাদ করে উঠল। কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। যারা জপ করছিল, থেমে গেল। নিস্তব্ধতা ভাঙে একগুচ্ছ কাশির শব্দে। কাশির গমক থামলে রাম মোদক বলল, বাঁচব-ও-ও। বাসের ভিতরে আর্তনাদ উঠল। কী হবে, এবার কী হবে আমাদের। ড্রাইভার ওর ডান হাতের পাতাটা সামনে বাড়ায়। ভোটের প্রতীক চিহ্নের মতো— আসলে ওটা বরাভয় মুদ্রা। বলল আমি আছি তো। পাগড়িটা খুলে নেমে এল। চাকা পাল্টানো হল, আধঘণ্টার মতো লেগে গেল। সুধীরবাবু বলল, এবার জোরে চালাও প্রতিটি মিনিট আমাদের দামি। ভোরের আগে পৌঁছতে না পারলে রাস্তাতেই আমাদের আটকে দেয় যদি কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। ড্রাইভার বলল, অত সহজ নয় মহাশয়গণ। যে টায়ারটি বিক্ষত হইল, তাহার ক্ষত সংশোধন করিতে হইবে। কোনওক্রমে নিকটস্থ গ্যারেজে গিয়া কার্যটি সুসম্পন্ন করিয়া লইতে হইবে। পথিমধ্যে পুনরায় অন্য কোনও টায়ার পাংচারিত হইলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

আরও শ্রবণ করো বিপদ একাকী আসে না, এবং একাধিক আসে। এবং বিপদের সময় কাজে আসা বন্ধুই তোমার প্রকৃত বন্ধু।

আব্‌বে স্‌সালা— ছিটলেমি করবি না বলে দিচ্ছি— গায়ে হাত চালিয়ে দেব।

—তমোগুণান্বিত হয়ো না। তমোনাশ কর।

ধৈর্য হারিয়ো না। ধৈর্য হল এমন একটি বৃক্ষ, যার সর্বাঙ্গে কণ্টক, কিন্তু ফল অতি স্বাদু। বলেছেন রাসুল হজরত মহম্মদ সাল্লাইহি ওয়া সাল্লাম। ধৈর্য হল জগতের সবচেয়ে শক্তিমান যোদ্ধা। বলেছেন লিও টলস্টয়...

—ভীষণ মাজাকি করছে তো লোকটা...। এখন আমাদের ড্রাইভার চেঞ্জ করারও কোনও উপায় নেই...।

স্পিকারগুলোতে গমগম শব্দ ভেসে এল— কোনও উপায় নেই, আমাতেই সমর্পণ কর। গাড়ি চলতে লাগল।

রাম মোদক কাশতে লাগল। নিমাই কপালে হাত দিয়ে বলল, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। বিলাসবাবু বলল, হাতটা ধুয়ে নাও এক্ষুনি। এই যে আমার কাছে স্যানিটাইজারটা আছে।

রাত্রি চিরে বাসটা ছুটছে। দু'পাশে শুধু অন্ধকার। মাঝে মাঝে মৃদু আলোকপুঞ্জ নজরে পড়লে বোঝা যায় ওখানে জনপদ আছে। এরকম একটা জায়গায় থামল। ওটা পেট্রোল পাম্প। অফিস ঘরে দু'জন ঝিমোচ্ছিল। বলল এখন মেরামত হবে না। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। চলল গাড়ি ফের। রাস্তায় অন্য সময় রাতে অনেক ট্রাক থাকে। আজ যেন ট্রাকের সংখ্যাও কম। এক জায়গায় একটা পুলিসের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। থামতে বলল হাতের ইশারায়। কী কথা হল ড্রাইভার এবং পুলিসের সঙ্গে বাসের ভিতরে যারা আছে, ওদের জানবার কথা নয়। তবে শরীরের ভাষায় বোঝা যাচ্ছে পুলিস বলছে ফিরে যেতে। ড্রাইভার বোধহয় পুলিসদের কিছু বোঝাতে পারল, আবার এগিয়ে চলল বাস। ঘণ্টাখানেক পরে ডানদিকের আকাশে একটা হালকা উদ্ভাস। ওই দেখ প্রভাত উদয়। একটা পেট্রোল পাম্প, এবং পাশে টায়ার ইত্যাদি। ড্রাইভার বলে— একটি অতিরিক্ত টায়ারগোলক নিতান্তই দরকার। সম্মুখের রাস্তা অতি কর্কশ। পুনর্বার পাংচারিত হইলে পথে বসিব, সুতরাং সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

ঘড়িতে চারটে বেজে চল্লিশ। ঠিক আছে, ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করা যেতে পারে। এই ঝামেলার জন্য দায়ী ব্যানার্জীবাবুর 'দেশ বিদেশ' থেকে দোষারোপের মাত্রাটা প্রধানমন্ত্রীর দিকে চলে গেল। মাত্র চার ঘণ্টার নোটিশে কোন বিবেচনায় এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হল? আরও কত লোক এখন রাস্তায়। কী হবে ওদের? একটু ভাবল না? এরপর রাগটা ড্রাইভারের দিকে যায়। এমন এক আজব ড্রাইভার এসে জুটল। কিন্তু এই ড্রাইভারটিকে জোটাল কে? মজুমদারমশাই। সুধীর মজুমদারের সামনেই এই আলোচনা চলছিল বলে ওকে বিশেষ গালমন্দ করা গেল না। কিন্তু জগন্নাথ প্রামাণিক যখন বলল, আর একটু দেখেশুনে গাড়িটা ঠিক করতে পারলেন না? ড্রাইভারটার সঙ্গে কথা বলেও বোঝেননি লোকটা ছিটেল? গাড়িটা আগে চেক করে নেবে না? জিজ্ঞাসা করে নিতে পারত স্টেপনি আছে তো? দুটো

এক্সট্রা চাকা রাখা উচিত এরকম লং জার্নিতে।

অপরূপ ঘাড়তেড়া করে বলল, তাহলে তুমি খোঁজ করতে গেলে না কেন? খালি তো আন্টির সঙ্গে গল্প করছিলে। এখন বাবাকে দোষ দিচ্ছ। আলোছায়া এবার এক পা এগিয়ে এসে বলল অ্যাই ছেলে, কে কার সঙ্গে গল্প করছে সেটা তুমি বলার কে? ভাব দেখাও যেন আলাভোলা...।

সুশীলবাবু ওদের থামায়।— অ্যাই থামো, বিপদের সময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি ঠিক নয়!

সবাই চায়ের খোঁজ করছে, কোথাও চা পাওয়া যায় কি না... নিমাই বারবার গাড়ির ভিতরে যাচ্ছে রামদাকে দেখতে। রাম মোদক খুব কষ্ট করেই বলছিল বাতাস... বাতাস...।

যারা চা খোঁজ করতে গিয়েছিল তারা ফিরে এসে বলল কাছেই একটা হাসপাতাল আছে। নিমাই বলল, তো হাসপাতাল থাক না হাসপাতালের জায়গায়।

বিলাসচন্দ্র বলল— তোমাদের রামবাবুকে হাসপাতালে দিয়ে দাও। এখানে তবু একটা চিকিৎসা হবে, বাসে থাকলে রোগ ছড়াবে। এরই মধ্যে রোগ ছড়িয়ে দিয়েছে কি না আমরা জানি না। ভগবান যখন হাসপাতালটা জুটিয়েই দিয়েছে আমাদের উচিত হাসপাতালে দিয়ে দেওয়া। ঝংকারও ওর বাবার পক্ষ নিল। সুনেত্রার দিকে তাকাল ও, সুনেত্রার চোখে সমর্থন দেখতে চায়। ঝংকার এক'দিনে সুনেত্রার চোখের ভাষা পড়ে ফেলতে শিখে গেছে।

রামকে এখানে ভর্তি করে দিলে এখানে একজনকে থাকতে হবে কিন্তু, কে থাকবে?

নিমাই পেদো বলল, আমি তাহলে থেকেই যাই...।

সেই ভালো সেই ভালো। সবাই বলল।

রাম মোদকের শ্বাস প্রশ্বাসে তখন হাঁপরের শব্দ হচ্ছে। বড় বড় হাঁ করে যতটা সম্ভব মুখের গহ্বর খুলে বাতাস গিলছে। মাঝে মাঝে দুই ওষ্ঠ একত্রিত করে কিছু বলার চেষ্টা করছে। কিন্তু তার আগেই আবার খুলে যাচ্ছে মুখগহ্বর। ওর পিছনের সিটে দাঁড়িয়ে আছে কেবলমাত্র নিমাই। নিমাই ওর মাথায় হাত বুলোচ্ছে। রাম মোদক নিমাইয়ের হাতটা চেপে চেপে ধরছে।

ঝংকার বলল, প্রত্যেকটা নিঃশ্বাসে ভাইরাস। নাকে ওড়না চাপা দিয়ে রাখ।

—তুই এত পাল্টে গেলি কী করে রে এরমধ্যে? সুনেত্রা বলে ঝংকারকে।

ঝংকার বলে আমি এখন সিওর যে লোকটার করোনাই হয়েছে। আর সব দেখছি তো ইন্টারনেটে।

সদানন্দ বলল— বাজারে আমার চার লাখ টাকা পাওনা। আমার কিছু হলে পুরো টাকাটা মারা যাবে। দোতলার ছাদটা ঢালাই করা হয়নি কো, আমার মরলে চলবে না।

উত্তম বলল— আমার মা যে ফুলে রয়েছে পেটে জল, আমার কিছু হলে আমার বউ খেদিয়ে দেবে মাকে। মা রাস্তায় পড়ে মারা যাবে।

বিলাসচন্দ্র বলল— আরে ঠিক আছে, সবারই কাজ বাকি, সবাই বাঁচতে চায়, এজন্যই তো বলা হচ্ছে রামবাবুকে হাসপাতালে রেখে দেওয়া হোক। আমরা সবাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে যাব যেন ও ভালো হয়ে যায়। কী বল? মতিউরের দিকেই তাকাল বিলাসচন্দ্র। মতিউর মাথা নাড়ল। তাহলে হাসপাতালেই?

আলমবাজার মৌন।

কী সুধীরবাবু? হাসপাতাল তো? সুধীর মজুমদার বলল, আমার বিবেচনা তো তাই বলে।

তাহলে সঙ্গে কে থাকবে?

সদানন্দ বলে নিমাই থাকুক, নিমাই তো ওর ঘরের লোক।

হাসপাতালটির সামনে থামল গাড়িটি। হলুদ বাড়িটি, ঝাপসা লাল ত্রিকোণ, লাল বড় কদম ফুলের নতুন পোস্টার। ওটা করোনার। তিন-চারজন গাড়ি থেকে ধরাধরি করে বের করে।

নিমাই ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। বলছে আমি পারব না গো থাকতে। ক'দিন থাকব বল, সব তো বন্ধ বলছে, তারপর আমি মুখ্যু লোক। কিছু হয়ে গেলে কী করব আমি। আর আমার মেয়েটা বাবা বাবা বলে কাঁদছে, বউ ফোনে বলে মেয়ে খাচ্ছে না। একটা ছেলে নষ্ট হবার পর দশ বছর বাদে মেয়েটা হয়েছে। আড়াই বছর বয়স। খুব বাপ ন্যাওটা গো...। দাদা গো, ক্ষমা করে দিও... থাকতে পারব না।

তবে কে থাকবে? সদানন্দ জিজ্ঞাসা করে ওই তিন-চারজনকে।

সবাই চুপ।

তবে এক কাজ করা যাক। সদানন্দ বলে। এই নিমগাছটার তলায় শুইয়ে দিই। ওর পকেটে ভোটার কার্ড আছে, আমি দেকিচি। কিছু হলে ওরা খবর দেবে। তখন দেখা যাবে।

ওরা এবার একে একে গাড়িতে ঢুকছে, মাথা নিচু।

গাড়ি ছাড়ল। দুর্গা দুর্গা। জয় লোকনাথ! জয় জগন্নাথ। স্পিকারে আওয়াজ এল— কাজটা ভালো করলেন না। বিপদেই তো মানুষের পরীক্ষা।

সবাই চুপচাপ। এ ওকে বলছে— এছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না, তাই না? বিলাসচন্দ্র বলছে এমনি রাস্তায় তো ফেলে আসা হয়নি, ঠিক জায়গাতেই রেখে আসা হয়েছে।

ঝংকার আর সুনেত্রা আগেকার মতোই পাশাপাশি বসে আছে, কিন্তু দু'জনই চুপচাপ। সুনেত্রা নেটও দেখছে না। ঝংকার দেখছে, মাঝে মাঝে নেট আসছে, মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছে। দেখছে এই ভাইরাসটা কেমন চুপি চুপি থাকে শরীরে, প্রথম ক'দিন কিছুই বোঝা যায় না। তারপর প্রকাশ। বিশেষজ্ঞরা বলছে কঠোরভাবে লকডাউন মেনে চললে কিছুটা ঠেকানো যাবে। নইলে দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ আক্রান্ত হবে, এবং মারা যাবে। সুতরাং এখন মানুষের কাছ থেকে দূরে থাক অন্য মানুষ। একা থাক, একা হও।

কতগুলো গাড়ি উল্টোদিক থেকে আসছে। ড্রাইভাররা হাত নেড়ে কিছু বোঝাতে চাইছে। স্পিকারে গম্ভীর শব্দ এল— যাত্রীগণ, সমূহ বিপদ। সম্ভবত সীমান্ত বন্ধ। অন্য প্রদেশের গাড়ি পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে দিচ্ছে না। তথাপি আপনারা ধৈর্য ধারণ করুন। আপনারা পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সঞ্চার করুন। ভালোবাসায় বেঁধে রাখুন। পাখিরা বাসা বাঁধে লতাপাতা দিয়ে, মানুষ বাসা বাঁধে ভালোবাসা দিয়ে।

—ভালোবাসা কি ভাইরাস ঠেকাতে পারে?

চেঁচিয়ে উঠল জগন্নাথ প্রামাণিক।

জগন্নাথ এ কথা বলছে? একজন মহিলাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, সেটা ভালোবাসার জন্যই না? জগন্নাথের দিকে পিছন ফিরে তাকায় সুনেত্রা, ঝংকারও।

এই প্রশ্নের উত্তর আসে না। স্পিকারে গড় গড় শব্দ আসে নিঃশ্বাস পতনের। বড় দীর্ঘ।

রাস্তার উপর লরি, বাস, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ সারি। ড্রাইভার নেমে যায়, ফিরে এসে বলে— প্রবেশ নিষেধ। বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফুয়েল খাওয়া গাড়ি তবু ঢুকতে পারছে। পূর্ণ মৌনতা কয়েক সেকেন্ড। মাথা চাপড়ানির শব্দ, সঙ্গে আর্ত কান্নায় মৌনতা ভাঙে। মাথা চাপড়াচ্ছে আলপনা। নিমাই বলল, তাহলে আমরা ব্যাক করি, হাসপাতালে যাই, দেখে আসি কেমন আছে দাদা...

মজুমদার বলে— এগতে হবে, এগতে হবে, ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। দেখ ড্রাইভার, হাইওয়ে বাদ দিয়ে ভিতর দিয়ে ভিতর দিয়ে যেতে পারো কি না। চন্দনেশ্বর দিয়ে যেতে পারো... আরও সব রাস্তা আছে...।

পাশের একজনকে বলল— গিন্নি মারা যাবার পর আমি তো ঘুরেই বেড়াই, আমি আর আমার ছেলে। এদিকে অনেকগুলো রাস্তা আছে। গোপাল সাহা নিমাইকে বলল, পচারে নিয়া আইতে পারতি। পচা যদি থাকত, রামবাবুর কাছে থাইক্যা যাইতে পারত।

পচা নিমাইয়ের মাছের দোকানের পাশে বসে। ও আঁশ ছাড়ায়, মাছ কোটে। ওর বাপ-মা নেই। ওর বাবা অন্য একটা বিয়ে করেছিল। সৎ মায়ের কাছেই থাকা। বাপ মরার পর ওখানেও থাকে না। বাজারেই থাকে। আলুর চাতালে শোয়, হোটেলে খায়। গোপাল বলতে চাইছে রাম মোদকের ছোঁয়াচ লেগে পচার যদি করোনা হয়েই যেত, এবং মরেই যেত, তাহলে পৃথিবীর কোনও ক্ষতি হতো না।

ড্রাইভার গাড়ি ঘোরাল। হাইওয়ে ছেড়ে সরু রাস্তায়, সুধীর মজুমদার বলল— সোজা, সোজা, তারপর বাঁদিকে চন্দনেশ্বরের রাস্তা, তারপরই দীঘা।

চন্দনেশ্বর সীমান্তে বেড়া দেওয়া।

গাড়ি ফিরে আসে।

সরু রাস্তা ছেড়ে সুরকি ঢালা পথে, সুরকি ঢালা পথ থেকে ঝাউছায়া ঘেরাপথ, সামনে বালিয়াড়ি।

স্পিকারে ভেসে আসে যাবই আমি যাবই। গন্তব্য কখনই শেষ হয় না, গন্তব্য চিরকালের। একটা গন্তব্য শেষে আর এক গন্তব্য আসে।

এরপরই কাশতে থাকে।

সেই শুকনো কাশি, রামবাবুর মতোই।

দুটি বালিয়াড়ির মাঝখান দিয়ে গালি রাস্তা সোজা চলে গেছে সমুদ্রের দিকে। বাসটা হেলতে দুলতে সেই রাস্তায় চলতে শুরু করল। সামনে সমুদ্র ঢেউগুলো আঙুলের ইশারায় ডাকছে আয় আয়। সমুদ্রের বেলাভূমি বিস্তৃত, সমুদ্রের দিকে ঢালু। বাসটা দুলতে দুলতে বালুপথে, ক্রমশ সমুদ্রের দিকে। গম্ভীর শব্দ গম গম করে উঠল— চলো সমুদ্রপথে। এবং এই বাসটা সোজা সমুদ্রে ঢুকে গেল, চলতে লাগল এবং বাসটি জাহাজ হয়ে গেল।

বাক্য ভেসে এল— স্থলপথ বন্ধ যখন জলপথেই যাব। এখান থেকে উত্তর-পূর্ব অভিমুখে চলে গেলেই পৌঁছে যাব আপনাদের বাংলায়। সাহস রাখুন। এবার কাশতে লাগল, আবার কাশতে লাগল। এই স্থলযানটি এখন জলযান। চাকা দেখা যায় না। জলের তলায় চাকা। সামনে ছুটেছে। পিছনে তটভূমি, ঝাউগাছ, বালুকাবেলা। পিছনের দিকে ভয়ার্ত তাকায় যাত্রীদল। ক্যাপ্টেনের গলা শোনা যায় স্পিকারে— হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌন মূক, অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন, সর্ব উপদ্রব সহা আনন্দ ভুবন শ্যামল কোমলা...।

—এইসব ঢং রাখ শালা ড্রাইভার...

—আমি ড্রাইভার না, সারথিও না, এখন ক্যাপ্টেন।

—আমাদের সবাইকে ডুবিয়ে মারবে নাকি?

—ধৈর্য রাখো। আমি তো তোমাদের নিজস্ব ভূমির দিকেই যেতে চাইছি। স্থলপথ বন্ধ যখন, জলপথে। আমার এই আশ্চর্য গাড়ি জলচরও বটে।

—উড়তে পারে? উড়তে পারে? তবে আমাদের উড়িয়েই নিয়ে চলো।

—উড়তে পারে না এটা। জলে চলে।

ফিরিয়ে নাও, আমাদের পৌঁছে দাও মাটিতে— হে সারথি, হে ড্রাইভার হে ক্যাপ্টেন...।

—আর তো ফেরানো যাবে না। আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে ঢুকছি। আগের চ্যাপ্টারে পড়ে থাকলে এগনো যাবে না। এখন ম্যাডাম অ্যান্ড জেন্টেলম্যানগণ, আপনারা জলের সৌন্দর্য উপভোগ করুন। দেখুন তরঙ্গিত গতিমত্ত জল কল কল্লোলে উদ্বেল উচ্ছল। বাতায়নে বসে শরীরে জলের গন্ধ নিন। আর অনুভব করুন অসীমকে। কাশতে থাকল। গমকে গমকে কাশি, ঠিক রামবাবুর মতো।

এবার আবার নতুন করে কান্নার রোল এল। কী হবে আমাদের?

এই ক্রন্দন এই অনির্দেশ যাত্রার জন্য নয়, সংক্রমণের আশঙ্কায়। আবার একটা করোনা রোগী বাড়ল।

দীঘা থেকে সমুদ্রপথে কোনাকুনি গঙ্গাসাগর কতটা পথ বল দেখি সুনেত্রা? সুনেত্রাকে জিজ্ঞাসা করে সুশীল।

সুনেত্রা বলে টাওয়ার নেই, নেট কাজ করছে না। তবে আন্দাজে বলছি পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার মতো।

কতক্ষণ লাগবে ক্যাপ্টেন?

বদ হাওয়া না থাকলে ছ'ঘণ্টা। তাছাড়া গণ, বে গণ,

হিসেব মেলে না স্যার। গঙ্গাসাগর থেকে চাঁদপাল ঘাট? আরও কয়েক ঘণ্টা। যতই করোনা হোক, এই টাইমটুকু বেঁচে থাকো প্লিজ। আমাদের পার কর হে পারের কর্তা। আমাদের চাঁদপাল ঘাট পৌঁছে দাও, আমাদের বাবুঘাট পৌঁছে দাও। হে ক্যাপ্টেন, হে কাণ্ডারি, হে প্রভু...। প্রভু আর বক বক করে না মাইক্রোফোনে। স্টিয়ারিং-এ মাথা এলিয়ে দেয়।

যাত্রীরা কেউ চিৎকার করে ওঠে, কেউ মাথা চাপড়ায়। কেউ স্তব্ধ। কেউ আর ইষ্টনাম জপ করছে না। আলোছায়া রুদ্রমূর্তিতে কোমরে হাত দিয়ে এগিয়ে এসে বলল— ব্যাটা অলপ্পেয়ে। পোড়ারমুখো, পাজি, নচ্ছার, আমাদের মাঝ সমুদ্দুরে নিয়ে এসে এখন হারামিগিরি হচ্ছে? মজুমদার এসে ওকে চুপ করায়। বলে ওকে এখন উত্তেজিত কোরো না। ওর এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে আর কিছুক্ষণ বেঁচে থাকা দরকার।

ক্যাপ্টেন মাথা এলিয়েছে স্টিয়ারিং-এ। অথৈ সমুদ্রে এই গাড়িটি চলেছে দিকবিদিকহীন। চারিদিকে ছল জল।

মাথায় চাপড় দেয় অণিমা, আলপনা। সুশীলবাবু বলে নির্ঘাৎ করোনা। এবার তো আমাদেরও হবে।

ড্রাইভার কেবিনের কাচের দরজাটা খোলে ও বলে— আপনাদের সংক্রমণের জন্য আমি দায়ী হতে চাই না। বিদায় বন্ধুগণ, আমি চললাম। আপনারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই ঠিক করে নিন। এবার বাঁদিকের দরজাটা খুলে আচমকা জলে ঝাঁপ দিল লোকটা। এবং সাঁতরাতে লাগল। নীল-কালো জলে দুটো হাত কত তুচ্ছ, কত শীর্ণ, গাড়িটা চলছে আপনার মনে লোকটি বিন্দু হয়ে যায়। লোকটি শূন্য হয়ে যায়।

কোনও চালক নেই এই জলযানটির। হঠাৎই অপরূপ নামের ছেলেটা উঠে দাঁড়ায়। হেঁকে বলে দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার ও হে... লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার...। বলে সামনে এগিয়ে যায়। কেবিনের দরজা খোলে, এবং ড্রাইভারের সিটে বসে। স্টিয়ারিং চেপে ধরে। ওর বাবা সুধীর মজুমদার স্যানিটাইজারের শিশি হাতে এগিয়ে যায়। ওরে, ওরে আগে স্টিয়ারিং স্যানিটাইজ কর। করোনা পেশেন্ট এতক্ষণ এতে হাত দিয়েছে, একবারও ওকে সাবান দিয়ে হাত ধুতে দেখিনি। নে, তোর হাত মেলে দে। হাতে স্প্রে করে, স্টিয়ারিং চাকাটার গায়ে স্প্রে করতে থাকে, বিলাসচন্দ্র চেঁচিয়ে ওঠে— করেন কী, করেন কী, স্যানিটাইজার তো একটাই আছে। সব এখানে ঢালছেন কেন? জগন্নাথ এগিয়ে আসে। সুধীর মজুমদারের হাত থেকে কেড়ে নেয়, গোপাল সাহা বলে আমরা কি বানের জলে ভাইস্যা আসছি নাকি, আমরা মানে আলমবাজারের লোকজনরা দেখি কিছুই পাই না। সদানন্দ বলে এক্কেবারে ঠিক কথা কয়েচো। ওটা তোমার কাছে রেখে দাও। জগন্নাথ শিশিটা বুকে আগলে রাখে। আলোছায়া এক হাতে চেপে অন্য হাতে কিছুটা নিজের তালুতে নিয়ে সারা হাতে যেটা মাখে সেটা ক্ষমতা। ক্ষমতা ও নিরাপত্তা। গোপাল ওটা ছিনিয়ে নেয়। সদানন্দ বলে— আমাদের সবার হাতে দাও তো... সবার হাতে একটু একটু...। মতিউর বলে— আমার জীবনের কুনো দাম নেই, হামাকে তুমরা আগে ভি এক বুঁদ দাওনি, এখন ভি এক বুঁদ না। মোসলমান আছি, সে জন্যে?

সাম্প্রদায়িক সম্পিতি নষ্ট হয় এমন কথা বলবি না মতিউর। সাম্প্রদায়িক সম্পিতির জন্যই তোকে এনেছিলাম... সদানন্দ চেঁচায়। ঝগড়া চলতে থাকে, যে যতটুকু জল সঙ্গে করে

এনেছিল শেষ হতে থাকে, যে যতটুকু খাবার সঙ্গে করে এনেছিল শেষ হতে থাকে। সূর্য ডুবে যাবার জন্য প্রস্তুত। লাল হয়ে এসেছে। ড্রাইভারের সিট থেকে অপরূপ মাইক্রোফোনে বলে— বেগুনি, কমলা, লাল মেঘেতে মিশিয়ে—

সূর্য, আমায় বলছে ওহে; তোমার চোখের সামনে ঈশ্বর দেখহে।

এই চেয়ারে বসলেই সব ছিটেল হয়ে যায় নাকি? ছেলেটা এমনিতেই একটু ইয়ে আছে অবিশ্যি...। সুনেত্রা সূর্যাস্ত দেখে। সত্যিই সুন্দর, কিন্তু খিদে পেয়েছে যে। খিদের পেটে এসব পোষায় না। কিন্তু সূর্যটা ডানদিকে অস্ত যাচ্ছে কেন? উত্তরদিকে গেলে তো বাঁদিকে পশ্চিম। তবে কি উল্টোদিকে যাচ্ছে এই জাহাজ! দক্ষিণে? সুনেত্রার স্মার্ট ফোনে টাওয়ার নেই বটে, ইন্টারনেট নেই, কিন্তু কম্পাসটা তো ফোনেই ইনবিল্ট। কম্পাসটা খোলে। দেখে একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি, মানে দক্ষিণ—দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলেছে। এভাবে চললে তো কোনওদিন কূল আসবে না— বঙ্গোপসাগর... ভারত মহাসাগর... সুনেত্রা ঝংকারকে বলে— ঝংকার বলে— আর ভাল্লাগে না। এনাফ ইজ এনাফ। সুনেত্রা কেবিনে ঢোকে। ছেলেটিকে বলে যাও স্টিয়ারিং ঘোরাও। এই দেখো কম্পাস। আমরা উত্তরদিকে যাব। উত্তরদিকে গেলে আমরা স্থলভূমি পাব। অপরূপ স্টিয়ারিং ঘোরায়, সুনেত্রা কম্পাস ধরে থাকে ওর পাশে। সুধীর মজুমদার ছেলেকে ডাকে চলে আয় বাবা চলে আয়, সুশীল-অণিমা মেয়েকে ডাকে চলে আয় মা, চলে আয়! ওরা ওখানেই থাকে। ওদের নিজস্ব বাপ-মায়েরা ওই কেবিনে ঢোকে না করোনা সংক্রমণের ভয়ে।

রাত্রি নামে। পশ্চিম আকাশে এক ফালি সরু চাঁদ আকাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। বাইরে ঘন অন্ধকার। বাসের ভিতরের আলো নিভিয়ে দেয় সুনেত্রা। বলে এখন ব্যাটারি বাঁচানো উচিত। সম্পূর্ণ অন্ধকারের ভিতর বাক্স বন্দি অন্ধকার মিশে রইল।

নীরব নিশীথ রাত। এই কেবিনে কি জাদু আছে? সুনেত্রার গান পায়। ও গাইতে থাকে—

নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে
আঁধার কেশভার দিয়েছে বিছায়ে।
আজি এ কোন গান নিখিল প্লাবিয়া
তোমার বীণা হতে আসিল নাবিয়া....

অপরূপ অবাক হয়ে তাকায় সুনেত্রার দিকে। বলে গান হচ্ছে বাইরেও। কিন্তু আওয়াজ নেই, তাই সবাই শুনতে পাচ্ছে না। আমি কিন্তু বুঝতে পাচ্ছি। নিস্তব্ধতার ভিতর থেকে বার কয়েক মচর মচর যে শব্দটা তৈরি হল, সেটা প্লাস্টিক এবং কাগজ থেকে তৈরি। সবাই খুঁজছে খাবারের কিছু অবশিষ্ট, কিছু গুঁড়ো কিছু কণিকা খুঁজে পাওয়া যায় কি না প্যাকেট কিনারে। ছেলেটি সিটে বসে থাকে। পাশে মেয়েটি। একটি বোতলে কিছুটা জল দেখতে পায় ছেলেটি। মেয়েটিকে দেখায়। মেয়েটি বলে দু'জনে একটু করে, এ্যাঁ? ছেলেটি বলে সবাইকে একটু একটু করে কুলোবে না, তাই না? মেয়েটা বলে নারে। ওরা চুপি চুপি জল খায়, অপরাধীর মতো। কেউ জানতে পারে না। কম্পাস ধরে বসে থাকে মেয়েটি। বাইরে হাওয়া দিচ্ছে, টলমল করে তরী। মেয়েটি বলে শক্ত হাতে, শক্ত হাতে ধর, এই দ্যাখ কম্পাস, উত্তরে যাব। উত্তরে।

মেঘ ডাকল। আকাশ চিরে বিদ্যুৎ ঝলক। হাওয়া দিল দমকা, টলমল করে ওঠে তরী। সুনেত্রা বলল— পারবে তো তুমি অপরূপ? এধার ওধার যাচ্ছে, অন্যদিকে যাচ্ছে, এই দেখো কম্পাস, আশি-নব্বই-একশো...।

কী হবে আমাদের?

এবার বৃষ্টি নামল।

বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি... বৃষ্টি মানে জল। সুনেত্রা চেঁচাল বৃষ্টি নেমেছে। সবাই ছাদে চলো। এখানে সিঁড়ি। একে একে। জল ভরে নাও।

জল ভরার কিই বা আছে কার কাছে। বোতলে তো বৃষ্টি জল ভরা যায় না। বাসের ছাদে উঠল সবাই। অনেকের মোবাইলে চার্জ নেই আর। দু'একজনের একটু ছিল। ওরা মুহূর্তের জন্য আলো দেখাচ্ছিল। সবাই চাতক হয়েছিল। চিৎ হয়ে হাঁ করে করে রইল। বৃষ্টি জল কেড়ে খাওয়া যায় না, ছিনিয়ে নেওয়া যায় না। হাঁ করে থাকলে মেঘ সবাইকে সমানভাবে বৃষ্টি ভাগ করে দেয়। বৃষ্টির শব্দের মধ্যে প্লাস্টিকের মচমচ ধ্বনি শোনা গেল। কেউ বোধহয় জলের সঙ্গে প্লাস্টিকও চিবুচ্ছে, কাগজ আর নেই। খাওয়া হয়ে গেছে হয়তো। সবাই শুয়ে আছে চিৎ, জলের আকাঙ্ক্ষার কাছে। করোনা ভয় নেই, দূরত্ব নীতি নেই, এক মায়াবী শব্দে বৃষ্টি নামে, থামে আবার মুখগহ্বর খোলাই থাকে, বৃষ্টি থেমে গেলে যে যার সিক্ত বসন চুষে জল খায়। কতগুলি আদি জীব পড়ে থাকে। আকাশ গ্রন্থিতে সূর্য ওঠে ফের। সমুদ্র রৌদ্রাক্রান্ত হয়। মানুষেরা মাথা চাপড়ায় ফের। রাত্রে জল দেখা যায়নি। অনন্ত অন্ধকারে ঢাকা ছিল। এখন আবার জল শুধু জল। চিত্ত বিকল করা জল। জগন্নাথ আলোছায়াকে দেখে। স্পর্শ বস্তু হিসেবে নয়, যৌন বস্তু নয়, খাদ্য হিসেবে দেখে। ছিঁড়ে খাব, ছিঁড়ে খাব আগে কতবার বলেছে জগন্নাথ, আদর করে। এখন যে ছিঁড়ে খেতে ইচ্ছে করছে। চোখ বোজে জগন্নাথ। সদানন্দর চেহারাটা বেশ বড়। ভুঁড়ি আছে। সদানন্দ লক্ষ করে, ওর দিকে জুল জুল তাকিয়ে আছে অনেকে। এরচেয়ে অন্ধকার ভালো। এই শালা সূর্য, আমাদের জাগালি কেন?

কেউ কাশছে। রাত্রের বৃষ্টি ভেজা ঠান্ডা নাকি করোনা? কার? হোক গে যাক। না খেয়েই তো মরতে হবে। খাবার ছাড়া ক'দিন বাঁচা যায়! যারা অনশন ধর্মঘট করে, ওরা তো জল খায়। জল না খেয়ে ক'দিন বাঁচা যায়? তিনদিন?

মতিউর বোতলে দড়ি বেঁধে সমুদ্র থেকে জল তুলে গলায় ঢেলেছিল। বমি করে দিয়েছে ও আরও অসুস্থ হয়ে গেছে। ঝংকার চোখ বুজে আছে। দেখতে পায় একটা জাহাজ ভেসে চলেছে সমুদ্রে সারা দিন— সারা রাত, এধারে ওধারে। জাহাজের ভিতরে কতকগুলি মৃতদেহ পচে যাচ্ছে। দুর্গন্ধ শব্দটাই অর্থহীন হয়ে গেছে। কারণ দুর্গন্ধ গ্রাহক কেউ নেই। শুধু পচাগলা মৃতদেহ ভরা একাকী জাহাজ ভেসে বেড়াচ্ছে। দেহগুলোর কার নাম ঝংকার ছিল, কে মইদুল, কেই-বা জয় জগন্নাথ-কৃপাসিন্ধু কেউ জানে না। ছোট, তাই সুনেত্রার দেহটাই চেনা যাবে শুধু। ভবিষ্যতে কোনওদিন এই জাহাজ আবিষ্কৃত হলে আগামী পৃথিবী একটা কঙ্কালভরা জাহাজ দেখতে পাবে। আগামী মানুষের চোখে এই কঙ্কালগুলোকে দেখতে পায় ঝংকার, কঙ্কালদের খিদে নেই, তেষ্টা নেই, যৌনতা নেই, সংক্রমণের ভয়ও নেই। আহা কী স্নিগ্ধ এই জলযান? কে ছিল ওই ড্রাইভারটা? যত নষ্টের গোড়া? ও কি ম্যানড্রেক? ডঃ ডুম? ক্যাপ্টেন স্ট্রেঞ্জ? নাকি সুপারম্যান না ব্যাটম্যান নাকি ব্যাটা ভগবান? সে এরকম নকশা করে এসেছিল, বুঝতে পারিনি আমরা। ভগবান কি ড্রাইভার হয়েই এসেছিল? ধুস্। ভগবানের করোনা হবে কেন? ভগবানের কি ইনফেকশন হয়? কিন্তু হয়ও তো। যিশুখ্রিস্টকে তো ক্রুশ

কাঠে পেরেক মারা হয়েছিল, চৈতন্যদেবের মাথা ফাটিয়েছিল জগাই-মাধাই। বুদ্ধদেব মারা গিয়েছিল আন্ত্রিক রোগে। আরে, শ্রীকৃষ্ণেরই তো ইনফেকশন হয়েছিল পায়ে তির লেগে।

আবার কাশির শব্দ শুনে চোখ খোলে ঝংকার। ঝংকার দেখল যারা ঝিমোচ্ছিল, সবাই নড়েচড়ে বসেছে। সবাই সবাইকে দেখছে। ঘাড় ঘোরাচ্ছে এদিক ওদিক। সবাই উৎস সন্ধানী। কিন্তু বোঝা গেল না কিছু। চোখ বুজে থাকা ছাড়া আর কিচ্ছু করার নেই কারও। কিন্তু চোখ বুজলেই কাশির উৎস অগোচর। কিন্তু চোখ বুজে আসে পুনরায়। কিন্তু আবার কাশির শব্দ। লোকগুলো কোনও মিটিং করেনি, কোনও রেজলিউশন নেয়নি, অথচ সবাই মিলে এক সঙ্গে হে ভগবান বাঁচাও ভগবান, হে মাকালী বাবা লোকনাথ বাবা লোকনাথ করতে লাগল। মাথাতেই এলো না করোনা না হলেও বাঁচার সম্ভাবনা নেই। মতিউরের বোধহয় এদের মাঝখানে হে খোদা ইয়া আল্লা করতে অসুবিধা হচ্ছিল, তাই কেবিনে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে চলে গেল। মতিউর উপরে যাকগে যাক, নীচে ভগবান ডাক চলতেই থাকে। ঝংকারও হাত জোড়া করে। এবং কান্না আসে প্রায় কেঁদেই বলে— কিছু একটা করো হে ভগবান। কেন এভাবে ঝুলিয়ে রেখেছ আমাদের...। ঠিক এ সময়ে মাউথ অর্গানে সুর শোনে ঝংকার। সুরটা চেনা লাগছে। হ্যাঁ, আজি এসেছি আজি এসেছি বঁধুহে...নিয়ে এই হাসি রূপ গান... টাডাডা টাডাটাডা লালালা লালালা— টারাডারা টারাডারা ডা...। মাউথ অর্গানে এই সুর... কোথা থেকে আসে। মতিউর ছাদে যাবার সিঁড়ি থেকে কিছুটা নেমে বলে— এসে দেখে যাও সবাই— উপরে কৌন আয়া, দেখিয়ে কৌন হাজির, আইয়ে আসুন, জলদি...

ঝংকার সিট ছাড়ে, উপরে যায়। কোথা যাস ঝংকার বলতে বলতে বিলাস, আলপনা, তারপর আরও কেউ কেউ...। অপরূপ স্টিয়ারিং ছাড়ে না। সুধীর মজুমদারও উপরে যায়।

ঝংকার দেখে— ছাদের একধারে একজন টুপি পরা লোক, ম্যানড্রেকের মতো নাকি চার্লি চ্যাপলিনের মতো। চোখে, সানগ্লাস, গায়ে ওভারকোট। গামবুটের ভিতরে গোজা প্যান্ট মুখটা কী আশ্চর্য বাসটার ড্রাইভারের মতোই তো। ওর সামনে এলিয়ে পড়ে আছে একটা রুপোলি প্যারাসুট, লোকটা বাঁশি বাজাচ্ছে, মতিউর বলে ছাদে এসে দেখি আমাদের সুরজ অস্ত যাচ্ছে, কতদিন নামাজ উমাজ বাদ গেছে, খুব ইচ্ছা হল আসর-এর নামাজটা এবার পড়েলি, নামাজ পড়ে দুয়া করলাম, ইবাদত করলাম দিল থেকে, বললাম হে আল্লাহ আমরা গুনাহগার, পাপী, অনেক শাস্তি হয়ে গেছে এবার আমাদের রহম কর, হেদায়েত কর, বলতে বলতে সেজদা করেছি, সেজদা থিকে উঠলাম, দেখি আসমান থেকে মিউজিক বাজাতে বাজাতে উনি নামছেন।

সুধীর মজুমদার সিঁড়ির গর্তে মুখ ডুবিয়ে বলল, অ্যাই অপরূপ? আর স্টিয়ারিং-এ বসে কী হবে? আয়, হাতজোড় করে উপরে আয়। দ্যাখ এসে, পারের কর্তা এসে গেছেন। আর চিন্তা নেই।

সবাই এসে গেছে বাসের ছাদে।

—আরে, এ তো দেখি পিসি সরকারের ম্যাজিক। জলে ঝাঁপ দিয়ে অদৃশ্য, আবার এখানে হাজির।

—আপনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। বুঝতে পারিনি স্যার।

—ওঁং নমঃ নারায়ণায় গোবিন্দায় কৃষ্ণায় নমঃ

—জয় শ্রীরাম।

—নারায়ে তাকবির। আল্লা হো আকবর।

—হে ভগবান— আমাদের বাড়ি পৌঁছে দাও...

—আরে বাড়ি তো পরের ব্যাপার, আগে দুটো খেতে দাও।

মাউথ অর্গান থামল। ওভারকোটে ঢাকা হাতটা লম্বা করে হাতের পাতাটা উঠিয়ে অভয় মুদ্রা দেখায়। বলে তথাস্তু। তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করব। খাবার? ইয়েস। তবে একটা শর্ত আছে। যত পরিমাণ দেব, আমি তত পরিমাণ নেবো।

—মানে? মানে? মানে?

তোমাদের একজনকে আমি নেব, যত কেজি তার ওজন, তত কেজি খাবার দেব। কেউ একজন ভলান্টিয়ার করো। আমাকে বল— নাও আমাকে, আমার ওজনের সমান সমান খাবার দাও।

সবার আগে সুনেত্রা বলে— আমাকেই নাও তবে। আমি তো ডোয়ার্ফ। আমি সংসারের বোঝা। আমাকে বিয়ে দিয়ে পার করতে বাবার খুব কষ্ট হবে। আমাকেই নাও।

সুশীল তক্ষুনি এগিয়ে যায়, মেয়ের হাত চেপে ধরে। বলে কেন এরকম কথা বলিস? আমি কি কোনওদিন বলেছি তুই আমাদের বোঝা?

অপরূপ বলে— ওর আর কতটুকু শরীর? আমি পাঁচফুট আট ইঞ্চি। আমি তো বাবার আরও বেশি বোঝা। আমি তো কিছু পাশ না, আমার তো বুদ্ধি কম। সবাই তো বলে। আমার বদলে যদি সবাই বেঁচে যায় তো খুব ভালো খুব ভালো। আমার ওয়েট একাত্তর কেজি, তাই না বাবা? টুপি পরা মানুষ মিটি মিটি হাসছে। কালো কাচে ঢাকা বলে চোখ পিটপিট করছে কিনা বেঝা যাচ্ছে না। বলল, ভেরি গুড, ভেরি গুড।

অপরূপের বাবা চেঁচিয়ে উঠল। বলল ভেরি গুড? বডি

ওয়েটই যদি ক্রাইটেরিয়া হয় তবে ওর চেয়ে হেভি তো ছিল। সদানন্দর ভুড়ির দিকে তাকায়। সদানন্দ হাত জোড় করে। বলে একটা প্রশ্ন করতে পারি প্রভু? আপনি মানুষের বদলে খাদ্য দান করবেন বলছেন, তো মানুষটিকে কোথায় রাখবেন? স্বর্গে না নরকে? সত্যি কথা বলবেন প্রভু। নরক যদি হয় ওখানে যা কষ্টর কথা শুনি সেটা কি ঠিক? নরক ফেরত কাউকে দেখিনি তো, তাই জানি না। স্বর্গে যদি চান্স দেন প্রভু, আমাকে নিয়ে নিন। মতিউর বলল— হে রব, হে মালিক, একটা কথা বলুন, জান্নাত আর স্বর্গ কি একই জায়গায় আছে? নাকি আলাদা? জান্নাতে মোসলমান না হলে লেকিন যাওয়া যায় না। স্বর্গ কি মোসলমানদের জন্য ভি অ্যালাও আছে? আর জান্নাতের মতোই সেম সেম ফেসিলিটি? সবকুছ আছে?

—সবকুছ বলতে কী মিন করছ ভাই? হুর?

—জি। সবকুছ। গুলাব, গিলাব, সারাব আউর...

—যদি থাকে তাহলে কি তুমি যাবে?

মতিউর মাথা চুলকায়। বলে ওই আখেরাতে জান্নাত ইয়া বেহেস্তের জন্যই তো এই দুনিয়াদারি। যদি ডাইরেক্ট উখানে লিয়ে যান তবে তো খুব ভালো হয়, রোজ রোজ মাংস কাটা আর খরিদ্দারের সঙ্গে খিটিমিটি ভালো লাগে না। রাং দাও, হাড় দিচ্ছ কেন, আর একটু মেটে দাও, চর্বি বেশি দিচ্ছো কেন। লেকিন দুটো কথা ছিল, ডাইরেক্ট বেহেস্ত দিবেন, নাকি কিয়ামত পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে?

—কেন, তুমি ওয়েট করতে চাইছ না বুঝি

মাথা চুলকোয় মতিউর।

—ঠিক আছে, দু'জন হল। যাদের বডি ওয়েটের সমান খাদ্য বাকিদের দিয়ে দেবো। আর কেউ? সবার আগে চেঁচিয়ে উঠল সদানন্দ। বলে না-না-না প্রভু... আমি তো ফাইনাল বলিনি। যদি, স্বর্গে আপনার শ্রীচরণে ঠাঁই পাই, তবেই যাব। নইলে যাব না।

টুপি পরা লোকটা বলে— স্বর্গ-নরক আমি কী করে বলি? বিচার-টিচার হবে, হিসেবপত্র হবে তবে তো...

—তবে যাব কেন? কোরাসে বলল ওরা। টুপি পরা লোকটা বলল, তাহলে আমি কী করে খাবার দেব? তোমরা ডেকেছিলে তাই এসেছি হেথায়। এবার চলিয়া যাইবা পরমে পরম।

তক্ষুনি কোরাস শোনা গেল— না যেও না হে, হে প্রভু, হে ঈশ্বর, হে খোদা যেও না।

সুনেত্রা আবার বলল— বলছি তো আমাকে নাও।

সুশীল বলল— আচ্ছা স্যার, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, যদি মেয়েটার বিনিময়ে খাদ্য দেন, সেটা আমাদের তো, মানে মেয়েটা আমাদের দু'জনের, সুতরাং খাবারটাও আমাদের দু'জনের...।

ঝংকারের মা আলপনা বলল— আমাকে নিয়ে নিন যদি আমার বদলের খাবারটা ওরা দু'জনে, মানে ঝংকার আর ঝংকারের বাপের থাকবে তো? জগন্নাথ বলল— এই মহিলাটি আমার, আর ওর বদলের খাবারটাও আমার একার...। আলোছায়া কোমরে হাত দিয়ে বলল— ইশশ, বললেই হল? আম যদি বলি এই মিনসেটা আমার, ওকে নাও, ওর বদলে খাবারটা তাহলে আমার...।

গোপাল সাহা বলল, আমাদের সদানন্দদা তো আগেই নিজেকে ভলান্টিয়ার কইরা ছিলেন। তেনার ওজনের ফুডটা কিন্তু আমাদের হক। এই আলমবাজার গুরুপের। এ সময় মতিউর জিজ্ঞাসা করে আমি কি আলমবাজার গুরুপে পড়ি, নাকি আমি আলাদা... বলতে গিয়ে কেশে ওঠে মতিউর।

—ও... এতক্ষণে বোঝা গেল তুই কাশছিলিস। ভগবান, মতিউরকে নিয়ে নিন। ওর করোনা হয়ে গেছে। ব্যাস, পল্লেম মিটে গেল।

মতিউর কাশি চাপার চেষ্টা করছিল, কিন্তু কাশির মধ্যেই বলল— আমি কেন? আমি ইয়ে বলে?

টুপি পরা লোকটা বলল— তোমরা একমত হতে পারলে না। তাহলে তোমাদের অন্য একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তোমাদের একটা করে পিল দিতে পারি যেটা খেয়ে নিলে আর কোনও খিদে থাকবে না। ভেবে দেখ।

বিলাসচন্দ্র জিজ্ঞাসা করে— আর তেষ্টা?

—সেটাও থাকবে না আর। ভেবে দেখো। সবাই চুপ। এ ওর মুখ দেখছে। জগন্নাথ বলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব স্যার?

টুপি পরা মানুষটি বলে হোয়াই নট?

জগন্নাথ বলে প্রাইভেট কথা স্যার। হাতের ইশারায় কাছে ডাকে।

জগন্নাথ ওই মানুষটির কাছে গিয়ে বলে— কানে কানে স্যার...।

গোড়ালি উঁচু করে। সেই মানুষটিও কাঁধ নিচু করে একটি কান আর অন্য একটি মুখের সম উচ্চতা রচনার চেষ্টা করে। জগন্নাথ একটি মাত্র শব্দ বলে।

মানুষটি মৃদু হাসে। আঙুলে টুসকি মারে। বলে হ্যাঁ, সবরকম, সবরকম খিদে। জগন্নাথের মন খারাপ হল যেন। সূর্য ডোবা আকাশের গোধূলি আলো জগন্নাথের মন খারাপ মুখে। নিমাই বোধহয় জগন্নাথের সমস্যাটা বুঝেছিল। নিজের পেটে হাত দিয়ে বলল, আগে তো এটা স্যার, পরে তো ওটা। সুনেত্রা হাত জোড় করল। বলল, তাই তোমার আনন্দ আমার পর। তুমি তাই এসেছ নীচে। আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে। আমাদের খিদে, আকাঙ্ক্ষা এসব কিছুই না থাকলে তো তোমায় ডাকবই না, আর আমরা না ডাকলে তো তুমিই নেই। তার চে ভালো আমাদের খিদে থাক, আশা-আকাঙ্ক্ষা সব থাক। কম কম থাক। আর সেটা তুমি মিটিয়ে দাও। যেমন তেষ্টা মিটিয়েছিলে বৃষ্টি দিয়ে, তেমন করে খিদেটাও মিটিয়ে দিও। উপর থেকে ঝিরি ঝিরি ভাত বৃষ্টি হোক, আমরা ভাগ করে খাব।

—শুধু ভাত? একটু একটু মিহিদানা... আলোছায়া বলে।

—শিল পড়ার মতো মাঝে মাঝে ছোট ছোট আলুও ফেলো প্রভু দয়াময় আলকাদির আলাই হি ওয়াসাল্লাম। ব্যাস, আর কিছু চাই না... বলার পরই কাশতে থাকে মতিউর।

বিলাসচন্দ্র বলে হে ভগবান— হে দয়াময়, খাবার ব্যবস্থাই যদি করে দাও, তবে এরও একটা ব্যবস্থা করে দাও। ওর তো করোনা হয়েই গেছে মনে হয়। কাশছে যে...। ওকে হয় সারিয়ে দাও, নয় তুলে নাও। টুপি লোকটা বলে বিহিত তো তোমাদের হাতেই আছে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও...।

ঝংকার বলে— সে না হয় ফেলে দেওয়া গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে তো ছড়িয়ে দিয়েছে অনেকের মধ্যেই। তার কী হবে? এইটুকু গাড়িতে আমরা সবাই গাদাগাদি করে আছি। সোশ্যাল ডিসট্যান্স নেই...।

—ও এই ব্যাপার? এ আর সমস্যা কী? বলে নিজের একটা হাতের পাতা উপরে আর একটা হাতের পাতা নীচে

করে আস্তে আস্তে দুটো হাতের দূরত্ব কমিয়ে আনতে লাগল টুপি পরা মানুষটা, আর সবাই আস্তে আস্তে ছোট হতে থাকল। ছোট হতে হতে ছোট হতে হতে পুতুল। সব পুতুল মানুষের মধ্যে সেই বামন মেয়ে মানুষ, সুনেত্রাই মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। টুপি পরা লোকটা মাউথ অর্গান তুলে নিল ফের। তখন অন্ধকার নামছে সমুদ্রে। একটা তারা ফুটেছে। ও কী একটা সুর বাজাচ্ছে, বেশ চেনা চেনা। উদাস উদাস। সুনেত্রার মনে হচ্ছিল— ও কি এল, ও কি এল না, বোঝা গেল না। ও কি মায়া, কী স্বপনছায়া ও কি ছলনা...

ও কি আমাদের রগড় দেখছে? নাকি রগড় দেখাচ্ছে? সবার জামাকাপড় কামিজ, প্যান্ট মাটিতে লুটোচ্ছে। মুখটা উঁচিয়ে আছে শুধু। বাজনা থামিয়ে লোকটা বলল— খুলে ফেলো, খুলে ফেলো তোমাদের এ আমির আবরণ। তোমরা কেউ তোমার সমান নও— উপলব্ধি করো। আর সোশ্যাল ডিসট্যান্স? ওটা তো হয়েই গেল। ওটা তো পেয়েই গেলে এবারে। কত বড় বিচরণ ক্ষেত্র পেয়ে গেলে তোমরা। এই যে দাঁড়িয়ে আছো, আগে দাঁড়িয়েছিলে তোমাদের দু'হাত অন্তর দূরত্বে। এখন পাঁচ হাত দূরত্ব হয়ে গেল। এ আবাসের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত হেঁটে গেলে তোমাদের আট পা হতো, এখন চব্বিশ পা কিংবা তিরিশ পা হয়ে যাবে। মিটে গেল সমস্যা। ব্যাক উইনডো থেকে ফ্রন্ট গেট এই তোমাদের পৃথিবী। এর মধ্যে তোমরা বাঁচো, প্রবলেম নেই কোনও। খিদে, মানে সবরকমেরই খিদে নিয়ে নিলাম। তেষ্টাও বাই বাই, টেক কেয়ার।

অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার হয়ে মিলিয়ে গেল সে।

এবার তো নামতে হবে। এত বড় বড় পোশাক পরে তো চলাফেরা সম্ভব নয়। পোষাক খুলে ফেলতেই হল। যে যার নিজস্ব পোশাকগুলো পাকিয়ে দু'হাতে আগলে রাখে। বিরাট বোঝা হয়ে আছে বুকের কাছে। নক্ষত্রের আলোয় একজন অন্যজনকে দেখে। নিচে নামতে গিয়ে দেখে সিঁড়ির ধাপগুলো সব বড় বড় হয়ে গেছে। একটা সিঁড়ি থেকে অন্য সিঁড়িতে লাফিয়ে নামতে হবে। এইসব পোশাক কুণ্ডলী দু'হাতে বুকে আগলে রেখে নামা যায় না। তাই যে যার পোশাক ফেলে দিল। এবার হাতল ধরে প্রায় ঝুলে পরের পাদানিতে পা। একজন অন্যজনকে সাহায্য করতে লাগল। এভাবে নেমে এল ওরা। বাসের ভিতরে আলো নেই আর। অন্ধকারে একজনের হাত ধরে অন্যজন নিজস্ব সিটের কাছে নিয়ে যায়। সিটগুলো অনেক উঁচু হয়ে গেছে। ওঠা যাচ্ছে না। চেষ্টা করছে, পড়ে যাচ্ছে। দৈর্ঘ্যে ছোট হলে কী হবে বয়স্করা বয়স্কই আছে। ওরা কি লাফাতে পারে? কম বয়সিরা উবু হয়ে পিঠ পেতে দেয়। পিঠে পা দিয়ে সিটে আরোহণ করে। এই সহমর্মিতা যেন হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন। একদা বাস, এখন জাহাজের সিটটাও অপরূপের পক্ষে বেশ উঁচু। সামনের কাচের ওপারের কালো থেকে একটা আভা, একটা রহস্যময় ছটা বেরিয়ে আসছে। অন্ধকারেরও একটা মোহিনী রং থাকে। স্টিয়ারিং-এর গোল চাকতিটার দুইদিক কি ধরতে পারবে অপরূপ? অপরূপ ওই চক্রটির দিকে চেয়ে থাকে। সিটটাও ওর পক্ষে যথেষ্ট উঁচু। ওখানেই সুনেত্রা। সুনেত্রা বলে এবার আমি চালাচ্ছি।

অন্ধকার মাখা কালো আলোয় বসনহীনা সুনেত্রাকে অবাক দেখে অপরূপ। সুনেত্রা বলে— তাকিওনা।

অতল অন্ধকারে ডুবে থাকা শব্দহীন রাত। ইঞ্জিনের শব্দ থেমে গেছে অনেকক্ষণ। সুনেত্রা বোঝে স্টিয়ারিং ধরে থাকার

কোনও মানে নেই। জ্বালানি নেই।

ব্যাটারি নেই, টাওয়ার নেই, ইন্টারনেট নেই, খিদেও নেই, তৃষ্ণাও নেই— এমন রাত্রি শেষে লাল আভা আসে। কতগুলো পুতুল বসে আছে তাদের নিজস্ব আসনে চুপচাপ। ওদের মধ্যে সোশ্যাল ডিসট্যান্স আছে ঠিকঠাক। স্রোতের ইচ্ছেমতো, বাতাসের ইচ্ছেমতো, জোয়ার কিংবা ভাঁটার ইচ্ছে মতো ভেসে চলেছে জাহাজ। আর কেশে চলেছে মতিউর।

এখন আর ওই কাশির শব্দে ভয় নেই। খিদে ছিনিয়ে নিয়েছে ওই টুপিপরা মস্তান। সবরকম খিদে। ভয়ও তবে একরকম খিদে? ভয় করছে না কেন? বিলাস, নিমাই, জগন্নাথ, সদানন্দ কেউ তো যে যার পুতুল শরীরের নাকে মুখে হাত চাপা দিচ্ছে না।

যে যার জায়গায় বসে বসে কিছু কিছু ভাবছিল। সদানন্দ ভাবছিল বাড়ি ফিরে নাতনিটাকে কোলে নেবার কথা ছিল, এখন নাতনিটাই সদানন্দকে কোলে নেবে, যদি ফেরে কোনওদিন। পুতুলটাকে ঘুম পাড়াবে নাতনিটি। টুকটুকি বলে ডাকে সদানন্দ। সদানন্দকে ঘুম পাড়াবে, খাওয়াবে, শোয়াবে ওর পাশে। গল্পও কি বলবে টুকটুকি? সদানন্দও কথা বলা পুতুল হয়ে এই জলযাত্রা, এই জাহাজ, এই অভিযানের গল্প বলবে।

নিমাই ভাবছিল ফিরে গিয়ে কি মাছের ব্যবসা করতে পারবে আর? বঁটিটাই তো ওর চেয়ে বড়। মানুষের চেয়ে বড় কেটে ফেলার অস্ত্র। দু'হাতে একটা কাতলা মাছও ধরতে পারবে না। কী করে সংসার চলবে তবে? জ্যান্ত পুতুল দেখবে গো... কথাবলা পুতুল দেখবে গো... বলতে বলতে ঝুড়ি করে পাড়ায় পাড়ায় ফেরি করতে বলবে। নিমাই লাফাবে, হাই তুলবে, হাঁচবে, কাশবে, ছোট্ট পুন্টু নিয়ে খেলবে... কেউ হাঁচি-কাশিকে ভয় পাবে না। সবাই গোল হয়ে দেখবে, মজা পাবে, পয়সা দেবে। নিজের না হয় খিদে নেই, পরিবারের তো আছে। সব খিদেই তো আছে। খগেনকে ডাকবে? ভজন কে? ভজন, ও ভজন, তোর বউদির বড় দুঃখ, আয়নারে আমাদের বাড়িতে, থেকে যা দু'রাত...।

সুশীল ভাবছিল ওদের সেই বামন লক্ষ্মীর কথা। ওদের পূর্বমাতা। যার কারণেই ওরা রায় বংশ। যার কারণেই ওরা পেয়েছিল মোহরভরা পিপে। সেই লক্ষ্মীই কি ফিরে এসেছে ওদের মেয়ে হয়ে? মেয়ের হাতে জাহাজের চাকা। মেয়ে কি সবাইকে নিয়ে চলেছে নতুন দেশে?

এরকম কিছু না কিছু ভাবছিল সবাই। আকাশে ফুল ফোটাতে অসুবিধা কোথায়? আস্তে আস্তে চিন্তাভাবনা করতেও ইচ্ছা করছিল না। স্থবির। ভাবনাহীন। জাহাজের টুলবক্স থেকে কাঁচি বের করল সুনেত্রা। ছাড়া পোশাকগুলো থেকে টুকরো টুকরো কাপড় বের করে। একটা আচ্ছাদন তো দরকার হয় মানুষের। জানোয়ারের চামড়াতেই ঠান্ডা-গরম নিবারণের ব্যবস্থা থাকে। পুতুল হলেও এরা মানুষ তো। বস্ত্র বিতরণ করে সুনেত্রা। হয়তো মতিউরের পরা বস্ত্র কৃপাসিন্ধু পায়, নিমাইয়ের বস্ত্র বিলাসচন্দ্র।

সূর্য ওঠে, অস্ত যায়, রঙের হোলি খেলা হয়। জোছনা মেশে সাগর জলে। বৃষ্টি ফোঁটাগুলোর কী আহ্লাদ। জলের ফোঁটারা নাচে। নাচতে নাচতে জলের অনন্তে মেশে। কখনও মেঘ ডাকে, আকাশ জুড়ে বিদ্যুৎ রেখা, অনন্তে জাগে, অনন্তে মেশে। রোদ্দুর চিক চিক করে জলে। কখনও দু'চারটে মাছ জল থেকে লাফিয়ে উঠে জলেই মিশে যায় ফের। জলে ফেনা হয়, ঘূর্ণি হয়। কত কিছু হয়। পাখিও দেখা যায় কখনও কখনও।

সুনেত্রার পাশে কেন কে জানে অপরূপ বসে থাকে চুপচাপ। মাঝে মাঝে কি সব কথা বলে, ঠিকঠাক লোকেরা বলে না এমন। সুনেত্রাকে বলে— জল কি তোমার ব্যথা বোঝে? কে জানে কেন বলল এমন? জলেরও কি ব্যথা হয়? জলের ব্যথা কি জানে জল? একবার বলল, এই সমুদ্রটা কার স্মৃতিচিহ্ন গো? সুনেত্রা বলে আমরা কাদের স্মৃতিচিহ্ন তবে? অপরূপ বলে আমি জানি না, কিন্তু সমুদ্র সব জানে। অপরূপ একদিন বলে—সমুদ্রের গান শুনতে পাও? সুনেত্রা বলে হ্যাঁ পাই। সুনেত্রা বলে আমি যা দেখি তুমি তাই দেখো? অপরূপ বলে দেখি। সুনেত্রা বলে হাতি। অপরূপ বলে ওই তো মেঘের মধ্যে। অপরূপ বলে আমি যা দেখি তুমি তাই দেখ? সুনেত্রা বলে দেখি। অপরূপ বলে ফোকলা বুড়ির হাসি। সুনেত্রা বলে ওই তো, ঢেউয়ে ঢেউয়ে ধাক্কা লাগা জলের ফেনায়।

পুতুল ঝংকার দূর থেকে ওদের দেখে। ওরা গল্প করছে হাসছে, এ ওর গায়ে ছোট করে ধাক্কা দিচ্ছে, চুল টেনে দিচ্ছে এসব দেখে। ওর অভিমান হয়। হিংসে হয়। সেই আশ্চর্য মানুষটাও বলেছিল সব খিদে তুলে নেবে। হিংসেটা তো তুলে নেয়নি, রাগটাও না। রাগ হয়, রাগ গিলে ফেলে। মেয়েটাকে বুঝতে পারল না। আজব মেয়েটা। একটা ইডিয়েটের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে।

জাহাজ ভেসে চলে নিজের খেয়ালে। লোকগুলো কেউ কেউ বলে আর পারা যায় না। এবার ঝাঁপ দেব জলে। কেউ শেষ অবধি ঝাঁপ দেয় না মতিউর আর কাশছে না। অন্য কারুর কাশি হলে আর ভয় পাচ্ছে না কেউ। সদানন্দ কাশলে মতিউর পিঠে হাত বোলাচ্ছে, আলোছায়া কাশলে নিমাই। বুড়ো কেউ সিট থেকে লাফিয়ে নামতে গেলে ছোঁড়া কেউ বলে ভয় নেই, আমি ধরছি।

সুনেত্রা জাহাজের স্টিয়ারিং ধরে বসে থাকে। স্টিয়ারিং-এর কাজ নেই কিছু, তবু মিছে বসে থাকা। সুশীল-অণিমার মুগ্ধ পুতুল-চোখ নিজেদের আত্মজাকে দেখে। মানুষ বড় হয় মিটার সেন্টিমিটারে নয়, ভারী হয় সের-কিলোগ্রামে নয়। অন্যকিছু, অন্য কিছু আছে। সুনেত্রা এই জাহাজের মানুষগুলোকে দেখে। অবাক হয়। এটুকু সময়ের মধ্যে কী বিরাট বিবর্তন দেখে ফেলল। অরোভিলের মিউজিয়ামে দেখেছিল অরবিন্দের অধিমানস চেতনা। মানুষের শ্রেয়তর হয়ে উঠবার জন্য চেতনা-বিকাশ। প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত ব্রহ্ম। তখন তো বোঝেনি কিছু। এখন কি বুঝতে পারছে এই বিকশিত প্রীতি কুসুম? আকাশে মেঘ। মেঘ ক্রমে গাঢ় হয়। আঁধার হয়। বৃষ্টি নামে। সুনেত্রা হাঁক দেয় চলো সবাই, বৃষ্টি খাব।

কেউ বলে কেন খাব, আমাদের তেষ্টা নেই। অপরূপ বলে বৃষ্টির মধ্যে স্বপ্ন আছে। আমরা স্বপ্ন খাব।

সদানন্দ বলে মেয়েটা ঠিক বলেছে। চল জল সইতে চল। জলের অন্য নাম জীবন। চোট পেলেও তো জল লাগে। কাশি হলেও জল পেলে শান্তি।

বৃষ্টি ভিজল, বৃষ্টি জল খেলো, যার যা কিছু ছিল ধরে রাখল জল। আনন্দে লুটোপুটি খেল এ ওকে জড়িয়ে। কত রকমের খিদে আছে পৃথিবীতে। খিদে মরে না। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া বাড়তে লাগল, হাওয়া তীব্র হতে লাগল। হাওয়া তো নয় ঝঞ্ঝা। বাজ পড়ছে, ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্টহাসিয়া করিছে খেলা, তরী দুলছে, এথাল পাথাল। ওরা সবাই নীচে নামে। পাগলের মতো বাতাস আর জল। ভীষণ দুলছে। জানলার কাচ বন্ধ করা হয়েছে আগেই, তবুও জল ঢুকছে। মেঝেতে জল জমে

গেছে। কখনও কাত হয়ে প্রায় জলস্পর্শ করছে। পুতুল মানুষগুলোর মুখে আবার হে ভগবান, হে বাবা লোকনাথ, হে মেহেরবান আল্লাহ, হে হরি...। হাতজোড়। বাঁচাও, বাঁচাও হে—। সুনেত্রা বলছে— ঝড় চিরকাল থাকে না। ঝড় থেমে যাবে। কতবার নিজেরা বলাবলি করেছিল— এ পুতুল জীবন আর ভালো লাগে না, ইচ্ছে করে টুপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু ঝাঁপায়নি। ঠিক পরের দিন সূর্য ওঠা দেখেছে, মেঘের ওড়া, জানলা গলে আসা রোদ্দুর, রাতের তারা অবাক না হবার ভান করে দেখেছে। এখন বাঁচার জন্য কী কাতরতা এই পুতুল শরীরেও। সদানন্দ ভাবে আগেরবার যখন সবাই মিলে ভগবানকে ডেকেছিল, একটা বিদঘুটে ভগবান এসে এসব করে গেছে। আবার যদি ওই পাগলা ভগবানটাই আসে আবার কী করবে ঠিক নেই। কমলে কামিনী এলে খুব ভালো হয়। সে দেবী দয়াময়ী। বণিক-ব্যবসায়ীদের দেবী। সদানন্দ হল ভুরিশ্রেষ্ঠ। বণিক বংশ। ওরা সমুদ্র যাত্রা করত। কমলে কামিনীকে প্রথম দেখে ধনপতি সওদাগর। সমুদ্র থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে হাতি নিয়ে খেলা করে। সমুদ্রের ঝড় তাঁরই সৃষ্টি। কমলে কামিনীর কথা ভুলেই গিয়েছিল এতদিন। ঠাকুমা ঠাকুরাণী কমলে কামিনীর কথা বলতেন। এতদিন পর মনে পড়ল। হে মা কমলে কামিনী। বাঁচাও।

কে থামাল ঝড়, কে বাঁচাল কে জানে! ঝড় থেমে গেল। কয়েক ঘণ্টা পর সুনেত্রা বলল, দেখলে তো সবাই, কেমন ভয় পেয়েছিলে, ভয় থেমে গেল তো?

ঝংকার সুনেত্রাকে বলে— শোন, একটা কথা আছে। ব্যক্তিগত। বলব?

সুনেত্রা বলে কেন বলবি না? বল।

ঝংকার বলে আমি তোকে ভালোবাসি।

সুনেত্রা বলে আচ্ছা বেশ। ভালোবাসা তো ভালো।...

ঝংকার বলে— তুই?

সুনেত্রা বলে— হ্যাঁ? বাসি তো...।

ঝংকার বলে কী করে বুঝব!

সুনেত্রা বলে বুঝতেই হবে? বোঝার কী দরকার?

ঝংকার বলে তুই অনেক পাল্টে গেছিস। অ-নে-ক। সুনেত্রা বলে তুই আমাকে পাল্টে দিয়েছিলি ঝংকার। তুই আমাকে দিয়েছিলি ভালোবাসার স্বাদ। বুঝেছিলাম আমার পাল্টানো দরকার।

সুনেত্রা কিন্তু সোজা সামনের কেবিনেই গেল। ওখানে অপরূপ রয়েছে।

আকাশে চাঁদ উঠল। কস্তুরী আভার চাঁদ। সুনেত্রা ছাদে গেল। অপরূপও। কিছুক্ষণ পরে ঝংকারের মনে হল ওরা অনেকক্ষণ উপরে রয়েছে। ঝংকার এবার সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে। দেখে, প্লাবিত জোছনায় ওরা দু'জনে আলিঙ্গনাবদ্ধ। দু'জনই দু'জনকে পেঁচিয়ে ধরেছে নিবিড়। আকাশের সহস্র তারা চেয়ে আছে এই যুগলটির দিকে।

ঝংকার আকাশ ফাটিয়ে, চাঁদ কাঁপিয়ে চিৎকার করে— হচ্ছেটা কী, কী হচ্ছে এসব? ইয়ারকি? আমাদের তো আর কোনও খিদে নেই, ইয়ে নেই, কিচ্ছু নেই? তবু কেন, কেন, কেন? ভেবেছিসটা কী?

কিন্তু কোনও স্বর বের হয় না গলা থেকে। শুধু হাওয়া বয় শন শন। তারারা কাঁপে।

ঝংকার নেমে আসে। নিজের সিটে বসে ফের। ভাবে, বিধির বিধান ভাঙছে ওরা, ওরা কি এতই শক্তিমান? এই শক্তি কীসের? সিটে বসে থাকে চুপচাপ। কী যে একটা বোধ কাজ করে মনের ভিতরে। একটা অদ্ভুত আকুলি বিকুলি। কে যেন, কী যেন ঘুরে ঘুরে কথা কয় মনের ভিতরে।

ভোর হয়। সবাই অবাক হয় দেখে বাসটা ঠেকেছে এক নতুন ডাঙায়। সামান্য হেলে আছে ডাঙাটির দিকে। চাকাগুলো হাসছে যেন নতুন দাঁত ওঠা সরল শিশুটি।

নতুন ডাঙার অচেনা গাছগুলি ডালপালা নাড়িয়ে ডাকে আয় আয়।

লতাগুল্ম ঢাকা মায়াময় বনের ভিতর থেকে অচেনা পাখি ডাকে আয় আয়।

বাসের হ্যান্ডেলটি ধরে আছে সুনেত্রা। বলে, বিকশিত... বিকশিত প্রীতিকুসুম হে...। লাফ দেয় নতুন ডাঙায়।

এগিয়ে যায় সামনে আদি জননীর মতো। লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ ভেজা বালির উপরে, বনানীর দিকে।

এবার কাউকে কিছু না বলে লাফ দেয় অপরূপ। বাকিরা তখনও পুতুল। এবার ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝংকার।

কমলে কামিনী হে জানি না কী ইচ্ছা তোমার? সদানন্দ নেমে পড়ে।

বাকিরা সবাই একে একে। দেখল গাছে ফল, ঝর্ণায় জল, গুহা কন্দর। শ্মশ্রুকেশ মুণ্ডিত ঊর্ধাঙ্গ উন্মুক্ত কটিদেশ সামান্য বস্ত্রাবৃত আদি মানব প্রায় ওরা দু'হাত উপরে তুলে সমবেত বলতে লাগল খিদে দাও আমাদের, খিদে চাই, খিদে...।

অলংকরণ: রঞ্জন দত্ত

সমাপ্ত

• উপন্যাস
পাণ্ডব গোয়েন্দা
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়
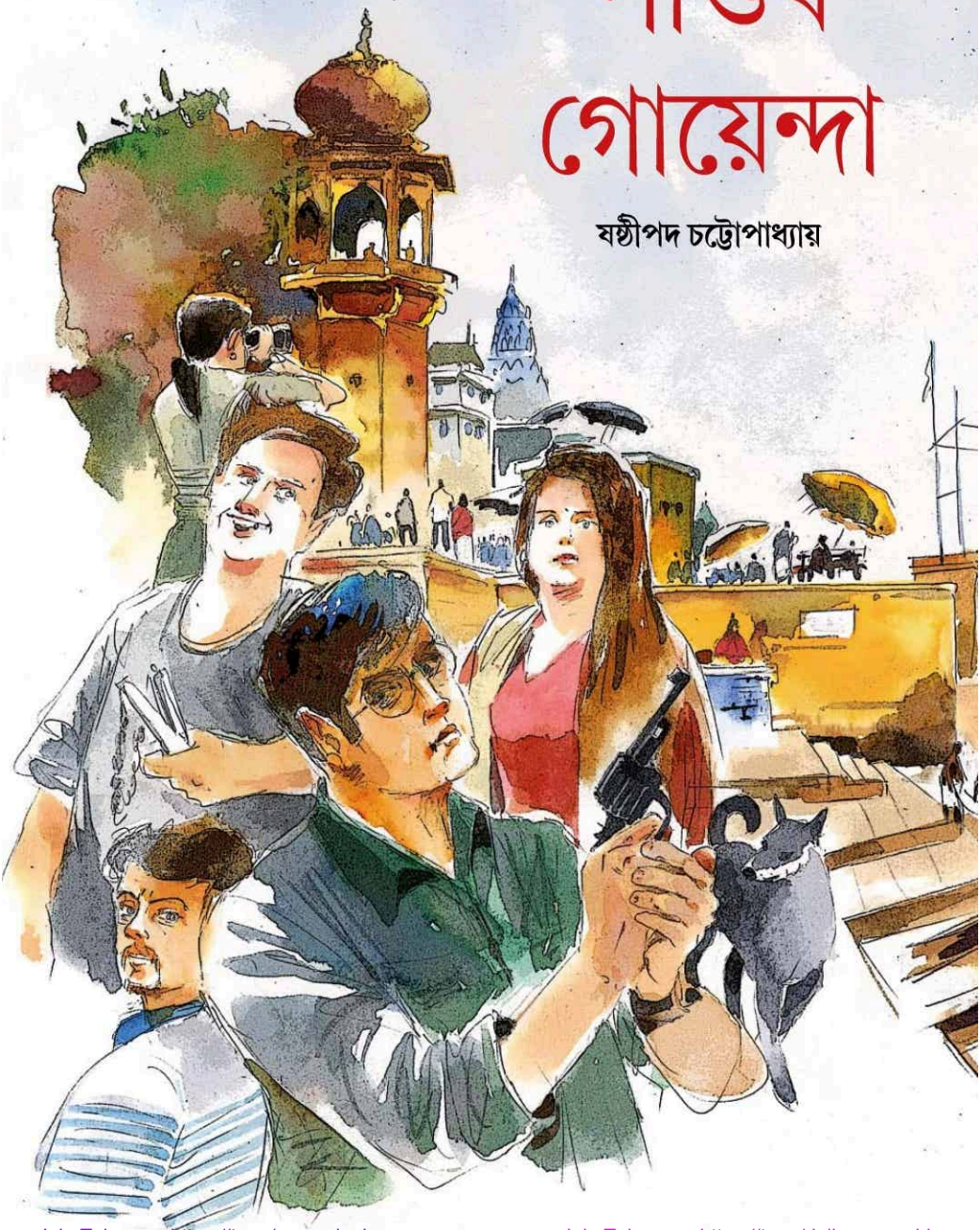
রিমঝিম বৃষ্টির দিনও শেষ হল অবশেষে। শরতের সোনার রোদে প্রকৃতি এখন ঝলমল করছে সবসময়। প্রায় মাসাধিক কাল ধরে পাণ্ডব গোয়েন্দারা মর্নিংওয়াকে যায়নি। তবে মিত্তিরদের বাগানে গিয়েছে এক-আধবার। আনন্দময়ীর আগমনে চারদিক উৎসবমুখর হয়ে উঠতেই আবার ওরা ওদের মর্নিংওয়াক শুরু করে দিল।

আজ মহালয়া। আকাশবাণীর প্রভাতী অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে ওরা যখন পঞ্চুকে নিয়ে পথে পথে ঘুরছে ঠিক তখনই মিত্তিরদের বাগানের দিক থেকে আঁচল ভর্তি শিউলি ফুল নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখা গেল সুকন্যাকে।

বাবলু একটু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'ব্যাপার কী! এত ভোরে?'

সুকন্যা বলল, 'ভোর! ভোর কাকে বলে নিশ্চয়ই ভুলে গেছ তোমরা? এখন আকাশ পরিষ্কার হয়ে আলো ফুটে গেছে। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারটা কী? বাগানে এসেছিলাম শিউলি কুড়োতে, নাহলে জানতেও পারতাম না।'

'কী জানতে পারতে না?'

'তোমাদের কীর্তি। এমন কাঁচা কাজ কেউ করে?'

বাবলু, বিলু, ভোম্বল পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, 'কাঁচা কাজ?'

'খুবই কাঁচা কাজ। সব ব্যাপারে চমকটা না দিতে যাওয়াই ভালো।'

বাবলু বলল, 'তোমার কথার কোনও খেই পাচ্ছি না। কীসের চমক?'

সুকন্যা বলল, 'জাস্ট এ মিনিট। আগে আমি মাসিমাকে ডেকে আনি তারপর হচ্ছে তোমাদের।'

বিস্মিত পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্থির হয়ে রইল।

সুকন্যা দ্রুত চলে গেল বাবলুদের বাড়ির দিকে।

কী যে হল ব্যাপারটা কেউ কিছুই বুঝতে পারল না।

পঞ্চু একবার গুটি গুটি পায়ে সুকন্যার পিছু পিছু গেল। তারপর আবার এসে বাবলুর গা-ঘেঁষে দাঁড়াল।

অল্প সময়ের মধ্যেই সুকন্যা গিয়ে বাবলুর মায়ের হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে এল সেখানে।

মা এসে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে, কী এমন কাণ্ড করেছিস তোরা যে—!'

বাবলু বলল, 'সেটা তোমার সুকন্যাই জানে। আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সুকন্যা বলল, 'বুঝেও না বোঝার ভান করলে তো কিছু করার নেই। এখন আমি কিচ্ছু বলব না।' বলে মায়ের একটি হাত ধরে বলল, 'আপনি নিজে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসুন মা, এইসব ছেলেমেয়েদের কীর্তিটা কী!'

সুকন্যা ও মায়ের সঙ্গে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও চলল।

সবার আগে চলল পঞ্চু। সে দ্রুত বাগানে ঢুকেই ভৌ-ভৌ ডাক ছেড়ে ছুটে এল। এসেই আবার ছুটল বাগানের দিকে।

বাবলু চাপা গলায় বলল, 'নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু কী যে হয়েছে তা কে জানে? আমরা তো এই ক'দিন বাগানের দিকে যাই-ই নি।'

এদিকে পঞ্চুর চিৎকারে তখন কান পাতা দায়।

বাবলুর মা বললেন, 'জানি না বাবা, কী কাণ্ড করেছিস তোরা।' বলতে বলতে বাগানে ঢুকল সবাই। তারপর ওদের সেই বহুদিনের পুরনো ভাঙা বাড়ির সামনে আসতেই চোখ কপালে উঠে গেল সকলের।

মা সুকন্যার আঁচল থেকে মুঠোয় ভরে শিউলি নিয়ে সেখানে ছড়িয়ে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁরে, বলা নেই কওয়া নেই
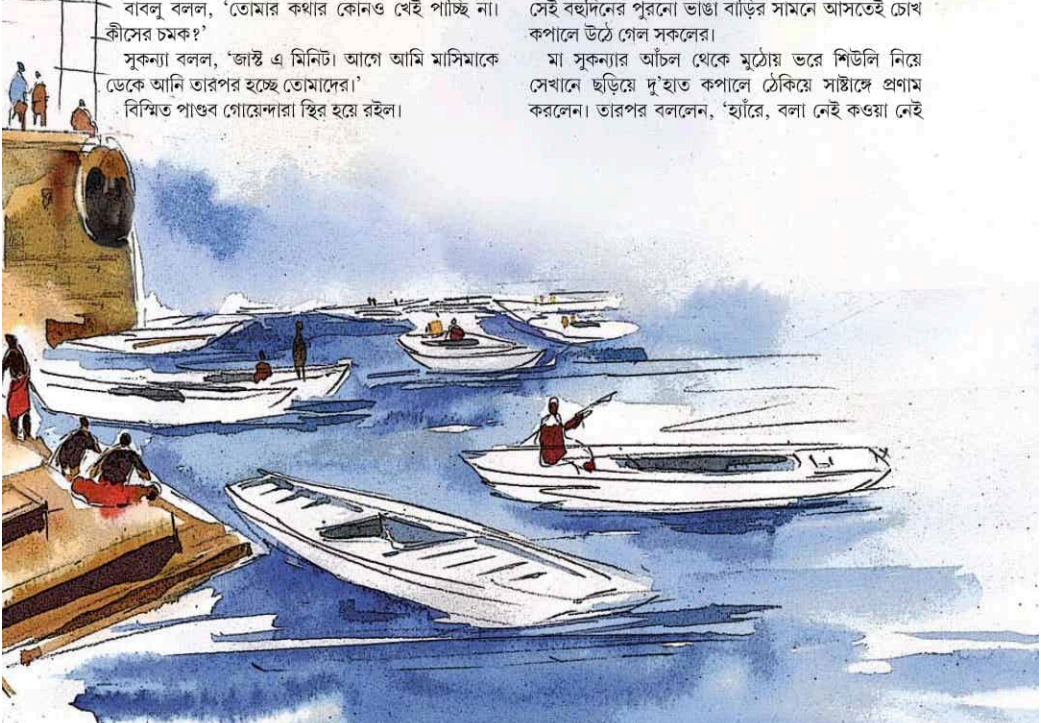
কারও সঙ্গে কোনও পরামর্শ না করেই এ কী করেছিস তোরা? ভাগ্যে মেয়েটা দেখল।'

বাবলু বলল, 'আমরা এসবের কিচ্ছু জানি না মা। সত্যি বলছি, আমরা তো এ ক'দিন আসিনি বাগানের দিকে। আজ হয়তো আসতাম। ততক্ষণে অনেক ক্ষতি হতে পারত।'

পাণ্ডব গোয়েন্দারা নিজেদের চোখকেও তখন বিশ্বাস করতে পারছে না।

বাবলু অস্ফুট ভাবে বলল, 'কার কাজ এটা? এই রম্য প্রতিমাকে কে এখানে অধিষ্ঠান করাল?'

মা বললেন, 'যে-ই করে থাকুক, এ নিয়ে কোনও চিন্তা-ভাবনা নয়। এখন আমরা সবাই মিলে মাতৃ আরাধনায় মেতে উঠি আয়।' বলেই আবার প্রণাম করলেন, 'মা! মাগো।'

মিত্তিরদের বাগানে সেই ভাঙা বাড়ির দালানে অতীব সুন্দর একটি দুর্গা প্রতিমা কেউ বা কারা যেন সযত্নে বসিয়ে দিয়ে গেছে। দারুণ সুন্দর সেই প্রতিমার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা ফেলতে পারল না কেউ।

উচ্ছ্বসিত বাচ্চু-বিচ্ছু প্রায় নেচে উঠে বলল, 'যাই, এক্ষুনি গিয়ে বাড়িতে খবর দিয়ে আসি। পাড়ার সবাইকে জানাই।'

ভোম্বল বলল, 'আমিও যাই চল তোদের সঙ্গে।'

বিলু বলল, 'মা যে এভাবে আমাদের কৃপা করবেন তা কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি।'

ওরা চলে গেলে সুকন্যা বলল, 'সত্যি বাবলু, আমিও ভাবিনি এটা এমন বিস্ময়কর ব্যাপার। ভেবেছিলাম, রাতের অন্ধকারে ঠাকুর বসিয়ে বেলায় তোমরা সবাইকে চমক দেবে। যাই, আমিও আমার মাকে খবর দিয়ে আসি।'

বাবলু বলল, 'এসো। তবে এই পুজোর সঙ্গে কিন্তু তোমাকেও সবসময় জড়িয়ে থাকতে হবে। আর হ্যাঁ, লতাকেও খবর দিও।'

সুকন্যা ওর আঁচলের ফুলগুলো দেবী বেদিকায় অর্ঘ্য দিয়ে বাড়ির দিকে চলল। যেতে যেতেই বলল, 'লতারা নেই। ওরা সাউথে বেড়াতে গেছে।'

মা ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই সুকন্যা যেন দেবীর এক অন্য রূপ। ওর জন্যই আজ এই সুন্দর প্রভাতে মায়ের মুখ দর্শন করতে পারলাম।' তারপর বললেন, 'মায়ের কত কৃপা তোদের ওপর। মিত্তিরদের এত বড় বাগানটা তোদের হয়ে গেল। এই পুরনো ভাঙা বাড়িতে নিজের থেকেই মা এলেন। তাই বলি এ সবের সংস্কার কর এবার।'

বাবলু বলল, 'আসলে কী জানো মা, এই বাগানের প্রতি এত মায়া যে এর প্রাচীন ঐতিহ্যকে আমরা হারাতে চাই না।'

'তা বললে হয়? যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাও যদি একদিন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে তখন কী করবি? নিজেরাই তো চাপা পড়বি তোরা।'

হঠাৎ শঙ্খরবে চারদিক মুখর হয়ে উঠল।

মা বললেন, 'ওই-ওই তো এসে গেছে সবাই।'

একটু পরে সুকন্যাও ওর মাকে নিয়ে এল সেখানে।

দারুণ সুন্দর প্রতিমা দেখে মুগ্ধ সবাই। সবারই মনে একটাই প্রশ্ন রাতের অন্ধকারে এমন সুন্দর দুর্গা প্রতিমা কে বসিয়ে দিয়ে গেল এখানে?

মা বললেন, 'যে-ই বসিয়ে দিয়ে যাক, এখন এই জায়গায় এইভাবে তো মাকে ফেলে রেখে দেওয়া যায় না। তাই মাতৃ আরাধনাটা ঠিক কোথায় হবে এবার সেই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করো সবাই।'

বাবলু বলল, 'কোথায় আবার? মায়ের আবির্ভাব যেখানে হয়েছে সেখানেই হবে তাঁর অধিষ্ঠান।'

বাবলুর কথা শুনে লাফিয়ে উঠল ভোম্বল। বলল, 'কখনওই নয়।'

বিলু বলল, 'কেন নয়?'

'পশ্চিমবঙ্গ এখন ভারতের চেরাপুঞ্জি। কখন কোন মুহূর্তে যে ঝমঝমিয়ে বা ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি নামে তা কে বলতে পারে? এখানে তিন ফোঁটা বৃষ্টি পড়লে সাড়ে তিন হাত জল দাঁড়িয়ে যায়। অতএব প্রতিমা উপযুক্ত জায়গায় নিয়ে যাওয়া দরকার।'

ভোম্বলের কথা শেষ হতেই বাবলুর বাবার গলা শুনতে পাওয়া গেল। উনি খুব ভোরে গঙ্গায় গিয়েছিলেন তর্পণ করতে। পাড়ায় ঢুকেই শুনতে পেলেন মা-দুর্গার আগমন সংবাদ। তখনই বাগানে এসে ভোম্বলের বক্তব্য শুনে বললেন, 'আমি দারুণভাবে অ্যাকসেপ্ট করছি ভোম্বলকে। প্রতিমা পুজো ছেলেখেলার ব্যাপার নাকি? বাগানে প্যান্ডেল বেঁধে পুজো করলে তবু হয়। কিন্তু এই পোড়ো বাড়ির মধ্যে পুজো অসম্ভব। তাই এই প্রতিমাকে পাড়ার মধ্যে সবার নজরে থাকে এমন জায়গাতেই নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।'

বাবলুর বাবার কথায় সায় দিলেন সকলেই।

প্রতিবেশী এক তরুণী বলল, 'হ্যাঁ কাকাবাবু, আপনি ঠিকই বলেছেন। ঘরের কাছে পুজো হলে সবাই আমরা সবসময় মন্ত্রের ধ্বনি, ঢাকের বাদ্যি সবই শুনতে পাব। ভোগ-নৈবেদ্যর কোনও অসুবিধে হবে না। পালা করে রাতও জাগব আমরা। আনন্দে ভরে উঠবে সকলের মন প্রাণ। তাই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দুর্গাপুজো ওদেরই বাড়ির কাছে হোক।'

অতএব আর দ্বিমত নয়। বাবলুর বাবার কথাতেই মান্যতা দিলেন সবাই।

সুকন্যার মা-ও এসেছিলেন। বললেন, 'মা যখন নিজের ইচ্ছেয় এখানে এসেছেন তখন তাঁর স্থান তিনিই বেছে নেবেন। ভাগ্য ভালো যে দুর্যোগের দিন শেষ হয়েছে।'

সিদ্ধান্ত যখন চরমে ঠিক তখনই দ্রুত সাইকেল চালিয়ে পাড়ারই মেয়ে শ্রীজিতা এসে বাবলুর মাকে বলল, 'এই পুজো যদি পাড়াতেই হয় তাহলে আমাদের নতুন গ্যারেজ ঘরে হলে কেমন হয়? আমার মা সেটাই জানতে চাইলেন। সবাই রাজি হলে এখনই সেই ব্যবস্থা করে ফেলবেন মা।'

শুনে বাবলুর বাবা বললেন, 'এ তো উত্তম প্রস্তাব। সবার চোখের সামনে নিরাপদ স্থানেই হবে মায়ের পুজো। যা, তোর মাকে গিয়ে বল এখনই গ্যারেজ ঘরটা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দিতে।'

বাচ্চু-বিচ্ছুর বাবা বললেন, 'আর তাহলে এখানে বেশি ভিড় জমিয়ে লাভ নেই। প্রতিমার স্থান নির্বাচন যখন হলই তখন অবিলম্বে ঠাকুর নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হোক।'

ভোম্বল বলল, 'আমি এখনই একটা ছোট লরির ব্যবস্থা করছি।' বলে বিলুকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল ভ্যান লরি আনতে।

বাবলু, পঞ্চু সহ কয়েকজনকে পাহারায় রেখে বাকি সবাইকে বলল ঘরে যেতে।

সুকন্যা বলল, 'আমিও তাহলে মা-কে নিয়ে বাড়ি যাই? বেলায় আবার আসব।'

সুকন্যা চলে যাবার পরই হোমরা-চোমরা চেহারার বেশ কয়েকজনকে নিয়ে একটি মোটর ভ্যান সহ আসতে দেখা

গেল ভোম্বলকে। বিলুও সঙ্গে ছিল। তাই সবার সহযোগিতায় প্রতিমা উত্তোলন করতে অসুবিধে হল না কারও।

ততক্ষণে গ্যারেজ ঘর ধুয়ে-মুছে প্রতিমা বসানোর জন্য আলপনা দিয়ে বড় একটি চৌকিও পেতে দেওয়া হয়েছে। সবার সহযোগিতায় প্রতিমার অধিষ্ঠান সেখানেই হল।

বেশ কিছুক্ষণ পর পাণ্ডব গোয়েন্দারা আবার যখন মিত্তিরদের বাগানে বসে দুর্গা মূর্তির আবির্ভাব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে ঠিক তখনই ফোন এল মায়ের 'তোরা কোথায়?'

'বাগানে ঘোরাফেরা করছি।'

'এখনই চলে যায়। বাড়িতে অতিথি এসেছে।'

বাবলু ফোন রেখে বলল, 'আসছি। একটু বসতে বলো।'

বিলু বলল, 'কী ব্যাপার?'

'আমার অনুমান যদি ভুল না হয়, তাহলে...।'

ভোম্বল বলল, 'তাহলে কী?'

'মনে হয় মূর্তি রহস্য এবার উদ্ঘাটন হবে।'

অতএব সবাই চলল ওরা বাবলুদের বাড়ির দিকে। যেতে যেতে বিলু বলল, 'কী করে বুঝলি?'

'তোরা জানিস অনেক কিছু আমি আগেভাগেই বুঝতে পারি। একটু ভেবে দেখ না, মূর্তিটা তো হাওয়ায় উড়ে আসেনি। কেউ না কেউ রেখে গেছে। যে কোনও কারণেই হোক আমাদের না জানিয়েই এ কাজ করেছে সে। এবং নজর রেখেছে আমাদের গতিবিধির দিকে। পরে যখন বুঝল প্রতিমাকে আমরা পরমাদরেই ঘরে তুলেছি, তাঁর পূজার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করেছি, আনন্দে মেতেছি সবাই—তখনই সে এসেছে তার পরিচয় আমাদের কাছে প্রকাশ করতে।'

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, 'তাই যেন হয়। আমাদের উৎকণ্ঠা আর ধরে রাখতে পারছি না।'

মা কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন। ওদের দেখতে পেয়েই হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। ওরা গেট খুলে ভেতরে আসতেই মা বললেন, 'দেখ কে এসেছে।'

সবাই ওরা বাবলুর ঘরে ঢুকেই দেখল শ্বেতশুভ্রা এক সুসজ্জিতা তরুণী সেই ঘর আলো করে বসে আছে।

বাবলু বলল, 'তুমি?'

তরুণী বলল, 'আমার নাম শুভলক্ষ্মী। তবে অন্যেরা আমাকে শুভা বলে ডাকে। বেহালার ব্রাহ্মসমাজ রোডে আমাদের পৈতৃক বাড়িটি শরিকি সংঘর্ষের ফলে এ বছর দীর্ঘদিনের পুজো বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিই এই পুজো কোনও মতেই বন্ধ হতে দেব না। তোমাদের অনেক অভিযানের কাহিনী পড়ে বার বার মনে হয়েছিল তোমাদের সঙ্গে দেখা করে আলাপ জমাই। কিন্তু সংকোচবশত তা হয়ে ওঠেনি। আমারই এক বান্ধবী দোলা থাকে হাওড়ার জগাছা সুন্দরপাড়ায়। সে তোমাদের সন্ধান জানে। একদিন ওকে নিয়েই চুপি চুপি তোমাদের এলাকায় যাই। তোমার বাড়ি অবশ্য দেখিনি। তবে মিত্তিরদের বাগান দেখেছি। ওখানে যে তোমরা কী করে আড্ডা জমাও তা ভেবে পেলাম না।'

শুভলক্ষ্মীর কথা শেষ হওয়ার আগেই সুকন্যা এসে হাজির। বলল, 'এই কথাটা পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অনেকবার বলেছি আমি। বাগানটার সংস্কার করাও।'

বাবলু হেসে বলল, 'সুকন্যা!'

শুভলক্ষ্মী দু'হাত জোড় করে বলল, 'পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে তোমার চম্বা উপত্যকায় যাওয়ার ঘটনাও পড়েছি।'

বাবলু শুভলক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার বলো তোমার কথা।'

'সেই দিনই আমরা দুই বান্ধবী কুমোরটুলিতে গিয়ে আমাদের বাড়ির মতো দুর্গা প্রতিমার অর্ডার দিই। সেই মতো দোলা কাল রাতের অন্ধকারে ওদেরই পাড়ার কয়েকজনকে নিয়ে এখানে প্রতিমা নামিয়ে যায়। আমার ধারণা ছিল তোমাদের পঞ্চু রাতে বাগানে টহল দেয়। তখনই ওঁর হাঁকডাকে জেগে উঠবে তোমরা। কিন্তু তা হয়নি। তবুও আমরা কানু আর কেষ্টা নামে দু'জনকে দূর থেকে নজর রাখতে বলেছিলাম। এও বলেছিলাম ওদের কাউকে আসতে দেখলেই কেটে পড়বি তোরা। কাউকে কিছু বলবি না। দেখাও দিবি না। সেই পরিকল্পনা মতোই কাজ হল।'

মা সব শুনছিলেন। এবার বললেন, 'সত্যিই তুমি শুভলক্ষ্মী। কার ঘর আলো করে আছো তা কে জানে?'

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই এবার একজোট হয়ে বলল, 'কী বলো তো তুমি? আমাদের বাগান পর্যন্ত এলে, দুর্গা মায়ের অধিষ্ঠান করালে অথচ জানতেও দিলে না কাউকে!'

বাবলু বলল, 'সত্যিই এমন চমক আমরা কখনও পাইনি। তারপর শুভলক্ষ্মীকে বলল, 'কিন্তু তুমি একা কেন? দোলা কই?'

'ও এখন ঘুমোচ্ছে। বিকেলে আসবে। আমি আজ সারাদিন এখানে আছি। দোলা এলে তবেই যাব।'

এমন সময় কে যেন বাইরে থেকে ডাক দিল, 'মাসিমা।'

জগাদার গলা। অনেক খাবারের প্যাকেট নিয়ে সে এসেছে।

মা বললেন, 'এই মুহূর্তে কিছু করে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই শুভা আসামাত্রই জগাকে দিয়ে খাবার আনতে পাঠিয়েছিলাম। তোর বাবাও আসবেন এখুনি। উনি গ্যারেজ ঘরে প্রতিমার ওখানে আছেন।'

শুভলক্ষ্মী বলল, 'কথায় কথায় ভুল হয়ে গেছে। আমিও কিছু মিষ্টি এনেছিলাম সবার জন্য।' বলে ব্যাগের ভেতর থেকে বড় একটা মিষ্টির প্যাকেট বার করে মায়ের হাতে দিল।

বাবলুর বাবা এবার ঘরে ঢুকে সবার দিকে এক নজর তাকিয়ে বললেন, ফোনে খবর পেয়েই ছুটে এলাম। তুমিই সেই মা যে কিনা শুভলক্ষ্মী হয়ে মা দুর্গার আগমন ঘটালে এখানে। সত্যি, একেই বলে মাতৃকৃপা।'

উল্লসিত বাবলু দরজার কাছে গিয়ে বলল, 'আপনারা প্রতিমার কাছেই থাকুন। আমরা সামান্য একটু জলযোগ পর্ব সেরে নিয়ে সবাই যাচ্ছি। ওখানে দেবী প্রতিমার সঙ্গে শুভলক্ষ্মীকেও দর্শন করবেন।'

দূর থেকে শ্রীজিতা হাত নেড়ে বলল, 'বেশি দেরি কোরো না। ঠিক নিয়ে যাবে কিন্তু।'

সুকন্যাও এবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'কোনও চিন্তা নেই, আমি তো আছি। তাছাড়া আজ সারাদিনই ও থাকবে আমাদের সঙ্গে।'

শুভলক্ষ্মীর আবির্ভাবে আনন্দ যেন উপচে পড়ল সকলের। সুকন্যা তখন রাতের অন্ধকারে প্রতিমা নিয়ে আসার কাহিনী বিস্তারিতভাবে শোনাল সকলকে।

শুনে চমকিত হল সবাই।

শ্রীজিতার মা শুভলক্ষ্মীকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'সত্যি করে বলো তো মা তুমি কে? পাণ্ডব গোয়েন্দাদের জন্য তুমি প্রতিমা নিয়ে এলেও তোমার কৃপায় আমার ঘর যে আজ

মন্দির হয়ে গেল। কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি আমার ভিটেয় মায়ের পদার্পণ ঘটবে।'

শুভলক্ষ্মী বলল, 'মায়ের কৃপা ছাড়া কি কিছু হয়?'

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, 'এবার আমাদের বাড়ি এসো। মা হানটান করছেন তোমাকে দেখার জন্য। দুপুরে খাওয়াদাওয়াটা আজ বাবলুদার ওখানে হলেও সারাটা দুপুর বিকেল কিন্তু আমাদের বাড়িতে কাটাতে হবে। সারাটা দিন আমাদের মেয়েদের সঙ্গে কাটালে একটুও আন ইজি ফিল করবে না।'

শুভলক্ষ্মী বলল, 'সেই ভালো। চলো ওখানেই যাই।'

আজ মহালয়া হলেও বিলু, ভোম্বল ও বাচ্চু-বিচ্ছুর বাবা সময়মতো অফিস চলে গেছেন।

মা ছিলেন ঘরে। শুভলক্ষ্মীর হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'আজ মহালয়ার দিনে মহামায়ার আবির্ভাব হল, এ কি কম কথা? এসো মা লক্ষ্মী ঘরে এসো।'

দুর্গা প্রতিমাকে কেন্দ্র করে এখানে এসে যে সকলের এত ভালোবাসা পাবে শুভলক্ষ্মী কল্পনাও করেনি তা। বিশেষ করে বাচ্চু-বিচ্ছু যেন একান্ত আপনজন হয়ে উঠল।

একসময় বাবলুর ফোন পেয়ে সবাই চলল ওদের বাড়ির দিকে। শুভলক্ষ্মীর অনারে সবারই নিমন্ত্রণ আজ বাবলুদের বাড়িতে। এখানেই স্নানাহার পর্ব শেষ হলে বেশ কিছুক্ষণের জন্য ক্লান্তি বিনোদনের বিশ্রাম। তারপরে একজোটে সবাই চলল মিত্তিরদের বাগানের দিকে।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে বাগানে প্রবেশ করেই যেন খুশির জোয়ারে ভেসে গেল শুভলক্ষ্মী। বলল, 'সেদিন আমরা দু'বান্ধবীতে বাগানে এলেও ভালোভাবে চারদিক ঘুরে দেখার সময় পাইনি। আজ পুরো বাগানটা ঘুরে দেখব।'

সুকন্যা বলল, 'সেকালের জমিদারদের বাড়ি বাগান। কোনও একসময় পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দিয়ে গেছে। তবে কিনা সংস্কার করার চেষ্টা করেনি একবারও। অবশ্য একেবারেই যে করেনি তা নয়। বাগানের একটা দিক ফুলে ফুলে ভরিয়ে দিয়েছে ওরা। কিন্তু বাকি জায়গাগুলো বনময় হয়ে আছে। ওদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর আমি নিজেও স্বেচ্ছায় একটু আধটু পরিচর্যা করি।'

শুভলক্ষ্মী বলল, 'তোমার বাড়িটা কোথায়?'

সুকন্যা দূর থেকে ওর বাড়ি দেখালো। বলল, 'ওদিকের পাঁচিলের একটা অংশ ধসে পড়েছে। আমি সেদিক দিয়েই এসে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করি।'

কথা বলতে বলতে একটা ফোন এলে শুভলক্ষ্মী বলল, 'দোলা এসে গেছে।'

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, 'কই কোথায়?'

'কাছাকাছি এসেছে। বাগানে ঢুকল বলে।'

আর এদিক-সেদিক নয়। সবাই ওরা সেই ভাঙা বাড়ির চাতালে এসে বসল।

সুকন্যা বলল, 'ওই বুঝি দোলা?'

শুভলক্ষ্মী বলল, 'হ্যাঁ, আমার প্রিয় বান্ধবী।'

সুকন্যাই গিয়ে হাত ধরে নিয়ে এল তাকে। স্লিম ফিগারের দোলা সুকন্যার হাত ধরে ওদের সঙ্গে এসে জুটল।

শুভলক্ষ্মী বলল, 'এরাই পাণ্ডব গোয়েন্দা।'

দোলা বলল, 'না বললেও হবে। এদের সবাইকেই চিনি? বিভিন্ন সময়ে খবরের কাগজে এদের যত ছবি বেরিয়েছে সবেরই কাটিং রেখেছি আমি।' তারপর বাবলুকে বলল, 'কাল শেষ রাতে কেমন চমকটা দিলাম?'

বাবলু হেসে বলল, 'নারীশক্তির অসাধ্য যে কিছু নেই তা আরও একবার প্রমাণ হল।'

এবার শুধু চুটিয়ে গল্প করা আর বাগানময় ঘুরে বেড়ানো।

এইভাবে গল্প করতে করতে বেলা গড়িয়ে এলে শুভলক্ষ্মী বলল, 'আর থাকা নয়। আমাকে তো এবার যেতে হবে। এরপর কথাবার্তা যা হবে তা ফোনেই।'

বাবলু বলল, 'না। আর তোমাকে আটকে রাখা ঠিক হবে না। পুজোর সময় রোজই আসবে কিন্তু।'

শুভলক্ষ্মী বলল, 'ওসব কথা পরে হবে? এখন আসা যাক।' কিছুটা এগিয়ে এসে শুভলক্ষ্মী একটি খাম বার করে সেটা বাবলুর হাতে দিয়ে বলল, 'আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ এই সামান্য উপহারটুকু মাতৃপূজার জন্য গ্রহণ করলে খুব খুশি হব কিন্তু।'

বাবলু বলল, 'কী আছে এতে?'

'ঘরে গিয়ে দেখো, এখন আসি?'

॥ দুই ॥

আজ সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত যা হল তা যেমনই অপ্রত্যাশিত তেমনই অভাবনীয়। মা সবাইকে চা-বিস্কুট খাইয়ে পুজোর ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করছিলেন।

একটু পরে বাবাও এসে যোগ দিলেন ওদের সঙ্গে। বললেন, 'পুজোর যদিও কদিন বাকি তবুও আর সময় নষ্ট করা চলবে না। কাল থেকেই কিন্তু শুরু করতে হবে মহাপূজার আয়োজন। কাল সকালেই কেউ গিয়ে আমাদের তিনকড়ি পাঠক মহাশয়কে একটা খবর দিয়ে আয়। উনি ফর্দ লিখে দিলেই আমরা কেনাকাটার ব্যবস্থা করব।'

বিলু বলল, 'কাল কেন? ভোম্বল আর আমি এখনই গিয়ে খবরটা দিয়ে আসছি। আমাদের আর তর সইছে না।'

বাবলু বলল, 'একটু অপেক্ষা কর, আমিও যাব তোদের সঙ্গে।' তারপর বাবাকে বলল, 'পুজো আমরা দারুণভাবে করতে চাই। আমরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে করব এই পুজো। এবার প্রতিবেশীরা নিজের থেকে ভালোবেসে কেউ কিছু দিলে সেটাও আমরা অ্যাকসেপ্ট করব।' বলেই বলল, 'মাই গড। শুভা, মানে শুভলক্ষ্মী যাবার সময় মায়ের পুজোর জন্য একটা খাম আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল। কী আছে তা জানি না। এতক্ষণ মনেই ছিল না সেটার কথা।'

বাবা বললেন, 'নিশ্চয়ই টাকা-পয়সা অথবা চেকটেক কিছু আছে।'

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে সেটা পকেট থেকে বার করে বাবার হাতে দিল।

বাবা খাম খুলে একটা চিঠি ও তার সঙ্গে একটা চেক পেলেন। বেয়ারার চেক। কারও নাম লেখা নেই। টাকার অঙ্ক দেখেই চোখ কপালে উঠে গেল। নামী ব্যাঙ্কের পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক। সেই চেকের সঙ্গে চিঠিতে লেখা আছে, 'আমাদের পরিবারের দীর্ঘদিনের পুজো শরিকি সংঘর্ষের ফলে এ বছর থেকে বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু আমার একমাত্র কন্যা শুভার অনুরোধে এই পূজার দায়িত্ব ওর পরমপ্রিয় পাণ্ডব গোয়েন্দাদের হাতেই তুলে দিলাম। ভালোবেসে গ্রহণ করলে অত্যন্ত খুশি হব— রজনীকান্ত ঘোষাল।'

চিঠি পড়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন বাবা। অস্ফুটে বললেন, 'আজকের দিনে এমন উদার মানুষও হয়?'

উনি সঙ্গে সঙ্গে ফোনে সে কথা জানালেন বিলু, ভোম্বল ও বাচ্চু-বিচ্ছুর বাবাকে। বাবলুরাও আর এক মুহূর্ত দেরি না করে চলে গেল পাঠকমশাইকে খবর দিতে।

প্রবীণ পণ্ডিত তিনকড়ি পাঠক ওদের মুখে সব শুনে বললেন, ‘বয়সের কারণে আমি ইদানীং নিজে পুজো করি না। আমার শিষ্যরাই সব করে। তবে তোমাদের ওই প্রতিমার আগমন যেভাবে হয়েছে তা শুনে আমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারছি না। তাই এই প্রতিমার পুজো আমিই করব। কাল সকালেই যাব আমি তোমাদের ওখানে। নিশ্চিন্ত থেকো তোমরা।’

বাবলুরা পাঠকমশাইকে প্রণাম করে যখন ফিরে আসছে ঠিক তখনই পিছু ডাকলেন উনি, ‘এই শোনো, কাল নয়। আজই আমি যেতে চাই তোমাদের ওখানে। সবে তো সন্ধে-রাত। তোমরা একটা রিকশ অথবা টোটো ডেকে আনো।’

আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওরা সঙ্গে সঙ্গে একটা রিকশা ডেকে নিয়ে এল।

তিনকড়ি পাঠকও যাবার জন্য তৈরি হয়ে সেই রিকশায় এসে বসলেন।

বেশি দূরের রাস্তা নয় তাই মিনিট দশেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন। পাঠকমশাই এর আগেও এ বাড়িতে বিভিন্ন সময়ে এসেছেন কয়েকবার। তাই বাড়ি চিনতে অসুবিধে হল না। তাছাড়া গোয়েন্দারা তো সঙ্গে ছিলই।

বাবলুর বাবা সসম্মানে পাঠকমশাইকে আলাদা চেয়ার দিয়ে অভ্যর্থনা করে বসতে বললেন। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছুর বাবাও তখন ছিলেন সেখানে। বাচ্চু-বিচ্ছু পাঠকমশাইকে দেখেই বাড়িতে বাড়িতে ফোন করে তাঁর আগমন সংবাদ জানাল সবাইকে।

বিলু ভোম্বলের মা-ও ফোনেই খবর পেলেন।

খবর পাওয়া মাত্রই সব কাজ ফেলে দ্রুত চলে এলেন সবাই।

তিনকড়ি পাঠক বললেন, ‘ছেলেদের মুখে দেবী দুর্গার আগমন-বার্তা শুনে আর থাকতে না পেরে রাতেই চলে এলাম।’

বাবা বললেন, ‘আপনি আমাদের গুরুস্থানীয়। আমরা কখনও দুর্গাপুজো করিনি। এখন আপনি বিধান দিন কীভাবে মায়ের পুজো আমরা করব।’

মা বললেন, ‘আগে একটু চা সেবা করুন। সবাই মিলে চা পর্ব শেষ করে ধীরেসুস্থে শুনব সব। রাত হলেও অসুবিধা নেই। আমাদের ছেলেরা গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে আপনাকে।’

পাঠকমশাই বললেন, ‘তোমার এইসব ছেলেমেয়েদের কোনও তুলনা নেই মা। সে জন্যই তো মা দুর্গা কৃপা করে ওদের কাছে এসেছেন।’

যাইহোক, কথায় কথায় একসময় চা-পর্ব শেষ হল। বাবা বললেন, ‘এবার বলুন, একেবারে রাজকীয়ভাবে মায়ের পুজো যেন আমরা করতে পারি তেমনই বিধান দিন। খরচ খরচার ব্যাপারে কোনও চিন্তা করবেন না। যত টাকা লাগে লাগুক আমরা তা জোগাড় করবই।’

‘সত্যি বলছেন, পারবেন?’

‘হ্যাঁ পারব।’

তিনকড়ি পাঠক মৃদু হেসে বললেন, ‘এখনও ভেবে দেখুন, আমি কিন্তু এখনই ফর্দ তৈরি করতে বসব। আর বেশি দেরি নেই। কাল থেকেই কেনাকাটা শুরু করতে হবে।’

সবাই একজোটে বললেন, ‘পারব-পারব-পারব।’

‘তাহলে শুনুন রাজকীয়ভাবে নিজেদের নাম উজ্জ্বল করে রাখতে চাইলে আপনাদের খরচ পড়বে নিরানব্বুই কোটি টাকা।’

পাঠকমশাইয়ের কথা শুনে আঁতকে উঠলেন সবাই। কী অসম্ভব রকমের কথা বলছেন উনি। মায়ের পুজো নিয়ে রসিকতা নাকি?

ভোম্বলের বাবা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ‘নিরানব্বুই কোটি টাকা! স্বপ্নেও কখনও এত টাকা দেখিনি কেউ।’

তিনকড়ি পাঠক বললেন, ‘তা আপনাদের অবগতির জন্য জানাই— একটি দুর্গাপুজো করতে সর্বনিম্ন খরচ হয় মাত্র দশ হাজার টাকা। এরপরে সাধ্যমতো যতটা পারবেন ততটা করবেন। বিশ, ত্রিশ, পঞ্চাশ, এক লাখ।’ বলে মুচকি হেসে বললেন, ‘রাজকীয়ভাবে সেই পুজো করা এখনকার দিনে কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। সেই পুজো হয়েছিল মাত্র একবারই। বউমারাও মন দিয়ে শুনুন। ছেলেমেয়েরাও শোনো— ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পর মর্তে প্রথম দুর্গাপূজার প্রচলন করেছিলেন রাজা সুরথ ও সমাধি। সে কোন অনাদি যুগের কথা। কিন্তু এই বাংলায় আমাদের যে দুর্গোৎসব তার প্রচলন কবে হয়েছিল সে
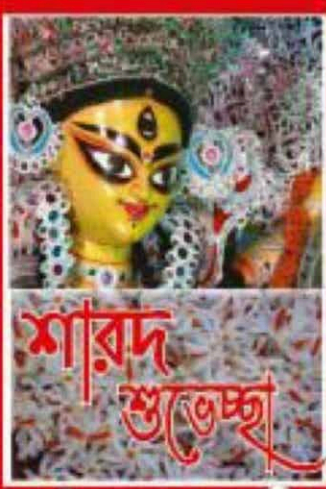
কথা কি জানা আছে কারও? দুর্গাপূজা এখন শুধু বাংলা নয় সারা ভারতে ও ভারতের বাইরেও সমাদৃত হয়েছে।

এই দুর্গাপূজার প্রচলন করেছিলেন তাহেরপুরের মহারাজ কংসনারায়ণ খাঁ। গৌড়বঙ্গের শাসক যখন হুসেন শাহ ঠিক তখনই উত্তরবঙ্গের, বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহি জেলার তাহেরপুর নামে ছোট একটি রাজ্যের রাজা ছিলেন কংসনারায়ণ খাঁ। রাজা তাঁর উপাধি হলেও তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের জমিদার। মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লুক ভট্টর পুত্র।

তা কংসনারায়ণের একবার খুব ইচ্ছা হল তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করবেন। উদ্দেশ্য একটাই, নিজ মহিমাকে সর্বজন সমক্ষে প্রকাশ করা। কিন্তু তাঁর এই মনোবাসনার কথা পারিষদগণের কাছে প্রকাশ করলে তাঁরা কেউই এ ব্যাপারে সায় দিতে পারলেন না। তাঁরা বললেন, 'রাজসূয় যজ্ঞ সেই রাজাই করতে পারেন যাঁকে অন্য রাজারা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ রাজা বলে মনে করেন। সাধারণত কোনও রাজা রাজ চক্রবর্তী বা সম্রাট হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করার জন্যই রাজসূয় যজ্ঞ করে থাকেন। সেদিক থেকে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি এবং গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের অধীন কোনও রাজা এই যজ্ঞ করার অধিকারী নন। তার আর এক কারণ কোনও রাজাই আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেবেন না। শুধু তাই নয়, নবাবি আমলে আপনার পক্ষে রাজ চক্রবর্তী হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। বিশেষ করে এই ধৃষ্টতা গৌড়ের সুলতান কখনওই মেনে নেবেন না।

কংসনারায়ণ বললেন, 'বেশ রাজসূয় যজ্ঞ না হোক অশ্বমেধ যজ্ঞ তো করতে পারি?'

অমাত্যরা বললেন, 'না। তাও পারেন না। কারণ অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে যজ্ঞের ঘোড়াকে অন্য সব রাজ্যের ওপর দিয়ে ছুটিয়ে আনতে হবে। এবার কোনও দেশের রাজা যদি সেই ঘোড়াকে আটকে রাখে তাহলে সেই রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যুদ্ধজয়ী হয়ে ঘোড়াকে মুক্ত করে আনতে হবে। পৌরাণিক যুগের সেই নিয়ম আজকের দিনে মানা সম্ভব নয়। বিশেষ করে আমাদের যা সামরিক শক্তি তাতে এরকম যুদ্ধযাত্রা অসম্ভব।'

এইসব যুক্তিগ্রাহ্য কথা শুনে রাজা কংসনারায়ণ খাঁ'র মন অত্যন্ত দমে গেল। তিনি ভেবে কূল পেলেন না কী করা যায়। কেন-না তিনি নিজেও জানেন তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক হলেও ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত।

তাঁর মানসিক অবস্থান দেখে অনেক বিচার বিবেচনার পর অমাত্যরা বললেন, 'তবে মহারাজ, একটা উপায় কিন্তু আছে।'

'কী উপায়?'

'আপনি দুর্গাপূজা করতে পারেন। রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞের চেয়েও দুর্গাপূজায় পুণ্যলাভ অনেক বেশি। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অকালে বোধন করে দেবীকে জাগ্রত করেছিলেন। আপনিও তাই করুন।'

'কিন্তু রাজা সুরথ তো বসন্তকালে করেছিলেন দেবীর পূজা।'

'করেছিলেন। তবে কিনা বসন্তকালের এখনও অনেক দেরি। শরৎ আগত। আপনি শ্রীরামচন্দ্রের মতো শরৎকালেই দেবীর বোধন করে পূজা করুন। এ দেশে দুর্গাপূজার প্রবর্তক হন আপনি।'

কথাটা দারুণভাবে মনে ধরল কংসনারায়ণের। বললেন, 'হ্যাঁ। উত্তম প্রস্তাব। দেবী দশভুজার পূজাই করব আমি ভক্তিভরে। দুর্গাপূজার প্রচলন আমার দ্বারাই শুরু হোক। কিন্তু দুর্গাপূজার বিষয়টাই যে আমার অজানা। কে আমাকে বিধান দেবে দুর্গাপূজার?'

কংসনারায়ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন রমেশ শাস্ত্রী। তিনি বললেন, 'আমাকে কয়েকটা দিন সময় দিতে হবে মহারাজ। আমি বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ পর্যালোচনা করে এর বিধান দিচ্ছি।'

রাজা কংসনারায়ণ আশার আলো দেখতে পেলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই বিধান দিলেন রমেশ শাস্ত্রী। বললেন, 'আশ্বিন মাসের শুক্লা দেবীপক্ষে ষষ্ঠীতে বোধন করেই সপ্তমীর দিন থেকে করতে হবে দেবীর পূজা। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী। দশমীতে বিসর্জন।'

কংসনারায়ণ বললেন, 'দেবীর পুজো করব তাতে বোধনের প্রয়োজন কী?'

রমেশ শাস্ত্রী বললেন, 'আছে মহারাজ। সুরথ ও সমাধি বসন্তকালে যে পূজা করেছিলেন সে পূজা বাসন্তী পূজা নামে পরিচিত। তখন উত্তরায়ণ, দেবী তখন জাগ্রত। তাই বোধনের প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র অকালে অর্থাৎ শরৎকালে দক্ষিণায়নের সময় দেবীর মহানিদ্রা ভঙ্গ করে পূজা করেছিলেন বলেই বোধনের প্রয়োজন হয়েছিল। তবে পূজার মন্ত্র একই। শুধু নিয়মের হেরফের।'

রাজা কংসনারায়ণ পণ্ডিতের বিধান মেনে মহা আড়ম্বরে শুরু করলেন দুর্গাপূজা। সে যুগে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে রাজা কংসনারায়ণ যে দুর্গাপূজা করেছিলেন তা আজ ইতিহাস হয়ে আছে। তাহেরপুরের কংসনারায়ণ প্রবর্তিত দুর্গোৎসবই আজ বাঙালি তথা ভারতীয়দের শ্রেষ্ঠ উৎসবে পরিণত হয়েছে।'

তিনকড়ি পাঠকমহাশয় একটু হেসে বললেন, 'এবার আপনারাই ঠিক করুন এই পুজো রাজকীয়ভাবে করবেন না সবাই যেমন যে যার সাধ্যমতো করে সেভাবেই করবেন?'

বাবলুর বাবা বললেন, 'আপনার কথা শুনে আমরা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম পণ্ডিতমশাই। সত্যি, ওইরকম পুজো কি আমাদের মতো কেউ করতে পারে?'

পাঠকমশাই বললেন, 'আসলে কী জানেন, মায়ের পুজো নিয়মমাফিক করলেই যথেষ্ট। মাকে পাঁচদিনে পাঁচটা শাড়িও দেওয়া যায় আবার দরিদ্রনারায়ণকে দেওয়ার জন্য পাঁচ হাজার শাড়িও দেওয়া যায়। কংসনারায়ণ শতজন ব্রাহ্মণকে সোনার থালা, সোনার বাটি, সোনার গেলাসে প্রসাদ দিতেন পুজোর চারদিনে। এখন সেসব গল্পকথা।' তারপর কাগজ-কলম হাতে নিয়ে নিবিষ্ট মনে ফর্দ তৈরি করতে বসলেন। ফর্দ লেখা শেষ হলে সবাইকে সেটা দেখিয়ে বললেন, 'আপনারা কাল থেকেই কাজে লেগে পড়ুন। সব জোগাড় হয়ে গেলে চতুর্থীর দিন আমাকে খবর দেবেন।'

পাঠকমশাই এবার কাগজ-পত্তর গুটিয়ে নিলে মা বললেন, 'আর এক কাপ চা খেয়ে যান। আশীর্বাদ করুন আমাদের এই প্রতিমা পুজো যেন নির্বিঘ্নেই হয়।'

পাঠকমশাই বললেন, 'মা স্বেচ্ছায় যেখানে এসেছেন, সেখানে কার সাধ্য বিঘ্ন ঘটায়?'

যাইহোক, শুধু পাঠকমশাই নয় সবাই একসঙ্গে চা-পর্ব শেষ করলেন।

বাবলু বলল, 'চলুন, আমাদের প্রতিমা দর্শন করিয়ে আমরা আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

বাবলু, বিলু, ভোম্বল তিনজনেই গেল পাঠকমশাইকে
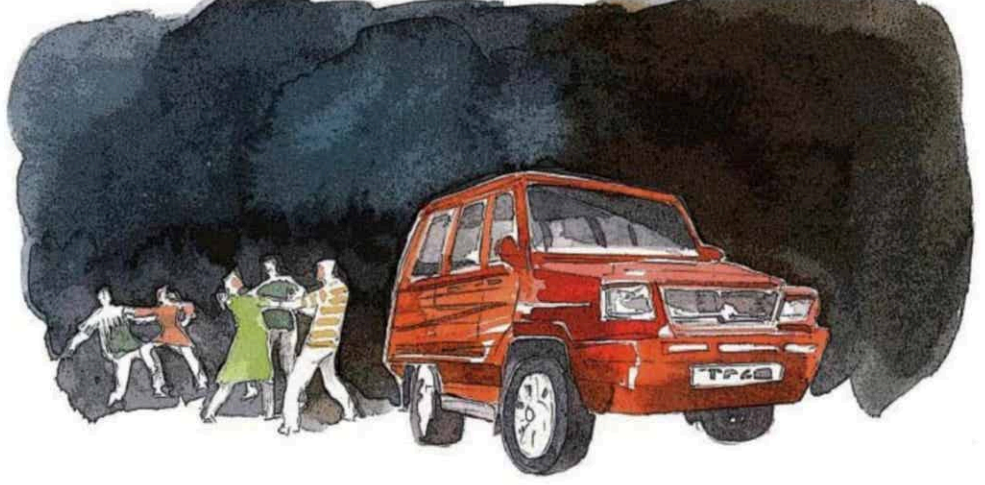
প্রতিমা দর্শন করাতে। তারপর পরম সমাদরে তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে যখন ঘরে এল ঘর তখন ফাঁকা।

বাবলু ওর সোফায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে শুভলক্ষ্মীকে ফোন করল, 'পৌঁছেছ?'

'সবে বাড়ি ঢুকলাম। তোমার মা-বাবাকে প্রণাম। তোমাদের সবার জন্য আমার ভালোবাসা রইল। মায়ের পুজোর আয়োজন করো। মহাষ্টমীর দিন আমার মা-বাবাও যাবেন তোমাদের পুজো দেখতে।'

'সে তো আসবেনই। তার আগে আমরাও যাব তাঁদের আমন্ত্রণ জানাতে।'

'সত্যি?'

'এটা তো আমাদের নৈতিক কর্তব্য। তাই না?'

'অপেক্ষায় রইলাম তাহলে।'

বাবলু ফোন রেখে দেহটা এলিয়ে দিল সোফাতে।

মা বললেন, 'অনেক হয়েছে। আর নয়। এবার পঞ্চুকে হাঁক দিয়ে রাতের খাওয়া সেরে শুয়ে পড় তাড়াতাড়ি।'

'বাবা?'

'তোরা যখন ঠাকুরমশাইকে দিতে গেলি তখনই পাশের ঘরে শুয়ে পড়েছেন।'

মা ঠিকই বলেছেন। সারা দিনে অনেক টেনশন গেছে। মনও এখন প্রফুল্ল। এবার নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়া যাক। বাবলু সোফা থেকে উঠে দরজার দিকে এগতেই পঞ্চুর আবির্ভাব হল।

মা বললেন, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

পঞ্চু আদুরে গলায় বলল, 'ভুক-ভুক।'

বাবলু এবার ফ্রেস রুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে চটপট রাতের খাওয়া সেরে শয্যায় এলিয়ে দিল দেহটা।

পরদিন ভোরে যথারীতি পঞ্চুকে নিয়ে বাইরে এল বাবলু। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছুরা তখনও এসে পৌঁছয়নি। তবে সুকন্যা সাজি ভর্তি ফুল নিয়ে শ্রীজিতাদের গ্যারেজ ঘরের সামনে পায়চারি করছে। যেখানে ত্রিপল দিয়ে আড়াল করা ওদের দুর্গা প্রতিমা সুরক্ষিত আছে।

বাবলু সুকন্যাকে দেখেই বলল, 'সুকন্যা, তোমাকে একটা কথা বলি। আমাদের এই বাগানের যত্রতত্র বিচরণ করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে তোমার। তবে এই নিশিভোরে ভাঙা পাঁচিল টপকে বাগানে ফুল নিতে আসা কি সত্যিই প্রয়োজন ছিল? এত ভোরে যদি কোনও বিপদ হয় তোমার?'

সুকন্যা হেসে বলল, 'সে জন্য তোমরা তো আছো।'

'আমরা সব সময়ই তোমার পাশে পাশে আছি। তবু বলি, পোড়ো বাগান। সাপ-খোপের ভয়ও তো আছে।'

এমন সময় বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছুকেও আসতে দেখা গেল।

বাবলু বলল, 'চল, একবার বাগানে যাই। মা যেখানে আবির্ভূতা হয়েছেন সেই জায়গাটায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে আসি। অমনি সুকন্যাকেও একটু এগিয়ে দিই।' তারপর বলল, 'সুকন্যা, কাল তোমার ওই ছোট্ট ভাইটিকে তো একবারও দেখলাম না?'

সুকন্যা বলল, 'ও ছিল না কাল। আমার পিসির বাড়ি গেছে। আজই আসবে।'

কথা বলতে বলতেই ওরা বাগানের দিকে এগল।

হঠাৎই 'উপ-উপ' ডাক শুনে 'ভৌ ভৌ' শব্দে পঞ্চু দ্রুত ছুটে গেল বাগানের দিকে।

নিশ্চয়ই হনুমানের দল এসেছে। বাবলুরাও তাই হাতের কাছে যে যা পেল নিয়ে ছুটে চলল সেদিকে। ততক্ষণে এদিক-সেদিক থেকেও অনেক কুকুর ছুটে এসে তাড়া করেছে হনুমানগুলোকে।

বিলু, ভোম্বলও দু'একটা ঢিল ছুঁড়ে মুখে শব্দ করতেই উধাও হল হনুমানের দল।

এরপর সবাই ওরা সেই ভাঙা বাড়ির চাতালে যেখানে মূর্তি বসানো হয়েছিল গিয়ে প্রণাম করল। তারপর সুকন্যাকে ওদের ফ্ল্যাটের দিকে এগিয়ে দিয়ে সামান্য পায়চারি করে হাজির হল গ্যারেজ ঘরের সামনে।

প্রতিমা দর্শনের জন্য ছেলে-বুড়ো অনেকেই তখন জড়ো হয়েছে সেখানে। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল এক সময়।

শ্রীজিতার মা-বাবা ওদের সবাইকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। তারপর শিঙাড়া, কফি, কেক ইত্যাদি খুব ভালোবেসে খাওয়ালেন।

শ্রীজিতার বাবা বললেন, 'শোনো তোমরা, আমি একজন ডেকরেটরকে দায়িত্ব দিয়েছি এখানে প্যান্ডেল বেঁধে জায়গাটাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলবার। আর পাড়ার ইলেক্ট্রিসিয়ান মন্টুকে বলেছি গলির মোড় পর্যন্ত আলোর ব্যবস্থা করে দিতে। এসবের খরচপত্তর আমি দেব। পুলিসের সঙ্গে তোমাদের তো ভালোই যোগাযোগ, নিয়ম অনুযায়ী তাঁদেরও একটু জানিয়ে রেখো আমরা রাস্তা ব্লক না করেই পুজোর আয়োজন করছি, তাঁরা যেন সময়মতো একবার এসে দেখে যান।'

বাবলু বলল, 'নিশ্চিন্তে থাকুন। ওদিক থেকে কোনও অসুবিধে হবে না। ওঁরা জানেন আমাদের দ্বারা কোনও গর্হিত কাজ কখনওই হবে না।'

এরপর সবাই যে যার বাড়ির দিকে চলে গেল।

বাবলু ঘরে এলে বাবা বললেন, 'চেকটা আজই ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দিস। আমি এখনই একবার দুর্গাপুরে যাব। সেখানে অফিসে খবর দিয়ে সব জানিয়ে পুজো পর্যন্ত ছুটি নিয়ে, পারলে আজই ফিরে আসব। তোরা সাবধানে থাকিস।' একটু পরে বাবা বিদায় নিলে বাবলু ব্যাঙ্কে গেল চেক জমা দিতে। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্চুরাও সঙ্গে গেল ওর।

৷৷ তিন ৷৷

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে উৎসবে মেতে উঠল এলাকাটা। তারচেয়েও আনন্দের কথা যা কিছু কেনাকাটা সবই করলেন একজোটে বড়রা। ওরা শুধু তদারকি করতে লাগল।

বিলু, ভোম্বল ও বাচ্চু-বিচ্চুর বাবাকে নিয়ে শুভলক্ষ্মীর বাবা-মাকে পুজোয় এখানে আসার জন্য আমন্ত্রণও জানিয়ে এলেন বাবলুর বাবা।

দেখতে দেখতে দিন এগিয়ে এল।

শুভার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে দোলাকে আমন্ত্রণ জানাল বাবলু। প্রতিমা যারা বয়ে এনেছিল বা নজরদারি করেছিল তাদেরও আসতে বলল।

পঞ্চমীর দিন সন্ধ্যা থেকেই তিনকড়ি পাঠকমশাই কী সব পূজা করলেন। তারপর বোধন করলেন দেবী দুর্গার। ষষ্ঠীর দিন ষষ্ঠাদিকল্পারম্ভের পর সন্ধ্যায় দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস করলেন।

সপ্তমীর দিন খুব সকালে একটা ট্যাক্সি নিয়ে আবির্ভাব হল শুভলক্ষ্মীরা। বাবলুদের ওখানেই উঠল। পরে নতুন শাড়ি পরে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে পূজার আয়োজনে সহযোগিতা করতে লাগল।

বিলুর বাবা ঠাকুরমশাইয়ের নির্দেশে গঙ্গায় গিয়ে নবপত্রিকা স্নান করিয়ে আনলেন। সঙ্গে গেল পাড়ার বলাইদা নামে একজন। আর গেল ঢাকিরা।

অনেক বেলায় দোলা এল একটা মোটর বাইক নিয়ে।

যথাসময়ে শুরু হল সপ্তমীর পূজা।

বাবলুদের বাড়ির পিছনদিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা ছিল সেখানে রান্নাবান্না বা লোকজনের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হল।

মন্ত্রের ধ্বনিতে ঢাকের বাদ্যে জমজম করে উঠল পূজা প্রাঙ্গণ। একটি পূজাকে ঘিরে যে এত আনন্দ হয় এতদিন তা কল্পনাও করেনি কেউ।

দুপুরে ভোগ-প্রসাদ খাওয়া শেষ হলে দোলা বিদায় নিল। ওদের দেশের বাড়ির পুজো। সেখানে কাল না গেলেই নয়। তবে নবমীর দিন সকালে ও আবার চলে আসবে জানাল।

এমন সময় হঠাৎই মা ও ভাইয়ের হাত ধরে সুকন্যাকে আসতে দেখে বিস্মিত বাবলু বলল, 'আশ্চর্য তো! সকাল থেকে কোথায় ছিলে তুমি? তারচেয়েও আশ্চর্য শুভাকে নিয়ে এমনই মেতে ছিলাম আমরা যে তুমি নেই এটা একবারের জন্যও মনে হয়নি কারও।'

সুকন্যার মা বললেন, 'আসলে কী জানো বাবা, ওর পিসি হঠাৎ করে সাতসকালে একটা গাড়ি নিয়ে এসে আমাদের সবাইকে বললেন বেলুড় মঠে যেতে। উনি তো ওখানেই দীক্ষা নিয়েছেন। তাই আর না করতে পারলাম না।'

বাবলুর মা বললেন, 'তাহলে বসে একটু প্রসাদ খেয়ে যান।'

'প্রসাদে না বলব না। যা হোক একটু দিন আমরা ওখানেই প্রসাদ খেয়ে এসেছি।'

মা প্রসাদ দিলে সেটা মুখে দিয়ে বললেন, 'সন্ধেবেলা আরতি দেখতে আসব।'

সুকন্যা ওর মা ও ভাইকে নিয়ে প্রতিমা দর্শন করতে গেল।

বাবলু শুভাকে বলল, 'তুমি যেন কেটে পড়ার মতলব কোরো না। তোমাকে থাকতেই হবে।'

শুভলক্ষ্মী বলল, 'আমি আছি। পুজোর ক'দিন থেকে তবেই যাব আমি।'

ওর কথা শেষ হতেই বাচ্চু-বিচ্চু এসে বলল, 'তোমার ব্যাগ নিয়ে চলে এসো এবার। একটু বিশ্রাম নেবে চলো। অনেক পরিশ্রম করেছ তুমি।'

শুভা বলল, 'এমন আমার অভ্যাস আছে।'

ওরা চলে গেলে বাবলুও ওর শয্যায় ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিল। মা এসে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তোদের এই পুজোর জন্য পাড়ার সবাই কিন্তু খুব করেছে।'

বাবলু বলল, 'পুজো তো সবারই মা, তাই না করবার কী আছে?'

বাবা পাশের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। মা সেখানে গেলেন।

বাবলুর চোখে ঘুম এল না। সে কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে আবার এল প্রতিমার স্থানে। বিলু, ভোম্বল সেখানেই বসে গল্প করছিল। পঞ্চুও ছিল একপাশে চুপচাপ। বাবলু এসে রাতের আরতি এবং মহাষ্টমীর সন্ধিপূজার ব্যাপারে যখন আলোচনা করছিল তখনই শ্রীজিতা এসে বলল, 'বাচ্চু-বিচ্চুর মা ডাকছেন তোমাদের। চা খাবে এসো।'

শ্রীজিতা মনে হয় ওদের ওখানেই ছিল। তাই সেখানেই গেল বাবলুদের নিয়ে।

ওদের ঘরে গিয়ে শুভাকে দেখে বাবলু বলল, 'কী, ঘুম হল?'

শুভা বলল, 'ঘুম! সে আবার কী বস্তু? আমার ওসব সহজে আসে না। তাছাড়া এমন গল্পের আড্ডা ছেড়ে কেউ ঘুমোয়? তবে একটা কথা, মায়ের পুজোর এই কটা দিন যেন কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে যেও না।'

বাবলুর হয়ে বিলু বলল, 'গোয়েন্দাগিরি কি ইচ্ছেমতো করা যায়? হঠাৎ করে সেরকম কোনও পরিস্থিতি তৈরি হলে কী করে ঘরে বসে থাকি বলো?'

একটু পরে বাচ্চু-বিচ্চুর মা চা নিয়ে এলে সবাই চা-পর্বে মেতে উঠল। তারপর একজোটে চলল দুর্গামণ্ডপে। আর একটু পরেই তো রাতের ভোগারতির ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রীজিতাদের বাড়িতেই হবে সে সবের আয়োজন। বাড়ির মায়েরাই করবেন সেই ব্যবস্থা।

ওরা মণ্ডপে যাওয়ার আগে থেকেই ঢাকের বাদ্যি শুরু হল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অনেকেই তখন নতুন পোশাক পরে মণ্ডপের কাছে এসে ভিড় করেছে। কেউ প্রতিমা দেখছে। কেউ খেলা করছে।

বাবলু শুভাকে নিয়ে ঘরে ঢুকেই দেখল সুকন্যাও ওর মা-ভাইকে নিয়ে ওদের বাড়িতে এসে মায়ের সঙ্গে গল্প করছে।

সুকন্যা পরমাদরে জড়িয়ে ধরল শুভলক্ষ্মীকে। বলল, 'এখন আর ঘরে বসে কী করব? চলো সবাই মণ্ডপে যাই।'

পাশের ঘর থেকে বাবা হাঁক দিলেন, 'হ্যাঁরে, সন্ধে হয়ে গেল। এবার ঠাকুরমশাইকে আনতে যা কেউ?'

বাবলু বলল, 'না, উনি নিজেই আসবেন বলেছেন। ওঁর সহকারী ব্রাহ্মণ যিনি তিনিই নিয়ে আসবেন সঙ্গে করে।'

'খুব ভালো কথা। চা খেয়ে আমিও যাচ্ছি একটু পরে।'

অতএব সবাই আবার প্রতিমার কাছেই চলল। কিছু সময়ের মধ্যেই জ্বলে উঠল আলো। রং-বেরঙের আলোর ছটায় ঝলমলিয়ে উঠল চারদিক।

সপ্তমীর পর অষ্টমী। যেমন তেমন অষ্টমী নয়, মহাষ্টমী। ভোর থেকেই চলল তার প্রস্তুতি। ঢাকের শব্দে মুখর হয়ে উঠল চারদিক। মা এবং অন্যান্য প্রতিবেশিনীরা স্নান করে গরদের শাড়ি পরে প্রতিমার স্থানে গিয়ে পূজার আয়োজনে মাতলেন।

পাঠকমশাইও তাঁর চ্যালাকে নিয়ে ঠিক সময়মতো চলে এলেন। মহা ধুমধামের সঙ্গে শুরু হল মাতৃ আরাধনা।

শুভলক্ষ্মীর বাবা মা-ও এলেন বেহালা থেকে। সারাদিন রইলেন, প্রসাদ গ্রহণ করলেন। সন্ধ্যায় আরতি দর্শন করে বিদায় নিলেন। তবে শুভলক্ষ্মী রয়ে গেল এখানেই।

মহাষ্টমীর পর মহানবমী। সুন্দরপাড়া থেকে দোলা ওর মাকে নিয়ে পুজো দেখতে এল। পুজো শেষে প্রসাদ গ্রহণ করল।

এরপর সকল আনন্দের অবসান। নবমী নিশি প্রভাত হতেই মন খারাপের পালা। বেজে উঠল বিসর্জনের বাজনা। মা'কে বিদায় দিতে মন যেন চায় না। তবু নিয়ম তো মানতেই হবে। তাই দধিকর্মা থেকে সিঁদুরখেলা সবই হল এক এক করে। বেলা থাকতে থাকতেই দেবী প্রতিমাকে বিসর্জন দেওয়া হল গঙ্গায়। গুরুজনদের প্রণাম পর্ব শেষ করে শুভলক্ষ্মীও বিদায় নিল একসময়।

বিজয়া দশমীর প্রণাম ও শুভেচ্ছা পর্ব শেষ করে বাবলু যখন শুতে যাচ্ছে তখন ফোন এল শুভার।

বাবলু বলল, 'ঠিকমতো পৌঁছেছ তো?'

'হ্যাঁ। তবে কিনা যে জন্য ফোন করলাম। দুর্গাপূজার পর কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার প্রচলন আছে সেটা মনে আছে নিশ্চয়ই?' কাল যখন হোক দোলা তোমাদেরই হাওড়ার প্রশস্ত থেকে প্রতিমা নিয়ে যাবে। অতএব বুঝতেই পারছ? এবার শুয়ে পড়ো। গুড নাইট।'

বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ পাড়ার দু'একটি ছেলের সঙ্গে প্রশস্ত থেকে প্রতিমা নিয়ে এল দোলা। সেই প্রতিমা শ্রীজিতাদের গ্যারেজ ঘরেই রাখা হল।

মা সবাইকে মিষ্টিমুখ করালেন। দুপুরে খাওয়ার জন্যও বললেন। কিন্তু ওরা রইল না। পুজোর দিন আসব বলে যে গাড়িতে এসেছিল সেই গাড়িতেই বিদায় নিল।

এরপর আবার নতুন করে জেগে উঠল পাড়া। সব রকমের প্রস্তুতিও নেওয়া হল। পুজোর আগের দিন সন্ধ্যায় শুভলক্ষ্মীও এল।

কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে সাড়ম্বরে মায়ের পুজোও হল। যদিও এই পুজো সব গৃহস্থের ঘরে ঘরে তবুও উৎসাহের অন্ত রইল না কারও। পাড়ার বউ-মেয়েরা সারা রাত ধরে নিশিযাপন করল।

উৎসাহের বশে বাবলুরাও রাত্রি জাগরণ করল সবার সঙ্গে। তারপর ভোরের আলো ফুটে উঠতেই প্রতিদিনের মতো ওরা বাগানে গেল। সুকন্যাও রাত জেগেছিল ওদের সঙ্গে। আবছা আলো-আঁধারে ও-ই দেখল প্রথমে দৃশ্যটা। বলল, 'ভালো করে চেয়ে দেখো ওখানে কী!'

ওরা বিস্ময়ভরা চোখে দেখল একজোড়া লক্ষ্মীপেঁচা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

এই আনন্দের কোনও তুলনা হয় না।

ভালো করে আলো ফুটলে পাড়ায় এসে খবরটা দিতে সবাই চমকিত হল। সবাই বলল, 'যাক মা যে আমাদের পুজোয় সন্তুষ্ট হয়েছেন এটাই তার প্রমাণ।'

দুপুরে প্রতিমার দধিকর্মা সাঙ্গ হলে বিকেলে গঙ্গায় নিরঞ্জন পর্ব শেষ হল।

শুভলক্ষ্মীও আর রইল না। সবাইকে একবার ওদের বাড়িতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিল। ওর যাওয়ার জন্য শ্রীজিতার বাবাই একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন।

এরপরে বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেছে। সবাই আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে এসেছে। বাবাও চলে গেছেন দুর্গাপুরে। এখনও চার-পাঁচ বছর চাকরি আছে তাঁর। তারপরই অখণ্ড অবসর।

শুভলক্ষ্মী প্রায় দিনই এখন ফোন করে। ওদের বড়িতে যাবার জন্য বলে।

বাবলু বলে, 'যাব তো বটেই এটা আমাদের নৈতিক কর্তব্য। কালীপুজো ভাইফোঁটার ব্যাপারটা কেটে যাক, তারপর যাব।

সেদিন সকালে মর্নিংওয়াকের পর বাবলু ওর কমপিউটার নিয়ে সবে বসেছে এমন সময় ফোন এল শুভার 'ব্যস্ত নাকি?'

বাবলু হেসে বলল, 'সেটা তো সব সময়ই।'

'আমরা এখনই বেরচ্ছি।'

'কোথায়? শিমলা না গ্যাংটক?'

'অতদূরে নয়, হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের লঞ্চ ঘাটে। সেখান থেকে যাব—'

'কোথায় যাবে?'

'পাণ্ডব গোয়েন্দাদের চেনো? যেখানে বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছু আছে সেখানে। আর আছে আমার দারুণ মজাদার একটা ভাই। তার নাম পঞ্চু।'

উল্লসিত বাবলু বলল, 'দারুণ একটা সারপ্রাইজ। কিন্তু আমরা বললে যখন, তখন মনে হচ্ছে তুমি একা নও। সঙ্গে কে বা কারা আছে বলো?'

'না না। একজনই আছে।'

'কে সে?'

'দারুণ এক চমৎকারী। সবার মন-প্রাণ ভরিয়ে দেবার অসীম ক্ষমতা রাখে ও।'

বাবলু বলল, 'মাকে তাহলে খবরটা দিই?'

'শুধু মা-কে কেন, সবাইকে দাও।'

'আমরা কি যাবো তোমাদের অভ্যর্থনা করে আমাদের এখানে নিয়ে আসার জন্য?'

'কোনও দরকার নেই। বেশিক্ষণ থাকব না আমরা। বেহালা থেকে অতদূর যাব, যেতেও তো সময় লাগবে আমাদের।'

মা ঘরে এসে বললেন, 'কার ফোন রে?'

'তোমার ওই ধিঙ্গি মেয়েটার, শুভলক্ষ্মীর। এখনই আসছে ওর কোনও এক বান্ধবীকে নিয়ে।'

'ওমা! তাই নাকি? তা ওকে ধিঙ্গি মেয়ে বলছিস কেন? ও নামেও শুভ, আচরণেও লক্ষ্মী।'

বাবলু তখনই ফোন করে দিল সবাইকে। তারপর মাকে বলল, 'এবার তাহলে আয়োজন শুরু করো। আমি একটু বাজারে গিয়ে দেখি ভালো গলদা চিংড়ি পাই কিনা। ফ্রায়েডরাইস আর চিংড়িমাছের মালাইকারি করো তুমি।' বলেই চটপট ব্যাগ হাতে বেরিয়ে গেল বাজারে।

পঞ্চু দরজার পাশেই শুয়েছিল। পায়ে পায়ে ও-ও সঙ্গ দিল বাবলুর।

ইতিমধ্যে খবর শুনে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছুরা সবাই এসে হাজির। শুভলক্ষ্মী আসছে এ কি কম কথা?

বাচ্চু বলল, 'আমাদের সঙ্গে তো কতভাবে কতজনেরই পরিচয় হয়েছে কিন্তু সুকন্যা আর শুভলক্ষ্মী যেন একেবারেই ব্যতিক্রমী।'

একটু পরেই বাবলু কাছাকাছি বোসেদের বাজার থেকে অনেক কিছু নিয়ে এল।

মা বললেন, 'কী রে! সবই তো নিয়ে এলি, তোর গলদা চিংড়ি কই?'

বাবলু বলল, 'আমাদের যে মাছ দেয় সেই নাড়ুদা দু'কেজি গলদা চিংড়ি নিয়ে একটু পরেই আসছে।' নাড়ুদা বলল, 'তোমাকে আর ছাড়াতে হবে না। সেই ছাড়িয়ে ছুড়িয়ে নিয়ে আসবে।'

ভোম্বলের আর তর সইল না। বলল, 'আমরা এখন আর ঘরে বসে থেকে কী করব? চল না একটু এগিয়ে দেখি।'

বাবলু কী যেন ভেবে বলল, 'বলছিস?'

বিলু বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চল।'

'চল তবে।'

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, 'আমরা ঘরেই থাকি। এখনই তো এসে পড়বে ওরা। ততক্ষণ মাসিমার কাজে একটু সাহায্য করি।'

মা বললেন, 'সত্যি, তোরা এখন কত কাজের হয়ে গেলি। দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেলি তোরা।'

বাবলু, বিলু, ভোম্বল চলে গেলে মা শ'পাঁচেক টাকা বাচ্চু-বিচ্ছুর হাতে দিয়ে বললেন, 'যা ওই মোড়ের মাথার দোকান থেকে শিঙাড়া, মিষ্টি যা পাস নিয়ে আয় দেখি।'

পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়ে ওরা গেল মিষ্টি কিনতে।

পরক্ষণেই নাড়ুদা এসে মাছ দিয়ে বিদায় নিল।

বাবলু, বিলু, ভোম্বল তখন জিটি রোড পার হয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে লঞ্চঘাটের দিকে।

তবে অত দূরে আর যেতে হল না। ফরশোর রোডের কাছে আসতেই শুভার আর্তস্বর কানে এল, 'আমি এখানে। হেল্প মি প্লিজ। আমার বান্ধবীকে এইমাত্র তুলে নিয়ে গেল ওরা।'

তিনজনে ছুটে গেল শুভার কাছে। স্কুটার থামিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা কী!'

'পরে সব বলব। ওই-ওদিকে গেছে ওরা। এখনও মনে হয় বেশি দূর যেতে পারেনি।'

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে বিলুকে বলল, 'তুই শুভাকে দেখ। আমরা আসছি।'

বাবলুর আগে ভোম্বলই স্টার্ট দিয়েছে। ঝড়ের চেয়েও দ্রুত গতিতে ছুটে চলল ওরা।

বিলু আতঙ্কিত শুভাকে বলল, 'ব্যাপারটা কী! কীভাবে কী হল?'

ততক্ষণে বেশ কিছু লোকজন জড়ো হয়ে গেছে সেখানে।

শুভা বলল, 'আমরা লঞ্চে গঙ্গা পার হয়ে রামকৃষ্ণপুর ঘাটে এসে একটু সময় এদিক-সেদিক করলাম। তারপর সেরকম পরিবহণ না পেয়ে যখন হাঁটা দেব কিনা ভাবছি তখনই এক ভদ্রমহিলা বললেন, তোমরা আর একটু পথ এগিয়ে যাও, ওখানে গেলে সবকিছুই পাবে। এদিকে এখন রাস্তার কাজ হচ্ছে তো, না হলে সবকিছুই পাওয়া যায় এখানে। তা ওঁর কথামতো আমরা এখানে এসে যখন গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছি ঠিক তখনই

আমাদের সামনে একটা সুমো গাড়ি এসে থামল। তিনজন বলিষ্ঠ চেহারার যুবক গাড়ি থেকে নেমে কারও দিকে না তাকিয়ে একবার এদিক সেদিকে পায়চারি করল। তারপর হঠাৎই ওরা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জোর করে আমাকে টেনে তুলতে গেল গাড়িতে। ওদেরই একজন চেঁচিয়ে বলল, 'আরে পাগলি খুদখুশি করনে কিঁউ আয়ি? চল ঘর চল।'

রাস্তায় তখন পথচারী কয়েকজন দাঁড়িয়ে পড়েছে। তারা ভাবল আমার বাড়ির লোক ওরা। আমি আত্মহত্যা করতে এসেছি। আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি তখন বাঁচাও-বাঁচাও করে প্রাণপণে চিৎকার ও ধস্তাধস্তি করছি তাদের সঙ্গে।

আমার বান্ধবী ক্যামেলিয়া ততক্ষণে বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওদের ওপর। তারপর ক্যারাটের প্যাঁচে ওদের একজনকে ধূলিসাৎ করে মুক্ত করল আমাকে। ততক্ষণে বাকি দু'জন ওকে গাড়িতে তুলে নিয়েই গাড়ি স্টার্ট করে দিল।'

বিলু বলল, 'আমরা এতদিন এ পথে যাতায়াত করছি এমন তো কখনও হয়নি।'

পথচারীদের ভেতর থেকেই একজন বলল, 'কখনও হয়নি বলে যে কোনওদিন হবে না তা তো নয়। আজকাল রাস্তাঘাটে যে কোনও দিন যা হোক কিছু হয়ে যেতে পারে।'

এদিকে বিলুকে শুভার কাছে রেখে বাবলু আর ভোম্বল ঝড়ের গতিতে এগিয়ে খানিক যাবার পরই দেখতে পেল একটি সুমো গাড়ি একপাশে কাত হয়ে আছে। আর দারুণ তেজি এক অষ্টাদশী তরুণী সমানে লড়ে যাচ্ছে ওদের সঙ্গে। তাদেরই ভেতর থেকে একজনের চোখের কোল বেয়ে রক্ত ঝরছে। বাকি দু'জন কিছুতেই আয়ত্তে আনতে পারছে না ওই তরুণীকে।

বাবলু কাছে গিয়েই হেঁকে বলল, 'ভয় নেই। এসে গেছি আমরা।'

ওই দু'জনের একজন তখন রিভলভার তাক করেছে।

বাবলু সে সবের পরোয়া না করে স্কুটার সমেত ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। ভোম্বলও ওইভাবেই চাপা দিয়েছে অপরজনকে। ততক্ষণে প্রথমজনের গুলি ছিটকে লেগেছে দ্বিতীয় জনকে।

তৃতীয়জন তখন ওদের ওই অবস্থা দেখে ভয়ে থর থর করে কাঁপছে।

তরুণী এক লাথিতে তাকে রাস্তায় ফেলে তার বুকের ওপর পা দিয়ে বলল, 'আমি অন্য সব মেয়েদের মতো ভেতো বাঙালিনী নইরে বুদ্ধুলাল, আমি হলাম শেরনি।'

প্রকাশ্য রাস্তায় এমন দৃশ্য দেখে রীতিমতো ভিড় জমে গেছে সেখানে। সম্ভবত কারও ফোনে খবর পেয়ে পুলিসও এসে গেছে তখন।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এখানকার প্রায় সব পুলিসই চেনে। ওদের একজন ইন্সপেক্টর বলল, 'কী ব্যাপার হিরো? এসব কী?'

'দেখছেন তো ব্যাপার। মনে হয় নারী পাচার চক্রের লোক এরা। আমাদের দু'জন মেয়েকে নিয়ে পালাচ্ছিল। ঠিক সময়ে ভাগ্যে এসে পড়েছিলাম। না হলে...।'

'না হলে কী হতো? কিছু হতো না। তোমরা এ বছর দুর্গাপুজো করেছিলে না? ফেসবুকে দেখেছি। মা-ই তোমাদের রক্ষা করেছেন।'

বাবলু বলল, 'আপনি এদের যথাস্থানে নিয়ে গিয়ে জামাই আদর করুন। আমাদের আরও একটি মেয়ে এদের খপ্পর থেকে বেঁচে ওদিকে আছে। আমি পরে গিয়ে দেখা করব আপনার সঙ্গে। অবশ্যই মি. বর্মণকে সব জানিয়ে।'

বাবলু তরুণীকে ওর স্কুটারের পিছনে বসিয়ে ভোম্বলকে নিয়ে সেই জায়গায় এল।

শুভা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল তরুণীকে। বলল, 'ক্যামেলিয়া তুই কী করে মুক্তি পেলি ওদের খপ্পর থেকে?'

তরুণীর নাম ক্যামেলিয়া। বলল, 'আমি তো ওদের হাত থেকে মুক্তি পাইনি। তোকে উদ্ধার করে নিজেই ওদের হাত মুচড়ে আরও শিক্ষা দেব বলে যখন টানাহেঁচড়া করছি তখনই ওরা গাড়ি স্টার্ট করে দিল। যে লোকটা গাড়ি চালাচ্ছিল সে তখন ওই অবস্থায় গাড়ির ব্যালান্স রাখতে পারছিল না। আমি তখন ওদের সঙ্গে লড়তে লড়তেই পিছনদিক দিয়ে লোকটার চোখে একটা খোঁচা দিই। তাতেই গাড়িটা কাত হয়ে রাস্তার ধারে চলে গেল। এখন তো সুবিধেই হল আমার। আমি একা, ওরা তিনজন। তারপর যা হল তা তো তোমার এই বন্ধুরাই জানে।'

বাবলু বলল, 'ঠিক আছে ওসব মন থেকে মুছে ফেলো এবার। এখন ঘরে চলো সবাই।'

অতএব যুদ্ধ জয় করে প্রত্যাবর্তন।

॥ চার ॥

মিনিট দশেকের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছল ওরা। বাবলুর মা এসে হাসিমুখ করে তাকালেন দু'জনের দিকে। বললেন, 'তোমরা হঠাৎ রামকৃষ্ণপুরের লঞ্চঘাট দিয়ে এলে কেন মা?'

ক্যামেলিয়া বলল, 'ভাগ্যে এলাম। ফলে যা অভিজ্ঞতা হল আমাদের।'

মা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'কেন কী হল?'

বাবলু বলল, 'সব বলব। ওরা একটু ফ্রেস হয়ে নিক।'

পঞ্চু এতক্ষণ কোথায় ছিল কে জানে? ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে দ্রুত ঘরে এসে ঢুকল। তারপর দারুণ আনন্দে লুটোপুটি খেতে লাগল শুভার পায়ে। ঘন ঘন পা দুটো শুঁকতে লাগল ক্যামেলিয়ার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জমে উঠল আসর। খবর পেয়ে সুকন্যাও এসে পড়েছে তখন।

ওর সাহায্যে মা অনেক জলখাবার নিয়ে এলেন সকলের জন্য। তারপর নবাগতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার নাম কী মা?'

মৃদু হেসে ক্যামেলিয়া বলল, 'আমি ক্যামেলিয়া সেন। শ্যামবাজারে থাকি। শুভলক্ষ্মী, মানে আপনাদের শুভা আমার দীর্ঘদিনের বান্ধবী। ওর মুখে যখনই শুনলাম পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছে, শুধু পরিচয় নয় একেবারে আত্মীয়তা হয়েছে তখন আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না। ওর সঙ্গ নিয়ে চলে এলাম।'

'তা যদি হয় তাহলে পুজোর সময় এলে না কেন তুমি?'

'আমি আলিপুরদুয়ারে ছিলাম। কাল ওদের বাড়িতে এসে যেই শুনেছি তখনই এখানে আসার পরিকল্পনা করলাম।'

বাবলু বলল, 'সকলের কৌতূহল মেটাতে বাকিটা আমি বলছি।' বলে আগাগোড়া সব কথা সবিস্তারে শুনিয়ে দিল সবাইকে।

মা শিউরে উঠে বললেন, 'মা গো! এইটুকু সময়ের মধ্যে এত কাণ্ড!'

বাচ্চু-বিচ্ছু একেবারেই নির্বাক।

মা বললেন, 'যা হবার হয়েছে। ভগবান রক্ষে যে ওরা তোমাদের তুলে নিয়ে যায়নি। এখন আর কথা না বলে এগুলো খেয়ে নাও।'

চা-পর্ব শেষ হলে বাবলু বলল, 'এই ঘটনার পর আমার একবার থানায় যাওয়া উচিত।' বলেই উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ভোম্বল তুইও চল আমার সঙ্গে।'

ভোম্বল বলল, 'সে তো যাবই।'

বিলু বলল, 'তাহলে আমিই বা ঘরে থাকি কেন?'

এমন সময় লোকাল থানা থেকেই ফোন এল মিঃ বর্মণের।

বাবলু ফোন ধরেই বলল, 'নমস্কার স্যার, আমরা এখনই যাচ্ছিলাম আপনার ওখানে।'

'এখন নয়। আমি সব শুনেছি, শুনেই ফোন করছি। দুপুর অথবা বিকেলের দিকে আমরাই যাচ্ছি তোমাদের ওখানে। খবর যা শুনলাম তাতে জাল এদের বহুদূর।'

বাবলু বলল, 'ভালোই হল। চলো, আমরা বরং ঘরে বসেই গল্প করি।'

এমন সময় হঠাৎই কী যেন মনে পড়ায় 'মাই গড' বলে উঠে দাঁড়াল ক্যামেলিয়া।

বাবলু বলল, 'কী হল?'

'উত্তেজনার বশে মস্ত একটা ভুল করে ফেলেছি আমি।

প্লিজ, তোমাদের যে কেউ একজন এখনই আমাকে নিয়ে চলো স্পটে। সঙ্গে পঞ্চুকেও নিও। একটুও দেরি কোরো না।'

কেন, কী বৃত্তান্ত কিছুই জানতে চাইল না কেউ। ওরা বুঝে গেছে কোনও একটা গোপন রহস্য নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে ওখানে। তাই মুহূর্তের মধ্যে তৈরি হয়ে নিল সবাই। পঞ্চুকে সঙ্গে নিল। শুধুমাত্র শুভা ও বাচ্চু-বিচ্ছু রইল ঘরে।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এখান থেকে ফরশোর রোডের সেই জায়গাটা বেশি দূরে নয়। ঘটনাস্থলে গিয়েই ব্রেক কষল সকলে।

ক্যামেলিয়া স্কুটার থেকে নেমেই ছুটে গেল সেই গাড়িটা যেখানে কাত হয়েছিল সেখানে। গাড়ি তখন সরিয়ে নিয়ে গেছে পুলিসের লোকেরা। ক্যামেলিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক সেদিক ঘুরে হন্যে হয়ে কী যেন খুঁজতে লাগল।

পঞ্চুও তখন বুঝে গেছে ব্যাপারটা। তাই সেও ক্ষিপ্র গতিতে মাটির গন্ধ শুঁকে ছুটোছুটি করতে লাগল চারদিকে। হঠাৎই পাশের কাঁটাঝোপের ভেতর থেকে বের করে নিয়ে এল একটা অ্যাটাচি।

ক্যামেলিয়া সেটা হাতে নিয়ে জড়িয়ে ধরল পঞ্চুকে।

বাবলুরাও ছুটে গেল। বলল, 'কী এটা?'

ক্যামেলিয়া বলল, 'দেখতেই তো পাচ্ছো। ওই তিন দুষ্কৃতীর একজনের হাতে এটা ছিল। আমার সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় আমি দেখেছি। পরে তোমরা এসে স্কুটার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেই একজনের হাত থেকে ছিটকে পড়ে এটা। আমি নজরে রেখেছিলাম। পরে লোকজন পুলিস এসে পড়ায় ভুলে গিয়েছিলাম এটার কথা। নিশ্চয়ই এর মধ্যে ওদের গোপনীয় অনেক কিছুই আছে। এরমধ্যে তল্লাশি করলেই ওদের ঠেক যে কোথায় তা হয়তো আমরা জানতে পারব। পুলিস ওদের কতদূর কী করবে তা জানি না। তবে আমি ওদের সর্বনাশ ঘনিয়ে আনব। আশা করি তোমরা আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে।'

বাবলু বলল, 'নিশ্চয়ই করব। আমরা এতদিন ধরে এত অভিযান করেছি, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরস্ত্র কোনও মেয়ে যে স্বেচ্ছায় নিজের জীবন বিপন্ন করে এইভাবে দুষ্কৃতীদের গাড়িতে চড়াও হয় এমন আমরা প্রথম দেখলাম।' তারপর আবার বলল, 'তোমার সঙ্গে তো আজই প্রথম পরিচয়। ওরা আমাদের শুভলক্ষ্মীকে অপহরণ করতে চেয়েছিল। শুধুমাত্র তোমার জন্যই তা পারেনি তাই তোমার হাতে হাত মিলিয়ে আমরাও প্রাণপণে ওদের সঙ্গে লড়ে যাব কথা দিলাম।'

এরপর আর কোনওদিকে না তাকিয়ে সোজা বাড়ি চলে এল ওরা।

পঞ্চু সবার আগে নেমে ভৌ ভৌ ডাক দিয়ে ওরা যে কাজ হাসিল করে ফিরে এসেছে সে কথা জানিয়ে দিল সকলকে।

অ্যাটাচিটা বিলুর হাতে ছিল। ও সেটা ক্যামেলিয়াকে দিলে শুভা হাত বাড়িয়ে নিল। তারপর বলল, 'কার এটা?'

'আমার নয়। ওই শয়তানদের। আমার সঙ্গে লড়াইয়ের সময় ওদেরই একজনের হাত থেকে ছিটকে পড়েছিল। যাইহোক, এটা একটু নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখা যাক। এর লক খুলে ভেতরে কী আছে দেখে তবেই পুলিসকে দেব।'

একটু পরে মা চা নিয়ে এলে শুভা বলল, 'ভেবেছিলাম তোমাদের সঙ্গে দেখা করে আজ বিকেলেই চলে যাব কিন্তু এখন যা হল তার পরে আজ আর যাওয়ার কোনও ব্যাপার নেই।'

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, 'সুকন্যাকেও খবর দিয়ে ডাকিয়ে আনব আমাদের ওখানে। সবাই একসঙ্গে গল্পে-গানে কাটাব।'

বিলু বলল, 'ওই অ্যাটাচির ভেতর কী আছে খুলে দেখবি নাকি এবার?'

ক্যামেলিয়া বলল, 'না না, এখন নয়। খাওয়াদাওয়ার পর একজোট হয়ে বসে তারপর। মনে হচ্ছে অনেক গোপন তথ্য জমা আছে ওটার ভেতর। সেই সঙ্গে আরও মনে হচ্ছে এরা যে শুধু বদ মতলবি তা নয়। আসলে এরা কোনও শিশু ও মেয়ে পাচারকারী দল।'

বাবলু বলল, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে। নাহলে প্রকাশ্য দিবালোকে এত সাহস ওদের হয় কী করে?'

বিলু বলল, 'আচ্ছা, লঞ্চঘাট থেকেই ওরা তোমাদের ফলো করেনি তো?'

শুভা বলল, 'না। সেখানে লোকজন খুব কম ছিল। তার ওপর রাস্তার কাজের জন্য গাড়ি নিয়ে যাওয়াও সম্ভব ছিল না ওদের পক্ষে। মনে হয় এই দলটা পথে পথে ঘুরেই পছন্দসই কাউকে বাগে পেলে অপহরণ করে।'

ক্যামেলিয়া বলল, 'ঠিক তাই। সেজন্য দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ করেই আমরা ওদের নজরে এসে পড়ায় কোনওরকম দ্বিধা না করেই শুভাকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করে ওরা। কিন্তু আমি যে কালান্তক যম হয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব সেটা ওরা কল্পনাও করেনি।'

ভোম্বল বলল, 'কী সাহস তোমার। কিন্তু ওই সময় যদি তুমি ওদের শক্তির সঙ্গে পেরে না উঠতে তাহলে?'

ক্যামেলিয়া হেসে বলল, 'তাহলে আত্মরক্ষার জন্য যা করা উচিত তাই করতাম।' বলার সঙ্গে সঙ্গেই ওর হাতে শোভা পেল চকচকে ঝকঝকে একটা দোনলা রিভলভার।

ক্যামেলিয়ার মতো একটি মেয়ের হাতে ও জিনিস দেখে চমকে উঠল সকলে।

'ও একজন আর্মি অফিসারের মেয়ে। জন্ম দেরাদুনে। ওয়েট লিফটিং থেকে পর্বতারোহণ সবেতেই ও অদ্বিতীয়। তবে শিক্ষা-দীক্ষা যা কিছু তা কলকাতাতেই। কলকাতার প্রেসিডেন্সিতে পড়ার সময় থেকেই ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। মেয়ে হিসেবেও ও কিন্তু খুব ভালো।'

শুভা বলল, 'যাক যা হবার তা হয়ে গেছে। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। এখন এই ঘরে বসে সময় নষ্ট না করে চলো সবাই বাগানে যাই। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সেই বিখ্যাত মিত্তিরদের বাগানে।'

শুনেই উঠে বসল ক্যামেলিয়া। বলল, 'হ্যাঁ, তাই তো ভুলেই গিয়েছিলাম বাগানে যাওয়ার কথা। সেই ভাঙা বাড়ি, সেই গুলঞ্চগাছ— চলো চলো। আর দেরি নয়।'

অতএব পঞ্চুকে একটা হাঁক দিয়ে সবাই চলল বাগানের দিকে।

খানিক যাওয়ার পরই দেখা গেল সুকন্যাও হন্তদন্ত হয়ে আসছে ওদের দিকে। কাছে এসেই বলল, 'সত্যি, অনেক দেরি করে ফেললাম। তবে একেবারেই হাতের কাজগুলো সব সেরে এসেছি।'

এরপর বাগানে গিয়ে সবাই মিলে ঘুরে বেড়াল চারদিক। পাণ্ডব গোয়েন্দারা অনেক যত্ন করে চারদিকে অনেক ভালো ভালো ফুলের গাছ বসিয়ে বাগান সাজিয়ে রাখলেও বহু জায়গা এখনও ঝোপ-জঙ্গলে ভরে আছে। তাই দেখে ক্যামেলিয়া বলল, 'এই যে এত বড় বাগানটা, কোনও প্রমোটার এখানে থাবা বসাতে আসেনি?'

বাবলু বলল, 'আগে দু'একবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বিশেষ কোনও সুবিধে করতে পারেনি। তার ওপর আমাদের সঙ্গে পুলিস-যোগ থাকায় উৎসাহ হারিয়েছে সবাই।'

এমন সময় বাবলুর মোবাইলটা বেজে উঠতেই শুভা বলল, 'আগে ফোনটা ধরো।'

বাবলু ফোন ধরে হ্যালো করতেই মিঃ বর্মণ বললেন, 'তখন আমি তোমাদের আসতে না করেছিলাম। কিন্তু কেসটা এমন জটিল হয়ে গেছে যে আসতেই হবে তোমাদের। আমি গেলে হবে না। কিছু মনে কোরো না, তোমরাই এসো।'

বাবলু বলল, 'না না। আপনি বলেছিলেন তাই, নাহলে আমরাই তো যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম।'

'ঠিক সন্ধের মুখে চলে এসো। সঙ্গে মেয়ে দু'জনকেও নিয়ে আসবে।'

বাবলু বলল, 'সবাই যাব আমরা। ওই দুষ্কৃতীদের কঠোর শাস্তি চাই।

'তোমাদের মুখে আগে সব শুনি, তবে তো।'

বাবলু ফোন রেখে বলল, 'বাগানে ঘোরা এখনকার মতো বন্ধ থাক। চলো সবাই ঘরে গিয়ে স্নান খাওয়ার পাট চুকিয়ে নিই। তারপর দেখি ওই অ্যাটাচিতে কী আছে।'

অতএব সবাই বাড়ি ফিরে এল। ঘড়ির কাঁটায় বেলা তখন বারোটা।

বাগান থেকে বেরিয়ে সবাই যে যার বাড়ির দিকে রওনা হল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছু সবাই। সুকন্যা, শুভা ও ক্যামেলিয়াকে নিয়ে বাবলু এল ওদের বাড়িতে। আর পঞ্চু ঘরে না গিয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এখন অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি সময়। তাই বাতাসে অল্প শীতের আমেজ বোঝা যাচ্ছে। চমৎকার আবহাওয়া বলা যেতে পারে।

বাবলুরা ঘরে এসে এক এক করে স্নানের পাট চুকিয়ে নিল। সুকন্যা বাড়িতেই স্নান করে এসেছিল। তাই তার আর স্নানের প্রয়োজন হল না।

মা সবাইকে খাওয়ার কথা বলেছিলেন। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছু ফিরে এল। শুরু হল আনন্দভোজ।

একসময় খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ হলে ওরা সেই অ্যাটাচিটা নিয়ে পড়ল। কী আছে এর ভেতরে সেটা তো জানতেই হবে ওদের। ভোম্বল এখানে আসার সময় বেশ কয়েকটা চাবি ও বাঁকানো পেরেক সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল তাই সবার আগে ও নিজেই হাত পেতে নিল সেটা।

দুষ্কৃতীদের হাত থেকে ছিটকে পড়ার ফলে ইটের ঘা লেগে সেটা একটু ড্যামেজ হয়েছিল, তাই একটা চাবি নিয়ে দু'একবার ঘোরাতেই খুলে গেল সেটা। ভেতরে অনেক কাগজপত্তরের মধ্যে ছবি সহ চারটে নামও পাওয়া গেল। নামগুলো হল পাপ্পু ডেক্কা (ভাকরা), নাহান শেরা (নাঙ্গাল), ভীরা সিং (জলন্ধর), হানিপ্রীত (লুধিয়ানা)। সেই সঙ্গে পাওয়া গেল একডজন ছেলে ও মেয়ের ছবি। মেয়েদের সংখ্যা নয়। আর ছেলে তিনজন। ছেলেগুলোর বয়স দশ-বারো বছরের বেশি নয়। মেয়েরা ষোড়শী কি অষ্টাদশী। রীতিমতো সুন্দরী ও লাবণ্যবতী। এছাড়াও বিভিন্ন নির্দেশিকা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্তর। যেগুলো কিছুটা হিন্দিতে ও কিছুটা ইংরেজিতে।

শুভা বলল, 'কিছু কি বুঝলে?'

বাবলু ক্যামেলিয়ার দিকে তাকালে ক্যামেলিয়া বলল, 'আমাদের এই অপহরণকারী দলের দুষ্কৃতীদের যে তিনজন তাদের একজনও কিন্তু এরা নয়। তাহলে ওই চারজন কারা?'

বিলু বলল, 'কারা আবার? এদের লিডার। এরা ছলেবলে কৌশলে অথবা অসতর্কতায় ছেলেমেয়েদের ধরে এনে মোটা টাকার বিনিময়ে ওদের হাতে তুলে দেয়।'

বাবলু বলল, 'বিলুর অনুমানই ঠিক। এই কিডন্যাপাররা সম্ভবত এখানকারই। ছবিতে যে মেয়েরা আছে মুখ দেখে মনে হল ওই ন'জন মেয়ের মধ্যে দু'জনই বাঙালি, তিনজন বিহারি। ছেলে তিনটিও বাঙালি বলেই মনে হয়।'

শুভা বলল, 'অথচ ওই তিনজন ছাড়া গাড়িতে কিন্তু আর কেউ ছিল না। ওরা তাহলে আসছিল কোথা থেকে, যাচ্ছিলই বা কোথায়?'

ভোম্বল বলল, 'মনে হয় সালকিয়া অথবা গোলাবাড়ি অঞ্চল থেকে শিবপুরের দিকে যাচ্ছিল ওরা।'

বিচ্ছু বলল, 'আমার মনে হয় ওরা শালিমারের দিকে যাচ্ছিল। ওদের তিনজনই ননবেঙ্গলি তো? কাজ হাসিল করে ওরা নিজেদের ডেরায় ফিরছিল।'

বাবলু বলল, 'বিচ্ছুর অনুমান ঠিক।' বলে আবার অ্যাটাচির কাগজপত্তরগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়েই দেখল বান্ডিল বান্ডিল চকচকে নোট বিছানো আছে ওইসব কাগজপত্তরগুলোর তলায়।

ক্যামেলিয়া বলল, 'তাহলে বোঝাই যাচ্ছে দুষ্কৃতীরা ওদের কাজ হাসিল করে ইনাম নিয়ে ডেরায় ফিরছিল।'

সুকন্যা এতক্ষণে কথা বলল, 'আমার কিন্তু তা মনে হয় না। ছেলেমেয়ে অপহরণ করে সালকিয়া বা গোলাবাড়ির দিকে ওরা কখনওই যাবে না। গোলাবাড়ি থানার পুলিসের এই সমস্ত ক্রিমিন্যালদের দিকে কড়া নজর। আর এখানকার সিটি পুলিসও দারুণ সতর্ক। ওরা নির্ঘাত শালিমার ইয়ার্ডের দিকে কোনও গোপন ডেরায় ছেলেমেয়েগুলোকে গুম করে রাখে। না হলে ক্যামেলিয়াকে নিয়ে ফরশোর রোড থেকে ওরা ওইদিকের রাস্তা ধরল কেন?

বাচ্চু বলল, 'যথার্থই।'

বিলু বলল, 'এখন আর এসব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আমরা মিঃ বর্মণের সঙ্গে দেখা করে আমাদের দিক থেকে যা বলবার বলে অ্যাটাচিটা ওঁর হাতে তুলে দিই। এরপর পুলিস যা করবার তদন্তের মাধ্যমে করুক।'

বিলুর কথায় সবাই একমত হলে নির্দিষ্ট সময়ে ওরা থানার দিকে রওনা হল।

থানার সবাই ওদের পরিচিত। তাই হেসে ওসির ঘরে যাবার নির্দেশ দিল।

মিস্টার বর্মণ বললেন, 'এসেছ? বসো সবাই। মিঃ তালুকদার এলেন বলে। ঘটনাটা হয়েছে ওঁদের এলাকায়। উনিও চেনেন তোমাদের। যাইহোক, দারুণ একটা দুষ্টচক্রের মৌচাকে হাত দিয়ে ফেলেছ তোমরা।'

বলতে বলতেই মিঃ তালুকদার এসে পড়লেন। উনিও চিনতেন বাবলুদের। তাই বাবলুর পিঠ চাপড়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন।

সঙ্গে সঙ্গে চা এল। সবার জন্যই এল।

চা খেতে খেতেই মিঃ বর্মণ বাবলুকে বললেন, 'নাও এবার তোমাদের ঘটনাটা আগাগোড়া খুলে বলো তো দেখি?'

বাবলু সবিস্তারে সব বললে তালুকদার বললেন, 'কই,

আমার সেই মা'কে একবার দেখি তো যে কিনা ওই দুষ্কৃতীদের সঙ্গে একা ওইভাবে লড়ে গিয়েছিল।'

শুভা ও ক্যামেলিয়া দু'জনেই এগিয়ে গেল।

শুভা ক্যামেলিয়াকে দেখিয়ে বলল, 'ও ঝাঁপিয়ে না পড়লে আমি নিজেকে বাঁচাতে পারতাম না।'

তালুকদার এবং মিঃ বর্মণ দু'জনেই ওদের ছবি তুলে নিলেন। তারপর একটু সময় চুপ থেকে বললেন, 'যে তিন দুষ্কৃতী ওদের কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল, অত্যন্ত দাগি আসামি ওরা। আর যে গাড়িটা ব্যবহার করেছিল সেটি হল মোহন শ্রীবাস্তব নামে এক ব্যবসায়ীর। গাড়িটি আমরা উদ্ধার করার পর মালিকের হাতে পৌঁছে দিয়েছি।'

বাবলু বলল, 'আর ওই তিন দুষ্কৃতী?'

'ওদের মধ্যে গুলিবিদ্ধ রাকেশ শর্মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথেই মারা যায়। ওর বাড়ি ভাটপাড়ায়। দ্বিতীয়জন তোমাদের মোটর বাইকের ধাক্কায় আহত। নাম যোগীন্দর। সে এখন থানার লক-আপে। আর তৃতীয়জন পলাতক। অঞ্চলে সে সুকুলজি নামে পরিচিত। উত্তরপ্রদেশের বেরিলির লোক।'

বাবলু বলল, 'স্ট্রেঞ্জ! অমন একজন দুষ্কৃতী পুলিসের হাত থেকে পালায় কী করে?'

তালুকদার হেসে বললেন, 'পুলিস ভগবান নয় বলে।' তারপর বললেন, 'আমরা যখন গুলিবিদ্ধ রাকেশ শর্মাকে নিয়ে ব্যস্ত সেই সময়েই কাত হয়ে থাকা গাড়িটাকে সোজা করতে গিয়ে গাড়ি নিয়েই পালায় ও। পরে কিছু দূর গিয়ে গাড়ি ফেলে রেখে জনারণ্যে হারিয়ে যায়। তবে ধরা ও পড়বেই। কেননা ওর চোখে আঙুলের খোঁচা লাগার ফলে কোনও না কোনও চোখের ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে ওকে। তখনই ধরা পড়বে ও।'

বিলু জিজ্ঞেস করল, 'যোগীন্দর নামে যে লোকটি লক-আপে আছে ওর ঠেক কোথায় জানা গেছে?'

'অবশ্যই। সুকুলজি আর ও দু'জনেই এখন জগদ্দলে থাকে। তবে যোগীন্দরের বাড়ি পাঞ্জাবের লুধিয়ানায়।'

বাবলু আর কোনও প্রশ্ন না করে মিঃ তালুকদার ও মিঃ বর্মণকে বলল, 'স্যার! আমরা কি একবার আপনাদের থানায় গিয়ে ওই যোগীন্দর দুষ্কৃতীটার সঙ্গে দেখা করতে পারি? সঙ্গে মোটর বাইক আছে আমাদের। কোনও অসুবিধে হবে না।'

তালুকদার বললেন, 'নিশ্চয়ই পারো। কেসটা তো তোমাদেরই।'

অতএব সবাই চলল থানার দিকে। মিঃ বর্মণও চললেন। ওখানকার থানার লক-আপের কাছে যেতেই বন্দি যোগীন্দর ঝাঁপিয়ে পড়ল লক-আপের কোলাপসিবল গেটে। প্রথমেই রুদ্রমূর্তিতে শুভাকে দেখল। তারপর ক্যামেলিয়াকে দেখে থুঃ করে একটু থুতু ছেটাল।

বাবলু মেয়েদের সরিয়ে কাছে যেতেই চিৎকার করে উঠল যোগীন্দর, 'তুঝে ইয়াদ রাখুঙ্গা।'

বাবলু হো হো করে হেসে বলল, 'শোলের এইসব ডায়লগ একেবারেই বস্তাপচা হয়ে গেছে যোগীন্দর ভাই। এখন বলো যেসব মেয়েদের বা ছোট বাচ্চাদের তোমরা কিডন্যাপ করে পাচার করবার জন্য তুলে নিয়ে যাও তাদের খোঁয়ারটা এখানে কোথায়? শালিমার রেল ইয়ার্ডের আশপাশে না আরও দূরে কোথাও?'

যোগীন্দর চোখ লাল করে বলল, 'এই শয়তান, মুখ সামালকে কথা বলবি আমার সঙ্গে।'

বাবলু বলল, 'অনেকদিন তো এ দেশে আছ। মনে হচ্ছে। এখনও হিন্দি বাংলা জট পাকাচ্ছ কেন? যে কোনও একটা ভাষায় কথা বলো। আমরা ঠিক বুঝে নেব। এখন বলো এদিককার ঠেক কোথায়?'

'আমরা এদিকে আসিই না।'

দু'জন কনস্টেবল কাছেই দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। তারা বলল, 'কে বলেছে? আমরা তো প্রায়ই তোমাদের দেখি এ পথে যাতায়াত করতে।'

গর্জে উঠল যোগীন্দর, 'মিথ্যে কথা।'

একজন হেভিওয়েটের ইন্সপেক্টর রুল হাতে এগিয়ে এলেন এবার। বললেন, 'পুলিস সচরাচর কাউকে মারে না। খারাপ কাজ করতে গিয়ে তোমারই রিভলভারের গুলিতে একজন মারা যাওয়ার পরও এত গলাবাজি কেন? এই মেয়েটাকে গাড়িতে উঠিয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে তোমরা?'

'বলব না।'

'কিন্তু মিস্টার রামমূর্তি তো সব ফাঁস করে দিয়েছেন।'

চিৎকার করে উঠল যোগীন্দর, 'ইয়ে হো নেহি সকতা।'

'এমনটাই হয়েছে। মৃত রাকেশ শর্মার পকেটে যে মোবাইলটা ছিল তা থেকেই খোঁজ পাওয়া গেছে ওই রামমূর্তির। উনি ওনার সব দোষ স্বীকার করেছেন এবং এও বলেছেন, তিন কিশোরী এখনও ওদের জিম্মাতেই রয়েছে। তাদের নিয়ে আসার জন্য আমরা রওনা দিচ্ছি এবার।'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন যাকে টানতে টানতে নিয়ে আসা হল সে হল সেই পলাতক সুকুলজি। পুলিসের অনুমানই ঠিক। চোখ দেখাতে গিয়েই ধরা পড়েছে সে। তার ডানদিকের জখম চোখে ব্যান্ডেজ। তাকে লক-আপে ঢোকানোর আগেই সে বলল, 'আমিও আমার অপরাধ স্বীকার করছি স্যার। আমরা মাঝেমধ্যেই এই কাজ করে থাকি। তারপর শালিমারে গঙ্গার ধারে একটি পরিত্যক্ত গুদামে তাদের বন্দি করে রাখি। এ কাজের দায়িত্বে আছেন ওই রামমূর্তিজি।

যোগীন্দর আর কোনওরকম ফোঁসফোঁসানি না করে মাথা হেঁট করল এবার।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাবলু ক্যামেলিয়ার হাত থেকে অ্যাটাচিটা নিয়ে মিঃ বর্মণের হাতে দিয়ে বলল, 'যোগীন্দর নামে এই দুষ্কৃতীর কাছে এটা ছিল। ক্যামেলিয়া উদ্ধার করেছে এটা। আমাদের পঞ্চুও হেল্প করেছে ওকে।' বলে কীভাবে উদ্ধার হল সেই বৃত্তান্তও শোনাল।

মিঃ তালুকদার ও বর্মণ অ্যাটাচি খুলেই চোখ কপালে ওঠালেন। সেই একডজন ছেলেমেয়ের ছবি দেখেই বুঝলেন নিশ্চয়ই এদেরকে এরা কিডন্যাপ করে পাচার করেছে। তারপর টাকার ভাগ নিয়ে এসেছে এদিকে।

মিঃ বর্মণ এবার সেইসব ছবি যোগীন্দর ও সুকুলজিকে দেখিয়ে বললেন, 'এরা কারা? এদের ছবি এখানে কেন? আর ওই পাপ্পু ডেক্কা, নাহান শেরা, ভীরা সিং, হানিপ্রীতই বা কোথায়?'

যোগীন্দর বলল, 'মালুম নেহি। হম দোনোনে শ্রিফ রামমূর্তিজি কো পয়চান্তা।'

'এই অ্যাটাচিতে যেসব কাগজপত্তর টাকা ফোটো ছবি আছে এগুলো কোথা থেকে নিয়ে আসছিলে তোমরা?'

সুকুলজি বলল, 'আমরা দু'জনেই জগদ্দলে থাকলেও কাল রাতে আমরা হাওড়ার ঘুসুড়িতে ছিলাম। সেখানেই জলন্ধর থেকে ভীরা সিং-এর দু'জন লোক এসে এই অ্যাটাচি আমাদের দিয়ে যায় শালিমারে রামমূর্তিজির কাছে পৌঁছে দেবার জন্য।'

'এই অ্যাটাচির মধ্যে যে সব মেয়ে বা ছেলের ছবি রয়েছে এরা কোথাকার?'

যোগীন্দর হুঙ্কার করে উঠল, 'সুকুলজি!'

সুকুলজি বলল, 'ধরা যখন পড়েছি তখন আর ধমক দিয়ে কোনও লাভ নেই। সব সত্য স্বীকার করে জেলে গিয়ে দিন কাটাই চল।' তারপর বলল, 'এই সব মেয়েদের আমরা আগেই পাচার করেছি। গঙ্গার জোয়ারে গুদামে জল ঢুকে পড়ায় ছেলে তিনটি কীভাবে যেন পালিয়েছে। আর ওই যে তিন কিশোরী মেয়ের কথা বললেন, ওদের আগেরবার নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কেননা একসঙ্গে পাঁচ ছ'জনের বেশি কাউকে নিয়ে যাওয়া তো সম্ভব হয় না, তাই ভবিষ্যতের জন্য রয়ে গিয়েছিল ওরা।'

মিঃ বর্মণ বললেন, 'তা হঠাৎ এমন দয়ালু হয়ে রামমূর্তিজি মেয়েগুলোকে ছেড়ে দিতে চাইছেন কেন?'

'বাধ্য হয়ে। ওই পলাতক ছেলেদের বাড়ির লোকেরা যে ইতিমধ্যে থানা-পুলিস করবে না বা এখানকার ঘাঁটি চিনিয়ে দেবে না তাই বা কে জানে? তার ওপর আমাদের ব্যাপারটাও জানাজানি হয়ে গেছে। তাই ওই জায়গাটা তো আর ওদের কাছে নিরাপদ নেই। অতএব বাধ্য হয়েই—।'

মিঃ বর্মণ বললেন, 'ঠিক আছে। বিশ্বাস করলাম তোমার কথা। এখন চলো একবার স্পটে যাই। সত্যি সত্যিই যদি তিনটি মেয়েকে মুক্তি দেয় ওরা, তাদের অন্তত রক্ষা করতে পারব।'

বাবলু বলল, 'আমরাও যাব। দেখে আসব ওদের সেই গোপন ডেরাটা।'

মিঃ তালুকদারের নির্দেশে যোগীন্দর ও সুকুলজিকে হাতে হাতকড়া পরিয়ে পুলিস ভ্যানে ওঠানো হল। মিঃ বর্মণ ও তালুকদার একটা জিপে বসলেন।

বাবলু মেয়েদের সবাইকে বাড়ি ফিরতে বলে ওঁদের অনুসরণ করল। ততক্ষণে সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

শালিমারের রেল ইয়ার্ড ছাড়িয়ে কিছুটা পথ যেতেই যোগীন্দর বলল, 'গাড়ি হিঁয়া রুখ দিজিয়ে।'

ওরা সবাই তখন সশস্ত্র পুলিস বাহিনী নিয়ে গাড়ি থেকে নামল।

সুকুলজি বলল, 'ওই আমাদের ঘাঁটি। ওখান থেকেই সবাইকে পাচার করা হয়।'

যোগীন্দর বলল, 'আগে বাড়িয়ে।'

আলো অন্ধকারে পুলিসের লোকেরা কয়েক পা এগতেই দেখতে পেল তিন কিশোরী কন্যা মুক্তি পেয়ে দ্রুত ওদের দিকে ছুটে আসছে। তাই দেখে কয়েকজন কনস্টেবল এগিয়ে গেল ওদের নিয়ে আসতে। আর ঠিক তখনই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে সেই গোপন গুদাম ঘরটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল গঙ্গার গর্ভে। সবার নজর যখন ওদিকে, এদিকেও আচমকা একটা গুলির শব্দ ও তীব্র ধোঁয়ার কুণ্ডলিতে ভরে গেল চারদিক। কার যেন একটা আর্তনাদও শোনা গেল।

ধোঁয়ার হাত থেকে বাঁচতে সবাই তখন পিছিয়ে এল একটু। পরে গঙ্গার হাওয়ায় ধোঁয়া অপসারিত হলে দেখা গেল সুকুলজির প্রাণহীন দেহটা সেখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। আর বন্দি যোগীন্দর আশ্চর্যজনকভাবে উধাও। চোখের

পলককে কীভাবে যে কী হয়ে গেল তা ভেবেও পেল না কেউ।

অতএব আর এখানে সময় নষ্ট করার কোনও প্রয়োজন নেই। সুকুলজির ডেডবডি পাহারায় রেখে থানায় এসে উপস্থিত হলেন সবাই।

এরপর ওই তিন কিশোরীর বাড়ির ঠিকানা জেনে ছবি তুলে মিঃ বর্মণ বাবলুকে বললেন, 'না তোমাদের ওই মেয়ে দুটিকে জড়িয়ে এই কাণ্ড হবে না এরা ফাঁদে পা দেবে। যাইহোক, এই অ্যাটাচির সূত্র ধরেই গ্যাং-কে গ্যাং ধরা পড়বে এবার। আমরা এখনই ঘুসুরির দিকে নজরদারি বাড়াচ্ছি। চারদিকে তল্লাসি চালাচ্ছি। তবে এখানকার ঘাঁটি ধ্বংস হলেও পাঞ্জাব ও হিমাচলেও এইসব ফাইল পত্তরের কপি পাঠিয়ে যোগাযোগ করব ওদের সঙ্গে। আপাতত এই মেয়েদের এখানে না রেখে তোমাদের জিম্মাতেই রেখে দাও। খুব আনন্দ পাবে ওরা। আমরা এদিকের দ্রুত ব্যবস্থা করে পরে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। বেস্ট অব লাক। যাও তোমরা।' তারপর মেয়েদের বললেন, 'আর কোনও ভয় নেই তোমাদের। যে যার বাড়ি ঠিক পৌঁছে যাবে।'

বাবলু বাড়িতে একটা ফোন করেই থানা থেকে সবাইকে নিয়ে বাড়ির দিকে চলল।

ওরা বাড়ি আসতেই সে কী আনন্দ পঞ্চুর। আনন্দের আর এক কারণ ওদের সঙ্গে আসা নবাগতা তিন কিশোরী।

সবাই ঘরে এসে বসলে মা বললেন, 'আগে একটু ফ্রেস হয়ে নাও তোমরা, তারপর ধীরেসুস্থে বলো— কীভাবে কী হল না হল শুনতে হবে তো?'

বাবলু নবাগতাদের বলল, 'একদম লজ্জা করবে না। মনে করবে এটা তোমাদের নিজেদের বাড়ি। এই যে দেখছ শুভাকে। দুষ্কৃতীরা ওকে কিডন্যাপ করতে গিয়েই ক্যামেলিয়ার আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছে। ওর জন্যই মুক্তি পেলে তোমরা। তবে ভাগ্য ভালো যে বেকায়দায় পড়ে ওরা তোমাদেরকেও মেরে ফেলেনি।'

কিছু সময়ের মধ্যেই মেয়েরা সবাই ফ্রেস হয়ে নিল। তারপর ঘরে এসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসলে মা সবার জন্য গরম হালুয়া ও চা নিয়ে এলেন।

পঞ্চদশী সেই তিন কন্যা এবার হালুয়া ও চা-পর্ব শেষ করে ওদের কথা বলতে লাগল। ওরা যা বলল, তা হল এই—

'আমরা তিনজনই আজিমগঞ্জ অঞ্চলের মেয়ে। বেশ কয়েকদিন হল ফাঁদ পেতে অতর্কিতে ধরে এনেছে আমাদের। প্রথমে আমরা ছিলাম নৈহাটির কাছে একজনের বাগানবাড়িতে। সেখানে আমাদের তিনজনেরই একটা করে ছবি তুলে নিল ওরা। এরপর আমাদের নিয়ে এল ঘুসুড়িতে।

বাবলু বলল, 'কী করে জানলে জায়গাটার নাম ঘুসুড়ি?'

'ওদের কথা শুনে জানলাম। ওখানে আরও ছ'জন মেয়ে ছিল। এরা সবাই নন বেঙ্গলি। আজমগড়, বেনারস, ফতেপুর অঞ্চলের মেয়ে। ওরা আমাদের অনেক আগেই এসেছিল। আমরা গোলমাল করার চেষ্টা করলে আমাদের মুখে অ্যাসিড ঢেলে দেবার ভয় দেখাত। তাছাড়াও খাবারের সঙ্গে এমনভাবে ঘুমের ওষুধ দিত যা আমরা টেরও পেতাম না। ওখানে কালোসোনা নামে একজন আমাদের পাহারা দিত। সে বলত, 'ওদের চাহিদামতো টাকা তোদের বাড়ির লোকেরা দিয়ে দিলেই এক এক করে ছেড়ে দেব তোদের। না হলে তিনগুণ টাকায় চালান করে দেব।' তারপর আমাদের

তিনজনকে দেখিয়ে বলত, 'এদের বাড়ির লোকেদের তো সেই সামর্থ্য নেই তাই এদের পাচার করে দেব বাংলাদেশে।'

বাবলু বলল, 'তারপর?'

'তারপর এক রাতে কালোসোনার কাছে ওপর থেকে নির্দেশ আসতেই যোগীন্দর ও সুকুলজি নামে দু'জন এসে আমাদের শালিমারে নিয়ে এল। আমরা সেখানেই বন্দি অবস্থায় ছিলাম।'

'ওরা ওদের কোথায় পাচার করত জানো?'

'না। ওদের সঙ্গে চোখে চোখে ছাড়া কথা বলার সুযোগই পেতাম না আমরা।'

বাবলু বলল, 'জানি না ওই মেয়েরা দুষ্কৃতী চক্রের ফাঁদ থেকে কখনও বেরতে পারবে কিনা, তবে ওই পাপ্পু ডেক্কা, নাহাল শেরা, ভীরা সিং আর হানিপ্রীতকে খুঁজে ঠিক বার করব আমরা। আসলে এদের চক্রেই এইসব হচ্ছে। ভীরা সিং তো জলন্ধরে থাকে। তারই লোক যখন অ্যাটাচিটা পৌঁছে দিয়েছে ওদের হাতে তখন মনে হচ্ছে ভীরা সিংই এদের লিডার।'

বাবলুর কথা শুনে বাচ্চু-বিচ্ছু মুখ খুলল এবার। বলল, 'তবে আমাদের কিন্তু ওই অ্যাটাচিটা পুলিসের হাতে তুলে দেওয়াটা ঠিক হয়নি। ওরা কে কোথায় থাকে বা ওদের দেখতে কেমন তাও তো জানতে পারব না আমরা।'

বিলু বলল, 'তা অবশ্য ঠিক। তবে ওদের ধরার পরিকল্পনা যদি আমরা করি তাহলে পুলিসই আমাদের সাহায্য করবে।'

ক্যামেলিয়া বলল, 'এ নিয়ে তোমরা চিন্তা কোরো না। ওই সব ছেলেমেয়েদের ছবি, শয়তানদের ছবি সবই আমি এক ফাঁকে মোবাইলে বন্দি করে রেখেছি। এই দেখো, এই হল ভীরা সিং (জলন্ধর), হানিপ্রীত (লুধিয়ানা), পাপ্পু ডেক্কা (ভাকড়া), নাহান শেরা (নাঙ্গাল)।'

দারুণ আনন্দে শুভা জড়িয়ে ধরল ক্যামেলিয়াকে।

বাবলু বলল, 'সত্যি, আমরা এতদিনের গোয়েন্দাগিরির পর তোমার মতো একজনকে এই প্রথম দেখলাম।'

মা-ও সব শুনছিলেন ওদের কথা। এবার বললেন, 'হ্যাঁরে, মেয়েগুলোর নাম জেনেছিস?'

ওরা নিজেরাই বলল, 'কনক, শিখা ও মীরা।'

'নাও, এবার রাতের খাওয়া সেরে চুপচাপ শুয়ে পড়ো সবাই।'

অতএব আর দেরি নয়। কোনওরকমে রাতের খাওয়া শেষ করে নিল ওরা।

আগেই ফোনে কথা হয়েছে। তাই পঞ্চুর তত্ত্বাবধানে মেয়েরা সবাই গেল বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়িতে। সুকন্যাও ওর মাকে জানিয়ে দিল রাতে এখানেই সবার সঙ্গে থাকার কথাটা। বিলু, ভোম্বলও বাড়ির দিকেই গেল।

একটু পরে পঞ্চু ফিরে এলে বাবলুও শুয়ে পড়ল একসময়। শুয়ে শুয়ে আরও অনেক রাত পর্যন্ত ভাবতে লাগল এইসব মেয়েদের কথা। শুধু তাই নয়, দেওয়ালে টাঙানো এ বছরের দুর্গা প্রতিমার ছবিতে করজোড়ে প্রণাম জানিয়ে ওইসব অপহৃতা মেয়েরা সবাই যেন দেবীর কৃপায় মুক্তি পায় এমনই প্রার্থনা করল।

এরপর ওর দু'চোখের পাতায় ঘুম নেমে আসতেই থানা থেকে ফোন এল। মিঃ তালুকদার ফোন করেছেন, 'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

'না স্যার, সবে বালিশে মাথা রেখেছি।'

'অন্য থানার মারফত ওই তিন কিশোরীর বাড়ির লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেছে। কাল সকালেই এসে পৌঁছবেন ওরা।'

বাবলু বলল, 'আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।'

'না না এতে ধন্যবাদ জানাবার কিছু নেই। আমরা পুলিসের লোক হলেও আমাদেরও পরিজন আছে। নাও, এবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ো।'

এই সুখবরটা ফোনের মাধ্যমে বাবলু সবাইকে জানিয়ে বালিশে মাথা রেখে দু'চোখের পাতা এক করল।

॥ পাঁচ ॥

পরদিন খুব সকালে মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙল বাবলুর। বলল, 'আরও একটু আগে ডাকতে পারতে। পঞ্চু কই? বিলু, ভোম্বলরা আসেনি?'

মা বললেন, 'পঞ্চু অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে। আর বিলু, ভোম্বলরা মনে হয় মেয়েগুলোকে নিয়ে আসতে বাচ্চু-বিচ্ছুদের ওখানেই গেছে। তুই চট করে মুখ-হাত ধুয়ে ফ্রেস হয়ে নে। চায়ের জল বসিয়েছি।'

বাবলু একটুও বিলম্ব না করে ফ্রেসরুমে গিয়ে তৈরি হয়ে এল।

মা ওর জন্য চা-বিস্কুট নিয়ে এলেন।

চায়ের পাত্রে চুমুক দিয়ে বাবলু বলল, 'কাল রাতে থানা থেকে ফোন এসেছিল।'

'আমি জানি। তুই যখন সবাইকে ফোন করছিলি তখনই শুনেছি। এখন ওরা কখন আসে দেখ।'

মায়ের কথা শেষ হতেই পঞ্চুর ভৌ-ভৌ স্বর শোনা গেল!

মা বললেন, 'নিশ্চয় ওরাই আসছে।'

দরজা খোলা ছিল তাই সবার আগে পঞ্চুই এসে ঘরে ঢুকল। এরপর বিলু, ভোম্বল সহ মেয়েরা সবাই।

মা নবাগতাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের কোনও অসুবিধে হয়নি তো মা?'

মেয়েদের একজন বলল, 'নেহাৎ বাড়ি যেতে হবে তাই। না হলে এইসব বান্ধবীদের ছেড়ে চলে যেতে কি মন চায়? সত্যি কথা বলতে কী আমরা নিজেদের জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। তাই আপনাদের কখনও ভুলব না।'

বাচ্চু-বিচ্ছু এবার বাবলুর মাকে বলল, 'আমরা সবাই কিন্তু আমাদের বাড়ি থেকে ভালোমতো জলযোগ সেরে এসেছি। অতএব শুধু চা ছাড়া আমরা এখন কেউ কিছুই খেতে পারব না। দুপুরে আমাদের জন্য যা ব্যবস্থা করবার তা করবেন।'

মা বললেন, 'বেশ তাই হবে।'

সুকন্যা ওর বাড়িতে একটা ফোন করে মায়ের সঙ্গে চা ডিপার্টমেন্টে ঢুকে পড়ল।

কিছু সময়ের মধ্যেই চা আর কেকের ব্যবস্থাও হয়ে গেল।

ওদের চা পর্ব শেষ হতেই বাড়ি চলে গেল সুকন্যা। কেননা ওরও ঘরের কিছু কাজ তো আছে। নাহলে একা মা ভাইকে নিয়ে ক'দিক সামলাবেন?'

সুকন্যা চলে যাবার পরমুহূর্তেই থানা থেকে ফোন এল, 'মেয়েদের তৈরি থাকতে বলো, ওদের বাড়ির লোকেরা এসে গেছেন।'

সেই তিন কন্যা তখন সবার সঙ্গে করমর্দন করে মায়ের চরণে হাত দিয়ে প্রণাম করল। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গেলেন ওরা।

পুলিসের গাড়ি ছাড়াও একটি টাটা সুমো ছিল। সেই

গাড়িতে ছিলেন ওই তিন কন্যার অভিভাবকরা। তাঁরা এসে সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় নিলেন।

ওরা চলে যাবার পর মিঃ বর্মণ গাড়ি থেকে নামলেন। দু'জন কনস্টেবলের হাতে দায়িত্ব দিয়ে ভেতরে আর একজন যে ছিল তাকে ডাকলেন, 'এবার তুমি গাড়ি থেকে নেমে এসো চাঁপা দেখো তো চিনতে পারো কিনা?'

বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছু শুভা ও ক্যামেলিয়া বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে রইল গাড়ির দিকে।

গাড়ি থেকে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে যে নামল তাকে দেখেই দারুণ উল্লসিত হয়ে ছুটে গেল ক্যামেলিয়া। 'চম্পু তুই!'

চম্পু তখন রুমাল সরিয়েছে। দারুণ আবেগে সেও ক্যামেলিয়াকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'থানায় এসে তোদের ছবি দেখেই তোকে চিনতে পেরেছি। তুই বা তোদের দলের সকলের সাহসিকতার জন্যই আজ আমরা মুক্তি পেলাম।'

'আমরা মানে? আর সব কই?'

মা ততক্ষণে বেরিয়ে এসে দরজার কাছেই ছিলেন। মিঃ বর্মণকে বললেন, 'আপনি ভেতরে আসুন। আপনার মুখেই তো শুনব সব।'

ক্যামেলিয়া তখন ওর আদরের চম্পু বা চম্পার হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেছে।

বাবলু, বিলুও মিঃ বর্মণকে পরম সমাদরে নিয়ে গেল ঘরে। আর ভোম্বল এরই মধ্যে এক ফাঁকে চলে গেছে শিঙাড়া আর জিলিপি কিনতে।

মা দ্রুত গিয়ে চা বসালেন।

সবাই ঘরে এসে বসলে মিঃ বর্মণ বললেন, 'তোমরা তো এ বছর দুর্গাপুজো করেছিলে?'

বাবলু বলল, 'করেছিলাম। তবে ওই যে দেখছেন শুভলক্ষ্মী। ওরই উৎসাহে।'

'সেই মা দুর্গাই দশভুজা হয়ে এই ক্যামেলিয়ার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করলে অসম্ভব সম্ভব হতো না। ওরই কারণে এই দুষ্টচক্রের গ্যাংটা একেবারেই ধ্বংস হয়ে গেল। বিভিন্ন থানার মাধ্যমে রাতারাতি সবকটি দুষ্টচক্রের ঘাঁটি ধ্বংস হয়েছে। আর আশ্চর্যজনকভাবে উদ্ধার করা হয়েছে গার্ডেনরিচ এলাকা থেকে ওইসব মেয়েদের। ওদের মধ্যে থেকে যোগীন্দরকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওকে রাখা হয়েছে কঠোর পুলিসি হেফাজতে। তবে রামমূর্তিজির কোনও খবর নেই। মনে হয় ওই বিস্ফোরণেই প্রাণ হারিয়েছে সেও। তবে বিস্ফোরণ ঘটাল কে বা কারা তা এখনও জানা যায়নি। যাইহোক, থানায় নিয়ে এসে মেয়েদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জানা গেল ওরা সবাই বিহার ও উত্তরপ্রদেশের মেয়ে। আর এই যে চম্পাকে দেখছ ও থাকে বারাণসীর তিলভাণ্ডেশ্বরের গলিতে। ওইসব মেয়েদের প্রত্যেকের বাড়িতে ফোনে খবর দেওয়া হয়েছে। আর এই চম্পা বা চাঁপা আমাদের মোবাইলে তোমাদের ছবি দেখেই চিনতে পারে ক্যামেলিয়াকে। ওরই অনুরোধে ওকে তোমাদের এখানে নিয়ে এলাম। বাকি মেয়েদের রাখা হয়েছে থানার কাছেই। আমাদের এক পরিচিতার বাড়িতে।'

মা ততক্ষণে চা-শিঙাড়া জিলিপি নিয়ে এসেছেন সবার জন্যই। মিঃ বর্মণের মুখে সব শুনে বললেন, 'আপনি ফোনে খবর দিয়ে আমার এখানেই নিয়ে আসতে পারতেন মেয়েদের।'

'আপনার পরিবারের ওপর আর কত উপদ্রব করব বলুন?'

'উপদ্রব কেন? এরাও তো আমার মেয়ে।'

বাবলু বলল, 'ভালোই হয়েছে। পাপ-পুণ্য কী তা জানি না। তবে দৈবী কৃপায় সবাই যে মুক্তি পেয়েছে এটাই আমাদের কাছে অনেক।'

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, 'যে মেয়েরা মুক্তি পেল তাদের ছবিগুলো কি আমাদের মোবাইলে ট্রান্সফার করে দিতে পারেন? ওদের মুখগুলো তাহলে ধরা থাকত আমাদের ক্যামেরায়।'

মিঃ বর্মণ বললেন, 'শুধু ছবি কেন? ওদের নাম-ফোন নম্বর সবই দিয়ে দেব। এখন তাহলে আসি?'

মিঃ বর্মণ বিদায় নিলে আনন্দের ঝড় বয়ে গেল সকলের মনে।

এরপর ওরা দলবদ্ধ হয়েই পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়ে মিত্তিরদের বাগানে গিয়ে হাজির হল। বাগানের পরিবেশ দেখে সে কী আনন্দ চম্পার। ওরা সেই ভাঙা বাড়ির চাতালে গোল হয়ে বসলে চম্পা বলল, 'এর আগে ক্যামেলিয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল দেহরাদুনে। তখন আমরা দু'জনেই ছোট। তারপর ও চলে আসে কলকাতায়। সেখানে ওর সঙ্গে আবারও দেখা হয় বারাণসীর তিলভাণ্ডেশ্বরে। ও থাকত সোনারপুরায়। আমাদের বাড়ি থেকে বেশিদূরের পথ নয়। আমরা রোজ বিকেলে রাণামহলের ঘাটে বসে গল্প করতাম। তারপর দুর্ভাগ্যবশত দুষ্টচক্রের খপ্পরে পড়ে আমি এখানে।'

বাবলু বলল, 'কিন্তু এদের খপ্পরে তুমি পড়লে কী করে?'

'আমাদের এক নিকট আত্মীয়কে স্টেশনে ট্রেনে তুলতে গিয়েই ফেরার পথে অন্ধকারে ওদের খপ্পরে পড়ি। তারপর ওরা আমাকে বা আমার মতো আরও দু'একজনকে অজ্ঞান করিয়ে ট্রাকে শুইয়ে কলকাতায় নিয়ে আসে। সেখান থেকে

শালিমারে। পরে একদিন রাতের অন্ধকারে ছোট স্টিমারে গার্ডেনরিচ অঞ্চলে। তোমাদের এখানকার পুলিস গুলির লড়াই চালিয়ে উদ্ধার করে আমাদের। সেখান থেকে আবার হাওড়ায় নিয়ে এসে আমাদের পরিচয় জেনে প্রত্যেকের বাড়িতে খবর দেয়। তোমরা না থাকলে যে পুলিস আমাদের নাগাল পেত না তাও জানায়। তোমাদের মিঃ বর্মণ হলেন দেবতা সদৃশ মানুষ। তোমাদের ছবিগুলো মোবাইলে দেখাতেই আমি চিনতে পারি ক্যামেলিয়াকে। তখনই ওঁকে বলি আমাকে যেভাবেই হোক ওর কাছে পৌঁছে দিন। উনি আমার কথা রাখলেন। আমার ফোন তো আগেই খুইয়েছি। তাই ওঁর ফোনই আমাকে ব্যবহার করতে দিলেন। কিন্তু ওর নম্বরটা মনে না পড়ায় শুধু চমক দেব বলেই মুখে রুমাল চেপে চলে এলাম। এখানে এসে নিরাপদ একটা আশ্রয় তো পেলামই সেই সঙ্গে ফিরে পেলাম আমার দীর্ঘদিনের বান্ধবীকে।'

সব শুনে দারুণ অভিভূত সকলে।

একটু পরেই মিঃ বর্মণ বাবলুর মোবাইলে ওই মেয়েদের যাবতীয় তথ্য পাঠিয়ে দিলেন।

বাবলু বলল, 'আর নয়, এবার ঘরে চলো। ভালোভাবে স্নানাহার সেরে একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক।'

বাবলুর কথা মেনে পঞ্চুকে নিয়ে বাড়ির দিকেই চলল সবাই। যেতে যেতে হঠাৎই কী মনে পড়ায় বাবলু ভোম্বলকে বলল, 'কথায় কথায় খুব ভুল হয়ে গেছে রে। তুই এক কাজ কর, জোরে পা চালিয়ে আমার মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে দু'কেজির মতো মাংস নিয়ে আয়। এরপর ভরপেট খেয়ে চাঁপার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করব। সুকন্যাকেও আমি ফোনে জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের বাড়িতে আসার জন্য।'

ভোম্বল তখনই দ্রুত রওনা হয়ে গেল। বাবলুও সবাইকে নিয়ে ফিরে এল বাড়িতে। বাচ্চু-বিচ্ছু ও বিলুও চলে গেল যে যার বাড়ির দিকে।

দুপুরে দমভর খাওয়ার পর জমজমাট আসর বসল বাবলুর ঘরেই।

বাবলু বলল, 'চম্পা যেহেতু আমাদেরই একজন তাই অন্যদের ব্যাপারে নজরদারি করার আগে আমাদের প্রধান কর্তব্য ওকে আজ-কালের মধ্যেই ওর মা-বাবার হাতে তুলে দিয়ে আসা। কেননা ও মুখে কিছু না বললেও ওর মন কিন্তু পড়ে আছে বাড়ির দিকে।'

বাবলুর প্রস্তাবে সবাই একমত হল।

ক্যামেলিয়া বলল, 'আজ তো সম্ভব নয়, তবে কাল-পরশুর মধ্যে দল বেঁধে সবাই যাব আমরা। ওখানে আমাদের থাকার জায়গার কোনও অসুবিধে নেই। সেরকম অসুবিধে হলে আমরা বীরেশ্বর পাঁড়ের ধর্মশালায় উঠে পড়ব। শুধু থাকার জন্য। খাওয়া-দাওয়া সব আমাদের বাড়িতেই হবে। এখন শুধু টিকিট পাওয়ার অপেক্ষা।'

বিলু বলল, 'টিকিটের দায়িত্ব আমি নিলাম।'

ভোম্বল বলল, 'তুই একা কেন, আমিও যাব।'

বাবলু বলল, 'সে তো যাবি, কিন্তু কবে যাবি সেটা আগে ঠিক কর। কোন গাড়িতে যাবি, কীভাবে যাবি, সবাই যাবি কিনা একটা কাগজে লিখে ফেল সেটা।'

বিলু বলল, 'যেদিনের টিকিট পাব সেদিনই যাব। সবাই যাব।'

বাবলু বলল, 'সে তো অনির্দিষ্ট কালের ব্যাপার। চট-জলদি যেতে হলে জেনারেলে টিকিট কেটেই যেতে হবে।'

ভোম্বল বলল, 'অসম্ভব। তার ওপর পঞ্চুকে নিয়ে।'

বাবলু বলল, 'সে ব্যবস্থা আমি করে ফেলব। হাওড়া থেকে প্রতিদিন সন্ধে সাড়ে সাতটায় দিল্লি-কালকা মেল ছাড়ে। সেই ট্রেনে ইঞ্জিনের পরেই মোগলসরাই পর্যন্ত একটি জেনারেল বগি থাকে। আমরা সবাই একজোটে সেই বগিতেই উঠব। এক রাতের জার্নি। সকাল সাড়ে ছ'টার মধ্যে পৌঁছে যাব আমরা। অতএব বেশি ভাবনা-চিন্তা করে লাভ নেই।'

ক্যামেলিয়া বলল, 'উত্তম প্রস্তাব। রিজার্ভেশনের ব্যাপার যখন নেই তখন দেরি না করে কালই যাওয়া যেতে পারে। শুভা তোর কী মত?'

শুভা বলল, 'আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে বাবা-মায়ের সঙ্গে একটু আলোচনা তো করতে হবে। ওঁরা কী বলেন, শুনি। না হলে বেনারসের মতো জায়গায় বেড়াতে যাবার এমন সুযোগ আর কি হবে?'

সুকন্যা বলল, 'তবে আমার কিন্তু এখন যাওয়া হবে না। তোমরাই যাও, ভালোভাবে ঘুরে এসো সবাই।' শুভা বলল, 'কেন, যাবে না কেন তুমি?'

'আসলে আমার বাবা ক'দিনের জন্য একটু কাজে আউট অব স্টেশন।'

ক্যামেলিয়া বলল, 'ঠিক আছে। কাল সন্ধ্যাতেই আমাদের যাওয়াটা তাহলে ফাইনাল। অতএব আজকের রাত্রিবাস এখানে না করে শুভাকে নিয়ে আমি এখনই বরং বেহালায় চলে যাই। তারপর ওর বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে কাল সকালেই চলে যাব আমাদের বাড়িতে। সেখান থেকে বেলা বেলা ফিরে আসব এখানে। দূরে কোথাও যাবার আগে বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করেও আসতে হবে তো।'

বাবলু বলল, 'সঠিক সিদ্ধান্ত। চম্পা তাহলে আমাদের জিম্মাতেই থাক।'

বাচ্চু বলল, 'এর আগে কোনও একটি অভিযানে আমরা বেনারস হয়েই গিয়েছিলাম।'

বিচ্ছু বলল, 'কী ভালো জায়গা। বেনারস এখন আগের চেয়েও নিশ্চয়ই আরও জমজমাট। যাইহোক ওখানে যাবার নাম শুনে বা হঠাৎ করে সুযোগ এসে যাওয়ায় আনন্দে মন যেন ভরে উঠেছে আমার।'

বাবলু বলল, 'তবে একটা কথা, বেশি আনন্দে যেন বিভোর হয়ে যেও না কেউ। বেনারসে গিয়ে কোনওভাবে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে গেলে তখনকার জন্যও কিন্তু তৈরি থেকো। চম্পা ওখানকার মেয়ে। ওখান থেকেই তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। তাহলেই বুঝে দেখো ওদের স্পাইরা

ওখানেও সক্রিয়। আমাদের হাওড়া-কলকাতার পুলিস এখন সর্বত্র জানিয়ে দিয়েছে ওই দুষ্টচক্রের কথা। অতএব সাবধান। আমাদের ওরা চেনে না। কিন্তু চম্পাকে তো চেনে। তাই যে কোনও সময়ে বিপর্যয় একটা ঘটে যেতে পারে। তাই মনে মনে তৈরি হয়ে আমিও একটা পরিকল্পনা করে রেখেছি। চম্পাকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ওই ভীরা সিং-এর সন্ধানে জলন্ধরে আমরা যাবই এবং সেটা এই যাত্রাতেই।'

ক্যামেলিয়া বলল, 'এই ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ একমত। তাই আজই চলে যেতে চাইছি আমি।'

মা ওদের আলোচনা ঘরের বাইরে থেকেই শুনছিলেন এতক্ষণ। এবার ঘরে এসে বললেন, 'না। এরকম চটজলদি কোনও সিদ্ধান্ত নিও না তোমরা। এমনই যখন পরিকল্পনা, তখন কিছুটা সময় অন্তত হাতে নাও। একেবারে অভিযানের জন্য তৈরি হয়ে বেরও। তাছাড়া অভিযানে যাবে বলেই যাওয়া কেন? জলন্ধরে তোমরা বেড়াতে যাবে। শুনেছি সেখানে কোথায় নাকি এক পীঠস্থান আছে। দেবী দুর্গার নাম করে সেখানে যাও। কোনওভাবে দুষ্টচক্রে জড়িয়ে পড়লে তখন তার মোকাবিলা কোরো।' এবার একটু থেমে বললেন, 'আজ তোমরা এখানেই বিশ্রাম নাও। কাল খুব ভোরে রওনা দিয়ে রাতে অথবা পরশু সকালে ফিরে এসো। দুপুরে এখানেই খাওয়াদাওয়া করবে।'

চমৎকার একটা সমাধান করে দিলেন মা।

ক্যামেলিয়া বলল, 'এমনই হওয়া উচিত। তাহলে এটাই স্থির হল কাল সারাটা দিন ধরে প্রস্তুতি নেওয়া। পরশু রাতের গাড়িতে যাওয়া।'

নতুন অভিযানের আনন্দে মেতে সময় কাটানোর জন্য মিত্তিরদের বাগানে গিয়ে জুটল সবাই। এরপর সন্ধে পর্যন্ত পঞ্চুকে নিয়ে সর্বত্র বিচরণ করে সুকন্যাকে ওর বাড়ির পথে এগিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরল ওরা। এবারের এই আনন্দযাত্রায় সবাই উৎফুল্ল হলেও সুকন্যাই শুধু ম্লান। কেননা এ যাত্রায় ওদের সঙ্গ নেওয়া ওর পক্ষে সত্যিই অসম্ভব।

যাইহোক, ঘরে এসে সবাই এবার একজোট হল। ওদের আসতে দেখেই চায়ের আয়োজন করতে লাগলেন মা। বাচ্চু-বিচ্চু তো বলতে গেলে এ বাড়িরই মেয়ে। তাই ওরাও গিয়ে হাত লাগাল।

একটু পরেই শুরু হল চা-পর্ব। মাখন টোস্ট আর চা।

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁরে, রাতে কী খাবি তোরা?'

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই বলল, 'আজ রাতে আপনার ছুটি। আমরা পাড়ার দোকান থেকেই তন্দুরি রুটি আর তরকা নিয়ে আসব। সেই সঙ্গে মোহনপুরীর ক্ষীরকদম।'

বাবলু বলল, 'গুড আইডিয়া। দারুণ জমবে কিন্তু।'

মা সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে টাকা নিয়ে এলেন।

বিলু বলল, 'আপনি টাকা রাখুন। এটা আমাদের তরফ থেকে। ক্যামেলিয়া শুভলক্ষ্মী আর চম্পার কারণে।'

অতএব পিকনিকের মেজাজে মেতে উঠল সবাই।

একটু পরেই বিলু, ভোম্বল চলে গেল খাবার আনতে।

এবার শুধু গল্প আর গল্প। মাঝে মাঝে টিভি দেখা। বাচ্চু-বিচ্চুও বাড়িতে জানিয়ে দিল এখানেই খাওয়াদাওয়ার কথা।

সময় পার হয়ে চলল। বিলু, ভোম্বল সবকিছু নিয়ে এলে দারুণ খাওয়া হল সে রাতে। এরপর মেয়েরা বিলু, ভোম্বলের সঙ্গ নিয়ে বাচ্চু-বিচ্চুদের বাড়িতে গেলে বাবলুও নানারকম চিন্তাভাবনা করতে করতে শয্যাগ্রহণ করল।

খুব ভোরে পঞ্চুর কুঁই কুঁই শব্দ শুনে দরজা খুলে বাইরে এল বাবলু। তারপর এদিক-সেদিক দেখে ফ্রেসরুমে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে এল। আর তখনই একে একে এসে হাজির হল সবাই।

বাবলু চম্পাকে বলল, 'নতুন জায়গায় ঘুম হয়েছিল তো রাতে?'

চম্পা হেসে বলল, 'কী যে বলো।'

ক্যামেলিয়া বলল, 'আমরা আমাদের বাড়ির সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি। শুভার বাবা-মা-ও মত দিয়েছেন। তার চেয়েও ভালো খবর হচ্ছে সোনারপুরায় আমাদের যে আত্মীয়রা আছেন, যেখানে মাঝেমধ্যেই গিয়ে থাকি, আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব কথা বলেছি। ওরা ওদের ওখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন বলেছেন। অতএব নিশ্চিন্তে থাকা যেতে পারে।'

বাবলু বলল, 'সেটা পরের কথা। আগে গিয়ে তো পড়ি। তবে আমার মনে হয় পাঁড়ে ধর্মশালাতেই আমাদের থাকা ভালো। কেননা আমরা শুধুমাত্র চম্পাকে পৌঁছে দিতেই যাচ্ছি না, সেই সঙ্গে জলন্ধরে যাওয়ারও পরিকল্পনা করছি। অতএব ওখানে গিয়ে কারও বাড়িতে না ওঠাই ভালো। যাইহোক, এবার আমাদের এখানেই একটু চা-পর্ব সেরে নিয়ে ভালোয় ভালোয় রওনা দাও।'

বাচ্চু-বিচ্চু বলল, 'বাবা একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এখনই এসে পড়বে। তাই ওদের আর কষ্ট করতে হবে না।'

বাবলু বলল, 'খুব ভালো হয় তাহলে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যামেলিয়া মায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চা-টোস্ট ও গরম হালুয়া নিয়ে এল।

চা-পর্ব শেষ হওয়ার পরই গাড়ি এসে হর্ন দিল দরজায়।

মাকে প্রণাম করে সবার হাতে হাত মিলিয়ে গাড়িতে উঠল দু'জনে।

ক্যামেলিয়া বলল, 'আমরা কাল বেলা দশটার মধ্যেই এসে পড়ব এখানে। বেশি দেরি করব না।'

বাবলু বলল, 'খুব ভালো হয় তাহলে।'

ওদের গাড়ি স্টার্ট দিল।

॥ ছয় ॥

সেদিনটা চম্পাকে নিয়ে নানা আলোচনায় ও গল্পের মাধ্যমে কাটল। আগামীকাল সন্ধ্যায় ওরা রওনা হবে বারাণসীর পথে। সে কথা মিঃ বর্মণকে জানাতেই খুব খুশি হলেন তিনি। বললেন, 'এই না হলে পাণ্ডব গোয়েন্দা।'

বাবলু বলল, 'কিন্তু স্যার, এবারে তো পাণ্ডবদের কৃতিত্ব কিছু নেই। সবের মূলে তো শুভলক্ষ্মী ও ক্যামেলিয়া।'

'বুঝলাম। আসলে তোমরা এতগুলো অভিযানের পর যেভাবে মাতৃপূজা করেছ তাতেই ওই মেয়েরা শক্তিরূপেণ সংস্থিতা হয়েছে। যাইহোক, কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, এত তাড়াতাড়ি তোমরা রিজার্ভেশন পেলে কী করে?'

বাবলু বলল, 'জেনেবুঝেই আমরা বিনা রিজার্ভেশনে কালকা মেলের জেনারেল বগিতে যাচ্ছি। এক রাতের রাস্তা গল্প করতে করতেই কাটিয়ে দেব।'

'কিন্তু ও তো প্রচণ্ড ভিড়ের গাড়ি।'

'অতটা ভিড় হবে না। কেননা আমরা মোগলসরাই কোচে যাচ্ছি।'

'যাইহোক, আমি নিজে একটু চেষ্টা করে দেখছি এই ব্যাপারে তোমাদের কোনও সাহায্য করতে পারি কি না।'

মিঃ বর্মণ ফোন রেখে দিলে বাবলুর আনন্দের আর শেষ রইল না। উনি যখন বলেছেন তখন ট্রেনে ওঠার ব্যাপারে একটু অন্তত সাহায্য করবেনই।

খবর শুনে আনন্দিত হল সবাই।

মা বললেন, 'সত্যিই তোদের ওপর মহাদেবীর আশীর্বাদ আছে। না হলে কি এইভাবে চম্পাকে পেতিস? ওর জন্যই তোরা যাচ্ছিস বাবা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণাকে দর্শন করতে। অমনি দুর্গাবাড়িতেও যেতে যেন ভুলিস না।'

ওদের বেনারস যাওয়ার কথা শুনে দুর্গাপুর থেকে বাবাও এসে হাজির হলেন। তাই দারুণ আনন্দে কাটল দিনটা।

পরদিন সকাল দশটার মধ্যেই হাজির হল শুভা ও ক্যামেলিয়া। তারপরই রীতিমতো তৈরি হয়ে এসে পড়ল সুকন্যা।

ওকে দেখে সবাই অবাক।

সুকন্যা বলল, 'আমিও যাচ্ছি। আমার বাবা হঠাৎ করেই এসে পড়েছেন। অতএব আর কোনও বাধা নেই। নাহলে তোমরা চলে গেলে আমার মন কিন্তু খুবই খারাপ হয়ে যেত। বিশেষ করে একবার তোমাদের সঙ্গে বেরিয়ে রীতিমতো সাহসও হয়ে গেছে আমার। তার ওপর এবার যাচ্ছি বেনারস। বাবা বিশ্বনাথ মা অন্নপূর্ণার দর্শন পাব। কী আনন্দ।'

এই আনন্দের মধ্যেই ওরা জিনিসপত্তরের ভার একটু হালকা করে গুছিয়ে নিল।

বাবলু মাকে বলল, 'এক রাতের জার্নি। তাও রিজার্ভেশন নেই। অতএব কোনওরকম খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কোরো না। কেক-বিস্কুট আর কড়া পাকের সন্দেশ কিছু নিয়েছি। তাতেই চালিয়ে নেব।'

দেখতে দেখতে বেলা গড়াল। সন্ধের আগেই একটা টাটা সুমোর ব্যবস্থা করে পঞ্চু সহ রওনা দিল ওরা। বেশ কিছুটা পথ আসার পর মিঃ বর্মণের ফোন এল, 'তোমরা কি বেরিয়ে পড়েছ?'

বাবলু বলল, 'হ্যাঁ স্যার।'

'তোমরা টিকিট কেটে ন'নম্বর প্ল্যাটফর্মের সামনে দাঁড়াবে। ওখানে গেলে একজন আরপিএফ তোমাদের সঙ্গে দেখা করে গাড়িতে ওঠার ব্যবস্থা করে দেবে। যাত্রা শুভ হোক তোমাদের।'

সুখবরটা সবাইকে দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে বাবলু আর বিলু গিয়ে প্রথমেই টিকিট করে আনল প্রত্যেকের। একটু পরেই ট্রেন এল প্ল্যাটফর্মে।

ওরা সবাই ন'নম্বর গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল। ওদের দেখে একজন সিএ ও দু'জন আরপিএফ এগিয়ে এলেন।

সিএ বললেন, 'তোমরাই পাণ্ডব গোয়েন্দা?'

বাবলু বলল, 'হ্যাঁ।'

সিএ বললেন, 'তোমাদের ভাগ্য খুব ভালো। এলাহাবাদ কোচের থ্রি-টিয়ারে ছ'টা বার্থ খালি আছে। তোমরা ওখানেই চলো। তবে তোমরা তো দেখছি মোট ন'জন। ওরই মধ্যে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিও। জেনারেলে বসে যাওয়ার চেয়ে তো ভালো হল এটা। আমি ওই বগির কোচ অ্যাটেনডেন্ট। মোগলসরাই পর্যন্ত যাব। অতএব নিশ্চিন্তে যাও তোমরা।'

আরপিএফরা সিএ'র নির্দেশ পেয়ে ওদের এলাহাবাদ কোচে বসিয়ে দিয়ে এল।

এমন অভাবিতভাবে ট্রেন জার্নির ব্যবস্থা যে হবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি কেউ। সত্যি, দৈবকৃপায় কী না হয়!

যথাসময়ে ট্রেন ছাড়ল।

একটু পরেই সিএ এসে ওদের টিকিটের জন্য স্লিপার ক্লাসের ভাড়া নিয়ে নিলেন। তারপর পঞ্চুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আগে জানলে এর টিকিট আমি কাটতে দিতাম না। যাইহোক, ভালোভাবে যাত্রা করো তোমরা।'

এত আনন্দে কি ঘুম আসে? সবাই গল্প করতে করতে এক কাপ করে কফি খেয়ে সময় কাটাল। এরপর বর্ধমান, দুর্গাপুর পার হলে সঙ্গে যা ছিল তাই খেয়ে বার্থে উঠল। বিলু, ভোম্বল গেল আপার বার্থে। দু'দিকের মিডল বার্থ না উঠিয়ে বাবলু মেয়েদের নিয়ে গল্প করেই রাত কাটাল।

এদিকে শীতের একটু প্রকোপ পড়েছে। যথাসময়ে ট্রেন এসে ভোরের আবছা অন্ধকারে যখন প্ল্যাটফর্মে পৌঁছল তখন সারা শরীর কেঁপে উঠল একবার বারেকের তরে। কী দারুণ জমজমাট স্টেশন। ওরা এক মুহূর্ত দেরি না করে প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে স্টেশনের বাইরে এল। তারপর একটি বড় গাড়ি ভাড়া করে সোজা বারাণসীর গোধূলিয়ায়।

ততক্ষণে আকাশ ফর্সা হয়ে রোদ উঠে গেছে।

চম্পা বলল, 'আমি একটা কথা বলব?'

বাবলু বলল, 'বলো।'

'সোনারপুরা, তিলভাণ্ডেশ্বর এখান থেকে খুব বেশি দূরের পথ নয়। আগে আমাদের বাড়িতে যাই চলো। তারপর ওখানে কোনও ব্যবস্থা না হলে ধর্মশালায় আসা যাবে।'

বাচ্চু-বিচ্চু বলল, 'হ্যাঁ বাবলুদা, আমাদের একই মত। আগে ও গিয়ে ওর মা-বাবাকে প্রণাম করে আসুক।'

ক্যামেলিয়াও বলল, 'এমনই করা উচিত। হারানিধি যখন ফিরে পেয়েছি আমরা, তখন অযথা এদিক-ওদিক করে লাভ নেই। ওকে ওর নিজের ঘরে পৌঁছে দিয়ে অন্য চিন্তা-ভাবনা করা যাবে।'

বাবলু বলল, 'তাই হোক তবে।'

ক্যামেলিয়া এবার ড্রাইভারকে অনুরোধ করল, 'ভাইসাব, থোড়া আগে বাড়ো। তিলভাণ্ডেশ্বর যানা।'

গাড়ি এগিয়ে চলল। দু'মিনিটের রাস্তা। তাই সহজেই পৌঁছে গেল। গলির মুখে বড় রাস্তাতেই নামল ওরা।

ওদের দেখে হইহই করে উঠল সকলে। এলাকার মেয়ে অপহরণের সংবাদ সবাই পেয়েছে। ওকে যে উদ্ধার করা গেছে তাও জেনেছে সবাই।

ওর আগমন সংবাদ পেয়ে বাড়ির লোকেরাও ছুটে এল প্রতিবেশীদের নিয়ে। চম্পার মা-বাবা, অন্যান্য লোকজনেরা সবাই এসে বাড়িতে নিয়ে গেল ওদের। আনন্দের উচ্ছ্বাসে বাড়ি মুখর হয়ে উঠল। আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত দোতলা বাড়ি। তবে বড় ঘিঞ্জি। তবু সবাই মিলে আদর-যত্ন করে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল।

চম্পার বাবা-মা দু'জনেই অশ্রুসজল চোখে বললেন, 'তোমাদের ঋণ আমরা শোধ করতে পারব না কোনওদিন। তোমরা না থাকলে এমন ফুলের মতো ফুটফুটে মেয়েটা কোথায় যে পাচার হয়ে যেত তা কে জানে?'

সবার হয়ে বাবলু বলল, 'যা কিছু হয়েছে তা সবই ওর ভাগ্যজোরে। আমরা নিমিত্তমাত্র। তবে আপনাদের মেয়েকে আমরা পেলাম ক্যামেলিয়ার কারণে। ও না থাকলে চম্পাকে পুলিসের হেফাজতেই থাকতে হতো। পরে আপনারা গিয়ে নিয়ে আসতেন।'

ক্যামেলিয়া এবার আগাগোড়া ঘটনার কথা সব বলে বলল, 'এবার আপনাদের মেয়ের মুখে ওর দুরবস্থার কথা শুনে মেয়েকে আগলে রাখার ব্যবস্থা করুন।'

রূপম এগ্রোটেক প্রাঃ লিঃ

ভারতবর্ষের পন্য দ্রব্য উৎপাদনকারী সংস্থা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে। আমাদের ব্যবসার মূল লক্ষ্য সঠিক গুনমান বজায় রেখে সঠিক দামে আমাদের উৎপাদিত পন্য সারা ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর। আমরা প্রতি নিয়ত আমাদের বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে পন্যের গুনগত মানকে উন্নত করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছি। খাদ্য প্রক্রিয়াকরন এবং বোতলজাত পানীয় জল প্রস্তুত কারক সংস্থা হিসাবে রূপম এগ্রোটেক প্রাঃ লিঃ ভারতবর্ষে সুনাম অর্জন করেছে। গুনগত মান, উন্নত পরিষেবা, গ্রাহক সন্তুষ্টি এবং কর্মীদের নিষ্ঠা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে।

Shyam Sundar Das
CMD

OUR UPCOMING PROJECT

PURE & HEALTHY PACKAGED DRINKING WATER

Rishaan

with added minerals

এই জল পান করলে আপনার ব্রেন, চোখ, হার্ট, লিভার, কিডনি ভালো থাকবে।

OUR COMPANY

Rupam Agrotech Pvt. Ltd.
Rupam Packging Pvt. Ltd.

Visit us at :www.rupamagrotech.com

রূপম এগ্রোটেক প্রাঃ লিঃ

Office : Rupam Agrotech Pvt. Ltd.
Stall No. 24, Akashganga Commercial Complex, Haldia, Purba Medinipur.
Contact No - 03224 - 272691 / 7547943246 / 8961786833 / 7076478937 / 9002522825
e-mail - rupam_rapl@yahoo.com

আমাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারে শীঘ্রই আসতে চলেছে

চম্পার বাবা বললেন, 'সে তো পরের কথা, এখন সবাই ফ্রেস হয়ে জলটল খাও। এতখানি ট্রেন জার্নি করে এসেছ।'

'বুঝলাম। কিন্তু আমাদের থাকার ব্যবস্থা কি কাছে-পিঠে কোথাও হবে, না আমরা পাঁড়ে ধর্মশালায় যাব।'

'ওমা! ধর্মশালায় কেন যাবে? তোমরা আসছ শুনেই পাঁড়ে হাবেলিতে একটা বড় ঘরের ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

'তবে তো আর কোনও সমস্যাই নেই। এখন মনের আনন্দে সবাই মিলে বাবা বিশ্বনাথের কাশী ঘুরব। কত কী দেখার আছে এখানে।'

বাবলু বলল, 'আসলে আমরা তো ঠিক বেড়াব বলে আসিনি এখানে। চম্পাকে পৌঁছে দিয়ে আমরা যাব জলন্ধরে। সেখানে এক জাগ্রতা দেবীপীঠ আছে। সেই পীঠ দর্শন করে আমরা অমৃতসর অথবা চণ্ডিগড় হয়ে ফিরব।'

চম্পার মা বললেন, 'তা হঠাৎ তোমাদের পীঠদর্শনের বাসনা হল কেন?'

'তার দুটো কারণ। এক আমাদের সঙ্গে এই যে শুভাকে দেখছেন এ আমাদের ভালোবেসে এ বছর দুর্গাপ্রতিমা উপহার দিয়ে দুর্গাপুজো করিয়েছে। আর দ্বিতীয় কারণ আপনার মেয়ে চাঁপা বা চম্পার অপহরণকারী দলের লিডারদের কয়েকজনের নাম ঠিকানা আমরা পেয়েছি। ওদেরই ব্যাপারে একটু গোপনে খোঁজখবর আমরা নেব।'

বাবলুর কথা শেষ হলে সকলের জন্য জলখাবারের ব্যবস্থা হল।

জলযোগ পর্ব শেষ হতেই এ বাড়ির লোকেরা ওদের রেখে এল পাঁড়ে হাবেলিতে। ওদের থাকার জন্য বেশ বড়সড় ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে। সবাই যে যার মনোমতো জায়গা বেছে নিয়ে বাইরে বেরনোর প্রস্তুতি নিল।

ইতিমধ্যে ফোনে খবর পেয়ে ক্যামেলিয়ার সোনারপুরা স্বজন-বান্ধবীরাও দেখা করে গেল।

এরপর ঘরে তালা দিয়ে ওরা হাঁটাপথেই চলে এল গোধূলিয়ায়।

ক্যামেলিয়া সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা ব্যাপার কেউ লক্ষ করেছ তোমরা?'

সুকন্যা বলল, 'কী ব্যাপার?'

'হাওড়ায় ট্রেনে ওঠার পর থেকে এখনও পর্যন্ত পঞ্চু কী আশ্চর্যরকমের নীরব আছে। সামান্য একটু কুঁই কুঁই শব্দ পর্যন্ত করেনি!'

বাবলু বলল, 'আসলে আমাদের দলে থেকে ও এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে পরিস্থিতি বুঝে আওয়াজ দেয়।' বলে ওর সারা গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, 'আমরা এতজনে আছি তো, তাই কথায় কথায় তোর দিকে নজর দিতে পারিনি। নাহলে তোকে ছাড়া কি আমরা? যাইহোক, এবার কিন্তু ভেতরে ভেতরে তৈরি থাক। বেনারস পার হলেই লড়াইয়ের ময়দানে নামতে হবে তোকে।'

এতক্ষণে পঞ্চুর গলা দিয়ে একটু 'ভুক ভুক' শব্দ বের হল।

ওরা প্রশস্ত রাজপথ ধরে বিশ্বনাথ গলির পাশ দিয়ে সোজা এগিয়ে চলল দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে। একসময় ঘাটে এসে পৌঁছল। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট তখন স্নানার্থী ও পুণ্যার্থীদের সমাগমে জমজমাট। শুভা ও সুকন্যার এই প্রথম কাশী দর্শন। তাই আনন্দের আর শেষ রইল না ওদের।

এখানে শীতলা মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে কিছুক্ষণ ঘাটে ঘাটে ঘুরে আবার দশাশ্বমেধে এল ওরা।

বাবলু বলল, 'এখন এক কাজ করা যাক, পঞ্চুকে নিয়ে সবাই ঘরে যাই চলো। ওকে ওখানে রেখে এখানে এসে স্নানের পর্বটা মিটিয়ে নিই। মেয়েরা যদি কেউ স্নান করতে চাও ভালো, নাহলে মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে চলো সবাই গিয়ে বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শন করে আসি।'

ক্যামেলিয়া বলল, 'এখানে আমাদের স্নানের অসুবিধে আছে। তাই আমরা গঙ্গার জল মাথায় ছিটিয়ে নিয়েছি। পঞ্চুর মাথাতেও দিয়েছি। তোমরা তিনজনে বরং ভালোভাবে স্নান করে এসো।'

অতএব আবার সবাই ফিরে এল পাঁড়ে হাবেলিতে। তারপর মেয়েরা স্নান-পর্ব শুরু করলে বাবলু বলল, 'তোমাদের স্নান পর্ব মিটলে বিশ্বনাথ গলির মুখে গিয়ে তোমরা দাঁড়াও। স্নান সেরে আমরাও সেখানে গিয়ে দাঁড়াব।'

বিদায় নিল বাবলুরা। ঘরে রইল মেয়েরা। আর রইল পঞ্চু।

পঞ্চুকেও গঙ্গায় স্নান করানোর ইচ্ছে ছিল বাবলুর। কিন্তু অসুবিধার কারণে তা আর হল না।

যাইহোক, ওরা ঘাটে এসে বেশটি করে স্নানপর্ব শেষ করল। তারপর বিশ্বনাথ গলির মুখে এসে অপেক্ষা করতে লাগল মেয়েদের জন্য।

বেশি সময় নিল না ওরা। অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ল। তারপর গলিপথ ধরে মূল মন্দিরের গেটের পাশে ঢুণ্ডিরাজ গণেশকে দর্শন ও প্রণাম করে অন্নপূর্ণার মন্দিরে ঢুকল। সেখানে পুজো দিয়ে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে গেল। মন্দিরে প্রবেশের আগে ফুল-বেলপাতা ও গঙ্গাজল নিয়েছিল সবাই। যে যার মনের মতো করে সেই জল বাবার মাথায় ঢেলে দর্শন শেষ করল।

বিশ্বনাথের গলি পার হয়ে বড় রাস্তায় এসে সোনারপুরায় যাবার পথে ক্যামেলিয়া ওর পরিচিত একটি লস্যির দোকানে বসিয়ে ভাঁড় ভর্তি লস্যি খাওয়াল সকলকে। কী দারুণ স্বাদ তার। মন যেন ভরে গেল।

ক্যামেলিয়া বলল, 'এটা আমার তরফ থেকে কিন্তু। চলো এবার ঘরে ফেরা যাক।' তারপর বলল, 'আজ বিকেলে রাবড়ি খাওয়াব সকলকে। গণেশ মহল্লার রাবড়ি। এবার চলো।'

খানিকটা পথ হেঁটেই ওরা পৌঁছে গেল পাঁড়ে হাবেলিতে।

চম্পা তখন ওর এক বান্ধবীকে নিয়ে পঞ্চুকে আদর করছিল।

ওরা যেতেই বলল, 'আর কেন? এবার দুপুরের খাওয়াটা সেরে নাও। পঞ্চুর খাবার কি এখানেই দিয়ে যাব, না ওকেও নিয়ে যাব আমাদের বাড়ি?'

ক্যামেলিয়া বলল, 'ও আমাদের সঙ্গেই খাবে। না হলে বড়ই একা পড়ে যাবে ও।'

পঞ্চু তখন গা ঝেড়ে টান হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

অতএব ঘরে তালা দিয়ে সবাই চলল চম্পাদের বাড়ি। যাবার পথে তিলভাণ্ডেশ্বর শিবকেও দর্শন করে নিল ওরা। প্রবাদ, ইনি নাকি বছরে এক তিল করে বাড়েন।

যাইহোক, চম্পাদের বাড়িতে দমভর খাওয়া সেরে সবাই ওরা আবার ফিরে এল পাঁড়ে হাবেলিতে। ওদের সঙ্গে চম্পাও এল। বেনারসি খানা খেয়ে পঞ্চুর মুখ দেখে মনে হল দারুণ খুশি ও।

গতরাতের ট্রেন জার্নিতে ভালোভাবে ঘুম হয়নি কারও, তাই সবাই যে যার মনোমতো জায়গা বেছে নিয়ে দরজা বন্ধ করে ঘুমোতে লাগল পরম শান্তিতে। শুধু ঘুম এল না বাবলুর। অনেকরকম চিন্তা ওর মনের মধ্যে ভিড় করতে লাগল।

প্রথম চিন্তা, ক্যামেলিয়াকে নিয়ে ওর ভয় নেই। সুকন্যাও অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু শুভা ও চম্পা? ওরা কি পারবে আকস্মিক কোনও বিপদ এসে গেলে তার মোকাবিলা করতে?

আর একটা কথা বারবার ওর মনের মধ্যে উদয় হচ্ছে, সেই অ্যাটাচির মধ্যে মেয়েদের ছবি থাকলেও চক্রের পাণ্ডাদের ছবি ছিল কেন?

এমন সময় হঠাৎ ক্যামেলিয়া পাশ ফিরতে গিয়ে বাবলুকে চিন্তামগ্ন দেখে বলল, 'ব্যাপার কী? ঘুমোওনি তুমি?'

'নানারকম চিন্তায় ঘুম আসছে না।'

'কীসের চিন্তা?'

বাবলু তখন ওর মনের কথা বলল।

ক্যামেলিয়া বলল, 'এ কথাটা যে আমার মনেও আসেনি তা নয়। এ নিয়ে আমিও একটু ভেবেছিলাম। পরে সিদ্ধান্তে এসেছি। অর্থাৎ যাদের মারফত পাচার করা হবে তাদের ছবির সঙ্গে এদের ছবির মিল আছে কিনা না দেখেই মেয়েগুলোকে পাচার করবে কী করে? জাহান্নমে যাক ওরা। মেয়েগুলো যে উদ্ধার হয়েছে, ওদেরই একজনকে যে তার বাবা-মায়ের হাতে তুলে দিতে পেরেছি এতেই খুশি থাকি আমরা।'

ওদের কথাবার্তাতেই সবাই জেগে উঠল এবার।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, 'বিকেল তিনটে। বেড়াতে যাবে না?'

ক্যামেলিয়া বলল, 'যাব তো, বিড়লা মন্দির, সংকটমোচন, দুর্গাবাড়ি, সব জায়গাতেই যাব। সবাই উঠে পড়ো। যাবার জন্য তৈরি হও।'

চম্পা বলল, 'আমিও তাহলে চট করে তৈরি হয়ে আসি?'

বাবলু বলল, 'তুমি যাবে? এত কাণ্ডের পর এখন কি তোমার বাইরে বেরনো উচিত? যারা তোমাকে কিডন্যাপ করেছিল তাদের লোকেরা কিন্তু জেনে গেছে তুমি ফিরে এসেছ। তাই বেশ কয়েকটা দিন একটু আড়ালেই থেকো তুমি।'

চম্পা বলল, 'অত ভয় আমার নেই। তোমরা চলে গেলে আমাকে তো একাই থাকতে হবে এখানে। তাছাড়া এখন আমরা দলবদ্ধ। সঙ্গে পঞ্চু আছে। ভয় কী? তোমরা সবাই গেলে আমার মন খারাপ হয়ে যাবে না?'

শুভা বলল, 'এখানে কোনও ভয় নেই তোমার। যাও, চট করে ঘুরে এসো।'

চম্পা একটুও দেরি না করে চলে গেল ওদের বাড়ির দিকে। সেই সময়ের মধ্যে এরাও চটজলদি তৈরি হয়ে নিল।

বিকেল চারটে নাগাদ সবাই ওরা গোধূলিয়ার মোড়ে এসে দাঁড়াল। তারপর চার্চের পিছনে যে গলি রাস্তাটা আছে তার ভেতরে ঢুকে ওরা বিড়লা মন্দিরে যাবার জন্য দুটো অটো বুক করল। তবে এরা বেনারস ইউনিভার্সিটির ভেতরে বিড়লা মন্দির পর্যন্ত যাবে না। এরা যাবে লঙ্কা।

তাই সই। ভেলুপুরা হয়ে দুর্গামন্দিরের পাশ দিয়ে সংকটমোচন ডাইনে রেখে লঙ্কায় এল ওরা।

তবে এ লঙ্কা রাবণের সেই লঙ্কা নয়, বারাণসীর। এখান থেকে গঙ্গার ওপারে রামনগর অর্থাৎ ব্যাস কাশী যাওয়ার পথ। পাণ্ডব গোয়েন্দারা অবশ্য এর আগে একবার এসেছিল এ পথে। যাইহোক, ওরা এখান থেকে সামান্য পথ হেঁটে হিন্দু ইউনিভার্সিটির গেটের কাছে গিয়ে আবারও অটো ধরল। সেই অটোয় বিড়লা মন্দির।

ক্যামেলিয়া, চম্পা, পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কাছে এই মন্দির স্মৃতিসুধায় ভরা হলেও সুকন্যা ও শুভা চমকিত। ওরা ভেতরে ঢুকে মন্দির দর্শন করে ওপরের বারান্দায় গান শুনে নীচে এসে চারদিক ঘুরে দেখল। মন ভরে গেল দু'জনের।

তারপর দর্শন শেষে বাইরে এসে একটা টাঙ্গা পেয়ে তাতেই চলে গেল সংকটমোচন মন্দিরে। এবার সেখানেও দর্শন-পূজা সেরে পদব্রজেই চলে এল দুর্গামন্দিরে। অজস্র বাঁদর বাসা বেঁধে আছে সেখানে। যাত্রীদের বিরক্ত করছে। ওরই মধ্য দিয়ে ফুল-মালা নিয়ে শুভার হাত দিয়ে পুজো প্রদান করল সবাই। শারদীয়ায় দুর্গাপূজার পর সেই বছরেই কাশীতে এসে দুর্গাবাড়ির দুর্গা দর্শন ওদের প্রত্যেকের জীবনে একটা শুভযোগ বলে মনে হল।

বাবলু ভিড়ের মধ্যে থেকেই করজোড়ে দুর্গা মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাল, 'মা, আমরা অনেক দুষ্ট দুর্জনকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছি। এবারের এই নারী পাচারকারী দলের শয়তানগুলোর সন্ধান যেন আমরা পাই। ওদের সঙ্গে লড়ে তো আমরা পারব না, তবে ঠিক জায়গায় যেন পৌঁছে দিতে পারি ওদের।' এই বলে সবাইকে নিয়ে ওরা যখন মন্দিরের বাইরে এসেছে ঠিক তখনই কে যেন একজন পিছন থেকে এসে বাবলুর কাঁধে হাত রাখল।

চমকের ঘোর কাটিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সুকন্যা, 'একী! মহারাজ আপনি!'

ঘুরে তাকিয়ে বাবলুও অবাক। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্চুও।

মহারাজ বললেন, 'বঙ্গালি বাবা, তুম সব বনারস মে! ঘুমনে আয়া?'

'লেকিন আপ ইধার কিঁউ?'

'জলন্ধর যানা হ্যায়। ওঁহি তো মেরা মকান। দেবী তালাওমে। কাল দুপহর বারা বাজে বেগমপুরা এক্সপ্রেসমে যায়েঙ্গে। টিকট কনফার্ম।'

বাবলু নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারল না। বলল, 'আপ জলন্ধর যায়েঙ্গে? দেবী তালাও?'

'হ্যাঁ।'

ক্যামেলিয়া বলল 'মহারাজ! দুর্গাজি কি কৃপায়া মে আপকা দর্শন মিল গয়ি হম সবকো।'

বাবলু এবার মহারাজকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'হম সবকো ভি জলন্ধর যানা পড়েগা আপকা সাথ।'

মহারাজ বললেন, 'সচ! রিজার্ভেশন মিলা?'

'বিনা রিজার্ভেশন। জলদি যানা হ্যায়!'

ক্যামেলিয়া মহারাজের দুটি হাত ধরে বলল, 'সারি বাত বতাউঙ্গি মহারাজ। আপকা মদত চাহিয়ে। কৃপা করকে মানস মন্দিরমে চলিয়ে। হুঁয়া যাকে সব কুছ—।'

মহারাজ বললেন, 'ব্যাস। আগে বাঢ়ো।'

দুর্গাবাড়ির পরেই বেশ কিছুটা প্রশস্ত জায়গায় ঠাকুরদাস সুরেখার তুলসী মানস মন্দির। মহারাজকে নিয়ে ওরা সেখানেই একটু নিরিবিলি স্থান দেখে বসল। তারপর সব মেয়েদের সঙ্গে মহারাজের পরিচয় করিয়ে দিল বাবলু। এর আগে হিমাচল প্রদেশে চম্বা অভিযানে রাভী নদীর তীরে জল্পা ভবানীর মন্দিরে ওরা দর্শন পেয়েছিল তাঁর। তখনই উনি কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন জলন্ধরের দেবী তালাওয়ের পণ্ডিত তিনি। তাই আজ এই মুহূর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর দর্শন পাওয়াটা দৈবীকৃপা ছাড়া কিছু নয়।

যাইহোক, ওরা সবাই মানস মন্দিরে গিয়ে মহারাজের পদধূলি নিয়ে ওদের সব কথা আগাগোড়া খুলে বলল।

সব শুনে মহারাজ কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে রইলেন। পরে আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এতদিনে সময় হয়েছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তোমরা এসেছ তা সফল হবেই। অসুর নিধন করতে হলে নারীশক্তির প্রয়োজন হয়। সেই শক্তি তোমরা অর্জন করেছ। কাজেই বিনাশ ওদের অবশ্যম্ভাবী। ওই চারজন অতি কুখ্যাত। ওরা এখানে কোনও গোলমাল না করলেও বাইরে ওদের বদনাম আছে। শুধু প্রমাণের অভাবে কেউ কিছু করতে পারে না ওদের।'

বাবলু বলল, 'এবার আমরা প্রমাণ সহ পুরো গ্যাংটাকে ধরিয়ে দেব। আমাদের হাওড়া পুলিসের কাছে ওদেরই দুষ্কৃতীদের কাছ থেকে পাওয়া বেশ কিছু কাগজপত্তর সহ একটি ফাইল আমরা জমা দিয়ে এসেছি।'

মহারাজ একটু চুপ থেকে বললেন, 'তোমরা কি কালই যেতে চাও?'

'হ্যাঁ মহারাজ। আর দেরি করে লাভ কী? কেননা আমাদের এই ঘটনা ওদের জানাজানি হয়ে গেছে। তাই নিশ্চয়ই ওরা লোকাল এরিয়া ছেড়ে দূরে কোথাও গা-ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করবে। তাতে সুবিধা হবে আমাদেরই। আমরা নিশ্চিন্তে ঘোরাফেরা করতে পারব।'

মহারাজ সবাইকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'কাল স্টেশনেই দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে। আর একটা কথা, জলন্ধরে ট্রেন থেকে নেমেই উধাও হয়ে যাবে না কেউ। কেননা তোমরা আমার ওখানেই থাকবে।'

মহারাজ বিদায় নিলেন।

ওরা সবাই পঞ্চুকে বসিয়ে রেখে মানস মন্দির দর্শন করে একটা ট্রেকার নিয়ে ঘরে ফিরল।

বাবলু চম্পাকে বলল, 'তোমার বাড়িতে জানিয়ে দাও আজ রাতে আমরা বাইরেই খেয়ে নেব। কাল সকালে তোমাদের এখানেই চা-পর্ব সেরে বিদায় নেব আমরা।'

চম্পা বলল, 'আমিও কি যেতে পারি তোমাদের সঙ্গে?'

'নিশ্চয়ই যাবে। তবে জলন্ধরে নয়। ওখানে আমাদের জন্য কোন দুর্ভাগ্য বা অপ্রত্যাশিত সাফল্য অপেক্ষা করে আছে তা কে জানে? হয়তো শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে আরও দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। তখন কিন্তু তুমি একা পড়ে যাবে। কেননা আমরা তো আর একবার বেনারসে আসব না। আমরা ওখান থেকেই একজোটে সবাই ফিরে যাব। তাই কিছু যেন মনে করো না। আমরা কোনও মতেই অভিযান শেষে একা ছাড়ব না তোমাকে।'

চম্পা বলল, 'আমি তাহলে বাড়িতে বলে আসি? তোমরা তৈরি হয়ে নাও।'

সবাই ওরা তৈরিই ছিল। তাই পঞ্চুকে সঙ্গী করে বাইরে এল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে চম্পাও এসে হাজির হল ওদের দলে। ওরা প্রথমেই এল দশাশ্বমেধ ঘাটে। তারপর হাতে হাত মিলিয়ে এ ঘাট ও ঘাট করে ঘুরতে লাগল। সন্ধের পর যার যার রুচিমতো পেট ভরে কচুরি মিষ্টি খেল। তারপর ক্যামেলিয়া ওদের গণেশ মহল্লায় নিয়ে গিয়ে স্পেশাল রাবড়ি খাওয়াল অনেক। তারপর আরও কিছুটা সময় পথে পথে ঘুরে রাত ন'টা নাগাদ ফিরে এল পাঁড়ে হাবেলিতে।

॥ সাত ॥

ভোরের বারাণসী জেগে উঠতেই নিদ্রাভঙ্গ হল সকলের।

পঞ্চু অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস করছিল। এবার বডিটাকে টান করে উঠে দাঁড়াল।

চম্পা কাল রাতেও ওদের সঙ্গেই ছিল। তাই ছল ছল চোখে বলল, 'আজ তোমরা চলে যাবে তাই মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে আমার।'

ক্যামেলিয়া বলল, 'না যাওয়া ছাড়া যে কোনও উপায় নেই, সে তো তুমি জানোই। তাছাড়া আমি তো মাঝে মাঝে আসিই। এবার না হয় শুধু বারাণসী ভ্রমণের জন্যই সবাই একবার দল বেঁধে আসব।'

চম্পা বলল, 'আসবে তো? অবশ্যই এসো।'

এরপর আর কোনও কথা নয় সবাই ফ্রেস হয়ে নিল।

চম্পা বলল, 'এবার চলো আমাদের বাড়িতেই যাওয়া যাক। চা-পর্বটা ওখানেই সেরে নেবে।'

বাবলু বলল, 'মন্দ নয়। আমরা তাহলে একেবারে তৈরি হয়েই যাই চলো। আর এখানে দরকার কী? ওখানে চা-পর্ব সেরে সোজা স্টেশন।'

অতএব সবাই ওরা পাঁড়ে হাবেলি ছেড়ে চম্পাদের বাড়িতে এল। ওর মা-বাবা এবং অন্যান্যেরা সবাই হানটান করছিলেন ওদের জন্য। ওরা যেতে যে কী খুশি হলেন সবাই তা বলবার নয়।

পঞ্চুও অনেক আদর পেল সকলের কাছে।

এই অল্প সময়ের মধ্যেই ওঁরা কচুরি শিঙাড়া প্যাঁড়া চমচম সহযোগে চা-পর্ব সমাধা করালেন।

চম্পার বাবা বাবলুর হাতে একটা খাম এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নাও, তোমাদের জলন্ধর ক্যান্ট পর্যন্ত যাওয়ার টিকিট। এতে পঞ্চুর টিকিটও আছে। তবে রিজার্ভেশন টিকিট তো নয়, জেনারেল।'

বাবলু বলল, 'এত সকালে টিকিট কে নিয়ে এল?'

চম্পা মিটিমিটি হেসে বলল, 'আমাদেরই এক দাদা। রেলে চাকরি করেন। কাছাকাছি থাকেন। কাল রাতেই ওঁকে বলে রেখেছিলাম। তাই খুব ভোরে উঠে এই টিকিট নিয়ে এসেছেন উনি। এটা কিন্তু আমাদের পরিবারের তরফ থেকে গিফট। একটু পরে ওই দাদা এলে উনিই তোমাদের সঙ্গে করে স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চাপিয়ে দিয়ে আসবেন। তোমাদের তো রিজার্ভেশন নেই, তাই হয়তো একটু অসুবিধে হবে। গাড়ির ব্যবস্থাও উনিই করেছেন।'

অভিভূত সকলের আনন্দের আর শেষ রইল না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি এলে সবাই ওরা সেই দাদার সঙ্গে বিদায় নিল।

খুব মিশুকে ছেলে। বাবলুদের চেয়ে বড়জোর বছর দুয়েকের বড়। এখানকার ওয়েটিং রুমের স্টাফ। তবে স্টেশন ম্যানেজারের ঘরের কাছে যেতেই দেখা হয়ে গেল মহারাজের সঙ্গে। উনি সবাইকে ম্যানেজারের ঘরে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এমনকী ওরা কী কারণে বিনা রিজার্ভেশনে যাচ্ছে তাও জানালেন।

সব শুনে স্টেশন ম্যানেজার একজন আরপিএফকে ডাকিয়ে এনে নির্দেশ দিলেন, 'গার্ড কামরার গায়েই যে জেনারেল কোচটা আছে ওখানেই এদের ভালোভাবে বসবার ব্যবস্থা করে দাও।'

ওরা সবাই মহারাজকে প্রণাম করে সেই দাদাটির সঙ্গে ওভারব্রিজ পার হয়ে চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে এল।

একটু পরেই ট্রেন এলে আরপিএফের সাহায্য নিয়ে ট্রেনে উঠে একটা সাইড দখল করে নিল ওরা। গুরু রক্ষে যে ট্রেনে সেরকম ভিড় ছিল না।

যথাসময়ে ট্রেন ছাড়লে ওরা হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাল দু'জনকেই।

অনেক আনন্দ নিয়ে শুরু হল ওদের জলন্ধর যাত্রা। দৈবকৃপাতেই বোধহয় গাড়িতে ভিড় না থাকায় কোনও অসুবিধে হল না। সারাটা দুপুর বিকেল কাটিয়ে সন্ধেয় যখন লখনউ পৌঁছল তখন ট্রেন প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, 'আশ্চর্য ব্যাপার! জেনারেল কম্পার্টমেন্ট এত ফাঁকা হয় নাকি?'

বিলু বলল, 'মনে হয় শেষ বগি বলেই এত খালি। যাইহোক, রাতটুকু তো কাটানো। একটু সজাগ থাকলেই হবে।'

সুকন্যা এবার পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, 'আমাদের সঙ্গে পঞ্চু আছে সে কথা ভুলে গেছ বুঝি?'

বাবলু বলল, 'সত্যি, আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলায় এত ব্যস্ত যে ও চোখ মেলে সবকিছু দেখলেও একজন নীরব শ্রোতা।'

যাইহোক, চম্পাদের বাড়ি থেকে অনেক উপাদেয় খাবার এসেছিল বলে শুধু চা ছাড়া আর কিছু খেতে হল না। ট্রেন বেরিলি পৌঁছলে রাতের খাওয়া সেরে নিজেদের মধ্যে অ্যাডজাস্ট করে শুয়ে পড়ল যে যার।

এরপর সকাল ছ'টায় ট্রেন জলন্ধরে পৌঁছলে নেমে পড়ল সবাই।

ওরা নামার সঙ্গে সঙ্গেই দু'জন যুবক পূজারীকে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। সবাই বুঝল মহারাজের নির্দেশ পেয়েই আসছেন ওঁরা। বাবলু ওঁদের দেখে হাত নাড়তেই ওঁরা এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিল।

মহারাজ ট্রেন থেকে নেমে অপেক্ষা করছিলেন ওদের জন্য। ওরা কাছে যেতেই বললেন, 'আও হামারা সাথ।' তারপর যা বললেন, তা হল জলন্ধর পীঠের দেবী তালাও যেতে হলে এখান থেকে জলন্ধর সিটিতে যেতে হবে। একটু পরেই ট্রেন আছে। তবে উনি ওঁর ভক্তদের বলে দিয়েছেন সবার জন্য একটা বড়সড় গাড়ি নিয়ে আসতে। অতএব সেই গাড়িতেই যেতে হবে ওদের।

ভাগ্য যেন আরও বেশি প্রসন্ন হয়ে উঠল। স্টেশনের বাইরে এসে ওরা দেখল একটি টাটা সুমো ও প্রাইভেট গাড়ি অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। মহারাজ তাঁর ভক্তদের নিয়ে প্রাইভেট গাড়ি ও বাবলুরা টাটা সুমোয় উঠল। গাড়ি স্টার্ট দিলে আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেল দেবী তালাওয়ে।

চারদিক উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিশাল মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল ওদের। সেখানে বিশাল সরোবরের তীরে প্রায় হাজার খানেক লোকের থাকার মতো মস্ত ধর্মশালা। মহারাজকে দেখেই ধর্মশালার লোকেরা এসে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সস্নেহে নিয়ে গেল দেবী মন্দিরের মুখোমুখি ধর্মশালার দোতলায়। ওদের জন্য দুটি ঘরের ব্যবস্থাও হয়ে গেল। অতি উচ্চমানের যাত্রীনিবাস।

মহারাজ নিজেও এসে একবার দেখে গেলেন ওদের ঘর দুটো। বললেন, 'থোড়াসা আরাম করো। হম বাদ মে আয়েঙ্গে।'

ওরা ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল। দেখল নানা দেব-দেবীর ছবিতে ভরা ঘর। বিশেষ করে দুর্গা দশমহাবিদ্যার ছবি ঘর যেন আলো করে আছে।

বাবলু, বিলু, ভোম্বল আর পঞ্চু প্রশস্ত ঘরের মধ্যে যে যার পছন্দসই জায়গা বেছে নিল। পঞ্চু রইল একপাশে।

পাশের ঘরে মেয়েরাও তাই।

ওরা সবাই ওদের জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিতে নিতেই চায়ের কাপ ও কেটলি নিয়ে দু'জন আশ্রমিক ওদের চা কেক দিয়ে গেল। অমনি বলে গেল, 'দুপহর এক বাজে ভোগ প্রসাদ মিলে গা।'

আনন্দের অবধি রইল না ওদের।

যাইহোক, চা-পর্ব শেষ করে ঘরে তালা দিয়ে সবাই ওরা দর্শনে চলল।

প্রথমেই দেবী তালাওয়ের জল স্পর্শ করল ওরা। তারপর চলল, মাতৃমন্দিরের দিকে। ওদের দেখতে পেয়েই একজন আশ্রমিক এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। বললেন, 'মহারাজ নে ভেজা। পহলে কল্পবৃক্ষ দেখো।'

শ্রীমন্দিরের পাশেই এই কল্পবৃক্ষ। সেখানে তখন বেশ কয়েকজন বেদি বাঁধানো সেই কল্পবৃক্ষকে ঘিরে পুজো দিচ্ছেন। এটি একটি অশ্বত্থ গাছ। ধর্মপ্রাণ নরনারীরা এই বৃক্ষতলে ধূপ-দীপ প্রজ্জ্বলন করছেন, ডোরি বাঁধছেন, কেউ কেউ প্রদক্ষিণও করছেন। অনেকে বিশ্বাস করেন মন্দিরে এবং এই বৃক্ষে দেবীর অবস্থান। দেবী সবসময় এখানে বিরাজ করেন। আর এখানকার এই বিশাল ভূখণ্ড হল জলন্ধরের মাথা।

আশ্রমিক বললেন, 'মহারাজ আ রহে।'

মহারাজ এলেন। এসে একটা লাল সুতোর বান্ডিল ওদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'পেড় পর ডোরি বাঁধো। তুমহারি মনোকামনা পূর্ণ হোগা। সবকো হোতা।'

মহারাজের নির্দেশে ডোরি বাঁধল ওরা। তারপর দর্শন করল এখানকার মহাদেবী ত্রিপুরমালিনীকে। এরপর ভৈরব মন্দির ও অন্যান্য আরও মন্দির দর্শন করে পথে নেমে সতর্ক পদক্ষেপে চারদিক ঘুরে বেড়াল।

একটু বেলায় আবার এসে ধর্মশালায় ঢুকল। স্থানটি এত ভালো যে এখানে দেবী তালাওতে স্নানের লোভ সামলাতে পারল না কেউ। তাই সবাই ওরা একজোটে এসে স্নান করল। মেয়েরা মেয়েদের জায়গায় ছেলেরা ছেলেদের দিকে। পঞ্চুই শুধু নীরব দর্শক হয়ে দেখতে লাগল। এই পবিত্র সরোবরে পঞ্চুকে স্নান করাতে ওরা সাহস করল না কেউ। তবে একটু জল ওর মাথায় গায়ে ছিটিয়ে দিল। স্নানান্তে ধর্মশালার লোকেরা প্রসাদ পাবার জন্য নীচের হল ঘরে ডাকল ওদের। দারুণ উপাদেয় প্রসাদ। পোলাও, সব্জি, চাটনি ও লাড্ডু। প্রসাদ পেয়ে সবাই যে যার ঘরে চলে গেল।

বিকেলে ওরা যখন আবার বাইরে বেরনোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ঠিক তখনই মহারাজ এসে হাজির হলেন। খুব ব্যস্ততার সঙ্গে সকলকে আড়ালে ডেকে যা বললেন, তা হল এই—

'আজ সকালের দিকে হানিপ্রীত ও ভীরা সিংকে অমৃতসরের দিকে দেখা গেছে। এতেই আমি অনুমান করছি ওরা কেউ দেশান্তরী হয়নি। ওদের পুরনো ঘাঁটি ভাকরা অঞ্চলের গভীর বনপ্রদেশে আত্মগোপন করে আছে ওরা। তাই বলি কী তোমরা আজই চণ্ডীগড়ে পৌঁছে যাও। ভাকরা ওখান থেকে দূর আছে। চণ্ডীগড় তোমাদের কাছে অনেক নিরাপদ। রাতটুকু ওখানে কাটিয়ে কাল সকালে আনন্দপুর সাহিবের গুরুদ্বারে ওঠো। ওখান থেকে ভাকরা গিয়ে চলে যাও নাঙ্গাল ড্যামে। ওরা যদি সত্যিই ওখানে গিয়ে থাকে বা পৌঁছয় তাহলে তোমাদের অস্ত্রেই বধ হবে ওরা। আসলে আমি চাইছি হানিপ্রীত ও ভীরা সিং গিয়ে পৌঁছনোর আগেই তোমরা ওখানে পৌঁছে যাও।'

বাবলু বলল, 'জয় মা ত্রিপুরমালিনী। এমন সুযোগ আমরা কখনওই হাতছাড়া করব না। তা মহারাজ! পথের দূরত্ব কত?'

'অনেক। তোমাদের কাছে টাকা পয়সা ঠিকমতো আছে তো?'

'ও নিয়ে চিন্তা করবেন না। ক্যাশ টাকা ছাড়াও এটিএম আছে প্রত্যেকের কাছে।'

'নিশ্চিন্ত হলাম। কার্যসিদ্ধি হলে ওখানকার, মানে আরও একটু উচ্চস্থানে নয়নাদেবীকেও প্রণাম করে এসো। আর একটা কথা, তোমরা বাস বা অন্য কোনও পরিবহণে যাবে না। আমি তোমাদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এই আশ্রমেরই বড় গাড়ি। ফলে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না। তোমরা তৈরি হয়ে নাও। বারান্দার কাছে থাকো, আমি নীচে থেকে হাত নাড়লেই নেমে আসবে তোমরা।'

মহারাজ নীচে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে মহারাজের ইঙ্গিত পেয়েই নীচে নামল ওরা।

কয়েকজন আশ্রমিক জানতে চাইলেন, 'আজই যা রহে সব?'

মহারাজ বললেন, 'হাঁ টাইম শর্ট। নয়নাদেবী কো দর্শন করনে যা রহে।' তারপর বাবলুকে বলল, 'তিন হাজার রুপিয়া গাড়িওয়ালাকে দে দেনা। বহুত দূর কি রাস্তা।'

ওরা সবাই মহারাজকে প্রণাম করে গাড়িতে উঠল। ঝড়ের বেগে ছুটে চলল গাড়ি। চণ্ডীগড়ে পৌঁছল রাত দশটায়। ড্রাইভার একটি বড় ধর্মশালায় মহারাজের পরিচয় দিয়ে ওদের সেখানে ভালোভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। হল ঘরের মতো বড় ঘর তাই অসুবিধে হল না কারও।

ওরা ধর্মশালায় মাল রেখে বাইরের দোকানে গিয়ে রাতের খাওয়া সেরে নিল। তারপর জমজমাট শহরের রূপ দূরে থেকেই চোখ বুলিয়ে নিল একবার। এরপর ঘরে ঢুকে দু'ভাগ হয়ে শয্যা গ্রহণ করল সকলে।

বাবলু, বিলু, ভোম্বল রইল একদিকে, অপরদিকে বাচ্চু-বিচ্ছু, সুকন্যা, শুভা ও ক্যামেলিয়া। পঞ্চু রইল দরজার কাছে।

সে রাতটা নিশ্চিন্ত নিদ্রায় কাটিয়ে পরদিন ভোরেই ওরা বিদায় নিল ধর্মশালা থেকে। মহারাজের কৃপায় কোনও ভাড়া দিতে হল না ওদের।

এখন যেতে হবে আনন্দপুর সাহিব। কিন্তু পরিবহণ কই? যেগুলো আসে সবই ছোট গাড়ি। দলে ভারী হলে এটাই অসুবিধের। অনেক পরে যদিও একটা সুমো গাড়ি পাওয়া গেল সে আবার পঞ্চুকে নেবে না।

ওরা যখন হতাশ, তখনই ভাগ্যক্রমে নাঙ্গালগামী একটি প্রাইভেট বাস হাঁক দিয়ে ডাকতে লাগল ওদের। বলল, 'ইয়ে বাস আনন্দপুর হোকর নাঙ্গাল যায়েগা। একদম খালি বাস। বৈঠ যাও।'

ওরা আর দ্বিরুক্তি না করে উঠে পড়ল সেই বাসেই। খাড়ার ও রোপার হয়ে সেই বাস ভাকরা ড্যাম পর্যন্ত যাবে। ওরা তো যাবে আনন্দপুর সাহিব। এ পর্যন্ত নিরাপদে নির্বিঘ্নেই এসেছে ওরা। এবার ওই গভীর বনপ্রদেশে ওই দুর্ধর্ষ শয়তানদের মুখোমুখি হতে পারবে কি না তা কে জানে?

একসময় আনন্দপুর সাহিব এসে গেলে সবাই নেমে পড়ল বাস থেকে।

সামনেই গুরদোয়ারা। আশ্রয়ের জন্য সেদিকেই এগিয়ে চলল ওরা।

গুরুদ্বারে ঢুকতেই একজন সর্দারজি হাসিমুখে অফিসঘরে নিয়ে গেলেন। পঞ্চুকে দেখে কী আনন্দ সকলের, তারপর পঞ্চাশ টাকা জমা নিয়ে প্রায় পনেরো জনের থাকার মতো একটি ঘরের ব্যবস্থা করে চাবি দিয়েদিলেন ওদের হাতে।

এত সুখ আশাই করেনি কেউ।

ওরা ঘরে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে ফ্রেস হয়ে নিলে প্রসাদ গ্রহণের ডাক পড়ল লঙ্গরখানায়। কেউ একটুও দেরি না করে মাথায় রুমাল বেঁধে প্রসাদ গ্রহণ করতে গেল।

এখন বেলা দশটা। তাতে কী? ওরা তো বেড়াতে আসেনি। এসেছে দুষ্কৃতী দমনে।

প্রসাদ পাওয়ার পর ওরা গুরুদ্বারের চারপাশ ঘুরে দেখল একবার। এটি যেমনই বিশাল তেমনই উন্নতমানের। একজন সর্দারজি উপযাচক হয়েই ওদের শুনিয়ে দিলেন, 'আনন্দপুর সাহিব হল শিখদের একটি প্রধান তীর্থস্থান। এখানকার গুরুদ্বারের স্থাপত্যও তেমনি অনবদ্য। শতদ্রু নদীর বামতীরে এই শহর। কিংবদন্তি, এখানে বশিষ্ঠ মুনি তপস্যা করে গেছেন। এর পিছনে যে রমণীয় গিরিশ্রেণী তারই নাম নয়নাদেবী। গুরু তেগবাহাদুর এই শহরের পত্তন করেন। গুরু গোবিন্দ সিং ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এখানে বিশ্রাম নিতেন। ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল তিনি এখানে খালসা ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন পাঁচজন শিখকে নিয়ে। যে চারটি তখৎ তিনি স্থাপন করেছেন তার একটি এখানে। পাশেই কেশগড়ে গুরুর শিষ্যরা শপথ নিয়ে বলেছিলেন, শরীরের কোনও অংশের কেশ তাঁরা কাটবেন না।'

এমন সময় হঠাৎই গুরুদ্বারের সামনে একটি বাস এসে পড়ায় সর্দারজি বললেন, 'উঠো উঠো। নাঙ্গাল কি বাস আ

গয়ে। ভাকরা নাঙ্গাল ড্যাম। তুরন্ত যাও।'

এমন অপ্রত্যাশিত সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়। ফাঁকা বাসে পঞ্চুকে নিয়েই সবাই উঠে বসল। কন্ডাক্টর পঞ্চুর দিকে তাকাতেই সর্দারজি বললেন, 'যানে দো।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভরে গেল বাস।

বাস নাঙ্গাল হয়ে ভাকরার দিকে রওনা দিল। পঞ্চুর ব্যাপারে অবশ্য বাসের কোনও যাত্রী একটুও আপত্তি করল না।

শিবালিক পর্বতমালার পাদদেশেই নাঙ্গাল শহর। তাই কিছুক্ষণের মধ্যে বাস ঘন অরণ্য পরিবৃত পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করল। পাহাড়ের গা বেয়ে একের পর এক ঘাট পার হয়ে ক্রমশ উচ্চস্থানের দিকে এগিয়ে চলল বাস। পিচ ঢালা মসৃণ পথ বেয়ে অপূর্ব বনশোভা মণ্ডিত শৈলশ্রী ও শতদ্রুর ধারা দেখতে দেখতে একসময় এসে পৌঁছল ভাকরা নাঙ্গাল ড্যামে।

আকাশচুম্বী ইংরেজি 'ভি' আকারের এই বাঁধের পাশ দিয়ে নয়নাদেবীর পথ। ১৭৫০ মিলিয়ন অর্থব্যয়ে নির্মিত বিশ্বের সর্বোচ্চ ড্যাম 'হুভার ড্যামের' চেয়েও ১৪ ফুট বেশি উঁচু। শতদ্রুর অশান্ত জলধারাকে বাঁধ দিয়ে বেঁধে এখানে তার নাম দেওয়া হয়েছে গোবিন্দ সিং সাগর। এমনকী নাঙ্গালে প্রবাহিত শতদ্রুর ক্যানালেও গুরু গোবিন্দ সিং-এর নামে গোবিন্দ সাগর ক্যানেল নামে পরিচিত।

ভাকরা নাঙ্গাল ড্যামের নয়ন মনোহর রূপ দেখে অভিভূত হল সকলে। পঞ্চু দারুণ উল্লাসে কী যে করবে কিছু ভেবে পেল না। কখনও ভৌ-ভৌ করল, কখনও ছুটোছুটি করল এদিক-সেদিক। অন্যান্য যাত্রীরা ওর কীর্তি দেখে কেউ গায়ে হাত বুলিয়ে দিল কেউ বা কেক-বিস্কুট খাওয়াল।

সবাই তখন ড্যামের জলধারা দেখে এখানকার বনপ্রদেশের দৃশ্য দেখতে লাগল। দেখবে না-ই বা কেন? হাতে ওদের অনেক সময়। আধঘণ্টা অন্তর বাস। মন গেলেই যে কোনও বাসে ফিরে যাওয়া যাবে।

এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে ওরা যখন বেশ খানিকটা উচ্চস্থানে উঠেছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঠিক তখনই পঞ্চুর চিৎকারে সচকিত হয়ে উঠল সবাই। ওরা দেখল আরও উচ্চস্থানে জঙ্গলের ভেতর থেকে বড় একটি পাথরের ওপর বসে কে যেন একজন বাইনোকুলার নিয়ে ওদের দিকে লক্ষ রাখছে।

পঞ্চুর চিৎকার শুনেই উঠে দাঁড়াল সে। পরক্ষণেই তার হাতে উঠে এল একটি পিস্তল অথবা রিভলভার। কিন্তু গুলি তার হাত থেকে বেরিয়ে আসার আগেই কার যেন লাথি খেয়ে একেবারে জলাধারের জলে আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ল সে।

হতচকিত বাবলুরা সবাই ছুটে গেল সেদিকে। কে! কে এই দুষ্কৃতীর জীবনাবসান ঘটাল এমন আচম্বিতে? ওদের দেখেই ধপ করে সেই পাথরটার ওপর বসে পড়ল ক্যামেলিয়া। বলল, 'শিগগির যাও। শুভাকে নিয়ে গেছে ওরা।'

বাবলু বলল, 'ওরা কারা!'

'পাপ্পু ডেক্কা ও নাহান শেরা।'

বাবলুর ইঙ্গিতে পঞ্চু তখন সেদিকে ছুটেছে।

বিলু, ভোম্বলও ধাওয়া করেছে প্রদর্শিত পথে।

বাচ্চু-বিচ্ছু ও সুকন্যা ধরে আছে ক্যামেলিয়াকে।

বাবলু বলল, 'এঃ। তোমার কপাল কেটে যে রক্ত ঝরছে।'

'ওরা পাথর দিয়ে মাথায় আঘাত করেছে আমার।'

'যাকে তুমি আঘাত করলে সে কে?'

'ওদেরই দলের লোক। তোমাদের মারার জন্য পাঠানো হয়েছিল ওকে। ওর নাম ডাম্পি। ওরই মুখে শুনেছি পাপ্পু ও নাহানের নাম। ওরা আমার মাথায় আঘাত করে শুভাকে নিয়ে যাবার সময় বলে গেছে, 'ডাম্পি তু সবকো গোলি মার। ঔর পানি মে ডাল দে।' এরপর আমি কোনওরকমে টলতে টলতে এসে আচমকা লোকটাকে লাথি মেরে ফেলে দিই।'

বাবলু বলল, 'তোমার তুলনা নেই ক্যামেলিয়া। এখন তুমি এখানে একটু বসো। আমি এগিয়ে গিয়ে দেখি ওরা কী অবস্থায় আছে বা কতদূরে গেছে।'

ক্যামেলিয়া বলল, 'না। একা তুমি কখনও যাবে না। আমরা সবাই যাবো। পাথরের ঘা খেয়ে তখন একটু নিস্তেজ হয়ে পড়লেও এখন আমি সেই আগের মতোই সক্ষম।'

সুকন্যা বাচ্চু-বিচ্ছুও উঠে দাঁড়াল তখন।

সুকন্যা বলল, 'জানি না ওরা কতদূরে গেছে। শুধু ভাবছি পঞ্চুর হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে না কেন?'

বাচ্চু-বিচ্ছু নীরব।

বাবলু বলল, 'এটা ভয় পাবার সময় নয়। চলো সবাই।'

ওরা এক মুহূর্ত দেরি না করে কয়েক পা এগতেই জঙ্গল ভেদ করে ভোম্বলকে দ্রুত ওদের দিকে আসতে দেখা গেল।

বাবলু বলল, 'শুভা কই? বিলু কোথায়? পঞ্চুর সাড়া নেই কেন?'

ভোম্বল কোনওরকমে বলল, 'পঞ্চু সাড়া দেবার মতো অবস্থায় নেই। রাস্তা খুব খারাপ। সাবধানে আয় তোরা।'

ওরা যতটা সম্ভব দ্রুত ভোম্বলের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে যা দেখল তা রীতিমতো ভয়াবহ। দেখল শ্বেতশুভ্রা শুভলক্ষ্মী রক্তমাখা হাতে ভয়ঙ্করী এবং রণরঙ্গিনী মূর্তিতে একজনের গলা নাইলনের ফিতে দিয়ে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে আছে যে তার গলা দিয়ে শুধু গোঁ-গোঁ করে শব্দ বেরোচ্ছে। তার দুটো চোখই নখ দিয়ে খুবলে নিয়েছে ও। আর অপরদিকে পঞ্চুর আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত একজনের গলা কামড়ে বাঘের বিক্রমে তার বুকের ওপর বসে আছে পঞ্চু।

ক্যামেলিয়া বলল, 'এরা হল পাপ্পু ডেক্কা ও নাহান শেরা।'

সেই দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।

বাবলু বলল, 'দু'জনের শেষ দশা। পাপ্পুটা যদিও প্রাণে বাঁচে নাহানের অবস্থা সঙ্গীন। আর এখানে থাকা নয়। চলে এসো এখান থেকে।'

ক্যামেলিয়া ও সুকন্যা শুভার রক্তাক্ত হাত রুমালে মুছে থুথু ফেলে চলে এল সেখান থেকে। তারপর আবার পায়ে পায়ে সেই পাথরটার কাছে এসে বসল সবাই। শুধু বিলু, ভোম্বল আর পঞ্চু রয়ে গেল।

ওরা বিশ্রাম নিতে নিতেই ফিরে এল তারাও।

বিলু বলল, 'দু'জনেরই মোবাইল হস্তগত করে ওদের জঙ্গলের খাদে ফেলে দিয়েছি। ভাগ্যজোরে যদি প্রাণে বাঁচে তো বাঁচবে। নাহলে বাঘের পেটে যাবে ওরা।'

ভোম্বল বলল, 'তবে আর এখানে বসে আমাদের সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। পাপ্পু ডেক্কা মারের চোটে ওদের অপরাধের কথা স্বীকার করেছে। একটু আগেই হানিপ্রীত ও ভীরা সিং এসে পৌঁছেছে নয়নাদেবীতে।'

বাবলু বলল, 'আশ্চর্য! যারা আত্মগোপন করবে তারা এমন প্রকাশ্যে আসবে কেন?'

বিলু বলল, 'পাপ্পু ডেক্কার গোপন ডেরা এখানেই। আর হানিপ্রীত ও ভীরা সিং এখানকার দেবীগুহার আশপাশে অন্য একটি গুহায় ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকে। তাই আর দেরি না করে এখনই আমাদের নয়নাদেবীতে যাওয়া উচিত।'

বাবলু বলল, 'অবশ্যই। সময় ও সুযোগ কখনওই হাতছাড়া করা উচিত নয়। চলো সবাই। গো অ্যাহেড।'

ওরা আর এক মুহূর্ত দেরি না করে ড্যামের কাছে চলে এল। একটু পরেই নাঙ্গাল থেকে বাস এল নয়নাদেবীর। এই অবেলায় ভিড় ছিল না বাসে। কন্ডাক্টরকে বুঝিয়েবাঝিয়ে পঞ্চুকে নিয়ে তাই নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেল রমণীয় সৌন্দর্যের তীর্থভূমি নয়নাদেবীতে।

জায়গাটি সমুদ্রতল থেকে চার হাজার ফিট উঁচুতে। পাহাড়ের ওপর বাস স্ট্যান্ডকে ঘিরে প্রচুর দোকানপত্তর গজিয়ে উঠেছে এখানে। এখান থেকে মন্দিরের দূরত্ব প্রায় দু'কিমির মতো। এমন ভরদুপুরেও এখানে যাত্রীর ভিড় নেই। বেলা অনেক হয়েছে। একটা দোকানে বসে সবাই ওরা গরম আলু পরোটা খেয়ে খিদে মেটাল। তারপর একজায়গায় একটি ওষুধের দোকানে ক্যামেলিয়ার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিয়ে ব্যথা কমার ওষুধও নিল। পরে আবার শুরু হল মন্দিরমুখী পথচলা।

এখানে পায়ে চলা পথ ছাড়াও মোট ৭৬১টি সিঁড়ি আছে। আসলে মোচাকৃতি পাহাড়। তাই পথ-কষ্ট খুব। রোপওয়েও আছে। মোট কথা পাহাড়ের এত উচ্চস্থানেও জমজমাট ব্যাপার।

এইভাবে দীর্ঘপথ ও খাড়াই অতিক্রম করে একসময় ওরা নয়নাদেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছল। সারা বছরই এখানে প্রচুর লোকসমাগম হয়।

ক্যামেলিয়া বলল, 'এখনই যদি এই, তো উৎসবের সময় না জানি কী হয়।'

বাবলু বলল, 'এখন দুপুর পেরতে চলেছে। এরপর এখানে ওই শয়তানদের নাগাল পেতে সময় লাগবে অনেক। পরে আর ফেরা যাবে না। তাই আজকের রাতটুকুর মতো কোথাও একটু শেলটার নিতেই হবে আমাদের।'

ক্যামেলিয়া বলল, 'অবশ্যই। তার ওপর পথে আসার সময় শুনতে পেলাম কারা যেন বলছিল আজ পূর্ণিমা। তাই এমন পবিত্র দেবীতীর্থে এক রাত্রি বাস করব না এ কি হয়?'

ক্যামেলিয়ার কথা শেষ হতেই একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এল ওদের, 'এক রাত তো রহনেই পড়েগি।'

চমকে ফিরে তাকাল সবাই। দেখল স্বয়ং মহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন ওদের পিছনে।

বিস্মিত বাবলু বলল, 'একী! মহারাজ আপ?'

'হাঁ বেটা। তুম সবকো ভেজ দেনে কে বাদ ম্যায় ভি সোচ লিয়া একই সাথ দর্শন করেঙ্গে মাতাজিকো। আও মেরা সাথ।'

মহারাজের বহু পরিচিত জায়গা এই নয়নাদেবী। তিনি ওদের সঙ্গে নিয়ে কিছুটা পথ এগতেই একজন ভক্ত এসে প্রণাম জানাল তাঁকে, 'নমস্তে মহারাজ! কব আয়ে?'

'আভি। দেবী কোঠি খালি হ্যায়?'

'বিলকুল।'

'লে যাও সবকো। হম আশ্রমমে হ্যায়। ইয়ে সব মেরা হি আদমি।'

মহারাজ বাবলুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'ব্যস। কোঠি মিল গয়া। হম মন্দিরকা বগলমে মহল পর হ্যায়। ওঁহি রহেঙ্গে হম। সামান রাখকে রেস্ট লেকে চলি আও হুঁয়া পর।'

ওরা সেই ভক্তের সঙ্গে নির্ভাবনায় দেবী কোঠিতে চলে এল। হল ঘরের মতো একটা ঘরে আশ্রয়ও পেল ওরা। ভক্ত ওদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে একমুখ হেসে বিদায় নিলেন।

বাবলু বলল, 'আমাদের এতদিনের জীবনে এমন সব চমৎকারী কখনও হয়নি। যা কিছু ঘটছে সবই যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো।'

যাইহোক, ওরা খুব তৎপরতার সঙ্গে যে যার জায়গা বেছে নিল। আনন্দপুর সাহিবের গুরুদ্বারে কিছু মালপত্তর রেখে এসেছে ওরা। আজই যে এখানে এসে পড়বে ওরা তা কেউ ভাবেনি। যাইহোক, যা ওদের ভাগ্যে আছে তাই তো হবে।

ওরা যখন দেবী কোঠি থেকে মন্দির প্রাঙ্গণে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে ঠিক তখনই অন্য সুরে একটা ফোন বেজে উঠল।

ফোনটা ছিল বিলুর কাছে। দুষ্কৃতীদের কাছ থেকে উদ্ধার করা ফোন। ফোন ধরতেই ওদিক থেকে ভারিক্কি গলা শোনা গেল, 'তুম ফোন কিঁউ নেহি করতা পাপ্পু? নাহান কা সমাচার ক্যা? নাইট মে আ সকোগে?'

বিলু সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর ভারী করে বলল, 'হম দোনো তো আভি তক নাঙ্গাল মে হ্যায়।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, 'এই! কৌন হো তুম? কৌন হো?'

বিলু একবার বলতে যাচ্ছিল, 'তেরা গ্র্যান্ডফাদার।' কিন্তু তা না বলে সুইচ অফ করে দিল।

পরক্ষণেই আর একটা ফোন বেজে উঠল। ফোন ধরতেই শোনা গেল, 'হানিপ্রীত বোল রহা হুঁ।'

বিলু উত্তর দিল, 'জঙ্গমে ফাঁস গয়ে। কাল শুভে যায়েঙ্গে।'

'কুছ বুরা সমাচার নেহি তো?'

বিলু ফোন কেটে সুইচ অফ করে দিল।

বাবলু বলল, 'ব্যাপারটা কী?'

'সব বলছি, বাইরে চল।'

সবাই ওরা দলবদ্ধ হয়েই বাইরে এল। তারপর ফোনের ব্যাপারটা বলল সবাইকে।

বাবলু বলল, 'সব ঠিক আছে। তবে কথা বলতে গেলি কেন ওদের সঙ্গে? গলা শুনেই তো ধরে ফেলল অন্য কারও হাতে পড়ে গেছে ফোনটা। যাইহোক, সুইচ অফ করে ভালো করেছিস।'

ওরা সবাই পায়ে পায়ে মন্দিরের কাছে আসতেই দেখা হয়ে গেল মহারাজের সঙ্গে। মহারাজ পরমাদরে সবাইকে ডেকে নিয়ে একটি প্রশস্ত স্থানে বসালেন। ওদের দেখে আরও কয়েকজন সেবায়েত এগিয়ে এলেন। তাদেরই ভেতর থেকে একজন অনেকটা পরিমাণ প্রসাদি প্যাঁড়া খেতে দিলেন ওদের। কী স্বাদ প্যাঁড়ার! তারপর কলের জল।

মহারাজ নিজে গিয়ে নয়নাদেবীর দর্শন করিয়ে আনলেন সকলকে। চারদিকের পার্বত্য প্রকৃতি দেখিয়ে বললেন, 'মা কী মহিমা দেখো। কিতনি সুন্দর রূপ।'

ঘন পর্বতমালায় ঘেরা এখানকার এই রমণীয় প্রকৃতির বুকে নয়নাদেবীর অবস্থান যেন স্বর্গরাজ বলে মনে হল।

মহারাজ এবার ওদের সবাইকে এক জায়গায় বসিয়ে বললেন, 'ইয়ে কৌন মা দেবী কুছ জানকারি হ্যায় তুমহারা?'

'নেহি। মহারাজ।'

'তো শুনো। দেবী দুর্গাজিনে এঁহি পর মহিষাসুরকো বধ কিয়া থা।' বলে যা বললেন, তা হল এই— পুরাকালে রম্ভ ও করম্ভ নামে মহাশক্তিধর দু'ভাই ছিল। তারা দু'জনেই ছিল অপুত্রক। তাই পুত্রলাভের আশায় তারা কঠোর তপস্যা শুরু করল। রম্ভ অগ্নিতে, করম্ভ জলে। ওদের তপস্যা দেখে দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন স্বর্গের সিংহাসন এবার হাতছাড়া হল বুঝি। তাই পঞ্চনদ তীর্থে হাঙড়ের রূপ ধরে করম্ভকে তিনি বধ করলেন। ভাইয়ের

মৃত্যুসংবাদ শুনে রম্ভ শোকে অগ্নিতেই প্রাণ বিসর্জন দিতে গেলেন। অগ্নিদেব তখন প্রকট হয়ে বললেন, 'দেহঘাতী হবার দরকার নেই। তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট। আর তপস্যার প্রয়োজন নেই। আমার বরে তোমার এক মহা বলবান পুত্র হবে। এবার ঘরে যাও।' ঘরে ফেরার পথে এক বলবতী মহিষীর সঙ্গে মিলিত হল সে। তারই গর্ভে জন্ম নিল মহিষাসুর। সে ছিল দারুণ অত্যাচারী। তার রাজ্য ছিল মহিষপুরী। পরে মহিষপুরীর নাম হয় মাখোবলি। সেই মাখোবলি এখন আনন্দগড়। আনন্দগড় এখন আনন্দপুর সাহিব নামে প্রসিদ্ধ। মহিষাসুরের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে দেবতারা দেবীর শরণ নিলেন। নয়নাদেবী (দুর্গা) চণ্ডিকা মূর্তিতে মহিষাসুরকে এখানেই বধ করেন।'

মহারাজের মুখে এমন পৌরাণিক বৃত্তান্ত শুনে চমকিত হল সবাই। বলতে গেলে সকলেরই চোখে জল এসে গেল।

বাবলু বলল, 'আমার এখনই ইচ্ছে করছে শুভলক্ষ্মীকে জড়িয়ে ধরে ওকে একটা প্রণাম করি। ওই দুর্গা মূর্তি পাঠিয়ে ধন্য করেছে আমাদের। ওরই জন্যে আজ আমরা এই মহিষাসুর বধের ক্ষেত্রে আসতে পারলাম।'

মহারাজ এবার ধরিত্রীমাতা নামে এক মহিলাকে হাঁক দিয়ে ডাকালেন। বললেন, 'দেবী গুম্ফা দর্শন করাও।'

এই মহিলা হরিদ্বারের কনখলে থাকেন। মন্দিরের কাছাকাছি পাহাড়ের একটি গুহায় প্রবেশ করালেন ওদের। অত্যন্ত সংকীর্ণ গুহা। হেঁট হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নামতে হয়। বললেন, 'দেবী চণ্ডিকা যখন দশপ্রহরণধারিণী হয়ে মহিষাসুরকে বধ করতে আসেন মহিষাসুর তখন প্রাণভয়ে মহিষ রূপ ধারণ করে এখানে আশ্রয় নেয়। তবে দেবীর ক্রোধ থেকে রেহাই পায় না সে। দেবী তাকে শিবের ত্রিশূলে বধ করেন।'

অনেক পরে ওরা এক এক করে সেই গুহা থেকে বেরিয়ে যখন মন্দিরের দিকে যাচ্ছে ঠিক তখনই আরতির শঙ্খ ঘণ্টা ও অন্যান্য বাদ্য ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল মন্দির প্রাঙ্গণ। চারদিক আলোয় আলো হয়ে উঠল। আকাশে সুগোল চাঁদ। ওরা পায়ে পায়ে এগিয়ে প্রাণভরে আরতি দর্শন করল। সবাই ধন্য হল পূর্ণিমা মিলনে আরতি দর্শনে।

আরতি শেষে একে একে সবাই বিদায় নিলে মহারাজের আশীর্বাদ নিয়ে ওরা যখন ফিরে আসছে ঠিক তখনই প্রচণ্ড আর্তনাদ ও পরপর দুটো গুলির শব্দে কেঁপে উঠল শিবালিক পর্বতমালার দূর-দূরান্ত পর্যন্ত।

থমকে দাঁড়াল সবাই।

মহারাজ এবং অন্যান্য সেবায়েতরা হই হই করে ছুটে এসে জড়ো হল সেখানে। মহারাজ হাঁক দিয়ে বললেন, 'হুঁশিয়ার হো যাও ভাই সব। শের আনেবালা।'

সবাই তখন ভয়ে পিছিয়ে এল নাটমন্দিরের দিকে।

তবে পঞ্চু পিছু হটবার নয়। দেবী গুহার অপরদিকে পাহাড়ের যে ঢাল সেদিকে ছুটে গিয়ে প্রচণ্ড চিৎকার শুরু করল।

বাবলু জানে বাঘের প্রিয় খাদ্য কুকুর। তাই বার বার ধমক দিয়ে ডাকতে লাগল পঞ্চুকে।

পঞ্চু কিছুটা পিছিয়ে আসতেই রিভলভার হাতে এক দুর্ধর্ষ শয়তানের আবির্ভাব হল সেখানে।

মহারাজ সাহসে ভর করে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'ভীরা সিং! তুমি হিঁয়া পর?'

ভীরা সিং ভয়ার্ত গলায় বলল, 'হানিপ্রীতকো এক শেরনিনে উঠাকে লে গয়ে পণ্ডিতজি।'

'তা না হয় হল। লেকিন এই আন্ধেরে মে তুম দোনো হিঁয়া কৌন কাম করনে আয়ে থে?'

ভীরা সিং সে কথার উত্তর না দিয়ে রিভলভার উঁচিয়েই হাত নেড়ে বলল, 'রাস্তা ছোড়ো। যানে দো মুঝে।'

রিভলভার দেখলে মাথা গরম হয়ে যায় পঞ্চুর। তাই সবাই রাস্তা ছেড়ে পথ ফাঁকা করে দিলেও পঞ্চু বিকট স্বরে একটা হাঁক দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল ভীরার ওপর। রিভলভারসুদ্ধ হাত কামড়েই ঝুলে পড়ল। সশব্দে ছিটকে পড়ল গুলি। পাপের পরিণাম বুঝি এমনই হয়। নিজের গুলিতেই নিজে শেষ হয়ে গেল ভীরা। গুলি লেগেছে পেটে।

বাবলু এগিয়ে গিয়ে পঞ্চুকে শান্ত করে ভীরার হাত থেকে রিভলভারটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল জঙ্গলের গভীরে। মহারাজ সবাইকে স্থির থাকতে বলে আশ্রম থেকে একটু দেবীর চরণামৃত নিয়ে এসে ভীরার মুখে দিলেন। তারপর সবাইকে বললেন, ওর দেহটা খাদের মধ্যে ফেলে দিতে।

মহারাজের নির্দেশে তাই করা হল। এরপর উনি যা বললেন তা হল, মেয়েদের এই রূপ এবং তেজস্বী ভাব দেখে কেন জানি না ওঁর বারবারই মনে হচ্ছিল এই দুর্ধর্ষ শয়তানদের মহানিপাত এবারই হবে। তাই উনি জলন্ধরে আর থাকতে না পেরে পিছু নিলেন ওদের। এখন আর দুই শয়তানের নিধন হলে তবেই রাহুর গ্রাস থেকে মুক্তি পাবে সবাই।

বাবলু তখন মহারাজকে আড়ালে ডেকে পাপ্পু ডেক্কা ও নাহান শেরার বৃত্তান্তও শুনিয়ে দিল।

মহারাজ শিউরে উঠে বললেন, 'মা কি মহিমা যব প্রকট হোতি, তব অ্যায়সা হি হোতা।' বলেই ক্যামেলিয়া ও শুভলক্ষ্মীকে কাছে টেনে আদরে আদরে ভরিয়ে দিলেন ওদের। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছু সুকন্যা ও পঞ্চুও ওর আদর থেকে বঞ্চিত হল না। বাবলুকে বুকে জড়িয়ে মাথায় হাত রেখে মহারাজ বললেন, 'জেতে রহো বেটা।' তারপর বললেন, 'মা কি করুণা তুম সবকো অবশ্য মিলেগি।

ওরা মহারাজকে প্রণাম করে দেবী কোঠিতে এল।

একটু পরেই সেবায়েতরা বেশ কিছু প্রসাদ দিয়ে গেলেন ওদের সকলের জন্য। সেই প্রসাদ পেয়ে তৃপ্ত হল সবাই। দেবী কোঠির সুখ-শয্যায় নিশ্চিন্তে নিদ্রা গেল সে রাতে।

পরদিন ভোরে মঙ্গলারতি দেখে মহারাজ এবং অন্যান্যদের আশীর্বাদ নিয়ে নয়নাদেবীর জয় দিয়ে অবতরণ শুরু করল ওরা। একটু পরেই আলো ফুটল।

আনন্দপুর সাহিবের খালি বাসও যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করছিল স্ট্যান্ডে। ওরা সেই বাসে যে যার পছন্দমতো জায়গা রেখে পাশেরই একটা দোকানে চা-পর্বটা সেরে নিল। তারপর বাসে ওঠার আগে সুকন্যা হঠাৎই উল্লাসে হেঁকে উঠল, 'থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা।'

বাবলু বলল, 'না। থ্রি চিয়ার্স ফর আমরা সবাই।'

বিচ্ছু বলল, 'উঁহু। থ্রি চিয়ার্স ফর শুভলক্ষ্মী।'

সবাই একবাক্যে বলে উঠল, 'হিপ হিপ হুররে।'

পঞ্চুও একবার লাফিয়ে উঠে ডেকে উঠল, 'ভৌ ভৌ ভৌ'।

অলংকরণ: সুব্রত মাজী
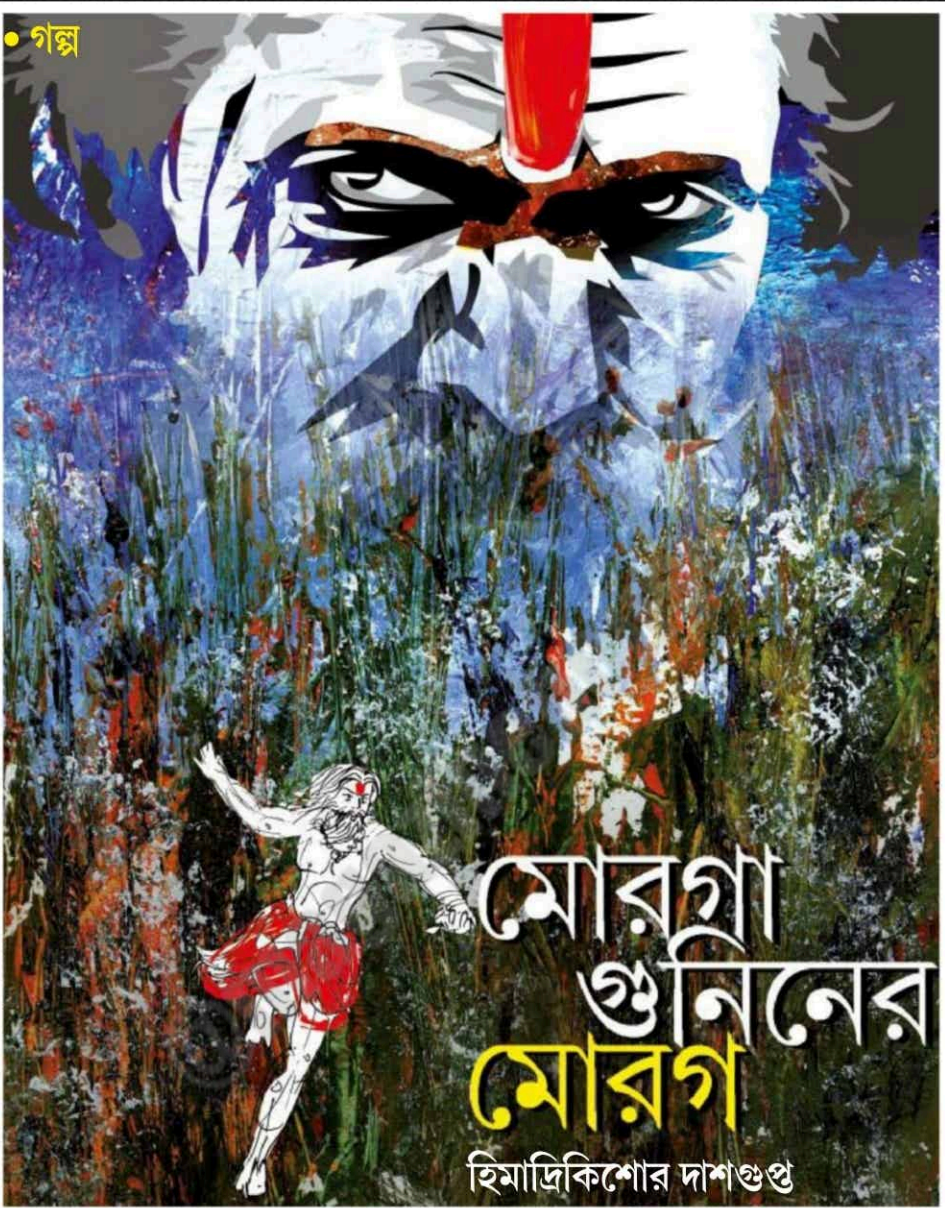
সমাপ্ত

ব্যারাক বাড়িটার বাইরে এসে দাঁড়ালেন সায়ন্তন। সামনে একটা ছোট মাঠের মতো জমি। তারপর শাল-পিয়াল-মহুয়ার জঙ্গল। শুধু সামনেই নয়, জঙ্গলটা চক্রাকারে ঘিরে রেখেছে মাঠ সমেত পুরো ব্যারাক বাড়িটাকেই। সকালের আলোতে ঝলমল করছে সামনের জমিটা। কয়েকটা ছাতারে পাখি পোকা খুঁটে খাচ্ছে সেখানে। জঙ্গলের দিক থেকেও পাখির ডাক ভেসে আসছে। বেশ মনোমুগ্ধকর পরিবেশ চারিদিকে। আধা সামরিক বাহিনীর অফিসার সায়ন্তন গোস্বামী চারপাশে তাকিয়ে বেশ একটা উৎফুল্ল ভাব অনুভব করলেন। আজকের দিনটা এখানে কাটিয়ে দিতে পারলেই হল। কাল সকালেই তিনি সঙ্গীদের নিয়ে যাত্রা করবেন তিরিশ মাইল দূরে জেলা সদরের দিকে, তারপর কলকাতায় রওনা হবেন নিজের বাড়িতে কিছুদিনের ছুটি কাটাবার জন্য। এখানে ছ'মাস আগে আসার পর থেকে আর বাড়ি ফেরার সুযোগ হয়নি তার। এ সব চাকরিতে এমনই হয়ে থাকে। এ জায়গাটা জঙ্গল অধ্যুষিত অঞ্চল। আর জঙ্গলের মধ্যেই এখানকার ভূমিপুত্র অর্থাৎ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের ছোট ছোট গ্রাম আছে। এমনিতে তারা নিরীহ, গরিব মানুষ, জঙ্গলের শালপাতা, কাঠ সংগ্রহ করে বা ছোটখাট কাজ করে জীবন নির্বাহ করে। কিন্তু বছর তিনেক আগে হঠাৎই কেউ বা কারা এ অঞ্চলকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল, শুরু হয়েছিল খুনজখম। বাধ্য হয়ে এ

অঞ্চলে শান্তি ফেরাবার জন্য সরকারকে আধা সামরিক বাহিনী—পুলিশ মোতায়েন করতে হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে শান্তি ফিরেছে। গত একবছর ধরে পুলিশ—আধা সামরিক বাহিনীর ক্যাম্পগুলোও উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে সরকার। সায়ন্তন গোস্বামীর আধা সামরিক বাহিনীর ক্যাম্পটাই শেষ ক্যাম্প যা আজ পর্যন্ত রয়েছে এখানে আগামীকাল পাকাপাকি ভাবে উঠে যাবার জন্য। সায়ন্তনের অধীনে গত ছয় মাস কুড়িজন জওয়ান আর একজন সহকারী অফিসার ছিলেন এই ক্যাম্পে। সেই অধস্তন অফিসারের তত্ত্বাবধানে আঠারো জন জওয়ানকে গতকালই জেলা সদরে পাঠিয়ে দিয়েছেন কমান্ডিং অফিসার সায়ন্তন। ক্যাম্প উঠিয়ে চলে যাবার আগে কিছু সরকারি কাগজ তাকে তুলে দিতে হবে স্থানীয় থানা প্রশাসনকে। সে কাগজগুলো ঠিকঠাক করে তাদের হাতে তুলে দেবার জন্যই দু-জন জওয়ানকে নিয়ে রয়ে গেছেন সায়ন্তন। এই ব্যারাক বাড়িটা আসলে একটা সরকারি স্কুল ছিল। এখানে আধা সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প হবার কারণে স্কুলটাকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কাল এখান থেকে ক্যাম্প উঠিয়ে দেবার পর আবার এখানে স্কুল বসবে।

ব্যারাক বাড়িটার বাইরে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে চারপাশের সূর্যালোকিত প্রকৃতির শোভা উপভোগ করলেন সায়ন্তন। তবে তাকে নিজের ঘরে ফিরে কাগজপত্র নিয়ে বসতে হবে। তাই তিনি যখন ব্যারাক বাড়িটার ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছেন ঠিক তখনই বাড়িটার বারান্দা থেকে নেমে এসে তার সামনে দাঁড়াল তার সঙ্গে রয়ে যাওয়া দু-জন জওয়ান। বছর পঁচিশ বয়স হবে তাদের। ইস্পাতের মতো কঠিন সুঠাম চেহারা, মাথার চুল জওয়ানদের মতোই ছোট করে ছাঁটা। হিন্দিভাষী, বিহারের মানুষ। তাদের একজনের নাম দুর্যোধন দুবে, অন্যজন কৌশল দুবে। শুধু বাসস্থান, ভাষা আর পদবীতেই তাদের মিল নয়, সায়ন্তন শুনেছেন এরা দু'জন সম্পর্কে জ্ঞাতি ভাই হয়, একই সঙ্গে ফোর্সে চাকরি পেয়েছে। দুজনে বেশ কুস্তি জানে। ব্যারাকের বারান্দাতে ওঠার মুখে একপাশে যে মাটি কোপানো জায়গাটা আছে সেখানে বিকালের অবসরে এই দুই ভাই কুস্তি প্রদর্শন করে ফোর্সের মনোরঞ্জন করে। দু'জনই অত্যন্ত কর্মঠ জওয়ান। নিয়মকানুন মেনে চলে। সায়ন্তনের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে তারা দু'জন স্যালুট করল তাকে। তারপর কৌশল দুবে প্রথমে একটু ইতস্তত করে বলল, 'স্যার, এখন কি আমাদের কোন কাজ দেবেন? নইলে একটা আবেদন ছিল।'

সায়ন্তন জানতে চাইলেন, 'কী আবেদন?'

দুর্যোধন দুবে জবাব দিল, 'স্যার, কালতো আমরা এখান থেকে চলে যাব। আজ রবিবার, হাটবার। আপনি যদি অনুমতি দেন তবে এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবার আগে হাট থেকে ঘুরে আসতাম। তেমন কিছু জিনিস পেলে শহরে কিনে নিয়ে যাব।'

হ্যাঁ, এখানে এক আদিবাসী গ্রাম লাগোয়া জঙ্গলের মধ্যে রবিবার সকালে হাট বসে। ঘাস আর পাতায় বোনা ঝুড়ি, টুপি সহ আদিবাসীদের তৈরি নানা রকম ছোটখাট, সস্তার জিনিস বিক্রি হয় সেখানে। তাছাড়া সাধারণ সবজি, মুরগি ইত্যাদি বিক্রি হয়। সামান্য কিছু মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা থাকে। যেমন আদিবাসী নাচ-গান ইত্যাদি। সায়ন্তন নিজেও বেশ কয়েকবার সেখানে গেছেন ক্যাম্পের রসদ কেনার জন্য। আজ এখন এই সকালে এই দুই জওয়ানকে দেবার মতো তেমন কোন কাজ সায়ন্তনের নেই। যা কাজ আছে তা সায়ন্তনকেই করতে হবে। তাই একটু ভেবে নিয়ে তিনি তাদেরকে বললেন, 'ঠিক আছে যাও। তবে ফিরতে বেশি দেরি কোরো না। দুপুরের রান্না করতে হবে তো।'

কৌশল দুবে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'আপনি চিন্তা করবেন না স্যার। আমরা দুপুরের মধ্যেই ফিরে আসব। দেশি মোরগ পেলে কিনে আনব রান্নার জন্য। ও মোরগ শহরে পাবেন না।' —এ কথা বলে আবারও তাকে স্যালুট ঠুকে দুই জওয়ান ক্যাম্প ছেড়ে রওনা হয়ে গেল জঙ্গলের দিকে হাটে যাবার জন্য। আর সায়ন্তনও ব্যারাকে নিজের ঘরে ঢুকে কাজে মগ্ন হয়ে গেলেন।

ঘন্টা দুই পর বেলা দশটায় একটা হাঁক বাইরে থেকে কানে এলো তার। আদিবাসী কোন মানুষের ডাক —'হেই সাহেব, ঘরে আছিস?'

সেই হাঁক শুনে সায়ন্তন ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দাতে এসে দাঁড়ালেন। বারান্দাতে ওঠার মুখেই সামনের জমিটাতে এসে দাঁড়িয়েছে মাঝবয়সি একজন আদিবাসী মানুষ। তার পরনে লুঙ্গির মতো করে জড়ানো লাল রঙের একটা কাপড়, মাথায় ঝাঁকড়া চুল লাল ফেট্টি দিয়ে বাঁধা, গলা থেকে ঝুলছে বেশ কিছু তাবিজ আর পাথরের মালা। চোখে মুখে একটা উত্তেজনার ভাব। এখানে গত ছ-মাস থাকার সুত্রে লোকটাকে চেনেন সায়ন্তন। লোকটার নাম 'মোরগা গুনিন'। স্থানীয় আদিবাসী গ্রামের বাসিন্দা। লোকটা নাকি তুকতাক, ঝাড়ফুঁক করে রোগ সারায় স্থানীয় আদিবাসীদের।

সায়ন্তনের অনুমান এসব তুকতাক নয়, আসলে চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রাথমিক কিছু জ্ঞান আছে লোকটার। জঙ্গলে বেশ কিছু ওষধি গাছ পাওয়া যায়। আসলে তা দিয়েই রোগ সারায় লোকটা। ওসব তুকতাক, ঝাড়ফুঁকের ব্যাপারটা ফালতু।

সায়ন্তনকে দেখতে পেয়ে লোকটা বলল, 'হেই তোর সেপাহি দুটো কুথায়রে? ওরা আমার মোরগ দুটো লিয়াইছে।' হ্যাঁ, যাবার সময় মোরগ কেনার কথা সায়ন্তনকে বলে গেছিল তারা। সায়ন্তন, লোকটাকে প্রশ্ন করল, 'কেন, মোরগ নিয়ে পয়সা দেয়নি তারা?'

মোরগা গুনিন জবাব দিল, 'হ্যাঁ, দিয়েছে। আমি ঘরে ছিলাম না। আমার বউ মোরগ দুটো ওদের হাতে বেঁচে দিয়েছে। আমি পয়সা লিয়েসেছি। মোরগ দুটো ফিরিয়ে লিয়ে যাব। মোরগ দুটো চাই, ওরা আমার কলজে।'

কথাটা শুনে সায়ন্তন বললেন, 'জওয়ানরা হাট থেকে ফেরেনি এখনও।'

মোরগা গুনিন বলল, 'ওরা ফিরলে বলবি মোরগ ফিরিয়ে লিতে এসেছিলাম আমি। মোরগা দুটোর যেন কোনও ক্ষতি না হয়। আমি আবার কিছু পরে আসব।'

মোরগা গুনিনের কথা শুনে সায়ন্তন মনে মনে বললেন, 'যতসব উটকো ঝামেলা!' কিন্তু মুখে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, ওরা এলে আমি ওদের বলব, মোরগ দুটোর যেন ক্ষতি না হয়। তোমার মোরগ তোমাকে ফিরিয়ে দিতে।'

সায়ন্তনের কথা শুনে মোরগা গুনিন একটু আশ্বস্ত হয়ে পা বাড়াল। আর সায়ন্তনও আবার তার ঘরে ঢুকে কাজে বসলেন।

॥ দুই ॥

বেলা বারোটা নাগাদ কাজ শেষ হল সায়ন্তনের। ঘর থেকে ব্যারাকের বারান্দাতে বেরিয়ে আসতেই তিনি দেখলেন জঙ্গলের দিক থেকে মাঠ পেরিয়ে জওয়ান দু'জন ব্যারাকের দিকে আসছে। তাদের সঙ্গে ঝুড়ি, ব্যাগ ইত্যাদি জিনিস।

অঞ্চলে শান্তি ফেরাবার জন্য সরকারকে আধা সামরিক বাহিনী—পুলিশ মোতায়েন করতে হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে শান্তি ফিরেছে। গত একবছর ধরে পুলিশ—আধা সামরিক বাহিনীর ক্যাম্পগুলোও উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে সরকার। সায়ন্তন গোস্বামীর আধা সামরিক বাহিনীর ক্যাম্পটাই শেষ ক্যাম্প যা আজ পর্যন্ত রয়েছে এখানে আগামীকাল পাকাপাকি ভাবে উঠে যাবার জন্য। সায়ন্তনের অধীনে গত ছয় মাস কুড়িজন জওয়ান আর একজন সহকারী অফিসার ছিলেন এই ক্যাম্পে। সেই অধস্তন অফিসারের তত্ত্বাবধানে আঠারো জন জওয়ানকে গতকালই জেলা সদরে পাঠিয়ে দিয়েছেন কমান্ডিং অফিসার সায়ন্তন। ক্যাম্প উঠিয়ে চলে যাবার আগে কিছু সরকারি কাগজ তাকে তুলে দিতে হবে স্থানীয় থানা প্রশাসনকে। সে কাগজগুলো ঠিকঠাক করে তাদের হাতে তুলে দেবার জন্যই দু-জন জওয়ানকে নিয়ে রয়ে গেছেন সায়ন্তন। এই ব্যারাক বাড়িটা আসলে একটা সরকারি স্কুল ছিল। এখানে আধা সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প হবার কারণে স্কুলটাকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কাল এখান থেকে ক্যাম্প উঠিয়ে দেবার পর আবার এখানে স্কুল বসবে।

ব্যারাক বাড়িটার বাইরে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে চারপাশের সূর্যালোকিত প্রকৃতির শোভা উপভোগ করলেন সায়ন্তন। তবে তাকে নিজের ঘরে ফিরে কাগজপত্র নিয়ে বসতে হবে। তাই তিনি যখন ব্যারাক বাড়িটার ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছেন ঠিক তখনই বাড়িটার বারান্দা থেকে নেমে এসে তার সামনে দাঁড়াল তার সঙ্গে রয়ে যাওয়া দু-জন জওয়ান। বছর পঁচিশ বয়স হবে তাদের। ইস্পাতের মতো কঠিন সুঠাম চেহারা, মাথার চুল জওয়ানদের মতোই ছোট করে ছাঁটা। হিন্দিভাষী, বিহারের মানুষ। তাদের একজনের নাম দুর্যোধন দুবে, অন্যজন কৌশল দুবে। শুধু বাসস্থান, ভাষা আর পদবীতেই তাদের মিল নয়, সায়ন্তন শুনেছেন এরা দু'জন সম্পর্কে জ্ঞাতি ভাই হয়, একই সঙ্গে ফোর্সে চাকরি পেয়েছে। দুজনে বেশ কুস্তি জানে। ব্যারাকের বারান্দাতে ওঠার মুখে একপাশে যে মাটি কোপানো জায়গাটা আছে সেখানে বিকালের অবসরে এই দুই ভাই কুস্তি প্রদর্শন করে ফোর্সের মনোরঞ্জন করে। দু'জনই অত্যন্ত কর্মঠ জওয়ান। নিয়মকানুন মেনে চলে। সায়ন্তনের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে তারা দু'জন স্যালুট করল তাকে। তারপর কৌশল দুবে প্রথমে একটু ইতস্তত করে বলল, 'স্যার, এখন কি আমাদের কোন কাজ দেবেন? নইলে একটা আবেদন ছিল।'

সায়ন্তন জানতে চাইলেন, 'কী আবেদন?'

দুর্যোধন দুবে জবাব দিল, 'স্যার, কালতো আমরা এখান থেকে চলে যাব। আজ রবিবার, হাটবার। আপনি যদি অনুমতি দেন তবে এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবার আগে হাট থেকে ঘুরে আসতাম। তেমন কিছু জিনিস পেলে শহরে কিনে নিয়ে যাব।'

হ্যাঁ, এখানে এক আদিবাসী গ্রাম লাগোয়া জঙ্গলের মধ্যে রবিবার সকালে হাট বসে। ঘাস আর পাতায় বোনা ঝুড়ি, টুপি সহ আদিবাসীদের তৈরি নানা রকম ছোটখাট, সস্তার জিনিস বিক্রি হয় সেখানে। তাছাড়া সাধারণ সবজি, মুরগি ইত্যাদি বিক্রি হয়। সামান্য কিছু মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা থাকে। যেমন আদিবাসী নাচ-গান ইত্যাদি। সায়ন্তন নিজেও বেশ কয়েকবার সেখানে গেছেন ক্যাম্পের রসদ কেনার জন্য। আজ এখন এই সকালে এই দুই জওয়ানকে দেবার মতো তেমন কোন কাজ সায়ন্তনের নেই। যা কাজ আছে তা সায়ন্তনকেই করতে হবে। তাই একটু ভেবে নিয়ে তিনি তাদেরকে বললেন, 'ঠিক আছে যাও। তবে ফিরতে বেশি দেরি কোরো না। দুপুরের রান্না করতে হবে তো।'

কৌশল দুবে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'আপনি চিন্তা করবেন না স্যার। আমরা দুপুরের মধ্যেই ফিরে আসব। দেশি মোরগ পেলে কিনে আনব রান্নার জন্য। ও মোরগ শহরে পাবেন না।' —এ কথা বলে আবারও তাকে স্যালুট ঠুকে দুই জওয়ান ক্যাম্প ছেড়ে রওনা হয়ে গেল জঙ্গলের দিকে হাটে যাবার জন্য। আর সায়ন্তনও ব্যারাকে নিজের ঘরে ঢুকে কাজে মগ্ন হয়ে গেলেন।

ঘন্টা দুই পর বেলা দশটায় একটা হাঁক বাইরে থেকে কানে এলো তার। আদিবাসী কোন মানুষের ডাক —'হেই সাহেব, ঘরে আছিস?'

সেই হাঁক শুনে সায়ন্তন ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দাতে এসে দাঁড়ালেন। বারান্দাতে ওঠার মুখেই সামনের জমিটাতে এসে দাঁড়িয়েছে মাঝবয়সি একজন আদিবাসী মানুষ। তার পরনে লুঙ্গির মতো করে জড়ানো লাল রঙের একটা কাপড়, মাথায় ঝাঁকড়া চুল লাল ফেট্টি দিয়ে বাঁধা, গলা থেকে ঝুলছে বেশ কিছু তাবিজ আর পাথরের মালা। চোখে মুখে একটা উত্তেজনার ভাব। এখানে গত ছ-মাস থাকার সুত্রে লোকটাকে চেনেন সায়ন্তন। লোকটার নাম 'মোরগা গুনিন'। স্থানীয় আদিবাসী গ্রামের বাসিন্দা। লোকটা নাকি তুকতাক, ঝাড়ফুঁক করে রোগ সারায় স্থানীয় আদিবাসীদের।

সায়ন্তনের অনুমান এসব তুকতাক নয়, আসলে চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রাথমিক কিছু জ্ঞান আছে লোকটার। জঙ্গলে বেশ কিছু ওষধি গাছ পাওয়া যায়। আসলে তা দিয়েই রোগ সারায় লোকটা। ওসব তুকতাক, ঝাড়ফুঁকের ব্যাপারটা ফালতু।

সায়ন্তনকে দেখতে পেয়ে লোকটা বলল, 'হেই তোর সেপাহি দুটো কুথায়রে? ওরা আমার মোরগ দুটো লিয়াইছে।' হ্যাঁ, যাবার সময় মোরগ কেনার কথা সায়ন্তনকে বলে গেছিল তারা। সায়ন্তন, লোকটাকে প্রশ্ন করল, 'কেন, মোরগ নিয়ে পয়সা দেয়নি তারা?'

মোরগা গুনিন জবাব দিল, 'হ্যাঁ, দিয়েছে। আমি ঘরে ছিলাম না। আমার বউ মোরগ দুটো ওদের হাতে বেঁচে দিয়েছে। আমি পয়সা লিয়েসেছি। মোরগ দুটো ফিরিয়ে লিয়ে যাব। মোরগ দুটো চাই, ওরা আমার কলজে।'

কথাটা শুনে সায়ন্তন বললেন, 'জওয়ানরা হাট থেকে ফেরেনি এখনও।'

মোরগা গুনিন বলল, 'ওরা ফিরলে বলবি মোরগ ফিরিয়ে লিতে এসেছিলাম আমি। মোরগা দুটোর যেন কোনও ক্ষতি না হয়। আমি আবার কিছু পরে আসব।'

মোরগা গুনিনের কথা শুনে সায়ন্তন মনে মনে বললেন, 'যতসব উটকো ঝামেলা!' কিন্তু মুখে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, ওরা এলে আমি ওদের বলব, মোরগ দুটোর যেন ক্ষতি না হয়। তোমার মোরগ তোমাকে ফিরিয়ে দিতে।'

সায়ন্তনের কথা শুনে মোরগা গুনিন একটু আশ্বস্ত হয়ে পা বাড়াল। আর সায়ন্তনও আবার তার ঘরে ঢুকে কাজে বসলেন।

॥ দুই ॥

বেলা বারোটা নাগাদ কাজ শেষ হল সায়ন্তনের। ঘর থেকে ব্যারাকের বারান্দাতে বেরিয়ে আসতেই তিনি দেখলেন জঙ্গলের দিক থেকে মাঠ পেরিয়ে জওয়ান দু'জন ব্যারাকের দিকে আসছে। তাদের সঙ্গে ঝুড়ি, ব্যাগ ইত্যাদি জিনিস।

মোরগের ব্যাপারটা জানাতে হবে তাদের। সায়ন্তন তাই বারান্দায় ওঠার মুখটাতে দাঁড়ালেন। তারা দু'জনও এসে দাঁড়াল তার সামনে। সায়ন্তন দেখলেন দুর্যোধনের হাতে ধরা নাইলনের ব্যাগের ভিতর থেকে উঁকি মারছে মোরগের ঠ্যাং। সায়ন্তন সেই ব্যাগটার দিকে তাকাতেই দুর্যোধন বলল, 'এক জোড়া ভালো মোরগ এনেছি স্যার, এখনই রান্না শুরু করব।'

কথাটা শুনে সায়ন্তন বললেন, 'ও মোরগ দুটো মোরগা গুনিনের। তাকে না জানিয়ে ওর বউ মোরগ দুটো বিক্রি করেছে। গুনিন মোরগ ফিরিয়ে নিতে এসেছিল। আবারও আসবে। তাকে মোরগ দুটো ফিরিয়ে দিতে হবে। তেমন হলে আবার হাটে গিয়ে অন্য মোরগ কিনে আনো।'

সায়ন্তনের কথা শুনে কৌশল দুবে বলল, 'কিন্তু এখনতো আর তাকে মোরগ ফেরানো যাবে না স্যার।'

সায়ন্তন বললেন, 'কেন ফেরানো যাবে না?'

দুর্যোধন এবার তার ব্যাগের ভিতর থেকে ঠ্যাং ধরে মোরগ দুটোকে টেনে বার করল। বেশ বড় দুটো মোরগ। একটা লাল, অন্যটা সাদা রঙের। তবে তারা মৃত। মোরগ দুটোর গায়ে রক্ত লেগে আছে। গায়ের নানা জায়গার পালক খসে ক্ষতচিহ্ন বেরিয়ে পড়েছে। মৃদু বিস্মিত ভাবে সায়ন্তন জানতে চাইলেন, 'মোরগ দুটো মরল কীভাবে?'

কৌশল তার কথার জবাব দিতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় সবাই দেখতে পেল জঙ্গলের দিক থেকে মোরগা গুনিন 'আমার মোরগ ফিরিয়ে দে, ফিরিয়ে দে' বলতে বলতে ছুটে আসছে! তাকে দেখে জওয়ান কৌশল তার কথাপৃষ্ঠের কথার জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল। মোরগা গুনিন হাঁফাতে হাঁফাতে তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে কোমর থেকে টাকা বার করে বলল, 'লে, তুদের টাকা লিয়ে লে। আমার মোরগ ফিরিয়ে লিব।'

গুনিন প্রথমে ভালো করে খেয়াল করেনি তার মোরগ দুটোর অবস্থা। দুর্যোধন এবার মোরগ দুটিকে তুলে ধরল মোরগা গুনিনের সামনে। তারপর ইতস্তত করে বলল, 'মোরগ দুটো লড়াইতে মারা গেছে। হাটে মোরগ লড়াই হচ্ছিল, ওদের লড়াইতে নামিয়ে ছিলাম। দু-জনই দুজনকে মেরে ফেলেছে। এ মোরগ নিলে নিয়ে যেতে পারো।'

মোরগ দুটোকে দেখে আর জওয়ান দুর্যোধনের কথা শুনে মোরগা গুনিন আর্তনাদ করে উঠল, 'তুরা ওদের মেরে ফেললি!'

ব্যাপারটা বুঝতে আর কোন অসুবিধা হল না সায়ন্তনের। এখানকার হাটে মোরগ লড়াই হয়। দুটো মোরগের পায়ে ধারালো ছুরি বেঁধে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামিয়ে দেওয়া হয়। মোরগ গুলো তার প্রতিপক্ষকে পায়ে বাঁধা ছুরির আঘাতে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। কোনও সময় ছুরির আঘাতে আহত হয়ে দুটো মোরগই মারা যায়। যেমন এক্ষেত্রে হয়েছে। এই মোরগ লড়াইয়ের খেলাটা এখানকার হাটে দেখেছেন সায়ন্তন। এই লড়াইটা অনেক লোক পছন্দ না করলেও আদিবাসী লোক সংস্কৃতির অঙ্গ। প্রচুর মানুষ ভিড় করে সে লড়াই দেখে উত্তেজনা লাভ করে।

এ অবস্থায় জওয়ান দু'জন বা মোরগা গুনিনকে কী বলবেন তা বুঝে উঠতে পারলেন না সায়ন্তন। আর্তনাদ করার পর পাথরের মূর্তির মতো তার মোরগ দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে গুনিন। সায়ন্তন তাকিয়ে রইলেন গুনিনের মুখের দিকে। আর এরপর হঠাৎই যেন মোরগা গুনিনের

মুখের ভাব বদলে গেল। চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল তার। জওয়ান দু'জনের দিকে তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলে উঠল, 'তুরা দুই ভাইকে লড়াই দিলি, মেরে ফেললি। মরবি, মরবি, তুরাও মরবি। মোরগা গুনিনের কথা মিথ্যা হবে না।' —এ কথাগুলো বলেই সে স্থান ত্যাগ করে পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে ফাঁকা জমিটা পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল মোরগা গুনিন।

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে দুই জওয়ান ভাই। তাদের দেখে সায়ন্তনের মনে হল তুকতাক জানা গুনিনের কথাগুলো যেন ভয় ধরিয়েছে তাদের মনে। সায়ন্তনের নিজের অবশ্য এসব তুকতাক, অভিশাপের ব্যাপারে কোনও বিশ্বাস নেই। তবে তিনি তিরস্কারের স্বরে জওয়ান দু'জনের উদ্দেশ্যে বললেন, 'মোরগ দুটোকে লড়াইতে নামিয়ে তোমরা ঠিক করোনি।'

দুর্যোধন বলল, 'আমাদের ভুল হয়েছে স্যার। আসলে দেহাতে আমাদের গ্রামেও মোরগ লড়াই হয়। মোরগ দুটো দেখে কয়েকজন লোক লড়াইতে নামাতে বলল তাই নামিয়েছিলাম। লোকটা যে মোরগ ফেরত নিতে আসবে তা বুঝিনি।'

সায়ন্তন ভেবে দেখলেন, এই জওয়ান দু'জনকে তেমন দোষ দেওয়া যায় না। পয়সা দিয়ে তারা মোরগ কিনেছে। লড়াইতে মোরগ নামিয়ে তারা ঠিক কাজ না করলেও হয়তো বা তারা গুনিন মোরগ খুঁজতে আসার আগেই রান্নার জন্য কেটে ফেলতে পারত। তাই তিনি শুধু তাদের উদ্দেশ্য বললেন, 'ওই কাটা-ছেঁড়া মোরগ খাবার ইচ্ছে আমার নেই। তোমরাই ওদের মাংস খেও।'

এই বলে বারান্দায় উঠে নিজের ঘরের দিকে এগোলেন তিনি। ঘরে ফেরার কিছুক্ষণের মধ্যেই বারান্দায় রান্নার জায়গা থেকে মাংস রান্নার গন্ধ নাকে এলো তার। মোরগ দুটো রান্না করছে জওয়ানরা। সায়ন্তন স্নান করার পর দুর্যোধন তার দুপুরের খাবার রুটি, ডাল, সবজি দিয়ে গেল নিশ্চুপ ভাবে। খাওয়া সেরে ক্যাম্পখাটে শুয়ে পড়লেন সায়ন্তন।

তার যখন ঘুম ভাঙল তখন সূর্য ডুবতে চলেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যারাকের সামনের মাঠে নেমে এলেন তিনি। তবে বারান্দা বা কুস্তির জায়গাতে জওয়ান দু'জনকে দেখতে পেলেন না। সায়ন্তন অনুমান করলেন, ভরপেট মোরগের মাংস খেয়ে তারা নিশ্চয়ই ঘরে ঘুমোচ্ছে। ব্যারাকের সামনে পায়চারি শুরু করলেন তিনি। জঙ্গলের আড়ালে সূর্য ডুবে যেতে শুরু করেছে। হঠাৎই তিনি একজনকে ব্যারাকের দিকে আসতে দেখলেন। এ লোকটাকেও চেনেন সায়ন্তন। লোকটা এই প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। শহরের লোক, চাকরি সূত্রে এখানে থাকেন। ভদ্রলোক সায়ন্তনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'শুনলাম কাল আপনারা চলে যাচ্ছেন, তাই দেখা করতে এলাম। আপনাদের জন্যই শান্তি ফিরল।'

সায়ন্তন হেসে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ফিরে যাচ্ছি। আপনারা আমাদের সাহায্য করেছেন বলেই শান্তি ফিরল। আর এমনি টুকটাক ঝামেলাতো সব জায়গাতেই থাকে। স্থানীয় পুলিশ ওসব সামলে নিতে পারে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, স্থানীয় ছোট ঝামেলাতো থাকেই। এই যেমন মোরগা গুনিন আত্মহত্যা করল।'

কথাটা শুনে সায়ন্তন বিস্মিত ভাবে বলে উঠলেন, 'কোথায়? কখন?'

শিক্ষক মশাই জবাব দিলেন, 'দুপুর বেলাতে। শুনলাম তার সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে না জানিয়ে তার মোরগ দুটো নাকি বেঁচে দিয়েছে তার বউ। এই মোরগ দুটোর পালক দিয়েই লোকটা ঝাড়ফুঁক করত। তাই লোকে ওকে 'মোরগা গুনিন' ডাকতো। মোরগের শোকে বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে জঙ্গলের মধ্যে শাল গাছ থেকে ঝুলে পড়েছে লোকটা। একটু আগে আমিও দেখে এলাম তাকে। বীভৎস দৃশ্য মশাই! জিভ, চোখ সব যেন ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে।'

লোকটার কথা শুনে সায়ন্তন হতভম্ব হয়ে গেলেও আসল ব্যাপারটা সঙ্গত কারণেই প্রকাশ করলেন না তাঁর কাছে। আধা সামরিক বাহিনীর কমান্ড্যান্ট সায়ন্তনের সঙ্গে আরও কিছু সৌজন্যসূচক কথা বলে বিদায় নিলেন সেই স্কুল মাস্টার। বনের আড়ালে সূর্য ডুবে গেল। আবার ব্যারাকের ভিতর ঢুকে পড়লেন সায়ন্তন।

ঘরে ঢুকে তার কাগজপত্রগুলো শেষ বারের মতো পরীক্ষা করতে বসলেন তিনি। সে কাজ শেষ করে নিজের জিনিসপত্র গুছোলেন। কারণ পরদিন ভোরেই স্থানীয় পুলিশ আধিকারিককে কাগজ বুঝিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে তিনি এ জায়গা ছেড়ে রওনা হয়ে যাবেন। সব কাজ মিটতে তার রাত আটটা বেজে গেল। রোজ ঠিক আটটাতে তাকে রাতের খাবার দিয়ে যায় দুবে ভাইদের একজন। কিন্তু রাত ন'টা নাগাদও যখন কেউ খাবার দিতে এল না সায়ন্তন তখন তার ঘর থেকে বেড়িয়ে দুটো ঘর পরে তাদের ঘরের দিকে এগলেন। জওয়ানদের ঘরের দরজাটা খুলে ঘরে ঢুকলেন তিনি। মাথার ওপর থেকে ক্ষয়াটে একটা বাতি ঝুলছে সে ঘরে। সায়ন্তন দেখলেন, ঘরটার দুই কোণে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে রয়েছে দুই ভাই। বেশ অদ্ভুত দৃশ্য। সায়ন্তনকে দেখে উঠে দাঁড়াল তারা। তিনি তাদের বললেন, 'রাতের খাবার হয়নি?'

কৌশল দুবে প্রথমে যেন কেমন জড়ানো গলায় উত্তর দিলো, 'রান্না করিনি স্যার। মাফ করবেন।'

ভাইয়ের দিকে চোখ রেখেই এরপর দুর্যোধন বলল, 'শরীরটা ভালো লাগছে না স্যার। আপনার কাছে খাবার থাকলে আজকের রাতটা চালিয়ে দিন।'

ফোর্সের কেউ সাধারণত ওপর অলার সঙ্গে এমন আচরণ করে না। হয়তো বা তাদের সত্যি শরীর খারাপ হয়েছে। রান্না না করার জন্য এই শেষ দিনের রাতে তাদের আর বকাঝকা করতে মন চাইল না। তাদের আর কিছু না বলে ঘরে ফিরে শুকনো খাবার খেয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি।

॥ তিন ॥

বিছানাতে শুলেও কিছুতেই ঘুম এল না কমান্ড্যান্ট সাহেবের। তার দুই জওয়ানের আচরণ যেন এখন কেমন অদ্ভুত মনে হচ্ছে তার। শরীর খারাপের জন্য তারা রাতের রান্না নাই করতে পারে, কিন্তু সে কথাটা তারা তাদের ওপর অলাকে জানাবার প্রয়োজন বোধ করল না? তাছাড়া ঘরের কোণে ওভাবে বসে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকাটা কেমন যেন অদ্ভুত ছিল! ঘুম না আসার কারণে নানা কথা ভাবতে থাকলেন তিনি। বাইরে রাত বেড়ে চলল।

তখন মধ্য রাত, ঘুম না আসার কারণে সায়ন্তন জেগেই ছিলেন। হঠাৎ সতর্ক কানে ধরা দিলো একটা শব্দ! বারান্দার গেট খোলার 'ক্যাঁচ' শব্দ! এত রাতে কে ঢুকেছে বা বেরোচ্ছে ব্যারাক থেকে? বিছানা ছেড়ে উঠে তিনি ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। প্রথমে কিছুটা হেঁটে তিনি জওয়ান দু'জনের

ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। দরজার পাল্লা খোলা, ভিতরে বাতিটাও জ্বলছে। কিন্তু তিনি ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে দেখলেন, দুবে ভাইরা ঘরে নেই! এত রাতে তারা গেল কোথায়? সায়ন্তন এরপর এগিয়ে গিয়ে বারান্দা ছেড়ে সামনের জমিতে নেমে এলেন তার জওয়ানদের খুঁজতে। হ্যাঁ, এবার তিনি দেখতে পেলেন তাদের। কিছুটা তফাতে কুস্তি লড়ার জমিটাতে কুস্তি শুরু করার ভঙ্গিতে নিজেদের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব রেখে হাতে ভর দিয়ে বসে পরস্পরের মুখোমুখি তারা! ব্যাপারটা দেখে বেশ বিস্মিত হলেন কমান্ডান্ট সাহেব। এত রাতে কুস্তি লড়তে নেমেছে দুবে ভাইরা! পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে স্থির দৃষ্টিতে তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে। তাদের কাছেই দাঁড়ানো কমান্ডান্ট সাহেবকে তারা যেন দেখতেই পাচ্ছে না। লড়াই শুরু করার আগে দু'জনের শরীরটা একটু নড়ল। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের পায়ে বাঁধা কী যেন একটা জিনিস ঝিলিক দিয়ে উঠল চাঁদের আলোতে। আর সেগুলোর দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে চমকে উঠলেন সায়ন্তন। দুই জওয়ান কৌশল আর দুর্যোধনের পায়ের গোড়ালিতে বাঁধা রয়েছে তাদের রাইফেলের মাথাতে যে ছুরি বসানো থাকে সেই ছুরি অর্থাৎ বেয়নেটের ফলা! মোরগ লড়াইতে ঠিক যে ভাবে মোরগের পায়ে ছুরি বাঁধা হয় ঠিক তেমনি ভাবেই ইস্পাতের ধারালো ছুরি পায়ে বেঁধেছে দুই ভাই। ব্যাপারটা কী ঘটছে তা অনুমান করে সায়ন্তন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'থামো, থামো, কী করছ তোমরা?'

কিন্তু তার কথায় কর্ণপাত না করে মোরগ লড়াইয়ের মতো পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দুই জওয়ান। সায়ন্তন তাদের থামাবার জন্য চিৎকার করতে লাগলেন, কিন্তু থামল না তারা। সায়ন্তন তাদের কাছে যেতে পারছেন না। এমন ভাবে তারা দু'জন পরস্পরকে ছুরি দিয়ে চিরে ফেলার জন্য পা ছুঁড়ছে যে সায়ন্তন তাদের কাছে গেলে ধারালো বেয়নেটের আঘাতে তারও আঘাত লাগার সম্ভাবনা আছে। হঠাৎ সায়ন্তনের মনে হলো ঘর থেকে বন্দুক এনে যদি তাদের ভয় দেখানো যায় তবে হয়তো তারা থামতে পারে। -এ কথা ভেবে নিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বারান্দাতে উঠে বন্দুক আনতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি সে দিকে ফিরতেই দেখলেন, চাঁদের আলোতে বারান্দায় ওঠার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক –মোরগা গুনিন। চোখ, জিভ যেন মুখমণ্ডল থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, তার গলাটা অস্বাভাবিক লম্বা দেখাচ্ছে! আর সেই গলাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দড়ির ফাঁসের স্পষ্ট কালো দাগ! সায়ন্তনের উদ্দেশ্যে মোরগা গুনিন বলল, 'দেখ সাহেব দেখ, আমার মোরগ দুটো কেমন লড়ছে! ভায়ে ভায়ে কেমন লড়ছে!'

তার কথা শুনে সায়ন্তন আবারও তাকালেন সে দিকে। কিন্তু জওয়নরা কোথায়? সায়ন্তন দেখলেন দুবে ভাইদের জায়গাতে লড়াই করছে দানবাকৃতির দুটো মোরগ! তাদের একটার রং লাল অন্যটার রঙ সাদা। তবুও মনে জোর এনে গুনিনকে ঠেলে সরিয়ে বন্দুক আনতে যাচ্ছিলেন সায়ন্তন। কিন্তু তার আগেই মোরগা গুনিন ছুটে এসে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিলো সায়ন্তনকে। মোরগা গুনিনের হাতের স্পর্শে সায়ন্তন বুঝতে পারলেন অমন শীতল কঠিন হাত কোন মানুষের হাত হতে পারে না। জীবিত মানুষের সঙ্গে লড়াই করা চলে, কিন্তু মৃত মানুষের সঙ্গে লড়াই চলে না। জ্ঞান হারাবার আগে সায়ন্তন দেখলেন, লড়াই করে চলেছে সেই মোরগ দুটো। পায়ে বাঁধা ছুরির আঘাতে তারা ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে পরস্পরের শরীর। রক্ত ঝরছে, বাতাসে পালক উড়ছে ছুরির ফলার আঘাতে। আর সেই মোরগ লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে পৈশাচিক আনন্দে হাসছে মোরগা গুনিন।

পরদিন ভোরের আলো ফোটার পর স্থানীয় থানার পুলিশ কর্মীরা সায়ন্তনদের বিদায় জানাতে এসে অবাক হয়ে গেল। ব্যারাকের বারান্দার সামনের জমিতে তারা পড়ে থাকতে দেখল অচৈতন্য সায়ন্তনকে। আর তার কিছুটা তফাতেই কুস্তির জায়গাতে পড়ে আছে জওয়ান কৌশল দুবে আর দুর্যোধনের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। তাদের পায়ে বাঁধা আছে বেয়নেটের রক্তাক্ত ফলা। মোরগ লড়াইতে মোরগের পায়ে যেমন ছুরির ফলা বাঁধা হয়, ঠিক তেমনই তাদের পায়ে বাঁধা রয়েছে বেয়নেটের ফলা।

ছবি: সোমনাথ পাল

হাওড়ায় থাকি।

হাওড়া শহরটা, মায় শহর-মফস্‌সল গোটা হাওড়াটাই মহা প্রাচীন বটে। সেই কবে কোন 'হাওড়' 'হাবড়' না 'হাড়িড়া' গাছের জঙ্গল থেকে নাম হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'হাওড়া'!

বিপ্রদাস পিপলাইয়ের 'মনসা বিজয়'-এ চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যতরী চলেছে—

''ডাহিনে কোডরবাহি কামারহাটি বামে।
পূর্বেতে আড়িয়াদহ ঘুষীড়ি পশ্চিমে।।
চিৎপুরে পূজে রাজা সর্বমঙ্গলা।
নিশিদিশি বাহে ডিঙ্গা নাহি করে হেলা।।
তাহার পূর্বকূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা।
বেতড় চাপায় ডিঙ্গা চাঁদ মহারথা।।''

শুধু তাই নয়, কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল'-এও তো ধনপতি সদাগর, শ্রীমন্ত সদাগরদের হুগলি তথা গঙ্গানদীর উপর দিয়ে সপ্তডিঙা কলিকাতা চিৎপুর সালিখা বেতড়ের পাশ দিয়ে ভেসে গিয়েছিল—

''ধালিপাড়া মহাস্থান কলিকাতা কুটিলাস
দুই কূলে বসাইয়া বাট।
পাষাণে রচিত ঘাট দুকূলে যাত্রীর নাট
কিঙ্করে বসায় নানা হাট।।
ত্বরায় বহিছে তরী তিলেক না রয়
চিৎপুর সালিখা সে এড়াইয়া যায়।
কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা।।''

কিন্তু সাহেবসুবোদের আঁকা মানচিত্রে হাওড়া, হাবড়া কী

হাওয়া মোরগ

নলিনী বেরা
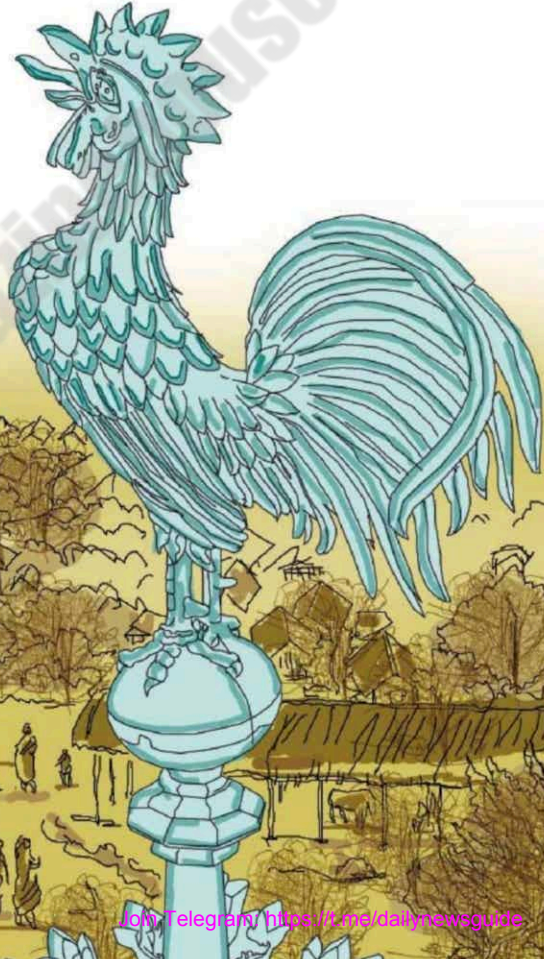
হাড়িড়ার কোনও নামগন্ধ নেই। 'জাও দ্য ব্যারোস' পনেরোশো বাহান্ন সন নাগাদ যে নকশা আঁকেন তাতে 'পিসাকোল' তথা 'পিকলদা'র নামোল্লেখ আছে।

জায়গাটা উলুবেড়িয়ার কাছাকাছি। কেউ কেউ বলেন, এটা শ্যামপুর থানার 'পিছলদা' গ্রাম। যেখানে নাকি চৈতন্যদেব পুরী যাবার পথে কিছুক্ষণ ছিলেন।

'জেমস রেনল'-এর আঁকা মানচিত্রেও এটা আছে। পনেরোশো একষট্টিতে 'গ্যাস্টালডি'র নকশায়ও 'পিকলদা'। হাওড়া শহরের একমাত্র বেতড় 'ডি, ব্যারোস'-এর ম্যাপে, 'ভেনেটিয়ান সিজার ফ্রেদেরিচি'র বিবরণীতেও আছে।

নকশা আঁকাআঁকিতে শহরটার নামগন্ধ থাক বা না থাক, শহরটাই না থাক, তখনও জায়গাটা মৌজাটা তো ছিল, ছিলই।

সতেরোশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লির বাদশাহ ফারুকশিয়রের কাছে ভাগীরথীর পূর্বতীরের তেত্রিশখানা গ্রামের সঙ্গে পশ্চিম তীরের গ্রাম সালিখা, হাড়িরা, কাসুন্দিয়া, রামকৃষ্ণপুর আর বেতড়েরও ইজারা চায়।

মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলি খাঁয়ের আপত্তিতে তা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সতেরোশো পঁয়ষট্টি সাল নাগাদ মীরকাশিমের আমলে ওই পাঁচটি গ্রামও তাদের দখলে আসে।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের 'হরিড়া' গাছের আধিক্য হেতু যেমন 'হড়িড়া' বা 'হাড়িড়া' তেমনি কালকাসুন্দের গাছ থেকেই হয়তো 'কাসুন্দিয়া'।

সেই কাসুন্দিয়ার হাল সংস্করণের গলি তস্য গলির চুরানব্বইয়ের তিনের দুই নম্বর হোল্ডিংয়ে আমি থাকি। কাছেই 'ডুমুরজলা'।

সাবেক 'কাসুনদিহ' যে এককালে হাওড় বাওড় জলাভূমি ছিল সে বিষয়ে আর সন্দেহ কী! সাঁত্রাগাছি ঝিল, পদ্মপুকুর, কুকুরভুখা জলা, তাছাড়াও শহর ছাড়ালে বাদার জলা, আবাদার জলা, কেদোর জলা, রাজাপুর জলা। কতরকম খাড়ি, বন্দর।

যাহোক, প্রথম প্রথম নবাবের লোক পত্তনি দেয়নিকো সাহেবদের। পরে তো নবাবই হেরে ভূত হল, সাহেবরা পাঁচটি মৌজার রায়তি পেল।

তারপর থেকে সাহেবরা কলিকাতা তো কলিকাতা, গঙ্গার এধারের 'কাতা'তেও কত নতুন নতুন 'কল' আমদানি করল।

একবার তো একটা 'গির্জা' বানাল, উপাসনা গৃহ। তার মাথায় লাগিয়ে দিল একটা টিনের পাতের মোরগ। মোরগটা হাওয়ায় ঘোরে, যাকে বলে 'হাওয়া মোরগ'।

সে ঘুরছে ঘুরুক। কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে যেদিকেই মুখ করে থামে, সেদিকেই নাকি 'ওলাউঠা' হয়, আর লোক মরে!

অথচ সাহেবদের ঘরের দিকে মুখ করে থাকলেও সাহেবদের ওলাউঠা হয় না। সাহেবরা মরে না, মরে শুধু 'নেটিভ'-রাই।

হুজুক দেখতে গাঁ থেকে একবার তিনজন লোক এল। দু'জন বৃদ্ধ, একজন যুবক। তারা কয়লাঘাটায় দাঁড়িয়ে দেখল— মোরগ মুখ করে আছে তাদের দিকেই—

—'ওরে বাবা রে!' বলে তারা দৌড়ুল খিদিরপুরের দিকে। মোরগ তখনও তাকিয়ে আছে তাদের দিকে!

আড়াল হতে তারা গেল বৈঠকখানায়। এবারও মোরগের মুখ যে তাদের দিকেই—

আর তো উপায়ান্তর নেই! এতক্ষণে তারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে পথিমধ্যেই ওলাউঠা হয়ে দু'জন বৃদ্ধ মারা পড়ল।

কোনওমতে বেঁচে গেল একজন।

—সেই যুবক।

॥ দুই ॥

হাওড়াকে বলা হত 'কুলিটাউন'।

ষোলোশো নব্বইয়ে কলিকাতা গড়ে উঠলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঙ্গার পশ্চিম পাড়কে বেছে নিয়েছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের যথার্থ কেন্দ্র হিসাবে।

তারও আগে বাণিজ্যতরী ভিড়েছিল জার্মানি ও পর্তুগিজ বণিকদের। উইলিয়াম জোন্স তথা 'গুরু জোন্স'-এর হাত ধরে গড়ে উঠেছিল 'অ্যালবিয়ান মিল'।

তাছাড়াও 'কটন স্ক্রু হাউস'। কাগজ কল, পেতলের কারখানা, দড়ি ও পাল তৈরির ক্যানভাস কাপড় মিল।

ঘুষুড়ি সালিখা শিবপুর হাড়িরা বা হাওড়ায় ডক, জাহাজ তৈরি ও মেরামতির কারখানা। চট চিনি তেল সুতা ও ময়দা কল।

আঠারোশো চুয়ান্ন তৈরি হল রেলপথ। হাওড়া ইস্টিশন। চাষবাস ছেড়ে সস্তার কুলি-মজুর, কারখানার শ্রমিক হতে দলে দলে বাঙালি অ-বাঙালি লোক এসে ভিড় করল হাওড়ায়।

বস্তিতে বস্তিতে ছয়লাপ হল হাওড়া। গোলাবাড়ি বস্তি, পিলখানা বস্তি, কুকুরভুখা বস্তি, ফাঁসিতলা বস্তি, কাজিডাঙা বস্তি—

তখন শিবপুর আর সালিখার মধ্যবর্তী অঞ্চলেও তেমন কিছু ছিল না। শুধুই জলা আর জলা। জলার উত্তর-দক্ষিণে শুষ্ক ডাঙায় বড় বড় নুনের গোলা, চালের গোলা, খড়ের গোলা, চিনির কল।

উইলিয়াম বুশের আঁকা ছবিতে দেখছি— সেকালের চিনিকলে মজুররা ভূতের মতোই বেগার খাটছে!

হরগঞ্জ ঘাট, চড়াঘাটে সৈদারি-পানসি, ক্যানভাস কাপড়ের পালতোলা নৌকা, গোরু-মোষের গাড়ি, পালকি আর কুলিদের ভিড়ে গিজগিজ করছে।

এখন যেখানে 'হংকং ব্যাঙ্ক', হাওড়া ময়দান, বঙ্গবাসী— এককালে সেখানেই ছিল 'নীলকারক' সাহেবদের নীলকুঠি।

কাছেই 'লিভেট সাহেব'-এর 'রাম' তৈরির কারখানা ও মদের ভাটি।

গোরা জাহাজিরা ডকে জাহাজ ভিড়িয়ে 'লিভেট সাহেব' কি 'চ্যাপম্যান সাহেব'-এর মদের ভাটিতে, চোলাইয়ের ঠেকে হল্লা করত, মারামারি করত।

তলে তলে দিনে-রাতে চলত ডক-ইয়ার্ড, জাহাজ মেরামতির ঠোকাঠুকি আর রং করা। বেকন, ম্যাকেঞ্জি, বোচাম্প, জর্জ ওয়াকার, এ্যাম্বার, ব্রেমার, গ্যাঞ্জেস নেভিগেশন কোম্পানির ডক।

অধিকন্তু ব্রাইটম্যান, ভিগনন, রিভস, খুরুটের রাধামোহন প্রামাণিক, কালীকুমার কুণ্ডু, জয়নারায়ণ সাঁতরা ইত্যাদি ইত্যাদি।

তৈরি হচ্ছিল লোহার পাত, নাট-বল্টু, স্প্রিং, চেইন, হুক, পেরেক। চাষবাসের যন্ত্রপাতি। ততদিনে 'কুলিটাউন' নাম বদলে হাওড়াও হয়েছে 'বঙ্গের শেফিল্ড'!

সে হয় হোক। আমি আদার বেপারি, জাহাজের কারবারে

আমার কী দরকার! নেহাত 'অর্ডারি' উপন্যাস লেখার তাগিদে 'প্লট' খুঁজতে যাওয়া।

আর এরমধ্যেই, বঙ্গাব্দ চোদ্দোশো ছাব্বিশ, ইংরাজি দু'হাজার বিশ, চব্বিশে মার্চ, মাত্র চার ঘণ্টার নোটিশে সারা দেশে লাগু হয়ে গেল 'লকডাউন'!

লকডাউন তো লকডাউন। বাস, ট্রেন, ট্যাক্সি, যাবতীয় যান-চলাচল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। রাতভোর কারফিউ!

একটাই কথা— 'স্টে হোম'।

'ঘরে থাকুন, বাইরে বেরবেন না। মুখে মাস্ক ও হাতে গ্লাভস পরুন। সামাজিক দূরত্ব ও লকডাউন মানুন। তবেই ভাঙা সম্ভব করোনার শৃঙ্খল।'

আসলে একটা হাওয়া উঠেছে, ভয়ঙ্কর হাওয়া। যার নাম 'নোভেল করোনা ভাইরাস— কোভিড-১৯'। চীনের উহান প্রদেশেই তার আঁতুড়ঘর।

নাকি একজন চোখের ডাক্তার, লি ওয়েন লিয়াং দু'হাজার উনিশের ডিসেম্বরে প্রথম তার হদিশ পান। একধরনের সংক্রামক নিউমোনিয়া।

জ্বর-কাশি-শ্বাসকষ্ট। ডায়ারিয়াও হতে পারে। পাতলা মলত্যাগ, বমি বমি ভাব। তদুপরি স্বাদহীনতা, গন্ধহীনতা। মুখের চারপাশে জ্বালা।

এই রোগেই লি ওয়েন লিয়াং মারাও যান। লোকে বলাবলি করল— চীনারা আরশোলা, ব্যাঙ-বাদুড়, সাপ-ইঁদুর-বাঁদর, যতসব অখাদ্য জন্তু-জানোয়ার খায়।

—এ রোগ তাদের হতেই পারে। তা বলে—

না, না। ছাড় দিল না আমাদেরও। আমাদের দেশেও তার শুভারম্ভ হল ত্রিশে জানুয়ারি, দু'হাজার বিশ।

বিশ্বের এই মহামারী অতিমারীতে বিষময় হয়ে উঠল সারা বিশ্ব। এ পর্যন্ত আমেরিকাতেই লোক মরল সবচেয়ে বেশি। যতদিন না ভ্যাকসিন আবিষ্কার হচ্ছে ততদিন এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নাকি একমাত্র অস্ত্রই 'লকডাউন'—

—লকডাউন, লকডাউন।

প্রথমটায় এই নিয়ে হাসাহাসি হল খুব, ঠাট্টা-ঠিসারা। কিন্তু কদিন বাদেই একটা খবর বেরল— 'রেললাইনে ঘুম, মালগাড়ির চাকায় ছিন্ন ১৬। লাইনে পড়ে আছে শ্রমিকদের জামাকাপড়, চটি ও না-খাওয়া রুটি!'

ঝুঁকে পড়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবিগুলো দেখছি— আমাদের দেশ-গাঁ মেদিনীপুরের কেউ আছে নাকি!

রাঙ্গিয়াম, হাঁড়িমারি, নলদাম, আম্ভিসোল, বাঁশকুঠি, ভেলাইচাটী, সিংধুই, বাঁশিয়াসোল, বাছুরখোয়াড়, খান্দারপাড়া থেকেও তো 'নামাল' খাটতে দাঁতন, বেলদা, হিল্লি-দিল্লি, গুজরাট, মহারাষ্ট্রে কত লোকে যায়!

যেমনটা এরাও গিয়েছিল মধ্যপ্রদেশের উমরিয়া থেকে ঔরঙ্গাবাদের জলনায়। লকডাউনের দরুন কাজকাম হারিয়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরছিল। কম তো নয় দেড়শো কিলোমিটার রাস্তা!

পথশ্রমে, ক্লান্তিতে ঘুম। রেললাইন তো রেললাইনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল ওরা। কী হবে, লকডাউনে রেলগাড়ি তো বন্ধ! রেলগাড়ি না, মালগাড়িই পিষে দিল তাদের।

কেউ কেউ বলল বটে, মরল যারা তারা বে-ফালতু। রেললাইন তো রেলগাড়ি চলাচলের রাস্তা, ঘুমোবার জায়গা কি!

তা অবশ্য ঠিক।

দিনকতক বাদে। আরও খবর— 'দিল্লির নিজামুদ্দিন সেতুর কাছে এক পরিযায়ী শ্রমিক তার গুরুতর অসুস্থ ছেলেকে দেখতে যেতে লকডাউনে কোনও গাড়ি-ঘোড়া না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে হেঁটেই রওনা দিয়েছিল—

—কিতনা দুরি যাওগে?

সে যমুনার ওপার দেখিয়ে কোনমতে বলেছিল—

—উধার!

—উধার মতলব?

জানা গেল— সে যাবে বিহারের বেগুসরাই। কম সে কম ১২০০ কিলোমিটার। পায়ে হেঁটে! বাপরে!'

তারপর আরও খবর— শুনশান রেলওয়ে স্টেশন। ট্রেন তো নেই-ই। লোকজনও নেই। প্ল্যাটফর্মে মরে পড়ে আছে এক মহিলা। তার পরনের কাপড় ধরে টানাটানি করে চলেছে তার দুধের শিশু, করেই চলেছে—

তারপরেও খবর—

তারপরেও—

তার—

॥ তিন ॥

মেদিনীপুর ছেড়ে হাওড়ায় আছি—

হ্যাঁ, তা ন্যূনাধিক ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর! এতদিনে অভিজ্ঞান হয়েছে বইকি—

> 'দেশ এখনও গঙ্গাকে আপনার
> প্রাণ জ্ঞান করে, আমাদের দেশ এখনও
> অমরতাকে স্পর্শ করে...।।'

গঙ্গার পশ্চিম পাড় তো পশ্চিম পাড়, উত্তর-দক্ষিণ এমনকী পশ্চিমেও অনেক দূর পর্যন্ত 'সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে'—

ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ইউপি থেকে আজও সস্তার কুলি, ঢালাই কারখানা, লেদমেশিনের শ্রমিক, কর্পোরেশনের সাফাই কর্মী, ইমারতি বিজনেসের নির্মাণশিল্পী হয়ে দলে দলে লোক এসেছে হাওড়ায়।

তারা এখন শহরের দরিদ্র পল্লির মধ্যে টালি বা টিনের ছাদযুক্ত অপরিচ্ছন্ন বাড়ি বা ওইরূপ কতকগুলি বাড়ির সমষ্টি, House of rooms in a street, alloy etc., of badly built, over crowded buildings-য়েই থাকে না, মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত পাড়ায়ও বাসা নিয়েছে।

যাদের দাগা মারা হচ্ছে লকডাউনের বাজারে 'পরিযায়ী' শ্রমিক হিসাবে। পরিযায়ী তো পাখিরা। ওই যারা—

বিশেষত শীতের মরশুমে মাথার উপরে 'মেঘ-পাতাল'-এ উদয়াচল কি দিকচক্রবালে একদঙ্গল কালো-কুলো বিন্দু বিন্দু ফুটকির মতো পাখিরা কখনও বৃত্তাকারে কখনও বা অর্ধচন্দ্রাকারে কখনও এক রেখায় 'কারিকুরি' অর্থাৎ কারুকার্য করতে করতে আঁকতে আঁকতে উড়ে আসে।

বালিহাঁস খড়হাঁস বিগড়িহাঁস দিগহাঁস মরাল শামুখখোল ইত্যাদিরা।

সে ধরলে আমাদের গ্রামে-ঘরেও, রাঙ্গিয়াম-হাঁড়িমারি-নলদাম- ভালিয়াঘাটী- বাঁশিয়াসোল- বাছুরখোয়াড়-নুয়াসাহীতে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যাও খুব অল্প-বিস্তর না।

ফোনাফুনি করে জানতে পারি— আমার নিজেরই ভ্রাতুষ্পুত্র, বড়দার ছেলে, এই অমোঘ লকডাউনের বাজারে আটকা পড়ে আছে সুরাটে!

তাকে পই পই করে নিষেধ করা হল অপরাপর সঙ্গীদের

পাল্লায় পড়ে ভুলেও কোনওরকম হাঁটার ঝুঁকি না নিতে! তার সঙ্গে মুহুর্মুহু যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

ইত্যবসরে 'তালহাট' থেকে একটা সুখবর এল। সুখবর বলতে সুখবর!

রাঙ্গিয়াম, নলদাম, হাঁড়িমারি গ্রামের 'মাঞ্জহি হাড়াম' অর্থাৎ মোড়লরা তাদের 'খাপ-পঞ্চায়েত'-এর ইস্পাত কঠিন আদেশে মাস কয়েক আগে সর্বস্বান্ত করে গ্রামছাড়া করেছিল তিন-তিনটে পরিবারকে।

আজ 'মালট'-মহামারীর এক ধাক্কায় সবকিছুই মার্জনা করে তারা এই বলে তাদের নাকি ডাক দিয়েছে— ফিরে আয়! মরতে হয় যদি তো মরি একসঙ্গে!

আর তারা ফিরে আসছে। হাঁটতে শুরু করেছে, হাঁটছে। তার মধ্যে আমার মাথায় বহু আকাঙ্ক্ষিত উপন্যাসের প্লটটাও এসে গিয়েছে।

আহারে! 'নোভেল করোনা ভাইরাস— কোভিড-১৯'! রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের মিনির মতোই নিজের হাঁটু ও হাত নিয়ে যেন আগডুম-বাগডুম খেলে চলেছে, আর—

'... সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রতাপ সিংহ তখন কাঞ্চনমালাকে লইয়া অন্ধকার রাত্রে কারাগারের উচ্চ বাতায়ন হইতে নিম্নবর্তী নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন।'

একদিন রাতে, রাত তখন ১২টা হবে, আমার উপন্যাসেরও সপ্তদশ পরিচ্ছেদ লিখে উঠে উপন্যাসের সমাপ্তি টানছি, ততদিনে 'রেড কন্টেনমেন্ট জোন' হিসাবে আমাদের পাড়ায় লকডাউন আরও কড়া হয়েছে।

পাড়ার এ-মুখ সে-মুখ কাঠ দ্বারা আবদ্ধ। পাড়ার ছেলেরা পালা করে 'পিকেটিং' চালাচ্ছে।

হঠাৎ ভারী শোরগোল উঠল। আর গণ্ডগোলটা যেন আমাদের বাড়ির সামনেই। একেবারে দোরগোড়ায়!

মুহূর্তে শুধু গোলমালের হাবি-জাবি কথাগুলোই থাকল। আর সব চুপ, শুনশান।

তারপরই দুদ্দাড় করে দরজা খুলে গেল। 'সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং' বজায় রেখেই আওয়াজ আসতে লাগল একটার পর একটা—

—ব্যাপার কী?

—কী ব্যাপার?

ব্যাপার কিছু হয়েছে। আমাদের বাড়ির গলির বাঁদিকে পুকুরপাড়ে এক চিলতে জমির উপর বাড়িওয়ালার একটা দশফুট বা ছ'ফুট টালির ঘর। বর্ষায় জল পড়ে বলে তাতে আবার চাপা দেওয়া পলিথিন শিট।

ঝুপড়িই বলা চলে। নিজেদের গরজে এক-আধটু পুকুর বুজিয়ে একটি কাঁঠাল ও নারকেল গাছ এর মধ্যেই মাথা চাড়া দিয়েছে।

সেখানে ভাড়াটে তিনজন। বৈজুনাথ, বাবুলাল আর মহাদেব। মোকাম বিহারের দ্বারভাঙা না সীতামাঢ়ী। পেশায় রাজমিস্ত্রি। একজন যুবক, দু'জন প্রায় বৃদ্ধ।

লকডাউনের আগেই দেশে গিয়েছিল। ট্রেন, বাস বন্ধ। এলই বা কী করে! এসে পাড়ার ছেলেদের চোখে ধুলো দিয়ে ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিয়েছে দরজায়!

তাই নিয়েই শোরগোল। পাড়ার ছেলেরাই তুমুল চেঁচাচ্ছে। সেই সঙ্গে মা-বোনেরা—

—বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে থাকি। ইয়ার্কি মারতা! ভাগো হিঁয়াসে!

ফোন আসছে—

—১৪ দিন কোয়ারেনটাইনে থাক।

ফোন গেল ডুমুরজলা কোয়ারেনটাইন সেন্টারে।

—হাউসফুল!

ফোন গেল ১০০ নম্বরে—

—দেখছি!

ফোন গেল হাওড়া কর্পোরেশন কন্ট্রোল রুমে—

—ফোন বেজেই চলেছে।

অগত্যা সিদ্ধান্ত হল— আজকের রাতটা না হয় থাক 'হোম আইসোলেশনে'।

তাও হল না। রিপোর্ট এল—

—দু'জন ঘন ঘন কাশছে। আরেকজন বাথরুমে যাচ্ছে-আসছে।

রাত ৩টা। ঘরের বাইরে যথেষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে পাড়ার ছেলেরাই হুমকি দিল—

—বেরও! নচেৎ ঘরে তালা পড়বে বাইরে থেকে!

তিনজনই বেরল সুড় সুড় করে। এক হাতে ব্যাগ এক হাতে বাটাম। ব্যাগের ভেতর হয়তো কন্নিক, ওলন সুতো, ব্রাশ।

হেঁটেই পেরিয়ে গেল গলিটা। তারপর দৌড়ুল। হেঁটে-দৌড়ে রেলপথ ধরেই হয়তো পৌঁছে যাবে সীতামাঢ়ী কি দ্বারভাঙা। পথশ্রমে ঘুম পায় যদি তো রেললাইনেই ঘুমোবে।

হাওয়া মোরগ ঘুরছে। এখন দেখার— ঘুরতে ঘুরতে কোন দিকে মুখ করে। ♠♠

অলংকরণ: সোমনাথ পাল

স্বপ্নের রেলপথে

অয়ন গঙ্গোপাধ্যায়

সাইবেরিয়া। বিশ্ব মানচিত্রের একেবারে উত্তরে মেরুপ্রদেশের অনতি দূরে ঘুমিয়ে আছে প্রকৃতির সেই মায়াবী জাদু দুনিয়া। স্থানীয় টাটার ভাষায় সাইবেরিয়া শব্দের অর্থ— 'ঘুমের দেশ।' বছরের প্রায় সাত থেকে আট মাস তুষার চাদরে ঢেকে থাকে সাইবেরিয়ার প্রকৃতি। সঙ্গে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা হাওয়ার দাপটে প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায় সেখানকার জনজীবন। সাইবেরিয়ার এই ছবির সঙ্গেই আমরা সবথেকে বেশি পরিচিত। ছেলেবেলায় স্কুলের ভূগোল বইয়ে পড়া সাইবেরিয়ার রোমাঞ্চকর ভূ-প্রকৃতি— তুন্দ্রা অঞ্চল, তাইগা অঞ্চল, বৈকাল হ্রদ— এইসবের কথা বারবার মনকে নাড়া দিত। সাইবেরিয়ার নৈসর্গিক শোভার কথাও কত শুনেছি, কত লেখায় তা পড়েছি, কত বর্ণময় ছবিতে তার রূপ দেখেছি। কিন্তু তার সঙ্গে নিজের চোখে দেখার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ তো হবেই। স্বচক্ষে দেখে মনে হবে সাইবেরিয়া যেন সুদূর কোনও স্বপ্নপুরী।

দেশ ভ্রমণের পাশাপাশি যেদিন থেকে বিশ্বভ্রমণের নেশাটাও আমার ওপর চেপে বসল, সেদিন থেকেই সাইবেরিয়া ভ্রমণের সুপ্ত বাসনা মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল। মাঝেমধ্যেই মনে হতো কবে যে যাব সেই সুন্দরের স্বপ্নরাজ্যে। আমার সাইবেরিয়া ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল দুটি। প্রথমটি হল

• লিস্তভিয়াঙ্কা গ্রাম

সেখানকার আশ্চর্য প্রকৃতির রূপদর্শন, আর দ্বিতীয়টি হল সেই দুর্গম প্রকৃতির বুক চিরে ছুটে চলা পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়েতে অবিস্মরণীয় ট্রেনযাত্রার সাক্ষী হওয়া। অবশেষে ২০১৯-এর জুন মাসে হঠাৎ করেই আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত সাইবেরিয়া ভ্রমণের সুযোগ হাতের মুঠোয় ধরা দিল। বিস্তর পড়াশোনা আর নেট দুনিয়া ঘেঁটে দেখলাম সাইবেরিয়া ভ্রমণের সেরা সময় জুন থেকে সেপ্টেম্বর। এই চার মাস এখানে গ্রীষ্মকাল। শীতের সাইবেরিয়ার তুষারময় রূপ দেখতে কিছু উৎসাহী পর্যটক সেখানে যায় বটে, কিন্তু সেই দুর্গম প্রকৃতির মাঝে নানা প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে বেড়ানোটা বেশ কষ্টকর। সেই সময় বরফে ঢেকে থাকে সমস্ত পর্যটন কেন্দ্র। বন্ধ থাকে বিভিন্ন দ্রষ্টব্যস্থান। রেলপথে কমে যায় ট্রেনের সংখ্যাও। অনেক পরিষেবাও বন্ধ থাকে। সাধারণত শীতে সাইবেরিয়া ঘুরতে যায় অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীরা। যাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল শীতে জমে যাওয়া বৈকাল হ্রদের ওপর দিয়ে ট্রেকিং করা। তবে সেই সংখ্যাটাও যথেষ্ট কম। তাই গ্রীষ্মই এখানের ভ্রমণ মরশুম। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, সাইবেরিয়া ভ্রমণ খুব একটা সহজসাধ্য নয়। বিপুল খরচ, দীর্ঘদিনের সফরসূচি, ট্রেনযাত্রার ধকল, খাওয়া এবং ভাষার সমস্যা।

যেহেতু সাইবেরিয়া ভ্রমণের ইচ্ছা বহুদিন ধরেই আমার মনে জমা ছিল, তাই একটা প্রাথমিক সফরসূচিও আগাম স্থির করে রেখেছিলাম। বেশিরভাগ পর্যটকই মস্কো থেকে ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলে চেপে দীর্ঘ সফর শেষে পৌঁছয় এই পথের শেষ স্টেশন ভ্লাডিভস্টক শহরে। অনেকে আবার মাঝপথে বৈকাল হ্রদ দেখার জন্যে নেমে যায় ইরকুতস্ক শহরে। আমার সাইবেরিয়া বেড়ানোর পরিকল্পনা ছিল একেবারে অন্য ধাঁচের। বারবার তো এত খরচ করে এখানে আসা সম্ভব নয়। তাই যাচ্ছিই যখন, তখন যতটা সম্ভব খুঁটিয়ে বেড়াব। তাই স্থির করলাম দীর্ঘ ট্রেনযাত্রার ক্লান্তি ও একঘেয়েমি কাটাতে ভেঙে ভেঙে রেল সফর করব। আর সেই ফাঁকে অচেনা বিদেশভূমির একাধিক গ্রাম, গঞ্জ, শহর বেড়িয়ে সেখানকার চিরকালীন সৌন্দর্য, কালজয়ী ইতিহাস আর চলমান লোকসংস্কৃতির রঙিন ছবি দু'চোখ ভরে দেখব। আর এভাবে না বেড়ালে আমার যে আবার মন ভরে না। সাইবেরিয়ার ভ্রমণ পরিকল্পনা যখন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে ঠিক তখন অযাচিতভাবে আমার পরিচিত ভ্রমণসংস্থার সাইবেরিয়া ভ্রমণের ব্যবস্থাপিত সফরসূচি হাতে এল। সাধারণত প্যাকেজট্যুরে সাইবেরিয়া ভ্রমণ কোনও ভ্রমণ সংস্থা সেভাবে করায় না। তার প্রধান কারণ পর্যটকমহলে এই ট্যুরের চাহিদা নেই। তাই এরা করাচ্ছে দেখে অবাকই হলাম। যাইহোক, এদের সফরসূচিতে চোখ বুলিয়ে দেখলাম আমার ভাবনার সঙ্গে অনেকটা মিলে যাচ্ছে। সঙ্গে বাড়তি পাওনা মঙ্গোলিয়া ভ্রমণ। এ তো দেখছি এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়ে যাবে। আর লোভ সামলানো গেল না। ওদের সফরসূচিতে আমার পছন্দমতো আরও কিছুটা সংযোজন বিয়োজন ঘটিয়ে অসাধারণ একটা চূড়ান্ত ভ্রমণসূচি তৈরি হল। এরপরের কাজটা হল সমস্ত কিছুর অগ্রিম বুকিং করে নেওয়া। আমরা মনস্থির করলাম ওই সংস্থার সঙ্গেই যাব। তাই বুকিংয়ের দায়িত্বটা তারাই নেবে। এক্ষেত্রে শুধু একটাই চিন্তা ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ের দিন অনুযায়ী রিজার্ভেশন পাওয়া। সিজনে এই টিকিটের বেশ চাহিদা থাকে শুনেছি। তারওপর আমরা বেশ কয়েকবার ট্রেনে নামা-ওঠা করব। তাই নির্দিষ্ট দিন অনুযায়ী ট্রেনের টিকিট না পেলে পুরো পরিকল্পনাটাই মাটি হয়ে যাবে। অবশেষে সমস্ত ব্যবস্থাই মসৃণভাবে সম্পূর্ণ হল। একসময় রাশিয়া ও মঙ্গোলিয়ার ভিসাও হাতে পেয়ে গেলাম। দেখতে দেখতে এসে গেল সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত সাইবেরিয়া ভ্রমণের শুভযাত্রার দিন।

জুন মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতা থেকে রওনা দিলাম। ১৬ জনের ছোট্ট দল। সঙ্গে রয়েছে আমার দুই প্রিয়জন সুবীর আর মহুয়া। এছাড়াও রয়েছে সমমনস্ক কয়েকজন ভ্রমণসঙ্গী যাদের সঙ্গে আগেও কয়েকটা দেশ ঘুরেছি। এই সফরে আরও আধডজন নতুন ভ্রমণবন্ধু আমাদের সঙ্গী হয়েছিল। এই ট্যুরে আমাদের দলনেতা প্রশান্ত। আমার পছন্দের এই মানুষটি যেমন প্রাণবন্ত, তেমন বিদেশ ভ্রমণে ওর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অপরিসীম। এক কথায় বললে ওর জন্যেই আমার সাইবেরিয়া ভ্রমণের স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল। লটবহর নিয়ে সময়মতো পৌঁছে গেলাম কলকাতার বিমানবন্দরে। লাগেজটা এবার একটু বেশিই ভারী হয়েছে অতিরিক্ত শীতবস্ত্রের জন্যে। সাইবেরিয়ায় এখন গ্রীষ্ম হলেও ঠান্ডার আমেজ যথেষ্ট রয়েছে। মাঝেমধ্যেই আবার কনকনে ঠান্ডা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যায়। এই সময় সেখানকার আবহাওয়া বেড়ানোর উপযোগী। বৃষ্টির পরিমাণও বেশ কম। সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে শুকনো খাবার নিয়েছি দীর্ঘ ট্রেন সফরের জন্যে। মনের মধ্যে চরম উত্তেজনা। অবশেষে চলেছি স্বপ্নের সাইবেরিয়া। যাতায়াত নিয়ে ১৬ দিনের সফর।

কলকাতা থেকে প্রথমে যাব দিল্লি। ভিস্তারা এয়ারওয়েজের বিমানে চেপে রাত এগারোটায় দিল্লি পৌঁছলাম। বিমানবন্দরেই আজ রাতটা কাটাতে হবে। নিজেদের মধ্যে গল্পগুজবেই রাত কাটল। এখান থেকে চাপব মস্কোগামী বিমানে। আগামীকাল ভোর পাঁচটায় বিমান ছাড়ার কথা। যাচ্ছি রাশিয়ার বিমানসংস্থা এরোফ্লোটের বিমানে। এই বিমান দিল্লি থেকে সরাসরি মস্কো যাবে। যেতে সময় লাগে প্রায় সাড়ে ছ'ঘণ্টা। সময়মতো এয়ারপোর্টের কাউন্টারে চেক-ইন করতে গিয়ে জানলাম বিমান দেরিতে ছাড়বে। কারণ হিসেবে জানা গেল দিল্লি থেকে মস্কো যে নির্দিষ্ট আকাশপথে বিমান যায় সেই আন্তর্জাতিক আকাশসীমায় বিমান ওড়ায় সাম্প্রতিক কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় অনেকটা ঘুরপথে বিমান যাচ্ছে। তাই সময়ও বেশি লাগছে আর দেরিও হচ্ছে নিয়মিত। চেক-ইন কাউন্টারে লাগেজ জমা দিয়ে বোর্ডিং পাস নিয়ে নিলাম। ভোর পাঁচটার পরিবর্তে বিমান ছাড়ল সকাল সাড়ে ৯টায়। বেশ বড় বিমান। ভেতরে কোনও আসন খালি নেই। দিল্লি থেকে প্রতিদিন বিমান উড়ছে মস্কোর পথে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে দু'বার খাবার পরিবেশন করা হল। তবে পরিষেবা খুব একটা আহামরি নয়। গত রাতে দিল্লি বিমানবন্দরে প্রায় জেগেই কাটিয়েছি। তাই কিছুটা ক্লান্তি লাগছিল। উড়ানপথে খাওয়া সেরে ক্লান্তি কাটাতে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলাম। চালকের ঘোষণায় ঘুমটা ভেঙে গেল। আমরা আর একটু পরেই মস্কোয় নামব। ঘুরপথে আসায় উড়ানে মস্কো পৌঁছতে অতিরিক্ত প্রায় ২ ঘণ্টা বেশি সময় লাগল।

মস্কো পৌঁছলাম স্থানীয় সময় দুপুর সাড়ে তিনটে। এখানকার সময় ভারতীয় সময়ের থেকে আড়াই ঘণ্টা পিছিয়ে। আমরা নামলাম মস্কোর সেরেমোভোভো বিমানবন্দরে। মূল শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে এর অবস্থান। ইমিগ্রেশনের পর্ব মিটিয়ে মালপত্র নিয়ে বাইরে বেরলাম। মেঘলা আবহাওয়া। ভালোই শীত রয়েছে। বৃষ্টি

পড়ছে ঝিরঝির করে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আমি মস্কো এলাম। বাইরে বেরতেই দেখি প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের গাইড অ্যানা। আমাদের স্বাগতম জানিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, কেউ স্থানীয় মুদ্রা বিনিময় করবেন কিনা। ওর কথামতো এয়ারপোর্টের ফরেন মানি এক্সচেঞ্জ কাউন্টারে গিয়ে ডলার ভাঙিয়ে রাশিয়ার মুদ্রা রুবল কিনে নিলাম। এই দেশে যাবতীয় ব্যক্তিগত খরচ করার জন্যে রুবল লাগবে। এরপর আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট বাসে চড়ে চললাম হোটেলে। বিমানবন্দর থেকে ঝাঁ চকচকে রাজপথ দিয়ে একঘণ্টার বাসযাত্রার শেষে পৌঁছলাম হোটেলে। হোটেলের নাম আইবিস ডায়নামো। তারকামানের অসাধারণ হোটেল। বাইরে এখনও বৃষ্টি হয়ে চলেছে। শুনলাম নিম্নচাপের জন্যে কয়েকদিন ধরে এমন বৃষ্টিভেজা আবহাওয়া। যদিও এখন এখানে বর্ষাকাল নয়। তবে ইউরোপের আবহাওয়ার এমন খামখেয়ালিপনা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। আমাদের গাইড কাল আবার আসবে বলে সকলকে শুভরাত্রি জানিয়ে নিজের বাড়ি ফিরে গেল। দীর্ঘ বিমানযাত্রার ক্লান্তি এড়াতে তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন, বেশ সকালেই উঠে পড়েছি ঘুম থেকে। জানলার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি বৃষ্টি থেমেছে। তবে আকাশের মুখ ভার। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে চলে এলাম ব্রেকফাস্ট টেবিলে। রেস্তোরাঁয় থরে থরে সাজানো আছে নানা ধরনের পদ। কোনটা ছেড়ে কোনটা খাব। প্রাতরাশের পরে বেরিয়ে এলাম হোটেলের বাইরে। শীতের মোলায়েম স্পর্শে শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল। ক্লান্তি একেবারেই উধাও হয়ে গেছে। আমাদের গাইড রুশ তরুণী অ্যানা সময়মতো হোটেলে চলে এল। এর আগেরবার যখন রাশিয়া বেড়াতে এসেছিলাম, সেবার মস্কো শহরটা খুঁটিয়ে বেড়িয়েছিলাম। এবার তাই অন্য পথে পা বাড়াব। বাস ছাড়ল সকাল দশটায়। শহরকে পিছনে ফেলে বাস ছুটছে হাইওয়ে দিয়ে। প্রায় ৭৫ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে বাস থামল সেরগিয়েভ পোসাদ নামে এক প্রাচীন জনপদে। এখানে আমরা দেখতে এসেছি ১৪ শতকের তৈরি বিশ্ব ঐতিহ্যের তকমা পাওয়া ট্রিনিটি লাভরা সেন্ট সেরগিয়াস মনাস্ট্রি। কয়েক একর জায়গা জুড়ে সাজানো বাগানের মাঝে ছড়িয়ে আছে একগুচ্ছ দৃষ্টিনন্দন চার্চ, আশ্রম সহ অনেক সৌধ। এদিকটায় পর্যটকদের ভিড় বেশ কম। অসাধারণ এই জায়গাটি গাইডের তত্ত্বাবধানে ভালোভাবে ঘুরে দেখলাম। এখান থেকে ফেরার পথে দেখে নিলাম প্রকৃতির কোলে লুকিয়ে থাকা চমৎকার র‍্যাডোনেজ গ্রাম। গ্রামের চারপাশে আরণ্যক প্রকৃতি বৃষ্টিতে ভিজে আরও সতেজ হয়েছে। সারাদিন বেড়িয়ে বিকেলবেলা আবার ফিরে এলাম মস্কো শহরে। বাসে বাসেই শহরটাকে একচক্কর পাক দিয়ে নিলাম। চোখের সামনে চেনা রেড স্কোয়ার, ক্রেমলিন, সেন্ট ক্যাসিলস ক্যাথিড্রাল যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বাস থেকেই দেখতে পেলাম ১৮৬২ সালে তৈরি ইয়ারোস্লাভস্কি রেল স্টেশন। অনবদ্য স্থাপত্যশৈলীতে বানানো এই স্টেশন থেকেই ছাড়ে ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ের ট্রেন। এছাড়াও এই রেলপথ দিয়ে যাওয়া চীনের বেজিং ও মঙ্গোলিয়ার উলানবাতারগামী আন্তর্জাতিক ট্রেনগুলোও ইয়ারোস্লাভস্কি স্টেশন থেকেই ছাড়ে।

আমাদের সফরসূচি অনুযায়ী এই স্টেশন থেকে আমরা ট্রেনে চাপব না। আমরা ট্রেনসফর শুরু করব ইয়েকাতেরিনবুর্গ থেকে। মস্কো থেকে ভ্লাদিভস্টক অর্থাৎ রাশিয়ার পশ্চিম থেকে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এই রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৯২৮৯ কিলোমিটার। দুনিয়ার দীর্ঘতম এই রেলপথের নির্মাণকার্য শুরু হয় ১৮৯১ সালে জার সম্রাটদের শাসনকালে। এই রেলপথ তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন জার সম্রাট তৃতীয় আলেকজান্ডার ও তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নিকোলাস। এই বিশাল কর্মকাণ্ডের দুটি উদ্দেশ্য ছিল। একটি হল বিশাল দেশ রাশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগর ঘেঁষা পূর্ব উপকূলকে দ্রুত যোগাযোগের মাধ্যমে নিরাপত্তা দেওয়া, আর অন্যটি হল সাইবেরিয়া অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা বিপুল খনিজ সম্পদের বাণিজ্যিকরণের সুবিধার্থে এই রেলপথকে ব্যবহার করা। রেলপথ তৈরি শেষ হলে ১৯১৬ সাল থেকে চালু হল ট্রেন চলাচল। দুর্গম আবহাওয়া সত্ত্বেও বছরভর এইপথে ট্রেন চলে। এই রেলপথে যাত্রীবাহী গাড়ির থেকে মালগাড়ির সংখ্যা অনেক বেশি। এই রেলপথ পাতা হয়েছে সাইবেরিয়ার দক্ষিণাংশ দিয়ে যেখানে লোকবসতি আর শহরের সংখ্যা বেশি। মস্কো থেকে ইয়েকাতেরিনবুর্গ, ওমস্ক, বারাবিনিস্ক, নোভোসিবিরিস্ক, ক্রাসনয়ারস্ক, ইরকুতস্ক, উলানউদে, চিতা প্রভৃতি বড় জনপদ পেরিয়ে পৃথিবী বিখ্যাত এই রেলপথ শেষ হয়েছে ভ্লাডিভস্টক শহরে। ট্রেনে চেপে এই পুরো পথ পেরতে সময় লাগে ৭ দিন। আরেকটা তথ্যও বেশ চমকপ্রদ। এই যাত্রাপথে ৭টা টাইম জোনও পেরতে হবে। অর্থাৎ জায়গা অনুসারে সাতবার ঘড়ির সময়কে বদলাতে হবে। ভাবলে অবাক লাগে এই প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে ৬২ হাজার শ্রমিকের নিরলস পরিশ্রম আর মুন্সিয়ানায় কীভাবে তৈরি হয়েছে ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে। পুরোটাই ব্রডগেজ রেলপথ। প্রধান রেলপথ থেকে কয়েকটি শাখা রেলপথও বেরিয়েছে। দুটি আন্তর্জাতিক রেলপথের একটি ট্রান্স মঙ্গোলিয়ান রেলওয়ে মঙ্গোলিয়ার উলানবাতার থেকে এসে মিশেছে এই রেলপথের উলানউদেতে। আরেকটি রেলপথ ট্রান্স মাঞ্চুরিয়ান রেলওয়ে চীনের বেজিং থেকে এসে যুক্ত হয়েছে চিতা থেকে কিছুটা দূরে ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথের সঙ্গে।

মস্কো থেকে কেন আমরা ট্রেনে চাপব না সেই ব্যাপারটা এবার একটু খোলসা করে বলি। মস্কো থেকে ইয়েকাতেরিনবুর্গের রেলপথের দূরত্ব ১৮১৬ কিলোমিটার। প্রায় ২৬ ঘণ্টার ট্রেনযাত্রা। অর্থাৎ পুরো একটা দিন নষ্ট হবে। আমাদের তো শুধু ট্রেন চড়াই উদ্দেশ্য নয়। ট্রেন চড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাইবেরিয়ার নানা দ্রষ্টব্যস্থান এক যাত্রায় দেখে নিতে হবে। তাই সময়টাও কিছুটা বাঁচাতে হবে। আর মস্কো থেকে ইয়েকাতেরিনবুর্গ পর্যন্ত রেলপথটা সাইবেরিয়া অঞ্চলের মধ্যে পড়ছে না। তাই এই পথ না দেখার আফশোস তেমন থাকবে না। তাই আমাদের সাইবেরিয়া অঞ্চলের প্রথম গন্তব্য ইয়েকাতেরিনবুর্গ মস্কো থেকে বিমানযাত্রা ঠিক করলাম। মস্কো শহরের একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁয় নৈশাহারের ব্যবস্থা করা ছিল। নাম 'দরবার'। মস্কোয় অনেক ভারতীয় খাবারের রেস্তোরাঁ রয়েছে। খাওয়ার পরে বাস ছুটল ৩০ কিলোমিটার দূরে ভুকোবো বিমানবন্দরের দিকে। এটি মস্কো শহরের আরেকটি বিমানবন্দর। রাত ৯টা নাগাদ পৌঁছলাম এই বিমানবন্দরে। গাইড অ্যানা এখানেই আমাদের বিদায় জানিয়ে মস্কো ফিরে গেল। এখান থেকে চাপলাম পোবেদা এয়ারওয়েজের বিমানে। রাত ১২টা নাগাদ বিমান উড়ল। এত রাতের বিমানেও দেখলাম বেশ ভিড়। কিছু আমাদের মতো বিদেশি পর্যটকও রয়েছে। মস্কো থেকে ইয়েকাতেরিনবুর্গ

পৌঁছতে ২ ঘণ্টা ২০ মিনিটের মতো সময় লাগবে।

ভোর রাতে বিমান পৌঁছল ইয়েকাতেরিনবুর্গ। এখানকার সময় মস্কো থেকে ২ ঘণ্টা এগিয়ে। পুবদিগন্তে আকাশ রঙিন করে সূর্য উঠল। বাইরে ভালোই ঠান্ডা। বিমানবন্দরের ডিসপ্লে বোর্ড জানান দিচ্ছে ১২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। বিমানবন্দরের ভেতরে হিটার চলায় শীত খুব একটা মালুম হচ্ছে না। এই শহরে আজ সারাদিন বেড়িয়ে রাতে ট্রেনে চাপব। বিমানবন্দরের বাইরে বেরিয়ে দেখি রোদ ঝলমলে শীতল আবহাওয়া। স্থানীয় গাইড মাইকেল ঠিক সময়েই এসে হাজির হয়েছে। প্রথমেই গেলাম স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁয় ব্রেকফাস্ট করতে। এরপর শুরু করলাম শহর বেড়ানো। বিরাট শহর ইয়েকাতেরিনবুর্গ। উলার পর্বতমালার পূর্বপ্রান্তে আইসেট নদীর গা ঘেঁষে গড়ে উঠেছে রাশিয়ার চতুর্থ বৃহত্তম এই শহর। এই শহরকে বলা হয় সাইবেরিয়া অঞ্চলের প্রবেশদ্বার। ১৭২৩ সালে তৈরি শহরটার নামকরণ করা হয়েছিল জার সম্রাট পিটার দ্য গ্রেটের পত্নী প্রথম ক্যাথরিনের নামে। শহর থেকে দূর দিগন্তে তাকালে চোখে পড়বে উরাল পর্বতমালা। এই সেই বিখ্যাত পর্বতমালা যেটি পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ রাশিয়ার মাঝে বিভাজন রেখা টেনেছে। এই পর্বতমালার পশ্চিমপ্রান্তে রাশিয়ার অংশটা ইউরোপ মহাদেশ আর পূর্বপ্রান্তে রাশিয়ার বাকি অংশটা এশিয়া মহাদেশের অধীনে। অর্থাৎ একটাই দেশ অবস্থান করছে দুটি মহাদেশে। উরাল পর্বতমালা উত্তরে কারা সাগর থেকে দক্ষিণে কাজাখস্তান সীমানা পর্যন্ত আড়াই হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত। জায়গা বিশেষে এই পাহাড়শ্রেণী প্রায় দেড়শো কিলোমিটার চওড়া। এর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ নারোদিনায়া (উচ্চতা ১৮৯৫ মিটার)। এই পর্বতমালার উত্তরাংশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে সাইবেরিয়া অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নদী ওব্। উরাল পর্বতমালায় ছড়িয়ে আছে কয়লা, আকরিক, দুর্মূল্য পাথরের বিপুল খনিজ ভাণ্ডার। আর রয়েছে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য।

উড়াল পর্বতমালার বিপুল খনিজ সম্পদকে কেন্দ্র করেই উড়াল অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। তৈরি করা হয়েছিল নদী বন্দর। এই শহর নানা ঐতিহাসিক ঘটনারও সাক্ষী। বলশেভিক বিপ্লবের সময়ে জার সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসকে এই শহরেই নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত এই শহর থেকেই রাশিয়ার বিখ্যাত সাইবেরিয়া অঞ্চলের বিস্তৃতি শুরু হয়েছে। আমরা আজ থেকে আগামী কদিন ধরে সাইবেরিয়ার নানাপ্রান্তে ঘুরে বেড়াব। এখন আমরা রয়েছি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত রাশিয়ায়। বাস থামল শহরের কেন্দ্রে হিস্টোরিকাল স্কোয়ারে। এই চত্বরের গা দিয়ে বয়ে চলেছে ক্ষীণকায়া আইসেট নদীর শান্ত তরঙ্গ। এখানে নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। বাঁধের ওপারে নদীর আকার বেড়ে হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। নদীর ওপর ড্যামের গা ঘেঁষে তৈরি ব্রিজ দু'পাড়ের শহরকে জুড়েছে। নদীর ধার থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম ব্রিজের কাছে। সামনেই কাঠের নজর মিনার ওয়াটার টাওয়ার। একটু এগতেই শহরের প্রধান রাস্তা লেনিন এভিনিউ। পুরনো ধাঁচের এক কামরার ট্রাম চলছে সেই রাস্তায়। রাস্তার ওপারে নদীর গায়ে প্রাসাদোপম স্থাপত্য সিভাসটিয়ানোভ হাউস। সবুজ আর সাদা রঙের প্রলেপ দেওয়া গথিক স্থাপত্যের এই অট্টালিকা ১৮ শতকে নির্মিত। বর্তমানে এটি রাশিয়ার রাষ্ট্রপতির স্থানীয় বাসস্থান

হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পায়ে হেঁটে চলে এলাম হ্রদের ধারে। জলে বোটিং করা যায়। অনেকে কায়াক নিয়েও ভেসে চলেছে। জলের পাড় দিয়ে গাছে ছাওয়া চমৎকার বাঁধানো পথে অনেকে হাঁটছে, সাইকেল চালাচ্ছে। কাছেই টাউন হল, ফুটবল স্টেডিয়াম। হ্রদের অন্যতীরে আধুনিক আকাশছোঁয়া বাড়িগুলো সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নদীর জলে সৃষ্ট এই হ্রদকে স্থানীয়রা বলে সিটি পন্ড। হ্রদ ছাড়িয়ে নদী আবার আপন পথে বয়ে গিয়েছে শহরের অন্য প্রান্তে।

২০০৩ সালে যেখানে চার্চটি গড়ে তোলা হয়েছে সেই স্থানেই ছিল শেষ জার সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসের বন্দিদশার দিনগুলোর ঠিকানা ইপাটিয়েভ হাউস। এই বাড়িতেই ১৯১৮ সালের ১৭ জুলাই বলশেভিক বিপ্লবীরা পুরো পরিবার সহ দ্বিতীয় নিকোলাসকে হত্যা করে। এরপর অপেরা হাউস দেখে চলে এলাম শহরের দ্বিতীয় উচ্চতম ১৯৮ মিটার উচ্চতার বাড়ি ভিসস্কি টাওয়ারের সামনে। টিকিট কেটে দ্রুতগতির লিফটে চেপে উঠে পড়লাম ৫২ তলায় ওপেন এয়ার অবজারভেশন ফ্লোরে। ওপর থেকে পাখির চোখে দেখছি শহরের ছবি। পশ্চিম দিগন্তে শহরকে আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে উরাল পর্বতমালার প্রাচীর। টাওয়ার থেকে নেমে এলাম নীচে। এবার চললাম শহরের বাইরের দ্রষ্টব্য দেখতে। মিনিট পনেরো পরে বাস থামল বলশেভিক বিপ্লবে নিহতদের স্মৃতিস্মারকের সামনে। রাস্তার ধারে আরণ্যক পরিবেশের মাঝে ছড়িয়ে আছে কুড়ি হাজার মানুষের সমাধি। মূল সৌধের ওপর তৈরি করা হয়েছে 'মাস্কস অফ সরো' নামে অনবদ্য একটি ভাস্কর্য। আরও পনেরো মিনিট এগতেই রাজপথের ধারে দেখলাম ইউরোপ আর এশিয়া মহাদেশের সীমানা। বাস থেকে নেমে পড়লাম। দু'পাশে অরণ্য আর তার বুক চিরে বানানো হাইওয়ে মস্কোর দিকে গিয়েছে। খানিকটা হেঁটে এলাম রাস্তার গায়ে দুই মহাদেশের সীমান্তরেখা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকা স্মারক সৌধের সামনে। শিল্পমণ্ডিত একটি ধাতব স্তম্ভ সীমানা নির্দেশ করছে। এটি ছোট সৌধ। গাইড বলল, এই অঞ্চলের সবথেকে বড় সীমান্ত সৌধ রয়েছে আরও কিছুটা দূরে। যেতে প্রায় আধঘণ্টা সময় লাগবে। আবার বাস ছুটল পারভোরালস্ক শহরের দিকে। ইয়েকাতেরিনবুর্গ থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে রয়েছে দুই মহাদেশের সীমান্তরেখায় অবস্থিত সবথেকে বড় ওবেলিস্ক সৌধ। বাস থামল এর সামনেই। জঙ্গলের গায়ে বার্চহিল অঞ্চলে যেখানে ১৮৩৭ সালে দুই মহাদেশের সীমান্ত দর্শনে জার সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজান্ডার এসেছিলেন, সেখানেই বিরাটাকার পাথরের ওবেলিস্ক স্তম্ভ দিয়ে সৌধটি তৈরি হয়েছে। এর একদিকে লেখা এশিয়া আর অন্যদিকে লেখা ইউরোপ। বাস থেকে নেমে গেলাম তার সামনে। চারপাশটা বেশ সাজানো। সীমান্তরেখার দু'দিকে পা রেখে অনেকেই ছবি তুলতে ব্যস্ত। গাইডের মুখে শুনলাম স্থানীয় নবদম্পতিরা বিয়ের পর অনেকেই এখানে আসে এই সৌধকে সাক্ষী রেখে ছবি তুলতে। এ তো ভারী মজার রেওয়াজ। সারাদিন এত ঘুরছি কিন্তু পর্যটকদের খুব একটা ভিড় চোখে পড়ছে না। এরপর আবার বাসযাত্রা শুরু হল অন্য পথ দিয়ে। গন্তব্য শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে বিখ্যাত গানিনা ইয়ামা মনাস্ট্রি। জঙ্গলে ছাওয়া রাস্তা দিয়ে আধঘণ্টায় পৌঁছে গেলাম টিলা পাহাড় আর সবুজ গাছপালায় আগলে রাখা এক প্রাকৃতিক অঞ্চলে। বেশ নির্জন জায়গা। এখানেই জঙ্গলের মধ্যে জার দ্বিতীয় নিকোলাস আর তার পরিবারের সদস্যদের সমাধিস্থ করা হয়। দীর্ঘদিন এই স্থান লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। ২০০০ সালে এখানে জার পরিবারের সাতজন সদস্যের স্মৃতিতে তৈরি হয়েছে কাঠের তৈরি ৭টি চার্চ। এই চার্চ কমপ্লেক্স গানিনা ইয়ামা মনাস্ট্রি নামে পরিচিত। শিল্পমণ্ডিত প্রবেশদ্বার দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম।

এখানে মহিলাদের প্রত্যেককে কোমরে একটি কাপড় জড়াতে হল। এটাই রীতি। প্রবেশদ্বারের লাগোয়া কাউন্টারে দাঁড়িয়ে স্বেচ্ছাসেবকরা মহিলা দর্শনার্থীদের সেই কাপড় হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে। গানিনা ইয়ামা মনাস্ট্রি দেখে ফিরে চললাম ইয়েকাতেরিনবুর্গ। সময় লাগল এক ঘণ্টা। শহরে পৌঁছে চলে এলাম ওল্ড সিটি পার্কে। এদিকে পুরনো শহরের ছোঁয়া রয়েছে। সিটি ট্যুরের শেষ দ্রষ্টব্য ১৮ শতকের আলেকজান্ডার নোভস্কি ক্যাথিড্রাল। দৃষ্টিনন্দন বিশালাকার চার্চ। ভেতরে ঢুকে দেখি প্রার্থনা চলছে। এই চার্চটি মহিলা সন্ন্যাসিনী দ্বারা পরিচালিত। তাঁরা কালো জোব্বা পোশাক পরে বাইবেল পাঠ করছেন একাগ্রচিত্তে।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ চলে এলাম রেলস্টেশনে। আকাশে এখনও দিনের আলো রয়েছে। ট্রেন সফরের জন্য প্যাকড ফুড আর পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার জল সঙ্গে নিয়েছি। ট্রেনে শুনেছি সবকিছুই পাওয়া যাবে। তবে দাম অনেক বেশি। বাস থামল পুরনো স্টেশনের সামনে। চমৎকার স্থাপত্যের এই স্টেশন বিল্ডিংয়ে রেল মিউজিয়াম তৈরি হয়েছে। বাইরেও পুরনো ইঞ্জিন, সেকালে ব্যবহৃত রেলের যন্ত্রাংশ, মডেল সাজানো আছে। পাশেই রয়েছে নবনির্মিত বিরাট স্টেশন বিল্ডিং। বাস থেকে মালপত্র নামিয়ে চললাম সেখানে। সঙ্গে গাইড রয়েছে। ও আমাদের ট্রেনে তুলে দেবে। একেই নতুন জায়গা তারওপর ভাষার সমস্যা, তাই সাইবেরিয়া ভ্রমণে প্রতি পদেই ইংরেজি বলতে পারা স্থানীয় দক্ষ গাইড প্রয়োজন।

আর দেরি না করে ঢুকে পড়লাম স্টেশনে। ঝকঝকে স্টেশন। ভাবলেই অবাক লাগছে যে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই রেল সফর শুরু হতে চলেছে।

আমরা অপেক্ষা করছি কখন ট্রেন আসার কথা ঘোষণা করা হবে। ট্রেনের খবর হতেই স্টেশনের ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে ট্রেনের নম্বর আর প্ল্যাটফর্ম নম্বর ফুটে উঠল। মাইকে ঘোষণাও হল। ট্রেন এল রাত ৯টা ১৫ মিনিটে। অনেকগুলো বগি নিয়ে বেশ বড় ট্রেন। গায়ে লাল আর ধূসর রঙের প্রলেপ দেওয়া। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ট্রান্স সাইবেরিয়ান ট্রেন। শীতে বরফ পড়লে তা পরিষ্কারের সুবিধার্থে এই রেলপথের সমস্ত প্ল্যাটফর্মই রেললাইনের প্রায় সমান্তরালে বানানো। তাই ট্রেনের গায়ে লাগানো সিঁড়ি বেয়ে কামরায় উঠতে হবে। এই ট্রেনটা আসছে মস্কো থেকে, যাবে চিতা পর্যন্ত। ট্রেন থামতেই দরজা খুলে পাদানি নামানো হল। কয়েকজন যাত্রী এখানেই নামলেন। কোচ অ্যাটেনডেন্ট দাঁড়িয়ে দরজার কাছে। একে একে টিকিট আর পাসপোর্ট দেখিয়ে ট্রেনে উঠলাম। প্রতিটি কামরায় ২ জন করে অ্যাটেনডেন্ট থাকে। এরাই টিকিট পরীক্ষক। ট্রেনের দরজা খোলা, বন্ধ করা, এমনকী ট্রেন ছাড়ার আগে সবাই উঠল কি না তা দেখে সবুজ পতাকা নেড়ে আর ওয়াকিটকিতে চালককে জানানোর কাজটাও এরা করে। ট্রেনের সমস্ত দরজা চাবি দিয়ে বন্ধ করা থাকে। তাই আমাদের দেশের ট্রেনের মতো এই ট্রেনে চলন্ত অবস্থায় দরজা খোলা যাবে না। আর একটা নতুন নিয়ম দেখলাম এখানে। কোচ অ্যাটেনডেন্ট প্রত্যেকের টিকিট

নিজের কাছে জমা রেখে দিল। গন্তব্য স্টেশনে নামার আগেই আবার সেই টিকিট ফেরত দিয়ে দেবে। আমাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে গাইড চলে গেল। আমরা যাচ্ছি ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীতে। যথেষ্ট আরামদায়ক ব্যবস্থা। চার শয্যার একেকটি ক্যুপ। দরজা লাগানো এমন ৯টি ক্যুপ রয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায়। প্রতিটি কামরায় দুটি করে সুন্দর বাথরুম রয়েছে। কেবিনে ঠান্ডা ও গরম জলের ব্যবস্থা রয়েছে। পুরো ট্রেনটাই বাতানুকূল। শীতকালে সর্বক্ষণ হিটার চলে ঠান্ডা থেকে রেহাই দিতে। ট্রেনে প্রথম শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীও রয়েছে। এছাড়াও আছে রেস্টুরেন্ট কোচ। প্রতিটি কামরাই ভেস্টিবিউল দিয়ে সংযুক্ত থাকায় চলন্ত ট্রেনেও অনায়াসে প্রতিটি কামরায় যাওয়া যায়। ট্রেনের ভাড়া যথেষ্ট বেশি। এখানে আবার যে কোনও শ্রেণীতেই আপার বার্থের থেকে লোয়ার বার্থের ভাড়া বেশি। গ্রীষ্মের পিক সিজনে ৬ মাস আগে অগ্রিম টিকিট কাটা যায়। অফ সিজনে টিকিট কাটা যাবে ৪৫ দিন আগে। প্রতিটি কামরার বাইরে কোচ নম্বর দেওয়া থাকে। ট্রেনের মধ্যে লোয়ার বার্থের নীচে লাগেজ রাখার জন্যে বাক্স করা আছে।

ট্রেন ছাড়ল সঠিক সময়ে রাত ৯টা ৫০ মিনিটে। আমাদের গন্তব্য এখান থেকে ১৫১৯ কিলোমিটার দূরের নোভোসিবিরিস্ক। জানলা দিয়ে শেষবারের মতো দেখছি ছেড়ে যাওয়া ইয়েকাতেরিনবুর্গ শহরটাকে। রাত এগারোটা নাগাদ আকাশে দিনের আলো নিভে আঁধার নামল। এই ট্রেনের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ২৪০ কিলোমিটার হলেও ট্রেন ছুটবে ঘণ্টাপ্রতি ৮০ থেকে ১০০ কিলোমিটার গতিবেগের মধ্যে। পুরোটাই ব্রডগেজ ডাবল লাইন। এই রেলপথের বৈদ্যুতিকরণের কাজ শুরু হয় ১৯২৯ সালে। ২০০২ সালে এই কাজ শেষ হওয়ায় বর্তমানে ইলেকট্রিক ইঞ্জিন দিয়ে ট্রেন চালানো হচ্ছে। আমাদের কামরার দুই ট্রেনসেবিকার নাম নাতালিয়া আর নাদিঝা। পরনে ছাইরঙা স্কার্ট, সাদা শার্ট, লাল টাই। জামায় রাশিয়ান রেলওয়েজের লোগো ছাপানো। প্রত্যেকেই ব্লেজার ও টুপিও পরে। ট্রেনে ছেলেদের থেকে মেয়ে কোচ অ্যাটেনডেন্টের সংখ্যাই বেশি। ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ পরে প্রত্যেককে একটা করে বেডরোল প্যাকেট দেওয়া হল।

পরদিন খুব সকালেই ঘুম ভেঙে গেল। জানলার পর্দা সরিয়ে দেখি সূর্য উঠেছে। ঘড়িতে প্রায় সাড়ে ৬টা বাজে। সকালবেলা আজ ট্রেনটা ভালো করে ঘুরে দেখব। ক্যুপের দরজা খুলে বেরলাম সামনের লম্বা করিডোরে। পুরো কামরাতেই বড় বড় জানলা। তাতে পর্দা দেওয়া। করিডোরে গদি আঁটা ভাঁজ করা কয়েকটি বসার জায়গা করা আছে। মেঝেতে কার্পেট পাতা। কামরার একদিকে রয়েছে ট্রেন-সেবিকাদের ক্যুপ আর লাগোয়া ছোট্ট একফালি অফিসঘর। তার সামনে অদ্ভুত আকৃতির একটা গরম জলের স্যামোভার যন্ত্র বসানো। ২৪ ঘণ্টা এই মেশিনের কলে খাবার জন্যে ফুটন্ত গরম জল মিলবে। এ তো দারুণ ব্যবস্থা। সঙ্গে চা, কফি, নুডলস থাকলে এই জল দিয়ে সেইসব বানানো যাবে। প্রতিটি কামরাতেই এই যন্ত্র বসানো আছে। ট্রেনে স্থানীয় যাত্রীদের সঙ্গে অনেক বিদেশি পর্যটকও রয়েছে। আমাদের ট্রেন সেবিকা দু'জনের কেউই ইংরেজি বোঝে না। দেখলেই কেবল মুচকি হাসে। তাই প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ইশারাতেই সারতে হচ্ছে। ট্রেন চলছে সঠিক সময়ে। করিডোরে ট্রেনের সময়সূচি লাগানো আছে। সেখান থেকে দেখে নিচ্ছি কখন কোন

স্টেশন আসবে আর কতক্ষণ দাঁড়াবে। এতে মস্কো ও স্থানীয় সময় দুয়েরই উল্লেখ করা আছে। কামরার ডিসপ্লে বোর্ডেও বাইরের তাপমাত্রা, পরের স্টেশনের নাম দেখায়।

ট্রেন ছুটছে সাইবেরিয়া অঞ্চলের আশ্চর্য প্রকৃতির বুক চিরে। ট্রেনের জানলার ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখছি সুদূর বিস্তৃত সবুজের গালিচা বিছানো অরণ্যভূমি। সাইবেরিয়ায় এখন গ্রীষ্মকাল। কিছু পাহাড়চূড়া বাদে সর্বত্র বরফ গলে গিয়েছে। শীতে এখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা। তখন কোথাও কোথাও তাপমাত্রা নেমে যায় হিমাঙ্কের ৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচে। গ্রীষ্মে শীত অনেকটাই কম থাকে। রাশিয়ার প্রায় ৭৭ শতাংশ অঞ্চল জুড়ে সাইবেরিয়ার বিস্তৃতি। লোকবসতি খুবই কম। দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৩ শতাংশ মানুষের বসবাস এখানে। যার মধ্যে অধিকাংশই থাকে দক্ষিণ সাইবেরিয়ায়। উত্তর সাইবেরিয়ায় বেশিরভাগটাই প্রাকৃতিক দুর্গমতায় ভরা। উত্তর সাইবেরিয়ার কিছুটা অংশ সুমেরু বৃত্তের মধ্যে পড়ছে। এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত রাশিয়ায় ২৭টি প্রদেশ নিয়ে সাইবেরিয়া গড়ে উঠেছে। এর তিনটি ভাগ— পশ্চিম সাইবেরিয়া সমভূমি, মধ্য সাইবেরিয়া মালভূমি, পূর্ব সাইবেরিয়া পর্বতাঞ্চল ও নিম্নভূমি। উরাল, আলতাই, বৈকাল, ভারখয়ানস্ক প্রভৃতি পাহাড়শ্রেণী ছড়িয়ে আছে সাইবেরিয়ার এই তিন প্রাকৃতিক অঞ্চলে। সাইবেরিয়ার একেবারে উত্তরে রয়েছে বৃক্ষহীন তুন্দ্রা অঞ্চল। এর ঠিক নীচেই তাইগা অঞ্চলে অল্প কিছু গাছপালার দেখা মেলে। একেবারে দক্ষিণাংশে কনিফেরাস অরণ্যের আধিক্য বেশি। জঙ্গলে নানাধরনের প্রাণী ও প্রচুর পাখি রয়েছে। ১৩ শতকে মোঙ্গলদের দখলে ছিল সাইবেরিয়া। এই অঞ্চল রাশিয়ার অধীনে আসে ১৭ শতকে। ইয়াকুত, তুর্কিক, মঙ্গোলীয় বুরিয়াত, রাশিয়ান কোসেক প্রভৃতি আদিবাসী বসবাস করে সাইবেরিয়ার নানা দুর্গম অংশে। সাইবেরিয়ার এই রহস্যময় প্রকৃতির টানেই তো এখানে ছুটে আসা। মাঝেমধ্যেই ভাবছি গ্রীষ্মের এই কয়েকটা মাস তো দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। তারপর হাড় হিম করা ভয়ঙ্কর ঠান্ডা নিয়ে হাজির হবে শীত। শুরু হবে সেই নির্মম প্রকৃতির সঙ্গে স্থানীয় মানুষদের নিত্যদিনের জীবনযুদ্ধ।

একের পর এক বগি টপকে এলাম প্রথম শ্রেণীর কামরায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর মতো এটিতেও ৯টি ক্যুপ রয়েছে। তবে অনেক বেশি সাজানো-গোছানো। আর ক্যুপগুলোর মধ্যে ২টি করে লোয়ার বার্থ রয়েছে। এরপর গেলাম তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়। সেখানেও যথেষ্ট ভালো ব্যবস্থা। এমন নিরাপদ রেলসফর আমাদের দেশে তো ভাবাই যায় না। ট্রেন যে স্টেশনেই দাঁড়াবে সেখানে প্রতিটি কামরার অ্যাটেনডেন্টরা প্ল্যাটফর্মে নেমে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে ট্রেন থেকে যাত্রীদের নামা-ওঠার ব্যাপারে কঠোর নজরদারি চালাবে।

বেলা এগারোটা নাগাদ ট্রেন পৌঁছল ওমস্ক শহরে। সাইবেরিয়ার অন্যতম বড় শহর এটি। শহরের গা দিয়ে বয়ে চলেছে ইরতিস নদী। সাদা আর সবুজ রঙের শিল্পমণ্ডিত বিরাট স্টেশন। এই যাত্রাপথের বেশিরভাগ স্টেশন বিল্ডিং দেখছি সাদা, সবুজ, হলুদ রঙে রাঙানো। ট্রেন এখানে ১৬ মিনিট দাঁড়াবে। নেমে পড়লাম প্ল্যাটফর্মে। বাইরে খুব ঠান্ডা নেই। আরামদায়ক আবহাওয়া। স্টেশনের ছোট ছোট ফুড স্টলে যাত্রীদের ভিড় হয়েছে কেনাকাটার জন্যে। মস্কো থেকে ২৭১২ কিলোমিটার দূরে ওমস্ক। ১৯ শতকের গোড়ার দিকে সাইবেরিয়ার নানা স্থানে তৈরি হয় বন্দি নির্বাসন শিবির। যেগুলোকে বলা হতো গুলাগ ক্যাম্প। সাজাপ্রাপ্ত আসামি থেকে শুরু করে বিপ্লবীদেরও সেইসব শিবিরে বন্দি করে রাখা হতো। তাদের ওপর চলত অকথ্য অত্যাচার। সাইবেরিয়ার কুখ্যাত শীতের কামড়ে মারা যেত অজস্র বন্দি। তখন ওমস্ক ছিল সেইসব নির্বাসন শিবিরের অন্যতম কেন্দ্রস্থল। এখানেই এক শিবিরে আটক করে রাখা হয়েছিল রাশিয়ার বিখ্যাত দার্শনিক, লেখক দস্তয়েভস্কিকে। ওমস্ক থেকে নির্দিষ্ট সময়েই ট্রেন ছাড়ল। ট্রেন থেকেই দেখা যাচ্ছে শহরটাকে। এই ট্রেন যাত্রার আরেকটা কড়া নিয়মের কথা এবার বলি। বিদেশ-বিভুঁই বেড়াতে এলে সেখানকার কিছু নিয়ম-কানুন, কিছু আদবকায়দা জেনে রাখলে বেড়ানোটা মসৃণ হয়। এই রেলপথের প্রতিটি বড় স্টেশনে ট্রেন থামার আধঘণ্টা আগে থেকে টয়লেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। আবার খোলা হয় স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার আধঘণ্টা পরে। এই বিষয়টা প্রতিবারই টয়লেট লক করার আগে যাত্রীদের জানিয়ে দেওয়া হয়। ট্রেনে বায়োটয়লেট না থাকার এটাই এখানে বড় সমস্যা। এই সমস্যাটুকুই যা একটু মানিয়ে নিতে হবে। এছাড়া বাকি ট্রেন সফরটা যথেষ্ট উপভোগ্য ও আরামদায়ক। যেসব ছোট স্টেশনে যেখানে ট্রেন দু থেকে পাঁচ মিনিটের বেশি থামবে না, সেইসব স্টেশনে নেমে অযথা প্ল্যাটফর্মে হাঁটার অনুমতি মিলবে না। এমনকী ওই সময়টুকু কামরার খোলা দরজার সামনেও কোচ অ্যাটেনডেন্টরা যাত্রীদের দাঁড়াতে দেবে না। ট্রেনযাত্রার প্রতিটি পর্ব নিয়ম-শৃঙ্খলায় বাঁধা।

ট্রেন ছুটছে আপন গতিতে। পাশ দিয়ে হুশ হুশ করে বেরিয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট স্টেশন। সময়মতো দুপুরের খাওয়া সারলাম। বাইরের দৃশ্য থেকে চোখ সরছে না। প্রায় ৫ ঘণ্টা অবিরাম ছোটার পর ট্রেন থামল বারাবিনিস্ক স্টেশনে। এখানে আধঘণ্টা দাঁড়াবে। প্ল্যাটফর্মের লাগোয়া সাজানো বাগানের মাঝখানে একটা পুরনো দিনের স্টিম ইঞ্জিন রাখা আছে। ট্রেনযাত্রার আলস্য কাটাতে প্ল্যাটফর্মে নামলাম। এখানে ইঞ্জিন বদলানো হল। ঝকঝকে নীল আকাশের বুকে সাদা পালকের মতো মেঘ উড়ছে। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এল। উঠে এলাম কামরায়। সিগনাল সবুজ হতেই হুইসল বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। এরপরের বড় স্টেশন নোভোসিবিরিস্কে আমরা নামব। মাঝপথে দুটি স্টেশনে এক মিনিট করে ট্রেন থামল। ট্রেন সেবিকা এসে জানিয়ে গেল আর এক ঘণ্টা বাদে আমাদের গন্তব্য স্টেশন আসবে। প্রত্যেকের বেডরোল বুঝে নিয়ে আমাদের টিকিটও ফেরত দিয়ে দিল। বারাবিনিস্ক থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগবে নোভোসিবিরিস্ক পৌঁছতে। দেখতে দেখতে দু'পাশের সবুজ প্রান্তর ফিকে হতে শুরু করল। দেখা দিল নগরজীবন। ঝমঝম আওয়াজ তুলে একসময় ট্রেন পেরল ওব নদীর দীর্ঘ সেতু। সেতু পেরিয়ে খানিকটা পথ এগিয়ে ট্রেন পৌঁছল নোভোসিবিরিস্ক। স্টেশনের ঘড়িতে দেখি রাত ৮টা বাজে। এখানকার স্থানীয় সময় ইয়েকাতেরিনবুর্গ থেকে ২ ঘণ্টা এগিয়ে। ট্রেন একেবারে নির্দিষ্ট সময়েই পৌঁছেছে। ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। বাইরের তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এই স্টেশনে দেখলাম অনেক যাত্রী নামল।

ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথের সবথেকে বড় স্টেশন এটি। বিশাল। এখানেও একটি প্রাচীন স্টিম ইঞ্জিন সাজিয়ে রাখা আছে। এই রেলপথের প্রতিটি বড় স্টেশনেই প্রাচীন ইঞ্জিন অথবা কামরা এমনভাবেই সংরক্ষিত রয়েছে। এখান থেকে আশপাশের শহরতলির মধ্যে লোকাল ট্রেনও চলছে। সেই ট্রেনগুলোয় ৪ থেকে ৬টি করে বগি থাকে। ভিড়ও খুব কম হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশনে দৈনিক প্রায় ৭০ হাজার

মানুষের যাতায়াত। আমাদের ট্রেনের কামরার সামনেই দাঁড়িয়েছিল স্থানীয় গাইড ওলগা। মাঝবয়সি মহিলা। পরিচয়পর্ব শেষ হতেই ওর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম স্টেশনের বাইরে। সামনে বিশাল খোলা চত্বর। একপাশে বাসস্ট্যান্ড। মালপত্র নিয়ে উঠে পড়লাম বাসে। বাস ছাড়তেই ওলগা সকলকে অভিবাদন জানিয়ে এই শহরের ইতিহাস বলতে শুরু করল। মস্কো থেকে ৩৩৩৫ কিলোমিটার দূরে ১৮৯৩ সালে গড়ে উঠেছিল রাশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম ও সাইবেরিয়া অঞ্চলের বৃহত্তম শহর নোভোসিবিরিস্ক। শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে এই শহর বেশ সমৃদ্ধ। শহরের গা দিয়ে বয়ে চলেছে ওব নদী। সাইবেরিয়া অঞ্চলের অধিকাংশ বড় শহরই নদীর ধারে গড়ে উঠেছে। অতীতে যখন রেলপথ বা ভালো সড়কপথ ছিল না তখন সাইবেরিয়ার মানুষের কাছে নদীপথই ছিল বাণিজ্য আর যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। এই শহরে বাস, ট্রাম, ট্রলি বাস, আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো রেল চলছে। সাইবেরিয়ার প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশকে মানিয়ে কীভাবে যে এই অঞ্চলে একাধিক বড় বড় শহর গড়ে উঠেছে সে কথা ভাবলেই অবাক হচ্ছি। এখনও আকাশে সূর্যালোক রয়েছে। মিনিট পনেরো বাসযাত্রার শেষে পৌঁছলাম শহরের এক নামজাদা হোটেল আজিমুট সাইবেরিয়া-তে। এখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা। হোটেলের চারপাশে একাধিক সুউচ্চ আধুনিক বিল্ডিং। হোটেলে চেক-ইন করে তারপর এখানেই ডিনার করে নিলাম। গাইড যাবার আগে বলে গেল, আজ 'সিটি ডে। আমাদের হোটেল থেকে হাঁটাপথের দূরত্বে শহরের প্রাণকেন্দ্র পারভোমেস্কি স্কোয়ারে রাতে জমজমাট সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে। পারলে দেখতে যাবেন, ভালো লাগবে।' ওর কথামতো চললাম সেই উৎসব দেখতে। প্রতি বছর জুন মাসের শেষ রবিবার এখানে সিটি ডে হিসেবে পালন করা হয়। হোটেলের কাছেই শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা লেনিন স্ট্রিট দিয়ে কিছুটা হেঁটে পৌঁছলাম উৎসব প্রাঙ্গণে। চারপাশটা আলোয় সেজেছে। লোকে লোকারণ্য। চত্বরের মাঝখানে বিশাল মঞ্চে চলছে গান-বাজনার অনুষ্ঠান। আমরাও পায়ে পায়ে মিশে গেলাম উৎসবের আবহে। একটা জিনিস লক্ষ করলাম, এই ভিড়ের মধ্যে আমাদের মতো কয়েকজন ভিনদেশি মানুষকে দেখে অনেকেই অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কেউ কেউ আবার এসে হাতও মেলাল। রাত এগারোটার পরে শুরু হল আতসবাজির প্রদর্শন। অন্ধকার আকাশের বুকে ঝরে পড়ছে বর্ণময় আগুনের ফোয়ারা। চোখ ধাঁধানো বাজি পোড়ানো দিয়ে শেষ হল উৎসব। রাত তখন বারোটা। ঠান্ডাও জাঁকিয়ে পড়েছে।

ভোরবেলা সময়মতো ঘুম ভেঙে গেল। প্রাতরাশ সেরে এগারোটায় বাসে চেপে চললাম শহর ঘুরতে। আমাদের গাইড ওলগা একজন স্কুল শিক্ষিকা। পাশাপাশি পর্যটকদের শহর ঘুরিয়ে দেখানোটা তার নেশা। সরকারি গণ্যমান্য কোনও অতিথি এখানে এলে দোভাষী অথবা গাইডের কাজেও মাঝে মাঝে ওর ডাক পড়ে। শহরে তার বেশ পরিচিতি। আমরা প্রথম ভারতীয় পর্যটক দল যাদেরকে নিয়ে ও আজ বেড়াবে। ওলগার বহুদিনের ইচ্ছা ছিল ভারতীয় পর্যটকদের গাইড করার। আজ সে আশা মেটায় বেজায় খুশি। সাইবেরিয়ায় প্রধানত বৈকাল হ্রদ অঞ্চলেই পর্যটক সমাগম বেশি। চলে এলাম শহরের অফিসপাড়া ক্রায়াচোকোভ স্কোয়ারে। এখানেই রয়েছে বিখ্যাত আলেকজান্ডার নোভস্কি

• সাইবেরিয়ান রেলওয়ে মিউজিয়াম

ক্যাথিড্রাল। নব্য বাইজানটাইন স্থাপত্যের এই অর্থডক্স চার্চটি দেখার মতো। লাল পাথর দিয়ে গড়া। চূড়াটা সোনালি রং করা। এটি স্থাপিত হয় ১৮৯৯ সালে। ভেতরের দেওয়াল, স্তম্ভ, সিলিং জুড়ে ছড়িয়ে আছে অসাধারণ সুন্দর সব চিত্রকলা। এখান থেকে কিছুটা দূরে নদীর ধারে রয়েছে সিটি বিগিনিং পার্ক। ওব নদীর পাড় জুড়ে সবুজ বনাঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছে এই বিস্তৃত পার্ক। একপাশে পাথর বাঁধানো বড় চত্বরের মাঝে স্থাপিত জার তৃতীয় আলেকজান্ডারের প্রস্তর মূর্তি। পাশেই প্রাচীন নদীব্রিজের কিছুটা অংশ সাজিয়ে রাখা আছে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমেছে নদীর জলে। ওব নদী খুব চওড়া হয়ে বয়ে চলেছে এখানে। নদীতে বোটিং হয়। অদূরে

আমাদের ট্রেনের কামরার সামনেই দাঁড়িয়েছিল স্থানীয় গাইড ওলগা। মাঝবয়সি মহিলা। পরিচয়পর্ব শেষ হতেই ওর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম স্টেশনের বাইরে।

• তালসি গ্রামে ঘোড়ার গাড়ি

• এই সেই সাইবেরিয়ান ট্রেন

নদীবন্দর। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে নতুন রেলসেতু। ওই সেতু পেরিয়েই গতকাল শহরে প্রবেশ করেছি। নদীর পাড়টা বাঁধানো।

সিটি ডে উপলক্ষে এই জায়গাটাকেও সাজানো হয়েছে। গতকাল নদীর ধারেও মঞ্চ বেঁধে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছিল। নদীর ধারে কিছুক্ষণ কাটিয়ে চলে এলাম পারভোমেস্কি স্কোয়ার লাগোয়া আর এক বড় চত্বর মেমোরিয়াল স্কোয়ার বা লেনিন স্কোয়ারে। এর মাঝখানে রয়েছে ব্রোঞ্জের তৈরি লেনিনের বিশাল মূর্তি। পাশে আরও পাঁচটি অন্যান্য মূর্তিও রয়েছে। লেনিনের মূর্তির পিছনেই বাগানে ঘেরা গোলাকার স্থাপত্যের অপেরা ও ব্যালে থিয়েটার। রাশিয়ার এই বৃহত্তম থিয়েটার হলে

দু'হাজার দর্শকাসন রয়েছে। রেলস্টেশনের বিপরীতেই বড় শপিং মলটাও এক ফাঁকে দেখে নিলাম। শহরের এক রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করা ছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে তো তাজ্জব বনে গেলাম। এত ভারতীয় খাবারের রেস্তোরাঁ! নাম লিটল ইন্ডিয়া। সাইবেরিয়ায় যে ভারতীয় খাবারের এমন রেস্তোরাঁ থাকতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। গাইডের কাছ থেকে জানলাম রাশিয়ানরা ইদানীং ভারতীয় খাবার খেতেও পছন্দ করে। তাই এই শহরে কয়েকটা এমন রেস্তোরাঁ চালু হয়েছে। রাশিয়ানদের ভারতীয় সিনেমার প্রতি টান আছে জানি। বিশেষ করে রাজ কাপুরের সিনেমার এরা খুব ভক্ত। এরপর গন্তব্য শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণে ওব নদী সংলগ্ন অ্যাকাডেমগরডক। এর অর্থ শিক্ষাবিদদের শহর। পাইন, ফার, বার্চ, লার্চ, সিডার গাছে ছাওয়া কয়েক একর জুড়ে বিস্তৃত আরণ্যক পরিবেশের মাঝে এর অবস্থান। এখানে গড়ে উঠেছে দেশের বৃহত্তম বিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয়, একাধিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বিরাট লাইব্রেরি, সংগ্রহশালা, বিজ্ঞানীদের আবাসন, টেকনোপার্ক। বাসে করে জায়গাটা এক চক্কর ঘুরে থামলাম আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামের সামনে। সাইবেরিয়ার প্রকৃতি, জনজীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অনবদ্য এই সংগ্রহশালা। আলতাই পার্বত্য অঞ্চল থেকে পাওয়া যাযাবর আদিবাসীদের মমি, তাদের ব্যবহৃত নানা জিনিসপত্র ছোট্ট এই সংগ্রহশালায় সাজানো আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী আমাদের ঘুরিয়ে সব দেখাল। এরপর এর কাছেই জিওলজি মিউজিয়ামে গেলাম। এটাও দেখার মতো। সাইবেরিয়ার নানা জায়গা থেকে পাওয়া হরেক রকমের পাথর, খনিজ পদার্থ, উল্কাখণ্ড, এখানে সংগ্রহ করে রাখা আছে। একজন অধ্যাপিকা এখানে আমাদের গাইড করলেন। এখানেই দেখলাম নীল রঙের দুর্মূল্য চ্যারোয়িট পাথর। এই দুটি অসাধারণ সংগ্রহশালা দেখে সাইবেরিয়া সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরি হল।

অ্যাকাডেমগরডক থেকে এবার শহরে ফেরার পথ ধরলাম। কিছুটা যেতেই বাস দাঁড়াল হাইওয়ের ধারে অবস্থিত ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে মিউজিয়ামে। খোলা আকাশের নীচে এখানে সাজানো আছে এই রেলপথে অতীতে ব্যবহৃত নানাধরনের রেলইঞ্জিন, কামরা, মালগাড়ি, রেলের বিভিন্নরকম যন্ত্রাংশ প্রভৃতি। এটাই আজ সিটি ট্যুরের শেষ দ্রষ্টব্য। সাড়ে ছ'টা নাগাদ ফিরে এলাম নোভোসিবিরিস্ক। আজ আবার এখান থেকে ট্রেনে চাপব। নৈশাহার করে পৌঁছে গেলাম রেল স্টেশনে। প্ল্যাটফর্মে দেখি দাঁড়িয়ে আছে এই রেলপথের তারকামানের ডিলাক্স ট্রেন 'জার অ্যান্ড গোল্ড'। এটা আমাদের দেশের প্যালেস অন হুইলস-র মতো ট্যুরিস্ট ট্রেন। অনুমতি নিয়ে সেই ট্রেনে উঠে ভেতরটা একটু উঁকি মেরে দেখলাম। রাজকীয় ব্যবস্থা। ভাড়াও আকাশছোঁয়া। এই রেলপথে এইরকম আরেকটি ট্রেন আছে যার নাম 'গোল্ডেন ঈগল'। এই ধরনের ট্রেনগুলো গ্রীষ্মের মরশুমেই চলে। ট্রেনের খবর হতেই হাজির হলাম প্ল্যাটফর্মে। সঠিক সময়ে ট্রেন এল মস্কোর দিক থেকে। কোচ নম্বর টিকিটের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে ট্রেনে উঠে পড়লাম। এবারও যাচ্ছি দ্বিতীয় শ্রেণীতে। তবে এবারের ক্যুপগুলো দেখছি আরও সুন্দর। গাইডের ডিউটি শেষ ও এবার ফিরে যাবে। ওলগা খুব যত্ন করে আমাদের শহর ঘুরিয়েছে। ঠিক রাত সাড়ে ৮টায় ট্রেনের চাকা গড়াতে শুরু করল। ডাইনিং কোচ নিয়ে ১৫ বগির ট্রেন। এই পর্বের ট্রেন সফরে আমাদের দু'রাত ট্রেনে থাকতে হবে। এবারও আমাদের কামরায় ২ জন মহিলা অ্যাটেনডেন্ট রয়েছে। একজনের নাম দারিয়া অন্যজন এলিজাবেথ। এলিজাবেথ কিছুটা ইংরাজিতে কথাবার্তা বলতে পারে।

রাতে ট্রেনে ভালোই ঘুম হল। বাইরে ভালোই ঠান্ডা। তবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্রেনে তা টের পাচ্ছি না। আমাদের এবারের গন্তব্য উলানউদে। নোভোসিবিরিস্ক থেকে দূরত্ব ২৩০৭ কিলোমিটার। আজ পথের প্রকৃতির কিছুটা পট পরিবর্তন হয়েছে। দিগন্তব্যাপী ঘাসজমির জায়গা দখল নিয়েছে ঘন সবুজ অরণ্যে ঠাসা ছোট-বড় পাহাড়ি টিলা। মাঝেমধ্যে রেললাইনের সমান্তরালে ছুটে চলা হাইওয়ের দেখা মিলছে। সেখানেও গাড়ির সংখ্যা কম। যেটুকু চোখে পড়ছে তার বেশিরভাগটাই মালবাহী ট্রাক আর অয়েল ট্যাঙ্কার। কয়েকটা গ্রামও চোখে পড়ল। গ্রাম লাগোয়া চাষের খেত। সেখানে মরশুমি সব্জি, গম, ভুট্টা প্রভৃতির চাষ হচ্ছে। গ্রামের কটেজধর্মী বাড়িগুলো সব কাঠের তৈরি। একতলা বা দোতলা চালাঘর। গায়ে নানারঙের প্রলেপ। সঙ্গে ছোট একফালি বাগানও রয়েছে। গ্রামের রাস্তাঘাটও খুব একটা ভালো নয়। কাঁচা রাস্তাও দেখা যাচ্ছে। সবমিলিয়ে সাইবেরিয়ার গ্রাম্য জীবনের আর্থিক দীনতার ছবি স্পষ্ট। কোনও কোনও গ্রামের কাছে ছোট স্টেশনও রয়েছে। সেইসব স্টেশনে যাত্রী সংখ্যা নগণ্য বলে ট্রেনও দাঁড়ায় হাতে গোনা। তবে এই রেলপথের ছোট-বড় সব স্টেশনই পরিচ্ছন্ন। প্রতিটি স্টেশনের নামফলকে স্থানীয় ভাষার সঙ্গে ইংরেজির ব্যবহার থাকায় স্টেশনের পরিচিতি সহজ হচ্ছে। রেলপথের দু'পাশে জনবসতি বেশ কম। অনেকক্ষণ পরে পরে গ্রাম-গঞ্জের দেখা মিলছে। এই রেলযাত্রায় অনেক নদী ব্রিজ, পাহাড়ি টানেল

পেরতে হবে। দেখা যাবে অগুনতি জলাশয়। সেখানে ভেসে বেড়াচ্ছে পাখির দল।

সকাল দশটা নাগাদ ট্রেন পৌঁছল বড় শহর ক্রাসনয়ারস্ক। সবুজ পাহাড়ে ঘেরা এই বাণিজ্যিক শহরের মধ্যে দিয়ে বইছে ইয়েনিসেই নদী। এই নদীর ধারেই শহর থেকে দূরের এক অজ গ্রামের বন্দিশিবিরে ১৮৯৭ সাল থেকে ৩ বছরের জন্যে নির্বাসিত ছিলেন লেনিন। ১৬ শতকে জন্ম নেওয়া এটি সাইবেরিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর। ট্রেন এখানে ৪০ মিনিট দাঁড়াবে। মেঘলা আবহাওয়া হলেও ঠান্ডা বেশ কম। হালকা শীত পোশাকে কাজ চলে যাচ্ছে। আমাদের এই ট্রেনও যাবে চিতা পর্যন্ত। এই দীর্ঘপথের সমস্ত ট্রেনই ঘড়ির কাঁটা ধরে সঠিক সময়ে চলে। একসময় ট্রেনসেবিকা এলিজাবেথ আমাদের সঙ্গে আলাপ জমাতে এল। ভাঙা ভাঙা ইংরেজি উচ্চারণে জানতে চাইল ভারতের কথা। কথায় কথায় জানলাম সে কলেজে পড়ে। এখন ছুটি থাকায় ৩ মাসের চুক্তিতে এই কাজ করছে। ওর বাড়ি সাইবেরিয়ার চিতা শহরের কাছে। ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে সরকারি সংস্থা হলেও এই ট্রেনের সব কর্মচারী সরকারের অধীনে নয়। অনেকেই চুক্তিভিত্তিক কাজ করে। এই হাসিখুশি মেয়েটি সুযোগ পেলেই গল্প করতে আসত। ওর কাছে শীতের সময় দিনযাপনের অভিজ্ঞতা শুনে গায়ে কাঁটা দিত। সঙ্গে আনা খাবার দিয়ে সকাল আর দুপুরের খাওয়াটা ভালোভাবেই সাঙ্গ হল। রাশিয়ার পশ্চিম থেকে ট্রেন চলেছে পূর্ব প্রান্তের দিকে। মাঝে হাতে গোনা কয়েকটি ছোট স্টেশনে দু-তিন মিনিট করে ট্রেন দাঁড়াল।

আরেকটা বড় স্টেশন ইলানস্কিয়া এল দুপুর সাড়ে তিনটেতে। মেঘ কেটে গিয়ে এখন ঝলমলে রোদ উঠেছে। এখানে ১৭ মিনিটের যাত্রাবিরতি। কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে ট্রেনের লাল ইঞ্জিনটা তীব্র ভোঁ বাজিয়ে আবার দৌড়তে শুরু করল। বিকেলের পর থেকে সমতলের বেশ কিছুটা ওপরে পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে অনেকটাই ধীর গতিতে ট্রেন চলছে। পাহাড়ের কোলে কয়েকটা গ্রামের দেখা পেলাম। বিকেল গড়াতেই চলে এলাম ট্রেনের রেস্তোরাঁ কামরায়। হঠাৎ মেঘলা করে ঝমঝমিয়ে খানিকটা বৃষ্টি হল। রাত সাড়ে ন'টায় ট্রেন দাঁড়াল নিজনেউদিনস্ক স্টেশনে।

সকালটা শুরু হল রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ার আলিঙ্গনে। সকাল সাড়ে ছ'টায় ট্রেন ঢুকল নোভোসিবিরিস্ক থেকে ১৮৫০ কিলোমিটার দূরে ইরকুতস্ক শহরে। বিরাট রেল স্টেশন। আঙ্গারা নদীর ধারে স্টেশনের অবস্থান। এখানেও একটা বড় রেল ইয়ার্ড রয়েছে। স্টেশনের বাড়িটাও চমৎকার স্থাপত্যের নিদর্শন। এখানে ৩৫ মিনিট ট্রেন দাঁড়াবে। এই শহর থেকেই যেতে হয় বৈকাল হ্রদে। আমাদের সফরসূচি অনুযায়ী ফিরতি পথে এই শহরে আসব। কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মে নামলাম। এখানে অনেক যাত্রী নামল। তারমধ্যে বৈকাল হ্রদ দেখতে যাওয়া পর্যটকই বেশি। এই সময় সাইবেরিয়ায় যতটা শীতল আবহাওয়া থাকা উচিত তারথেকে শীত অনেক কম লাগছে। ক'দিন ধরেই বিষয়টা লক্ষ করছি। এখানেও এত সকালে শীতের আমেজ খুব একটা কড়া নয়। মনে হচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়ন এখানেও হানা দিয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে আবার ট্রেনের পথচলা শুরু হল। ট্রেনসেবিকা এলিজাবেথ আগেই বলেছিল ইরকুতস্কের পরেই ট্রেন কিছুক্ষণ ধরে বৈকাল হ্রদের ধার দিয়ে যাবে। সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য দর্শনের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে আমাদের যাত্রাপথের বাঁদিকে চোখের পর্দায় ভেসে উঠল বৈকাল হ্রদ। প্রথম দর্শনেই বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। হ্রদের অসীম বিস্তৃতি দেখে সাগর বলে ভ্রম হয়। হ্রদের ওপর উড়ে বেড়াচ্ছে জলচর পাখির ঝাঁক। মাঝেমধ্যে আবার আকাশ থেকে নেমে এসে ঢেউয়ের দোলায় জলে ভাসছে। হ্রদের প্রায় গা দিয়েই ধীর গতিতে ট্রেন যাচ্ছে। দূর-দিগন্তে নীল-আকাশ আর হ্রদের সীমানা মিলেমিশে একাকার। আমরা চলেছি বৈকাল হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত দিয়ে। সাইবেরিয়ার দক্ষিণে ৩১,৫০০ বর্গকিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে বৈকাল হ্রদের বিস্তৃতি। চারপাশে ঘিরে আছে আরণ্যক পাহাড়। বৈকালের তটরেখা আর সবুজ পাহাড়ি টিলার মাঝখান দিয়ে রেলপথ তৈরি হয়েছে। হ্রদ লাগোয়া পাহাড়ের পাদদেশে ছোট ছোট কয়েকটি গ্রাম নজরে পড়ল। হ্রদের ধারে নৌবন্দরকে কেন্দ্র করে জেলে গ্রামও রয়েছে। গ্রামবাসীদের কাঠের তৈরি সাদামাঠা কুটিরগুলো ইতিউতি ছড়ানো। সাইবেরিয়ার গ্রাম্য অঞ্চলে বিদ্যুৎ আর জলের পরিষেবা থাকলেও সর্বত্র রাস্তাঘাটের অবস্থা ভালো নয়। মিনিট কুড়ি হ্রদের ধার দিয়ে যাওয়ার পরে একটি পাহাড়ি সুড়ঙ্গ পেরিয়ে ট্রেন অন্য পথ ধরল। কিছুক্ষণের জন্যে বৈকালকে আর দেখা যাবে না। সকাল ন'টা নাগাদ এল স্লুদিয়াঙ্কা স্টেশন। এখানে ৪২ মিনিট থামল ট্রেন। এখান থেকে ছাড়ার পরে আবার চলতে শুরু করল হ্রদের গা দিয়ে।

হ্রদের ধার দিয়ে প্রায় ২০০ কিলোমিটার পথ ট্রেন যাত্রা করতে হবে। যাত্রার এই পর্যায়ে কমবেশি প্রায় চার ঘণ্টা ধরে বৈকাল হ্রদের দর্শন পাব। এরপর ট্রেন কয়েক মিনিটের জন্যে থামল হ্রদ লাগোয়া গঞ্জ বৈকালস্ক স্টেশনে। বেলা এগারোটায় পৌঁছলাম হ্রদের অদূরে নির্জন ছোট্ট গ্রাম ভাইদ্রিনো-তে। গ্রামের গা ঘেঁষা একফালি রেল স্টেশন। কটেজধর্মী স্টেশন বিল্ডিংটা খুব সুন্দর। এখানে ট্রেন থামল আধঘণ্টা। স্টেশনে কয়েকজন ফেরিওয়ালা ছাড়া একজনও যাত্রী নেই। ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। এখানে যে ক'জন ফেরিওয়ালা রয়েছে তাদের বেশিরভাগই গ্রামের বয়স্ক মহিলা। এরা হ্রদের মাছ ভাজা বিক্রি করছে।

ভাইদ্রিনো থেকে ট্রেন রওনা দিয়ে একনাগাড়ে চলেছে হ্রদের ধার দিয়ে। রেলপথের বাঁদিকে বৈকালের অনন্ত জলরাশি আর ডানদিকে গাছের ছায়ামাখা পাহাড়, উপত্যকা ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে। হ্রদ লাগোয়া রেলযাত্রার এই অংশের প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের সীমাহীন সৌন্দর্য ভাষায় বোঝানো অসম্ভব। দুপুর দু'টো পর্যন্ত দর্শন দিয়ে একসময় বৈকাল হ্রদ চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল।

ট্রেন যত উলানউদের দিকে এগচ্ছে, ক্রমশ আরণ্যক প্রকৃতিও তার রূপ বদলাতে শুরু করেছে। ঘন অরণ্যের অবয়ব পাতলা হচ্ছে। কমছে দীর্ঘদেহী গাছপালার সংখ্যা। ফুটে উঠছে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। নাতিউচ্চ টিলাপাহাড়ের ধারাবাহিক অবস্থানও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। তার গায়েও সবুজ ঘাসের চাদর পাতা। উলানউদে পৌঁছনোর বেশ কিছুটা আগে যাত্রাপথের ডানদিকে পাহাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে সেলেঙ্গা নদীর সর্পিল প্রবাহ ট্রেনের সঙ্গে সমান্তরালে বইতে শুরু করেছে। নদীর ধারে গ্রাম্য বসতি চোখে পড়ল। সেলেঙ্গা নদী মঙ্গোলিয়া থেকে বয়ে এসে উলানউদে শহর ছুঁয়ে আরও অনেকটা পথ চলে গিয়ে মিশেছে বৈকাল হ্রদে। নদীর ওপর রেলসেতু পেরিয়ে একেবারে সঠিক সময়ে বিকেল চারটে নাগাদ ট্রেন ঢুকল উদে আর সেলেঙ্গা নদী সঙ্গমে ১৬ শতকের এক প্রাচীন শহর উলানউদে-তে। উলানউদে-র অর্থ হল

লাল দরজা। নোভোসিবিরিস্ক থেকে এই শহরের সময় আরও ১ ঘণ্টা এগিয়ে। মস্কো থেকে দূরত্ব ৫৬৪২ কিলোমিটার। দেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের এই শহরের থেকে পড়শি দেশ মঙ্গোলিয়ার দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়। শহরের এক প্রান্তে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে উলান বুরগাসি পাহাড়শ্রেণী। রাশিয়ার অন্যান্য শহরগুলোর থেকে এই শহরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সবদিক থেকেই আলাদা। চারপাশে রুক্ষ প্রকৃতি। চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া। গ্রীষ্মে প্রখর গরম আবার শীতে কনকনে ঠান্ডা। শহরবাসীর মধ্যে মিশে আছে প্রচুর মঙ্গোলীয় মানুষ। জনজীবনে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বেশি। স্টেশনটা বেশ বড়। কামরার সামনে নাম লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই শহরে আমাদের গাইড বায়ারমা। ছিপছিপে গড়নের দীর্ঘদেহী রুশ তরুণী। ওভারব্রিজ পেরিয়ে চলে এলাম স্টেশনের বাইরে। এখন সাইবেরিয়ার এই ভিন্নধর্মী শহরের বাছাই করা গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্যগুলো চার ঘণ্টায় ঘুরে দেখব।

উলানউদে ব্যস্ত বাণিজ্যিক শহর। বহুকাল আগে শহরটা দুর্গপ্রাচীরে ঘেরা ছিল। শহরের মধ্যে চওড়া রাস্তাঘাট। তার ওপর দিয়ে ট্রাম চলছে। চোখে পড়ল এক বগির ট্রাম। শহর মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। শহরের মধ্যে দিয়ে ক্ষীণকায়া উদে নদী বয়ে চলেছে। শহর থেকে বেরিয়ে এই নদী মিশেছে সেলেঙ্গা নদীতে। এখানে আমাদের প্রথম দ্রষ্টব্য শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার বাইরে রাশিয়ার একমাত্র বৌদ্ধ ধর্ম কেন্দ্র ইভোলগিনস্কি দাতসান মনাস্ট্রি। নির্জন প্রকৃতির মাঝে কয়েক একর জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে একাধিক বৌদ্ধ মন্দির, বৌদ্ধধর্ম শিক্ষাকেন্দ্র, লামাদের বিশ্ববিদ্যালয়। প্যাগোডাকৃতির রঙিন মনাস্ট্রিগুলোর গায়ে কাঠের নিখুঁত কারুকার্য। ভেতরে রয়েছে থাঙ্কা চিত্রকলা। লামাদের কাঠের বাড়িগুলোও নানা রঙে রঙিন। রয়েছে বোধিবৃক্ষ। গাইড বলল, ভারত থেকে শাখা নিয়ে এসে এই বোধিবৃক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। একটি মন্দিরে এখানকার প্রধান লামা খাম্বো লামার মৃতদেহকে মমি করে রাখা আছে। ফুলবাগানের মাঝে রয়েছে চোর্তেন, প্রার্থনা চক্র। ১৯৪৫ সালে তৈরি হয়েছিল এই তিব্বতীয় বৌদ্ধ মন্দির কমপ্লেক্স। এর চারপাশে ছড়িয়ে আছে গাছপালাহীন রুক্ষ উপত্যকা। তার গায়ে সীমানা টেনেছে ঘাসের চাদর পাতা টিলাপাহাড়। কাছে-দূরে কয়েক ঘর বসতি নিয়ে গ্রামও রয়েছে। উপত্যকার বুকে ঘোড়ার দল চরে বেড়াচ্ছে। সাইবেরিয়ায় এমন রুক্ষ প্রকৃতির দেখা এই প্রথম পেলাম। মনাস্ট্রি দর্শন শেষে আবার ফিরে এলাম শহরে। রাশিয়া আর মঙ্গোলিয়ার মধ্যে ব্যবসায়িক যোগসূত্রের মাধ্যম এই শহর। সীমান্ত পথ দিয়ে দুই দেশের নাগরিকরা ভিসা ছাড়াই অবাধে একে অপরের দেশে যাতায়াত করতে পারে। উলানউদে শহরের মধ্যে অনেক পুরনো দিনের ঘরবাড়ি আজও রয়েছে। বাস থামল রেল স্টেশনের অদূরে লেনিন স্ট্রিট লাগোয়া বিশাল চক সোভিয়েত স্কোয়ারে।

এই চত্বর থেকেই আমাদের একঘণ্টার সিটি ওয়াকিং ট্যুর শুরু হল। চকের ঠিক মাঝখানে পাথরের বেদিতে বসানো রয়েছে ৮ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট ৪২ টন ওজনের ব্রোঞ্জের তৈরি বিশালাকার লেনিনের মুখাবয়ব। লেনিনের শুধুমাত্র মুখের এত বড় স্থাপত্য রাশিয়ায় তো বটেই এমনকী দুনিয়ায়ও বিরল। ১৯৭০ সালে লেনিনের জন্মশতবর্ষে এটি স্থাপিত। এর চারপাশ কেয়ারি করা ফুলবাগিচায় সাজানো। এই চত্বরে দেখলাম মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল হাউস, সোভিয়েত হাউস, ইউনিভার্সিটি, জেনারেল পোস্ট অফিস প্রভৃতি। রাস্তা পেরিয়ে চলে এলাম অপেরা হাউসের সামনে। দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য। এর সামনে চমৎকার ফোয়ারা আর বাগান। ফোয়ারার জল সুরের তালে নাচছে। চারপাশে বসার জায়গা রয়েছে এই চত্বরে। ছুটির দিন আর প্রতিদিন বিকেলে শহরবাসীরা ঘুরতে আসে এখানে। লেনিন স্ট্রিটের ধার দিয়ে হাঁটছি। যেতে যেতে দেখলাম জার সম্রাটের বিজয়তোরণ। বিরাট একটা আধুনিক শপিং মল দেখে সেখানে একবার ঢুঁ মারলাম। আরও কিছুটা এগতেই লেনিন স্ট্রিট গিয়ে মিশেছে সিটি সেন্টারে। এখানেই পুরনো পাড়ায় গ্রেট মার্চেন্ট রো-এর অবস্থান। দু'পাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাঠ ও পাথর দিয়ে তৈরি ১৯ শতকের বসতবাড়ি। এগুলো সব শহরের ব্যবসায়ীদের আদি বাড়ি। বর্তমানে এগুলিতে রেস্তোরাঁ, মিউজিয়াম, দোকানপাট গড়ে উঠেছে। এই রাস্তাটায় গাড়ির প্রবেশ নিষেধ। এই পায়ে চলা পথটা খুব যত্ন করে সাজানো। পুরনো বাড়িগুলোকেও সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়েছে। রাস্তার ধারে বসে অনেকে গিটার বাজিয়ে গান করছে। কেউ আবার ছবিও আঁকছে। এখনও আকাশে দিনের আলো রয়েছে। ঘড়িতে প্রায় রাত আটটা বাজে। শহরের অন্যতম সুন্দর চার্চটি রয়েছে লেনিন স্ট্রিটের অন্য প্রান্তে নদীর ধারে। ১৭ শতকে নির্মিত এই অর্থডক্স চার্চটির নাম ওদিগিট্রিভস্কি ক্যাথিড্রাল। উলানউদে শহরের অন্য প্রান্তে অবস্থিত এথনোগ্রাফিক ওপেনএয়ার ভিলেজ মিউজিয়ামটা সময়ের অভাবে দেখা হল না। রাত ন'টা নাগাদ শহর বেড়ানোর শেষে গেলাম বৈকাল প্লাজা হোটেলে। আজই রাতে এখান থেকে বাসে চেপে রওনা দেব পড়শি দেশ মঙ্গোলিয়ায়। সারারাত ধরে এক রোমাঞ্চকর পথযাত্রার শেষে পৌঁছব সে দেশের রাজধানী শহর উলানবাতার। মঙ্গোলিয়ায় তিনদিন ধরে বেড়িয়ে ফের উলানবাতার থেকে চাপলাম সরাসরি ইরকুতস্কগামী ট্রান্স মঙ্গোলিয়ান রেলপথের ট্রেনে।

মঙ্গোলিয়া বেড়ানোর গল্প আজ আর নয়। পরে কখনও সুযোগ হলে শোনাব। এবার শুধুই সাইবেরিয়া। উলানবাতার থেকে বিকেলবেলা ট্রেন রওনা দিয়ে পরদিন ভোরে পৌঁছল উলানউদে। এখান থেকে আবার ট্রেন চলল ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ দিয়ে। এ আমাদের চেনা পথ। ক'দিন আগেই তো এই পথ দিয়েই এসেছিলাম। ইরকুতস্ক পৌঁছতে প্রায় দুপুর তিনটে বাজল। মস্কো থেকে এই শহরের দূরত্ব ৫১৮৫ কিলোমিটার। বেড়ানোর শেষ পর্যায়ে এবার এখান থেকে দেখতে যাব সাইবেরিয়ার প্রধান আকর্ষণ বৈকাল হ্রদ আর তার সঙ্গে আরও কয়েকটি দ্রষ্টব্য। যদিও ট্রেন সফরে আগেই বৈকালের দেখা পেয়েছি, তবে এবার তাকে হাতের নাগালে পাব। মনের মধ্যে উত্তেজনার পারদ ক্রমশ চড়ছে। স্টেশনে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল গাইড নাতালিয়া। মেয়েটি ইরকুতস্কেরই বাসিন্দা। মস্কো থেকে এই শহরের সময় পাঁচ ঘণ্টা এগিয়ে। অর্থাৎ উলানউদে আর ইরকুতস্কের সময় এক। রোদ ঝলমলে আবহাওয়া। বাতাসে শীতের আমেজ খুবই কম। সাইবেরিয়ার এহেন গ্রীষ্ম প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার প্রসঙ্গ উঠতেই গাইড বলল, এই বছর এখানে গ্রীষ্মের তাপমাত্রা বেশ কিছুটা বেড়েছে। কারণ গ্লোবাল ওয়ার্মিং। সাইবেরিয়ার প্রকৃতি এরফলে ভারসাম্য হারাচ্ছে। বৈকাল হ্রদের জলদুনিয়া ও তার জীববৈচিত্র্য এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

রেল স্টেশনের বাইরেই আমাদের বাস দাঁড়িয়েছিল। এবার গন্তব্য এখান থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে বৈকাল হ্রদের তীরে লিস্তভিয়াঙ্কা গ্রাম। আঙ্গারা নদীব্রিজ টপকে শহর

ছাড়িয়ে বাস চলেছে চার লেনের প্রশস্ত হাইওয়ে দিয়ে। পথের দু'পাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সরলবর্গীয় বৃক্ষরাজি। এই পথ সাইবেরিয়ান হাইওয়ের একাংশ। কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে হাইওয়ে ছেড়ে বাস অন্য পথ ধরল। আরণ্যক প্রকৃতি এখনও সঙ্গ ছাড়েনি। পথের ডানদিকে গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে মাঝেমধ্যেই উঁকি দিচ্ছে আঙ্গারা নদী। যত এগচ্ছি চারপাশের প্রাকৃতিক শোভা তত খোলতাই হচ্ছে। প্রকৃতির ক্যানভাসে ক্রমশ ফুটে উঠছে সবুজ পাহাড়ের সারিবদ্ধ ছবি। যাত্রাপথের শেষ পর্যায়ে আঙ্গারা নদী সড়ক পথের প্রায় গা ঘেঁষে বয়ে চলেছে। এক ঘণ্টার বাসযাত্রার শেষে পৌঁছলাম এক নয়নাভিরাম গ্রামে। এটাই লিস্তভিয়াঙ্কা। গ্রামে প্রবেশের মুখেই দেখলাম বৈকাল হ্রদের সঙ্গে আঙ্গারা নদীর সংযোগস্থল। এখান থেকেই নদীর উৎপত্তি। লাগোয়া ছোট নদীবন্দর। ১৭ শতকে হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম কিনারায় গড়ে ওঠা এই নির্জন গ্রামে সর্বসাকুল্যে হাজার দুয়েক লোকের বসবাস। গ্রামের মুখোমুখি দিগন্তবিস্তৃত নীলাভ বৈকাল হ্রদ। অঢেল প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে ভরপুর হ্রদের চারপাশ। বৈকাল হ্রদে বেড়াতে আসা পর্যটকদের কাছে তাই সবথেকে পছন্দের জায়গা এই গ্রাম। লিস্তভিয়াঙ্কা গ্রামটাও খুব বেশি বড় নয়। বাস থামল লেকড্রাইভ রোডের (গোর্কি স্ট্রিট) ঠিক মাঝখানে গ্রামলাগোয়া হোটেল ক্রিস্টো ভায়াপাড-র দোরগোড়ায়। হ্রদের সামনেই সমতল আর টিলার গায়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে এটি গড়ে উঠেছে। আমাদের দোতলা রিসর্টটা পুরোটাই কাঠের অভিনব স্থাপত্যে বানানো। টিলার গা দিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করতে হবে। সেখান থেকে গ্রাম আর হ্রদকে আরও ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে। গ্রামের গায়ে সবুজের চাদরে মোড়া পাহাড়শ্রেণীর নাম প্রিমরস্কি।

হোটেলের ঘরে মালপত্র রেখে বাসে চেপে চলে এলাম কাছেই হ্রদের বোটজেটিতে। বাতাসের ধাক্কায় হ্রদের স্বচ্ছ শীতল জলে ভালোই ঢেউ খেলছে। ছোট ছোট নুড়ি-পাথর আর মিহি বালি ছড়ানো পরিচ্ছন্ন তটরেখা। লাগোয়া উঁচু পিচ রাস্তা থেকে কিছুটা অন্তর একাধিক সিঁড়ি নেমেছে হ্রদের গায়ে। শীতল জলে হাত ছোঁয়াতেই মনে শিহরণ খেলে গেল। দাঁড়িয়ে আছি বৈকাল হ্রদের তীরে। কতদিনের স্বপ্ন আজ সত্যি হল। এখানে এসে পর্যটকদের ভিড় কিছুটা চোখে পড়ল। হ্রদের তীরে বসে অনেককেই মাছ ধরতে দেখলাম ছিপ দিয়ে। কেউ আবার হ্রদের জলে স্নান করছে, ছাতার নীচে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে। হ্রদে অ্যাডভেঞ্চার ওয়াটার স্পোর্টসেরও ব্যবস্থা রয়েছে। জলের মাঝে প্যারাসেলিং করছে উৎসাহী পর্যটক। খাবারের স্টলে বিক্রি হচ্ছে হ্রদের নানারকম মাছের সুস্বাদু পদ। গাইডকে সঙ্গে নিয়ে বোটজেটি থেকে চাপলাম লেকট্যুরের স্পিড বোটে। প্রায় তিন ঘণ্টার এই হ্রদ ভ্রমণ। আমাদের জন্যে বরাদ্দ ছিল দুটি ছোট স্পিড বোট। জল কাটিয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটছে তারা। আকাশে ঝলমলে সূর্যদেব ফুটে আছে নীলাকাশের পটভূমিকায়। গাইডের মুখে শুনছি বৈকাল হ্রদের অজানা তথ্য। সাইবেরিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে ইরকুতস্ক আর বুরিয়াতিয়া প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত বৈকাল হ্রদ সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় আড়াই কোটি বছর আগে। প্রকৃতির আশ্চর্য সৃষ্টি এই জলাশয় পৃথিবীর প্রাচীনতম, গভীরতম এবং স্বচ্ছতম মিষ্টি জলের হ্রদ। বিশ্বের মিষ্টি জলের ২০ শতাংশ সঞ্চিত রয়েছে এই হ্রদে। বৈকাল হ্রদ লম্বায় ৬৩৬ কিলোমিটার আর

চওড়ায় জায়গা বিশেষে ২৭ থেকে ৮০ কিলোমিটার। গভীরতা ১৬৩৭ মিটার। হ্রদের চারপাশ ঘিরে আছে ছোট-বড় পাহাড়শ্রেণী। যার বেশিরভাগ ঢাল জুড়ে ঘন সবুজ অরণ্যের রাজ্যপাট। প্রায় সাড়ে তিন হাজার প্রজাতির জলজ প্রাণী আর উদ্ভিদ রয়েছে এই হ্রদে। দেখা মেলে আশ্চর্য জলজ প্রাণী বৈকাল শীল। হ্রদের উত্তর-পশ্চিমে বৈকাল পাহাড়, উত্তর-পূর্বে বারগুজিন পাহাড়, দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রিমরস্কি পাহাড় আর দক্ষিণ-পূর্বে খামার দাবান পাহাড়— এই চার পাহাড়শ্রেণী ঘিরে রেখেছে বৈকাল হ্রদকে। প্রায় শ'তিনেক ছোট-বড় নদী এসে মিশেছে এই হ্রদে, কেবল একটিমাত্র নদী আঙ্গারা উৎপন্ন হয়েছে হ্রদ থেকে। হ্রদের তটরেখার দৈর্ঘ্য ২১০০ কিলোমিটার। হ্রদের জলে ভেসে রয়েছে নানা মাপের ২৭টি দ্বীপ। যার মধ্যে সবচেয়ে বড় ওলখোন দ্বীপ। দ্বীপের একপ্রান্তের সামানকা যমজ টিলাপাহাড়ের আকর্ষণে ওলখোন দ্বীপে পর্যটক সমাগম হয়। লিস্তভিয়াঙ্কা থেকে কন্ডাকটেড ট্যুরে দিনে দিনেই সেই দ্বীপ বেড়িয়ে আসা যায়। জানুয়ারি থেকে এপ্রিল এই চার মাস হ্রদের জল জমে বরফ হয়ে যায়। তখন তার ওপর দিয়ে হাঁটা যায়। অ্যাডভেঞ্চার-প্রেমীরা সেই জমাট বাঁধা বরফ প্রান্তর দিয়ে ট্রেকিং করে। হ্রদের কিছু অংশের বরফস্তর এতটাই পুরু এবং শক্ত থাকে যে তার ওপর দিয়ে ছোট গাড়ি বা হোভারক্রাফটও চলতে পারে। শীতে এই হ্রদ অঞ্চলের তাপমাত্রা নেমে যায় হিমাঙ্কের বহু নীচে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার বৈকাল হ্রদ ১৯৯৬ সালে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তকমা পেয়েছে। আয়তনের বিচারে বৈকাল হ্রদ পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম।

হ্রদের মাঝখান থেকে অদূরের সবুজ পাহাড়ের সারির মাঝে লিস্তভিয়াঙ্কার গ্রাম্য প্রকৃতিকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। হ্রদের জলে ভেসে বেড়াচ্ছে পর্যটক বোঝাই মোটর বোট, লঞ্চ। যন্ত্রচালিত জেলে নৌকাও চোখে পড়ল। আধঘণ্টার জলযাত্রার শেষে স্পিড বোট থামল হ্রদের অন্য প্রান্তে। হ্রদের অর্ধচন্দ্রাকৃতির একফালি তটরেখায় ছড়িয়ে আছে গোলাকার ছোট ছোট পাথরের টুকরো। হ্রদের গা ছোঁয়া টিলাপাহাড়ের গায়ে নিবিড় অরণ্যের প্রলেপ। চারপাশ শুনশান। মানুষজনের চিহ্ন নেই। পাখিদের কলকাকলি শুধুমাত্র কানে বাজছে। এদিকে হ্রদের সৌন্দর্যকে আরও মায়াবী লাগছে। অবিরাম নৈঃশব্দ্যের মাঝে ভেসে থাকা বৈকাল হ্রদের রূপ-রস প্রাণভরে আত্মস্থ করছি। বোট থেকে পাড়ে নেমে টিলার গা দিয়ে গাছের ছায়া ঢাকা অসমান কাঁচা পথ বেয়ে খানিকটা হেঁটে কিছুটা ওপরে উঠে এলাম। হ্রদের জল এতটাই স্বচ্ছ যে জলের তলদেশের অনেকটাই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এখানে টিলার গায়ে বেড় দিয়ে রেললাইন পাতা রয়েছে। গাইডের কাছে জানলাম এটা ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ের পুরনো রেলপথের একাংশ। টিলার গা দিয়ে সাবধানে নেমে এলাম সেই রেললাইন লাগোয়া ১৬৪ মিটার দীর্ঘ এক পাহাড়ি সুড়ঙ্গের সামনে। ইরকুতস্ক থেকে আঙ্গারা নদীর গা দিয়ে অতীতে ট্রেন আসত এইপথে। লিস্তভিয়াঙ্কা গ্রামের বিপরীতে নদী আর হ্রদের সংযোগস্থলে অবস্থিত পোর্ট বৈকাল স্টেশনের পর থেকেই হ্রদের একেবারে গা ঘেঁষে পাহাড়কে বেড় দিয়ে এই রেলপথ গিয়েছে কুলতুক হয়ে স্লুদিয়াঙ্কা। ১৯৫০ সালে আঙ্গারা নদীতে বাঁধ নির্মাণের ফলে ইরকুতস্ক থেকে পোর্ট বৈকালের মধ্যে সেই রেলপথের বেশিরভাগটাই নদীর জলস্তর বৃদ্ধিতে নষ্ট হয়ে যায়। তখন ইরকুতস্ক থেকে নতুন আরেকটি রেলপথ তৈরি করা হয় যেটিতে বর্তমানে ট্রেন চলাচল করছে। তবে পোর্ট বৈকাল থেকে কুলতুক পর্যন্ত প্রাচীন রেলপথের বাকি অংশটাকে বন্ধ করা হয়নি। এই পথে কয়েকটি গ্রাম থাকায় ইরকুতস্ক আর স্লুদিয়াঙ্কা থেকে দিনে গোটাদুয়েক প্যাসেঞ্জার ট্রেন আর পর্যটকদের জন্যে স্টিম ইঞ্জিনে টানা একটি হেরিটেজ কন্ডাকটেড ট্যুরের ট্রেন চলে। প্রাচীন এই রেলপথটুকু 'সার্কাম বৈকাল রেলওয়ে' নামে পরিচিত। সিঙ্গল লাইনের এই রেলপথে রয়েছে প্রচুর পাহাড়ি সুড়ঙ্গ আর ব্রিজ। রেললাইনের গা দিয়ে খানিকটা পথ হেঁটে হ্রদ, আরণ্যক প্রকৃতিকে নতুন রূপে আবিষ্কার করলাম। এদিকের পাহাড়শ্রেণীর বেশিরভাগটাই জলের গা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে এক ঘণ্টা কাটিয়ে আবার বোটে চাপলাম। নিস্তব্ধতা ভেঙে গতি তুলল জলযান। পাড়ের কিছুটা কাছ দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম রেলওয়ে টানেল, ব্রিজ, ড্রাই ডক, পোর্ট বৈকাল রেল স্টেশন। এই স্টেশনটা অনেক পুরনো। ছোট্ট স্টেশন। ভেতরে এই রেলপথের ইতিহাস নিয়ে সংগ্রহশালা রয়েছে। স্টেশনে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। রেলস্টেশনের অদূরে গ্রামের অবস্থান। পর্যটকদের সেই গ্রামে রাত কাটানোর জন্যে হাতে গোনা কয়েকটি হোটেল রয়েছে। পোর্ট বৈকাল থেকে ফেরি সার্ভিস চালু আছে লিস্তভিয়াঙ্কা পৌঁছনোর জন্যে। এরপর স্পিড বোট এগিয়ে চলল পোর্ট বৈকালের অদূরে আঙ্গারা নদীর উৎসমুখের দিকে। সেখানে হ্রদ আর নদীর সংযোগস্থলে দেখলাম জল থেকে মুখ তুলে থাকা পাথরখণ্ড। এটির নাম 'সামান স্টোন'। এই ডুবোপাথরটিকে নিয়ে স্থানীয় একটি লোককথা রয়েছে। সেটি এইরকম— বৈকাল হ্রদের মেয়ে আঙ্গারা নদী প্রেমে পড়ে ইয়েনিসেই নদীর। এই দুই নদীর ভালোবাসায় বাধ সাধে বৈকাল। কিন্তু সেই বাধা উপেক্ষা করে আঙ্গারা নদী বৈকাল হ্রদ থেকে ভেসে চলে তার প্রেমিকের কাছে। তখনই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বৈকাল পাথরখণ্ড ছুঁড়ে আঙ্গারার যাত্রাপথকে আটকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তার সেই চেষ্টা বৃথা যায়। ভালোবাসার টানে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আঙ্গারা আর ইয়েনিসেই নদীর মিলন ঘটে। গাইডের মুখে এমন মজার এক কাল্পনিক গল্পকথা শুনে ভালো লাগল। জলবিহারের একফাঁকে বোট চালকের সাহায্যে মাঝ হ্রদ থেকে গ্লাসে করে হ্রদের সুপেয় জল তুলে চেখে দেখলাম। স্বচ্ছ টলটলে শীতল জল গলায় ঢালতেই তৃষ্ণা মিটল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত সাড়ে আটটা বাজে। রাত হলেও এখনও আকাশে দিনের আলো রয়েছে। ডিনারের সময় হয়ে গিয়েছে। চলে এলাম আমাদের রিসর্টের রেস্তোরাঁয়। হ্রদের তাজা মাছ আর নানারকমের পদ দিয়ে রাতের খাওয়া সারলাম। মাছের পদ তৈরি হয়েছিল বৈকালের সবথেকে জনপ্রিয় ও সুস্বাদু মাছ ওমুল দিয়ে। অপূর্ব তার স্বাদ। ডিনার শেষে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম হ্রদের ধারে। ক্রমশ আকাশের রং বদল হচ্ছে। ঠান্ডাও বাড়ছে। দূরের ঢেউ খেলানো পাহাড়টাকে ছায়ার মতো দেখতে লাগছে। স্পিড বোটে দীর্ঘ জলপথ পেরিয়ে ওই পাহাড়টার কাছেই তো গিয়েছিলাম আজ। প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ আকাশে গোধূলির রং ঢেলে বৈকালের জলে ডুব দিল অগ্নিগোলক। আকাশের রঙের ছোঁয়া লেগেছে হ্রদের জলেও। বিস্ময়বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছি অস্তমিত সূর্যের দিকে। বৈকাল হ্রদের তীরে অসাধারণ সূর্যাস্ত দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। দিনান্তের সূচনায় জলচর পাখির ঝাঁক উড়ে চলেছে আপন বাসায়। সূর্য ডুবলেও আকাশে এখনও দিনের আবছা আলো রয়েছে।

হ্রদের গা দিয়ে হেঁটে চলেছি। দেখতে দেখতে একসময় অন্ধকারে হারিয়ে গেল বৈকাল হ্রদের ছবি। কানে শুধু বাজছে ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ।

পরদিন হ্রদের বুকে সূর্যোদয় দেখার তাগিদে খুব সকাল সকাল উঠে পড়লাম ঘুম থেকে। সকালে ভালোই ঠান্ডা। হ্রদের পূর্ব দিগন্তে সোনালি আলো ছড়িয়ে সূর্যদেব জেগে উঠল। হোটেলের ঘরের জানলা দিয়েই সেই দৃশ্য উপভোগ করলাম। সময়মতো গাইড নাতালিয়া চলে এসেছে হোটেলে। ও আজ আমাদের লিস্তভিয়াঙ্কার দ্রষ্টব্য স্থানগুলো ঘুরিয়ে দেখাবে। ব্রেকফাস্ট করে বাসে চেপে রওনা দিলাম। ঝকঝকে আবহাওয়া। রোদের তেজ বাড়ায় শীত অনেকটাই কম লাগছে। এ বছর এখানে শীতের প্রকোপ কম থাকায় সঙ্গে আনা ভারী শীতবস্ত্র খুব একটা কাজে লাগল না। হালকা শীতপোশাকেই ঠান্ডাকে মানিয়ে নেওয়া যাচ্ছে। লিস্তভিয়াঙ্কার কয়েকটি ট্রাভেল এজেন্সি এই গ্রাম আর বৈকাল হ্রদকে কেন্দ্র করে পর্যটকদের জন্যে নানারকমের ব্যবস্থাপিত সফরের আয়োজন করে থাকে। গ্রামের অলিগলিতে আর পাহাড়ি অপ্রশস্ত পাকদণ্ডী পথে চলার সুবিধার্থে আজ আমরা একটা ছোট বাসে চাপলাম। প্রথমে গেলাম আমাদের হোটেলের অদূরে গ্রামের মধ্যে অবস্থিত ১৮ শতকে এক রুশ ব্যবসায়ীর তৈরি সেন্ট নিকোলাই অর্থডক্স চার্চে। চারপাশে ঘন সবুজ গাছগাছালির ঘেরাটোপ। অসম্ভব শান্ত পরিবেশ। মাঝারি মাপের দৃষ্টিনন্দন চার্চ। অনতিদূরে সর্পিল গতিতে বয়ে চলেছে ক্ষীণকায়া ক্রিস্টোভায়া নদী। এই নদী গ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মিশেছে হ্রদের জলে। চার্চ দেখে হ্রদপাড়ের সড়কপথ দিয়ে এলাম স্থানীয় এক মাছের দোকানে। লেক ড্রাইভ রোডের একেবারে শেষপ্রান্তে এটির অবস্থান। হ্রদের নানা ধরনের মাছ রান্না করে বিক্রি হচ্ছে এখানে। দেখলাম হ্রদের সবথেকে জনপ্রিয় ওমুল মাছের চাহিদাই বেশি। হ্রদের গা বরাবর সড়কপথটি প্রায় পাঁচ কিলোমিটার প্রসারিত হয়ে এদিকেই শেষ হয়েছে। এরপর হ্রদ আর পাহাড়ের গা দিয়ে এই অঞ্চলের জনপ্রিয় এক ট্রেকিং পথ শুরু হয়েছে। অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীরা গ্রেট বৈকাল ট্রেইল পদযাত্রায় সেই পথ পৌঁছয় ২৫ কিলোমিটার দূরে হ্রদলাগোয়া বলসিকোটি গ্রামে।

এর পরের গন্তব্য বৈকাল লেক মিউজিয়াম। হ্রদের কাছেই গড়ে উঠেছে এই অসাধারণ সংগ্রহশালা। প্রবেশমূল্য দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে। বৈকাল হ্রদের খুঁটিনাটি বিষয় এখানে সযত্নে সাজানো রয়েছে। প্রথমে সাবমেরিনের আদলে বানানো প্রেক্ষাগৃহে বসে দেখলাম হ্রদের তলদেশের চমৎকার তথ্যচিত্র। দোতলায় রয়েছে এই হ্রদ সংক্রান্ত গবেষণাকেন্দ্র। তার একাংশে পর্যটকদের প্রবেশাধিকার মেলে। সেখানেই একটা গবেষণাকক্ষে ঢুকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ রেখে দেখলাম বৈকাল হ্রদ থেকে পাওয়া অতি ক্ষুদ্র মাছ, পোকামাকড় আর রঙিন পাথর। মিউজিয়াম দর্শন সাঙ্গ করে এবার চললাম অন্যপথে। বাস কিছুটা পাহাড় ঘুরে উঠে থামল ছোট্ট একখণ্ড উপত্যকার দোরগোড়ায়। চারপাশে আরণ্যক পাহাড়ে ঘেরা। সবুজ উপত্যকার ঢালে ফুটে রয়েছে রংবেরঙের অজস্র বন্য ফুল। এই পার্বত্য অঞ্চল প্রিমরস্কি পাহাড়শ্রেণীর একাংশ। এখান থেকে চাপলাম ঝুলন্ত কেবলকারে। দশ মিনিটে উঠে এলাম পাহাড়ের ৭২৮ মিটার উচ্চতায়। এই পথটুকুতে অনেককে হেঁটেও উঠতে দেখলাম। পাহাড়চূড়ার ওপরে অনেকটা সমতল অংশ ছড়িয়ে রয়েছে। ওপর থেকে

উলানউদেতে বৌদ্ধ মনাস্ত্রি

চারপাশের পাহাড়ি শোভা অপরূপ দেখাচ্ছে। কেবলকারের আপার টার্মিনাল লাগোয়া ক্যাফেটেরিয়া রয়েছে। তাকে ঘিরে খোলা আকাশের নীচে প্রকৃতির কোলে চমৎকার বসার ব্যবস্থা। এখানে বসেই হোটেল থেকে দিয়ে দেওয়া লাঞ্চবক্স খুলে দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিলাম। এরপর বন্ধুর পথ দিয়ে খানিকটা হেঁটে এলাম পাহাড়চূড়ার আরেক প্রান্তে চেরস্কি স্টোন নামে বিরাট এক পাথরখণ্ডের সামনে। এটি আসলে ওপর থেকে বৈকাল হ্রদের শোভা দেখার ভিউপয়েন্ট। এই পাথরখণ্ডের নামকরণ করা হয়েছে বিখ্যাত রুশ অভিযাত্রীর নামে। এখান থেকে সুদূরব্যাপী সাগরসম বৈকাল হ্রদকে দু'চোখ ভরে দেখলাম। আবার কেবলকারে চেপে

বোটজেটির বিপরীতেই রয়েছে হস্তশিল্প আর মাছের বাজার। সেখানে বিক্রি হচ্ছে সুস্বাদু ওমুল সহ বৈকাল হ্রদের হরেকরকম টাটকা মাছ।

বৈকাল হ্রদ

বৈকাল হ্রদের বিখ্যাত ওমুল মাছ

পাহাড়ের নীচে নেমে এলাম। এবার চলেছি হ্রদের তীরের রাস্তা ধরে বোটজেটির দিকে। বাস থামল বোটজেটি লাগোয়া বাঁধানো চত্বরে। তারপর মেঠো পথ ধরে হেঁটে লিস্তভিয়াঙ্কা গ্রাম দর্শনে বেরলাম। সবুজের ছায়ামাখা পথে ঘুরছি। গ্রামের বাড়িগুলো সব কাঠের তৈরি। একতলা, দোতলা গ্রাম্যবাড়ি চালাঘরের আদলে বানানো। কয়েকটাতে পর্যটকদের জন্যে হোমস্টে-র ব্যবস্থাও রয়েছে। গ্রামের মানুষজনের জীবনযাত্রা দেখে বোঝা যায় যে এদের আর্থিক অবস্থা খুব একটা মজবুত নয়। গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলে এলাম ক্রিস্টোভায়া নদীর তীরে।

অনবদ্য সূর্যোদয়কে সঙ্গী করে নতুন দিনের সূচনা [illegible]

শীতল সকাল। আজ বৈকাল হ্রদকে বিদায় জানিয়ে পাড়ি দেব ইরকুতস্ক। ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। কিন্তু আমরা নিরুপায়। সবকিছুই যে সময়ের গণ্ডিতে বাঁধা। দুটো দিন হ্রদের তীরে হইহই করে কাটিয়ে ব্রেকফাস্ট করে বেলা এগারোটায় বাসে চাপলাম। বাসের জানলা দিয়ে শেষবারের মতো দু'চোখ ভরে দেখছি বৈকালকে। দেখতে দেখতে চোখের আড়াল হল মায়াবী বৈকাল হ্রদ। প্রায় ২০ কিলোমিটার বৈকাল হাইওয়ে দিয়ে যাত্রার শেষে বাস থামল সবুজে ঘেরা তালসি গ্রামে। আঙ্গারা নদীর ধারে এর অবস্থান। চারপাশে আরণ্যক টিলা পাহাড়। নির্জন পরিবেশ। এখানে দেখতে এসেছি সাইবেরিয়ার আদিবাসী ও গ্রাম্যজীবনকে নিয়ে খোলা আকাশের নীচে গড়ে ওঠা তালসি ভিলেজ মিউজিয়াম। নদীর তীরে কয়েক একর জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে স্থানীয় গ্রাম্য ঘরবাড়ি, উপাসনালয়, দুর্গ প্রভৃতির প্রায় ৪০টি স্থাপত্য। যার মধ্যে কয়েকটিকে আবার বিভিন্ন গ্রাম থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে তুলে এনে এখানে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সেইসব স্থাপত্যগুলি ১৭ থেকে ১৯ শতকের মধ্যে নির্মিত। ইরকুতস্ক থেকে প্রায় ৯০০ কিলোমিটার উত্তরে ইলিমিস্ক জনপদ লাগোয়া ইলিম নদীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ার সময়ে বেশ কিছুটা গ্রামাঞ্চল জলস্তর বৃদ্ধিতে তলিয়ে যায়। সেখান থেকেও বেশ কিছু শতবর্ষ প্রাচীন স্থাপত্যকে এখানে সরিয়ে এনে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এখানে প্রবেশ করে প্রথমেই দেখলাম ইলিমিস্ক ফোর্ট কমপ্লেক্স। সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি এই দুর্গ-প্রাসাদ ১৭ শতকে নির্মিত। এর ভেতরে রয়েছে কাজান চ্যাপেল, অস্ত্রাগার, প্রশাসনিক ভবন, কোষাগার। দুর্গকে ঘিরে আছে বড় বড় কাঠের টুকরো দিয়ে তৈরি সুউচ্চ প্রাচীর। কয়েকটি বাড়ির মধ্যে সংগ্রহশালা রয়েছে। সমস্ত কিছুই কাঠের অভিনব স্থাপত্যশৈলীতে তৈরি। গ্রামের মধ্যে খোলা মঞ্চে নিয়মিত স্থানীয় লোকসংস্কৃতিকে তুলে ধরতে নানাধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখছি সাইবেরিয়া অঞ্চলের নানা ধরনের মডেল গ্রাম্য বাড়ি। এখানে দেখলাম ইরকুতস্ক প্রদেশের ইয়োদারমা গ্রামের ঘরবাড়ির মডেল। ১৬৬৭ সালের স্পাসকায়া টাওয়ারের অভিনব স্থাপত্য দেখে তাক লেগে গেল। কী নিখুঁত কাঠের শিল্পকর্ম। কাজান চ্যাপেলে কোসেক আদিবাসীরা গেয়ে শোনাল তাদের লোকগান। এরপর দেখলাম ১৯ শতকের পারিস স্কুলবাড়ি। এর ভেতরে ক্লাসরুম, হেডমাস্টার অফিস, লাইব্রেরি রয়েছে। এটা সাইবেরিয়ার গ্রাম্য বিদ্যালয়। ঘুরতে ঘুরতে থামলাম মঙ্গোলীয় বুরিয়াত আদিবাসীদের গোলাকার কাঠের তৈরি বাড়ির সামনে। এতক্ষণ যেসব গ্রাম্য বাড়ি দেখেছি সেগুলোর থেকে এর আকৃতি আলাদা। এখানেও ভেতরে বুরিয়াতদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্রে সাজানো সংগ্রহশালা করা। চলে এলাম গ্রামের শেষ প্রান্তে। সামনে অনেকটা চওড়া হয়ে বইছে আঙ্গারা নদী।

তালসি থেকে ইরকুতস্ক পৌঁছতে এক ঘণ্টা লাগল। সাইবেরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ এই শহরের গোড়াপত্তন হয়েছিল ১৬৬১ সালে। ইরকুতস্ক প্রদেশের (ওবলাস্ত) নামেই শহরের নামকরণ। শিক্ষা ও বাণিজ্যে এই শহর বেশ উন্নত। শহরের মধ্যে দিয়ে বইছে আঙ্গারা নদী। নদীর মধ্যে কয়েকটি দ্বীপ রয়েছে। শহরের অন্য প্রান্ত থেকে ছোট আরেকটি নদী ইরকুট বয়ে এসে মিশেছে আঙ্গারা নদীতে। বেশ বড় শহর। সুন্দর সাজানো। শহরের মধ্যে এক কামরার ট্রাম, ট্রলিবাস চলছে। একসময় এখানকার সমস্ত ঘরবাড়িই ছিল কাঠের তৈরি। ১৮৭৯ সালের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে এই শহরের একটা বড় অংশ পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। পুনরায় নতুনরূপে গড়ে ওঠে শহরের পুড়ে যাওয়া অংশ। ১৮ শতকের কাঠের ইমারত আজও ছড়িয়ে আছে শহরের নানা প্রান্তে। পুরনো শহরের পাশাপাশি আধুনিক নগর সভ্যতাও গড়ে উঠেছে। সেখানে সুউচ্চ ইমারত, কল-কারখানা, চওড়া রাস্তাঘাট। আঙ্গারা নদীতে বাঁধ দিয়ে তৈরি হয়েছে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। শহরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সবুজ প্রকৃতির চাদরে মোড়া পাহাড়ি টিলা। এই শহরে দেখার অনেক কিছুই রয়েছে। তাই বৈকাল হ্রদ বেড়িয়ে একযাত্রায় ইরকুতস্কের দ্রষ্টব্যগুলোও দেখে নেওয়া যায়। মাঝদুপুরে এসে পৌঁছেছি এখানে। শহর দর্শনের জন্যে হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে। গাইড নাতালিয়া আমাদের খুব যত্ন করে সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে। বাস চলেছে শহরের প্রধান রাস্তা কার্ল মার্কস স্ট্রিট দিয়ে। পথের দু'পাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে ১৯ শতকে পাথরের তৈরি ইমারত। সেগুলো আজ অফিস-কাছারি, নানা ধরনের দোকান আর রেস্তোরাঁর দখলে। বেশ চওড়া রাস্তা। কাছেই উডেন স্ট্রিটে ছড়িয়ে রয়েছে কাঠের বাড়ি। কটেজধর্মী একতলা বাড়ি ছাড়াও চোখে পড়ল দোতলা, তিনতলা বাড়িও। শহরের ১৩০ কোয়ার্টার অঞ্চলেও রয়েছে এই ধরনের আরও কাঠের স্থাপত্য। জিউস সিনাগগ, সেন্ট্রাল মার্কেট দেখে শহরের প্রান্তে নদীব্রিজ পেরিয়ে বাস থামল আঙ্গারা নদীতে ভাসমান এক ছোট্ট দ্বীপে। গাছগাছালিতে সাজানো সুন্দর দ্বীপ। এখানে গড়ে তোলা হয়েছে ইয়ুথ পার্ক।

এরপর দ্রষ্টব্য ডিসেমব্রিস্ট মিউজিয়াম। ১৮২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সেন্টপিটার্সবার্গে জার সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন শহরের কিছু বিশিষ্টজন আর রাজপরিবারের সেনাদের একাংশ। সম্রাটের নির্দেশে তাদেরকে সাইবেরিয়ার নানা প্রান্তে নির্বাসন দেওয়া হয় শাস্তি হিসেবে। এমন শাস্তিপ্রাপ্ত কিছু বিশিষ্ট জন এই শহরে থাকাকালীন এখানকার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলেন। গড়ে তোলেন শিল্পমণ্ডিত ঘরবাড়ি। বাস থামল এমনই এক দোতলা কাঠের বাড়ি ভলকোনস্কি ম্যানর-এ। শহরের ১৮ কিলোমিটার বাইরে উরিক গ্রামে ১৮৩৮ সালে এই ভবনটি তৈরি হয়। ১৮৪৭ সালে সেই বাড়িটিকে বিশেষ পদ্ধতিতে গ্রাম থেকে সরিয়ে এনে বর্তমান স্থানে পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। এটা ভলকোনস্কি পরিবারের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা। ভেতরে তাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, জার সম্রাটের বিরুদ্ধে বিপ্লবের ইতিহাস সযত্নে সংরক্ষিত। এখানে প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি এই মহল রুশ স্থাপত্যশৈলীর এক অনবদ্য নিদর্শন। চারপাশটা ফুলের বাগানে সাজানো। এখান থেকে বেরিয়ে সামনেই দেখে নিলাম সবুজ রঙের চূড়াবিশিষ্ট ট্রান্সফিগারেশন চার্চ। আবার ফিরে এলাম নদীর ধারে। অদূরেই ১৭ শতকের চার্চ জামেনস্কি মনাস্ট্রি। মহিলা সন্ন্যাসিনী পরিচালিত এই চার্চে প্রবেশ করলাম। বিরাট চার্চ কমপ্লেক্স। লাগোয়া বাগানটা ফুলে ফুলে ভরে রয়েছে। ভেতরে ঢুকে চার্চের দেওয়াল জোড়া চিত্রকলা, সোনার জল করা কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হলাম।

শহর দর্শনের এক ফাঁকে দেখে নিলাম চীনা পণ্যের সম্ভারে সাজানো বিরাট চায়না মার্কেট। আঙ্গারা নদীর গায়ে ১৭০১ সালে গড়ে উঠেছিল নগরদুর্গ। যদিও আজ সেই দুর্গের একটুকরোও অবশিষ্ট নেই। ধ্বংস হয়ে গিয়েছে সেই

দুর্গ। নদীর ধারে মস্কো বিজয় তোরণের আশপাশেই ছড়িয়ে ছিল সেই দুর্গ। এই অঞ্চলে কয়েকটি চার্চ, পার্ক রয়েছে। বাস থামল এই অঞ্চলেই সবুজের ছায়াঘেরা কিরোভ স্কোয়ারে। এই চত্বরটা যত্নে সাজানো। কিরোভ স্কোয়ারের কাছেই সোভিয়েত হাউস। এর লাগোয়া ওয়ার মেমোরিয়াল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সাইবেরিয়ার যে সব যোদ্ধা নাৎসি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রাণ দিয়েছিল তাদের স্মৃতিসৌধ এটি। বেদিতে অনির্বাণ অগ্নিশিখা জ্বলছে। আরেকটু হেঁটে এগতেই দেখলাম বাগানের মাঝে গড়ে উঠেছে স্পাসকায়া চার্চ। ১৭ শতকে তৈরি চার্চের প্রাচীন স্থাপত্যটি কাঠের ছিল। সেটি আগুনে পুড়ে গেলে একই জায়গায় নতুন করে তৈরি করা হয় বর্তমান চার্চটি। চার্চের বাইরের দেওয়ালে একাংশে অভিনব চিত্রকলা চোখে পড়ল। একপাশে প্রাচীন নগরদুর্গের প্রতিরূপ খোদাই করা রয়েছে একটা বড় পাথরখণ্ডে। চার্চের ভেতরে ঢুকলাম। দেওয়াল জোড়া ভাস্কর্য। অনুমান করা হয় এই চার্চ হারিয়ে যাওয়া দুর্গের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন। রাস্তা পেরিয়ে ডানদিকে দেখলাম ১৮ শতকের পোলিস ক্যাথলিক চার্চ। অদূরেই নদীর আরও কাছে ১৬ শতকের দৃষ্টিনন্দন এপিপহানি ক্যাথিড্রাল। নজরকাড়া স্থাপত্য। এর ভেতরের দেওয়াল, অর্ধগোলাকৃতির সিলিং জুড়ে আঁকা রয়েছে অপূর্ব সুন্দর ম্যুরাল চিত্র। রঙিন ঝাড়বাতির আলোয় চার্চের ভেতরটা ঝলমল করছে। চার্চ দেখে বেরিয়ে রাস্তা পেরিয়ে চলে এলাম নদীর ধারে। সাজানো গোছানো নদীতীর। কাছেই মস্কো গেট। আজকের মতো শহর দর্শনের সমাপ্তি এখানেই। উঠে পড়লাম বাসে। শহর ঘুরে বাস থামল সিটি সেন্টার লাগোয়া মার্কস হোটেলে। আকাশে এখনও দিনের আলো রয়েছে। সাইবেরিয়ায় অদ্য শেষ রজনী।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেখি নীল আকাশ ফুঁড়ে সোনালি রোদ ঠিকরে পড়ছে শহরের বুকে। বাতাসে হালকা শীতের আমেজ। মন বেশ ভারাক্রান্ত। আজ আমরা বিদায় নেব সাইবেরিয়া থেকে। ফিরে যাব নিজভূমে। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিলাম। হোটেল ছাড়তে এখনও কিছুটা দেরি আছে। সময় নষ্ট না করে হাঁটতে বেরলাম হোটেল লাগোয়া পাড়ায়। বড় রাস্তার দু'ধারে সার দিয়ে সোভিয়েত স্থাপত্যশৈলীর প্রাসাদোপম অট্টালিকা। পথের ধারে সাজানো ফুলবাগান। বাতিস্তম্ভ থেকে ঝুলছে মরশুমি ফুলে ভরা টব। পরিচ্ছন্ন পথঘাট। রাজপথের ওপর দিয়ে মাঝেমধ্যেই টুং টুং করে ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম ছুটছে। শহরে জনসংখ্যার চাপ বেশ কম। রাজপথ থেকে ঢুকে পড়লাম গলিপথে। নজরে পড়ল পুরনো দিনের কয়েকটা কাঠের বাড়ি। একঘণ্টা পরে ফিরে এলাম হোটেলে। বাস নিয়ে গাইড হাজির। মালপত্র নিয়ে উঠে পড়লাম বাসে। আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছলাম বিমানবন্দরে। ইরকুতস্ক থেকে চাপব এরোফ্লোটের বিমানে। গন্তব্য মস্কো। ৬ ঘণ্টার বিমান যাত্রা। গাইড নাতালিয়া হাসিমুখে আমাদের বিদায় জানাল। দুপুর ১টায় বিমান ডানা মেলল আকাশে। বিমানের জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। অনেক নীচে জলছবির মতো দেখা যাচ্ছে সাইবেরিয়ার প্রকৃতির মাঝে ইরকুতস্ক শহর। আরও দূরে অস্পষ্ট বৈকাল হ্রদ। বিদায় বৈকাল হ্রদ। বিদায় সাইবেরিয়া। ♦♦

ছবি: সুবীর কাঞ্জিলাল
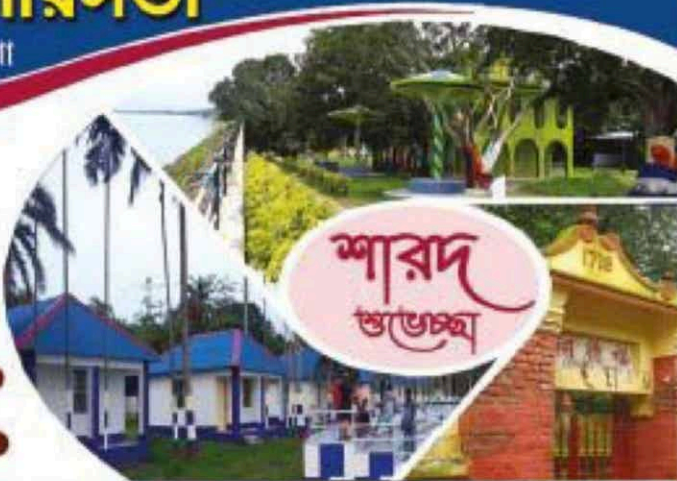
এক অনন্ত সফর

প্রফুল্ল রায়
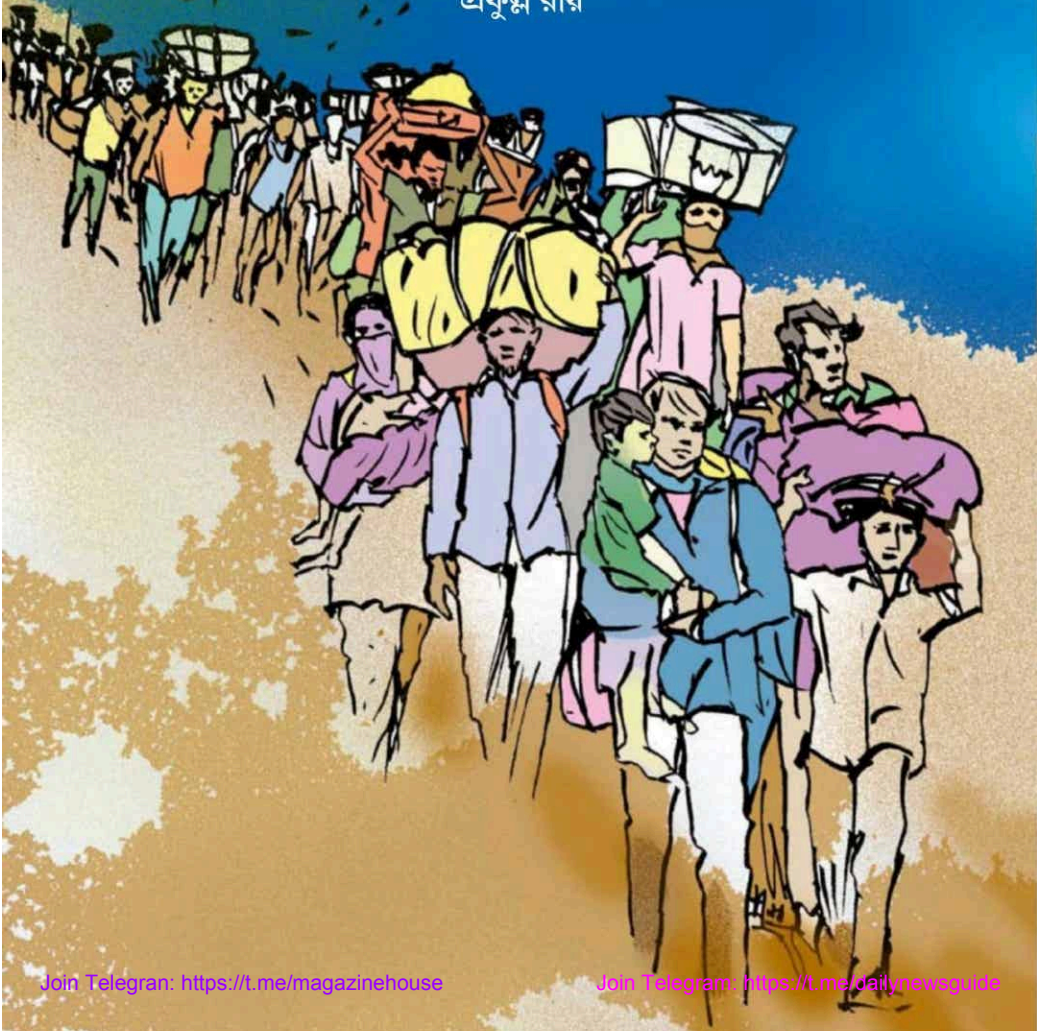
ঘন অন্ধকার আর কুয়াশার দেওয়াল ভেদ করে ট্রাকটা দুরন্ত গতিতে ছুটছিল। মাঝে মাঝে গাড়ির চালক হেডলাইট জ্বালছে। চকিতের তীব্র আলোয় চোখে পড়ে এলাকাটা পাথুরে। রুক্ষ এবং কর্কশ। কতকাল আগে এখানকার পাথর কেটে কারা সড়ক বানিয়েছিল কে জানে। তার ওপর দিয়েই গাড়িটা চলেছে।

দু'ধারে গভীর জঙ্গল। নিজস্ব এনার্জির জোরে শক্ত, নীরস পাথুরে মাটি ফুঁড়ে মাথা তুলেছে উদ্দাম বুনো ঘাসের ঝোপ, আগাছার ঝাড়, মহা মহা সব বৃক্ষ। মানুষজন, গাঁও-দেহাত কিছুই চোখে পড়ে না। রাস্তার দু'পাশে শুধুই নিঝুম, জনশূন্য, দুর্গম বনভূমি। হয়তো কয়েকশো বছরের প্রাচীন।

আচমকা এই মধ্যরাতে বিশাল আকারের যানটি এসে পড়ায় জঙ্গলের প্রাণীরা যে বেজায় বিরক্ত এবং সন্ত্রস্ত তা টের পাওয়া যাচ্ছে। ট্রাকের চাকার কর্কশ শব্দে পাখিদের ঘুম ভেঙে গেছে। উঁচু উঁচু গাছগুলোর মাথায় ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে তারা তুমুল চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে। অদৃশ্য অন্য প্রাণীরা, খুব সম্ভব হরিণ, বুনো শুয়োর, খরগোশ, শিয়াল, বনবিড়াল সবাই দুড়দাড় আওয়াজ করে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। সরীসৃপেরাও তাই। সর সর করে বুক টানতে টানতে পালাচ্ছে।

অনুপ্রবেশকারী যানটা যে খুবই অবাঞ্ছিত, বনভূমির স্থায়ী বাসিন্দারা তা বুঝিয়ে দিচ্ছে।

এই ট্রাকে দুশো পঁচিশ জন সওয়ারি। গাড়ির ভেতরে একশো পঁচিশ জন তাদের পোঁটলা পুঁটলি, ব্যাগ, বাক্স, জলের বোতল ইত্যাদি যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি কোলে চাপিয়ে দু'হাতে জাপটে ধরে ঠাসাঠাসি করে বসে আছে। বাকি একশো জনকে বসানো হয়েছে ছাদে, ঠিক একই কায়দায়। কোথাও একটা ছুঁচ গলানোর মতো ফাঁক নেই। ট্রাকের ঝাঁকানিতে যাতে যাত্রীরা ঠিকরে বাইরে পড়ে না যায়

তাই ছাদের চারপাশে কোমর-সমান হাইটের স্টিলের রেলিং বসানো।

জঙ্গলের ত্রস্ত শঙ্কিত প্রাণীরা যেমন পালিয়ে যাচ্ছে, অবিকল সেই রকমই প্রবল আতঙ্কে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাবার জন্য দু'শো পঁচিশ জন মানুষ এই যানটিতে উঠেছে। একান্ত নিরুপায় হয়েই। চোখ বুজে অথৈ সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার মতো।

সারা বিশ্ব জুড়ে করোনা সংক্রমণে মহামারী শুরু হয়েছে। পোকামাকড়ের মতো মারা যাচ্ছে হাজারে হাজারে মানুষ। চিন-আমেরিকা-ইউরোপ মধ্যপ্রাচ্য পার হয়ে মহামারণের হানাদারি চলছে এ দেশেও। এই বিভীষিকা ঠেকাতে গোটা ভারতভূমি জুড়ে শুরু হয়েছে লক-ডাউন। ট্রেন, প্লেন, বাস, ট্যাক্সি, অটো, টাঙা, মোটরবাইক, সাইকেল রিকশ, এমনকী নৌয়া গাড়ি, ভৈসা গাড়ির চলাচলও বন্ধ। বন্ধ স্কুল, কলেজ, হাটবাজার, মল, সিনেমা হল, সব সরকারি, বেসরকারি অফিস, রাস্তার দোকানপাট, কলকারখানা। যেদিকেই তাকানো যাক, তালার পর তালা ঝুলছে।

সমস্ত কিছুই যখন বন্ধ, দেশের হৃৎপিণ্ড প্রায় স্তব্ধ, এই ট্রাকটা তাহলে চলছে কী করে? যান চলাচলের নিষেধাজ্ঞা ছাড়াও কঠোর সরকারি ফতোয়া— রাস্তায় বেরলে সবাইকে মাস্ক পরে নাক-মুখ ঢেকে রাখতে হবে। শুধু তাই নয়, দু'জন মানুষের মধ্যে কম করে দু'মিটার দূরত্ব বজায় রাখা বাধ্যতামূলক। কোনওভাবে একজনের ছোঁয়া যেন আরেক জনের গায়ে না লাগে, সে ব্যাপারে সবাইকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

কিন্তু এই ট্রাকের সওয়ারিদের তো গাদিয়ে তোলা হয়েছে। এখানে দু'জন যাত্রীর মধ্যে কতটুকু ফাঁকা জায়গা? সিকি মিলিমিটারও নয়। সবাই তাদের সামনের, পেছনের এবং দু'পাশের যাত্রীদের গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে আছে। হাত-পা নাড়ার উপায় নেই। নেহাত ছাদটা খোলা, মাথার ওপর ছাউনি নেই, বাতাসের চলাচলে লকডাউন করা যায়নি, তাই সেখানে শ্বাস-প্রশ্বাসটা চালু আছে। অন্তত দমবন্ধ হয়ে মরতে হবে না। তবে ছাদের তলায় যাদের ঠেসে তোলা হয়েছে তাদের হাল যে কী, ছাদের ওপর থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

দু'দুটো কঠোর সরকারি নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ট্রাক চালানো এবং ঠেসে ঠেসে সওয়ারি তোলার মতো এত বড় বুকের পাটা কার? ট্রাকের আরোহীরাই শুধু নয়, যেখান থেকে এরা আসছে সেখানকার আম-আদমি থেকে সরগনা অর্থাৎ গণ্যমান্য সবাই জানে তাঁর নাম গিরিরাজজি। তিনি যাদব না শাস্ত্রী, বাজপেয়ি কিংবা শ্রীবাস্তব, কেউ জানে না। তবে এটা সবার জানা তাঁর হাতে একটা 'জাদু কা ছড়ি' আছে। যখন তখন তিনি ভেলকি দেখাতে পারেন। পারেন 'হাঁ' কে 'না' করাতে, 'না' কে 'হাঁ'। পারেন 'অসম্ভব'কে 'সম্ভব' বানাতে।

তাছাড়াও গিরিরাজজি জানেন, কোথায় কোথায় 'পূজা' চড়ালে অতিশয় কঠিন কাজও হাসিল হয়ে যায়। জনরব এবারও নাকি যথাস্থানে তিনি একটি খুব পুরু এবং ভারী খাম পাঠিয়েছেন, আর সেটা দু'হাজার টাকার গোছা গোছা কড়কড়ে নোটে বোঝাই। গিরিরাজজির 'জাদু কা ছড়ি' আর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ছাপ মারা কড়কড়ে নোটের ভেলকিতে 'না', 'হাঁ' হয়েছে। দু'শো পঁচিশ জন যাত্রী নিয়ে লকডাউনের সময় ট্রাকটা অবাধে দৌড়তে পারছে। এই একটাই নয়, এরকম দু'আড়াইশো প্যাসেঞ্জার নিয়ে গিরিরাজজির ডজনখানেক ট্রাক কাল থেকে দু'তিন দিন পর পর দেশের নানা রাজ্যের বর্ডারের দিকে দৌড়তে থাকবে। লকডাউনের অপার মহিমা।

গাড়ির চালকদের হুঁশিয়ারি দেওয়া আছে, হাট-বাজার, গাঁও-গঞ্জ, শহর বা লোকালয় রয়েছে এমন কোনও এলাকার ধার-কাছ দিয়ে যাওয়া চলবে না। জনমনুষ্যহীন ধু ধু ফাঁকা মাঠ, জঙ্গল, এমন সব অঞ্চল দিয়ে যেতে হবে।

ট্রাকটা আসছে উত্তরপ্রদেশের সীমানার বাইরে কয়েক কিলোমিটার দূরের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। যাত্রা শুরু হয়েছিল একটা মাঝারি মাপের টউন বা টাউনের শেষ মাথায় এক পরিত্যক্ত, নির্জন, নিস্তব্ধ এলাকা থেকে।

তখন সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। হালকা অন্ধকার, সেই সঙ্গে মিহি কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। চারিদিক ঝাপসা ঝাপসা।

মাথা পিছু আট হাজার টাকা ভাড়ায় যাত্রীদের পৌঁছে দেওয়া হবে বিহার বা বাংলার সীমানার কাছাকাছি গাঁও বা শহর নেই, মানুষজন নেই, এমন কোনও জায়গায়। ট্রাকে ওঠার আগেই সবাইকে ভাড়ার টাকা মিটিয়ে দিতে হয়েছে। গিরিরাজজির বিলকুল নগদে কারবার। ওই যে চালু একটা কথা আছে 'পাইসা ফেকো, তেল উঠাকে শরপে (মাথায়) লাগাও'— সেইরকম আর কী।

সওয়ারিদের সবার পরনে খেলো ছিটের ময়লা জামা-প্যান্ট বা দলা পাকানো নোংরা পায়জামা আর হাফ-হাতা শার্ট, কারও বা খাটো ধুতির ওপর বোতামহীন জামা। বেশিরভাগেরই চার-পাঁচ দিনের না-কামানো দাড়িগোঁফ। চোখ গর্তে ঢোকানো। ভাঙাচোরা মুখগুলোতে ভয় এবং অনন্ত উৎকণ্ঠার ছাপ। সবারই নাকের তলা থেকে মুখের নীচের দিকটা ময়লা রুমাল, ছেঁড়া গামছা বা পুরনো ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে আটকানো। করোনার হানাদারি রুখতে এই সব বর্ম লাগাতে হয়েছে। কঠোর সরকারি ফতোয়া। এই ঠুলি ছাড়া তাদের একজনকেও গাড়িতে উঠতে দেওয়া হয়নি।

মানুষগুলোর চোখ, কপাল বা মুখের না-ঢাকা খোলা অংশগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছিল তারা লেশমাত্র স্বস্তিতে নেই। ট্রাক যতই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে সবাইকে ভীষণ অস্থির অস্থির আর উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। হয়তো তারা ভাবছিল গিরিরাজজির এই ট্রাকটায় চড়ে আদৌ কি নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে? নাকি এই দানব আকারের যানটা তাদের অনিশ্চিত, বিপন্ন কোনও ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে চলেছে? কেন দুর্ভাবনাটা ক্রমশ পাহাড়-প্রমাণ হতে হতে তাদের মাথায় চেপে বসছে?

গিরিরাজজি অবশ্য দুই হাতের দশটা আঙুলে অভয়মুদ্রা ফুটিয়ে বেশ কয়েকবার ভরসা দিয়েছেন, 'ডরো মাত। চিন্তা নায় করনা।' কিন্তু চিন্তাটা তাদের পিছু ছাড়ছে না। না ছাড়ারই কথা। ট্রাকটা তাদের পৌঁছে দেবে বাংলা বা বিহারের সীমান্তে কোনও নির্জন, নিঝুম জায়গায়। সেখান থেকে তারা আপনা আপনা গাঁও বা টাউনে ফিরবে কীভাবে?

গিরিরাজজির হুকুমনামা মেনে উত্তরপ্রদেশের সীমানার বাইরের সেই টাউনটা থেকে বেরিয়ে নানা জনশূন্য অঞ্চল দিয়ে পাক খেতে খেতে ট্রাকটা প্রথমে একটা মজে-যাওয়া নদীর পাশে চলে এসেছিল। নদীটা দীর্ঘ এবং শীর্ণ, শুকিয়ে যাবার পর যে জলটুকু পড়ে আছে তাতে হাঁটুও ডোবে না। সেটার ধার দিয়ে নুড়ি আর বেলেমাটির একটা রাস্তা নদীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনেক দূরে অস্পষ্ট দিগন্তের দিকে চলে

গেছে। সেই রাস্তাটা পেরিয়ে ট্রাক যেখানে এসেছিল সেখানে আদিগন্ত, অজস্র ধানের খেত। প্রতিটি খেতেই ফসল কেটে নেবার পর নাড়া পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

তখন অন্ধকার আর কুয়াশা গাঢ় হতে শুরু করেছে। চারপাশের কোনও কিছুই স্পষ্ট চোখে পড়ার কথা নয়। যদিও শুক্লপক্ষের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, আকাশের কোণ থেকে এক ফালি চাঁদ উঠে এসেছিল। তার মরা মরা নিস্তেজ আলোয় মনে হচ্ছিল মাঠগুলো যেন মহাশ্মশান। নাড়া পুড়িয়ে দেবার পর দিকে দিকে শুধুই কালো কালো ছাইয়ের স্তূপ। ফসলের খেতগুলো পেছনে ফেলে ট্রাকটা একসময় গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। তারপর পাথর কেটে বানানো ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া বহুকালের পুরনো সড়কটা ধরে দু'ধারের দুর্ভেদ্য অরণ্যকে সচকিত করতে করতে ছুটেই চলেছে। এই নিবিড় বনভূমি পার হতে কতটা সময় লাগবে, কে জানে। হয়তো রাত কাবার হয়ে যাবে।

সেই মাঝারি মাপের টাউনটা থেকে বাংলা বা বিহারের সীমান্ত কতদূরে? হাজার, দু'হাজার কিংবা পাঁচ হাজার কিলোমিটার— সওয়ারিদের কারও কোনও ধারণাই নেই।

॥ দুই ॥

ট্রাকের ছাদের মাঝামাঝি জায়গায় দুই হাঁটু ভাঁজ করে যে দু'জন পাশাপাশি বসে আছে তাদের বয়স খুব বেশি নয়, চৌত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ। দু'জনেরই রোগা রোগা, ক্ষয়াটে চেহারা। বছরের পর বছর একটানা ভারী মেহনতের কাজ করলে যেমনটা হয়। একজনের গায়ের রং কালো, আরেকজনের তামাটে। তাদের যুবকই বলা যায়। তাদের কোলে পুরনো রংচটা শতরঞ্চিতে মোড়া বিছানা, পুরু কাপড়ের ব্যাগ, পোঁটলা-পুঁটলি, ঝুলিতে জলের বোতল ইত্যাদি ছাড়াও ছুটকো ছাটকা আরও কিছু জিনিস।

ট্রাকে ওঠার পর থেকে তারা ঠায় এভাবেই বসে আছে। নড়াচড়ার উপায় নেই, হাত-পা যে নাড়বে তেমন একটু ফাঁকও চোখে পড়ে না। সামনের দিকটা জুড়ে কারও পিঠ, পেছনে কারও হাঁটু, ডাইনে-বাঁয়ে কাঁধ, ঊরু, কোমর বা কনুই। চারপাশে মনুষ্য শরীরের নিশ্ছিদ্র, নিরেট দেওয়াল। প্রায় দুর্ভেদ্য। এই দু'জনেরই নয়, বাকি সব সওয়ারিরই এক হাল।

সূর্যাস্তের পর সেই যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তারপর ট্রাকটা এক লহমার জন্যও কোথাও থামেনি। চলেছে তো চলেছেই।

বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে। এরমধ্যে ওই দুই যুবক খুব কমই কথা বলেছে। দু'চারটের বেশি নয়। বাকি সময়টা চুপচাপ। কিন্তু অন্য যাত্রীরা এক মুহূর্তের জন্যও থেমে নেই। অনর্গল বলেই চলেছে। এই ট্রাকটার বাংলা কি বিহারের সীমান্তে সবাইকে পৌঁছে দেবার কথা। কখন পৌঁছবে? আজ শেষ রাত্তিরে, নাকি কাল সুবে সুবে, বা দুপুরে সূরয মাথার ওপর উঠে এলে কিংবা আন্ধেরা নামার পর সামকো? পৌঁছনো না হয় গেল, সেখান থেকে আপনা আপনা শহর বা গাঁওয়ে যাবে কীভাবে? এই নিয়ে ট্রাকের ছাদটা সরগরম। সারাক্ষণ অজস্র মাছির ভনভনানির মতো আওয়াজ। প্রতিটি সওয়ারির কণ্ঠস্বরে প্রবল উদ্বেগ।

তামাটে রঙের যুবকটি হঠাৎ কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। একবার জানুর ওপর মাথা রাখছে, দু'এক লহমা পর পর মাথা তুলে দু'হাতে মুখ ঢাকছে, পরক্ষণে গলা থেকে বুক অবধি জোরে জোরে ডলছে আর অনবরত ঢোক গিলছে। চোখ লাল হয়ে উঠেছে, মনে হয় তীব্র কষ্টে ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। সারা শরীর জুড়ে তার প্রবল অস্থিরতা।

পাশের কালো যুবকটি তাকে লক্ষ করছিল। জিজ্ঞেস করল, 'ক্যা হুয়া তুমহারা? তবিয়ত আচ্ছা নেহি?' তাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে।

জবাব মিলল না। তামাটে যুবকটি ঢোক গিলেই চলেছে আর বুক গলা চেপে চেপে ধরছে। শ্বাস টানতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার।

কালো যুবকটির দৃষ্টি স্থির হয়ে গেছে। কিছু একটা আন্দাজ করে অনেকটা ঝুঁকে বলল, 'তুমহারে তিয়াস লাগা, ক্যায়া?'

কোনওরকমে গলার ভেতর থেকে ফ্যাসফেসে স্বর বের করে আনল তামাটে যুবকটি, 'হাঁ—'

'পানিকা বটলি (বোতল) কাঁহা?'

একটা ছোট ঝুলিতে তামাটে যুবকটির জলের বোতল ঢোকানো রয়েছে। ট্রাকে ওঠার পর সে সেটা পায়ের কাছে নামিয়ে রেখেছিল। আস্তে আস্তে বোতলটা তুলে সঙ্গীর হাতে দিল।

কালো যুবকটি হতভম্ব। বলল, 'ইসমে তো এক বুঁদ ভি পানি নেহি। আউর কোই বটলি হ্যায়?'

'নেহি—' ক্ষীণ গলায় জানাল তামাটে যুবকটি।

'তুম ক্যায়া বুদ্ধু হ্যায়! ইতনে লম্বে সফর। স্রিফ এক বটলি পানি! কমসে কম পাঁচ ছে' বটলিকা জরুরত—' বলতে বলতে নিজের থলি থেকে একটা জল-ভরা বোতল বের করে পাশের সঙ্গীর দিকে বাড়িয়ে দিল কালো যুবকটি, 'পি লো, আল্লাকা মেহেরবানিসে সব ঠিক হো যায়েগা।'

তামাটে যুবকটি হাত বাড়াতে গিয়ে কী ভেবে টেনে নিল।

কালো যুবকটির মুখ কেমন যেন শুকিয়ে গেল। তার

পাশের সঙ্গী হাত বাড়িয়েও যেভাবে সরিয়ে নিয়েছে, মনে হয় তাতে সে খুব আঘাত পেয়েছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'মেরা নাম আসলাম, মুসলমান, ইসি লিয়ে মেরা ছুঁয়া পানি নেহি পিওগে?' তার গলার স্বর করুণ, ব্যথাতুর হয়ে উঠল। তার সঙ্গে মিশে আছে চাপা ক্ষোভ।

'নেহি, নেহি—' চমকে ওঠে তামাটে যুবকটি, 'অ্যায়সা কুচ নেহি—'

'তব?' আসলাম এমনভাবে তাকিয়ে আছে, তাতে স্পষ্ট, ধাক্কাটা সে সামলে নিতে পারেনি।

'বহুত দূর যানা পড়েগা। তুমহারে পানিকা জরুরত। ইসি লিয়ে নেহি লিয়া—'

মুহূর্তে মুখের চেহারাটা পুরোপুরি বদলে গেল আসলামের। সঙ্গীকে থামিয়ে দিয়ে খুব আন্তরিক গলায় বলল, 'ফিকর মাত করনা। আউর তিন বটলি পানি হ্যায় মেরা পাস। পি লো ভাইয়া—'

তামাটে যুবকটি হাত বাড়িয়ে বোতলটা নিয়ে ছিপি খুলে ঢক ঢক করে অনেকটা জল খেয়ে ফুসফুস ভরে বার কয়েক বাতাস টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে বের করে দিল। একটু আগের সেই প্রচণ্ড কষ্টটা আর নেই। তার শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ, স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। বেশ আরামই লাগছে। বোতলের মুখটা ছিপি দিয়ে বন্ধ করে আসলামের দিকে বাড়িয়ে দিল, 'এ লো ভাইয়া তুমহারে বটলি। ঝুটা নেই কিয়া (এঁটো করিনি)। লো ভাইয়া, লো। জরুরত হোনেসে ফির লেঙ্গে। তুম মেরা জান বঁচায়া। যব তক ইস দুনিয়ামে হায়, তুমহারে মেহেরবানি কভি নেহি ভুল যায়েঙ্গে—'

'ছোড় দো, ছোড় দো। অ্যায়সা কুছ নেহি কিয়া—' বোতলটা নিয়ে একটা ঝুলির ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে আসলাম জিজ্ঞেস করল, 'ভাইয়া তুমহারে নাম?'

'বিনোদ। বিনোদ দাস—।'

বিনোদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কী যেন ভাবল আসলাম। তারপর ধীরে ধীরে বার কয়েক বিড় বিড় করল, 'বিনোদ দাস, বিনোদ দাস, বিনোদ দাস'— পরক্ষণে গলার স্বরটা উঁচুতে তুলে জানতে চাইল, 'তুমি কি বাঙালি?' হঠাৎ যেন মধ্যরাতে, অচেনা অফুরন্ত অরণ্যের ভেতর দিয়ে অদ্ভুত এক যানে ঠাসাঠাসি ভিড়ের ভেতর বসে অনিশ্চিত কোনও ভবিষ্যতের দিকে যেতে যেতে বিস্ময়কর কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছে, তার মুখ-চোখ দেখলে এখন তেমনটাই মনে হয়।

'হ্যাঁ, বাঙালিই তো। পা থেকে মাথা অবধি পুরোটাই বাঙালি—' বলেই বিনোদ খুব অবাক, 'বাংলায় কথা বললে। তুমিও কি—'

তাকে শেষ করতে দিল না আসলাম, 'কী ভেবেছ, মুসলমান হলে কি বাঙালি হওয়া যায় না?' প্রশ্নটা করেই দু'চোখে মিটি মিটি মজাদার হাসি ফুটিয়ে তুলল, 'আমরা কত পুরুষ ধরে বাঙালি, বলতে পারব না।'

বিনোদ লজ্জা পেয়ে গেল, 'ভুল হয়ে গেছে। বুঝতে পারিনি তুমিও বাঙালি।'

চোখের সেই হাসিটা ধরে রেখেই বিনোদের কাঁধে একটা হাত রাখল আসলাম, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন তো বুঝতে পেরেছ।'

'বাঙালি যখন, হিন্দিতে কথা বলছিলে কেন?'

'আরে ভাই, ছ'সাত বছর হল সাহানপুরে কাজ নিয়ে এসেছি। সবাই সেখানে হিন্দি বলে। হিন্দি বুলির মুল্লুকে এলে ওটা বলতেই হয়। বলতে বলতে আদত হয়ে গেছে। তুমিও তো বলছিলে—'

'হ্যাঁ, পুরো ছ'সাল সাহানপুরে আমার নৌকরি হয়ে গেল। হিন্দি ছাড়া কী আর বলব।'

সামনের দিক থেকে একজন ঘাড় ফিরিয়ে হাত তুলে বিনোদদের বলল, 'তোমরা দুই বাঙালি জব্বর আড্ডা জমিয়ে দিয়েছ। আরে ভাই, আমিও বাঙালি। আমার নাম রফিক। বাড়ি মালদায়। আট বছর আমিও সাহানপুরে কাজ করছি।'

রফিকের পর একে একে আরও অনেকে পেছন এবং সামনে থেকে ঘাড় ফিরিয়ে হাত তুলে জানিয়ে দিল তারাও বঙ্গসন্তান। কারও নাম ফটিক, কারও নাম গৌরাঙ্গ, কেউ সিরাজ, কেউ খলিল, কেউ হরিপদ, কেউ নিমাই। এদের কারও বাড়ি মুর্শিদাবাদ, কারও নদীয়া, কারও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বা পূর্ব মেদিনীপুর।

শুধু রফিক, ফটিক, গৌরাঙ্গরাই নয়, ট্রাকের ছাদের এধার ওধার থেকে একই কায়দায় হাত তুলে ঘাড় ফিরিয়ে গলা মিলিয়ে কয়েকজন জানিয়ে দিল, 'আমে ওড়িশাবাসী, আমে ভি অছি, আমে ভি অছি (আমরাও আছি, আমরাও আছি)।'

আরও কয়েকজন জানাল, 'হামলোগনকা মুলুক বিহার। হামলোগন বিহারি। পাঁচ-সাত সাল সাহানপুরমে নৌকরি করতে হেঁ—'

বাংলা, বিহার, ওড়িশা— পূর্ব ভারতের তিন রাজ্যের শ্রমিক নিয়ে ট্রাকটা ছুটেই চলেছে, ছুটেই চলেছে।

দুরন্ত গতির যানটিতে হঠাৎ একজন উঠে রেলিং ধরে দাঁড়াল। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, হট্টাকাট্টা, মজবুত চেহারা চুলে হালকা সাদা ছোপ। গম্ভীর গলায় সে বলল, 'বিহারি, ওড়িয়া, বাঙালি— সব ছোড়ো। মেরা নাম রামবনবাস দুবে। তেরা সাল সাহানপুরমে নৌকরি কিয়া। লেকিন করোনা হামলোগকো ভবিষ্য বিলকুল আন্ধেরামে ডাল দিয়া। সাহানপুরকা সবহি কারখান্না, অফিস বন্‌ধ। হামলোগনকা নৌকরি বরবাদ হো গিয়া। পাইসা কামাইকে লিয়ে ইতনে ইতনে দূর সাহানপুর চালা আয়া থা। মুল্লুক ওয়াপস যানেকা বাদ কাম-কাজ কুছ মিলেগা? ঘরকা খরচ সামহালেগা ক্যায়সে? বহুত বুরা দিন আ গিয়া। সোচো, সোচো, সোচো—'

মোক্ষম একখানা চেতাবনি দিয়ে বসে পড়ল রামবনবাস দুবে।

ট্রাকে ওঠার পর থেকেই পরিবেশটা ছিল ভীষণ থমথমে। সওয়ারিদের তখন একটাই চিন্তা, বাংলা বা বিহারের বর্ডারে গাড়িটা পৌঁছলে কীভাবে তারা নিজেদের গন্তব্যে যেতে পারবে। রামবনবাস দুবের চেতাবনি শোনার পর মানসিক চাপটা হাজার গুণ বেড়ে গেল। চাঁই চাঁই পাথর যেন মাথার ওপরেও ঠেসে বসছে।

যে কোনও উপায়েই হোক, বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে না হয় পৌঁছনো গেল কিন্তু রামবনবাস দুবে শুধু চেতাবনিই দেয়নি মনে করিয়ে দিয়েছে সাহানপুরার কারখানাগুলোর আর কোনও দিনই খোলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তাছাড়া বড় বড় ঠিকাদারদের কাছে যারা বিল্ডিং, নদী, বাঁধ বা নয়া নয়া সড়ক তৈরিতে দিনমজুর হিসেবে কাজ করতে এসেছিল তাদেরও কোনও আশা নেই। লকডাউন সবার রোজগারের পথগুলোই হয়তো চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে।

নিজেদের মুলুকে কাজকর্ম জোটাতে না পেরে ট্রাকের সওয়ারিদের কেউ কেউ তিন-চার বছর, কেউ কেউ দশ-বারো বছর আগে দু'তিন হাজার কিলোমিটার দূরের

সাহানপুরে নৌকরি বা দিনমজুরির কাজ নিয়ে চলে এসেছিল। মাসের শেষে মাইনে বা তলব, কিংবা দিনমজুরির টাকা হাতে এলে বেশিরভাগটাই তারা বাড়িতে পাঠিয়ে দিত। বাকিটা দিয়ে সাহানপুরে নিজের খরচ চালাত। দুর্গাপুজো, ঈদ, ছট এমন সব উৎসব বা পরবের ছুটিতে কয়েকটা দিন বাড়িতে এসে পরিবারের সকলের সঙ্গে কাটিয়ে যেত। উদ্বেগশূন্য, শান্ত, মসৃণ জীবন। কিন্তু করোনা ভাইরাসের একটি ধাক্কায় সমস্ত কিছু তছনছ হয়ে গেল।

ছাদের ওপর কিছুক্ষণ আগেও যে ভনভনানি চলছিল তা থেমে গেছে। ট্রাকের চাকার তীব্র, কর্কশ শব্দ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই।

ছাদের সওয়ারিরা জানুর ওপর থুতনি রেখে নিঝুম বসে আছে। অদূর ভবিষ্যতে কী ঘটতে চলেছে সেই চিন্তায় সবাই যেন নুয়ে পড়েছে।

অনেকটা সময় কেটে যায়। ট্রাক এখন যেখান দিয়ে চলেছে সেখানে জঙ্গল আগের মতো তত ঘন নয়। ঝোপঝাড় কমই চোখে পড়ছে। উঁচু উঁচু গাছগুলো গা ঘেঁষাঘেষি করে নেই, লকডাউনের শর্ত মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই যেন দাঁড়িয়ে আছে।

সন্ধেবেলায় আদিগন্ত ফসলের খেতগুলো পেরিয়ে আসতে আসতে আকাশের কোণে ক্ষীণ চাঁদ চোখে পড়েছিল। তারপর নিবিড় জঙ্গলে মাথার ওপর উঁচু উঁচু গাছের ডালপালার আচ্ছাদন থাকায় চাঁদটা দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছিল। ফের সেটা দেখা দিয়েছে। একফালি চাঁদই শুধু নয়, আদিঅন্তহীন আকাশের অনেকটা অংশ আর লক্ষকোটি নক্ষত্র দেখা দিয়েছে। ট্রাকের আরোহীদের সেদিকে নজর নেই। চাঁদ-তারা সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহও না।

অন্য আরোহীদের মতো আসলাম আর বিনোদ এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। এবার বিনোদ তার পাশের সঙ্গীটির দিকে তাকাল। খুব আস্তে ডাকল, 'আসলাম—'

আসলাম তার দুই জানুর ওপর থেকে মুখ তুলে বিনোদকে দেখতে দেখতে একটু হাসল— 'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কতক্ষণ আর ঠোঁটে ঠোঁট টিপে বোবা হয়ে বসে থাকা যায়—'

'ঠিক। প্রাণ খুলে যা বলার বল—'

বিনোদ সামান্য কাত হয়ে শুরু করল, 'দেখ ভাই, তুমি পশ্চিমবাংলা থেকে সাহানপুরে নৌকরি নিয়ে এসেছিলে, আমিও তাই। কয়েক বছর আমরা সেখানে কাজ করেছি। কিন্তু না সাহানপুর, না নিজেদের রাজ্য, কোথাও আমাদের দেখা হয়নি। লকডাউনে কলকারখানা, অফিসটফিস বন্ধ না হলে আর গিরিরাজজির এই ট্রাকটায় না উঠলে কোনওদিন হয়তো দেখাই হতো না। নিজেদের মুল্লুকে ফিরতে ফিরতে তোমার মতো একজন ভালো বন্ধু পেয়ে গেলাম যে কিনা জল দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, অথচ নামটা ছাড়া তার সম্বন্ধে কিছুই জানি না।'

'কী জানতে চাও বল—'

'পশ্চিমবাংলায় কোথায় তোমাদের বাড়ি, সেখানে কারা আছে, এইসব আর কী—'

আসলাম বলল, 'আমরা কিন্তু খুব গরিব—'

'আমাকে দেখে কি মনে হয় রাজা মহারাজার বাড়ির ছেলে? তাই যদি হতাম সাহানপুরের ছোটখাট একটা কারখানায় ওয়েল্ডারের চাকরি নিয়ে কি যেতাম?' বিনোদ হাসল।

'ঠিক আছে। আগে আমার কথা শোন। তারপর তোমার সম্বন্ধে কিন্তু বলতে হবে।'

'নিশ্চয়ই। নাও, শুরু কর—'

আসলাম নিচু গলায় এক নিঃশ্বাসে সমস্ত জানিয়ে দিল। তাদের বাড়ি রসুলপুরে। বেহালা ঠাকুরপুকুরের দিক থেকে বাসে ডায়মন্ডহারবারের দিকে যেতে আমতলা পেরিয়ে খানিকটা গেলেই রসুলপুর। তাদের বাড়িটা ছোট, মোটে তিনখানা ঘর। পাকা মেঝে, ইটের দেওয়াল, মাথায় খড়ের চাল।

আসলামের আম্মু অনেকদিন আগেই মারা গেছে। আব্বু খুবই অসুস্থ। বাত, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, এমন নানা রোগে সারা বছর প্রায় শয্যাশায়ী। আব্বু ছাড়া আছে বড় ভাই, ভাবী এবং তাদের তিন ছেলেমেয়ে। মাত্র আড়াই বিঘে চাষের জমি আসলামদের। বড় ভাই চাষবাস করে কিন্তু ক'কিলো আর ধান হয়! তাই চাষের মরশুম বাদ দিয়ে বছরের বাকি কয়েক মাস সে বাজারে আনাজ বেচে।

পড়াশোনায় খারাপ ছিল না আসলাম। কিন্তু বাড়ির আর্থিক যা হাল তাতে বছর পাঁচেক স্কুলে যাতায়াত করেই থেমে যেতে হয়েছে। এই বিদ্যের জোরে কোথায় চাকরিবাকরি জুটবে? তাই রাজমিস্ত্রিদের জোগাড়ে হয়ে সে কাজে লাগে। কিন্তু ক'টা পয়সা আর মেলে। জোগাড়েগিরি করতে করতে আসলাম রাজমিস্ত্রির কাজটা শিখে নেয়। নসিবটা ভালো। এই সময় সাহানপুরে একটা বড় কোম্পানিতে কাজ জুটে যায়। এই কোম্পানি সাহানপুর ছাড়াও আশপাশের শহরে জমিজমা কিনে বা নানা কৌশলে জোগাড় করে বড় বড় আবাসনও বানায়।

দৈনিক ছ'শো টাকা মজুরিতে বিল্ডিং বানানোর কাজ করত আসলাম। সকাল আটটা থেকে সন্ধে পাঁচটা অবধি ডিউটি। সপ্তাহে তিনদিন ওভারটাইম। সন্ধে পাঁচটা থেকে রাত ন'টা। বাড়তি খাটুনির জন্য এক্সট্রা চারশো টাকা। রোজকার মজুরি বা ওভারটাইমের টাকা রোজ পুরোটা দেওয়া হতো না। সিকিভাগ দিয়ে বাকিটা কোম্পানি নিজের কাছে রেখে দিত। মাসের শেষে হিসেব করে সেই টাকা মিটিয়ে দেওয়া হতো। তার সবটাই বাড়িতে পাঠিয়ে দিত আসলাম।

তাদের কোম্পানির নাম 'জৈন প্রোমোটার্স অ্যান্ড বিল্ডার্স'। মজুরি আর ওভারটাইমের বাড়তি টাকা ভালোই পাওয়া যেত। উৎসবে পরবে বোনাস। এরমধ্যে রসুলপুরে গিয়ে বিয়েটাও করে ফেলে আসলাম। বউ ছাড়া তার দুই ছেলে। তারা রসুলপুরের বাড়িতেই থাকে।

দিনগুলো স্বপ্নের মতোই কেটে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বাকি জীবনটাও এইভাবেই কাটবে। কিন্তু আচমকা করোনা ভাইরাসের হানা, তার সঙ্গে লকডাউন। একটা বড় আবাসন বানিয়ে দেবার পর কোনও কারণে কোম্পানি ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে ঠিক সময়ে প্রাপ্য টাকা পায়নি। পেতে নাকি দেরি হবে। তাই আসলামদের দৈনিক আর ওভারটাইমের মজুরি থেকে রোজ কোম্পানি যা কেটে রাখে দু'মাস তা দিতে পারেনি।

দু'মাসে আসলামের বকেয়া পড়ে আছে পঁচাশি হাজার টাকা। তাকে মাত্র আঠারো হাজার ধরিয়ে দিয়ে 'জৈন প্রমোটার্স অ্যান্ড বিল্ডার্স' অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। সাহানপুরে আসলামের আর বোধহয় ফেরা হবে না। বাকি টাকাটাও পাওয়া যাবে না।

দুনিয়াজোড়া করোনার মহামারীতে হাজার হাজার মানুষই শুধু মরছে না, যারা বেঁচে আছে তাদের রোজগারের জায়গা, সুখ, স্বপ্ন, আনন্দ, ভবিষ্যৎ— করোনা ভাইরাস সমস্ত কিছুই ধ্বংস করে দিচ্ছে। যারা মরে যাচ্ছে তারা তো চিরকালের মতোই চলে যাচ্ছে। মৃত্যুর মহামিছিলের পরও যারা টিকে থাকবে তাদের অনেকেই সত্যি সত্যি কি বাঁচার মতো বেঁচে থাকবে? রোজগারের নতুন কোনও রাস্তার যদি সন্ধান না পাওয়া যায়, এই সব মানুষের সামনে শুধুই অনন্ত বুভুক্ষা। অনাহারে ক্ষুধায় বউ-ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তারাও শীর্ণ হতে হতে কঙ্কালসার হয়ে যাবে। শরীরে নেমে আসবে অকাল-জরা। প্রকৃতির দেওয়া অফুরান বাতাস ফুসফুসে টেনে নেবে ঠিকই, হয়তো পথে নেমে টলমল করতে করতে দু'চার পা ফেলবেও কিন্তু কতদিন? যতকাল তারা বেঁচে থাকতে পারত তার অনেক আগেই আয়ু ফুরিয়ে যাবে।

আসলামের কথাগুলো শুনতে শুনতে এমন সব ছবি বিনোদের চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ আগে দূরদর্শী রামবনবাস দুবেও এসবের ইঙ্গিত দিয়েছিল।

নিজের এবং তাদের পরিবারের সবার সম্বন্ধে অকপটে সমস্ত কিছু জানিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল আসলাম। তারপর বিনোদের দিকে তাকিয়ে ম্লান একটু হাসল! 'আমাদের কথা তো শুনলে। আরেকটু বাকি আছে। আমাদের কোম্পানির মালিক পরমেশ্বর জৈনজির হাতে পায়ে ধরেছিলাম, পাওনা টাকার অর্ধেকটা অন্তত দিন। বাড়ির সবাই আমি কবে ফিরব সেদিকে তাকিয়ে আছে। দয়া করুন স্যার। পরমেশ্বরজি কোনও কথাই শুনলেন না। মাছি তাড়ানোর মতো হাত নাড়তে নাড়তে শুধু বললেন, 'যাও-যাও—'। বিনোদ, মাত্র আঠারো হাজার নিয়েই আমাকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে। তার মধ্যে গাড়ি ভাড়ার জন্যে গুনে গুনে আট হাজার দিতে হয়েছে। বাংলা কি বিহারের সীমানার কাছে এই গাড়িটা আমাদের পৌঁছে দেবে। সেখান থেকে কী পাব, বাস না টেরেন নাকি গোরুর গাড়ি, কিছুই জানি না। যা-ই পাওয়া যাক আরও কত ভাড়া দিতে দিতে কটা পয়সা নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারব, একমাত্তর ওপরওলাই জানে।' একটা হাত উঁচুতে তুলে আকাশ দেখিয়ে দিল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর করুণ একটু হেসে বিনোদ শুরু করল, 'আমাদের হাল কি তোমাদের চেয়ে খুব একটা ভালো মনে হয়?'

জবাব না দিয়ে আসলাম তাকিয়ে থাকে।

বিনোদ বলতে লাগল। তাদের বাড়ি গড়িয়া রেল স্টেশন থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে যে গ্রামটায় তার নাম কালিকাগঞ্জ। তাদের দেড়তলা বাড়িটা ঠাকুরদার আমলের, পলেস্তারা খসে নোনা-ধরা ইট বেরিয়ে পড়েছে। তাদের ফ্যামিলিটা জনবহুল। সব মিলিয়ে পনেরোজন। মা, এক বিধবা পাগল পিসি, ডিভোর্স হওয়া এক দিদি এক অবিবাহিত ছোট বোন ছাড়া বিনোদরা চার ভাই। বিনোদের বড়দা এবং মেজদা বিবাহিত বড়দা, বড় বউদি, তাদের তিন ছেলেমেয়ে, মেজদা, মেজো বউদি এবং তাদের দুই ছেলে। বিনোদ এবং তার ছোটদার এখনও বিয়ে হয়নি।

বিনোদের সঙ্গে গোপার ছ'সাত বছরের একটা সম্পর্ক। সে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। গোপার কথা অবশ্য আসলামকে বলল না।

বিনোদদের বাড়িতে রোজগেরে বলতে তিনজন। বড়দা

হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করার পর রাজ্য সরকারের পরিবহণ দপ্তরে ছোটখাট একটা চাকরি পেয়েছে। কতই বা মাইনে। পৈতৃক সম্পত্তি বলতে সওয়া আট বিঘে চাষের জমি। মেজদা তার দেখাশোনা করে। বছরে যা ধান হয় তাতে সারা বছর চলে যায়। বাজার থেকে দশ গ্রাম চালও কিনতে হয় না। ছোটদা ক্লাস সেভেনে ওঠার পর মা সরস্বতীর সঙ্গে তার সম্পর্কটা চুকেবুকে গেছে। এখন সে এক পলিটিকাল পার্টির জবরদস্ত নেতার এক নম্বর চামচে। চামচাগিরি, নানারকম ফরমাশ খাটা, ইলেকশানের সময় নেতার নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে মিছিলে হাঁটা, দেওয়াল লিখন, ফাঁকা জায়গা পেলে পোস্টার সাঁটা, ভোটের দিন বুথ সামলানো ইত্যাদি প্রচণ্ড মেহনতের দাম মোটামুটি ভালোই জোটে। কালীমার্কা বোতলে যে তরল বস্তুটি থাকে তার স্রোতে ছোটদা যা পায় তার অনেকটাই ভেসে যায়। তারপরও যা বেঁচে থাকে তার কিছুটা নিজের জন্য রেখে বাদবাকি সংসার খরচের জন্য দিয়ে দেয়।

পরিবারে ছোট বড় মিলিয়ে পনেরো জন। বছরের চালটা কিনতে হয় না ঠিকই, কিন্তু তেল, ডাল, নুন, চিনি, মশলা, সুজি, আটা, ময়দা, দুধ, ডিম, মাছটাছও তো প্রয়োজন। এসব তো মাগনা পাওয়া যায় না। নগদ পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। তাছাড়া বড়দা মেজদার ছেলেমেয়েদের স্কুলের মাইনে, পাগল বিধবা পিসির চিকিৎসা, ইত্যাদি খরচের অনেকটাই দিতে হয় বিনোদকে। তার ওপর এক অবিবাহিত বোন রয়েছে। তার বিয়ের দায়টা তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে বাড়ির সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। অবশ্য মায়ের কিছু গয়নাগাটি এখনও টিকে আছে। অনেকটাই বাঁচোয়া। গয়না বাদ দিলেও বিয়ের অন্য খরচও তো কম নয়। তা সামলাতে হবে বিনোদকেই। তার মাথায় কেন এত খরচের বোঝা? কারণ একটাই। তা হল বাড়ির সবার চেয়ে তার রোজগারটা বেশ কয়েকগুণ বেশি।

মাধ্যমিক পাশ করার পর হাতেকলমে কারখানার কাজ শিখতে একটা স্কুল অফ টেকনোলজিতে ভর্তি হয়েছিল বিনোদ। দু'বছর বাদে সেখান থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে কলকাতার আশপাশে কয়েকটা কারখানায় পাঁচ-সাত মাস করে কাজ করার পর দারুণ সুযোগ পেয়ে সাহানপুরের একটা বড় কোম্পানিতে ওয়েল্ডারের চাকরি পেয়ে যায়। মাইনে ছাড়াও সপ্তাহে চারদিন চারঘণ্টা করে ওভারটাইম। দুটোই লোভনীয়।

লকডাউনে কোম্পানি তালা ঝোলানোর সময় বিনোদের বকেয়া পাওনা ছিল ছিয়াশি হাজার তিনশো পঞ্চাশ টাকা।

কোম্পানি আগেই সমস্ত কিছু মিটিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বিনোদ নেয়নি। সে ভেবে রেখেছিল মা আর দাদারা বোনের বিয়ে ঠিক করে জানিয়ে দিলে টাকাটা তুলে নিয়ে বাড়ি যাবে। বোনের বিয়েটা হয়ে গেলে সে অনেকটা চাপমুক্ত হতে পারবে।

বোনের বিয়ে যখন মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে সেই সময় দিল্লি থেকে ঘোষণা করা হল, দেশজুড়ে লকডাউন হতে চলেছে। বিনোদের মনে হল কতদিন আর এই অবস্থা চলবে। সে ঠিক করে ফেলল তার প্রাপ্য টাকা তুলে নিয়ে বাড়ি চলে যাবে। যদি সম্ভব হয় লকডাউনের মধ্যেই বোনের বিয়েটা চুকিয়ে ফেলবে। তা না হলে লকডাউন তোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

লকডাউনের একদিন আগে পাওনা টাকা তুলতে গিয়ে মাথায় বাজ পড়ল বিনোদের। কোম্পানির চিফ অ্যাকাউনটেন্ট মহেশ রোহতগি একটা খাম বিনোদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'থার্টি থাউজেন্ড হ্যায়। গিনতি করকে লো—'

বিনোদ হতভম্ব। মনের জোর, শরীরের সমস্ত শক্তি হঠাৎ কেউ যেন হরণ করে নিয়েছে। অনেক কষ্টে গলার ভেতর থেকে স্বরটা বের করে এনে বলেছে, 'স্যার, মেরা এইট্টি সিক্স থাউজেন্ড—'

হাত তুলে মহেশ রোহতগি বুঝিয়ে দিয়েছেন, এইট্টি সিক্স থাউজেন্ডটা তাঁর অজানা নয়। তিনি আরও জানিয়েছেন, কারখানায় প্রচুর মাল তৈরি হয়ে পড়ে আছে, ডিলাররা নিয়ে যাবার সময় তো পায়নি, বাইরে এক্সপোর্টও করা যায়নি। কোম্পানির আর্থিক হাল বহুত বহুত খারাপ। ওয়ার্কারদের যা প্রাপ্য তার সিকিভাগও দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিনোদকে তো তাদের সবার থেকে খানিকটা বেশিই দেওয়া হয়েছে। লকডাউন তুলে নেওয়া হলে কারখানা যদি খোলা হয় আর কোম্পানির হাল ফেরে, ওয়ার্কারদের বাকি সব পাওনাগন্ডা হিসেব করে মিটিয়ে দেওয়া হবে। কারও একটি পয়সাও মার যাবে না। বিনোদ যেন অহেতুক চিন্তা না করে।

এরপর আর বলার কিছু ছিল না। তিরিশ হাজার নিয়েই সাহানপুর ছাড়তে হয়েছে বিনোদকে। সেই টাকা থেকে গিরিরাজজিকে নগদ আট হাজার দিয়ে এই ট্রাকে উঠতে পেরেছে। বাড়ি অবধি পৌঁছতে আরও কত খরচ হবে, কে জানে। বোনটার বিয়ে আর দেওয়া গেল না।

সমস্ত শোনানোর পর বিনোদ বলল, 'আমাদের ফ্যামিলি আর আমি কী অবস্থায় এসে পড়লাম, বুঝতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হচ্ছে না।'

'না।' আস্তে মাথা নাড়ল আসলাম, 'আমাদের সবারই হাল এক। ঘরবাড়ি ছেড়ে রুজি-রোজগারের ধান্দায়— দেশের অন্য রাজ্যে চলে এসেছিলাম। এতদিন ভালোই ছিলাম। কোত্থেকে আচমকা এক করোনা এসে হাজির হল। এক ঝটকায় আমাদের রোজগারের সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। বাড়ি গিয়ে কী যে করব!' তার গলার স্বরটা হতাশায় বুজে এল।

নিচু গলায় আসলাম আর বিনোদ কথা বলছিল কিন্তু চারপাশের অনেকেই তা শুনে ফেলেছে।

কয়েকজন গলা মিলিয়ে তারা যেসব কলকারখানার মালিক বা ঠিকাদারদের কাছে কাজ করেছে তাদের চোদ্দো পুরুষ উদ্ধার করতে করতে বলতে লাগল, মাত্র পনেরো-কুড়ি হাজার ধরিয়ে দিয়ে বিনোদদের মতো তাদেরও পথ দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কেউ কেউ বলল, তাদের পাওনাগন্ডা পুরোটাই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাড়ি ফিরে রোজগারের একটা ব্যবস্থা করতে না পারলে ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসারের খরচ চালাব কী করে?

এত শোরগোলের মধ্যে গালে হাত রেখে আধবোজা চোখে আনমনা কিছু ভাবছিল বিনোদ। হঠাৎ হাতটা নামিয়ে চোখ পুরোপুরি মেলে বলল, 'কারখানা টারখানা না খুললে কী আর করা যাবে। গ্রামে একশো দিনের সরকারি কাজ মেলে। সেখানেই নাম লেখাব।'

'মজা করছ!' আসলাম হাসল, 'তুমি ছিলে একটা বড় কারখানার ওয়েল্ডার। বড় চাকরি— করতে। মাইনে, বোনাস, ওভারটাইম মিলিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। একশো দিনের কাজ জুটিয়ে পুকুর আর রাস্তা তৈরির জন্যে মাটি কোপাবে, পাথর ভাঙবে, এসব আগড়-বাগড় বিশ্বাস করতে বলছ?'

'তেমন চাকরি-বাকরি না পেলে মাটি কোপানো, পাথরভাঙা, ধান রোয়া, ধান কাটা— যা পাওয়া যায় তাই করব। দেখ ভাই, পয়সা কামাই করাটাই আসল ব্যাপার।'

হিন্দি বাংলা এবং ওড়িয়া মিশিয়ে অনেকে এবার ভবিষ্যদ্বাণী শোনাতে লাগল, 'গাঁওয়ে গিয়ে পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে হাত জোড় করে যদি বল, 'মান্যবর পরধানজি, দয়া করে আমাকে শ'ও রোজের একটা কাম-কাজের বন্দোবস্ত করে দিন।' ব্যস, আশমানসে পুষ্পবৃষ্টির মতো তোমার হাতে সেটা ঝরে পড়বে। তাই তো? ইতনা আসান নেহি ভাইয়া। শ'ও রোজের একটা কাম জোটাতে শ'র (মাথা) বিলকুল সফেদ হয়ে যাবে।'

এরপর কেউ আর কিছু বলে না। মুলুকে ফিরে একটা রুজি-রোজগারের বন্দোবস্ত করা যে কতটা কঠিন, সবাই তা জানে এবং তা বোঝেও।

॥ তিন ॥

বেশ কয়েক ঘণ্টা হল জঙ্গল আগের মতো ততটা নিবিড় নেই। এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত, প্রচুর ডালপালাওয়ালা বুনো গাছ এবং ঝোপ-ঝোপের ভেতর দিয়ে ট্রাকটা দৌড়েই চলেছে।

অন্ধকার আর কুয়াশাও আগের মতো ঘন নেই, অনেকটাই ফিকে হয়ে এসেছে। চাঁদ এবং তারাগুলো জলুস হারিয়ে ফ্যাকাসে। রাস্তার দু'পাশে খানিকটা দূরে দূরে বুনো গাছগুলোর মাথায় পাখিদের ডাকাডাকি শুরু হয়েছে। ভোর হতে বেশি দেরি নেই। বড়জোর আধঘণ্টা।

শেষ রাতের দিকে সওয়ারিদের ঢুলুনি লেগেছিল। এখন সেই ঘোরটাও নেই। সবার চোখ সামনের দিকে। দিগন্তের তলা থেকে সূর্য উঁকিঝুঁকি দিলে ট্রাকটা হয়তো বিহার বা বাংলার সীমান্তে গিয়ে থামবে। কে জানে নেহাতই দুরাশা কি না।

একসময় সূর্যের দর্শন মিলল। সকালের ঠান্ডা ঠান্ডা নরম রোদে ভেসে যেতে লাগল চরাচর। কিন্তু ট্রাকের থামাথামির লক্ষণ নেই। বিপুল আকারের যানটা দৌড়েই চলেছে অবিরাম। ক্লান্তি বলতে কিছুই নেই এই দানবটার।

কাল সন্ধের একটু আগে আগে সওয়ারিরা গাড়িতে উঠেছিল। তখন থেকে এতটা সময় হাঁটু মুড়ে গোরু-ছাগলের মতো গাদাগাদি করে বসে আছে। একটানা এভাবে বসে থাকায় অসহ্য যন্ত্রণায় হাঁটু-কোমর-কাঁধ-শিরদাঁড়া এত টন টন করছে, মনে হয় শরীর থেকে সেগুলো ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে। রাগ, বিরক্তি আর যন্ত্রণায় মানুষগুলোর মুখ থম থম করছে। ধৈর্যের শেষ সীমায় বোধহয় তারা পৌঁছে গেছে।

ছাদের কয়েকজন তাদের বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে উঠেছিল। বাচ্চাগুলো হঠাৎ তুমুল কান্না জুড়ে দিল। নীচের দমবন্ধ করা ভিড়ে তারা যে কাল থেকে চুপচাপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছিল সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার।

বাচ্চাদের কান্নার সঙ্গে অনেকের চিৎকারও শোনা যাচ্ছে। কী হতে পারে? বাপেরা কি চেঁচিয়ে মেচিয়ে ধমক ধামক দিয়ে তাদের ছেলেমেয়েগুলোর কান্নাকাটি থামিয়ে দিতে চাইছে? ট্রাকের ছাদ থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

আসলাম আর বিনোদ কান খাড়া করে শুনছিল। বাচ্চাদের

কান্নাটা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিশেষ কোনও রাগে একনাগাড়ে চলছে। আর ধমকানি, হুঙ্কার চলছে অন্য কোনও তালে লয়ে। দুইয়ের মধ্যে মনে হয় না আদৌ কোনও সম্পর্ক আছে।

ট্রাকের ছাদে হঠাৎ চাঞ্চল্য দেখা দিল।

আচমকা যেমন কান্না এবং চিৎকার শুরু হয়েছিল তেমনি আচমকাই বিনোদদের সামনে এবং পেছন দিকের সারিগুলোতে যারা রেলিংয়ের ধার ঘেঁষে বসেছিল উঠে দাঁড়িয়ে রেলিং ধরে নীচের দিকে ঝুঁকে কান্না এবং চিৎকারের কারণ খোঁজার চেষ্টা করতে লাগল। তারপর নীচে যারা চেঁচাচ্ছে তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দিল, 'বংগাল ইয়া বিহারকা বর্ডার আউর কেত্তে দূর, সাফ সাফ বোলো—'

এবার ট্রাক চালকের গলা শোনা গেল, 'থোড়া দূর। চিল্লাও মাত—'

কে কার কথা শোনে। ট্রাকের ছাদে এবং নীচে চিৎকার থামতেই চায় না। —'লগভগ চৌদা ঘন্টে বইঠা বইঠা প্যায়ের, কমর বিলকুল বরবাদ হো গিয়া। আউর কেত্তে টাইম লেওগে? দো লম্বরি মাত করনা।'

'দো লম্বরি!' ড্রাইভার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, 'দো লম্বরি করতে হ্যায় ভুচ্চরকা আউলাদ সমঝে? খামোস বইঠা রহো। আউর একঘন্টে ঠিক হ্যায়।'

চালক এক ঘণ্টা সময় চেয়ে নিয়েছে। শোরগোল থামল। ছাদে রেলিং ধরে যারা চেঁচামেচিতে গলা মিলিয়েছিল তারা নীরবে যে যার জায়গায় ফিরে এসে বসে পড়ল।

কান্না এবং হল্লার কারণ এখন স্পষ্ট। প্রচণ্ড ভিড়ের চাপে বাচ্চাগুলোর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল, তাই কান্নাকাটি। এখন তাদের গলা শোনা যাচ্ছে না। মা-বাবারা খুব সম্ভব ভুলিয়ে ভালিয়ে আদর-টাদর করে তাদের শান্ত করেছে। আর হইচইয়ের উদ্দেশ্যটা হল একটানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রাকে বসে থেকে সবাই অতিষ্ঠ এবং অধৈর্য হয়ে উঠেছিল, তাই ড্রাইভারের ওপর একরকম চড়াও হয়েছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাংলা বা বিহারের সীমান্তে পৌঁছনো যাবে, এই আশ্বাস পাওয়ার পর আপাতত তারা চুপচাপ।

আসলাম বলল, 'কী মনে হয়, ড্রাইভারটা কি আমাদের বুদ্ধু বানাল?'

বিনোদ দুই জানুর ওপর থুতনি রেখে বসেছিল। মুখ তুলে বলল, 'মানে?'

'এক ঘণ্টার নাম করে আমাদের সবাইকে ঠান্ডা করেছে। পরে দেখবে পাঁচ ঘণ্টা লাগিয়ে দিয়েছে।'

একটু ভেবে বিনোদ বলল, 'মনে হয় না। ঝুটমুট মিথ্যে বলবে কেন?'

'লোকটা কি সাধু সন্ন্যিসি, পীর দরবেশ যে ওর মুখ থেকে সচ্ ছাড়া এক ভি ঝুটি নেহি নিকলে গা?' বছরের পর বছর সাহানপুরে কাটিয়ে বিনোদ আর আসলামরা কথা বলার সময় অজান্তে বাংলার সঙ্গে দু'চারটে হিন্দি উর্দু মিশিয়ে ফেলে।

'দেখ ভাই ওই লোকটাও আমাদের মতো ইনসান। ওর বডিটা স্টিল দিয়ে বানানো নয়। আমরা তবু নিজেদের হাঁটুতে বা অন্যের পিঠে কী কাঁধে মাথা রেখে ঝিমিয়ে নিতে পেরেছি। কিন্তু ওই লোকটা পুরা চৌদা ঘন্টে সিধা বসে থেকে ট্রাক চালিয়েছে। এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। এক মিনিটের জন্যও জিরিয়ে নেয়নি। যদি পরেশানিসে স্টিয়ারিংয়ের ওপর শর (মাথা) রেখে ঘুমিয়ে পড়ত, ট্রাকটার কী হাল হতো ভেবে

দেখ—।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। বিলকুল অ্যাক্সিডেন্ট।'

'করোনা লকডাউন আমাদের জিন্দা লাশ বানিয়ে ফেলেছে। অ্যাক্সিডেন্টটা হয়ে গেলে হামলোগ সব কোই পুরা লাশ বনে যেতাম।' হেসে হেসে বিনোদ বলল।

আসলামও হাসল।

ট্রাকটা চলেছেই। কখন এক ঘণ্টা শেষ হবে, কখন বাংলা বা বিহারের সীমান্তে গিয়ে দানব আকারের যানটা থামবে, প্রতিটি সওয়ারি তাই শিরদাঁড়া টান টান করে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে।

ট্রাক চালকের সময়ের হিসেবটা মোটামুটি নির্ভুল। একসময় প্রায় অফুরন্ত দীর্ঘ জঙ্গল পেছনে ফেলে ট্রাকটা এক জনশূন্য এলাকায় এসে থামল।

সূর্য এতক্ষণে সোজা মাথার ওপর উঠে এসেছে। এখন ভরদুপুর।

॥ চার ॥

গাড়িটা থামিয়ে দিয়ে চালক নেমে এসে একটা হাত প্রবলবেগে নাড়তে নাড়তে গলার স্বর উঁচুতে তুলে ভীষণ জরুরি কিছু ঘোষণার ভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'পঁহুছ গিয়া, পঁহুছ গিয়া। পাসিঞ্জার লোগ (প্যাসেঞ্জাররা), সামান উমান বাল-বাচ্চা লেকে উতরো। তুরন্ত, তুরন্ত, তুরন্ত'— শেষ শব্দটা বেশ জোর দিয়ে তিনবার উচ্চারণ করল।

সওয়ারিরা যেমন হুড়মুড় করে ট্রাকে উঠেছিল অবিকল সেভাবেই বাক্স-ব্যাগ ঝোলা ঝুলি এবং বালবাচ্চাদের কাঁধে মাথায় চড়িয়ে বা হাতে ঝুলিয়ে নেমে পড়ল। ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে যারা কিছুটা বড়, নিজেদের হাত-পা চালিয়ে নেমে এসেছে। তাদের সবার সঙ্গে আসলাম আর বিনোদও।

ড্রাইভার দাঁড়িয়েই ছিল। তার দু'নম্বর ঘোষণাটির জন্য সওয়ারিরা তার দিকে তাকাল।

তাগড়াই চেহারার ট্রাক চালক প্রথমে তার বাঁ-হাতের রোমশ কব্জিতে বাঁধা মান্ধাতার আমলের মস্ত গোলাকার ঘড়িটা দেখাল। 'দেখো, বারা বাজকে নে মিনট (বারো বেজে নয় মিনিট)। ইগারো (এগারো) বাজে দশ মিনট যব হুয়া, এক ঘণ্টে টেইম মাঙ লিয়া থা। অব এক ঘণ্টে পুরা নেহি হুয়া, তুম লোগক পঁহুছ গিয়া।' ডান হাতের বুড়ো আঙুলের পাশের আঙুলটা নিজের বুকে ঠেকিয়ে সে বলতে লাগল, 'ইয়ে আদমি দো লম্বরি হারামখোর নেহি। মেরা মুহসে (মুখ থেকে) কভি ঝুট নেহি নিকালতে—' বলে আঙুলটা বুক থেকে সরিয়ে এনে ডান পাশে বাড়িয়ে দিল, 'ওহি দেখো—'

চালকের আঙুল দিক নির্ণয় যন্ত্রের মতো কোনাকুনি ডানদিকে স্থির হয়ে আছে। দু'শো পঁচিশ জোড়া চোখ সেদিকে ঘুরে গেল।

চালক বলতে লাগল, 'উয়ো কাচ্চি (কাঁচা রাস্তা) দেখ লিয়া, উধার চলা যাও, চলতেই রহো—'

লোকটা বলে কী! সওয়ারিদের চোখেমুখে প্রবল উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে। প্রায় পনেরো ঘণ্টা বিরামহীন ট্রাকযাত্রায় ততটা টের পাওয়া যায়নি, কিন্তু গাড়ি থেকে নামার পর হাত-পা কোমর টোমর টান টান করে দাঁড়াতে যখন শরীর জুড়ে অসহ্য টনটনানি শুরু হয়েছে, মনে হচ্ছে চামড়া এবং মাংসের তলায় হাড়গোড় থেঁতো হয়ে গেছে, সেই সময় ড্রাইভারের আঙুল কিনা ভাঙাচোরা, এবড়ো খেবড়ো মেঠো রাস্তাটা দেখিয়ে দিল।

কতরকম ত্রাস আর আতঙ্ক নিয়েই না দু'শো পঁচিশ জন যাত্রী গিরিরাজজির ট্রাকে উঠেছিল! কীভাবে কবে নিজের নিজের রাজ্যে ফিরতে পারবে, আদৌ পারবে কি না, না পারলে কী হবে তাদের পরিণতি, কী হবে তাদের পরিবারের ভবিষ্যৎ— এমন হাজারো দুশ্চিন্তা নানা দিক থেকে তাদের মাথায় ঢুকে যাচ্ছিল। তবু তারই মধ্যে নিজেরাই নিজেদের ভরসা দিতে চাইছিল, বাংলা বা বিহারের বর্ডারে একবার পৌঁছতে পারলে যেভাবেই হোক নিজেদের বাড়িতেও যেতে পারবে। সাহানপুরে ফেরার আর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বাড়িতে ফিরতে পারলে হাত-পা গুটিয়ে নিষ্কর্মা বসে থাকা চলবে না। যে কোনও রকম কাম-ধান্ধার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে নেহাতই দুরাশা।

চালক ওই কাঁচা রাস্তাটা ধরে হেঁটে যেতে বলেছে। হাঁটা না হয় শুরু করা গেল কিন্তু রাস্তাটা শেষ পর্যন্ত তাদের কোথায় পৌঁছে দেবে?

সবাই ভয়ে ভয়ে মিয়ানো গলায় জানতে চাইল এখানে যে তাদের নামিয়ে দেওয়া হল এই জায়গাটার কী নাম?

ড্রাইভার জানাল এই এলাকার নাম তার জানা নেই। লকডাউনের সময় যে মজদুররা বাংলা, বিহার বা ওড়িশায় নিজের নিজের মুল্লুকে যেতে চাইছে গিরিরাজজি তাদের এখানেই পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

সওয়ারিদের দুশ্চিন্তার সীমা পরিসীমা নেই। সবার মুখগুলো শুকিয়ে গেছে। তারা আরও জানতে চায় ওই রাস্তাটা ধরে কোথায় কত দূরে গেলে বাংলা, বিহার বা ওড়িশায় পৌঁছনো যাবে?

ড্রাইভারের সাফ সাফ জবাব, তেমন জানকারি তার কাছে নেই। সে বলল, 'তুমলোগন খাঁড়া কিঁউ? আগে বাড়ো, আগে বাড়ো। রাম রাম—' বলতে বলতে লাফ দিয়ে ড্রাইভারের কেবিনে উঠে স্টার্ট দিল। বিশাল ট্রাকটা এক পাক ঘুরে চকিতে ছেড়ে আসা জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে গেল। আর দুশো পঁচিশ জন ত্রস্ত, অসহায় মানুষ উদ্‌ভ্রান্তের মতো সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কী ভাবছে তারা? গিরিরাজজি বলেছিলেন, ট্রাকটা যেখানে তাদের নামাবে সেখান থেকে বাংলা বা বিহারে কীভাবে যাওয়া যায়, ড্রাইভার

তার দিশা দেখিয়ে দেবে। কিন্তু একটা সৃষ্টিছাড়া এলাকায় তাদের নামিয়ে আঙুল বাড়িয়ে একটা ক্ষতবিক্ষত মাটির রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে সে পালিয়ে গেল।

ট্রাক ড্রাইভার কেন এমন একটা নোংরা কাজ করতে গেল? হতভম্ব সওয়ারিদের মনে হয় এই দুষ্কর্মটি গিরিরাজজির। তিনিই খুব সম্ভব সাহানপুর থেকে অনেক দূরে কোনও একটা নির্জন জায়গায় তাদের নামিয়ে দিয়ে ফিরে যেতে বলেছিলেন ড্রাইভারকে। কিংবা এমনও হতে পারে চোদ্দো পনেরো ঘণ্টা এক নাগাড়ে গাড়ি চালাবার পর ড্রাইভার এতটাই পরেশান হয়ে পড়েছে যে আর চালাতে পারছিল না। বাংলা বা বিহারের বর্ডার অবধি না গিয়ে এখানেই নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে। এমন একটা জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা কেন করা হল? এই প্রশ্নটার জবাব কোনও দিনই পাওয়া যাবে না।

ট্রাকটা যতক্ষণ না গভীর জঙ্গলে অদৃশ্য হল, অসহায় মানুষগুলো তাকিয়েই থাকে।

॥ পাঁচ ॥

বেশ খানিকটা সময় কেটে যায়।

হঠাৎ বিনোদের মনে হল, এভাবে অনন্ত হতাশা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না, কিছু একটা করতেই হবে। রামবনবাস দুবে কাছেই রয়েছে। সে তাকে বলল, 'দুবেজি, আপ তো বিহারকে রহনেবালা, ঘর মুল্লুক উধারই হোগা। যঁহা হামলোগ খাড়া হ্যায়, ইয়ে বিহারকা কোই ইলাকা?'

চোখ আধবোজা করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল রামবনবাস। তারপর জানাল, বিহার যে তার মুলুক, সেটা বিলকুল ঠিক। পাটনা শহরে তাদের সাতপুরুষের বাস। সাহানপুরে একটা বড় কারখানায় সে কাজ করে। পাটনা থেকে ট্রেনে এবং বাসে সেখানে যেতে হয়। ছুটিছাটায় অর্থাৎ ছট পরবে, হোলিতে সাহানপুর থেকে কয়েক দিনের জন্য পাটনায় ফিরতেও সেই বাস এবং ট্রেন। কোনও দিনই এই সৃষ্টিছাড়া জায়গায় সে আসেনি। তাই বলতে পারবে না, এটা খাস বিহারের কোনও অংশ কি না।

বিহারের অন্য যে সওয়ারিরা ছিল, তারাও জানাল অনেকটা পথ ট্রেনে এবং বাসে, বাকিটা পায়ে হেঁটে পাটনা থেকে সাহানপুরে, সাহানপুর থেকে পাটনায় তাদের যাতায়াত। কস্মিনকালেও এই অঞ্চলে তারা আসেনি। এলাকাটা তাদের সম্পূর্ণ অচেনা।

রীতিমতো দমে গেল বিনোদ। কিন্তু না, হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। সমস্ত নৈরাশ্য ঝেড়ে ফেলে মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে, এবং সেটা উঁচু গলায় সবাইকে জানিয়েও দিল, 'চলো, ওই কাচ্চি দিয়েই আমাদের যেতে হবে।'

বিনোদ বুঝিয়ে দিল, তারা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার পেছন দিকে জঙ্গল। ডাইনে-বাঁয়ে ধুধু পড়তি জমি, কোনও দিন ওইসব জমিতে ফসল ফলেছে কি না, কে জানে। বাকি রইল সামনের কাচ্চিটা, ওটা ধরে গেলে পথে কোনও গাঁও, গঞ্জ বা ছোটখাট শহর পাওয়া যেতেই পারে। সেই সব লোকালয়ের বাসিন্দাদের কাছ থেকে বাংলা বিহার বা ওড়িশায় যাবার সড়কের হদিশও মিলতে পারে।

'তাছাড়া সওয়ারিদের সবার কাছে যা খাবার দাবার রয়েছে তাতে ক'দিন আর চলবে। বড় জোর দো-তিন রোজ।

তারপর কী হবে? সেটাও ভেবে দেখা দরকার। ওইসব গাঁও-গঞ্জে গেলে ছাতু-মুড়ি, চিঁড়ে-গুড়, শুকনো মিঠাই বালুসাই, লাড্ডু বা গজাটজা, কয়েকদিনের জন্য এসবও কিনে নেওয়া যাবে। এতো গেল খাবার। কিন্তু পিনেকো পানি? কার কাছে ক'বোতল জল রয়েছে। বড়জোর দো-চার বটলি। তাই দিয়ে কতক্ষণ আর চালানো যাবে? বড়জোর পন্দ্র (পনেরো) বিশ ঘণ্টা। তারপর কী হবে? গাঁও কি শহরে গেলে পিনেকো পানিও কিন্তু মিলবে। ক্যায়া করোগে সোচো ভাইলোগ, সোচো—

ভিড়ের ভেতর চাঞ্চল্য দেখা দিল। শুরু হল শোরগোল। বিনোদ যা যা বলেছে প্রায় সবারই তা মনে ধরেছে। এছাড়া সত্যিই তো অন্য কোনও উপায়ও নেই। একমাত্র কাঁচা সড়কটাই তাদের সংকটের সুরাহা করতে পারে।

প্রায় সবাই বিনোদের সঙ্গে একমত। তারা বলল, 'ভাইয়া, তুমনে বিলকুল ঠিকহি বোলা। চল—'

যে ক'জনের মনে কিছুটা ধন্দ ছিল তারাও তা ঝেড়ে ফেলে অন্য সকলের সঙ্গে গলা মেলাল, 'হাঁ ভাইয়া। হামলোগ ভি সাথ হ্যায়। চল-চল-'

কাঁচা রাস্তাটা এতই ভাঙাচোরা, উঁচুনিচু, গর্তে বোঝাই যে চলাচলের প্রায় অযোগ্য। এই পথের কোথাও মানুষের পায়ের একটা ছাপও চোখে পড়ে না।

কতদিন পর, নাকি কত শতাব্দী, দুশো পঁচিশ জনের দলটা শক্ত শক্ত মাটির চাঙড় আর গর্তটর্ত বাঁচিয়ে পা ফেলতে ফেলতে চলেছে।

বিনোদের পাশেই রয়েছে আসলাম। একটু হেসে নিচু গলায় বলল, 'এ কোন হাইওয়েতে এনে তুললে ভাই, গাঁও শহরে পৌঁছবার আগেই হাঁটুটাটু খসে পড়বে।'

বিনোদও হাসল কিন্তু কিছু বলল না।

রাস্তার বাঁ দিকে একটা খাল, তারপর থেকে পড়তি জমির সীমানা শুরু। যে মজা নদীটার পাশ দিয়ে কাল ট্রাকটা তাদের অনেকটা পথ নিয়ে এসেছিল খালটার হাল সেই নদীর মতোই। তেমনি মজে যাওয়া, জল তলানিতে নেমে গেছে, তারওপর চাপ চাপ গুঁড়িপানার স্তর।

আশ্চর্যের ব্যাপার, বেশ খানিকটা পথ যাওয়ার পর খালটার ওপর দু'দুটো বাঁশের সাঁকো চোখে পড়ল। সে দুটো আস্ত নেই, অনেকটাই ভেঙেচুরে গেছে। সাঁকোর ওপর দিয়ে যাতায়াতের কোনও উপায়ও নেই। পারাপার করতে গেলে খালে নামতেই হবে। বেশির ভাগটা ভেঙে গেলেও সাঁকোর খুঁটিগুলো কিন্তু এখনও অটুট। খুঁটিগুলোর মাথায় মাছরাঙারা বসে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খালের দিকে তাকিয়ে আছে। গুঁড়িপানার ফাঁকে ফাঁকে নড়াচড়া চোখে পড়লেই তড়িদ্গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই ঠোঁটের ফাঁকে মাছ চেপে ধরে ফের খুঁটির মাথায় গিয়ে বসছে। শুধু মাছরাঙাই নয়, এধারে ওধারে ধবধবে বকেরাও রয়েছে। তারা অবশ্য উঁচু কোনও টঙের মাথায় বসে নেই, খালের জলে হাঁটু অবধি ডুবিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁদের খুব একটা তাড়াহুড়ো নেই, মাঝে মাঝে ঠোঁট দুটো নিঃশব্দে খালে নামিয়ে দিয়ে মাছ তুলে আনছে।

ট্রাকের মাথায় অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বিনোদের। তাদের একজন ফটিক, তার বাড়ি নদীয়ায়। বিনোদদের সমবয়সিই হবে। সে তাদের সামনের সারিতেই ছিল। হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'দুটো ভাঙা সাঁকো দেখছি। মনে হয় এই জায়গাটার কাছাকাছি একসময় গ্রামট্রাম ছিল। সেখানকার বাসিন্দারা সাঁকো দুটো বানিয়েছিল।'

আরও একজন তার নাম রফিক, বাড়ি বসিরহাটে, বলল, 'খুব সম্ভব তাই। কোনও কারণে পরে এখান থেকে তারা অন্য কোথাও চলে গেছে। বিনোদ তোমার কথা বোধহয় মিলে যাবে। সামনের দিকে আরও খানিকটা গেলে গ্রাম ট্রাম পেয়েও যেতে পারি।'

বিনোদ হেসে হেসে বলল, 'দেখা যাক—'

আরও কিছুক্ষণ হাঁটার পর কাচ্চির চেহারাটা পুরোপুরি বদলে গেল, আগের মতো ক্ষতবিক্ষত, গর্তে বোঝাই নয়, বেশ সমতল, চোখ বুজে স্বচ্ছন্দে পা ফেলা যায়।

দুশো পঁচিশ জনের দলটা এখন যেখানে এসে পৌঁছেছে তার ডানপাশে অনেকটা এলাকা জুড়ে ঘন সবুজ ঘাসের জমি। বেশ কয়েকটা বিশাল বিশাল গাছ ডালপালা মেলে ছাতার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘাসের জমিটাকে ছায়ায় ভরে রেখেছে।

হঠাৎ কাতর গলায় আসলাম বলল, 'কাল দুপুরে খেয়েছিলাম। তারপর পুরো চব্বিশটা ঘণ্টা আর কিছু খাওয়া হয়নি। পেটের ভেতর আগুন জ্বলছে। নাড়িভুঁড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।'

বিনোদ ভুরু দুটো উঁচুতে তুলে আসলামের দিকে তাকাল— 'আমার হালও একইরকম। ট্রাকের গাদাগাদি ভিড়ে হাঁটু ভাঁজ করে একটানা চোদ্দো-পনেরো ঘণ্টা বসে থেকে কোমর, ঊরু, শিরদাঁড়ার বারোটা বেজে গেছে। তারওপর চনমনে খিদে। মনে হচ্ছে পেটের ভেতর কারা যেন ছুরি চালিয়ে যাচ্ছে। এখন আর হাঁটাহাঁটি নয়, মুসাফির রুখ যাও—'

'সঙ্গে পেট্রোল টেট্রোল আছে তো?' বলে হাসতে লাগল বিনোদ।

লকডাউন, রুজি-রোজগারের রাস্তা বন্ধ, আগাগোড়া অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, এমন এক পরিস্থিতিতে অজানা এলাকার জনশূন্য মেটে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আদৌ নিজের নিজের মুলুকে পৌঁছতে পারবে কি না এইসব চিন্তায় সবার যখন পাগল পাগল দশা সেই সময় এভাবে হেঁয়ালির মতো কেউ কথা বলতে পারে, ভাবা যায় না। হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইল আসলাম।

'আরে বাবা, সোজা কথাটা বুঝতে পারছ না? পেট্রোল ছাড়া কি ইঞ্জিন চলে?' বিনোদ হেসে হেসে বলতে লাগল, 'তেমনি ভাত-রুটি, সব্জি, মাছ, দুধ, মাংস ছাড়া আমাদের বডিও বিলকুল বরবাদ। সাহানপুর থেকে কিছু খাবার দাবার নিয়ে বেরিয়েছ তো?'

মহা দুঃসময়ে ট্রাকের মাথায় পাশাপাশি বসে আসার সময় বিনোদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তখন থেকেই তাকে ভালো লেগেছিল আসলামের। এখন অচেনা রাস্তায় একসঙ্গে পা ফেলতে ফেলতে যতই তাকে দেখছে, তার কথা যতই শুনছে, ভালো লাগাটা আরও বেড়েই যাচ্ছে।

দু'শো পঁচিশ জনের দলটা লম্বা লাইন দিয়ে মিছিলে পা মেলানোর মতোই হাঁটতে হাঁটতে আসছিল। তাদের সামনের দিকে রয়েছে বিনোদরা। তারা দাঁড়িয়ে পড়েছে। দেখাদেখি বাকি সবাই।

খিদেয় বাচ্চা-কাচ্চাগুলো তুমুল কান্নাকাটি জুড়ে দিল। বাকিরাও ধুঁকছে।

বিনোদ হাত নেড়ে সবাইকে ঘাসের জমিটা দেখিয়ে সেখানে চলে যেতে বলল। আসলাম ফটিক রামবনবাস দুবে

যারা যারা লাইনের সামনের দিকে রয়েছে তাদের নিয়ে সেও গেল।

সকলেই দু'তিন দিনের মতো রসদ নিয়ে বেরিয়েছে। গাছের ঠান্ডা ছায়ায় হাত-পা ছড়িয়ে বসে তারা চটের থলি বা প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে খাবারের বড় বড় কৌটো বের করতে লাগল।

যাদের সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে রয়েছে, আগে তাদের খাইয়ে, কান্না থামিয়ে নিজেরা খাওয়া শুরু করেছে।

বিনোদ নিয়ে এসেছে তিনদিনের মতো চাপাটি, শুখা আলুর তরকারি, ডিম সেদ্ধ, কাঁচা লঙ্কা, কাঁচা পেঁয়াজ। এসব দুপুর এবং রাতের জন্য। সকালের জন্য কলা, পাউরুটি আর লাড্ডু।

আসলাম এনেছে একদিনের মতো ভাত, তিন-চার টুকরো মাছ ভাজা, ডাল মাখানি, পেঁয়াজ, লঙ্কা এবং আচার। বাকি দু'দিনের জন্য আটার মোটা রুটি আর তড়কা। সকালের জন্য সস্তা বেকারির গোল গোল কয়েকটা রুটি, শসা, গুড়।

চারপাশে আরও যারা রয়েছে তারাও ডাব্বা টাব্বা খুলে ফেলেছে। সবার খাদ্যবস্তু প্রায় একইরকম। রোটি, ভাত, ডাল মাখানি, ডিম ইত্যাদি। সাহানপুরের ধাবা আর ছোটখাট হোটেলগুলোতে এসবই মেলে।

বিনোদকে লক্ষ করছিল আসলাম। বলল, 'শুকনো চাপাটি বের করেছ। দিনেরবেলা ওগুলো চিবোবে? একদম না। আমার কাছে ভাত আছে। দু'জনে ভাগাভাগি করে খাব। ভাতে বোঝাই স্টেনলেস স্টিলের কাঁধা-উঁচু একটা থালা বিনোদের দিকে এগিয়ে দিল। —'এখান থেকে অর্ধেকটা তুলে নাও।'

'না, না, কতটা আর ভাত। তুমিই খাও। দিনেরবেলা ভাত খাওয়ার অভ্যেস আমার নেই।'

মনটা একটু খারাপ হল আসলামের। সে বলল, 'অভ্যেস যখন নেই তখন জোর করছি না। তবে অর্ধেকটা ভাত কিন্তু রেখে দিচ্ছি, রাত্তিরে না খেলে কিন্তু ছাড়ছি না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাই হবে। ছেলেমানুষি আর কাকে বলে'— বিনোদ হেসে ফেলল।

মনখারাপ উধাও। আসলামের মুখেও হাসি ফুটল। সে বলল, 'এখন মাছভাজা আর ডাল মাখানি খেতে আপত্তি নেই তো?'

'একেবারেই নেই। তোমাকেও কিন্তু একটা ডিম নিতে হবে।'

'জরুর, জরুর—'

হাসি আর মজাটজার মধ্যে দু'জনের খাওয়া শুরু হল।

খানিকটা দূরে একটা মস্ত পিপর গাছের তলায় বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে বসেছিল নকুল মাইতি। সে সাহানপুরে একটা কারখানায় কাজ করত, পুরো পরিবার নিয়ে সেখানেই থাকত। লকডাউনের পর এখন সে পূর্ব মেদিনীপুরে নিজেদের সাত পুরুষের ভিটেয় খুব সম্ভবত বরাবরের মতো চলে যাচ্ছে। ট্রাকে ওঠার সময় তারসঙ্গে বিনোদের আলাপ হয়েছিল তখন আভাসে এমনটাই জানিয়েছে।

নকুলের তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। বড়টার বয়স চার কি সাড়ে চার, তার পরেরটার বছর দেড়েক। সবচেয়ে ছোটটা মাস চারেকের বেশি হবে না। সেটা মনে হয় সারাক্ষণ মায়ের কোলেই থাকে। এখনও রয়েছে। এদের মধ্যে দুটো মেয়ে, একটা ছেলে।

নকুল মাইতি হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে কোনাকুনি তাকিয়ে ডেকে উঠল, 'বিনোদদাদা গ—'

ডাকটার মধ্যে কেমন একটা ব্যাকুলতা রয়েছে। খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে বিনোদের। থালা থেকে মুখ তুলে সে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু হয়েছে?'

'হ্যাঁ দাদা, বড় বিপদ—'

'কীসের বিপদ?'

'আমার তিন ছানাপোনার জন্যি সাহানপুর থেকে তিনটে বড় বোতল ভরে দুধ এনেছিলাম। সিকিভাগও পড়ে নেই, বাকিটা শেষ। খুব বিপদ গো। এখন দুধ কোথায় পাই?'

সত্যিই বিরাট সমস্যা। নকুল মাইতি যে প্রশ্নটা করেছে তাতে ভেতর ভেতর একটু দমেই গেছে বিনোদ, কিন্তু বাইরে তা বেরিয়ে আসতে দিল না। বরং ভরসা দিয়ে বলল, 'একটা গ্রামগঞ্জ পাই, দুধও জুটে যাবে।'

কী ভেবে নকুল উঠে এল। এধারে-ওধারে তাকিয়ে বিনোদের কানের কাছে মুখটা প্রায় ঠেকিয়ে ডানদিকে, ঘাসের জমির সীমানা যেখানে শেষ হয়েছে ইশারায় সেদিকটা দেখিয়ে খুব চাপা গলায় বলল, 'দাদা, ওই দিকটায় একবার চলুন।'

বিনোদ অবাক। জানতে চাইল, 'ওখানে কেন যাব? যা বলার এখানেই বলুন—'

'অন্য কারও সামনে বলতে পারব না। দয়া করে চলুন'— নকুল মাইতি কাকুতিমিনতি করতে লাগল।

কিছুক্ষণ দ্বিধাগ্রস্তের মতো দাঁড়িয়ে রইল বিনোদ। তারপর বলল, 'আচ্ছা, চলুন—'

নকুল তাকে নিয়ে ঘাসের জমির ডানপাশের শেষ প্রান্তে চলে এল। বিনোদ বলল, 'যা বলার বলে ফেলুন—'

বেশ কয়েকবার চারপাশ দেখে নিল নকুল মাইতি। তারপর চাপা কণ্ঠস্বর আরও নামিয়ে দিল, 'আমার বউয়ের পরশু রাত থেকে জ্বর। জ্বরটা কমছে না, তার সঙ্গে কাশি আর শ্বাসের কষ্ট। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে বউটাকে করোনায় ধরেছে।'

বিনোদ চমকে উঠল। 'এই অবস্থায় তাকে নিয়ে ট্রাকে উঠেছিলেন। এর ফলটা কী হবে বুঝতে পারছেন? আপনার স্ত্রী অন্য সবার মতো ট্রাকে ঠাসাঠাসি করে বসেছে। তার করোনা অন্যদের গায়ে যে চলে যায়নি জোর দিয়ে কি বলা যায়? তাছাড়া আপনাদের বাচ্চাগুলো। তাদেরও সর্বনাশ হয়ে গেছে বোধহয়। এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই আপনার?'

'কী করতাম বলুন—' কাঁচুমাচু হয়ে নকুল মাইতি বলল।

'স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসার পর উনি সুস্থ হলে বাড়ি ফিরতেন। এটুকু সবুর সইল না?'

'কোম্পানি আমাকে চাকরিই দেয়নি, থাকারও ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। লকডাউনে কারখানা বন্ধ হল, যেখানে থাকতাম সেখান থেকে আমাদের বের করে দেওয়া হল। বউকে হাসপাতালে দিয়ে বাচ্চা তিনটেকে নিয়ে কোথায় কাটাতাম, আপনিই বলুন—'

সাহানপুর ছেড়ে নকুলদের চলে আসার সংগত কারণ আছে। কিছুক্ষণ ভেবে বিনোদ বলল, 'সবই বুঝলাম, কিন্তু আপনার স্ত্রীর ব্যাপারটা জানাজানি হলে সবাই আপনাদের কি হাল করবে ভাবতে পারেন? খুব ঝামেলা তো করবেই, তাছাড়া এতগুলো মানুষ তাদের সঙ্গে আপনাদের কিছুতেই যেতে দেবে না। রাস্তায় ফেলে রেখে চলে যাবে।'

ভয়ে মুখটা শুকিয়ে গেল নকুলের। দিশাহারার মতো বলল, 'এখন আমরা কী করব, কিছুই তো মাথায়

আসছে না।'

নকুল মাইতির সমস্যাটা সামান্য নয়। ঘাসের জমিটায় বসে যারা খাচ্ছে, চকিতে একবার তাদের দেখে নিল বিনোদ। এই মানুষগুলোর হাত থেকে নকুলদের কী করে বাঁচানো যায়? আকাশ পাতাল ভেবে সে নকুলের দিকে তাকাল। বলল, 'এক কাজ করুন। এখন তো আর ট্রাকে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে হচ্ছে না। আমরা হাঁটতে হাঁটতে যাব। আপনারা অন্য সবার থেকে বেশ খানিকটা দূরে থেকে পা ফেলবেন। দেখবেন কারও গায়ে গা না ঠেকে যায়। অন্যদের সঙ্গে কথাটথা বলবেন না। আপনার স্ত্রীর কী হয়েছে, কেউ যেন টের না পায় এমনভাবে চলবেন। মনে থাকবে?'

মুশকিল আসান যেন হাতে পেয়ে গেল নকুল। এই প্রথম তার মুখে একটু হাসি ফুটল। বলল, 'থাকবে, থাকবে—'

বিনোদ ঈশ্বর বিশ্বাসী। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর হাতে আপাতত নকুলের পরিবারটিকে সঁপে দিয়ে সে বলল, 'এবার চলুন—'

নকুল তার বউ-ছেলেমেয়ের কাছে চলে এল। বিনোদ ফিরে গেল তার জায়গায়। অসীম কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছিল আসলাম। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে নকুল মাইতির? তোমাকে দূরে নিয়ে গিয়ে কী এত কথা বলছিল?'

নকুলের স্ত্রী করোনা ভাইরাসের শিকার, আসলামকে তা বলা যেতেই পারে। সে খুবই ভালো মানুষ। কিন্তু বলতে গিয়ে থেমে গেল বিনোদ। মুখ ফসকে আসলাম যদি অন্য কারওকে এটা জানায় এতগুলো মানুষের মধ্যে তা চাউর হয়ে যেতে পারে। তার ফলাফল হবে মারাত্মক। তাই এই করোনার ব্যাপারটা গোপন রাখাই উচিত।

বিনোদ বলল, 'তেমন কিছু নয়। নকুল মাইতি তার বাচ্চাদের জন্য সাহানপুর থেকে যে দুধ এনেছিল তা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে আর কতদূর গেলে দুধ মিলতে পারে, কবে কোন দিক দিয়ে গেলে বাড়ি ফেরা যেতে পারে, এইসব আর কি—'

ছেলেমেয়েদের জন্য দুধের জোগাড়, বাড়ি ফিরে যাওয়ার দিশা, এসবের মধ্যে এমন গোপনীয় কী থাকতে পারে? যে বিনোদকে দূরে নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে বলতে হবে! না, এ ব্যাপারে আর কিছু জানতে চাইল না আসলাম।

এদিকে সবার খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে এসেছে। সূর্য মাঝ-আকাশ থেকে পশ্চিম দিকে অনেকটা নেমে গেছে। রোদের ঝাঁঝ আর আগের মতো নেই।

বিনোদ উঠে দাঁড়িয়ে হিন্দি বাংলা মিশিয়ে বলল, 'দেখো ভাই, দু'পহর পার হয়ে গেছে অনেক আগেই। তিন নাম্বার পহর ভি যানেবালা হ্যায়। বহুৎ দূর যানা পড়েগা। সব কোই সামান উঠাকে লো, তুরন্ত—'

মুহূর্তে তুমুল ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল। কাঁধে মাথায় মালপত্র চাপিয়ে দ্বিতীয় দফার যাত্রা শুরু হল। লাইন দিয়ে সবাই মেটে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলল।

লাইনের সামনের দিকে আগের মতোই রয়েছে বিনোদ, আসলাম, রামবনবাস, ফটিক, রফিক এবং আরও দু'একজন।

চলতে চলতে ঘাড় ফিরিয়ে মাঝে মাঝে নকুল মাইতিকে লক্ষ করছিল বিনোদ। নকুলরা তাদের খানিকটা পেছনে অন্যদের সঙ্গে চার-পাঁচ ফুটের মতো দূরত্ব রেখে আসছে। নকুল তার কথা রেখেছে এটুকুই যা স্বস্তি কিন্তু তাতে বিপদটা কি আদৌ কাটবে? নকুলের ঘাড়ে মাথায় যাবতীয় লটবহর। বড় ছেলেটার হাত ধরে হাঁটিয়ে আনছে সে। তার রোগা, ক্ষয়াটে চেহারার বউটার কোলের দু'পাশে ছোট দুটো বাচ্চা। কিছুক্ষণ পর পর সে কাশছে। মোটেও এটা সুলক্ষণ নয়।

সামনের দিকে পা ফেলতে ফেলতে পেছন ফিরে যতই নকুলের পরিবার, বিশেষ করে তার বউ আর ছোট ছেলেমেয়ে দুটোকে দেখছে ততই অদ্ভুত একটা ভয় বিনোদের মাথায় চেপে বসছে। এই অচেনা রাস্তা কতটা লম্বা কে জানে। এটা পেরিয়ে, তারপর আরও কত অজানা মাঠঘাট, নদী, ফসলের খেতটেত এবং ঘোর জঙ্গল পেছনে ফেলে আদৌ বউ আর ছোট বাচ্চা দুটোকে বাঁচিয়ে নিয়ে নকুল মাইতি মেদিনীপুরে তাদের গ্রামে পৌঁছতে পারবে? যতই ভাবছে চিন্তাটা তার মাথায় আরও বেশি করে চেপে বসছে।

পাশ থেকে আসলাম জিজ্ঞেস করল, 'ঘাড় ঘুরিয়ে কী এত দেখছ বলো তো—'

বিনোদ চমকে ওঠে। দ্রুত মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলে, 'না, না কিছু নয়।'

চারপাশে সবাই অবিরল কথা বলছে। নতুন কোনও বিষয় নয়। এই অচেনা মেটে রাস্তাটা ধরে কোথায় তাঁরা পৌঁছতে পারবে, সেখানে গেলে তাদের সব সমস্যার সুরাহা হবে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। ঘাসের জমিটা পেছনে ফেলে দু'শো পঁচিশ জনের দলটা অনেক দূর চলে এসেছে। কিন্তু না গ্রাম, না শহর বা অন্য কোনও ধরনের লোকালয়, কিছুই চোখে পড়েনি।

যতক্ষণ দিনের আলো আছে, তেমন দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু ঝপ করে সন্ধে নামলে চারিদিক যখন অন্ধকারে ডুবে যাবে তখন কী হবে তাদের, কোথায় রাত কাটাবে তারা— সেসব

ভেবেই এতগুলো মানুষের এখন থেকেই দুশ্চিন্তার শেষ নেই। তার সঙ্গে মিশেছে ত্রাস এবং প্রবল উৎকণ্ঠা।

'আন্ধেরা নামলে কী করব আমরা, কোথায় থাকব ভাইয়া?' চারিদিক থেকে এই প্রশ্নগুলো ধেয়ে আসতে থাকে বিনোদের দিকে। কারণ আছে। কেননা সে-ই তো এই কাচ্চি ধরে হাঁটার কথা বলেছে। ভরসা দিয়ে বলেছে, মেটে এই পথটা নিশ্চয়ই কোনও গাঁওগঞ্জে তাদের পৌঁছে দেবে।

বিনোদ সবাইকে বোঝায়, তারা এতগুলো মানুষ। দিনের আলো থাক বা রাতের আন্ধেরা, ভয়টা কীসের? গাঁও শহর না পাওয়া গেলেও থাকার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ফিকর মাত করনা—

সবাই কতটা ভরসা পায় তারাই জানে। তবে সওয়াল এবং জবাব চলতেই থাকে।

আচমকা কাছাকাছি কোত্থেকে যেন একটানা করুণ কাতর চিৎকার ভেসে আসতে থাকে। মনে হচ্ছে একজন নয়, দু'জনের গলা। শুধু চিৎকারই নয়, জড়িয়ে জড়িয়ে তারা কিছু বলছেও, তা বোঝা যাচ্ছে না।

বিনোদ দাঁড়িয়ে পড়ল। তার দেখাদেখি বাকি সবাই। তারা যেখানে চলে এসেছে মেটে রাস্তাটা সেখানে বেঁকে ডানদিকে ঘুরে গেছে। এই বাঁকটার বাঁ পাশ থেকে অনেক দূর অবধি জঙ্গল, তবে সেটা খুব একটা ঘন নয়। জঙ্গলটার ভেতর দিয়ে সরু একটা পথ সোজাসুজি চলে গেছে।

চিৎকারটা থামার কোনও লক্ষণ নেই। কান খাড়া করে শুনতে শুনতে সবারই মনে হচ্ছে শব্দটা আসছে ওই সরু রাস্তাটার ভেতর দিক থেকে।

বিনোদ বলল, 'জরুর কারা যেন বিপদে পড়েছে। আমি একবার দেখে আসি। তোমরা ডানদিকে ঘুরে হাঁটতে থাকো।'

অনেকেই আপত্তি জানাল, বেলা পড়ে গেছে। সন্ধে নামতে বেশি দেরি নেই। বিনোদের পক্ষে একা জঙ্গলের ওই রাস্তায় যাওয়া ঠিক হবে না।

বিনোদ বুঝিয়ে বলল, কেউ বিপদে পড়লে তার পাশে দাঁড়ানো উচিত। বেলা পড়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু এখনও দিনের যে আলোটুকু আছে তাতে সন্ধে নামার আগেই সে ফিরে আসবে।

রামবনবাস দুবে এবং আরও কয়েকজন বলল 'দের নায় করনা—'

'নেহি, নেহি। চিন্তা নায় করনা। তুরন্ত লৌটেঙ্গে—'

আসলাম বিনোদকে লক্ষ করছিল। বলল, 'আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাব।'

বিনোদ বুঝতে পারছে, মাত্র একদিনের আলাপ, আর তার মধ্যেই তার ওপর আসলামের একটা টান পড়ে গেছে। সে বলল, 'না গেলেই কি নয়?'

'না গেলেই নয়—' বেশ জোর দিয়েই জানিয়ে দিল আসলাম।

'কী আর করা, চল তাহলে—' বিনোদ হাসল।

বাকি কেউ আর দাঁড়াল না। বাঁকের ডানদিকে ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। আসলে কাল সন্ধে থেকে তাদের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ট্রাকে চোদ্দো পনেরো ঘণ্টা ঠাসা ভিড়ে ঠায় বসে থাকা, তারপর কিছুক্ষণের জন্য দুপুরের খাওয়া এবং বিশ্রাম বাদ দিলে অবিরল হাঁটতেই থাকা। শরীর ভেঙে আসছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা নিরাপদ কোনও একটা জায়গায় পৌঁছতে চাইছে যেখানে গেলে আজকের রাতটা অন্তত নিশ্চিন্তে কাটাতে পারবে।

॥ ছয় ॥

বিনোদ আর আসলাম জঙ্গলের পথটা ধরে যখন খানিকটা গেছে, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে নকুল মাইতি চলে এল।

বিনোদ আর আসলাম দাঁড়িয়ে পড়ল। কেউ কিছু বলার আগেই বিনোদের একটা হাত ধরে রাস্তার একধারে টেনে নিয়ে গেল নকুল। খুব জোরে জোরে শ্বাস টানছে সে, বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করছে। সেই অবস্থাতেই টেনে টেনে বলতে লাগল, 'আপনি তো চলে এলেন দাদা, ওদিকে বউটার জ্বর, গলার ব্যথা বেড়েছে, থেকে থেকেই কেশে উঠছে। ধরা পড়ে গেলে ওরা আমাদের রাস্তায় ফেলে রেখে চলে যাবে। এখন কী করব বুঝতে পারছি না।' ভয়ে, উদ্বেগে তাকে দিশাহারার মতো দেখাচ্ছে।

বিনোদ বলল, 'অন্যদের থেকে দূরে দূরে থেকে হাঁটছেন তো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'বউটা কাশলেই চারপাশে যারা আছে, তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে।'

'তাকাক গে, কেউ যদি কিছু জিজ্ঞেস করে বলবেন কাল রাত্তিরে ট্রাকের ঝাঁকুনি আর আজ চড়া রোদে একটানা হাঁটাহাঁটিতে সর্দি-কাশি হয়েছে।' শিগগির চলে যান। ওদের নিয়ে ডানদিকে হাঁটতে থাকুন। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসব। ভয় নেই।'

কতটা ভরসা পেল নকুলই জানে। পেছন ফিরে বারবার তাকাতে তাকাতে সে দূরের কাঁচা সড়কটার দিকে চলে গেল।

সরু পথটা দিয়ে চলতে চলতে বিনোদের কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। আসলামকে কিছু একটা বলতে গিয়ে বার কয়েক থেমে গেছে বিনোদ। তারপর মনস্থির করে নিচু গলায় বলল, 'একটু দাঁড়াও—'

বেশ অবাক হয়েই তার সঙ্গীর দিকে তাকাল আসলাম।

'আমার খুব একটা অন্যায় হয়ে গেছে।'

'কীসের অন্যায়?' আরও বেশি করে অবাক হল আসলাম।

নকুল মাইতিরা কী ধরনের মহাসংকটে রয়েছে এবং কেন ঘাসের জমিতে একবার তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, এখন আবার কেন দৌড়ে এসেছিল, সব [illegible] জানিয়ে দিল

বিনোদ বলল, 'কাউকে তার বউয়ের ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলেছিল। কিন্তু তোমার মতো বন্ধুকে আগেই বলা উচিত ছিল। ভাই কিছু মনে কোরো না। মাফ করে দাও—'

'না, না, এভাবে বোলো না। কীসের আবার মাফ! আমাকে বন্ধু করে নিয়েছ সেটাই অনেক।'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা যেখানে চলে এসেছে সেই এলাকাটা নিঝুম এবং নির্জন। ট্রাক থেকে নামার পর এতটা পথ বিনোদরা এসেছে, সাহানপুরের শ্রমিকরা ছাড়া অন্য একটি মানুষও চোখে পড়েনি।

চিৎকারটা অল্পক্ষণের জন্য থেমে ফের শুরু হল। শব্দটা এখন অনেক স্পষ্ট, সেই সঙ্গে দু'একটা শব্দও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে— 'বচাইয়ে, বচাইয়ে—'

শব্দগুলো আসছে খুব কাছ থেকে। বিনোদ জিজ্ঞেস করল, 'শুনতে পারছ?'

'হ্যাঁ। ডানদিকে চলো মনে হচ্ছে আমরা যাদের খোঁজে এসেছি তারা এখানেই আছে।' আসলাম বলল।

ডানদিকের ঝোপঝাড় আর কয়েকটা গাছের পাশ দিয়ে খানিকটা এগুতেই চোখে পড়ল একটা বহুকালের পুরনো বটগাছের মোটা ঝুরির গায়ে কাত হয়ে রয়েছে দু'জন মাঝবয়সী লোক। ক্ষয়াটে চেহারা। মাথায় উসকোখুসকো ধুলোয় ভরা জট পাকানো চুল। এক নজরেই বোঝা যায়, বেশ কয়েকদিন ওদের মাথায় তেল জল কিছুই পড়েনি। মুখ ভরা খাড়া খাড়া দাড়ি। ভাঙা গাল, কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। চোওয়ালের হাড়ও বড় বেশি প্রকট।

একজনের পরনে ময়লা ঢলঢলে পায়জামা আর হাফহাতা পাঞ্জাবি, আরেক জনের খেলো ফুলপ্যান্টের ওপর হাফ শার্ট। একধারে দুটো চাকা লাগানো চারদিকে নিচু রেলিং লাগানো পুরু কাঠের পাটাতনের ওপর চট দিয়ে মোড়া বেশ কিছু লটবহরই হয়তো রয়েছে। পাটাতন দুটোর একদিকে মোটা দড়ি বাঁধা। বোঝাই যায় দড়ি ধরে টানতে টানতে মালপত্র এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।

লোক দুটোকে দেখামাত্র অনুমান করা যায় বেশ কয়েকদিন ওদের চান খাওয়া ঘুমটুম হয়নি। সারা শরীর জুড়ে এত ক্লান্তি যে সোজা হয়ে বসে থাকতে তো পারেইনি, পুরোপুরি চোখ মেলে তাকাতেও না। এই অবস্থাতেই থেকে থেকে জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতে তারা চেঁচিয়ে চলেছে, 'বচাইয়ে বচাইয়ে—' মাঝে মাঝে হাঁপাতে হাঁপাতে নিজেদের মধ্যে দু'চারটে কথাও বলছে।

একজন বলল, 'কত চেল্লাচ্চি কিন্তুক কেউ তো এলনি।' আরেকজন বলল, 'যাদের নে (নিয়ে) এয়েচি তাদের কী গতিক যে হবে ভেবে পাচ্চি না।'

ওরা যে বাঙালি তা নিয়ে ধন্দ নেই। কোত্থেকে এসেছে ওরা, কী নিয়ে এসেছে, কাদের গতির কথা বলছে?

বিনোদের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা গলায় আসলাম বলল, 'বাংলায় কথা বলছে। আমাদের রাজ্যের লোক। এই অবধি বুঝতে পারছি। তবে কাদের নাকি নিয়ে এসেছে, তাদের গতিক নিয়ে খুব চিন্তা করছে কিন্তু ওরা ছাড়া অন্য কারওকে দেখতে পাচ্ছি না। কী ব্যাপার বলো তো।'

বিনোদ বলল, 'আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। এতক্ষণ ধরে কেন চিৎকার করছে তার নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। দেখা যাক।' সে লোক দুটোর দিকে ফিরে ডাকল, 'শুনছেন'—

প্রথম ডাকটা ওরা বোধহয় শুনতে পায়নি। বার কয়েক ডাকাডাকির পর ঘোলাটে লাল চোখ মেলে দু'জনে তাকাল। কয়েক লহমা পলকহীন তাকিয়ে থেকে খুব অবাক হয়েই যেন জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা!'

বিনোদ কম অবাক হয়নি। বলল, 'আপনাদের চিৎকার শুনেই আমরা এসেছি।'

লোক দুটো এবার হুঁশে ফিরল। তাদের একজন বলল, 'এই জনমনিষ্যিহীন জঙ্গলে আমাদের কেউ বাঁচাতে আসবে ভাবতে পারিনি। মনে হচ্ছেল আমাদের চেল্লানি ব্রেথা হবে। আমাদের বড় বেপদ। শেষ অবধি ভগবান আপনাদের পেটিয়েচেন। বসেন বাবুরা, বসেন। কিন্তুক বটগাছের তলায় ধুলোবালিতে কোতায় বসবেন—'

লোক দুটো ঢোক গিলতে গিলতে কিছু বলতে যাচ্ছিল। তাদের থামিয়ে দিয়ে বিনোদ বলল, 'আগে নিজেদের পরিচয় দিই। আমার নাম বিনোদ আর আমার এই বন্ধু হল আসলাম। আমরা যে বাঙালি বুঝতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হচ্ছে না। আমার বাড়ি সোনারপুরের কাছে একটা গ্রামে, আসলামদের বাড়ি ডায়মন্ডহারবারের দিকে যেতে আমতলা পেরিয়ে খানিকটা দূরে একটা গ্রামে। আমরা দু'জনেই সাহানপুরে কাজ করতাম। লকডাউনে সারা দেশের অন্যসব জায়গার মতো সেখানেও সব কলকারখানা, রুজি রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। তাই আমরা সেখানকার দু'শো পঁচিশজন শ্রমিক খানিকটা পথ ট্রাকে, বাকিটা হাঁটতে হাঁটতে যে যার বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। অন্য সবাই এগিয়ে চলেছে। আপনাদের চিৎকার শুনে আমরা দু'জন চলে এলাম। এবার আপনাদের কথা বলুন। আপনারা কারা, কোত্থেকে আসছেন, মানুষজন নেই, এমন একটা জঙ্গলে ঢুকলেনই বা কেন? নিন শুরু করুন।'

শুরু হয়ে গেল। ফুলপ্যান্ট পরা লোকটার নাম বিপিন হালদার, যার পরনে পায়জামা সে হল হরেন জানা। ডায়মন্ডহারবার থেকে সমুদ্রের ধারে ফ্রেজারগঞ্জের দিকে যেতে কাকদ্বীপ কুলপি পেরিয়ে গেলেই বাঁপাশে যে বড় গাঁখানা পড়বে তার নাম পাতিবুনিয়া। সেখানেই তাদের বাড়ি।

বছর তিনেক আগে তারা কানপুরের লাগোয়া মস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সে এক খুব বড় ঠিকাদারের কাছে দিনমজুরিতে বিরাট বিরাট নতুন সব কারখানার শেড তৈরির কাজ করতে আসে। ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে বিপিনরা থাকত। খাওয়া দাওয়া হোটেলে। প্রচণ্ড খাটুনির পর হোটেলে খেয়ে পেটের রোগ ধরে গিয়েছিল। তাই আলাদা দু'কামরার ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে বিপিন গ্রামের বাড়ি থেকে তার বউ আর ছ'বছরের একমাত্র ছেলেকে তাদের কাজের জায়গায় নিয়ে যায়। হরেনের ছেলেপিলে নেই, সে নিয়ে যায় তার বউকে।

লকডাউন শুরু হয়েছে সবে। তার কয়েক দিন আগেই তারা যেখানে থাকত সেই অঞ্চলে আচমকা অল্প কয়েকজনের ওপর করোনা ভাইরাস চড়াও হয়। তাদের মধ্যে বিপিনের ছেলে এবং বউ, আর হরেনের বউ। লক্ষণ বলতে কাশি আর অল্প অল্প জ্বর। এই ধরনের সর্দি কাশি তো কারও না কারও হামেশাই লেগে থাকে। কেউ তেমন আমল দেয়নি।

কাজকর্ম, রুজি রোজগার বন্ধ। তাই ওই শিল্পাঞ্চলে পড়ে থাকার মানে হয় না। ওখানকার দেড়শো জন মজদুর মাথাপিছু সাত হাজার টাকা দিয়ে একটা বড় বাস ভাড়া করে। বাসটা তাদের পশ্চিমবাংলার সীমান্তে পৌঁছে দেবে, এই কড়ারে।

কানপুরের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূরে একটা মাঝারি ধরনের শহরে এসে ঘড় ঘড় আওয়াজ করে বাসের ইঞ্জিন পুরোপুরি বিগড়ে যায়। বাসওয়ালা জানায় গাড়ি আর যাবে না। আপসোস করতে করতে আঙুল দিয়ে দূরে একটা রাস্তা দেখিয়ে সে বলেছে, ওটা ধরে এগিয়ে গেলে বাংলার বর্ডারে পৌঁছনো যাবে। যাত্রীরা নেমে খানিকটা যেতে না যেতেই বিগড়ে যাওয়া বাসটা আচমকা সচল হয়ে ওঠে এবং মুহূর্তে এক পাক খেয়ে প্রচণ্ড গতিতে উধাও হয়ে যায়।

শুনতে শুনতে বিনোদদের মনে হচ্ছিল, ব্যাপারটা অবিকল তাদের মতোই। লকডাউনে ট্রেন থেকে শুরু করে সবরকম যানবাহন চলাচল বন্ধ। গিরিরাজজির মতো ধূর্ত ধড়িবাজেরা নানা কৌশলে নিরুপায় শ্রমিকদের তাদের রাজ্যের সীমান্তে পৌঁছে দেবার আশা ভরসা দিয়ে প্রচুর টাকা ভাড়ায় গাদিয়ে ট্রাক বা বাসে তুলে মাঝ রাস্তায় নামিয়ে দিচ্ছে। তারা যেমন গিরিরাজজির খপ্পড়ে পড়েছিল বিপিনরাও তেমনি এক ধুরন্দর বাসওয়ালার পাল্লায়।

এতক্ষণ হরেন জানা বলে যাচ্ছিল। বাকিটা বলল বিপিন হালদার।

বাসওয়ালা অচেনা একটা শহরে নামিয়ে দিয়ে অনেক দূরে অজানা ধুধু প্রান্তরের মাঝখানে যে অস্পষ্ট রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়েছিল সেদিকে হাঁটতে থাকা ছাড়া তাদের আর কোনও উপায় ছিল না।

চলতে চলতে বিপিনের বউ, ছেলে এবং হরেনের বউয়ের জ্বর বেড়ে যায়। তার সঙ্গে কাশি এবং শ্বাসের কষ্ট। রাস্তার ধারে একটা ডাক্তারখানা চোখে পড়ায় তারা সেখানে ঢুকে পড়ে। কিন্তু বিপিন-হারানের ছেলে-বউদের পরীক্ষা করে প্রেসক্রিপশন লিখে দেওয়া তো দূরের কথা, তাদের দেখামাত্র কুকুর-বেড়ালের মতো দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বিপিনদের ছেলে-বউরা কোন মারণরোগ বাধিয়ে বসেছে, তাদের সঙ্গীরা একসঙ্গে চলতে চলতে টের পেয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারখানার লোকজন না হয় অন্য রাজ্যের মানুষ, পুরোপুরি অচেনা। তারা রূঢ় ব্যবহার করতেই পারে। কিন্তু যাদের সঙ্গে পা ফেলতে ফেলতে বিপিনরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছে তারা তো তাদেরই রাজ্যের মানুষ। হলে কী হবে, তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিল, যা ছোঁয়াচে ব্যারাম একসঙ্গে হাঁটতে থাকলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। বিপিনরা অনেক বুঝিয়েছে, যাতে ছোঁয়া না লাগে সেইভাবে তারা দূরে দূরে থাকবে। মহা বিপদে তাদের রাস্তায় ফেলে রেখে সঙ্গীরা যেন চলে না যায়।

সঙ্গীরা তাদের দিকে আর ফিরেও তাকায়নি। লম্বা লম্বা পা ফেলে একরকম দৌড়তে দৌড়তে দূরের রাস্তাটার দিকে উধাও হয়ে গেছে। ভয়ঙ্কর একটা মারণব্যাধি নিজেদের রাজ্যের মানুষগুলোর কাছে তাদের অচ্ছুৎ করে দিয়েছে।

তিনজন রুগিকে নিয়ে বিপিনদের পক্ষে দৌড়ে গিয়ে সঙ্গীদের ধরা সম্ভব ছিল না। দৌড় টৌড় তো ভাবাই যায় না, হাঁটার শক্তিও তখন তাদের প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

বিপিনরা ঠিক করল, যতক্ষণ না পা এবং মনের জোর ফিরে আসছে সেই শহরটাতেই থেকে যাবে। অবশ্যই সেখানকার মানুষজনের চোখের আড়ালে। অনেক ঘোরাঘুরি করে একটা পোড়ো চালাঘরের সন্ধান পায় বিপিনরা সবাই সেখানে গিয়ে ওঠে। দিনটা ফুরিয়ে সন্ধে নামার পর থেকে তিনজন রুগির জ্বর অনেকটা বেড়ে যায়। গায়ে হাত দিলে মনে হচ্ছিল পুড়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হারান আর বিপিনের চোখের সামনে একে একে তাদের ছেলে এবং বউদের মৃত্যু হয়। এদের বাঁচাবার

কোনও ব্যবস্থাই করা যায়নি। তীব্র শোকের মধ্যে তাদের চিন্তা তিনটি মৃতদেহ নিয়ে কোথায় যাবে, কীভাবে এদের শেষ কাজ করবে? লকডাউনের রাতে সেই নিঝুম অজানা শহরের কোথায় শ্মশান, তাদের পক্ষে খুঁজে বের করা অসম্ভব। অনেক ভেবেচিন্তে বিপিনরা ঠিক করে ফেলে ওই শহরে তারা আর থাকবে না। তিনটি শব নিয়ে দূরে কোথাও গিয়ে শেষ কাজটি সেরে ফেলবে। কিন্তু সঙ্গে রয়েছে বেশ কিছু মালপত্র, সেসবের সঙ্গে তিনটে নিথর দেহ বয়ে নিয়ে যাওয়া আদৌ সম্ভব নয়।

সমস্যার সুরাহা অবশ্য হয়ে যায়। বিকেলে শহরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে হারানের চোখে পড়েছিল মস্ত একটা কিরানার দোকানের গায়ে চাকা এবং রেলিং লাগানো কাঠের পাটাতনের দড়ি দিয়ে টানা বেশ কয়েকটা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সেই মাঝরাতে সুনসান রাস্তায় বেরিয়ে সে দুটো গাড়ি টেনে এনে মালপত্র আর তিনটে মৃতদেহ তুলে চট দিয়ে মুড়ে বেরিয়ে পড়ে। তাদের ফেলে রেখে বাসওয়ালার দেখানো যে ধুধু রাস্তাটায় তাদের সঙ্গীরা উধাও হয়েছিল, অন্ধকারে আন্দাজে আন্দাজে সেই পথ ধরেই লটবহর এবং তিনটি মৃতদেহ টানতে টানতে এগিয়ে যায় বিপিনরা।

রাত পোহালে তারা একটা বড় গ্রামে চলে আসে কিন্তু সেখানকার শ্মশানে শবগুলোর গতি করা সম্ভব হয় না। গ্রামের লোকেরা লাঠি ডাণ্ডা নিয়ে তাদের ওপর চড়াও হয়। শ্মশানটা সেই গ্রামের বাসিন্দাদের জন্য করা হয়েছে। অন্য জায়গা থেকে করোনার মড়া এনে সেখানে পোড়াতে দেওয়া হবে না। লাঠি উঁচিয়ে তারা বিপিনদের গ্রামের চৌহদ্দি পার করে দিয়েছিল।

এরপর আরও দুটো গ্রামেও ওইভাবেই তাড়া করে বিপিনদের বের করে দেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ধুঁকতে ধুঁকতে তারা জঙ্গলের ভেতর সরু রাস্তাটা ধরে বটগাছের তলায় চলে এসেছে।

সমস্ত শোনানোর পর বিপিন বলল, 'দাদারা, আমাদের বউ আর বাচ্চাটার কোতাও গতিক করতে পারিনি। দেশটা কী হয়ে গেল! একটুন মায়া-দয়া নেই। এখেনেও কি ওদের গতিক হবে না।' তার গলার স্বর ভারী হতে হতে বুজে এল।

'দেশে আর বুঝিন নে যেতি পারলাম না। শেষ পয্যন্তি পথের ধারে ফেলে রেখে যেতি হবে কিনা, কে জানে। শেয়াল শকুনে বুঝিন ওদের ছিঁড়ে খাবে।' হারান বলল। তার গলাটা করুণ কান্নার মতো শোনাল। সে থামেনি, বলতেই লাগল, 'আমাদের রাজ্যিতে বেশি মজুরির কাজ-কম্ম পাচ্ছিলাম না, তাই সুযুগ পেয়ে কানপুরে চলে এসেচি। ভালো মজুরি, বাড়তি খাটলে রোজ আরও পয়সা। আমাদের বাড়ির অবোস্তা তো ভালো নয়। সেখেনে মা-বাবা আর ভাইদের কাছে আমার ছেলেমেয়েরা রয়েছে। একটারে শুদু কানপুরে নে গে (নিয়ে গিয়ে) ইস্কুলে ভত্তি করেছিলুম। ভেবেছিলুম, বাকিগুলোনরে এক এক করে নে যাব, ওদের লিখাপড়া শেখাবো। হারানের দুই ছেলে গেরামে ওর মা বাপের কাছে থাকে। সে-ও ভেবেছিল এই বচ্ছরই ছেলে দুটোকে কানপুরে নে গিয়ে ইস্কুলে ভত্তি করবে।'

কত রঙিন স্বপ্ন ছিল এই মানুষ দুটোর। হারান বলতে লাগল, 'আমাদের দু'জনারই মাটির বাড়ি, মাথায় খড়ের চাল। সেই চালে পচ (পচন) ধরেচে। ঠিক করেছিলুম আসছে

বচ্ছর কাঁচা বাড়ির জায়গায় পাকা বাড়ি তুলব। কিন্তুন কোত্থেকে করোনা এসে জুটল, তারপরে লকডাউন। কলকারখেনা, আপিস কাচারি, রুজি রোজগার সব বন্দ। আমাদের দু'জনার বউ আর একটা ছেলে—' বাকিটা শেষ করতে না পেরে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল।

মানুষ দুটোর জন্য ভীষণ কষ্ট হচ্ছে বিনোদদের। নিজেদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে বেশি রোজগারের আশায় বহু দূরে চলে এসেছিল তারা। করোনা ভাইরাসের হানায় নিমেষে তাদের সব স্বপ্ন শেষ। বিপিন আর হারানের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বিনোদ। তারপর চারপাশটা একবার দেখে নিল। সূর্যটা এখন চোখে পড়ছে না। তবে দিনের আলো একেবারে ফুরিয়ে যায়নি। লজ্জা পাওয়া মেয়ের মুখের মতো লালচে একটু আভা আকাশের গায়ে লেগে আছে। হালকা কুয়াশা আগে থেকেই পড়তে শুরু করেছিল। এখন আর ততটা হালকা নেই। মনে হয় একটু পরেই গাঢ় হয়ে যাবে।

শোককাতর মানুষ দুটো কথা বলতে বলতে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ হুঁশে ফিরল।

বিপিন বলল, 'দাদারা, সন্ধে নামতে কিন্তুন দেরি নেই। ছেল-বউদের কী হবে? হটাৎ লোকজন এসি পড়লে ফের—' সে থেমে গেল।

এর আগে দু'তিনটে গ্রামের শ্মশানে গিয়ে তাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে ওরা ত্রস্ত, অতিষ্ঠ হয়ে আছে। বিনোদ ভরসা দেবার সুরে বলল, 'কোনও ভয় নেই। কেউ আসবে না। এবার কিন্তু আসল কাজটা করা দরকার। ঝপ করে অন্ধকার নামলে ভীষণ অসুবিধা হবে। আপনাদের কাছে টর্চ বা অন্য আলোটালো আছে?'

বিপিন বলল, 'আমাদের দু'জনের দুটো বড় টর্চ আর হেরিকেন আছে। আমরা যেখেনে থাকতাম সেখেনে মাঝেমধ্যে লোডশেডিং হতো। তাই হেরিকেন ছাড়া উপায় ছিল না।'

'ওগুলো বের করে ফেলুন। আর হ্যাঁ, দা আর কুড়ুল টুড়ুলও দরকার। সঙ্গে আছে কি?'

'কুড়ুল নেই। তবে দা আর হাত-করাত আছে। এগুলোন কীসে লাগবে?'

'যে কাজে এসেছেন তার জন্যে কাঠটাঠ লাগবে তো। ওই দেখুন জঙ্গলে কত মরা গাছ। ওগুলোর শুকনো ডাল কেটে নিতে হবে।'

বিপিন আর হারান দু'তিনটে বড় ঝুলি থেকে ক্ষিপ্র হাতে টর্চ, হ্যারিকেন, হাত-করাত টরাত বের করল।

বিনোদ বলল, 'কাঠের ব্যবস্থা করছি।'

আসলাম নিজের নামটা আরেকবার জানিয়ে দিয়ে বলল, 'বিনোদের সঙ্গে আমি হাত মেলালে কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আপনাদের আপত্তি নেই তো?'

বিপিন আর হারান একসঙ্গে বলে উঠল, 'কীসের আপত্তি। ওপরওলা আপনাদেরকে পাটিয়েছেন। আমাদের কত বড় ভাগ্যি। আপনারা দয়া করে না এলে কী যে করতুম—'

বিনোদ বলল, 'যাদের শেষ কাজ করতে নিয়ে এসেছেন, চটের মোড়ক খুলে এবার তাদের বের করুন। এই পৃথিবীতে কতক্ষণ আর ওরা থাকবে। শেষবারের মতো যতটুকু সময় পাওয়া যায় ওদের দেখে নিন।'

বিপিনরা উত্তর দিল না। বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে অসহনীয় যন্ত্রণা উঠে এসে দু'জনের মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। নীরবে হাতে-টানা কাঠের গাড়িটার দিকে তারা এগিয়ে গেল।

বিনোদ আর আসলাম আগেই তাদের ব্যাগ সুটকেস নামিয়ে রেখেছিল। বিপিনদের দা আর হাত-করাত তুলে নিয়ে একটু দূরে বুড়ো গাছগুলো অনেকটা ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে বিনোদরা সেদিকে চলে গেল। বেশিক্ষণ সময় লাগল না, তিনবারে প্রচুর শুকনো ডাল কেটে নিয়ে এল।

এরমধ্যে সন্ধে নেমে গিয়েছিল। বিপিনরা দুটো হ্যারিকেন জ্বালিয়ে দিয়েছে। তারপর চটের মোড়ক খুলে তিনটি মৃতদেহ বের করে চাদর পেতে শুইয়ে রেখে তাদের পাশে বসে পলকহীন তাকিয়ে আছে।

বিনোদ বলল, 'আর দেরি করা যাবে না। আমাদের ফিরে যেতে হবে। এবার শেষ কাজটা শুরু করা যাক।'

নিঃশব্দে উঠে পড়ল বিপিনরা। পাশের দিঘি থেকে জল এনে মৃতদেহ স্নান করাতে লাগল। ওদিকে বিনোদ আর আসলাম কাঠ দিয়ে তিনটে চিতা প্রায় সাজিয়ে ফেলেছে।

এই নির্জন জঙ্গলে কোথায় পাওয়া যাবে পুরোহিত? কে করবে মন্ত্রপাঠ? স্নান করানো হয়ে গেলে খুব যত্ন করে তিনটি দেহ মুছিয়ে দিয়ে চিতায় তোলা হল। তারপর মুখাগ্নি করে চিতায় আগুন দেওয়া হল। পুরোহিতহীন, মন্ত্রহীন চিরবিদায়।

তিনটি অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে মহাশক্তি কালী, দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এমন বহু দেবদেবীর নাম করতে করতে অঝোরে কেঁদে চলেছে বিপিনরা। এমন চরম শোকের মুহূর্তে কী-ই বা সান্ত্বনা দেওয়া যায়। করোনা আতঙ্কের চরম দুঃসময়ে নিজেদের রাজ্যে ফিরে যেতে যেতে পথে অজানা, অনাত্মীয় তিনটি মানুষের জন্য চিতা সাজাতে হবে, শুধু সাজানোই নয়, চিতার আগুন যতক্ষণ জ্বলবে তাকিয়ে থাকতে হবে, কোনওদিন বিনোদরা কি ভাবতে পেরেছে! দাউ দাউ তিন অগ্নিকুণ্ড খুবই কষ্ট দিচ্ছে। চুপচাপ মূর্তির মতো তারা দাঁড়িয়ে থাকে।

মানুষ তিনটিকে আর দেখা যাচ্ছে না। তাদের শেষ স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তিনটি ভস্মস্তূপ ফেলে রেখে আগুন নিভে গেছে।

বিপিন আর হারান একেবারে ভেঙে পড়েছে। তাদের ধরে ধরে দিঘিতে নিয়ে গেল বিনোদরা। বিনোদ বলল, 'চান করে নিন।' সে শুনেছে, প্রিয়জনদের মৃত্যুর পর শ্মশানে গিয়ে দাহ করা হলে স্নান করতে হয়। এটাই নাকি রীতি।

যন্ত্রচালিতের মতো বিপিন আর হারান জলে নেমে বেশ কয়েকবার ডুব দিয়ে উঠে এসে গা-মাথা মুছতে লাগল। বিনোদরা হাত-পা মুখ ধুয়ে, মাথায় জল ছিটিয়ে এসে বলল, 'চলুন এবার'।

সাময়িক যে শ্মশানটা বানানো হয়েছে সেখানে হ্যারিকেন দুটো জ্বলছিল। সে দুটো হাতে ঝুলিয়ে বিপিনদের সঙ্গে করে বটতলায় চলে এল তারা।

ভেজা জামাকাপড় বদলে শুকনো পোশাক পরে বসে পড়ল বিপিনরা। বিনোদরাও তাদের কাছাকাছি বসল।

বিপিনরা কেঁদেই চলেছে। তবে এতটুকু শব্দ হচ্ছে না। দু'জনের চোখ কেঁদে কেঁদে টকটকে লাল। সেগুলো থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে।

এইমাত্র ছেলে-বউদের পুড়িয়ে এসেছে তারা। দগদগে ক্ষতের মতো এত বড় নিদারুণ শোক সামলে নেওয়া কি এতই সহজ। অবিরল কান্না আর অশ্রুপাতটা তো খুবই স্বাভাবিক। এই শোকের আঘাত তাদের একেবারে ভেঙেচুরে দিয়েছে। পুরোপুরি নয়। অল্প একটু সামলে উঠতেও সময়

লাগবে, অনেক অনেক সময়। তবু বিনোদ বলল, 'আপনারা কান্নাকাটি করবেন না, শান্ত হোন।'

'আমাদের কত বড় সব্বোনাশটা হয়ে গেল। কী করে শান্ত হব! বুক যে ভেঙে যাচ্চে—' বিপিন এবং হারানের গলায় একই হাহাকার।

অনেক বোঝানোর পর কান্না থামল। বিনোদ জিজ্ঞেস করল, 'এই জঙ্গলে পড়ে থেকে কী করবেন? আমরা তো একই রাজ্যে যাব। চলুন আমাদের সঙ্গে।'

বিপিন বলল, 'কাল দুপুর থেকে আমরা শুদু হেঁটিচি। মদ্যিখানি রাত্তিরে কয়েক ঘণ্টা জিরিয়ে মালগাড়ি টানতে টানতে অ্যাদ্দুর (এত দূর) এইচি (এসেছি)। পথে কত হুজ্জুতি গেচে। এক শোশ্মান থেকে আরেক শোশ্মানে তাড়া খেতি খেতি এখেনে এলাম। নিজের নিজের বউ-বাচ্চাকে পুড়োলুম। শরীলে আর মনে শুদুই কষ্ট। এখেন থিকে এই রাত্তিরবেলায় উটে দাঁড়াবার শক্তিটুকুনও নেই। আমাদের সব্বোস্ব শেষ।'

'আপনারা তা হলে ঘুমিয়ে রাতটা এখানেই কাটিয়ে দিন। আমরা চলি—'

'চলে যাবেন?' বিপিনদের গলার স্বর ভারী হয়ে এল।

বিনোদ বলল, 'আমাদের সঙ্গীরা— এতক্ষণে অনেক দূর চলে গেছে। তাদের ধরতে হবে তো।'

'দাদারা আমাদের জন্যি অনেক করেচেন। আপনারা না এলি বাচ্চা আর বউ দুটোর শেষ গতিক যে কী হতো, জানি না। ভগমান আপনাদের পেটিয়ে দেচেন। আমাদের আরেকটুন দয়া করে যান।' হাত জোড় করে কাকুতি-মিনতির সুরে বলল বিপিনরা।

ওদের সঙ্গে একাই কথা বলছিল বিনোদ। সে অবাক। জিজ্ঞেস করল, 'কীসের দয়া?'

বিপিন বলল, 'কাল দুপুর থিকে কিচু খাওয়া হয়নি। ঝোলাতে মাত্তর হাজার পাঁচেকের মতোন টাকা পড়ে আচে। তিনটে ছোট-বড় শহর আর সাত-আটটা গাঁয়ের ভেতর দে (দিয়ে) হাঁটতে হাঁটতে এয়েচি। সেই সব জায়গা থিকে মুড়ি চিড়ে কি পাউরুটি কিনে নেবো, ইচ্ছে থাকলেও কেনা হয়নি। করোনায় তিনজন মারা গেচে। তাদের শোশ্মান খরচ কত লাগবে তকোন কিচুই জানি না। হারান আর আমার খিদে মেটাতে একটা পয়সাও খরচ করতে সাহস হয়নি।' একটু থেমে সে আরও বলে, 'একোন (এখন) আর থির হয়ে বসে থাকতি পারচি না। খিদের চোটে মাতা (মাথা) ঘুরচে, চোখি (চোখে) আধার দেকচি আর পেটের ভেতরে ঝ্যানো চিতা জ্বলচে।'

এই দুই শ্রমিক লকডাউনে সমস্ত কিছু খুইয়ে যখন নিজেদের রাজ্যে ফিরে যাচ্ছে পথে করোনা ভাইরাস তাদের হাতে তুলে দিয়েছে তিন-তিনটে মৃত্যু, লেলিহান ক্ষুধা এবং ঘোর অন্ধকার ভবিষ্যৎ। আরও কত শ্রমিক যে এইভাবে করোনা ভাইরাসের শিকার হয়েছে এবং হবে, ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। স্তম্ভিত বিনোদ কয়েক লহমা তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, 'বলুন আপনাদের জন্যে কী করতে পারি—'

'আপনাদের কাচে ভাত-রুটি টুটি কিচু আচে—' বলতে বলতে থেমে গেল বিপিন।

এতক্ষণ নীরবে দু'পক্ষের কথাবার্তা শুনছিল আসলাম। এবার মুখ খুলল, 'আমার কাছে ভাত, রুটি তরকারি আর

ক'টা বালুসাই আছে। বিনোদের কাছে আছে চাপাটি তরকারি আর লাড্ডু। আমার ছোঁয়া ভাত আপনারা খাবেন?'

'সবার ছোঁয়া খাব। খাবারে কোনও জাত নেই।' দুই বুভুক্ষু শ্রমিকের চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। তারা সামনের দিকে দুই দুই চারটে হাত বাড়িয়ে দিল।

ক্ষুধা বোধহয় কোনওরকম দূরত্ব রাখে না। ভেদাভেদ ঘুচিয়ে সবাইকে একই সমতলে নিয়ে আসে। বিনোদ এবং আসলাম তাদের ব্যাগে যা খাবার দাবার ছিল সবটাই বিপিনদের হাতে তুলে দিল।

'আপনাদের এত দয়া কুনো দিন ভুলব না।' কৃতজ্ঞতায় বিপিনদের গলা কাঁপতে লাগল।

'কীসের আবার দয়া।' বিনোদের মুখে মৃদু হাসি ফুটল। 'মানুষ বিপদে পড়লে এটুকু করতেই হয়—'

অভিভূত, সর্বস্ব হারানো দুই শ্রমিক একসঙ্গে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আপনাদের মতো মানুষ আরককোনো (কখনও) দেকিনি—'

'এসব কথা থাক।' বিনয় বলল, 'আপনারা তো রাত্তিরটা এখানেই থাকছেন—'

'আর কুতায় (কোথায়) যাব! শরীলের কী হাল, আপনাদের বলেচি। নড়াচড়ার মতোন জোর নেই।'

'বাড়িতে তো যেতে হবে। কীভাবে যাবেন ভেবেছেন?'

'কাল মালপত্তর ঘাড়ে চাপিয়ে পথে তো নামি। তারপরে দেকা যাবে—'

'আমরাও বাড়ি ফিরব। আগেও একবার বলেছি, ফের বলছি, আমাদের সঙ্গে যাবেন?'

বিপিন আর হারানের ম্লান মুখে আলো খেলে গেল। গলা মিলিয়ে তারা বলে উঠল, 'আপনাদের মতোন মানুষের সঙ্গে যেতি পারলে—'

হাত তুলে তাদের থামিয়ে দিল বিনোদ, জঙ্গলের সরু পথটা দেখিয়ে বলল, 'কাল সকালে ওটা ধরে চওড়া কাঁচা রাস্তাটায় গিয়ে ডান দিকে সোজা চলে যেতে হবে। ওই পথে আমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। আজ রাতটা এই জঙ্গলে সাবধানে থাকবেন। এখন আমরা চললাম।'

নিজেদের মালপত্র কাঁধে তুলে, হাতে ঝুলিয়ে বিনোদরা জঙ্গলের সরু পথটা ধরে এগিয়ে চলল।

খানিকটা যাবার পর কী ভেবে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল বিনোদ, দেখাদেখি আসলামও।

বটগাছের তলায় সেই হ্যারিকেন দুটো জ্বলছে। তার আলোয় চোখে পড়ল বিপিন আর হারান তাদের দেওয়া ভাত রুটিটুটি গোগ্রাসে খেয়ে চলেছে। মুখের খাবার শেষ হতে না হতেই তড়িৎগতিতে রুটির টুকরো বা দলা দলা ভাত তরকারি ঠেসে ঠেসে মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

পথে আসতে আসতে ওদের ছেলে এবং বউদের মৃত্যু হয়েছে। মাত্র কিছুক্ষণ আগে দিঘির ধারে তাদের মৃতদেহগুলো পোড়ানো হয়েছে। আগুন নিভে গেলেও প্রিয়জনদের পুড়ে যাওয়া দেহগুলোর ভস্ম এখনও সেখানে পড়ে আছে। পুত্রশোক এবং স্ত্রীদের হারানোর তীব্র যাতনা একধারে সরিয়ে কেউ যে এইভাবে খেতে পারে, কে জানত।

পাশ থেকে আসলাম বলল, 'কীভাবে ওরা খাচ্ছে, দেখছ?'

'দেখছি তো—' বিনোদ বলল, 'করোনা ভাইরাস আর লকডাউনের সময়ে আরও কতকিছু যে দেখব। চল—'

ফের তারা হাঁটতে শুরু করল।

॥ সাত ॥

জঙ্গলের সরু পথটা পেছনে ফেলে বিনোদরা কাচ্চিতে পৌঁছে গেল। পূর্ণিমাপক্ষ শেষ হতে চলেছে। কৃষ্ণপক্ষ শুরু হতে আর ক'দিনই বা বাকি। বিনোদের হঠাৎ মনে পড়ল কাল গিরিরাজজির ট্রাকে বসে আকাশে ক্ষীয়মাণ চাঁদ দেখতে দেখতে মজা নদীর ধার দিয়ে এসে ফসল কাটা ধুধু ফাঁকা মাঠের ভেতর দিয়ে বহুকালের প্রাচীন এক জঙ্গলে চলে এসেছিল। সেই জঙ্গলেই রাতটা কেটে যায়। তখন কোথায় চাঁদ আর কোথায়ই বা আকাশভরা তারা। আজ কিছুক্ষণ আগে ফের নতুন একটা রাত শুরু হয়েছে। আকাশে তেমনই ক্ষীণ চাঁদ আর লক্ষ কোটি জ্বলজ্বলে তারা। চাঁদের আলোর সঙ্গে কুয়াশা মিলেমিশে সমস্ত চরাচর ঝাপসা ঝাপসা।

কাচ্চিটার ওপর দিয়ে ডানপাশের বাঁকটা ঘুরে বিনোদরা কথা বলতে বলতে চলেছে। কোথাও মানুষজন নেই। রাস্তার দু'পাশে ঝোপঝাড়, তারপর বিশাল মাঠ, সেগুলো চাষের জমি কি না বোঝা যাচ্ছে না। রাতটা একেবারে ঝিম মেরে আছে। ঝোপঝাড়ে ঝিঁঝিদের অবিরাম ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

আসলাম বলল, 'আমাদের দু'জনের কাছে যা যা খাবার ছিল, এমনকী রাতে খাবে বলে তোমার জন্যে যে ভাত রেখে দিয়েছিলাম, সবই বিপিনদের দেওয়া হল। শুনেছি, গান্ধীজি মাঝে মাঝে উপোস করতেন। উপোসকে কী যেন একটা বলা হয়?'

'অনশন।'

'হ্যাঁ, আজ রাত্তিরটা আমাদের অনশনে কাটাতে হবে, তাই তো?'

করোনা আর লকডাউন দেশের যা হাল করেছে, একটা রাত্তির কেন, কত দিন কত রাত্তির যে আমাদের ভুখা কাটাতে হবে, কে জানে।' বলে একটু ভেবে শুরু করল বিনোদ, 'করোনা বিপিনদের কোন অবস্থায় ফেলেছে, নিজের চোখেই তো দেখে এলে। আমরা এই যে চলেছি পথে আমাদের কী হতে পারে, তা কি জানি। বিপিনদের ছেলে আর বউ দুটোর মতো আমাদের অনেকেরই হয়তো আর বাড়ি ফেরা হবে না। ওদের তবু চিতা সাজিয়ে পোড়ানো গেছে। আমার জন্যে কেউ চিতা সাজাবে না, তোমার জন্যেও কেউ মাটি খুঁড়বে না। রাস্তার ধারে পড়ে থাকব। তারপর শিয়াল আর শকুনেরা দুটো মরা মানুষকে নিয়ে ভোজ লাগিয়ে দেবে।'

'না না, এসব বোলো না।' আসলামের গলা শুনে মনে হয় তার খুব অস্বস্তি হচ্ছে।

বিনোদ লঘু সুরে বলল, 'ভয় পেলে নাকি? আরে বাবা, করোনা নিয়ে সারাক্ষণ মানুষ সিঁটিয়ে থাকে। আমি শুধু একটু মজা করলাম।' সে হাসতে লাগল।

'এরকম মজা ভালো লাগে না।' আসলাম বলল, 'বাড়িতে বউ ছেলেমেয়ে আছে। আমার জন্যে মাটি খুঁড়লে তাদের কী হবে? তারা যে একেবারে ভেসে যাবে।' তার গলার স্বরটা ভারী হয়ে উঠল।

চকিতে গোপার মুখটা চোখের সামনে অদৃশ্য কোনও পর্দায় ফুটে উঠল। চোখ-ধাঁধানো সুন্দরী সে নয়। কিন্তু তার পিঠ ছাপানো মেঘের মতো চুলে, তুলিতে-আঁকা ভুরুতে, টোল-পড়া গালে, চিবুকে, ঘন পালকে ঘেরা টানা টানা চোখের নরম চাউনিতে আশ্চর্য এক মায়া যেন ছড়িয়ে আছে। তার দিকে তাকালে মন ভালো হয়ে যায়।

আমি পেরেছি।
ক্যান্সার থেকে মুক্ত হয়ে আজ আমি সুস্থ।

সব সময়।

HOPE
NCRI

বাড়িতে যে প্রিয়জনেরা রয়েছে তাদের সঙ্গে সম্পর্কটা স্রেফ দেওয়া-নেওয়ার। সাহানপুর থেকে মাসের পর মাস সে শুধু টাকাই পাঠিয়েছে। সম্পর্কটা এর বাইরে তেমন কিছু নয়।

কিন্তু গোপা? পাঁচ বছর সে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

'এত কী ভাবছ?'

আসলামের গলা কানে আসতে ভাবনাটা ছিঁড়েখুঁড়ে গেল। গোপার মুখটা এখন আর চোখের সামনে নেই। একটু চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গীর দিকে তাকাল বিনোদ। বলল, 'কই কিচ্ছু না তো।'

আসলাম বিশ্বাস করল কিনা কে জানে। বিনোদের দিকে চোখ রেখে সামনের দিকে পা ফেলতে লাগল।

গোপার মুখটা ফের বিনোদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। মেজদার বিয়ের দিন সে যখন বরযাত্রী হয়ে মেজো বউদিদের বাড়ি যায় সেই প্রথম গোপাকে দেখে। তখন কত আর বয়স। পনেরো কি ষোলো। সদ্য তরুণী। বিনোদের আঠারো উনিশ।

দশ-পনেরোটি তরুণী এক ঝাঁক রঙিন পাখির মতো যেন উড়ে বেড়াচ্ছিল। তাদের অবিরল কলকলানিতে সারা বিয়েবাড়ি মেতে উঠেছে। ওই ঝাঁকের মধ্যেই ছিল গোপা। অন্যদের মতো সে উদ্দাম নয়। তার চোখেমুখে শান্ত মায়াবী হাসি। মেজো বউদিদের বাড়িটা দোতলা। বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য সামনের ফাঁকা জায়গায় ডেকোরেটরকে দিয়ে প্যান্ডেল তোলা হয়েছিল।

মেয়েদের সেই ঝাঁকটা কলর কলর করতে করতে এই হয়তো প্যান্ডেলে, পরক্ষণে বাড়িতে ঢুকে সটান দোতলা এবং একতলায় পাক খেয়ে ফের প্যান্ডেলে— এমনটাই করে বেড়াচ্ছিল। গোপা যেখানেই যাক, সারাক্ষণ বিনোদের চোখ তার পিছু নিয়েছে।

বিয়েবাড়িতেই মেজো বউদি গোপার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। গোপা তার খুড়তুতো বোন। তাদের পাশের বাড়িটা গোপাদের।

বউভাতের দিন মেজো বউদির বাপের বাড়ি থেকে যে নতুন আত্মীয়দের আসার কথা তাদের মধ্যে একজনের জন্য উদগ্রীব হয়েছিল বিনোদ। সেই বিশেষ একজন গোপা। তার সঙ্গে সেদিন আলাপটা আরেকটু ঘন হল।

গোপা তখন ক্লাস ইলেভেনে পড়ছে। এক বছর বাদেই হায়ার সেকেন্ডারি।

এদিকে পলিটেকনিকে দু'বছরের একটা কোর্স করে ডিপ্লোমা নিয়ে বেরিয়েছে বিনোদ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তারাতলার একটা কারখানায় চাকরি জুটে গেল। পাকা চাকরি নয়। ছ'মাসের মেয়াদে তাকে নেওয়া হয়েছে। তার কাজকর্ম পছন্দ হলে মেয়াদটা বাড়ানো হবে। আপাতত মন্দের ভালো।

চোখের পলকে কয়েকটা বছর কেটে গেল। এরমধ্যে গ্র্যাজুয়েশনের পর বিএড করে বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা স্কুলে চাকরি পেয়ে গেল গোপা। বাসে যাতায়াত করতে হয়। যেতে এক ঘণ্টা, ফিরতে এক ঘণ্টা।

ওদিকে বিনোদ পাকাপাকি কিছু জোটাতে পারছিল না। কোথাও ছ'মাস, কোথাও দশ মাস, কোথাও এক কি দেড় বছর— এইভাবে এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে ভেসে বেড়াচ্ছিল। তারপর হঠাৎই সাহানপুরের চাকরিটা পেয়ে যায়। ভালো মাইনে, ভালো বোনাস, তাছাড়া ওভারটাইম।

সাহানপুরে যাবার দিন গোপা বলেছিল, 'আমি অপেক্ষা করে থাকব।'

মাসে তিনটে চিঠি লিখত গোপা। প্রতিটি চিঠির শেষ লাইনটা ছিল এইরকম, 'তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি।' ছুটিছাটায় বাড়ি গেলে অনিবার্যভাবেই গোপার সঙ্গে দেখা হতো। তার মুখে সেই একই কথা।

মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যায়, একটি মেয়ে অপেক্ষা করেই থাকে। মজা করেও নিজের মৃত্যুর কথা মুখে আনা যাবে না। বিনোদকে বেঁচে থাকতেই হবে। হঠাৎ নিঝুম চরাচরের অসীম স্তব্ধতাকে চিরে ফেড়ে সে চেঁচিয়ে উঠল 'করোনা কিছুই করতে পারবে না। বাঁচবই, বাঁচবই, বাঁচবই।'

শেষ শব্দটা এত জোর দিয়ে বিনোদ তিনবার বলল যে আসলাম চমকে উঠল। সেই সঙ্গে অবাকও। বিনোদের দিকে চোখ রেখে সে হাঁটতে লাগল, কিন্তু কিছু বলল না।

বিনোদ সঙ্গীকে লক্ষ করেনি। পা ফেলতে ফেলতে বলতে লাগল, 'জানো আসলাম, আমার দাদু মানে মায়ের বাবা অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি আসতেন। হাসিখুশি, আমুদে মানুষ। কথায় কথায় তাঁর মজা। তিনি আমাদের বাড়িতে পা দেওয়া মাত্র আমরা ভাইবোনেরা তাঁকে ছেঁকে ধরতাম। আমাদের সামনে বসিয়ে কতরকমের গল্প যে করতেন। একবার কী বলেছিলেন জানো?'

'কী বলেছিলেন?' আসলাম উৎসুক হল।

'অনেকদিন আগের কথা, তখন আমার তো নয়ই, আমার দাদাদেরও জন্ম হয়নি, এমনকী আমার বাবার নাকি হামাগুড়ি দেবার বয়েস। দাদু তখন যুবক। সেই সময় আজকের এই করোনা হানার মতো ম্যালেরিয়ার জ্বরে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছিল। এখন যে রোগটা করোনা ভাইরাসে হচ্ছে, ম্যালেরিয়াটা হচ্ছিল মশার কামড়ে। তখনও সেই রোগটার ওষুধ বেরয়নি। মানুষ মশার কামড় খেয়ে খেয়ে বেঘোরে মরে যাচ্ছে। দাদু বলেছিলেন, 'মরে গেলেই হল! বিকেল হলেই অনেকে হাতে দস্তানা, মাথায় মাঙ্কিক্যাপ, হাঁটু অবধি মোজা, লম্বা হাতাওয়ালা জামা— এসব পরে ঘরে ঢুকে দরজা জানলা বন্ধ করে দিত। মেয়েরা অবশ্য বাঁদুড়ে টুপিটা পরত না। আঁচল কি ছোট চাদর দিয়ে মাথা মুখ যতটা পারে ঢেকে রাখত। তারপর তিন-চারটে ধুনুচিতে ধুনো জ্বালিয়ে দেওয়া হতো। বিকেলের আগে যত মশা ঘরে ঢুকত, ধূপের ঘন ধোঁয়ায় দিশেহারার মতো পাক খেতে খেতে ভবলীলা সাঙ্গ করত। ঘরের একটি মানুষের গায়েও হুল ফুটিয়ে ম্যালেরিয়ার বিষ ঢোকাতে পারেনি। দাদু বলেছিলেন, ম্যালেরিয়ার মহামারী কাটিয়ে তিনি বেঁচে আছেন। শুধু ম্যালেরিয়াই নয়, বাংলা তেরোশো পঞ্চাশ সালে সারা বাংলা জুড়ে দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ পোকামাকড়ের মতো মরে গিয়েছিল। দাদুদের অবস্থা ভালো ছিল না। সেই দুর্ভিক্ষের দিনগুলোতে বাজার থেকে চাল উধাও। কালো বাজারে যা-ও পাওয়া যায় তা ধরাছোঁয়ার বাইরে। বেশিরভাগ দিনই আধপেটা ছাতু বা মুড়ি খেয়ে কোনও কোনও দিন উপোস দিয়ে কাটাতে হতো। দাদু বলেছিলেন, দুর্ভিক্ষের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোও পার হয়ে তিনি দিব্যি বেঁচে আছেন।'

একটানা বলতে বলতে হাঁপিয়ে পড়েছিল বিনোদ। কিছুক্ষণ জোরে জোরে শ্বাস টানার পর ফের শুরু করল, 'দাদু যদি ম্যালেরিয়া আর দুর্ভিক্ষের মতো মহামারী কাটিয়ে বেঁচে থাকতে পারেন, আমিও এই করোনার ধাক্কা সামলে বেঁচে থাকব।'

আসলাম তাকে লক্ষ করছিল। বলল, 'আমার আব্বুর মুখেও শুনেছিলাম ম্যালেরিয়া আর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল শুধু আমাদের বাংলায়। কিন্তু করোনা ছড়িয়ে পড়েছে সারা দুনিয়ায়। ম্যালেরিয়া দুর্ভিক্ষের চেয়েও এটা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। সাহানপুরে ধনিয়ানাথ সিং-এর বাড়িতে মাঝে মাঝে যেতাম। সে ওখানকারই লোক। একসঙ্গে কাজ করতাম। খুব ভালো মানুষ। ধনিয়ার সঙ্গে দোস্তি হয়ে গিয়েছিল। ওদের বাড়িতে টিভি আছে। আমি গেলেই সেটা চালিয়ে দিত। টিভির খবরে শুনেছি, চীন, আমেরিকা, ইতালি— এমন সব দেশে করোনায় শ'য়ে শ'য়ে মানুষ মরছে। আমাদের দেশেও সেটা এসে পড়েছে। করোনা কি আমাদের ছাড়বে ভেবেছ? করোনা আমাদের রুটি রুজি সাবাড় করেছে। ঘর-সংসার ছেলেমেয়ে নিয়ে কীভাবে যে বেঁচে থাকব! করোনা আমাদের সবাইকে খতম করে ছাড়বে।'

'কেন এত ভয় পাচ্ছ? বাড়ি ফিরে ঠান্ডা মাথায় ভাবো, রোজগারের একটা দিশা ঠিকই পেয়ে যাবে। আর করোনা? ডাক্তারবাবুরা যেমন যেমন বলেছেন সেভাবে সাবধানে চললে সেটা ঠেকানো যাবে। এত ভয় পেলে চলে?' এই নিঝুম নিশীথে ক্রমশ আরও বেশি করে আশাবাদী হয়ে উঠতে লাগল বিনোদ।

আসলাম উত্তর দিল না। বিনোদ যতই তার মিইয়ে পড়া উৎসাহ বা উদ্যমকে উসকে দিতে চাক না বাড়ি ফিরে এই চরম দুঃসময়ে এত সংকটের মধ্যে নিজেদের ঘর-সংসার আদৌ বাঁচিয়ে রাখতে পারবে কি না সে সম্বন্ধে একটা ধন্দ থেকেই গেছে। ধন্দ না বলে ভয় বলাই ঠিক।

এরপর অনেকক্ষণ নীরবতা। মেটে রাস্তায় দু'জোড়া পায়ের হালকা আওয়াজ আর ঝিঁঝিঁদের ক্লান্তিহীন ডাকাডাকি ছাড়া অন্য কোনও শব্দ নেই। জনশূন্য প্রান্তরে এত রাতে ঝিঁঝিঁরাই একমাত্র জীবিত প্রাণী যারা বিনোদদের অনবরত সঙ্গ দিয়ে চলেছে। তাদের সান্নিধ্য বেশ ভালোই লাগছে।

একসময় আসলাম বলল, 'আমাদের সঙ্গে যারা ছিল তাদের তো এই পথ দিয়ে আসার কথা। কিন্তু দু'ধারে ফাঁকা মাঠ, ঝোপঝাড় ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা কিছু গাছ ছাড়া আর কিছুই তো চোখে পড়ছে না। পা খুব টাটাচ্ছে। তারা সব গেল কোথায়? আর কত হাঁটব।'

বিনোদ বলল, 'আমাদের কারও কাছেই ঘড়ি নেই। দিনটা যখন ফুরিয়ে আসছে সেই সময় জঙ্গলে ঢুকে গাছের শুকনো ডাল কেটে, মড়াটড়া পুড়িয়ে মালপত্তর নিয়ে হেঁটেই চলেছি। ক'ঘণ্টা পার হয়েছে আন্দাজ করতে পারো?'

একটু ভেবে আসলাম জবাব দিল, 'মনে হচ্ছে সাড়ে পাঁচ থেকে ছ'ঘণ্টা।'

বিনোদ বলল, 'তোমার আন্দাজটা মোটামুটি ঠিক। তার মানে এখন রাত এগারোটা কি সাড়ে এগারোটা। আমরা যখন জঙ্গলে বিপিনদের কাছে, রামবনবাসজিরা হাঁটতে শুরু করেছিল। প্রায় ঘণ্টা ছয়েক ওরা হেঁটেছে। আর আমরা? জঙ্গলে কাঠ কেটে তিনটে মড়া পোড়াতে পোড়াতে কমসে কম ঘণ্টা চারেক লেগেছে। তারপর দু'ঘণ্টা হাঁটছি। ছ'ঘণ্টায় ওরা কতদূর চলে গেছে ভেবে দেখো ওদের কাছাকাছি পৌঁছতে আমাদের আরও অনেকটা হাঁটতে হবে।' মুখে মুখে অঙ্ক কষে সে বুঝিয়ে দিল।

আসলাম যেন ধন্দে পড়ে গেল। বলল, 'ওরা কোথায়, কতদূরে যেতে পারে? এই রাস্তাটা ছেড়ে অন্য কোনও দিকে

চলে যায়নি তো?’
‘মনে হচ্ছে না।’
‘কেন?’
‘এতটা পথ যে এলাম, এই কাচ্চিটার গা থেকে ডাইনে বা বাঁয়ে অন্য কোনও পথ বেরিয়ে যেতে দেখেছ কি?’
‘না।’ আস্তে মাথা নাড়ল আসলাম।
‘তাই যদি হয়, রাস্তার এপাশে ওপাশের ফাঁকা মাঠে নেমে নিশ্চয়ই ওরা অন্য কোথাও চলে যায়নি, এই পথটা ধরেই হাঁটতে হাঁটতে গেছে।’ বিনোদ বেশ জোর দিয়ে বলল।
‘হ্যাঁ, তাই তো—’ আসলাম বলতে লাগল, ‘এই ব্যাপারটা আমার মাথায় আসেনি। আহাম্মকের মতো কী না কী ভেবেছি।’
‘এবার বুদ্ধিমানের মতো চোখ-কান বুজে ভাবতে থাকো।’
আরও কতক্ষণ পর, দুই বা আড়াই ঘণ্টা, কারও খেয়াল নেই, আকাশে চাঁদ আর তারাগুলো জেল্লা হারিয়ে আরও বেশি ফিকে হয়ে গেছে, হঠাৎ বিনোদের চোখে পড়ল কাচ্চির বাঁদিকে বেশ কিছুটা দূরে অনেকখানি এলাকাজুড়ে ভূতুড়ে চেহারার কী সব দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলোর তলায় কিছু যেন পড়েও রয়েছে। এই মধ্যরাতে অন্ধকার আর কুয়াশা এত গাঢ় যে তা ভেদ করে নজর অত দূরে পৌঁছতে পারছে না। বিনোদ দাঁড়িয়ে পড়ল। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কিছু দেখতে পাচ্ছ?’
আসলামও থেমে গিয়েছিল। বিনোদের আঙুল বরাবর কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, ‘বুঝতে পারছি না। সব খুব ঝাপসা। মনে হচ্ছে কিছু থাকলেও থাকতে পারে।’
একটু চিন্তা করে বিনোদ বলল, ‘আমাদের তো ওখান দিয়েই যেতে হবে। চলো। কী আছে না আছে, দেখাই যাক।’
দু’জনে সেদিকে চোখ রেখে ফের হাঁটতে শুরু করল। চারপাশের অন্য সব জায়গা থেকে যেখানটা অনেক বেশি ঝাপসা, মিনিট পনেরো কুড়ির মধ্যে তারা সেখানে পৌঁছে গেল। চারপাশ এখন মোটামুটি স্পষ্ট।
মেটে রাস্তাটা প্রায় তিন-চার ফুট উঁচুতে বাঁপাশে তার তলায় ডালপালাওয়ালা অজস্র গাছ। কী গাছ বোঝা যাচ্ছে না। তবে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখানে ওখানে গাছগুলোর তলায় চাদরটাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে প্রচুর মানুষ। তাদের শিয়রের কাছে ঝোলাঝুলি, চামড়া বা টিনের স্যুটকেস।
‘যাক বাবা, এতক্ষণে ওদের পাওয়া গেছে।’ বিনোদের চোখেমুখে অন্ধকারেও আলো খেলে গেল। জোরে নিঃশ্বাস ফেলল সে, স্বস্তির নিঃশ্বাস।
আসলামের মনে একটা ধন্দ দেখা দিয়েছে। সে বলল, ‘কারও মুখ তো দেখতে পাচ্ছি না। আমরা যাদের খুঁজছি ওরা যে তারাই, কী করে বুঝব? টিভির খবরে শুনেছি দেশের নানা রাজ্য থেকে অনেক মজুর বাংলা, বিহার ওড়িশায় ফিরে যাচ্ছে। তাদের একটা দল হয়তো এদিকে চলে এসেছে।’
বিনোদ কয়েক লহমা একদৃষ্টে আসলামের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, ‘কাল সকালে যখন ওদের ঘুম ভাঙবে মুখ থেকে চাদরও সরে যাবে, তখন মিলিয়ে নিও আমি যা বলেছি তা ঠিক কিনা।’
‘কিন্তু—’ আসলামের ধন্দটা পুরোপুরি কাটছে না।
বিনোদ তার মুখ থেকে চোখ সরায়নি। বলল, ‘তোমার কথামতো ধরা যাক এরা অন্য একটা দল যাদের কারওকে চিনি না। কিন্তু কাল বিকেলে ট্রাকে ওঠার পর থেকে, ওই যে পাথরের রাস্তা, খোয়ার রাস্তা ঠিকঠাক করার জন্যে কী যেন চলে, ও হ্যাঁ, রোড রোলার, সারাক্ষণ আমাদের ওপর দিয়ে তাই চলেছে। আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না, মনের জোরে এতটা পথ হেঁটে এসেছি। যারা গাছগুলোর তলায় ঘুমোচ্ছে তারা চেনা হোক বা অচেনা, ওদের মধ্যেই বাকি রাতটা কাটিয়ে দেবো। ঘুমটা বড্ড দরকার। চল, চল—’
আসলাম এবার আপত্তি করল না। চুপচাপ রাস্তা থেকে নীচে নেমে ঘুমন্ত মানুষগুলোর পাশ দিয়ে দিয়ে একটা ফাঁকা গাছতলায় চলে এল। হাত আর কাঁধ থেকে চটপট লটবহর নামিয়ে ক্ষিপ্র হাতে বিছানার মোড়কটা খুলে শতরঞ্চি, চাদর আর হাওয়া-বালিশ বের করে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল।
এই সব অঞ্চল থেকে শীত বিদায় নিয়েছে বেশিদিন হয়নি। এখন বসন্ত। কিন্তু শীতের আমেজ এখনও থেকে গেছে। দিনের বেলায় ঝলমলে রোদের উষ্ণতা গায়ে মেখে বেশ আরামেই কেটে যায়। কিন্তু সন্ধেটি যেই হল, হিম পড়তে শুরু করল। বাতাস বেশ ঠান্ডা, শীতকালের মতো কনকনে না হলেও গায়ে দাঁত নখ বসায়।
বিনোদ চাদর বা কম্বল চাপা দিয়ে শুতে পারে না, দম আটকে আসে। সে গলা অবধি একটা সুতির চাদর টেনে দিয়েছে।
পাশের বিছানাটা আসলামের। আগাপাশতলা পুরু কম্বল মুড়ি দিয়ে সে শুয়ে পড়েছে। ঠান্ডা আছে ঠিকই, তবে তা এত তীব্র নয় যে কম্বল দরকার। আসলাম নিশ্চয়ই শীতকাতুরে।
শরীরময় অনন্ত ক্লান্তি, বিছানায় গা ঢেলে দেওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু অল্প বয়স থেকেই বিনোদের অভ্যাসটা অন্যরকম। যত ক্লান্তই হোক, শুলেই তার দু’চোখ জুড়ে ঘুম নেমে আসে না। কত রকমের চিন্তা যে এই সময় নানা দিক থেকে তার মাথায় ঢুকে যেতে থাকে। এই যেমন এখন সে ভাবছে, কীভাবে কোন পথ ধরে গেলে কত কম সময়ে বাড়ি ফিরতে পারবে। নতুন কোনও চিন্তা নয়। ট্রাকে ওঠার পর থেকে অজস্রবার এটা ভেবেছে। পরমুহূর্তে ঘন অন্ধকার আর নিবিড় কুয়াশার মধ্যেও গোপার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। লকডাউনে তাদের কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। রোজগারহীন, বেকার এক যুবকের পক্ষে বিয়ের কথা ভাবাটা নেহাতই ধৃষ্টতা। আকাশকুসুমের দিকে হাত বাড়ানোর মতো পাগলামো। কীভাবে সে গোপার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। বাড়ি ফিরে তাকে একটা কাজকর্ম জোগাড় করতেই হবে। এটাও তার পুরনো ভাবনা। না, গোপাও বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। বিপিন আর হারান দেখা দিল। ছেলে এবং বউদের দাহ করার পর জঙ্গলে এই মাঝরাতে তারা কী করছে? না, এই চিন্তাটাও তেমন দানা বাঁধল না।
আচমকা স্তব্ধ নিশুতিকে খান খান করে একপাল শিয়াল ডেকে উঠল। বাতাসে সেই শব্দটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই নিদ্রাভঙ্গের কারণে বেজায় বিরক্ত হয়ে এক দঙ্গল কুকুর গলার আওয়াজ অনেক উঁচুতে তুলে শাসাতে শাসাতে শিয়ালের দলটাকে তাড়া করে কোন দিকে নিয়ে গেল, এত রাতে তা জানার উপায় নেই।
আন্দাজ করা যাচ্ছে শিয়ালগুলো ভয়ে পালাচ্ছে কিন্তু পালাতে পালাতেও পালটা জবাব দিচ্ছে।
শিয়ালের ডাক আর কুকুরদের গজরানি থামছেই না।
চিন্তাগুলো এলোমেলোভাবে একের পর এক যখন বিনোদের মাথায় হানা দিচ্ছে, সে টের পাচ্ছিল ঘুম ঘুম লাগছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়েই পড়ত। কিন্তু শিয়াল-কুকুরদের চিল্লাচিল্লিতে ঘুমের দফারফা।

মেজাজ খিঁচড়ে যাচ্ছিল বিনোদের। হঠাৎ মাথায় ঝিলিকের মতো কিছু খেলে গেল। শিয়াল না হয় বনে-জঙ্গলে থাকে, কিন্তু হিংস্র বুনো ছাড়া অন্য সমস্ত কুকুর থাকে গ্রামেগঞ্জে, যেখানে যেখানে মানুষজন থাকে সেইসব এলাকায়।

বিনোদ কান খাড়া করে রইল। প্রথমটা মনে হচ্ছিল শিয়াল-কুকুরের চিৎকারটা অনেক দূর থেকে আসছে। এখন শিয়ালের চেঁচানি থেমে গেছে। কিন্তু কুকুরগুলোর গজরানি কমেনি। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তারা কাছাকাছি কোথাও আছে। তার মানে এখানেই কোনও জনবসতি রয়েছে।

কাল বিকেল থেকে আজ এতটা রাত অবধি না চোখে পড়েছে কোনও গ্রাম, না একজন মানুষ। বিনোদ ঠিক করে ফেলল, রাত পোহালেই আসলামকে সঙ্গে নিয়ে কাছের লোকালয়টায় চলে যাবে। ট্রাকে ওঠার পর দেড় দিনে তাদের প্রায় সবারই খাবারদাবার ফুরিয়ে গেছে, কারও কারও ঝুলিতে অল্প কিছু পড়ে থাকতে পারে। এখানেই তো তাদের যাত্রা শেষ হচ্ছে না। আরও কত হাজার কিলোমিটার হাঁটতে হবে, কে জানে। খিদের দহন নিয়ে কত কিলোমিটার হাঁটা সম্ভব। তাই সবার আগে এতগুলো মানুষের জন্য খাদ্যবস্তু জোগাড়ের ব্যবস্থা করতে হবে। হঠাৎ নকুল মাইতিকে মনে পড়ে গেল। ভীষণ সংকটের মধ্যে রয়েছে। তাঁর স্ত্রী খুবই রুগ্ন। লক্ষণ দেখে মনে হতেই পারে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত। অবশ্য আগাগোড়া মেডিকেল টেস্ট না করে এমন একটা ধারণা করা ঠিক তো নয়ই, খুব অন্যায়। ওদের তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। তাদের জন্য যে দুধ নিয়ে আসা হয়েছিল দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে দিতে তা ফুরিয়ে গেছে। এই বাচ্চাগুলোর জন্য দুধও জোগাড় করতে হবে। যদি সেখানে ডাক্তারখানা বা হাসপাতাল থাকে, নকুলের স্ত্রীকে দেখিয়ে নেওয়া যাবে। তাছাড়া নিজেদের রাজ্যে ফেরার পথের সন্ধানও পাওয়া যেতে পারে।

রাতটা ফুরিয়ে আসছে। আর কতক্ষণই বা বাকি। খুব বেশি হলে ঘণ্টা তিনেক। রাত পোহালে অনেক কাজ, তুমুল ব্যস্ততা। বাকি সময়টুকু ঘুমিয়ে নেওয়া খুব জরুরি। ঘুম টনিকের কাজ করে। ধীরে ধীরে বিনোদের দু'চোখ জুড়ে এল।

॥ আট ॥

বসন্তকালের উষ্ণ নরম রোদ চোখে এসে পড়ায় ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ মেলে প্রথমে বাঁপাশে তাকাল বিনোদ। কম্বলের তলায় এখনও অদৃশ্য হয়ে আছে আসলাম। মিহি মোটা নানারকম আওয়াজ করে তার নাক ডেকেই চলেছে। সহজে থামবে বলে মনে হয় না।

হাতের ভর দিয়ে উঠে বসল বিনোদ। চারপাশের গাছতলায় বেশিরভাগই চাদরটাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। বসন্তের শীত-জড়ানো উষ্ণ রোদ বড় আরামের। চাদর-কম্বলের তলা থেকে অনেকে বেরুতে চাইছে না। কেউ কেউ জেগে উঠে বিছানায় বসে আড়মোড়া ভাঙছে। সবই চেনা মুখ।

আসলামের ধন্দ ছিল তাদের সঙ্গীরা মেটে রাস্তাটা ছেড়ে অন্য কোনও দিকে চলে গেছে। কিন্তু বিনোদের অনুমানই ঠিক। কাচ্চির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিশ্চয়ই রাত থেমে গিয়েছিল। ভারী বোকার মতো ক্লান্ত শরীর টানতে টানতে হাঁটার মতো পায়ের জোর তাদের সঙ্গীদের ফুরিয়ে এসেছিল। পথের ধারে এত গাছটাছ দেখে তারা সেগুলোর তলায় বিছানা পেতে শুয়ে পড়েছে। একটা গোটা রাত, এবং পরের দিন দুপুর অবধি একটানা ট্রাকের ঝাঁকুনি, তারপর অবিরাম হাঁটতে থাকা, এসবের কারণে ওদের হাত-পা-কোমর-পিঠ-কাঁধের যা হাল হয়েছে, ঘুম কখন ভাঙবে, কে জানে।

বেলা বাড়ছে। সূর্য হামাগুড়ি দিতে দিতে আকাশের গা বেয়ে বেশ খানিকটা ওপরে উঠে এসেছে। রোদের তাত আস্তে আস্তে বাড়ছে। বাতাসে এখনও হালকা হালকা হিম। কিন্তু কতক্ষণ আর। কিছুক্ষণ আগে অন্ধকার উধাও হয়েছে, তবে একটু আধটু কুয়াশা এখনও থেকে গেছে। কাছাকাছি নয়, অনেক দূরে বনজঙ্গলকে ফিনফিনে মলিদার মতো জড়িয়ে রয়েছে।

না, শুয়ে শুয়ে আর সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না। আজ প্রচুর কাজ। বিনোদ নিশ্চিত কাল কুকুরের দঙ্গলটা গজরাতে গজরাতে নিঝুম নিশুতিকে খান খান করে শিয়ালের পালকে যেখানে ধাওয়া করছিল সেখানে গ্রাম হোক বা ছোটখাট কোনও শহর রয়েছে। লোকালয় যেমনই হোক, এই অঞ্চলের মানুষজনকে তাদের একান্ত প্রয়োজন।

না, এখন শুয়ে শুয়ে সময় নষ্ট করাটা ঠিক হবে না। হাতের ভর দিয়ে উঠে বসল বিনোদ। বাঁদিকে তাকাতেই চোখে পড়ল কম্বলের তলায় নড়াচড়া করছে আসলাম।

বিনোদ ডাকল, 'এই উঠে পড়ো—'

এক ডাকে কাজ হল না। বারকয়েক ডাকাডাকির পর গা থেকে কম্বল নামিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসল আসলাম।

বিনোদ এধারে ওধারে তাকাচ্ছিল। কাল রাতেই চোখে পড়েছিল এখানে অনেকটা এলাকা জুড়ে অজস্র গাছ। তারপর ডানদিক দিয়ে যে একটা খাল চলে গেছে গভীর রাতের অন্ধকারে দেখা যায়নি। শুধু অন্ধকারই তো নয়, গাঢ় কুয়াশাও ছিল। নজর অত দূরে পৌঁছবে কী করে?

'আর বসতে হবে না। ওই যে ডানদিকে খালটা দেখা যাচ্ছে, ওখানে মুখ ধুয়ে আমার সঙ্গে চল—' বিনোদ তাড়া দিতে লাগল।

'এই সকালবেলায় কোথায় যাব তোমার সঙ্গে!' আসলাম অবাক।

'কাল মাঝরাত্তির পার হয়ে গেছে তখন, একপাল কুকুর এমন চেঁচাচ্ছিল যে কানের পর্দা ফেটে যাবার অবস্থা। তোমার কানে কি সেই আওয়াজটা ঢুকেছিল?'

'কই, না তো—'

'না ঢুকবারই কথা। কুকুরের চিল্লানিতে কতটুকু আর আওয়াজ হয়। তোমার যা ঘুম, একসঙ্গে দশ-বিশটা বাজ পড়লেও ভাঙত না।'

আসলাম হতভম্বের মতো কয়েক লহমা তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'তোমার কী হয়েছে বল তো। দুনিয়ায় কত কিছু থাকতে— কুকুর নিয়ে পড়লে যে—'

'কারণ কাল অনেক রাতে দুনিয়া যখন মড়ার মতো বেঁহুশ হয়ে ঘুমোচ্ছে, একপাল কুকুর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে একটা শহর বা গ্রামের হদিশ দিয়েছে।'

'মানে?'

'অত মানে টানের দরকার নেই। বেলা চড়ে যাচ্ছে। চটপট বিছানা থেকে উঠে পড়। ওই যে খালটা দেখছ, ওখানে গিয়ে মুখটুখ ধুয়ে আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে—'

মাতৃভাষা ভুলে গিয়েই বোধহয় ধন্দ-ধরা মানুষের মতো আসলাম হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, 'বহোত তাজ্জবকি বাত। কাঁহা যায়েগা তুমহারে সাথ?'

'এখন আর একটা কথাও নয়। গেলেই দেখতে পাবে।'

কী পাগলের পাল্লাতেই না পড়া গেছে, হয়তো এরকমই কিছু ভাবল আসলাম। টুঁ শব্দটিও আর না করে চুপচাপ উঠে বিনোদের সঙ্গে হাঁটতে লাগল কিন্তু খাল পর্যন্ত পৌঁছনো গেল না।

এরমধ্যে চারপাশের গাছগুলোর তলায় যারা ঘুমোচ্ছিল তারা সবাই জেগে উঠেছে। বিনোদ আসলামের কানের কাছে মুখ এনে নিচু গলায় ফিস ফিস করল, 'কী, এরা সব চেনা মানুষ তো? দেখ ভালো করে এদের সঙ্গে কাল ট্রাকে উঠেছিলে কিনা—'

জবাব না দিয়ে আসলাম শুধু একটু হাসল।

এদিকে হইচই শুরু হয়ে গিয়েছিল। এধার ওধার থেকে হিন্দি বাংলা আর ওড়িয়াতে সবাই জানতে চাইছে, 'কাল বিকেলে জঙ্গলে কারা যেন 'বচাও, বচাও' বলে চিৎকার করছিল। তাই শুনে তোমরা দু'জনে ওখানে চলে গিয়েছিলে। আমরা বারণ করেছিলাম, শোনোনি। কী হয়েছিল জঙ্গলে? কারা ছিল ওই লোকগুলো?'

সবার অফুরন্ত কৌতূহল। এখন তা মেটানো সম্ভব নয়। বিনোদ জানাল, সে সব বলতে অনেক সময় লাগবে। পরে শোনাবে। সঙ্গীরা তাতেই রাজি হল। কিন্তু বিনোদদের এত সহজে ছাড়ল না। জানতে চাইল জঙ্গল থেকে কাল কখন তারা এখানে এসেছে?

বিনোদ জানিয়ে দিল, অনেক রাতে গাছতলায় সবাই যখন ঘুমোচ্ছিল, সেই সময়। আরও জানাল এখন আর দাঁড়িয়ে নষ্ট করার মতো সময় নেই।

ভিড়ের ভেতর থেকে অনেকেই জানতে চাইল, কীসের এত তাড়া?'

বিনোদ জানাল, আশপাশে কোথাও লোকালয় আছে। সে আর আসলাম সেখানে যাবে। কোন উদ্দেশ্যে যাওয়া তাও জানিয়ে দিল।

তুমুল হুলুস্থুল শুরু হয়ে গেল। কেউ বিনোদদের ছাড়বে না, সবাই তাদের সঙ্গে যাবে। বিনোদ অনেক বোঝাল, গ্রাম বা শহর যা-ই থাক, সেখান থেকে খাবারদাবার এবং অন্য জরুরি খবর নিয়ে তারা কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসবে। কিন্তু কেউ রাজি হল না। সবাই নিজেদের দাবিতে অনড়। বিনোদদের সঙ্গে তারা যাবেই যাবে।

এতগুলো মানুষের দাবি মেনে নিতেই হল। তাড়াহুড়ো করে সবাই নিজেদের মালপত্র ঘাড়ে মাথায় চাপিয়ে নিল। বিনোদরাও দূরের গাছতলা থেকে তাদের ব্যাগ-বাক্স-বিছানাটিছানা নিয়ে এল। তারপর নতুন যাত্রা শুরু হল।

॥ নয় ॥

মেটে রাস্তাটা দিয়ে দু'শো পঁচিশ জনের সেই দলটা সোজাসুজি এগিয়ে চলেছে। তাদের অনন্ত আশা যেখানে যাচ্ছে সেখানে পৌঁছলেই খাদ্য, তৃষ্ণার জল এবং নিজের নিজের রাজ্যে ফিরে যাবার দিশা পেয়ে যাবে।

এই বিশাল জনতাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার কথা বিনোদের। তাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। সে ভাবতে চেষ্টা করছে কাল কুকুরগুলো ঠিক কোথায় চিৎকার করছিল। এই কাঁচা সড়কটার কোনদিকে? ডানদিকে না বাঁদিকে। অনেকক্ষণ ভাবনা-চিন্তার পর সে মনে মনে দিক নির্ণয় করে ফেলল। কাল গাছতলায় শুয়ে শুয়ে মনে হচ্ছিল কুকুরের ডাক আসছে কোনাকুনি বাঁদিক থেকে। কাচ্চি দিয়ে যেতে যেতে মনে হচ্ছে

কোনাকুনি নয়, সোজা বাঁদিকেই হবে। আর কতদূর গিয়ে কাচ্চি থেকে বাঁপাশে নামতে হবে বোঝা যাচ্ছে না। খুব সম্ভব সামনের দিকে আরও খানিকটা যেতে হবে, তার পর বাঁপাশে নেমে কতদূর গেলে গ্রাম বা শহরের দেখা পাওয়া যাবে, আন্দাজ করা যাচ্ছে না।

হাঁটতে হাঁটতে কী ভেবে পেছন ফিরে তাকাল বিনোদ। কাঁচা রাস্তাটা বেশ প্রশস্ত। পাশাপাশি চার-পাঁচজন হাঁটলে কারও অসুবিধা হয় না। সেইভাবেই তার সঙ্গীরা কাতার দিয়ে আসছে। সবাইকেই দেখা যাচ্ছে, শুধু একটা ফ্যামিলি বাদ। সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার দেখাদেখি বাকিরা।

বিনোদ জিজ্ঞেস করল, 'নকুল মাইতিদের তো দেখছি না। তারা কোথায়?'

তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বুধিলাল যাদব, আসলাম, ফটিক, সিরাজ আর গোবিন্দ। তারা বলল, 'নকুলের বউকে করোনায় ধরেছে। কেউ ওদের সঙ্গে নিতে চাইছিল না, ভাগিয়ে দিয়েছে।'

বিনোদ চমকে উঠল, 'কী বলছ তোমরা! কোথায় তাদের ফেলে রেখে এসেছ? নকুলের বউয়ের যে করোনা হয়েছে জানলে কী করে? তোমরা কি ডাক্তার?'

বুধিলাল বলল, 'নকুলের ঘরবালি বহোত খাসছিল (কাশছিল), শ্বাসের কষ্ট ভি হচ্ছিল।'

'কাশি আর শ্বাসকষ্ট দেখেই বুঝে ফেললে করোনায় ধরেছে। লোকের সর্দি-কাশি হয় না?'

'হয়। লেকিন নকুলের ঘরবালি জরুর করোনাকা মারিচ। ওহি আওরত সাথ সাথ রহেনেসে জরুর করোনা সব কোইকো পাকড় লেঙ্গে! ইসি লিয়ে নকুল, উসকা ঘরবালি, লেড়কা, লেড়কিকো সাথ নেহি লায়া।' খুব জোর দিয়ে বলল বুধিলাল। তার কথায় চারপাশের সবাই সায় দিল।

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল বিনোদের। নিজের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের বাঁচাবার জন্য তার কাছে দৌড়ে এসেছিল নকুল মাইতি, কিন্তু তাদের বাঁচানো গেল না। বুধিলালরা এই দীর্ঘ পথের কোথায় কতদূরে তাদের ফেলে রেখে এসেছে, কে জানে। সে বলল, 'তোমাদের একবার মনে হল না রোগা স্ত্রী আর তিনটে ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে নিয়ে নকুল কী করবে, কীভাবে তাদের বাঁচাবে?'

ফটিক বলল, 'দেখো ভাই, নিজেদের বাঁচাতে হবে তো। করোনা যে কত খতরনাক সবাই জানে। চার-পাঁচজনের জন্যে দু'শোর বেশি মানুষ মরে যাবে, তাই কখনও হয়?'

বিনোদদের ঠিক পেছনেই ছিল রামবনবাস দুবে। সে বলল, 'ম্যায় বোলা, অ্যায়সা করনা ঠিক নেহি। নকুল আউর উসকা ফেমিলিকো হামারে সাথ লে লো।' আরও জানাল, সে বলেছিল, কারও গায়ে যাতে ছোঁয়া না লাগে তাই খুব হুঁশিয়ার হয়ে ওরা দূরে দূরে থাকবে। কিন্তু তার কথা কেউ কানেও তোলেনি।

বিনোদও নকুলদের সকলের ছোঁয়া বাঁচিয়ে দূরে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছিল কিন্তু কয়েক ঘণ্টার জন্য জঙ্গলে চলে যাওয়ায় অঘটনটা ঘটে গেছে। সে থাকলে নকুলদের রাস্তার ধারে ফেলে আসতে দিত না।

করোনা ভাইরাস বিশ্বজুড়ে মহামারীই নিয়ে আসেনি, মানুষকে নির্মম অমানুষও করে তুলেছে। একবার নিজের সঙ্গীদের দিকে তাকাল সে। একটা অদ্ভুত চিন্তা তার মাথায় এল। কয়েকদিন আগে টিভিতে একজন ডাক্তারকে সে হুঁশিয়ারি দিতে শুনেছিল। তিনি বলেছিলেন, জ্বর-কাশি, শ্বাসকষ্ট, কারও এই ধরনের লক্ষণ দেখা দিলেই সে যে করোনা ভাইরাসের রোগী, জোর দিয়ে বলা যায় না। অনেক সময় যাকে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে, জ্বর কাশিটাশি নেই, করোনা ভাইরাস তার শরীরেও ঘাঁটি গেড়ে থাকতে পারে। পরে ওইসব লক্ষণ দেখা দেয়।

বিনোদ ভাবল, কাশছে না, শ্বাসকষ্টে হাঁপাচ্ছে না, তার সঙ্গীদের মধ্যে এমন কেউ কি নেই যার শরীরে করোনা ভাইরাস ঢুকে আছে। তাই যদি হয় নকুল মাইতিদের সঙ্গে আরও অনেককেই তো বিসর্জন দেওয়া উচিত।

আসলাম বলল, 'কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবে? বেলা কিন্তু চড়ে যাচ্ছে।'

বাকি সবাইও তাড়া দিল, 'চলো, চলো—'

অন্যমনস্কতা কেটে গেল বিনোদের। ব্যস্তভাবে সে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাচ্ছি।'

ফের পথচলা শুরু হল। বেশিক্ষণ নয়, একটা বাঁকের মুখে আসতেই বিনোদের মনে হল, কাল রাত্তিরে কুকুরগুলো এখানেই কোথাও তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল। বাঁদিকেই হবে। রাস্তার এধারে ওধারে ধানখেত। কাল একটা মজা নদীর পাশ দিয়ে ধুধু ধানখেতগুলোর কাছে চলে এসেছিল তারা। সেগুলোর মতোই এই সব খেতের নাড়া পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পড়ে আছে ছাইয়ের স্তূপ। ধানখেতগুলোর ভেতর দিয়ে একটা ঘাসে ঢাকা পথ সোজা চলে গেছে। কাচ্চি থেকে বিনোদ ওই পথটায় নেমে গেল। সঙ্গীরা থেমে গিয়েছিল। অনেকে জিজ্ঞেস করল, 'ইয়ে তো ফসলকা জমিন। কাঁহা যাতে হ্যায়?'

বিনোদ সংক্ষেপে জবাব দিল, 'আউর কুছ নেহি পুছনা, আও মেরা সাথ।'

কেউ আর কোনও প্রশ্ন করল না। কী ভেবে সবাই ঘাসের রাস্তাটায় নেমে এল।

মিনিট পনেরো-কুড়ি হাঁটার পর গাছপালার আড়ালে বেশ কিছু একতলা, দোতলা এবং টিনের চালের বাড়ি চোখে পড়ল। বিনোদরা যত এগচ্ছে, সংখ্যাটা বাড়ছে। শুধু তাই নয়, বিশাল এলাকা জুড়ে এই লোকালয়। গেঁয়ো মেটে ছাড়াও পিচের রাস্তাও দেখা যাচ্ছে। এটা ঠিক গ্রামও নয়, আবার শহরও বলা যাবে না। গ্রাম-শহর মিলিয়ে এক জনপদ।

আরও কিছুটা এগতেই অনেক মানুষের গলা কানে এল। সেই সঙ্গে কুকুরের ডাকও। তবে কুকুর বা মানুষ, কারওকেই দেখা যাচ্ছে না।

বিনোদ নিশ্চিত কাল রাত্তিরে কুকুরগুলো এখানেই শিয়ালের পালকে তাদের খাসতালুকে আসতে দেখে গজরাতে গজরাতে এলাকাছাড়া করেছিল। শুয়ে শুয়ে সেই শব্দই সে শুনেছে। তবে আজ কুকুরদের গলায় তেমন গজরানি নেই। আদর করলে তারা যেমন হালকা গরর গরর আওয়াজ করে অনেকটা সেইরকম।

দু'চার মিনিট পরেই কুকুরগুলো হঠাৎ চারদিক তটস্থ করে একসঙ্গে গর্জে উঠল। পরক্ষণে চোখে পড়ল গ্রাম-শহর মেশানো ওই লোকালয়টা থেকে তারা ছুটে আসছে। এই প্রাণীগুলোর ঘ্রাণশক্তি যে খুবই প্রবল, বিনোদ জানে। ওরা নিশ্চয়ই এই এলাকায় তাদের মতো অচেনা অনুপ্রবেশকারীদের গন্ধ পেয়েছে। কুকুরদের দৌড়তে দেখে তাদের পিছু পিছু হট্টাকট্টা চেহারার পঁচিশ-তিরিশ জনের একটা দঙ্গল চলে এসেছে।

বিনোদ আর তার সঙ্গীরা ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে থেমে গেল।

কুকুরগুলো একটানা চেঁচাতে থাকলেও বিনোদদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি। কিছুটা দূর থেকে অচেনা আগন্তুকদের ভাবগতিক লক্ষ করছিল।

লোকগুলো গলার স্বর অনেক উঁচুতে তুলে শাসানির সুরে সমানে বলতে লাগল, 'কৌন হো তুমলোগন? কাঁহাসে আয়া? মতলব ক্যায়া তুমহারে—'

বিনোদ, রামবনবাস দুবে এবং আরও কয়েকজন হাতজোড় করে খুব নরম গলায় বলল, 'কোই বুরা মতলব নেহি। কিরপা করকে সব কুছ শুনিয়ে—'

কিন্তু ওরা কোনও কিছুই শুনতে চায় না। গলা আরও চড়িয়ে দেয়, 'ঝামেলা মাত করনা। হটো ইঁহাসে, হটো—'

অনেক কাকুতি-মিনতির পর জনতা সামান্য নরম হল। বলল, 'ঠিক হ্যায়, বোলো—'

দেশের কোন অঞ্চল থেকে কেন, কীভাবে কী নিদারুণ দুর্গতির মধ্যে ট্রাকের গাদানো ভিড়ে, পরে হাঁটতে হাঁটতে এতদূর চলে এসেছে তার মর্মান্তিক বিবরণ শুনিয়ে বিনোদ এবং রামবনবাসরা বলতে লাগল, 'অব কিরপা করকে শুনিয়ে—'

এখন আর পঁচিশ-তিরিশ জন নয়, এরমধ্যে আরও দেড়-দু'শো জন চলে এসে জনতার সংখ্যাটা অনেক বাড়িয়ে দিয়ে তুমুল হুলস্থুল বাধিয়ে দিল। 'শুননেকা কোই জরুরত নেহি। সাহানপুরসে জরুর তুমলোগন করোনা লেকে আয়া। ভাগো— ভাগো— ভাগো—'

'বিনতি করতা হ্যায়, খানেকা কুছ নেহি, পিনেকা পানি নেহি, বচ্চেলোগনকো লিয়ে দুধ নেহি। হামলোগন ভিখ নেহি মাঙতা। পাইসা দেকে খরিদ করলেঙ্গে—'

বিপুল জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। — 'নেহি, নেহি কুছ নেহি মিলেগা। হটো, হটো—'

বিনোদরা বলেই চলেছে, 'সোচিয়ে হামলোগনকা ক্যায় হাল। কিরপা (কৃপা) করকে—'

'নেহি, নেহি—' জনতা এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। হাতের সামনে যে যা পাচ্ছে, ভাঙা ইটের টুকরো, খোয়া, মাটির ডেলা, গাছের শুকনো ডাল, সব কিছু তুলে নিয়ে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর দিকে ছুঁড়তে লাগল।

বিনোদদের পক্ষে আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। কারও মাথায়, কারও বুকে, কারও কাঁধে সেইসব খোয়াটোয়া এসে লাগছে। রক্তারক্তি কাণ্ড। ভয়ে আতঙ্কে সবাই ঘাসের পথ ছেড়ে ফসল-কাটা জমির ওপর দিয়ে পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে কাচ্চির দিকে পালাতে লাগল। এদের কারও কপাল, কারও থুতনি, কারও বা কনুই ফেটে রক্ত ঝরছে।

সামনের দু'তিনটে সারিতে যারা ছিল তাদেরই বেশি চোট লেগেছে। যারা পেছন দিকে ছিল বেঁচে গেছে, পাথর টাথর এতদূর পৌঁছয়নি।

প্রথম সারির রামবনবাস, আসলাম, ফটিক, বিনোদরা বেশ জখম হয়েছে। রামবনবাসের মাথার ডানপাশে পাথর লেগেছে। ওই দিকটা ফুলে উঠেছে, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে। বিনোদের থুতনিটা ঢিবির মতো ফোলা, অল্প অল্প রক্ত চুঁইয়ে আসছে। আসলামের কাঁধটা খোয়া বা ইটের ঘায়ে রক্তাক্ত না হলেও ওখানকার হাড় খুব সম্ভব থেঁতো হয়ে গেছে।

সবাই কাচ্চিতে পালিয়ে এসেছে। দূরে সেই হিংস্র জনতা

এখনও দাঁড়িয়ে আছে। সেই কুকুরের দলটা এক লহমার জন্যও থামছে না। সাহানপুর থেকে যারা এসেছে তারা যে এই তল্লাটে আদৌ বাঞ্ছনীয় নয় তা তাদের পাশের দাঁড়িয়ে থাকা জনতার ভাবগতিক লক্ষ করে সমানে চেঁচিয়ে চলেছে। বোঝাই যাচ্ছে যতক্ষণ না বিনোদরা এই এলাকা ছাড়ছে, কুকুর বা জনতা এক চুলও নড়বে না।

॥ দশ ॥

চলাচলের মতো খানিকটা জায়গা ফাঁকা রেখে বিনোদরা সবাই রাস্তার বাকি অংশ জুড়ে বসে পড়েছে। কাল বিকেল থেকে তাদের হাঁটা শুরু হয়েছিল। মাঝখানে গাছতলায় শুয়ে কয়েক ঘণ্টা ঘুম। তারপর আজ ভোর হতে না হতেই ফের পথ চলা, চলতেই থাকা। খাদ্য নেই, তৃষ্ণার জল নেই। খিদেয় তেষ্টায় সবার শরীর ভেঙে আসছে। আদিঅন্তহীন মেটে রাস্তাটার ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর গলা থেকে গোঙানির মতো আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। যাদের মাথায় বুকে, থুতনিতে কাঁধে ইট-পাথর লেগেছে, রক্ত মুছতে মুছতে মাঝে মাঝেই তারা যন্ত্রণায় উঃ আঃ করে উঠছে।

নকুল মাইতিরাই শুধু নয়, আরও কয়েকজন তাদের ছেলেমেয়ে বউ সঙ্গে নিয়ে সাহানপুর থেকে বাড়ি ফিরছে। এদের মধ্যে তিনজনের কয়েকটা বাচ্চা খিদেয় একটানা কান্না জুড়ে দিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, সাহানপুর থেকে যেটুকু গোরু বা মোষের দুধ নিয়ে তারা গিরিরাজজির ট্রাকে উঠেছিল সব ফুরিয়ে গেছে। একটি ফোঁটাও আর পড়ে নেই। এই বাচ্চাগুলোর মায়েদের চেহারা এতই শীর্ণ, শুকনো যে নিজের সন্তানদের রক্ষা করার মতো এক বিন্দু দুধও তাদের বুকে নেই।

মা আর বাপেরা পিঠে বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে শান্ত করতে চাইছে। কিন্তু বাচ্চাগুলোর থামার কোনও লক্ষণই নেই। মা-বাপদের কোলে তারা আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে তাদের হিক্কা উঠছে।

বাচ্চাগুলোর এত কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না। বিনোদ ওদের মা-বাবাদের সকলকেই চেনে। এদের একজন হল রমেশ জানা। পূর্ব মেদিনীপুরে রমেশদের বাড়ি। বাকি দু'জন হুগলি জেলার গণেশ হালদার আর বর্ধমানের নিমাই কর্মকার। কয়েক বছর আগে প্রায় একই সময়ে সাহানপুরে এসেছিল। তবে তাদের কাজ আলাদা, আলাদা, কোম্পানিও এক নয়। মাঝে মাঝেই রাস্তায় বাজারে বা সিনেমা হলে দেখা হতো। হেসে হেসে দু'চারটে কথা, তারপর যে যার পথে।

বিনোদের থুতনিটা খোয়ার ঘায়ে থেঁতলে গিয়ে প্রচুর রক্ত পড়েছিল। আসলাম খুব সাবধানি, দূরে কোথাও গেলে ডেটল, তুলো, জ্বরজারি, পেটখারাপের ট্যাবলেট, এসব তার সঙ্গে থাকবেই থাকবে। এই মুহূর্তে বিনোদের কাছে বসে আছে সে। ডেটল বার করে তুলো ভিজিয়ে বিনোদের থুতনিতে চেপে চেপে ধরে রক্ত বন্ধ করছে। তবে জায়গাটা বেশ ফুলে রয়েছে।

আসলাম জিজ্ঞেস করল, 'তোমার টাটানি কি কমেছে?'

রমেশ, নিমাইদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল বিনোদ। অন্যমনস্কের মতো বলল, 'নার্সদের মতো অনেক সেবা করেছ। এবার আমাকে উঠতে দাও।'

'উঠে কী করবে?'

'ওই বাচ্চাগুলোকে দেখ, কীরকম কাঁদছে। কিছু একটা না করলেই নয়।'

'এখন উঠতে হবে না। আগে একটা ব্যথার ট্যাবলেট খাও। যেখানে চোট লেগেছে সেখানে ব্যান্ড-এড তো লাগাই।'

'ওসব পরে করলেও চলবে। আমাকে ছাড়ো।'

ছাড়াছাড়ির ব্যাপারই নেই। একরকম জোরজার করেই বিনোদকে ট্যাবলেট খাইয়ে ব্যান্ড-এড সেঁটে আসলাম হাসতে হাসতে বলল, 'এই ছাড়লাম। খাবার, জল, দুধ এসব কিনতেই তো ওই গাঁ না শহরের মতো জায়গাটায় গিয়েছিলাম। কী জুটল? আমরা এতগুলো মানুষ জখম হয়ে ফিরলাম। বাচ্চাগুলোর জন্য কোথায় দুধ পাবে? কীভাবে ওদের খিদে মেটাবে?'

অদ্ভুত চোখে আসলামের দিকে তাকিয়ে রইল বিনোদ। সাহানপুরে তাকে হয়তো দু'চারবার দেখেছে। দেখলেও মনে করে রাখেনি। ট্রাকে আসতে আসতেই তার সঙ্গে আলাপ। পুরোপুরি অচেনা, অনাত্মীয়, ধর্মও আলাদা, এমন একটি মানুষ মাত্র দেড় দিনের মধ্যে তাকে কতটা আপন করে নিয়েছে, ভাবতেও অবাক লাগছে। কত যত্ন করেই না সে তার ক্ষত'র রক্ত বন্ধ করে ওষুধ খাওয়াল। এমন শুশ্রূষা মা ছাড়া আর কি কখনও কেউ করেছে, আকাশ-পাতাল হাতড়েও তেমন কারও সন্ধান পাওয়া গেল না।

আসলাম জিজ্ঞেস করল, 'অমন করে তাকিয়ে আছ যে?'

'তোমাকে দেখছি।'

'আমাকে আর দেখতে হবে না। বাচ্চাগুলোর জন্য যা করার করো।'

'তা তো করবই। আমাদের মধ্যে আরও অনেকে খুব জখম হয়েছে। তাদেরও ওষুধটষুধ দেওয়া খুব দরকার।'

'কারও কথাই ভুলে যাইনি। ওষুধের থালাটা নিয়ে এবার ওদের কাছে যাব।'

দু'জনেই উঠে পড়ল। মারাত্মক আঘাত নিয়ে যারা এধারে-ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, আসলাম তাদের খোঁজে চলে গেল। বিনোদ অবশ্য কোথাও গেল না। ডানপাশে বাঁপাশে তাকাতে তাকাতে জোরে জোরে বলতে লাগল, 'বাচ্চাগুলো সেই কখন থেকে কাঁদছে। যাদের কাছে বেশি দুধ আছে, ওদের মা-বাবাদের যেটুকু পারেন দয়া করে দিন। নইলে ওই ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো বাঁচবে না।' শুধু বাংলাতেই না, হিন্দিতেও বার বার বলতে লাগল।

ডানপাশে খানিকটা দূরে যারা বসেছিল তাদের ভেতর থেকে তিন-চারজন উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে তাদের স্ত্রীরা। এরা হল মুর্শিদাবাদের রহিম, নদীয়ার আব্বাস, মালদার বিশ্বনাথ আর বিহারের জগনাথ। সবাইকে চেনে বিনোদ, তবে ওদের স্ত্রীদের নাম জানে না।

রহিম, আব্বাস, জগনাথরা হাত তুলে বলল, চিন্তা কোরো না বিনোদ। বাচ্চাগুলোকে আমরা দেখছি।' স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে তারা রমেশ নিমাইদের কাছে চলে গেল। দূরে থাকার জন্য ওদের সঙ্গে রহিমদের কী কথাবার্তা হল শুনতে না পেলেও মোটামুটি আন্দাজ করতে পারল বিনোদ।

একটু পরেই রহিম আব্বাসদের স্ত্রীরা নিমাই রমেশদের বাচ্চাগুলোকে কোলে নিয়ে সড়কের ওধারে কয়েকটা বড় গাছের আড়ালে গিয়ে বসল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে যখন তারা ফিরে এসে ছেলেমেয়েগুলোকে তাদের মায়েদের কোলে ফিরিয়ে দিল, বাচ্চাদের কান্নাকাটি থেমে গেছে। পরিতৃপ্ত শিশুদের মুখে শুধুই হাসি। কোন মন্ত্রবলে ক্ষুধার্ত বাচ্চাদের মুখে হাসি ফোটানো যায় মায়েরাই শুধু জানে।

স্ত্রীদের আগের জায়গায় পাঠিয়ে দিয়ে রহিমরা বিনোদের

কাছে চলে এল। একা বিনোদই নয়, সেখানে আরও অনেকেই রয়েছে।

কাঁচা সড়কের বাঁদিকে অনেক দূরে ফসল-কাটা ধানখেতগুলোর ওধারে লাঠিডাণ্ডা নিয়ে সেই হিংস্র জনতা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। পাশে ইট পাথরের টুকরো আর শক্ত মাটির ঢেলার স্তূপ। তাছাড়া কুকুরের পাল তো রয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে রহিম বলল, 'ওখানে গিয়ে তো চিঁড়ে, মুড়ি, রুটি বাচ্চাদের দুধ কিছুই জোটানো গেল না। আমাদের মধ্যে কয়েকজন জখম হয়ে ফিরে এল। আমরা যদি আবার যাই, হাতিয়ার নিয়ে তাই দাঁড়িয়ে আছে। কিছুতেই কাছে ঘেঁষতে দেবে না। এখন আমাদের কী হবে? খাবার জল দুধ, এসব না পাওয়া গেলে করোনার আর দরকার হবে না, উপোস দিয়েই মরতে হবে। কিছু একটা ব্যবস্থা তোমরা কর।'

বিনোদ বলল, 'একা কি কেউ কিছু করতে পারে। সবাইকে এককাট্টা হয়ে চেষ্টা করতে হবে।'

রামবনবাসও কিছুক্ষণ আগে যেখান থেকে তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে সেদিকটা দেখিয়ে বলতে লাগল, 'বহুত ভরোসা নিয়ে ওখানে গিয়েছিলাম। লেকিন ওহি ভুচ্চরকা ছোরারা ইনসান নেহি, খতারনাক জানবার।' দূর লোকালয়ের নির্মম নিষ্ঠুর বাসিন্দাদের সম্পর্কে ক্ষোভ, ঘৃণা ক্রোধ উগরে দিতে দিতে বলেই চলেছে 'উধার ফির যানেসে কুছ ভি ফায়দা নেহি। ফির যানেসে ওহি শয়তানকা ছোরা লোগন ইটা পাত্থর ফেকেঙ্গে, কুত্তা ভোকেঙ্গে। লেকিন—' বাকিটা শেষ না করে সে থেমে গেল।

ওই লোকালয় থেকে খালি হাতে ফিরে এসে সবাই ভীষণ মুষড়ে পড়েছে। যারা ইট-পাথরের আঘাতে খুব বেশি জখম হয়েছে, কাতর শব্দ ছাড়া তাদের গলা থেকে আর কোনও আওয়াজ বেরচ্ছে না। প্রায় সবার চোখে-মুখে অনন্ত হতাশা। দু-চারজন বাদে সকলেই ধরে নিয়েছে, কারও আর বাড়ি ফেরা হবে না। দু'পাশের জনশূন্য, ফসলহীন ধুধু ধানখেতগুলোর মাঝখানে অচেনা অজানা এক মাটির সড়কে খিদেয় তেষ্টায় ধুঁকতে ধুঁকতে তাদের মৃত্যু অনিবার্য।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে নাড়তে বুধিলাল নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে চাপা গলায় বলতে লাগল, 'বহুত মুসিবত, বহুত মুসিবৎ—'

তার পাশে যারা বসে আছে তারা ঠিক শুনে ফেলেছে। একজন বলে উঠল, 'বিলকুল সহি বুধিয়া চাচা। নায় মিলেগা রোটি, নায় মিলেগা পানি। মর যায়েগা সব কোই, মর যায়েগা।' হামলোগনকা সাথীও কোই নেহি জিন্দা রহেঙ্গে—' লোকটার নাম ধনিয়া প্রসাদ। বিহারি।

অন্য এক বিহারী ভরোসালাল আঁতকে উঠল, 'অ্যায়সা মাত বোলো ভরোসা ভাইয়া। মওত মওত নায় বোলো।'

নকুল মাইতিদের বাদ দিলে সংখ্যাটা এখন দুশো একুশ। তাদের সবাই মৃত্যুভয়, আর চরম হতাশায় ভেঙে পড়েনি। যারা মনের জোরে এখনও বেঁচে থাকার ইচ্ছা এবং আশাকে মরে যেতে দেয়নি তাদের একজন রহিম। দূরের মারমুখী জনতার দিকে আঙুল বাড়িয়ে হিন্দি এবং বাংলা মিশিয়ে সে বলল, 'দুনিয়ার সবাই ওদের মতো জানবর হয়ে যায়নি। এই কাচ্চি দিয়ে যেতে যেতে জরুর গাঁও কি শহর পেয়ে যাব। সেই সব জায়গায় কি দিলওয়ালা আচ্ছে আদমি নেই? সবাই উপরবালার ওপর ভরসা রাখো।'

অদৃশ্য উপরওয়ালার নামেও কারওকে তেমন চনমনে হয়ে উঠতে দেখা গেল না।

এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল বিনোদ। এবার সে মুখ খুলল, 'দেখ ভাই, এই কাচ্চির ধারে দিনের পর দিন পড়ে থাকলেও রোটি ভাজি মিঠাই দিয়ে থালি সাজিয়ে কেউ আমাদের খাওয়াতে আসবে না। জানি লগভগ এক রোজ কারও পেটে কিছুই পড়েনি। হাল বহুত বুরা। হাত-পায়ের জোর ফুরিয়ে এসেছে। তব ভি কোসিস করনাই পড়েগা। আপনা আপনা সামান উঠাকে লো।'

কেউ আর আপত্তি করল না। মালপত্র কাঁধে মাথায় চাপিয়ে ফের যাত্রা শুরু হল।

কয়েক ঘণ্টা হাঁটার পর বিকেল ফুরিয়ে এল। সূর্যটাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। দিনের শেষ, নরম আলো এখনও রয়ে গেছে। আরও কিছুক্ষণ পর সন্ধে নামলেই অন্ধকারে ছেয়ে যাবে চারদিক। তার আগেই কালকের মতো ফিনফিনে কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে।

বিনোদ, রামবনবাস দুবে, রহিম, বুধিলাল, আসলাম এমন কয়েকজন খুবই চিন্তিত। তারা বলাবলি করছিল কাল অজস্র গাছের তলায় খাবারদাবার না জুটুক, এতগুলো মানুষ নির্বিঘ্নে ঘুমোতে পেরেছে। কিন্তু এতটা পথ হেঁটে আসার পরও না চোখে পড়েছে কোনও গ্রাম বা না মানুষজন। যেদিকে তাকানো যায়, আদিগন্ত রুক্ষ, কাঁকুরে মাটির উঁচুনিচু, ধুধু, ধূসর প্রান্তর। তার ওপর রাত কাটানো অসম্ভব কিন্তু ঝপ করে সন্ধে নেমে গেলে কী করবে তারা, এতগুলো ক্লান্ত ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য কোথায় বিঘ্নহীন, নিরাপদ আশ্রয় মিলবে? বিনোদ আসলাম রামবনবাসরা শুধু চিন্তিতই নয়, একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়েছে। তবে কি প্রান্তরের বুক চিরে যে মেটে পথটা দিয়ে তারা চলেছে, শেষ পর্যন্ত তার ওপরেই কী আজকের রাতটা কাটাতে হবে?

বিনোদ, সিরাজ, রামবনবাসরা সামনের দিকে ছিল। তাদের অনুসরণ করে যে ধ্বস্ত মানুষগুলো ধুঁকে ধুঁকে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে, তাদের ভেতর থেকে কারা যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই যে বাঁদিকে দেখ, বাঁয়ে-বাঁয়ে—'

তাদের গলা চিরে ফেড়ে মুর্হুমুহু আওয়াজটা বেরিয়ে আসতে লাগল।

বিনোদরা চমকে উঠে বাঁপাশে তাকাল। অনেক দূরে ঝাপসা ঝাপসা কিছু যেন দাঁড়িয়ে আছে। পেন্সিলের হালকা আঁচড়ের মতো। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

পেছন দিক থেকে সমানে তাড়া লাগানো হচ্ছে। 'নজর ঠিক রেখে ভালো করে দেখ। দেখ, দেখ—'

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বিনোদরা। তাদের চোখের পাতা পড়ছে না। কিছুক্ষণ পর ছবির মতো সবটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সারি সারি প্রচুর চালা ঘর দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সেগুলোর আশপাশে কোনও লোকজন চোখে পড়ছে না।

পেছন ফিরে অবাক বিস্ময়ে তাকাল বিনোদরা। আশ্চর্য, পিছু পিছু যারা আসছে তাদের হাত-পা কোমর পিঠ প্রায় ভেঙেচুরে দুমড়ে মুচড়ে গেছে কিন্তু চোখের জ্যোতি এখনও নিভে যায়নি। খিদেয় তেষ্টায় নুয়ে পড়ে তাদের মনে হচ্ছিল মওত অনিবার্য, সমস্ত উদ্যম ফুরিয়ে এসেছিল। কিন্তু সেই দুপুর থেকে হাঁটতে হাঁটতে বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছা বা তাগিদটা ফিরে এসেছে। বিনোদরা লক্ষ করেনি কিন্তু পেছনের সঙ্গীরা চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিরাপদ কোনও আশ্রয়ের খোঁজ করতে করতে ওই চালাঘরগুলো দেখতে পেয়েছে।

পেছন দিক থেকে কয়েকজন বিনোদদের কাছে চলে এল। আগে আলাপ পরিচয় না হলেও মুখগুলো বিনোদের মোটামুটি চেনা। সাহানপুরে এদের দেখেছে।

যারা এসেছে তাদের ভেতর থেকে একজন বলল, 'সন্ধে নামতে বেশি দেরি নেই। রাত্তিরে এখানকার উঁচুনিচু খোলা মাঠে পড়ে থাকলে ভীষণ কষ্ট হবে। খিদেয় সবারই পেট জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে। ওখানে গেলে রাতটা অন্তত শান্তিতে ঘুমিয়ে কাটানো যাবে।' সে হাত বাড়িয়ে দূরের চালাঘরগুলো দেখিয়ে দিল।

আরেকজন বলল, 'চালাঘর যখন আছে, মনে হয়, কাছাকাছি গ্রামও আছে, লোকজনেরও দেখা মিলবে।' দোকানপাটও নিশ্চয়ই রয়েছে। চিঁড়ে মুড়িটুড়ি জোগাড় করতেই হবে।'

তৃতীয়জন বলল, 'আজই তো অন্য একটা গাঁ কী শহরে গিয়েছিলাম কিন্তু ভেতরে ঢোকার আগেই সেখানকার লোকজন আমাদের কী হাল করে ছেড়েছে, এর মধ্যেই ভুলে গেলে?'

চতুর্থজন বলল, 'সব মানুষ একরকম, তাই কখনও হয় নাকি?'

সাব্যস্ত হল রাতটা চালাঘরে কাটিয়ে কাল সকালে চারপাশের জনবসতি যদি থাকে, সেই সব জায়গায় গিয়ে প্রথম কাজটি হবে, ছাতু, চিঁড়ে মুড়ি বিস্কুট লিট্টি, গাঠিয়া পাউরুটি যা যা পাওয়া যায় সব জোগাড় করবে। পথ চলার রসদ।

বিনোদ বলল, 'এখানে সন্ধে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি নেমে যায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর সময় নষ্ট করা যাবে না।'

দু'শো কুড়িজনের দলটা আবার লাইন দিয়ে চলতে শুরু করল।

॥ এগারো ॥

কাঁচা সড়কটা খানিকটা এগিয়ে দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে গেছে। ডান দিকেরটা খানিকটা গিয়ে একটা মস্ত ঢিবির কাছে থেমে গেছে। সেখানে এমন কোনও ফাঁকা জায়গা নেই যেখান দিয়ে সেটা আরও এগিয়ে যেতে পারে। অন্য অংশটা বাধাবন্ধহীন। বাঁপাশ দিয়ে সেটা অবাধে বহুদূর দিগন্তের দিকে চলে গেছে।

প্রায় ছ'সাত বিঘে, তারও বেশি হতে পারে জায়গা জুড়ে শ'দেড়েকের মতো চালাঘর গা ঘেঁষাঘেঁষি করে নয়, ছাড়া ছাড়া দাঁড়িয়ে আছে। চালাগুলোর কোনওটার মাথায় পুরনো খড়ের ছাউনি, কোনওটার মাথায় নতুন খড় চাপানো হয়েছে। চালাগুলোর পুব এবং দক্ষিণ দিকে অনেকটা করে খোলা চত্বর। একটু লক্ষ করলেই চোখে পড়বে দু'জায়গাতেই লালচে শুকনো মাটিতে বহু গৈয়া এবং ভৈসা গাড়ির চাকার দাগ ছাড়াও ম্যাটাডোর, সাইকেল রিকশা, ঠেলাগাড়ির চাকার ছাপও রয়েছে। চারপাশ মোটামুটি সাফসুতরো। কোথাও তেমন আবর্জনা চোখে পড়ে না।

এলাকাটা যে পোড়ো বা পরিত্যক্ত নয়, মানুষজনের এখানে যে নিয়মিত যাতায়াত আছে, খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন নেই। চারপাশে একটা চক্কর মারলেই তা আন্দাজ করা যায়।

বিনোদরা যখন সেখানে পৌঁছল, দিনের আলো একেবারে ফুরিয়ে যায়নি, খুব হালকা ছোপের মতো সুদূর আকাশ থেকে নীচের মাঠঘাট, গাছপালা, এমনকী এই চালাঘরগুলোর খড়ের ছাউনিতেও আলগাভাবে লেগে আছে।

সবাই ঘাড় মাথা থেকে লটবহর নামিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। এধারে ওধারে তাকাতে তাকাতে কথা বলছে। একটা পুরো রাত ট্রাকের ঝাঁকুনিতে এক লহমাও কেউ ঘুমোতে পারেনি। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটে এসে গাছের তলায় হা-ক্লান্ত শরীর ঢেলে দিয়ে কোনওরকমে রাত কাটানো। তার ওপর আজ দুপুরে একটা গাঁও কী টাউনের বর্বর জনতার হাতে চরম হেনস্তার পর এই নির্জন এলাকায় তারা পৌঁছেছে। না, আজকের রাতটা তাদের চলমান ট্রাকের গাদাগাদি ভিড়ে বা গাছতলার ঘাসের জমিতে শুয়ে কাটাতে হবে না। সারি সারি ঘরে, সে ঘর যেমনই হোক, শান্তিতে ঘুমোতে পারবে।

সমস্ত এলাকাটা থেকে গুঞ্জন উঠে আসছে। ট্রাকে ওঠার সময় থেকে প্রায় দুটো দিন দু'শোরও বেশি মানুষের চোখেমুখে প্রবল উৎকণ্ঠা, ভয় অনিশ্চয়তার গাঢ় কালো ছোপ পড়েছিল হঠাৎ তার সবটা না হলেও খানিকটা মুছে দিয়ে সামান্য হলেও স্বস্তি ফুটে উঠেছে।

রামবনবাস, বিনোদ, রহিম, আসলাম, বুধিলাল এমন কয়েকজন আলাদা আলাদা চালাঘরের তলায় তাদের মালপত্র রেখে এসে একধারে দাঁড়িয়ে আছে।

আসলাম বলছিল, 'ট্রাকের ঝাঁকুনি আর হাঁটাহাঁটিতে আমাদের হাত-পা-কোমর খসে খসে পড়ছে। দু'চার দিন এই চালাঘরগুলোতে কাটিয়ে খাবারদাবারের ব্যবস্থা করে আবার পথে নামব। জিরিয়ে নিতে পারলে শরীরে তাকত ফিরে আসবে।'

রামবনবাস তাকে লক্ষ করছিল। 'দো চার রোজ? জ্যাদাসে জ্যাদা আজকের রাত মুসাফির, কাল ফির সামান উঠাকে পাদল চলনা।' বেশ মজার সুরেই বলল সে।

আসলাম অবাক। জিজ্ঞেস করল, 'মতলব?'

'দেখো ভাইয়া, ইয়ে সব হামলোগকা রাজমহল নেহি, হাটিয়াকা ঝোপড়ি।'

বুধিলাল বাংলাটা মোটামুটি জানে। সে বলল, 'কবে কবে এখানে হাটিয়া বসে, জানি না। তব দুকান বালারা কাল নেহি তো পরশু জরুর চলে আসবে। তখুন এক মিনিটও আমাদের থাকতে দিবে না। বলবে, 'ভাগো ভাগো—' আরে ভাইয়া, হামলোগনকো বিলকুল রাহি বনা গিয়া। রাহি, রাহি আউর রাহি।' কব ঘর পঁহুছেঙ্গে ভগোয়ান রামজিই জানে।'

বুধিলাল আর রামবনবাস যা বলল তাতে মনটা খারাপ হয়ে গেল আসলামের। সে উত্তর দিল না।

সন্ধে নেমে গিয়েছিল। অন্ধকার এবং কুয়াশায় ছেয়ে যাচ্ছে চারদিক। আকাশে মিটমিটে তারা আর নির্জীব চাঁদ ছাড়া সমস্ত চরাচরে অন্য কোনও আলো নেই।

হাটের চালাগুলোর তলায় ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল। এখনও ঝাপসা ঝাপসা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু অন্ধকার এবং কুয়াশা আরও গাঢ় হলে কিছুই চোখে পড়বে না। তাই ক্ষিপ্র হাতে বিছানা পেতে কেউ কেউ তার ওপর বসে বসে কথা বলছে, অনেকেই শুয়ে পড়েছে।

বিনোদ আসলাম রামবনবাসরাও কাছাকাছি কয়েকটা চালার তলায় বিছানা পেতে শুয়ে শুয়ে সেই কঠিন সমস্যা দুটোর সুরাহা কীভাবে হবে, তাই নিয়ে কথা বলতে লাগল। এক নম্বর সমস্যা হল, কাল সকালে উঠে এতগুলো ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য কোথা থেকে খাবার এবং জল পাওয়া যাবে? দু'নম্বরটা হল কার বা কাদের কাছ থেকে বাড়ি ফেরার পথের দিশা মিলবে? কথায় কথায় বেশ রাত হয়ে গেল। আর বিনোদদের চোখগুলো ঘুমে জুড়ে আসতে লাগল।

॥ বারো ॥

বিনোদের ঘুমটা বরাবরই ঠুনকো, কোথাও একটু শব্দ হলেই ভেঙে যায়। হঠাৎ তার কানে এল খুব চাপা গলায় কারা যেন কাঁদছে। শব্দটা স্পষ্ট নয়। ঘুমের ঘোরে মনে হল হয়তো ভুল শুনেছে।

কিন্তু না, একটু পরেই আওয়াজটা জোরালো হল। কোনও ভুল নয়, ওটা কান্নারই শব্দ।

ঘোরটা এখনও পুরোপুরি কাটেনি।

ধীরে ধীরে চোখ মেলল বিনোদ। এখনও ঠিক ভোর হয়নি, তবে অন্ধকার আর কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। আবছা আবছা আলো ফুটতে শুরু করেছে।

শুয়ে শুয়েই বিনোদ এধারে-ওধারে তাকাতে লাগল। কাল সন্ধে নামার পর তার সঙ্গীরা হাটের চালাগুলোতে ঝপাঝপ বিছানা পেতে শুয়ে পড়েছিল। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। সেই ঘুম ভাঙার আদৌ কোনও লক্ষণ নেই। চারপাশে শ'খানেকেরও বেশি চালাঘরে দু'শোরও বেশি ঘুমন্ত মানুষ।

কান্নাটা চলছেই। কখনও চাপা, কখনও জোরালো। শব্দটা কোন দিক থেকে আসছে বোঝা যাচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ শোনার পর মনে হল মেয়ের গলা। একজন নয়, দু'জন একটা গলা ভারী, অন্যটা হালকা। নিশ্চয়ই একজন মাঝবয়সি, অন্যটির বয়স কুড়ির বেশি হবে না। এরা কারা? এই ভোরবেলায় সমস্ত চরাচর যখন গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে, কাকপক্ষীটি জেগে নেই, হঠাৎ কোত্থেকে এসে কান্নার জন্য কারা এই হাটটাকে কেন বেছে নিয়েছে?

বিনোদ আর শুয়ে থাকতে পারল না, আস্তে আস্তে হাতে ভর দিয়ে উঠে ধন্দ-ধরা মানুষের মতো বসে বসে কান্নার

শব্দটা শুনতে লাগল। একসময় তার মনে হল, দূর থেকে নয়, শব্দটা আসছে আশপাশের কোনও চালা থেকে। বেশ কিছুক্ষণ কী ভাবল সে, তারপর বিছানা থেকে উঠে পড়ল।

বিনোদ দিক নির্ণয় করে ফেলেছে। তার চালাটা থেকে কোনাকুনি ডান পাশে বেশ কিছুটা দূর থেকে আওয়াজটা আসছে। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল।

এরমধ্যে কুয়াশা আর অন্ধকার অনেক ফিকে হয়ে গেছে। বহু দূরের দিগন্তে সূর্যটা সবে মাথা তুলতে শুরু করেছে। এখন কোনও কিছুই আর আবছা আবছা নয়।

বিনোদ যে চালাটায় রাত কাটিয়েছে তার ডান পাশের চালাগুলো একদম ফাঁকা। একটা চালায় তিন-চারটে বেওয়ারিশ কুকুর বুকের ভেতর পা-গুলো গুটিয়ে নিয়ে ঘুমোচ্ছিল। পায়ের শব্দে চোখ মেলে নিরাসক্তভাবে কয়েক লহমা তাকিয়ে থেকে ভৌ ভৌ করে দু'চারবার হালকা ধমক দিয়ে ফের ঘুমিয়ে পড়ল।

কুকুরদের চালাটার পর আরও এগারোটা ফাঁকা চালা পেরিয়ে গেল বিনোদ। যা আন্দাজ করেছিল ঠিক তা-ই। সামনের দিকের একটা চালার পাশের চালাটার তলায় একটি মাঝবয়সি মহিলা এবং সতেরো-আঠারো বছরের একটি যুবতী বসে বসে কাঁদছে। মুখের আদল দেখে মনে হয় মা এবং মেয়ে। তাদের পাশে দু'টো বড় বড় পুঁটলি।

দু'জনের চোখ ফোলা ফোলা এবং টকটকে লাল। তারা যে অনেকক্ষণ কাঁদছে, চোখ দেখলেই বোঝা যায়। শুধু কান্নাই নয়, তাদের সারা শরীর জুড়ে অসীম ক্লান্তিরও ছাপ। মনে হয়, অনেক দূর থেকে তারা হাঁটতে হাঁটতে এখানে এসেছে।

বিনোদ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের লক্ষ করল। গিরিরাজজির ট্রাকের ভেতরে এবং ছাদে গাদাগাদি করে যে দু'শো পঁচিশজন সওয়ারি বাংলা বা বিহারের বর্ডারের দিকে রওনা হয়েছিল তাদের মধ্যে এরা ছিল না। মাঝবয়সিনী আর যুবতীটি অন্য কোথাও থেকে এসেছে।

বিনোদের খেয়াল হল বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট এদের কান্না শুনেছে, এখানে এসে আরও দশ-পনেরো মিনিট শুনল। ওদের মুখ-চোখ দেখে মনে হয় কান্নাটা শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকে। তখন সে হয়তো গভীর ঘুমে।

ভোররাতে, নাকি মাঝরাতে কিংবা আরও অনেক আগে তারা এই হাটে এসেছে? দেখে মনে হয় দেহাতি, সঙ্গে কোনও পুরুষ নেই। বিহার, উত্তরপ্রদেশের গ্রামের মেয়েরা, তাদের বয়স যেমনই হোক, বাবা, কাকা, বড় ভাই বা স্বামী এই ধরনের পুরুষসঙ্গী ছাড়া রাত্তিরে বেরয় না। তাহলে এরা কেন বেরিয়েছে? একটানা কান্নাটা ইঙ্গিত দিয়ে চলেছে ওরা নিশ্চয়ই কোনও বিপদে পড়েছে। কী ধরনের বিপদ?

বিনোদের মনে হাজারটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কী করবে সে? একবার ভাবল ফিরে যায়। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওধারের চালাগুলোতে তার সঙ্গীদের ঘুম ভাঙতে শুরু করেছে। আসলামরা হয়তো তাকে খোঁজাখুঁজি করছে। কিন্তু না, এতদূর এসে হুট করে ফিরে যাওয়া যায় না। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ওদের নজর এসে পড়ল তার ওপর।

মুহূর্তে কান্না থেমে গেল। দু'জনের চোখেমুখে এখন ভয় এবং আতঙ্ক। ওদের মনোভাবটা আঁচ করে নিল বিনোদ। খুব নরম গলায় বলল, 'ডরিয়ে মাত। মুঝে আপকে বেটা সমঝো।'

ভয় এবং আতঙ্ক তো কাটলই না, তার সঙ্গে যোগ হল তীব্র সন্দেহ আর অবিশ্বাস। কাঁপা কাঁপা গলায় মাঝবয়সিনী বলল, 'হামলোগন বহোত গরিব। হামারে পাশ জেবর নেহি, হাজারো লাখো রুপাইয়া নেহি।'

মনটা খারাপ হয়ে গেল বিনোদের। সে বলল, 'ম্যায় চোর, ডাকু, রাহাজান নেহি। হামারে কোই বুরা মতলব ভি নেহি। মেরা বাত শুনিয়ে—' নিজের পরিচয় দিয়ে কোথা থেকে, কী কারণে, কীভাবে কাদের সঙ্গে কখনও ট্রাকে, কখনও পায়ে হেঁটে কাল সন্ধের আগে আগে এই অজানা এলাকার অচেনা হাটটিতে এসে ভুখা সাথিদের সঙ্গে শুয়ে পড়েছিল। তারপর ভোররাতে আচমকা কান্নার আওয়াজ শুনে এখানে চলে এসেছে— এক নিশ্বাসে সব জানিয়ে দিল সে।

মাঝবয়সিনী এবং যুবতীটি পলকহীন বিনোদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখ-মুখ থেকে ভয় আর আতঙ্কের কালো ছায়াটা সরে সরে যাচ্ছে। বিনোদের বলার ভঙ্গিতে এমন এক অকপট সারল্য রয়েছে যে তারা খুব সম্ভব অবিশ্বাস করতে পারছে না। অচেনা এই যুবকটিকে কী বলবে, ভেবে পাচ্ছে না। শুধু একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

একটু চুপ করে থেকে বিনোদ জিজ্ঞেস করল, 'ক্যায়া হুয়া আপলোগনকা? ইতনা রোতে থি (এত কাঁদছিলেন)! কোই খতরা?'

মাঝবয়সিনী বারকয়েক বিনোদের পা থেকে মাথা অবধি দেখে নিল। হয়তো তার মনে হল, এই যুবকটিকে বিশ্বাস করা যায়। নামটা আগেই জেনেছে। দ্বিধা কাটিয়ে বলল, 'বৈঠো বিনোদ—'

কিছুটা দূরত্ব রেখে বসে পড়ল বিনোদ। অসীম কৌতূহল নিয়ে মাঝবয়সিনীকে লক্ষ করতে করতে বলল, 'বোলিয়ে মাইজি—'

মাঝবয়সিনী বলল, 'তুম ঠিকহি বোলা। হামলোগন ভারী খতরেমে হ্যায়—'

ওরা যে খুবই বিপন্ন, কান্না শুনে অনেক আগেই তা আন্দাজ করেছিল বিনোদ। কিন্তু বিপদটা কী ধরনের এবং কতটা ভয়ঙ্কর, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। উত্তর না দিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

যা বলার মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে মাঝবয়সিনী শুরু করল, 'দেখো বেটা, তুম মুঝে মাইজি বোলা। ম্যায় তুমকো বিশোয়াস করতি হ্যায়।'

'চিন্তা নায় করনা মাইজি। আপকো বিশোয়াস নেহি টুটেঙ্গে।'

মাঝবয়সিনী প্রথমে যুবতীটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল, 'বিনোদ ইয়ে হামারে বেটি কমলা। তুমহারে বহিন—' পরিচয়টা করিয়ে দেবার পর একনাগাড়ে যা বলে গেল তা এইরকম— তারা লালদাসিয়া কায়াথ (কায়স্থ)। তাদের বাড়ি এই হাট থেকে বাঁদিকে গিয়ে পর পর পাঁচটা গ্রাম পেছনে ফেলে যে বিরাট গ্রামটা পড়বে সেই শিউপুরায়। সেখানে একশো বছরেরও প্রাচীন ভগবান শিউশঙ্করজির একটা মন্দির রয়েছে। তাঁর নামেই গ্রামের নাম।

মাঝবয়সির নাম পার্বতী। তাদের ছোট সংসার। মাত্র তিনজন মানুষ। সে, তার ঘরবালা ধরমদাস লাল আর একমাত্র মেয়ে কমলা। তারা খুব গরিব, এক বিঘতও চাষের জমি নেই। থাকার মধ্যে একটা টুটোফুটো টিনের চালের তিন কামরার বাড়ি।

রোজগেরে মাত্র একজনই। ধরমদাস। দিনমজুরির কাজ পেয়ে তিন-চার বছর ধরে সে লখনউতে যাচ্ছে। অন্য সব
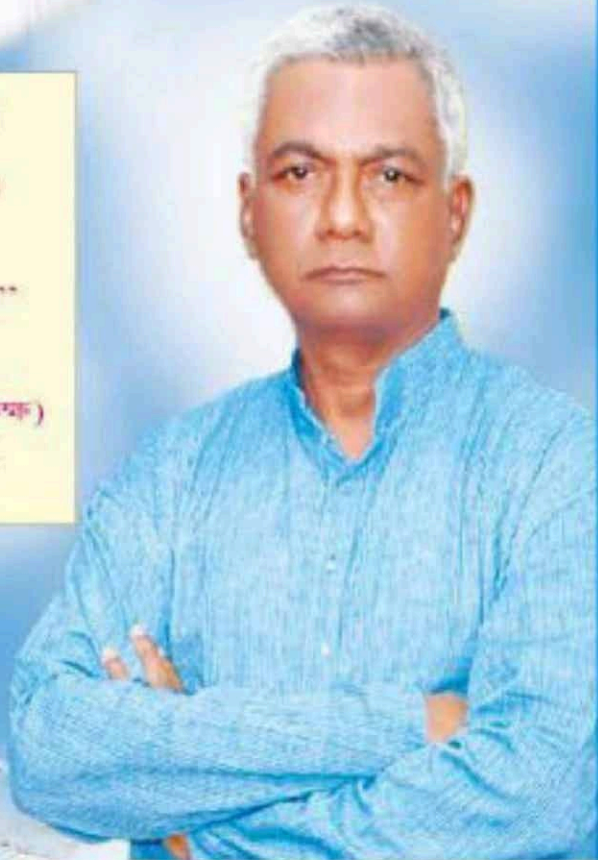
মজুরের মতো তিন-চারমাস পর পর শিউপুরায় এসে দশ-পনেরো দিন ঘরবালি আর মেয়ের সঙ্গে কাটিয়ে কাজের জায়গায় ফিরে যায়।

লখনউতে ধরমদাসের কাজটা জোটার পর দিনগুলো মোটামুটি ভালোই কাটছিল। এদিকে দেখতে দেখতে কমলা বড় হয়ে উঠছিল। স্কুলে সাত ক্লাস অবধি সে পড়েছে। কিন্তু আর নয়, ঠিক করা হল তার বিয়ে দেওয়া হবে। শাদির জন্য কিছু টাকা জমানো হয়েছিল, গ্রামের মহাজনের কাছ থেকে আরও কিছু ধার নিয়ে দেড় সাল আগে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে কমলার শাদি দেওয়া হল। এই হাট থেকে ডান দিকের কাচ্চি ধরে পুরা আট-দশ ঘণ্টা হাঁটলে কমলার শশুরাল। গ্রামটার নাম মনকোহল।

শাদির সময় নগদে পণের টাকা এবং অন্য সব দহেজ মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শাদির পর চার-পাঁচ মাস ভালোই কেটেছে। কিন্তু তারপর থেকেই শুরু হয়েছে কমলার ওপর নির্যাতন। পনেরো-বিশ দিন কাটতে না কাটতেই তাকে বলা হতো বাপের বাড়ি থেকে দশ হাজার, বিশ হাজার নিয়ে এসো। তাদের খাঁই মেটাতে লখনউতে অনেক বেশি করে ওভারটাইম খাটতে হয়েছে ধরমদাসকে। কিন্তু লোকগুলো মানুষ না, একেকটা গিধ। ওদের খাঁইয়ের শেষ নেই।

পাঁচ দিন আগে কমলা পার্বতীকে একটা চিঠি লিখেছিল। সেটা নিয়ে এসেছিল তার শ্বশুরবাড়ির এক নৌকর। পার্বতী স্কুলে না গেলেও বাড়িতে যৎসামান্য যা শিখেছে তাতে চিঠিটিঠি পড়তে পারে। কমলার চিঠিটা পড়েই সে বুঝতে পেরেছে ওটা শ্বশুরবাড়ির চাপে লিখতে সে বাধ্য হয়েছে। কমলা জানিয়েছে তুরন্ত পনেরো হাজার টাকা পাঠাতে হবে। কোনওভাবেই যেন দেরি না করা হয়।

এদিকে পার্বতীর হাতে রয়েছে ছ'সাতশো টাকা। লকডাউনের চারদিন আগে ধরমদাস চিঠি লিখে জানিয়েছিল লখনউয়ের হাল খুব খারাপ। করোনার দাপট দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। সেখানে থাকা আদৌ নিরাপদ নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মালিকের কাছ থেকে পাওনা টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরে আসছে। সে একাই নয়, শিউপুরা থেকে তার সঙ্গে আরও যে কুড়ি-বাইশজন রুজি রোজগারের সন্ধানে লখনউতে গিয়েছিল একসঙ্গে তারাও ফিরে আসবে।

কয়েকদিন আগেই ধরমদাসের ফেরার কথা কিন্তু কাল বিকেল অবধি ফেরেনি। সে ফিরে এলে পনেরো হাজার টাকা নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সুরাহা হয়ে যেত।

টাকা পেতে দেরি হলে কমলার ওপর নির্যাতন শুরু হবে। তাই কাল বিকেলে পার্বতী মনকোহলে মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে চলে এসেছিল। কমলার শ্বশুর-শাশুড়ির হাতেপায়ে ধরে কিছুদিন সময় চেয়েছিল। বারবার বলেছে, কমলার বাপু ফিরে এলেই টাকাটা দিয়ে যাবে। কিরপা (কৃপা) করে এই সময়টুকু দেওয়া হোক। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কমলার শ্বশুর অগ্নিমূর্তি হয়ে আঙুল নাচাতে নাচাতে বলেছে, পাঁচ রোজ টাইম দেওয়া হল, এরমধ্যে পনেরো হাজার দিতেই হবে। অব তুমহারে লেড়কিকো লে যাও। রুপাইয়াকে সাথ ইসিকো ভেজো। পাঁচ রোজের মধ্যে টাকাটা না পেলে শাদি তোড় দেঙ্গে। ভুলো মাত।'

সন্ধের পর পর যখন চারিদিক অন্ধকারে কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে কমলা এবং পার্বতীকে একরকম গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে তারা কাল মাঝরাতে এই নিঝুম নির্জন হাটের চালাঘরগুলোর সামনে চলে এসেছিল। একটা ফাঁকা চালা দেখে তার তলায় বসে বাকি রাতটা কাটিয়ে দিয়েছে। বাকি রাতটা যে তাদের কেঁদে কেঁদে কেটেছে তা অবশ্য বলল না পার্বতী।

শুনতে শুনতে অস্থির অস্থির লাগছে বিনোদের। এদের সঙ্গে তার মতো লক্ষ লক্ষ মানুষের কোনও তফাৎই নেই। বৃদ্ধ বাপ মা, ছোট ভাইবোন, স্ত্রী ছেলেমেয়ে অর্থাৎ পরিবার এবং প্রিয়জনদের বাঁচাতে তারা সবাই নিজের নিজের রাজ্য ছেড়ে ভিন রাজ্যে চলে গেছে। সবারই দিন মোটামুটি ভালোই কাটছিল কিন্তু করোনা ভাইরাসের হানাদারিতে সব যেন উথালপাতাল হয়ে যাচ্ছে। কারও সংকট আচমকা শতগুণ বেড়ে গেছে, কারও কিছুটা কম। পার্বতী যা বলেছে তাতে মনে হয় অন্য বহু পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের তুলনায় ওরা অনেক বেশি বিপন্ন। লকডাউনের পর তাদের নতুন রুজি-রোজগারের পথ খুঁজতে হবে। সংসার বাঁচাতে ধরমদাসকেও তাই করতে হবে। তাছাড়া মেয়ের বিবাহিত জীবনটাও রক্ষা করতে হবে।

লকডাউনের চারদিন আগে লখনউ থেকে ধরমদাস যদি রওনা হয়ে থাকে এতদিনে তার শিউপুরায় পৌঁছে যাবার কথা। বিনোদ খবরের কাগজে পড়েছে এবং টিভির নিউজে শুনেছে ভিন রাজ্য থেকে যারা নিজেদের রাজ্যে ফিরছে দু'তিন দিনের জায়গায় অনেক বেশি বেশি সময় লেগে যাচ্ছে। ধরমদাস কি সেইরকম কোনও ফেরে পড়ে গেছে? যদি তাই হয়, মেয়ের বিবাহিত জীবনটা ভেঙেচুরে বরবাদ হয়ে যাবে।

বিনোদ কমলার শ্বশুরকে দেখেনি কিন্তু তার সম্বন্ধে যা শুনল তাতে মনে হল লোকটা করোনা ভাইরাসের চেয়েও ভয়ঙ্কর। পার্বতীদের জন্য কষ্টই হচ্ছে, সেই সঙ্গে সহানুভূতিও, কিন্তু কী-ই বা করতে পারে সে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর হঠাৎ কিছু খেয়াল হতে বিনোদ জিজ্ঞেস করল, 'কব ঘর যাওগি?'

পার্বতী জানাল, কাল এত হাঁটাহাঁটি গেছে যে শরীরে আর তাকত নেই। হাঁটু-কোমর পিঠ যন্ত্রণায় টন টন করছে। দুপুর পর্যন্ত এই হাটের চালায় বসে জিরিয়ে নেবে, তারপর বাড়ির দিকে রওনা দেবে।

বেলা আরও বেড়েছে। রোদ তেরছা হয়ে এই চালাঘরে চলে এসেছে। পকেট থেকে কয়েকটা পাঁচশো টাকার নোট বের করে হাতের মুঠির মধ্যেই রেখে দিল। মাথাটা একটু নামিয়ে বারকয়েক পার্বতী আর কমলাকে লক্ষ করল। তারপর হঠাৎই সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে পার্বতীর একটা হাত তুলে নিয়ে পাঁচশো টাকার নোটগুলো তার ভেতর রাখল।

অবাক পার্বতী বলল, 'ইতনা রুপাইয়া—'

'ইতনা নেহি। শ্রিফ চার হাজার—'

'লেকিন—'

'লেকিন উকিন কুছ নেহি। আপ মুঝে বেটা বোলা, ব্যস। ধরমদাসজি লখনউসে কব লোটেঙ্গে, কৌন জানে। মাইজি আপকে ঘরকা খরচ হ্যায় না— 'ইসি লিয়ে—' বাকিটা আর শেষ করা হল না।

হঠাৎ পেছনে কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ। সেই সঙ্গে চেনা কয়েকটা কণ্ঠস্বর। ঘুরে তাকাতেই বিনোদের চোখে পড়ল— রামবনবাস দুবে, আসলাম, ফটিক, রফিক এমন চার-পাঁচজন। হিন্দি আর বাংলায় তারা হইচই বাধিয়ে দিল।

'কখন এখানে এসে বসে আছ? আমরা সারা হাট তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'ঢুঁড় ঢুঁড়কে হয়রান হো গিয়া—'

বিনোদ উঠে পড়ল। হাত তুলে আসলামদের থামিয়ে পার্বতীকে বলল, 'ইয়ে লোক মেরা সাথি হ্যায়। একসাথ বহুৎ দূর যানা পড়েগা। নমস্তে।' কমলাকে বলল, 'চিন্তা নায় করনা বহেন। ঘর যাকে জরুর শিউশঙ্করজিকো পূজা চড়ানা। উনকো কিরপাসে সব কুছ ঠিক হো যায়েগা।' সে আর দাঁড়াল না, রামবনবাসদের কাছে চলে এল। তাদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে একবার পেছন ফিরে তাকাল। পার্বতী আর কমলা একদৃষ্টে, পলকহীন তাকে দেখছে। তাদের চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে এসে গাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে। রক্তের কোনও সম্পর্ক নেই, আগে কখনও দেখা হয়নি, পরেও কখনও দেখা হবে না, এক মাঝবয়সিনী মা এবং তার যুবতী মেয়ের জন্য মনটা ভারী বিষাদে ভরে যেতে লাগল।

আসলাম তাকে লক্ষ করছিল। অন্যদের কান বাঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কারা? যেভাবে পাশে বসে কথা বলছিলে মনে হল তোমার অনেক দিনের চেনাজানা।'

'আরে না না—' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল বিনোদ, 'ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর হাঁটতে হাঁটতে এধারে চলে এসেছিলাম। তখন ওদের দেখতে পাই, হাটের চালাটার তলায় বসে আছে। এত ভোরে ওরা কোত্থেকে এল, কোথায় যাবে, জানতে ইচ্ছা করল। ওরাই আমাকে তাদের কাছে গিয়ে বসতে বলল। বসলাম। জানা গেল তারা মা আর মেয়ে। মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে নিয়ে এসে মা নিজেদের বাড়িতে চলেছে। এইরকম নানা কথা হচ্ছিল। তারমধ্যেই তোমরা চলে এলে—'

আসলাম তাকিয়েই আছে। খুব সম্ভব বিনোদের কথাগুলো পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি। বলল, 'দেখলাম তুমি ওই মায়ের হাতে অনেক টাকা দিলে। এই যে আমাদের সঙ্গে চলেছ, ওরা কিন্তু কাঁদছিল। কী ব্যাপার বল তো—'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিনোদ বলল, 'করোনা আর লকডাউন আমাদের মতো হাজার হাজার মানুষের যতটা ক্ষতি করেছে তার পঞ্চাশ গুণ সর্বনাশ করেছে ওই মা আর মেয়েকে।'

'মানে? কী হয়েছে ওঁদের?'

'এখন বলার মতো সময় নেই। পরে শুনো।'

আসলাম আপাতত আর কিছু জানতে চাইল না।

রামবনবাস দুবে বিনোদদের কথা শুনছিল না। অন্যমনস্কের মতো অন্য কিছু ভাবছিল। হঠাৎ বলে উঠল, 'দেখো ভাই, অব খানেকা বন্দোবস্ত জরুর করনা চাহিয়ে। নায় তো স্রিফ ভুখা মরেগা।'

'হাঁ হাঁ—' সবাই চারপাশ থেকে জোর গলায় সায় দিল।

একটু পরেই যে যার চালাঘরে পৌঁছে গেল। আর তখনই চারদিক থেকে তুমুল শোরগোল কানে এল। মনে হচ্ছে অনেকে একসঙ্গে গলার স্বর চড়িয়ে চিৎকার করছে। কী বলছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

॥ তেরো ॥

পরশু নকুল মাইতিদের পথের ধারে ফেলে রেখে সাহানপুরের বাকি যে দু'শো কুড়িজন শ্রমিক কাল এই হাটে রাত কাটিয়েছে ভয়ে আতঙ্কে হুড়মুড় করে তারা যে যার চালাগুলো থেকে বেরিয়ে এসেছে। সবার আগে আগে রয়েছে বিনোদ, আসলাম, রামবনবাস, ফটিক, বুধিলাল,

রহিম এমন কয়েকজন।
হাটের চালাগুলোর সামনের এবং ডানপাশের খোলা চত্বরে এর মধ্যেই লকডাউনকে তোয়াক্কা না করে, বলা যায় বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গৈয়া গাড়ি, বয়েল গাড়ি, ম্যাটাডোর ভ্যান, ভ্যান রিকশা বা সাইকেল রিকশায় মালপত্র চাপিয়ে অনেকে চলে এসেছে, কাতার দিয়ে আরও অনেকে আসছে। নিশ্চয়ই হাটবার। আর লোকগুলো হাটুরে ব্যাপারী। চালাঘরগুলো বেদখল হয়ে যেতে দেখে তারা খেপে উঠেছে। গলার শিরা ফুলিয়ে তারা চেঁচিয়েই চলেছে, 'শালে, কুত্তে, ইয়ে হাটিয়া তুলোগনকা বাপকা হ্যায়?' তাদের গলা দিয়ে বাছা বাছা সব গালাগাল ফোয়ারার মতো ঠিকরে ঠিকরে বেরুচ্ছে।
বিনোদ, রামবনবাসরা হাতজোড় করে বলল, 'বিনতি করতা হ্যায়, হামলোগন কুছ বোলেঙ্গে। কিরপা করকে শুনিয়ে—'
'ক্যায়া শুনেঙ্গে? অব ভাগো হিঁয়াসে। তুরন্ত।'
বেশিরভাগেরই মাথায় আগুন জ্বলছে, রাগে ফুঁসছে। কারণও আছে। হাট বসতে দেরি হলে তাদের বিকিকিনি মার খাবে, তা আর কে মেনে নিতে চায়। কিন্তু এদের মধ্যে সবাই উগ্র, মারমুখো নয়, কিছু ঠান্ডা মাথার মানুষও আছে। এরা তাদের সঙ্গীদের বুঝিয়েসুজিয়ে শান্ত করে বিনোদদের দিকে তাকাল, 'যো বোলনা তুরন্ত বোলো—'
করোনার হানাদারি এবং লকডাউনের পর কাজকর্ম খুইয়ে তারা এতগুলো মানুষ সাহানপুর থেকে কীভাবে এতদূরে এসে হাটের চালায় রাত কাটিয়েছে সব জানিয়ে বলল, তাদের কাছে যা খাবারদাবার আর জল ছিল সব ফুরিয়ে গেছে। এক দেড় দিন কারও খাওয়া হয়নি। ভুখে পিয়াসায় তারা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। চিঁড়ে, মুড়ি, ছাতু যা পাওয়া যায় তারা নগদ পয়সায় কিনে নেবে দয়া করে তার একটা ব্যবস্থা করা হলে তারা বেঁচে যায়।
আগেই যারা খেপে ছিল তারা নতুন উদ্যমে ফের হুলস্থুল বাঁধিয়ে দিল। 'নেহি নেহি, কুছ নেহি মিলেগা। ইয়ে সব হারামজাদকা ছোঁয়া জরুর করোনা লেকে আয়া। ভাগো শালে লোক, আভভি ভাগো—'
এরা ছাড়া আরও যারা ঝাঁকে ঝাঁকে গৈয়া গাড়ি, ভৈসা গাড়ি ম্যাটাডোর ভ্যান রিকশাটিকশায় মাল নিয়ে চলে এসেছে তারাও সুর মেলাল, 'ভাগো ভাগো—'
কিন্তু ভালোমানুষ দুনিয়ার সব জায়গাতেই থাকে। যারা আগে উত্তেজনা থামিয়েছিল, এবারও তারা হাত তুলে সেটাই করে ক্ষিপ্ত হাটুরে দোকানিদের বোঝাল, এই লোকগুলো অনেক দূর থেকে আসছে। বহুত খতরেমে হ্যায়। খানেপিনেকো কুছ নেহি। চুড়া সাত্তু লিট্টি যিসিকো পাস যো কুছ হ্যায় ইয়ে লোগন মুফত নেহি, পইসা দেকে খরিদ করেঙ্গা। অ্যায়সা মওকা ছোড়ো মাত।
নগদ পয়সার একটা ভেলকি আছে। যারা এখানে নানারকম খাবার বেচতে এসেছে এককথায় তারা রাজি হয়ে গেল। ঠিক হল, করোনা ছড়িয়ে পড়তে পারে, এই আতঙ্কে বিনোদদের হাটের ধারেকাছে থাকতে দেওয়া হবে না। নিজের নিজের লটবহর নিয়ে তারা বাঁদিকের চত্বর ছাড়িয়ে উঁচু নিচু ঘাসের জমিটায় গিয়ে বসবে। হাটুরে দোকানিরা যার যা দরকার জেনে নিয়ে নাকে-মুখে কাপড় বেঁধে দিয়ে যাবে।
ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দু'তিন দিনের মতো রসদ জোগাড় হল। শুধু সাত্তুটাত্তুই নয়, খাওয়ার জলও পাওয়া গেল। হাটের ডানপাশে যে টিউবওয়েলটা রয়েছে সেটা চালিয়ে কয়েকজন বালতি বালতি জল এনে বিনোদদের খালি বোতলগুলো ভরে দিয়ে গেল।
সবার পেটে খিদের দাউ দাউ আগুন। খাদ্যবস্তুগুলো হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে সবাই গোগ্রাসে খেতে শুরু করল।

হাটের বাঁ পাশের খোলা চত্বরে দাঁড়িয়ে পনেরো-কুড়িজন বিনোদদের ওপর নজর রাখছিল। তাদের খাওয়াদাওয়া শেষ হতেই লোকগুলো দৌড়ে এসে কড়া গলায় হুকুমের সুরে বলল, 'অব চলা যাও—'
যে কাঁচা সড়কটা ধরে দুশো কুড়ি জনের দলটা কাল এখানে চলে এসেছিল সেটা হাটের পাশ দিয়ে বাঁদিকে বহুদূরে চলে গেছে। মানুষগুলো নিঃশব্দে তাদের লটবহর তুলে নিয়ে সেই পথটায় গিয়ে উঠল। অন্তবিহীন সড়কে ফের তাদের যাত্রা শুরু হল।
খিদে এবং তেষ্টাকে অনেকটাই বাগে আনা গেছে। এখন আর হাঁটতে তেমন কষ্ট হচ্ছে না।
অল্প কয়েকজন ছাড়া বাকি সব হাটুরে দোকানি এতটাই মারমুখো যে কীভাবে কোন কোন পথ দিয়ে গেলে পাটনা, কলকাতা বা কটকে পৌঁছানো যাবে তা জেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি।
বিরাট দলটার সামনের দিকে ছিল রামবনবাস, বিনোদ, আসলাম আর ফটিক।
ফটিক বলল, 'আমরা যেন গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছি। এই কাচ্চিটা ধরে কোথায় গিয়ে যে ঠেকব, কে জানে।'
একটু ভেবে বিনোদ বলল, 'ভোরবেলা হাটের চালায় যে অচেনা মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, কথায় কথায় সে বলেছিল যে পথ দিয়ে আমরা চলেছি সেটার পাশে পর পর কয়েকটা গ্রাম পড়বে। গাঁওবালাদের জিজ্ঞেস করলে হয়তো কলকাতা বা পাটনায় যাওয়ার দিশা পাওয়া যাবে।'
রামবনবাস দুবে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। বলল, 'ভগোয়ান রামচন্দরজিকা মরজি।'
কেউ উত্তর দিল না। ভগবান রামচন্দ্র কতটা সদয় হন, তা দেখা যাক— মুখ-চোখের এমন একটা ভাব সবাই সামনের দিকে পা ফেলতে লাগল।
ঘণ্টা দেড়েক হাঁটার পর পথের ডান ধারে একটা গ্রাম চোখে পড়ল। অজস্র ফুল আর ফলগাছ দিয়ে ঘেরা শান্ত, ছায়াচ্ছন্ন লোকালয়টিতে টিন আর টালির চালের প্রচুর ঘরবাড়ি। বেশ কিছু দালান কোঠাও দেখা যাচ্ছে।
কাছাকাছি চলে আসতেই গাঁওবালারা প্রায় সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে পথের ধারে এসে সমানে চেঁচাতে লাগল, 'শালে লোগন, করোনা লেকে আয়া। ভাগো, ভাগো—'
দু'শো কুড়িটি মানুষ ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। তাদের আসার খবর ওই হাটটা থেকে নিশ্চয়ই এই গ্রামে পৌঁছে গেছে।
বিনোদ আর রামবনবাস হাতজোড় করে বলল, 'শুনিয়ে—'
গাঁওবালারা কিছুই শুনতে রাজি নয়। রাস্তার সামনের দিকটা দেখিয়ে চেঁচাতে লাগল, 'ভাগো, ভাগো। আগে বাড়ো—'
আর দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস হল না। বিনোদরা গ্রামের ভেতর ঢুকত না। শুধু পাটনা বা কলকাতায় যাবার পথের হদিশ জেনে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু চরম হতাশা নিয়ে হাঁটতে লাগল।

পর পর আরও দু'তিনটে গ্রামের সামনে একইরকম অভ্যর্থনা জুটল। বিনোদরা যে করোনার বাহক হয়ে চলে এসেছে, সেই খবর এই গ্রামগুলোতেও ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই কুকুরের মতো দূর দূর করে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

দুপুর পেরিয়ে যখন বিকেল হতে শুরু করেছে, বিনোদরা একটা বাঁকের মুখে চলে এসেছে। তখনই দেখা গেল অন্য একটা পথ কোনাকুনি ডানদিক থেকে এসে তাদের কাচ্চিতে মিশেছে। আরও চোখে পড়ল কোনাকুনি ওই সড়কটা দিয়ে পঁচিশ-তিরিশজনের একটা দল আসছে। দলটার সামনের দিকে অনেকটা আগে আগে রয়েছে চোদ্দো-পনেরোজন। তাদের কাঁধে মাথায় অবিকল বিনোদদের মতোই ব্যাগ স্যুটকেস পোঁটলা-পুঁটলি। ওদের পেছনে বাকি সবাই। এরা চারজন করে একেকটা বাঁশের মাচা কাঁধে চাপিয়ে আসছে। সবসুদ্ধ চারটে মাচা। মাচাগুলোতে বেশ ভারী কিছু রয়েছে। চাদরে ঢাকা।

দলটা সম্পর্কে কৌতূহল হচ্ছিল বিনোদদের। কী ভেবে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে অচেনা মানুষগুলো তাদের সামনে এসে থেমে গেল। ভাঙাচোরা, শ্রান্ত বিধ্বস্ত সব চেহারা। উসকো খুসকো রুক্ষ চুল, চোখগুলো গর্তে ঢোকানো, কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। জামাকাপড় ময়লা চিটচিটে। একপলক তাকালেই বোঝা যায় বেশ কয়েকদিন এদের চান খাওয়া হয়নি। খুব সম্ভব অনেক দূর থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছে।

রামবনবাস দুবে জিজ্ঞেস করল, 'কাঁহাসে আতে হো?'

এই লোকগুলো রগচটা, হিংস্র ধরনের নয়। মোটামুটি ভদ্র। ওদের একজন বলল, 'লখনউসে। আপলোগন?'

লকডাউনের পর তারা কোত্থেকে কীভাবে আসছে, কোথায় যাবে সব জানিয়ে দিল রামবনবাস আর বিনোদ।

কথায় কথায় অচেনা ওই লোকটির নাম জানা গেল। বিষুণলাল। সে জানাল, তাদেরও একই হাল। তারা মজদুর। ছ'সাত সাল ধরে তাদের কেউ ইমারত বা ব্রিজ বানাতে কেউ বা কারখানায় কাজ করতে লখনউ যাচ্ছিল। কিন্তু করোনা আর লকডাউনে নৌকরি খুইয়ে তারা বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। আর কখনও লখনউ যাওয়া হবে কি না কে জানে। লকডাউনের কারণে বাস-ট্রেন এবং অন্য সব যানবাহন চলাচল বন্ধ। তাই দেড় দু'হাজার কিলোমিটার রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে আসছে। তারা বদনসিব। পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় বিষুণলালরা তাদের চারজন সাথিকে হারিয়েছে। এক মাতোয়ালা ড্রাইভার বেপরোয়া লরি চালিয়ে তাদের ওপর এসে পড়ে। চারজন তৎক্ষণাৎ মারা যায়। বাকিরা অবশ্য বেঁচে আছে।

লরিটা চারজনকে পিষে দিয়ে নিমেষে উধাও হয়ে যায়। ড্রাইভারকে ধরা যায়নি।

এতটা রাস্তা তারা হাঁটতে হাঁটতে আসছে কিন্তু পথের পাশে যে সব ছোট ছোট টাউন অপার গাঁও পড়েছে সেসব জায়গার টাউন আর গাঁওবালারা তাদের শ্মশানে চার সঙ্গীর শেষ কাজটা করতে দেয়নি। তাড়া করে হুমকি দিতে দিতে ভাগিয়ে দিয়েছে। গাঁওবালা, টাউনবালাদের সন্দেহ বিষুণলালদের মৃত সঙ্গীরা করোনায় মারা গেছে।

বন্ধুদের মৃতদেহগুলো রাস্তার ধারে তো ফেলে রেখে চলে আসা যায় না। ফেলে রেখে হাত-পা ঝেড়ে ফেললে

লাশগুলোর কী গতি হবে তা কি তারা জানে না? শকুন আর শিয়ালেরা ভোজের আসর বসিয়ে দেবে। সহযাত্রী বন্ধুদের এমন নিদারুণ পরিণতি তারা ভাবতেও পারে না। তাই বাঁশ আর দড়ি কিনে চালি বা মাচা বানিয়ে একেকটা চালিতে একটা করে লাশ তুলে শুইয়ে দিয়ে চারজন বয়ে বয়ে নিয়ে আসছে। চারটি লাশের জন্য ষোলোজন বাহক।

চালিগুলোতে কী রয়েছে, এতক্ষণে বোঝা গেল। চকিতে বিপিনদের কথা মনে পড়ে গেল। করোনা ভাইরাসের হানায় তাদের ছেলে এবং স্ত্রীদের মৃত্যু হয়েছে কিন্তু কোনও শহর বা গ্রামের শ্মশানে তাদের দাহ করা যায়নি। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে শত শত কিলোমিটার হেঁটে তাদের একটা জঙ্গলে ঢুকতে হয়েছিল। করোনা অসহায় মানুষদের পুরোপুরি অচ্ছ্যুৎ বানিয়ে অন্য সবার কাছ থেকে কীভাবে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে তার কিছু নমুনা নিজের চোখে দেখতে দেখতে চলেছে বিনোদ।

রামবনবাস দুবে জিজ্ঞেস করল, 'আপকে গাঁও কিধর হ্যায়? আউর কিতনে দূর?'

হাটের চৌহদ্দি থেকে ভাগিয়ে দেবার পর যে চার-পাঁচটা গ্রামের মারমুখো জনতার হুমকি শুনতে শুনতে রামবনবাসরা এত দূরে চলে এসেছে সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে বিষুণলাল জানিয়ে দিল তাদের গাঁওয়ের নাম শিউপুরা, সেটা ওখানেই।

লখনউ থেকে আসা ওই মানুষগুলোকে দেখামাত্র বিনোদের খুব কৌতূহল হচ্ছিল। শিউপুরা নামটা এই দ্বিতীয়বার শুনল সে। আজ ভোরেই হাটের চালিয়ায় বসে প্রথম সে শোনে পার্বতীর মুখে।

পার্বতী বলেছিল ওই গ্রামেই তাদের বাড়ি। ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা দেড়েকের মতো আলাপ। তারমধ্যেই সে বিনোদকে আপন করে নিয়েছিল। পরমাত্মীয়ের মতো নিজেদের ঘর-সংসারের কথাই শুধু নয়, তারা যে কী নিদারুণ সংকটের মধ্যে রয়েছে সে সবও জানিয়ে দিয়েছিল।

শিউপুরা নামটা শুনেই তাই বিনোদের কৌতূহল অনেকটা বেড়ে গেছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'বিষুণলালজি, এক বাত পুছু?'

'কিউ নেহি। পুছিয়ে না—' বিনোদের দিকে তাকাল বিষুণলাল।

'আপকে গাঁওমে শিউশঙ্করজিকা মন্দির হ্যায় না? বহুৎ বড়ে'—

'আপ ক্যায়া হামারে গাঁওমে কভি ভি আয়া থা?'

'নেহি। শুনা থা।'

'হো সাকতা।' বিষুণলাল একটু হাসল।

একটু চুপচাপ।

তারপর বিনোদ বলল, 'আউর এক বাত পুছু?'

অচেনা এই যুবকটি বার বার কেন প্রশ্ন করছে? সামান্য ধন্দেই যেন পড়ে গেল বিষুণলাল। কী যেন ভেবে বলল, 'পুছিয়ে—'

প্রশ্নটা করবে কি করবে না, ভাবতে কিছুটা সময় নিল বিনোদ। তারপর বলেই ফেলল, 'ধরমদাসজি আপকে গাঁওবালা হ্যায় তো?'

বিষুণলাল ভীষণ চমকে উঠল। 'আপ, আপ—' বাকিটা শেষ করতে পারল না। বার বার ঢোক গিলতে লাগল।

বিনোদ তাকিয়ে ছিল। বিষুণলালের এতটা চমকে ওঠার কারণটা ঠিক আঁচ করা যাচ্ছে না। তাকে কিছুটা সময় দিল সে কিন্তু বিষুণলাল কোনওরকম সাড়াশব্দ করছে না। চমকের সেই রেশটা এখনও তার চোখেমুখে, এমনকি সারা শরীরেই যেন থেকে গেছে।

একসময় বিনোদ বলল, 'ধরমদাসজিকা নাম ভি শুনা হ্যায়—'

এতক্ষণে গলার ভেতর থেকে ফ্যাসফেসে আওয়াজ বের করে আনল বিষুণলাল, 'কৌন বোলা?'

'আপহিকা গাঁওবালা এক আদমি। অব বোলিয়ে ধরমদাসজি, ক্যায়া আপলোগকে সাথ লখনউ গ্যায়া থা?'

বিষুণলালের চোখে-মুখে সেই চমকটা নেই। মুখটা মুহূর্তে রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। লম্বা-চওড়া হাট্টাকাট্টা চেহারাটা বেঁকেচুরে দুমড়ে যেতে লাগল।

তাকে কিছুক্ষণ লক্ষ করল বিনোদ। বিষুণলাল তো বটেই, তার সঙ্গীরাও চুপ। সবাই মাথা নিচু করে আছে। যারা চালি বইছিল, অনেকটা কাছাকাছি চলে এসেছে। দিনের আলো নিবু নিবু। সন্ধে ঘনিয়ে আসছে। সমস্ত কিছুর মধ্যেই কেমন একটা অশুভ সংকেত রয়েছে।

বিনোদ বিষুণলালের কানের কাছে মুখ নামিয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আউর ভি শুনা ধরমদাসজি লখনউমে নৌকরি করতা। উনোনে ক্যায়া আপলোগকো সাথ লৌট আয়া?'

উত্তর দিতে একটু সময় নিল বিষুণলাল। ততক্ষণে চালিবাহকরা আরও কাছে চলে এসেছে। মাথা তুলে একটা চালির দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল। কাঁপা গলায় বলল, 'ওহি। আকসিডেন্টমে—' বাকিটা আর শেষ করতে পারল না। কণ্ঠস্বর বুজে এল।

সারা শরীর জুড়ে তীব্র একটা ঝাঁকুনি লাগল বিনোদের। পার্বতী আর কমলার ত্রস্ত কাতর মুখদুটো চোখের সামনে ভেসে উঠল। পার্বতীর সেই কথাগুলো এখনও সে যেন শুনতে পাচ্ছে। শ্বশুরবাড়িতে চরম নির্যাতনের পর বিতাড়িত কমলাকে সঙ্গে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটে মাঝরাতে হাটের ফাঁকা চালায় এসে উঠেছিল। বাকি রাতটা সেখানে কাটিয়ে সকাল হলে শিউপুরায় নিজেদের বাড়িতে ফিরে যাবে, এমনটা ভেবে রেখেছিল।

পার্বতী জানিয়েছিল কমলার শ্বশুর পনেরো-কুড়ি দিন পর পর বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য তাকে চাপ দিতে থাকে। কয়েকবার শিউপুরায় এসে টাকা নিয়ে গিয়ে শ্বশুরকে দিত। টাকা আনতে না পারলে কপালে জুটত লাঞ্ছনা, মারধর। এবার সেটা চরমে উঠেছে। পার্বতী ঠিক করে রেখেছে লখনউ থেকে ধরমদাস ফিরে এলে শ্বশুরবাড়ির

খাঁই মিটিয়ে সবদিক থেকে কমলাকে বাঁচাবে।

প্রচণ্ড অপমান লাঞ্ছনা এবং পীড়ন সয়েও কত আশা নিয়েই না ধরমদাসের ফেরার জন্য পথের দিকে তাকিয়ে আছে।

বিনোদেরও মনে হয়েছিল, ধরমদাস ফিরলে চিরস্থায়ী না হোক, সাময়িক একটা সুরাহা হবে। এ যাত্রায় কমলার বিবাহিত জীবনটা রক্ষা পাবে। কিন্তু বিষুণলাল কিনা আঙুল বাড়িয়ে বাঁশের চালিতে চাদরে ঢাকা একটা লাশ দেখিয়ে দিল। ধরমদাসের নিথর মৃতদেহ।

খুব অস্থির অস্থির লাগছে বিনোদের। বার বার পার্বতী আর কমলার মুখ দুটো সামনে ভেসে আসছে। অচেনা, অনাত্মীয়, এক দেহাতি মধ্যবয়সিনী আর সতেরো-আঠারো বছরের এক তরুণীর ভবিষ্যৎটা কী হতে পারে এখন আর ভাবতে সাহস হচ্ছে না। ওরা কি এখনও হাটের চালায় বসে আছে, নাকি অনেক আগেই শিউপুরার দিকে রওনা হয়েছে? তাই যদি হয় এতক্ষণে বাড়ি পৌঁছে গেছে।

বিনোদের হঠাৎ খেয়াল হল, রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তারা হাট থেকে বেরিয়ে পড়েনি, চিঁড়ে, মুড়ি, সাতু এবং জলের জন্য অনেকক্ষণ হাটের চত্বরে তাদের বসে থাকতে হয়েছে। সেই সময় পার্বতীরা বাড়ির পথ ধরতে পারে কিন্তু তারা যেখানে বসেছিল তার পাশ দিয়েই তো সড়ক। ওই পথ দিয়েই তো পার্বতীদের যাবার কথা। কিন্তু তারা ওদের দেখতে পায়নি। আসলে তারা তখন চিঁড়ে মুড়ি নিয়ে এতই ব্যস্ত যে অন্য কোনও দিকে নজর ছিল না।

যাইহোক, হয় তারা বাড়িতে পৌঁছে গেছে, নইলে যে কোনও সময় পৌঁছে যাবে। হাটুরে ব্যাপারীরা কিছুতেই তাদের হাটের চালা দখল করে বসে থাকতে দেবে না।

সবচেয়ে প্রিয় মানুষটি যার সঙ্গে তাদের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে তার মৃতদেহ যখন পার্বতীরা দেখবে তখন দু'জনের কী প্রতিক্রিয়া হবে ভাবা যায় না।

হঠাৎ কী মনে হল বিনোদের, রামবনবাসকে বলল, 'আপলোগ চলতে রহো। আধাঘণ্টে বাদ ম্যায় আপকো পাশ চলা যায়েগা—'

রামবনবাসরা একটু অবাক হল। কিন্তু কোনও প্রশ্ন করল না। বিশাল জনতা লাইন দিয়ে যেমন চলছিল তেমনই চলতে লাগল।

এদিকে চালিবাহকরা কাঁধের ওপর ভারী বোঝা নিয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। তারা তাদের সঙ্গীদের তাড়া দিতে লাগল, 'বহুত থক গয়া। খাড়া নেহি রহনা। চল, চল—'

'হাঁ হাঁ—'

এবার বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে চালিবাহকেরা আগে আগে এগিয়ে চলল। তাদের পেছনে বিষুণলাল এবং বাকি সঙ্গীরা।

বিনোদ যখন রামবনবাসের সঙ্গে কথা বলছিল তারমধ্যে বিষুণলালরা বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে তাদের কাছাকাছি এসে 'নিচু গলায় ডাকল, 'বিষুণলালজি—'

ঘুরে দাঁড়িয়ে বিষুণলাল অবাক। বলল, 'আরে ভাইয়া তুম!' তুম তো উধার যানেবালা—' যে সড়কে তারা দাঁড়িয়ে আছে সেটা ডানপাশে সোজা বহুদূরে চলে গেছে। আঙুল বাড়িয়ে সেদিকটা দেখিয়ে দিল।

বিনোদ বলল, 'উধারই যায়েঙ্গে। আপকো কুছ বোলনে চলা আয়া—'

চালিবাহক এবং অন্য সঙ্গীদের হাতের ইশারায় শিউপুরার দিকে এগিয়ে যেতে বলে বিনোদের দিকে তাকাল। জানতে চাইল এমন কী জরুরি কথা থাকতে পারে যা বলার জন্য নিজের সাথিদের ছেড়ে চলে আসতে হল?

বিনোদ বলল, 'আপকে গাঁওবালা ধরমদাসজি অ্যাকসিডেন্টমে যিসকো মওত হুয়া, উনকে ঘরবালি পার্বতী আউর উনকে বেটি কমলাকো আজ সুবে সীতাপুরকা হাটিয়ামে দেখা হ্যায়—'

'সচ্!' চমকে উঠল বিষুণলাল।

'হাঁ, বিলকুল সচ্—'

'ইয়ে ক্যায়সে হো সাকতা?'

কীভাবে সীতাপুরে পার্বতীদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, শুধু তাই নয় কমলার চিঠি পেয়ে মনকোহলে তার শশুরালে কাল পায়ে হেঁটে পার্বতীকে যেতে হয়েছিল, তারপর কালই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে শিউপুরায় ফেরার পথে কাল রাতটা সীতাপুরের হাটের চালায় কীভাবে তাদের কেটেছে, সব জানিয়ে বিষুণলালের মুখের দিকে তাকাল বিনোদ। আরও জানাল কাল ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটার কারণে পার্বতীরা এতটাই ক্লান্ত ছিল যে আজ সকালে শিউপুরার দিকে রওনা হতে পারেনি। এতক্ষণে অনেকটা সময় কেটে গেছে। হয়তো পার্বতীরা এরমধ্যে বাড়ি ফিরে এসেছে। আবার নাও ফিরতে পারে।

বেশ কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল বিষুণলাল। একটানা বিনোদ যা বলে গেল, শুনেও যেন তার বিশ্বাস হচ্ছে না। একসময় অনেক কষ্টে গলার ভেতর থেকে স্বরটাকে বের করে আনল সে, 'ভাইয়া তুম যো বোলা সচ হ্যায়?'

'পুরা সচ—' খুব জোর দিয়ে বলল বিনোদ, 'ঝুট বোলনেসে মেরা ক্যায়া ফায়দা?'

দু'হাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরে বিষুণলাল বলল, 'অ্যাকসিডেন্টমে ধরমদাস মেরা দোস্ত থা, লেকিন উসকো মওত হুয়া। কমলা বেটিকা শ্বশুর ইনসান নেহি জানবর, ভুচ্চরকা ছৌয়া, এক গিধ। পাইসাকা ইতনা লালচ, ইতনা লালচ, কমলাকো ঘরসে নিকাল দিয়া! ধরমদাস জিন্দা নেহি, পার্বতী আউর কমলাকো জিন্দেগি বিলকুল বরবাদ—' বন্ধুর শোচনীয় মৃত্যু এবং তার স্ত্রী আর একমাত্র সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে আক্ষেপে, বেদনায় তার গলা বুজে এল।

বিষুণলাল যে ভালো, শুধু ভালোই নয়, খুবই নরম মনের মানুষ, নইলে বন্ধুর মৃত্যু এবং তার স্ত্রী আর মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে সে এতটা ভেঙে পড়ত না।

বিনোদ তার কাঁধে হাত রেখে বুঝিয়ে যা বলল তা এইরকম— বিষণুলালের সাথিরা সবাই মৃতদেহগুলো নিয়ে অনেক দূর চলে গেছে। সে যেন আর দাঁড়িয়ে না থাকে। পার্বতী আর কমলা যদি এরমধ্যে শিউপুরায় ফিরে এসে থাকে ধরমদাসের মৃতদেহ দেখলে তীব্র শোকে ভেঙে পড়বে। তাদের সামলানোর জন্য বিষুণলালের মতো একজন সহৃদয় মানুষের পাশে থাকা খুবই প্রয়োজন। যদি গাঁওয়ে গিয়ে বিষুণলাল দেখে পার্বতীরা তখনও ফিরে আসেনি, তাদের খোঁজে তুরন্ত কারওকে যেন সীতাপুরার হাটিয়ায় পাঠিয়ে দেয়।

বিষুণলাল ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। ম্লান মুখে বলল, 'তুম ঠিক বোলা ভাইয়া। অব ম্যায় যাতে হুঁ। রাম রাম—' বলেই লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করল।

যতক্ষণ বিষুণলালকে দেখা গেল, তাকিয়ে রইল বিনোদ। সে যখন পথের একটা বাঁকে অদৃশ্য হল, বিনোদ আর দাঁড়িয়ে থাকল না, ঘুরে কয়েক পা ফেলতেই চোখে পড়ল একটা বিরাট পিপর গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে আসলাম।

বিনোদ অবাক। জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে যাওনি?'

'না।' আস্তে মাথা নাড়ল আসলাম।

'গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কী করছিলে?'

'তোমাদের দেখছিলাম, তোমাদের কথা শুনছিলাম।' বলতে বলতে বিনোদের কাছে চলে এল আসলাম, 'অবাক হবার কিছু নেই। আমরা বন্ধু তো। জানা নেই চেনা নেই, বিষুণলালদের কাছে হুট করে চলে এলে। ওরা কেমন মানুষ কে জানে। কোনও ঝুট-ঝামেলায় পড়ে যাও কিনা, খুব চিন্তা হচ্ছিল তাই না এসে পারিনি। রাগ করলে না তো?'

মাত্র দু'দিনের পরিচয়। এরমধ্যে এতটা আপন করে নিয়েছে, ভাবা যায়! বিনোদের সারা মুখে নির্মল একটা হাসি ফুটল। এক হাতে আসলামের কাঁধ বেড় দিয়ে বলল, 'এই না হলে বন্ধু—'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। রামবনবাসজিরা এতক্ষণে কতদূর চলে গেছে বুঝতে পারছি না।'

'কতদূর আর যাবে! আমাদের দলে বাচ্চাকাচ্চা আর তাদের মায়েদের পায়ে ঝাড়া দু'দিন হেঁটে হেঁটে কতটা জোর আর পড়ে আছে। ওদের ঠিক ধরে ফেলব। ফিকর মাত করনা— চলো মুসাফির—'

বিনোদ আর আসলাম, পাশাপাশি হেঁটে চলেছে।

হঠাৎ আসলাম বলল, 'তুমি কিন্তু আমার কাছে একটা কথা লুকিয়েছ।'

'লুকিয়েছি। মানে?' হাঁটতে হাঁটতেই সে আসলামের দিকে তাকাল।

'ওই যে হাটের চালায় পার্বতী আর তার মেয়ের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল, কী কথা হয়েছে তাদের সঙ্গে, কিছুই জানাওনি। তবে একটু আধটু বুঝেছি ওরা খুব বিপদে পড়েছে। তারপর এখানে এসে শুনলাম কমলার বাবা ধরমদাস লখনউ থেকে ফেরার পথে লরির ধাক্কায় মারা গেছে। ব্যস, এর বেশি আর কিছু জানি না।'

বিনোদের হাতটা আসলামের কাঁধের ওপরেই ছিল। সেটা একটু নামিয়ে আলতো করে সঙ্গীর পিঠে চাপড় মারতে মারতে বলল, 'কাল তোমাকে বলার সময় পেলাম কোথায়? সীতাপুরা হাটিয়ায় দোকানদাররা কীরকম ঝামেলা বাধিয়েছিল তুমি তো জানো। ভেবেছিলাম আজ বলব। সকাল থেকে এ পর্যন্ত কত হুজ্জুত গেছে, নিজের চোখেই দেখেছ। সে যাক। এখন আশপাশে কেউ নেই। বলছি শোন।'

কাল ভোররাতে সীতাপুরার হাটে কান্নার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বিনোদের। কারা কাঁদছে প্রথমটা বুঝতে পারেনি সে। ঘুমের ঘোরটা পুরোপুরি কেটে গেলে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ওটা দু'জন মেয়েমানুষের কান্নার শব্দ। সেটা এতই করুণ যে বিছানায় বসে থাকতে পারেনি বিনোদ। অনেক খুঁজে হাটের পেছন দিকে একটা চালায় পার্বতী আর কমলাকে দেখতে পায়। কোত্থেকে তারা আসছে, কোথায় যাবে, হাটের চালায় বসে কেন এত কাঁদছে, কোনও বিপদে তারা পড়েছে কি না, এইসব প্রশ্নের উত্তরে তারা যা যা বলেছে সব

আসলামকে শুনিয়ে দিয়ে সে বলল, 'দেশের এখনও, স্বাধীনতার তিয়াত্তর বছর পরেও আমাদের দেশের কোথাও না কোথাও বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য মেয়েদের ওপর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কী সাংঘাতিক অত্যাচার করে, খবরের কাগজে পড়েছি আর লোকের মুখে শুনেছি। নিজের চোখে এই প্রথম দেখলাম।'

বিনোদ এমনভাবে পার্বতী আর কমলার কথা বলল, শুনতে শুনতে খুব কষ্ট হচ্ছিল আসলামের। সে উত্তর দিল না। তার মুখটা কেমন যেন থমথমে হয়ে গেল।

বিনোদ বলল, 'ভাবতে পারো মাত্র দেড় বছর আগে কমলার বিয়ে হয়েছে। সেই সময় ওর শ্বশুরবাড়ি পুরো দহেজ আদায় করে নিয়েছিল। তারপর দু'এক মাস পর পর ওর শ্বশুর বাপের কাছ থেকে দশ হাজার, বিশ হাজার করে টাকা নিয়ে আসার জন্য চাপ দিচ্ছিল। না আনতে পারলে তার হাল যে বহুত বুরা হয়ে যাবে। কমলার বাপ লখনউতে তোমার আমার মতো রাস্তা তৈরি, বিল্ডিং বানানো, এই ধরনের কাজ করে আর ওভারটাইম খেটে যে কামাইটা করত তার অর্ধেকের বেশিটাই চলে যেত কমলার শ্বশুরের গর্ভে। লোকটার খাঁইয়ের শেষ নেই। তোমাকে তো বলেছি শ্বশুরের কথামতো টাকাপয়সা আনতে পারেনি বলে কমলাকে বার বার হুমকি দিচ্ছিল তার শ্বশুর। খাঁই মিটিয়ে দেবার জন্য কিছুদিন সময় চাইতে গিয়েছিল পার্বতী কিন্তু তার কোনও কথা শোনেনি লোকটা। মা আর মেয়ে দু'জনকেই বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে ওরা কোথায় এসে রাত কাটিয়েছে সেসব তো তোমাকে বলেইছি।'

আসলাম বলল, 'শ্বশুর লোকটা জঘন্য, আস্ত জানোয়ার।'

'কী বলছ আসলাম। জন্তুজানোয়ারদের শুনেছি একটু আধটু মায়ামমতা থাকে। ওই লোকটার কিছুই নেই। আরেকটা ব্যাপার ভেবে দেখেছ?'

আসলাম একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি কী বলতে চাইছ, আমি জানি।' কমলার বাপ ধরমদাসের লাশ নিয়ে আজ লখনউ থেকে বিষুণলালজিরা এসেছে। এতক্ষণে শিউপুরায় পৌঁছেও গেছে। ওদিকে সীতাপুরার হাট থেকে পার্বতীরাও নিশ্চয়ই চলে এসেছে। এখন ওখানে কী চলছে ভাবতে পারি না।'

বিকেল ফুরিয়ে এসেছে। সূর্যটাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। অনেক দূরে পশ্চিম দিকের উঁচু উঁচু গাছগুলো ওধারে নেমে গেছে। অন্ধকার নামতে এখনও কিছুক্ষণ দেরি। তবে হালকা কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে।

কথা বলতে বলতে ওরা যেমন হাঁটছিল তেমনি রাস্তার দু'ধারে নজরও রাখছিল। দু'পাশেই ধুধু, রুক্ষ, নিষ্ফলা, উঁচু-নিচু মাঠ। সেই মাঠ ফুঁড়ে কোথাও কোথাও ঝোপঝাড় আর কঙ্কালসার কিছু গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

বিনোদ বলল, 'গিরিরাজজির ট্রাক থেকে নামার পর এই যে আমরা হাঁটছি হেঁটেই চলেছি, ক'টা আর ধানের জমি চোখে পড়েছে। বেশিরভাগই বাঁজা কাঁকরে বোঝাই মাঠ, ফসলটসল ফলে না।'

আসলাম তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, 'তুমি তো দেখছি এখানকার মাঠঘাট নিয়েই বেশি ভাবছ। যা নিয়ে ভাবার কথা সেটাই তোমার মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে।'

'মানে?' বেশ অবাকই হল বিনোদ, 'কী নিয়ে ভাবার কথা বলছ!'

'বিষুণলালজির সঙ্গে তোমার কথা শেষ হলে আমরা হাঁটতে শুরু করেছিলাম। তারপর শুধু হাঁটছিই। কিন্তু কতদূর চলে এসেছি, জানি না। এদিকে সন্ধে নামছে। এখনও পর্যন্ত রামবনবাসজিদের দেখতে পাইনি। কোথায় যে গেল ওরা'—

বিনোদ বলল, 'ফিকর মাত করনা ভাইয়া। ওরা কোথায় আর যাবে। ঠিক দেখা হবে।'

'সন্ধে হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে কুয়াশা আর অন্ধকারে ডুবে যাবে চারদিক। রামবনবাসজিদের কীভাবে খুঁজে পাব?' বলতে বলতে দাঁড়িয়ে পড়ল আসলাম।

'আরে ভাই, পরশু রাত্তিরে বিপিন আর হারানের ছেলে আর বউদের চিতায় তুলে পুড়িয়ে মাঝরাতে সেই গাছগুলোর তলায় রামবনবাসজিদের পেয়েছিলাম তো। সেদিনও অন্ধকার আর কুয়াশা ছিল। পেলাম কী করে? আসলামের পিঠে আলতো করে ঠেলা দিয়ে বিনোদ বলল, 'চলতে রহো দোস্ত—'

দু'জনে চুপচাপ হাঁটতে লাগল। খানিকটা চলার পর হঠাৎ বিনোদের চোখে পড়ল, ডানদিকের মাঠে অনেক দূরে কারা যেন নড়াচড়া করছে। কুয়াশা আর অন্ধকার দ্রুত ঘন হওয়ায় ঠিক স্পষ্ট নয়, তবু মনে হচ্ছে মানুষই। কী ভেবে সে থেমে গেল।

দেখাদেখি আসলামও। সে বলল, 'আমাকে চলতে রহো বলে তুমি দাঁড়িয়ে গেলে। ব্যাপারটা কী বলো তো—'

ডানদিকে ডানহাতের তর্জনীটা বাড়িয়ে দিয়ে বিনোদ বলল, 'আমার আঙুল যেদিকটাকে দেখাচ্ছে সেই দিকে খুব ভালো করে তাকাও।'

'কী আছে ওখানে? রামবনবাসজিরা?'

'আরে বাবা, যা বলছি আগে সেটা কর। তাকাও-তাকাও—' বিনোদ তাড়া দিতে লাগল।

কথামতো একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল আসলাম। মিনিট তিনেক বাদে বিনোদ জিজ্ঞেস করল, 'কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

চোখ না সরিয়ে আসলাম বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে মানুষই—'

'আর কিছু দেখা যাচ্ছে?'

চোখের দৃষ্টি স্থির রেখে আসলাম বলল, 'মাঠের মাঝখান দিয়ে রাস্তা ঠিক ডানদিকে না, আরেকটু কোনাকুনি হয়ে কোন দিকে গেছে বুঝতে পারছি না। রাস্তা কিন্তু পাকা।'

'শাবাশ মেরা প্যায়ারে দোস্ত। তোমার নজরের বহুত জোর। পুরা ফোর ফর্টি ভোল্ট। তুমি যা যা দেখেছ, আমি তাই তাই দেখছি। এবার বল, যাদের মানুষ মনে হচ্ছিল তারা সচমুচ মানুষ তো?'

'হ্যাঁ মানুষই। দু'চারজন নয়, কমসে কম পঞ্চাশ-ষাট জন তো হবেই। ওই পাক্কিটা (পাকা রাস্তা) দিয়ে আসছে। দেখতে পাচ্ছ?'

এতক্ষণে কাল-পরশুর মতো আকাশে বাঁকানো কাস্তের মতো সেই একফালি চাঁদটা উঠে এসেছে। মাথার ওপর যে দিকেই তাকানো যাক আকাশ জুড়ে চোখের পলকে হাজার হাজার নক্ষত্রের মেলা বসে গেল। কাল আর পরশুর মতো আজও মহাশূন্য থেকে চাঁদ-তারার নির্জীব আলো নীচের এই ধুধু জনশূন্য মাঠে নেমে এসেছে। সেই ফিকে আলোয় পাকা রাস্তাটার দিকে তাকিয়েছিল বিনোদ। আপন মনেই যেন বলল, 'ওরা কারা? এই রাত্তিরবেলা ফাঁকা মাঠের ভেতর দিয়ে এদিকে কোথায় যাবে?'

'তাজ্জব ব্যাপার। ভাই, তোমার মতো মানুষ আমি আগে কখনও দেখিনি।' আসলাম বলল।

'কী বলতে চাইছ? কীসের তাজ্জব?' মুখ ফিরিয়ে আসলামের দিকে তাকাল বিনোদ।

'ওরা মনে হয় এদিকে কোথাও থাকে। দূরে কোনও দরকারে গিয়েছিল। এখন ফিরে আসছে।'

'আমার কিন্তু এখন তা মনে হচ্ছে না।' বিনোদের চোখ আবার পাকা রাস্তার মানুষগুলোর দিকে চলে গেল।

'দেখ ভাই, কানপুর থেকে ধরমদাসদের লাশ নিয়ে বিষুণলালজিরা যখন আসছিল, আমাদের সবাইকে নিয়ে তুমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলে। তারপর কতটা সময় বেফায়দা নষ্ট হয়েছে ভেবে দেখ। রামবনবাসজিদের এগিয়ে যেতে বলে তুমি বিষুণলালজির সঙ্গে পার্বতী আর কমলার ব্যাপারে কথা বলতে গেলে। সেখানেও গেল অনেকটা সময়। এখন আমরা সাথিদের খোঁজে চলেছি, রাতও বাড়ছে। ওরা যে চুলোয় খুশি যাক, আমাদের মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই। সেই সকাল থেকে শরীরের ওপর দিয়ে কী যাচ্ছে ভাবো তো। হাঁটতে হাঁটতে হাত-পা কোমরটোমর যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছে। চোখ মেলে রাখতে পারছি না। কোথাও শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচি। চল তো, চল—'

তার কথাগুলো খুব সম্ভব বিনোদের কানে ঢোকেনি। দূরে মাঠের দিকে যেমন তাকিয়েছিল তেমনই তাকিয়ে থেকে হঠাৎ গলার স্বর উঁচুতে তুলে খুব ব্যস্তভাবে বলল, 'দেখ, দেখ, মেয়েমানুষ আর বাচ্চাকাচ্চা বাদে বাকি পুরুষগুলোর ঘাড়ে মাথায় বাক্স-বিছানা ব্যাগ। কয়েকজন মোটরের টায়ার লাগানো দুটো ঠেলাগাড়ি টানতে টানতে নিয়ে আসছে। ঠেলা দুটোর ওপর মালপত্র নেই। কারা যেন ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে। দেখতে পাচ্ছ?'

শুনতে শুনতে কৌতূহল হচ্ছিল। ক্ষণিকের জন্য হাত-পা কোমরের টনটনানি ভুলে গিয়ে আসলাম ফের মাঠের সেই অচেনা আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ঠিকই বলেছ। ঠেলা দুটোর ওপর যারা বসে আছে তাদের অনেক বয়স। বুড়োবুড়ি। এরা ছাড়াও আরও কী যেন আছে।'

'আর কী, বোঝা যাচ্ছে?'

'না—' মাথাটা ডাইনে-বাঁয়ে নাড়তে লাগল আসলাম।

একটু ভেবে বিনোদ বলল, 'তুমি বলেছিলে ওরা এদিকেই কোথাও থাকে। আমি তখনও বলেছি, এখনও বলছি ওরা এই এলাকার লোক নয়।'

উত্তর দিতে যাচ্ছিল আসলাম। তার আগেই চোখে পড়ল পাক্কি দিয়ে আসতে আসতে সেই লোকগুলো থেমে গেছে। যাদের ঘাড়ে মাথায় লটবহর ছিল চটপট পথের ডানদিকে নামিয়ে রাখল। ঠেলাওয়ালারা গাড়ি দুটোকে সওয়ারিসুদ্ধ রাস্তা থেকে নামিয়ে মালপত্রগুলোর পাশে রেখে এল। নানা বয়সের মেয়েমানুষরা বাচ্চাগুলোকে সঙ্গে নিয়ে ঠেলাগাড়িগুলোর কাছাকাছি শতরঞ্চি বিছিয়ে বসে পড়ল।

এদিকে কয়েকজন, চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের ভেতর বয়স, পাঁচ ছ'টা লণ্ঠন জ্বেলে ফেলেছে। তেজি আলোয় এখন মাঠের মাঝখানের ওই অংশটুকু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আরও চোখে পড়ল লণ্ঠন জ্বেলেই ওই লোকগুলো হাতে কোদাল আর দা নিয়ে রাস্তার বাঁদিকে নেমে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে রুক্ষ, বন্ধ্যা মাঠের মাটি কোপাতে লাগল।

অবাক চোখে বিনোদ আর আসলাম কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর আসলামই শুরু করল, 'কী ব্যাপার বল তো। রাত্তিরে মাঠ খুঁড়ছে কেন? কিছু বুঝতে পারছ?'

‘কী বুঝব বল। এমন অদ্ভুত কাণ্ড আগে কখনও দেখিনি। গুপ্তধন না কী যেন বলে মাটি খুঁড়ে মনে হয় তাই বের করবে। চল তো, মাটির তলা থেকে মণিমুক্তো কী বেরয় দেখা যাক। এই চান্স জিন্দেগিতে আর মিলবে না।’

শরীরের পুরোটাই প্রায় বেহাল। পিঠ, শিরদাঁড়া, হাঁটু, গোড়ালি— সব টনটন করছে। খানিকক্ষণ আগেও মাঠের ওই অচেনা মানুষগুলো সম্পর্কে এতটুকু আগ্রহ ছিল না আসলামের। কীভাবে নিজের সঙ্গীদের খুঁজে বের করে তাদের পাশে বিছানা পেতে শুয়ে পড়বে, এছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছিল না সে। তারপর বিনোদের কথায় একটু একটু করে কৌতূহলটা বাড়ছিল। এখন তার মাত্রাটা আরও বেড়েছে।

আসলাম বলল, ‘চল—’

‘একটু দাঁড়াও। দু’দিন ধরে ব্যাগ বিছানাটিছানা বয়ে বয়ে হাত আর কাঁধ যন্ত্রণায় যেন ছিঁড়ে পড়ছে। ওগুলো এখানে নামিয়ে রেখে যাই—’ বিনোদ বলল।

‘কিন্তু এখানে—’ বাকিটা শেষ না করে থেমে গেল আসলাম।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনোভাবটা আঁচ করে নিল বিনোদ। হেসে হেসে বলল, ‘খুব চিন্তা হচ্ছে, তাই না? আরে বাবা, গিরিরাজজির ট্রাক থেকে নামার পর কয়েকশো কিলোমিটার হাঁটা হয়ে গেছে। এরমধ্যে আমরা ছাড়া রাস্তায় আর কোনও লোকজন চোখে পড়েছে? শিউপুরার বিষুণলালজিরা ছাড়া একজনও না। তাও ওরা অন্য দিক থেকে আসছিল। রাস্তার দু’দিকে ডাইনে-বাঁয়ে তাকাও, ধুধু করছে। চুরি যে করবে তেমন কেউ নেই এখানে।’

‘ঠিক আছে—’ আসলাম একটু হাসল।

কাচ্চির একধারে নিজেদের মালপত্র নামিয়ে রেখে দু’জন মাঠে নেমে হাঁটতে লাগল। যেখানে মাটি কোপানো হচ্ছে, কিছুক্ষণের মধ্যে তারা সেখানে পৌঁছে গেল।

দূর থেকে চোখে পড়েছিল, একধারে শতরঞ্চি বিছিয়ে মেয়ে আর বাচ্চার দল বসে আছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন চাপা শব্দ করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বাকিরা তাদের শান্ত করতে চেষ্টা করছে। বাচ্চাগুলো ফ্যালফ্যাল করে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

কাচ্চি থেকে কান্নার শব্দ শোনা যায়নি। এই রাত্রিবেলায় বিশাল ফাঁকা মাঠের মাঝখানে বসে কেন তারা কাঁদছে? কারণটা কী? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কয়েক মিনিট অবাক তাকিয়ে রইল বিনোদরা। তারপর তাদের চোখ চলে গেল পাশের ঠেলাগাড়ি দুটোর দিকে। একটা ঠেলাগাড়িতে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে সাত আটজন বয়স্ক মানুষ। গায়ের চামড়া কুঁচকে ঝলঝল করছে। ক্ষয়ে ক্ষয়ে শরীরের সারবস্তু বলে কিছু নেই। কণ্ঠার হাড়, চোয়াল ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। মাথায় পাটের ফেঁসোর মতো কয়েক গোছা চুল, ভাঙা গাল, গর্তে ঢোকানো চোখের তারা দুটো ঘোলাটে। সবারই বয়স আশি পেরিয়েছে। অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসতে বেশি দেরি নেই। মানুষ নয়, মনে হয়, কাঠের মূর্তি। অসাড়, নিষ্প্রাণ।

এবার দু’নম্বর ঠেলাগাড়িটার দিকে তাকাল বিনোদ। কয়েকজন পাশাপাশি শুয়ে আছে। গলা অবধি চাদর টানা। চোখ বোজা। বোধহয় ঘুমোচ্ছে। মুখ দেখে আন্দাজ করা যায় এদের বয়সও আশি ছুঁই ছুঁই, কিংবা আশি পেরিয়েছে।

‘আপলোক!’ আচমকা পেছন থেকে কেউ বলে উঠল।

চমকে উঠে ঘুরে তাকাল বিনোদরা। পনেরো-ষোলো জনের একটা দল। যারা মাটি কোপাচ্ছিল আর যারা তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল, মাঠ থেকে তারা চলে এসেছে। সবার চোখেমুখে কেমন একটা ভয়ের ছাপ।

বিনোদ পাল্টা জিজ্ঞেস করল, 'আপলোগন কঁহাসে আতে হে—'

সবার সামনে যে মধ্যবয়সি লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, সে ঢোঁক গিলে বলল, 'রাজস্থান, জয়পুর—'

'আপ সব কেয়া জয়পুরকা রহনেবালা?'

'নেহি নেহি, হামসব বঙ্গালি—'

'আপনারা বাঙালি। আমরাও বাঙালি। আমার নাম বিনোদ আর এ হল আমার বন্ধু আসলাম। আমার বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় সোনারপুরের কাছে একটা গ্রামে। ওর বাড়িও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় আমতলার কাছে একটা গ্রামে—' বলে একটু হাসল বিনোদ।

দু'চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে তাকিয়েছিল পুরো দলটা। তাদের চোখ-মুখ থেকে সিঁটিয়ে থাকা ভাবটা কেটে গেছে। সেই লোকটা বলল, 'কী ভয়টাই যে পেয়েছিলাম! আপনারা বাঙালি শুনে ভালো করে নিশ্বাস ফেলতে পারছি।'

'কীসের ভয়?'

'পরে বলছি ভাই। আগে নিজেদের পরিচয়টা দিই। আমার নাম গণেশ মণ্ডল আর এরা সবাই আমার বন্ধু। ওরা হল শেখ আলতাফ, নগেন জানা, পশুপতি হালদার, কেষ্টপদ হালদার, জলিল, ষষ্ঠী গায়েন, তাজিমুদ্দিন, রাখাল দাস, নরেশ গায়েন, নরেশের দাদা সুরেশ, শশধর, মধু সামন্ত, কেশব নন্দী, কার্তিক বিশ্বাস, কার্তিকের ভগ্নীপতি জগন বিশ্বাস আর তোরাব আলি। আমাদের সবার বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাটে। আমরাও আগাপাস্তলা বাঙালি।'

'আপনারা তো জয়পুর থেকে আসছেন। এতজন সেখানে কি বেড়াতে গিয়েছিলেন?' বিনোদ জানতে চাইল।

'আমরা বেড়াতে গেছি, কী বলছেন আপনি! সেই কবে থেকে করোনায় সারা দুনিয়া উজাড় হয়ে যাচ্ছে। সেই মারণ-ব্যামো আমাদের দেশেও মড়ক লেগেছে চারদিকে। এই যখন হাল, শখের বেড়ানোর কথা কেউ ভাবতে পারে?'

'তাহলে?'

গণেশ মণ্ডল যা জানাল তা এইরকম— তারা আট বছর ধরে জয়পুরে দিনমজুরের কাজ করছে। বউ ছেলেমেয়ে বাপ-মা, পুরো পরিবারটাকে জয়পুরে নিয়ে গেছে। দেশের বাড়িতে তালা লাগানো থাকে। দুর্গাপুজো, ঈদ, এইরকম সব বড় উৎসব-পরবে বসিরহাটে এসে মাসখানেক কাটিয়ে আবার কাজের জায়গায় ফিরে যায়। কিন্তু এ বছর করোনার প্রকোপ থেকে বাঁচতে দেশ জুড়ে লকডাউন করা হয়েছে। গণেশদের রুজি-রোজগার সব চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেছে। জয়পুরে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে কী হবে? সেখানে থাকলে বাচ্চাকাচ্চা বুড়ো মা-বাপসুদ্ধু সবার কপালে উপোস দিয়ে মরণটা নাচছিল। পথের ধারে মরে পড়ে থাকতে হতো। শিয়াল-শকুনেরা তাদের শরীরগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত। তাই সংসার তুলে নিয়ে তারা বসিরহাটে ফিরে যাচ্ছে।

সবটা শুনিয়ে গণেশ মণ্ডল করুণ গলায় বলল, 'কটা বছর জয়পুরে ভালোই কেটেছে। করোনা সব শেষ করে দিলে।'

সবাই নীরবে শুনে যাচ্ছিল। এবার আসলাম জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের তো কলকাতা হয়ে বসিরহাটে যাবার কথা। রাত্তিরবেলা এই মাঠে চলে এসেছেন যে?'

গণেশ মণ্ডল বলল, 'দেশের সবাই জানে লকডাউনে রেল বাস সব বন্ধ হয়ে গেছে। পথে নেমে তিনদিন ধরে এ রাস্তায় সে রাস্তায় পাক খেতে খেতে এদিকে চলে এসেছিলাম। কয়েকজন বললে, এ মাঠের মাঝখান দিয়ে পাকা রাস্তাটা গেছে ওটা ধরে গেলে পূর্ণিয়ায় যাওয়া যাবে। সেখান থেকে কলকাতায় যাবার একটা ব্যবস্থা হতে পারে। সেই আশায় এখানে চলে এসেছি। কিন্তু আসলামভাই, বিনোদভাই, আপনাদের সম্বন্ধে তেমন কিছু তো জানতে পারিনি। আপনারা হঠাৎ কোত্থেকে কেনই বা রাত্তিরবেলা এই মাঠে চলে এসেছেন, বুঝতে পারছি না।'

বিনোদ বলল, 'আমাদের হালও আপনাদের মতোই—'

'কীরকম?'

বাড়িঘর ছেড়ে সাহানপুরে এসে অনেকে কলকারখানায় কাজ করে, অনেকে নদীর বাঁধ বা রাস্তা তৈরি, বা আবাসনের বিল্ডিং বানিয়ে রোজগারটা বেশ ভালোই করছিল। দিনগুলো চমৎকার কেটে যাচ্ছিল। আচমকা করোনা আর লকডাউনে সব বরবাদ হয়ে গেল। কাজকর্ম খুইয়ে তারা দু'শো পঁচিশজন শ্রমিক— বাঙালি, বিহারি এবং ওড়িয়া, নিজের নিজের দেশের বাড়িতে ফেরার জন্য সাহানপুর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু তারাও তিনদিন ধরে পাক খেতে খেতে এখানে চলে এসেছে। এখনও দেশে ফেরার দিশা কেউ পায়নি। ঘুরতে ঘুরতে, পাক খেতে খেতে এখানে চলে এসেছি।

সবটা শোনাবার পর একটু মজা করেই বিনোদ বলল, 'ইয়ে হামারে কহানি—' বলে হেসে ফেলল।

ওদিক থেকে আলতাফ বলল, 'আপনারা তো মোটে দু'জন। বাকি সবাই?'

'ওরা কাচ্চি ধরে এগিয়ে গেছে। মাঠের মাঝখানে লণ্ঠনের আলো আর এত মানুষজন দেখে ভাবলাম কী ব্যাপার দেখে আসি।' উত্তরটা দিল আসলাম। আলতাফ বিনোদ এবং আসলামের সঙ্গীদের সম্বন্ধে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

আসলাম কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই হঠাৎ বিনোদ শুরু করে দিল, 'আলো, অনেক মানুষের জটলা, ঠেলাগাড়ি, এসব দেখেও হয়তো আসতাম না। কিন্তু একটা ব্যাপার চোখে পড়ায় খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তাই আমরা না এসে পারিনি।'

গণেশ মণ্ডল তাকে লক্ষ করছিল। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?'

'আপনারা এই রাত্তিরবেলায় মাঠের মাটি কুপিয়ে চলেছেন। আমরা এসে পড়ায় ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে মাটি কোপানো থামিয়ে দিলেন। এসবের কারণ কী?'

গণেশ মণ্ডল, শুধু সে-ই নয়, তার বসিরহাটের বন্ধুরাও ভীষণ হকচকিয়ে গেল। মাটি খোঁড়ার ব্যাপারটা যে বিনোদদের চোখে ধরা পড়ে গেছে এটা তারা বুঝতে পারেনি। গণেশ বারকয়েক ঢোক গিলে বলল, 'আপনারা যখন এলেন, সত্যি ভয় পেয়ে গেছিলাম। মনে হয়েছিল আপনারা এখানেই কোথাও থাকেন। চেঁচিয়ে হল্লা মচিয়ে মাঠের মালিক আর এলাকার লোকজন জড়ো করে ফেলবেন। তারা এসে আমাদের বিলকুল খালাস করে দিয়ে যাবে।'

'করোনা আর লকডাউনে আপনারা আমরা সবাই সব খুইয়ে বাড়ির পথে পা বাড়িয়েছি। সবাই আমরা এক ডালকা পঞ্ছি। বুঝতেই পারছেন আমাদের ভয় পাওয়ার কারণ

নেই—' হেসে হেসে বলল বিনোদ।

গণেশ মণ্ডলের পাশ থেকে সিড়িঙ্গে চেহারার জগন বিশ্বাস বলে উঠল, 'ভয় কিন্তু পুরোটা যায়নি।'

একটু অবাক হয়েই বিনোদ জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'আমাদের এখানকার কাজ এখনও সারা হয়নি। অনেক সময় লাগবে। তার ভেতরে মালিক দলবল নিয়ে এসে পড়তে পারে। আমরা তখন জানে বাঁচব না।'

উত্তরটা দিল আসলাম, 'আড়াই দিন ধরে আমরা এখানে ওখানে চক্কর মারছি। বেশিরভাগই এইরকম পাথুরে মাঠা কোনও দিন এই জমিনে একগোছা ধান গজিয়েছে বলে মনে হয় না। এইসব মাঠের মালিকফালিক থাকতেই পারে না।'

জগন বিশ্বাস জবাব হাতড়াতে থাকে। খানিকক্ষণ ভেবে বলল, 'কী যে বলো ভাই'—

একটু চুপচাপ।

তারপর আগের কথার খেই ধরে বিনোদ জানতে চাইল, 'কী জন্যে এত ভয়? কাজটা কী?'

জগন বিশ্বাস এর ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। বলবে কি বলবে না ঠিক করতে পারছে না।

গণেশ মণ্ডল তার দিকে তাকিয়ে ছিল। হয়তো তার মনে হল, জগন গুছিয়ে জবাব দিতে পারবে না। হাত তুলে তাকে বলল, 'জগনদা, আমিই বলি। যদি ভুলভাল হয় শুধরে দিও।'

'সেই ভালো, সেই ভালো—' জগন যেভাবে বলল, তাতে মনে হয় বেঁচে গেছে।

গণেশ মণ্ডল মুখ ফিরিয়ে কিছুক্ষণ বিনোদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'কাজটা বড্ড কষ্টের গো বিনোদভাই—।'

কী ধরনের কষ্ট, বোঝা যাচ্ছে না। বিনোদ উত্তর না দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

গণেশ বলতে লাগল, 'লকডাউন হবার পর জয়পুরে আর থাকা গেল না। ওখানকার সংসার তুলে নিয়ে পথে নামতে হল। আমাদের, আমাদের বউদের বয়স কম, শরীরে তাকত আছে। ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে কোলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। কিন্তু আমাদের বাবা, আব্বা, মা আম্মিদের কারও বয়স আশির নীচে নয়। জয়পুরেই তাদের ঠেলাগাড়িতে তোলা হয়েছিল। আমরা তাদের ছেলেরা পালা করে গাড়ি দুটো ঠেলতে লাগলাম।

'দিন ফুরোয়, রাত নামে। বাজারের ফাঁকা জায়গা বা ছেলেদের খেলার মাঠটাঠ পেলে রাত কাটিয়ে আবার হাঁটা আর ঠেলাগাড়ি ঠেলা শুরু। এইভাবেই চলছিল। জয়পুরে থাকতেই আমাদের তিন বাবা আর আব্বাকে করোনায় ধরেছিল। তখন বোঝা যায়নি। কিন্তু পথে চলতে চলতে রোগটা খুব খারাপ দিকে চলে যায়। কিন্তু কোথায় ডাক্তার, কোথায় কোবরেজ আর কোথায়ই বা হাসপাতাল। তাদের বাঁচানো যায়নি। আরও চারজন বাবা আব্বার করোনা হয়নি তবে আগে থেকেই শ্বাসের কষ্ট, জখম হার্ট, পেটের লাগাতার যন্ত্রণা— এইরকম সব রোগ ছিল। তারা রাস্তার ধকল সইতে পারেনি। রাস্তাতেই সব শেষ।'

বলতে বলতে গলার স্বর বুজে গেল গণেশের। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

হঠাৎ বিপিন আর বিষুণলালজিদের কথা মনে পড়ে গেল বিনোদের। তাদের একদল আসছিল লখনউ থেকে, আরেক

দল কানপুর থেকে, আরও একদল এলাহাবাদ থেকে। পথেই তাদের প্রিয়জনদের মৃত্যু হয়েছে। স্বজন হারানোর শোকে তারাও ভেঙে পড়েছে।

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল বিনোদের। মনে মনে ভাবল, দেশের বাড়িতে পৌঁছবার আগে পথে আরও কত মৃতদেহ আর তাদের শোককাতর স্বজনদের দেখতে হবে!

গণেশ মণ্ডল কিছুটা সামলে নিয়ে মুখ থেকে হাত সরাল। তারপর কান্নাজড়ানো গলায় বলতে লাগল, 'বাবা আব্বাদের মৃত্যুর পর ঠেলাগাড়িতেই চাদরে ঢেকে শুইয়ে রেখেছি। যাতে দেহগুলো ঠেলাগাড়ির ঝাঁকনিতে পড়ে না যায় তাই দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। কিন্তু সমিস্যেটা হল, বাড়িতে ফেরার পথ জানা নেই। আর এক-আধ দিন পরে দেহগুলোতে পচ (পচন) ধরবে। কী যে করব! পথে আসতে আসতে বেশ কটা শ্মশানমশান আর গোরস্থান চোখে পড়েছে কিন্তু কোত্থাও ঘেঁষতে পারিনি। লাঠি ডান্ডা তুলে রে রে করে আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে।'

বলতে বলতে ফের সে কেঁদে উঠল। তবে হাত দিয়ে মুখ ঢাকল না, থেমেও গেল না, 'বিনোদ ভাই আমাদের জন্য দুনিয়ার কোথাও শ্মশান আর কবরস্থান নেই।'

গণেশের আশপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারাও যে কাঁদতে শুরু করেছে, বিনোদ লক্ষ করেনি। তার মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল।

গণেশ মণ্ডল বলেই চলেছে, 'ঘুরতে ঘুরতে আজ বিকেলে এই মাঠে চলে এসেছি। চারদিক ফাঁকা, ধুধু, জনমনিষ্যি নেই। হঠাৎ করে চিন্তাটা মাথায় এল। দেশের ভিটেতে গিয়ে যে শেষ কাজটা করব তার উপায় নেই। যা করার এখানেই করতে হবে। আমরা হিন্দু-মুসলমান বন্ধুরা বসে ঠিক করলাম, আমাদের বাবা আর আব্বাদের চিরকালের মতো এখানকার মাটির তলায় রেখে চলে যাব।'

শোকাতুর মানুষগুলো কেঁদেই চলেছে। আচমকা ডানপাশ থেকেও অনেকের কান্নার আওয়াজ কানে আসায় বিনোদ আর আসলাম সেদিকে তাকাল। অচেনা কেউ নয়। কাচ্চি থেকে আসার সময় চোখে পড়েছিল দুটো ঠেলাগাড়ির পাশে নানা বয়সের মেয়েরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে গোঙানির মতো আওয়াজ করে কাঁদছিল। গণেশদের কাঁদতে দেখে স্বজন হারানোর শোকটা তাদের এখন অনেক বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে। গলার স্বর উঁচুতে তুলে কেঁদেই চলেছে সেই সঙ্গে উন্মাদের মতো বুক আর কপালে দু'হাতে চাপড়াতে চাপড়াতে ভেঙে পড়ছে।

ওধারের একটা ঠেলাগাড়িতে সাত-আটজন বুড়োবুড়ি কাঠ বা পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। ঠিক আগের মতোই। জীবন্ত মানুষ বলে তখনও মনে হয়নি, এখনও নয়। চারপাশে এত বিলাপ, এত কান্না, নিদারুণ শোকের এমন উতরোল প্রকাশ— কিছুই যেন তাদের ছুঁতে পারছে না।

একটু লক্ষ করতেই গণেশের চোখে পড়ল কোটরের ভেতর থেকে দু'চার ফোঁটা জল বেরিয়ে এসে শুকনো গালের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে যাচ্ছে। নিঃশব্দ এই অশ্রুবর্ষণ মৃত কটি মানুষকে খুব সম্ভব শেষ বিদায় জানাচ্ছে।

আসলাম গণেশের কানের কাছে মুখ এনে নিচু গলায় বলল, রাত কিন্তু বাড়ছে। এবার চল'—

আনমনা গণেশ কিছু ভাবছিল। চমকে উঠে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ চল।' গণেশ মণ্ডলরা কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। সে তার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'শান্ত হোন। আপনাদের কিন্তু অনেক কাজ বাকি।'

গণেশ মণ্ডলের হুঁশ ফিরল। শোকের ধাক্কা খানিকটা কাটিয়ে বলল, 'ঠিকই বলেছেন, অনেক কাজ। এখনই শুরু করতে হবে।'

'এবার আমাদের যেতে হবে গণেশ ভাই।' বিনোদ তার হাতটা ছেড়ে দিল।

'এখনই যাবেন? আপনারা এসেছেন। আমাদের মনের জোরটা বেড়ে গিয়েছিল। আরেকটু থাকুন না।' গণেশের গলার স্বরটা করুণ শোনাল।

'আর থাকা সম্ভব নয়। আমাদের সঙ্গীদের খুঁজে বের করতে হবে। তারা কোথায় কতদূরে চলে গেছে, জানি না। চলি—'

গণেশ মণ্ডল কিছু বলল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ওদের সবার দিকে হাত নেড়ে বিনোদ আর আসলাম কাচ্চির দিকে হাঁটতে লাগল।

॥ চোদ্দো ॥

মাঠের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে বিনোদ বলল, 'একটা কথা ভেবে দেখেছ?'

'কী বল তো—' উৎসুক চোখে তার দিকে তাকাল আসলাম।

'আমাদের রাজ্য থেকে দেশের অন্য সব রাজ্যে রুজি-রোজগারের খোঁজে কত মানুষ যে চলে গিয়েছিল। তারা কতজন হতে পারে? কী মনে হয় তোমার?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে আসলাম বলল, 'সব মিলিয়ে লাখখানেক।'

'কী বলছ তুমি! কমসে কম চার পাঁচ লাখ।' বিনোদ বলতে লাগল, 'শুধু ইউপি আর রাজস্থান নয়, এরা দলে দলে চলে গিয়েছিল মহারাষ্ট্র, গুজরাত, এমপি, হরিয়ানা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু— এইসব রাজ্যে। লকডাউনে আমাদের মতো তারাও যে যার দেশের বাড়িতে নিশ্চয়ই ফিরে আসছে। যারা ফিরছে তারা সবাই তাদের বাড়ি অবধি পৌঁছতে পারছে না, পথেই বেঘোরে মরে যাচ্ছে।'

আসলাম জবাব দিল না। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

বিনোদ বলেই চলেছে, 'এই যে দু'দিন ধরে হাঁটছি তার মধ্যে কতগুলো ডেডবডি দেখলাম বল তো। কবে, কত দিনে দেশের বাড়িতে ফিরতে পারব কে জানে। ততদিনে আরও কত ডেডবডি যে দেখব।' একটু চুপ করে থেকে ফের শুরু করল, 'গুজরাত, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কেরালা এমন রাজ্যগুলো থেকে নানা দিক দিয়ে যারা দেশে ফিরছে তারা সবাই তো আর ফিরতে পারবে না। হয় পথে বেওয়ারিশ লাশ হয়ে পড়ে থাকবে। নইলে মাঠের মাঝখানে যেমনটা দেখে এলাম ঠিক সেইভাবে তাদের সঙ্গীসাথি বা আপনজনেরা তাদের লাশগুলো কোনও পোড়ো জমি পেলে পুঁতে রেখে চলে যাবে। তেমন কোনও জমি না পাওয়া গেলে লাশগুলোর কী গতি হবে জানো?'

'কী?' আসলাম জানতে চাইল।

সঙ্গীরা লাশগুলো পথের ধারে ফেলে রেখে হাত ঝেড়ে ফেলবে। শকুন আর শিয়ালের পাল ডেডবডিগুলো নিয়ে তোফা ভোজের আসর বসিয়ে দেবে। আমাদের মতো মজুরদের নিয়ে দেশ জুড়ে যেন মড়ক লেগেছে। শুধু মৃত্যু মৃত্যু আর লাশের পাহাড়।'

একসময় কাচ্চিতে এসে বিনোদ আর আসলাম তাদের

বাক্স-বিছানা তুলে নিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে লাগল।

রাত আরও অনেকটাই বেড়েছে। কুয়াশা আর অন্ধকার আরও গাঢ় হয়েছে। আঁধার আর কুয়াশা ভেদ করে যেদিকে যতদূর নজর যায় তারা দু'জন ছাড়া আর একজনও জীবন্ত প্রাণী নেই। চারপাশে অপার নৈঃশব্দ।

অনেকটা হাঁটার পর আসলাম বলল, 'কোথাও তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। না গ্রাম, না শহর, না মানুষজন। রামবনবাসজিরা কোথায় গেছে বুঝতে পারছি না।' তাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে।

'যাবে আর কোথায়। কাচ্চির দু'ধারে নজর রেখে হাঁটতে থাকো। ঠিক পেয়ে যাবে। ফিকর মাত করনা মেরা দোস্ত—' নির্বিকার ভঙ্গিতে একটু হাসল বিনোদ।

পথের দু'ধারে ঝোপজঙ্গল, মাঝে মাঝে মজা খাল এবং পোড়ো জমি। সঙ্গীদের কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

আসলাম অস্থির হয়ে উঠল, 'ওরা কি আমাদের ফেলে চলে গেছে?'

'অত ভয় কীসের। আরও খানিকক্ষণ হেঁটে দেখাই যাক না। চল, চল—' আসলামের পিঠে আলতো করে ঠেলা দিল বিনোদ।

হাঁটতে হাঁটতে মাঝরাত পেরিয়ে গেল। তখনও সঙ্গীদের দেখা মিলল না। এদিকে সারা শরীর ভেঙে আসছে আসলামের। কুঁই কুঁই করে ক্ষীণ গলায় বলল, 'আর যে হাঁটতে পারছি না। কী হবে এবার?'

'আমারও হাল বহুত বুরা। হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছে—' বলতে ডান দিকে আঙুল বাড়িয়ে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই ওই, ওদিকে তাকাও। কিছু চোখে পড়ছে?'

দু'জনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আসলাম বলল, 'কী চোখে পড়বে? কোথায়— কোথায়?'

'ভালো করে দেখ। ওই যে—'

'বাড়িঘর মনে হয়। গ্রামই হবে—' আসলাম বলল।

'চল ওখানে—' আসলামকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িগুলোর কাছে চলে এল বিনোদ।

দূর থেকে ঝাপসা ঝাপসা লাগছিল। এখন অনেক স্পষ্ট। সবই টালি আর খড়ের চালের ঘর। ফাঁকে ফাঁকে ইটের দেওয়াল আর মাথায় পুরনো টিনের ছাউনি দেওয়া দু'একটা বাড়ি। প্রায় সব বাড়ির সামনে হাল লাঙল আর বলদ চোখে পড়ছে। দেখেই মনে হয়, গরিব কিষাণদের গ্রাম।

এই মধ্যরাতে গ্রামের একটি প্রাণীও জেগে নেই। গভীর ঘুমে ডুবে আছে। সমস্ত এলাকা এক নিঝুম নিশুতিপুর।

আসলাম বলল, 'এখন কী করব বল তো। গ্রামের লোকজনকে ডাকব?'

বিনোদ চমকে উঠল, 'আহাম্মকের মতো কাজ কোরো না। এখন কারও ঘুম ভাঙালে ডান্ডার বাড়ি খেয়ে খতম হয়ে যাব।'

'তাহলে এইরকম দাঁড়িয়েই থাকব?' আসলাম হতাশার শেষ সীমায় যেন পৌঁছে গেল।

বিনোদ এধারে ওধারে তাকিয়ে স্থির করে ফেলল। তারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশের অল্প একটু জমির ঘাস চেঁছে সাফ করে রাখা হয়েছে। কারণটা নিয়ে মাথা ঘামাল না সে। বলল, 'সামান নামাও। তারপর বিস্তারা পেতে টান টান হয়ে শুয়ে পড়।'

এই মাঝরাতে জোরালো ঠান্ডা হাওয়া ছেড়েছে। বেশ শীত শীত করছে। আগাপাস্তলা চাদর মুড়ি দিয়ে দু'জনে পাশাপাশি শুয়ে পড়ল।

সময় কাটতে থাকে। আসলামের ঘুম আসছে না। একটা দুশ্চিন্তা তাকে পেয়ে বসেছে। কিছুক্ষণ উসখুস করে মাথার ওপর থেকে চাদর সরিয়ে কাত হয়ে তাকাল। পাশের বিছানার চাদরের তলা থেকে জোরে জোরে শ্বাসটানা আর নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ আসছে। বিনোদ নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে ডাকাটা ঠিক হবে কি? চিন্তাটা তাকে সমানে খুঁচিয়ে চলেছে। দোনোমনো করে শেষ পর্যন্ত ডেকেই ফেলল, 'বিনোদ—'

এক ডাকে কাজ হল না। পাশের বিছানায় শ্বাসটানা শ্বাস ফেলার একটানা সেই শব্দটা চলছেই।

আসলাম মনস্থির করে ফেলল। গলা উঁচুতে তুলে ডাকতেই লাগল। একবার, দু'বার, তিনবার, চারবার। পাঁচবারের পর একটানে চাদর সরিয়ে মাথা বের করে ঘুম-জড়ানো গলায় বিনোদ বলল, 'কী হয়েছে, কানের পর্দা ফাঁসিয়ে ফেলবে নাকি?'

'কাল সকালে কী হবে?' শরীরটাকে টেনে কাছাকাছি এসে জিজ্ঞেস করল আসলাম।

'এই ব্যাপার? কাল সকালে যা হবার তাই হবে। ফিকর মাত করনা দোস্ত। ভেবে ভেবে তোমার ঘুম আর আমার ঘুমের বারোটা বাজিও না। সরে নিজের জায়গায় গিয়ে মাথার ওপর চাদর চাপাও। আমিও চাপাচ্ছি—'

বিনোদ চাদর টানতে যাবে, তার আগেই ভীষণ ব্যস্তভাবে বাধা দিল আসলাম, 'না না, আমার আরেকটা কথা আছে।'

'আবার কী কথা?'

'রামবনবাসজিরা কোথায় কতদূরে চলে গেছে, কিছুই জানি না। তাদের পাওয়া না গেলে—' খুব ব্যাকুলভাবে বলল আসলাম।

ঘুমে বুজে আসা চোখ দুটো পুরোপুরি মেলে বিনোদ বলল, 'পাওয়া না গেলে যাবে না। এবার মাথার ওপর চাদর চাপাও, আমিও চাপাচ্ছি।' বলেই চাদর টেনে নিজের মাথা মুখ ঢেকে ফেলল বিনোদ।

কী বলবে ভেবে পেল না আসলাম। ধীরে ধীরে চাদর দিয়ে সারা শরীর মুড়ে শুয়ে পড়ল। বিনোদের মতো এমন আশ্চর্য মানুষ আগে কখনও দেখেনি সে।

কয়েক লহমা মাত্র। তারপরেই আচমকা পাশের বিছানা থেকে বিনোদ বলল, 'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

'না—' একটু অবাক হয়েই চাদর সরিয়ে মুখ বের করল আসলাম।

চাদরের তলা থেকেই বিনোদ বলল, 'একটা কথা বলতে খেয়াল ছিল না। এখন শোন—'

জবাব না দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল আসলাম।

বিনোদ শুরু করল, 'দেশে ফেরার জন্যে গিরিরাজজির ট্রাকে আমরা যে দু'শো পঁচিশ জন উঠেছিলাম তাদের মধ্যে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন আমার বা তোমার চেনা। সাহানপুরের রাস্তায় মাঝেমধ্যে দেখা হয়েছে। বাকিরা অচেনা। ট্রাকে সারা রাত, পরে দু'দিন হাঁটতে হাঁটতে সবার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ভাবছি একজন আরেক জনকে সাহায্য করবে। কিছু কিছু করছেও। কিন্তু ধর গিরিরাজজির ট্রাকে আমাদের মতো বিশ-পঞ্চাশ জনের জায়গা হল না। আমরা কি হাল ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় বসে থাকতাম? কক্ষণও না, অন্যভাবে দেশে ফেরার চেষ্টা করতাম। তেমনি আমাদের সঙ্গীরা কোথায় কোন দিকে চলে গেছে ভেবে ভেবে তুমি অস্থির হয়ে পড়েছ। তোমার মনে হচ্ছে ওদের না পেলে কীভাবে আমরা দেশে ফিরব? লকডাউনের পর রাস্তায় কতরকম বিপদ। একসঙ্গে অনেকে থাকলে সেসবের মোকাবিলা করা যায়। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?' আসলাম জানতে চাইল।

'আমরা কারও ভরসায় পথে নামিনি। যদি রামবনবাসজিদের সঙ্গে দেখা না হয় হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারব না। আর একটি কথাও নয়। ঘুমিয়ে পড়।' বিনোদ অন্যদিকে কাত হয়ে শুল।

আসলাম ধীরে ধীরে চাদরটা ফের একবার মাথার ওপর টেনে দিল।

॥ পনেরো ॥

কাদের ডাকাডাকিতে বিনোদদের ঘুম ভেঙে গেল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে ধড়মড় করে উঠে বসতে বসতে দেখল তাদের বিছানা দুটো ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের একটা দল। রুক্ষ, ভাঙাচোরা চেহারা। এই দেহাতি মানুষগুলোকে যে উদয়াস্ত খেটে পেটের দানা জোটাতে হয়, পা থেকে মাথা অবধি একবার তাকালেই তা আঁচ করা যায়।

গিরিরাজজির ট্রাক থেকে নামার পর পথে যে দেহাত আর ছোট ছোট শহর চোখে পড়েছে সেইসব জায়গার লোকজনরা ভয়ঙ্কর হিংস্র। লেশমাত্র মায়াদয়া নেই। তাদের দেখেই অনবরত হুমকি দিতে দিতে লাঠি-ডান্ডা নিয়ে তেড়ে এসেছিল। শুধু তাই না, ঝাঁকে ঝাঁকে পাথর আর ইটের টুকরোও ছুড়েছে। রক্তারক্তি কাণ্ড। কয়েকজন তো রীতিমতো জখমই হয়েছে। কিন্তু এই গাঁওয়ের লোকগুলো ঠিক যেন তেমনটা নয়। এখন অবধি হুমকিটুমকি কিছুই দেয়নি। কিন্তু একটু পরে তারা কী মূর্তি ধারণ করবে এখনও আন্দাজ করা যাচ্ছে না। বিনোদদের কপালে কী নাচছে কে জানে।

গাঁওবালারা বিনোদদের লক্ষ করছিল। হঠাৎ মাঝবয়সি জিজ্ঞেস করল, 'আপলোগন?' চেহারা যতই রুক্ষ বা কর্কশ হোক, গলার স্বরটা তার বেশ শান্ত। মোলায়েম।

বিনোদ আর আসলাম ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল। বিনোদ বলল, 'হামলোগ বঙ্গালকা রহনেবালা। নৌকরি করতা হ্যায় বহুত দূর। করোনা আউর লকডাউনকে লিয়ে সব কুছ বন্ধ হো গ্যায়া—'

'শুনা। জরুর শুনা—'

বিনোদ জানাল রুজি-রোজগার হারিয়ে তারা দেশের বাড়িতে ফিরবে বলে কয়েকশো কিলোমিটার পায়ে হেঁটে এখানে এসে পৌঁছেছে। আর পারা যাচ্ছিল না। হাত-পা ছিঁড়ে পড়ছিল। তাই এখানেই বিছানা পেতে শুয়ে পড়েছি।

'এহি জমিন পর। —ইয়ে ঠিক নেহি। কিসিকো বোলনেসে আরামসে রাত গুজার সাকতা। আপ দোনোকো বহুত তখলিফ হুয়া'— মাথা নাড়তে নাড়তে আক্ষেপের সুরে বলল মাঝবয়সি।

'কাল আধি রাত মে ইধর আয়া। কিসকো বোলেঙ্গে। পুরা গাঁও নিদমে থা—'

'আপলোগন কিঁউ গাঁওবালাকা দরবাজা নেহি খটখটায়া?'

'কাল রাতকে বাত ছোড়িয়ে—' বিনোদ বলল, 'ইঁহা তালাও হ্যায়?'

'মুহ্ সাফা করনা হ্যায় তো? আইয়ে মেরা সাথ— মাঝবয়সি বিনোদদের গ্রামের মাঝখানে নিয়ে গেল। সেখানে

কয়েকজন পুরুষ এবং মহিলা বালতি হাতে দাঁড়িয়েছিল। তাদের দূরে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'যাইয়ে উধার।'

মুখ ধুয়ে সেই ফাঁকা জমিটায় ফিরে এল বিনোদরা। সঙ্গে মাঝবয়সি। যে গাঁওবালারা আগেই চলে এসেছিল তারা এখানেই থেকে গিয়েছিল।

বিনোদ হাতজোড় করে বলল, 'আপকা নাম আভিতক নেহি শুনা। বোলিয়ে—'

'ধৌলিচাঁদ—'

'নমস্তে ধৌলিচাঁদজি, ম্যায় আউর মেরা দোস্তকা অব যানা হ্যায়—'

'নেহি নেহি—' হাত নাড়তে নাড়তে ধৌলিচাঁদ বলল, 'বহুত থক গ্যয়া আপলোগন। আজ মাত যাইয়ে। কাল সুবে সুবে যাইয়েগা। এক রোজমে তবিয়ত ঠিক হো যায়েগা।'

বিনোদ রাজি হল না। ধৌলিচাঁদও ছাড়তে চাইছে না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল আজই চা খেয়ে বিনোদরা বেরিয়ে পড়বে।

চা, সেই সঙ্গে লিট্টি, বালুসাই, লাড্ডু দিয়ে সকালের খাওয়া সেরে বাক্স-বিছানা গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় ধৌলিচাঁদ ব্যস্তভাবে বলল, 'কাল আধিরাত আপ দোনো কাঁহাসে হামারে গাঁও আয়া থা?'

'সাহানপুরসে।'

'আপ দোনো বিনোদ আউর আসলাম হ্যায়?'

বিনোদ আর আসলাম অবাক। ধৌলিচাঁদরা তাদের নাম জানতে চায়নি, তাহলে জানল কী করে?

বিনোদ বলল, 'আপ ক্যায়সে—'

তাকে শেষ করতে না দিয়ে ধৌলিচাঁদ পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল, কাল সাহানপুর থেকে দু'শোরও বেশি মজদুর করোনা আর লকডাউনে রুজি-রোজগার খুইয়ে নিজের নিজের রাজ্যে ফিরে যেতে যেতে পথ হারিয়ে এই গাঁওয়ে চলে এসেছিল। কোন পথ ধরে গেলে তাদের মুল্লুকে পৌঁছতে পারবে, জানতে চেয়েছিল। ধৌলিচাঁদ তাদের সঠিক দিশা দিতে পারেনি, কারণ সে জানে না। সে বলে দিয়েছিল সড়ক দিয়ে যেতে যেতে রাহিদের কাছ থেকে তারা যেন জেনে নেয়।

ধৌলিচাঁদরা তাদের গাঁওয়ে কিছুক্ষণ বসে জলটল খেয়ে জিরিয়ে যেতে বলেছিল। কিন্তু তারা রাজি হয়নি। হড়বড় করে চলে গেছে।

এই মজদুরদের একজনের নাম রামবনবাস দুবে। যাবার সময় সে বলে গেছে, তাদের সাহানপুরের দুই সাথি বিনোদ আর আসলাম যদি ঘুরতে ঘুরতে তাদের খোঁজে এই গাঁওয়ে চলে আসে ধৌলিচাঁদ যেন ওদের বলে দেয় রামবনবাসরা চলে গেছে। তাদের জন্য অপেক্ষা করবে না। বিনোদরা আপনা মুল্লুকের পথ যেন নিজেরাই খুঁজে নেয়।'

এক নিশ্বাসে সবটা জানিয়ে ধৌলিচাঁদ বিনোদদের দিকে তাকাল।

কীভাবে ধৌলিচাঁদ তাদের নাম জানতে পেরেছে বোঝা গেল। বিনোদ জিজ্ঞেস করল, 'রামবনবাসজিরা কোন দিকে গেছে ধৌলিচাঁদরা দেখেছে কি না—'

'নেহি—' মাথা নেড়ে বলল ধৌলিচাঁদ।

'নমস্তে—' হাতজোড় করে বিনোদ বলল, 'অব চলতা হ্যায়—' নিজেদের মালপত্র তারা তুলে নিল।

শুধু ধৌলিচাঁদই নয়, অন্য গাঁওবালারাও হাতজোড় করে বলল, 'নমস্তে'—

॥ ষোলো ॥

ফের এক নতুন পথে নামল বিনোদরা। ধৌলিচাঁদদের গাঁও থেকে বেরিয়ে এধারে ওধারে তাকাতেই চোখে পড়ল, গাঁওয়ের ডানদিক দিয়ে একটা কাচ্চি সোজা চলে গেছে। ওটা ছাড়া কোনওদিকে আর কোনও রাস্তা নেই। ওরা কাচ্চিটার দিকে এগিয়ে গেল।

এখন ক'টা বাজে? খুব বেশি হলে ন'টা কি সাড়ে ন'টা। রোদে ঝাঁঝ নেই। ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। কাচ্চির ওপর দিয়ে হাঁটতে বেশ আরামই লাগছে।

ধৌলিচাঁদদের গাঁও থেকে বেরুবার পর কেউ একটি শব্দও মুখ থেকে বের করেনি। চুপচাপ পা ফেলছিল।

হঠাৎ বিনোদ বলল, 'ধৌলিচাঁদ আর ওদের গাঁওয়ের লোকগুলোকে দেখলে তো?'

তার সঙ্গীটি কী বলতে চাইছে বুঝতে না পেরে তার দিকে তাকাতে তাকাতে চলতে লাগল।

আসলামের ধন্দ-ধরা মুখটা দেখে তার মনোভাবটা মোটামুটি আঁচ করে নিয়েছে বিনোদ। একটু হেসে বলল, 'ঠিক আছে, বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমরা হাঁটতে হাঁটতে কতগুলো গাঁও আর আধা-শহর গোছের জায়গা পেরিয়ে এসেছি। ভাব, আমাদের দেখেই ওইসব গাঁও-টাওয়ের লোকেরা লাঠি ডান্ডা আর পাথর নিয়ে চড়াও হয়েছিল। আর ধৌলিচাঁদরা? আমাদের কিছুতেই ছাড়তে চাইছিল না। কত যত্ন করে আমাদের খাওয়াল। এই করোনার টাইমে এই ধরনের মানুষ এখনও রয়েছে। সবাই জন্তুজানোয়ার হয়ে যায়নি। ধৌলিচাঁদরা আছে বলেই মনে হয় দুনিয়াটা হয়তো বেঁচে যাবে।' বলতে বলতে গলার স্বরটা ভারী হয়ে এল।

'ঠিকই বলেছ। এমন মানুষ হয় না।' বলতে বলতে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় সামান্য অস্বস্তি নিয়ে গলার স্বর একটু উঁচুতে তুলে বলল 'একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গেছি।'

'কী কথা?'

'আমরা যখন আসি, তুমি ধৌলিচাঁদের সঙ্গে কথা বলছিলে। আমার দিকে তোমার নজর ছিল না। তখন আমার পাশে যে লোকটা দাঁড়িয়েছিল তার নাম রঘুয়া। রঘুয়া খুব চাপা গলায় আমাকে বলছিল কিছু চিঁড়ে মুড়ি লিট্টি আর লাড্ডু আমাদের দেবে। পথে যেতে যেতে খাবারদাবার কিছুই হয়তো জোগাড় করতে পারব না। সেই সময় ওগুলো কাজে লাগবে।' আমি বললাম, দরকার হবে না। সীতাপুরার হাটিয়া থেকে চিঁড়ে মুড়ি, কিছু বালুসাই কিনে নিয়েছি। আমাদের তিন-চারদিন চলে যাবে। রঘুয়াকে সুক্রিয়া বলেছি।'

'সামান্য গাঁওয়ের মানুষ। মনটা কত বড় চিন্তা করে দেখ—'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

কাঁচা রাস্তার দু'পাশে প্রচুর গাছপালা, নহর, কয়েকটা ফসল-কাটা ধানের খেত। ঝাঁকে ঝাঁকে নাম না-জানা পাখি উড়ছে। ঝোপঝাড় থেকে ঝিঁঝিদের একটানা গলা সাধার আওয়াজ উঠে আসছে। মাথার ওপর চলছে পাখিদের কিচির মিচির আর ডানা ঝাপটানোর শব্দ। এছাড়া সারা পথটা নিঝুম। কোথাও কোনও রাহি চোখে পড়ছে না।

আশ্চর্য ব্যাপার, তিনদিন ধরে তারা হাঁটছে কিন্তু রাস্তায় ক'জন রাহি আর চোখে পড়েছে! এত জনশূন্য কাঁকুরে মাঠ, প্রান্তর, বনজঙ্গল আগে কখনও দেখেনি। এই কাঁচা রাস্তাটা তাদের কোথায় পৌঁছে দেবে কে জানে।

'বিনোদ—' ঢোক গিলে একটু মিয়ানো গলায় ডাকল

আসলাম।

কিছুটা অন্যমনস্ক ছিল বিনোদ। একটু চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, 'কিছু বলবে?'

'এই মানে—' কুণ্ঠিতভাবে আসলাম বলল, 'আরেকটা কথা বলতে গিয়েছিলাম।'

'এই নিয়ে দু'বার তোমার ভুলে যাওয়া কথা মনে পড়ল। আরও কত কথা মনে পড়বে?' ভুরু নাচিয়ে মজাদার ভঙ্গি করে ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগল বিনোদ।

আসলামও হেসে ফেলল।

হাসাহাসির মধ্যেই বিনোদ বলল, 'তোমার দু'নম্বর ভুলে গিয়ে মনে-পড়া কথাটা আমি জানি। রামবনবাস দুবে ধৌলিচাঁদজিকে বলে গেছে তারা আমাদের জন্য আর পথের ধারে বসে থাকবে না। তারা আমাদের বাদ দিয়ে নিজেদের বাড়ির পথ খুঁজে নিয়ে চলে যাবে। আমরাও যেন পথ খুঁজে নিজেদের মুল্লুকে চলে যাই। এই তো?'

'হ্যাঁ। রামবনবাস দুবেই শুধু নয়, সাহানপুর থেকে আর যারা এসেছে তারাও আমাদের ওপর খুব রেগে গেছে।'

'ভেবে দেখ, ওদের পাঠিয়ে দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে এলাম। তারপর বিষুণলালজিদের সঙ্গে কাটালাম। তারপর মাঠের মাঝখানে গণেশ মণ্ডলদের কাছে গিয়ে আরও কয়েক ঘণ্টা থেকে এলাম। ওদের রেগে যাবারই কথা।' বিনোদ বলতে লাগল, 'আসলে আমার স্বভাবটাই ছেলেবেলা থেকে এইরকম। কেউ কোনও বিপদে আপদে পড়লে না গিয়ে পারি না। সে যাক। এখন আমাদের বাড়ির পথ আমরাই খুঁজে নেব।'

আসলামের কেমন যেন মনে হল পথের সাথি এই যুবকটির সঙ্গে মাত্র তিনটে দিন কাটিয়ে সেও কি বদলে যাচ্ছে?

বেলা অনেক চড়ে গেছে। এখন ভরদুপুর। সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছে। দুপুরের রোদ তীব্র ঝাঁঝ ছড়াচ্ছে। বাতাসও সকালের মতো ঠান্ডা ঠান্ডা নয়, বেশ তপ্ত হয়ে উঠেছে।

দু'জনের পেটের ভেতর পঞ্চাশটা মশাল এক সঙ্গে জ্বলছে। আর দেরি হলে নাড়িভুঁড়ি পুড়ে খাক হয়ে যাবে।

এপাশে ওপাশে তাকিয়ে বিনোদ বলল, 'ওখানে চল। খিদেটা পেটের ভেতর চোদ্দোপুরুষের নাম ভুলিয়ে দিচ্ছে। চল, চল—'

পথের ধারে একটা ঝাড়ালো বুনো গাছের তলায় বসে সীতাপুরা থেকে কিনে আনা লিট্টি, বালুসাই আর চিঁড়ে গুড় দিয়ে দুপুরের ভোজনটি সেরে ফের কাচ্চিতে উঠে হাঁটতে লাগল।

কিছুটা যাওয়ার পর আচমকা আসলাম একটু ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'দাঁড়াও দাঁড়াও—'

'কী হয়েছে?' বিনোদ জানতে চাইল।

'ওই দেখ, ওই যে—' আসলাম আঙুল বাড়িয়ে দিল।

এবার বিনোদের চোখে পড়ল। ডানদিকের আদিগন্ত ফসল-কাটা ফাঁকা মাঠের বুক চিরে একটা রাস্তা কোনাকুনি এদিকে এসে কাচ্চি ভেদ করে বাঁদিকে বহুদূর চলে গেছে। ওই রাস্তায় পঞ্চাশ-ষাট জনের একটা দঙ্গল। মেয়ে-পুরুষ ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। পুরুষদের কাঁধে মাথায় নানা লটবহর। কোনাকুনি ওই রাস্তাটা ধরে ওরা এদিকেই আসছে।

বিনোদ আর আসলাম দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বিনোদ বলল,

'এরা তো আমাদের মতোই মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ। কোত্থেকে আসছে বুঝতে পারছ?' আসলাম জিজ্ঞেস করল।

'তুমি যেখানে আমিও সেইখানে। ওরা আসুক, তারপর দেখা যাবে।'

বেশিক্ষণ লাগল না, মোটামুটি আধঘণ্টার মধ্যে দলটা চলে এল। ওদের দিকে এগিয়ে গেল বিনোদরা।

ওদের সামনের দিকে যে তিন-চারজন রয়েছে, বিনোদ তাদের জিজ্ঞেস করল, 'আপলোগন কাঁহাসে আতে হেঁ—'

বিনোদদের হাতে কাঁধে মালপত্র দেখে ওদেরও কৌতূহল হচ্ছিল। সামনের দিকেরই নয়, পেছনে যারা রয়েছে তারাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। একটি বয়স্ক লোক বলল, 'রায়পুরসে। লকডাউনমে সব কুছ খো গিয়া। অব আপনা ঘর ওয়াপস যাতা—'

মধ্যপ্রদেশ যে দু'ভাগ হয়ে একভাগ ছত্তিশগড় আর বাকিটা মধ্যপ্রদেশই থেকে গেছে বিনোদ তা জানে। রায়পুর ছত্তিশগড়ে না মধ্যপ্রদেশে, এই মুহূর্তে মনে করতে পারল না বিনোদ। জিজ্ঞেস করল, 'আপকে ঘর কিধর হ্যায়?'

'গাঁওকা নাম মনরঙ্গোলি, মজফ্‌ফরপুর।'

এরপর বিনোদদের সম্পর্কেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত কিছু জেনে নিল বয়স্ক লোকটি। বলল, 'এই হাল। ভাইয়া চার রোজ নাহানা নেহি, নিদ নেহি, আধা ভুখা থা। অর চলতা'—

বোঝাই যাচ্ছে এই মানুষগুলো দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, ক্লান্তিতে, ধকলে তাদের শরীরগুলো ভেঙে আসছে। পথের মধ্যে ওদের আটকে রাখা ঠিক হবে না।

বিনোদ আর আসলাম হাতজোড় করল। ওরাও হাতজোড় করে একে একে তাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

একেবারে শেষ মাথায় ছিল দুই যুবক। তাদের পিঠে দুটো বড় ঝোলায় দুটি যুবতী। ঝোলা দুটো মোটা দড়ি দিয়ে যুবকদের বুকের দিকে খুব শক্ত করে বাঁধা। দুটি যুবতী মেয়েকে বয়ে আনতে তারা সামনের দিকে অনেকটা নুয়ে পড়েছে। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে তাদের। বোঝাই যায় ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।

দুই যুবতীর সঙ্গে ওই ছেলে দুটোর সম্পর্ক মোটামুটি আন্দাজ করা যাচ্ছে। দুই যুবক তাদের সঙ্গিনীদের খুব কাছের মানুষ। দু'জোড়া স্বামী-স্ত্রী হওয়াই সম্ভব।

বিনোদরা ওদের লক্ষ করছিল। একটা মানুষ, সে অল্পবয়সি তরুণ, বা মাঝবয়সি কিংবা বুড়ো ধুড়ো যেমনই হোক তার একটা ওজন তো আছে। ওই ছেলে দুটো সেই রায়পুর থেকেই কি দুই মেয়েকে বয়ে নিয়ে আসছে? এইভাবেই কি মজফ্‌ফরপুরে তাদের বাড়িতে যাবে! তাই যদি হয় ছেলে দুটোর শিরদাঁড়া কি আস্ত থাকবে!

এদিকে দড়ির গিঁট খুলে পথের ধারে সঙ্গিনীদের নামিয়ে তাদের পাশে বসে ছেলে দুটো জোরে জোরে হাঁফাতে লাগল। ওদের বুক হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে।

বিনোদরা তাকিয়েই আছে। মেয়ে দু'টোকে কেমন কেমন যেন দেখাচ্ছে। চোখের কোলে কালি, কপালে সিঁদুর লেপটে আছে। গায়ে চাদর জড়ানো থাকলেও মনে হচ্ছে শরীরের মাঝামাঝি অংশটা বেশ ভারী। গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে দু'জনেই খুব হাঁপাচ্ছে। এরা তো দুই যুবকের পিঠে ঝুলতে ঝুলতে এসেছে। তা হলে এত ক্লান্তি, এত হাঁপানোর কারণ কী হতে পারে? হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল নাকি?

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বিনোদ ওই যুবক দুটিকে ডাকল, 'এই ভাইয়া— দোনো দোনো—'

দুই যুবক এরমধ্যে অনেকটা সামলে নিয়েছে। এখন আর হাঁপাচ্ছে না। একজন বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বোলিয়ে—'

দুই তরুণীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে বিনোদ জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, তুমহারে সাথবালি ওহি দোনোকো ক্যায়া বুখার—'

তার প্রশ্নের মধ্যেই আঙুল দিয়ে বিনোদকে আস্তে ঠেলা দিয়ে চাপা গলায় ব্যস্তভাবে বলল, 'আরে অসুখ না, অসুখ না। ওদের—'

যুবকটি তাকে শেষ করতে দিল না, 'সাথবালি নেহি, ওহি দোনো হামারে ঘরবালি। বুখার উখার কুছ নেহি, দোনো মা হোনেবালি—'

বিনোদ থতমত খেয়ে গেল। সেই ভাবটা কেটে গেলে জানতে চাইল ওই যুবক কি তাদের ঘরবালিদের সেই রায়পুর থেকে বয়ে এনেছে কিনা—

যুবকটি বলল, 'হাঁ ভাইয়া—'

বিনোদ জানে ওদের দেশের বাড়ি মজফ্‌ফরপুরে। এখান থেকে সেটা কত দূরে কে জানে। নিজের নিজের স্ত্রীদের নিশ্চয়ই তারা ফের পিঠে ঝুলিয়ে বইতে বইতে নিয়ে যাবে। সে আর কোনও প্রশ্ন করল না। শুধু বলল, 'ভগোয়ানকা আশীর্বাদমে তুমলোগনকো আচ্ছাই হোগা। অব হাম দোনো যাতে হুঁ—'

ফের তারা কাচ্চিতে চলে এল। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বিনোদের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে মিটিমিটি হাসতে লাগল আসলাম। হঠাৎ তার দিকে নজর পড়ায় অবাক হয়ে বলল, 'তুমি ওভাবে হাসছ যে?'

'হাসার মতো কাজ করলে না হেসে পারা যায়?'

'মানে!'

হেসে হেসেই জবাবটা দিল আসলাম, 'সত্যিই তুমি আনাড়ি—'

'মানে!' বিনোদের ভুরু দু'টো কুঁচকে গেল।

'মেয়ে দু'টোর চোখের তলায় কালি, চাদরে ঢাকা ভারী পেট দেখেও বুঝতে পারলে না ওরা মা হতে চলেছে।'

বিনোদের মনে পড়ল, আসলাম বিবাহিত, তার দাম্পত্য জীবনের নানা রহস্য, তার মতো সে কী করে জানবে? উত্তর দিল না। বোকাটে একটু হাসি তার মুখে ফুটে উঠল।

এরপর দু'জনে চুপচাপ হাঁটতে লাগল। অন্যমনস্কর মতো হাঁটতে হাঁটতে কিছু ভাবছিল বিনোদ। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে তার সঙ্গীর দিকে তাকাল।— 'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ?'

'কী ব্যাপার?' উৎসুক দৃষ্টিতে আসলামও তার সঙ্গীকে দেখতে লাগল।

ওরা কেউ দাঁড়িয়ে পড়েনি। চলতে চলতেই কথা হচ্ছে। বিনোদ বলল, 'গিরিরাজজির ট্রাক থেকে নামার পর কমসে কম এক হাজার কিলোমিটার হাঁটা হয়ে গেছে, তাই তো?'

'হ্যাঁ, তা তো হবেই।' আসলাম মাথা নাড়ল।

'তারপরও কিন্তু আমরা হেঁটেই চলেছি।'

আসলাম জবাব দিল না। তিনদিন ধরেই তো হাঁটা চলছে। আরও ক'দিন চলবে, কে জানে। এটা নিয়ে কচলাবার কী দরকার, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

বিনোদ বলতে লাগল, 'পথে আসতে আসতে লাশের পর লাশ চোখে পড়েছে। দেশের নানা রাজ্য থেকে নানা দিক দিয়ে আরও কত লাশ যে আসছে, কতদিন ধরে আসতেই থাকবে,

শারদ শুভেচ্ছা ২০২০

জানি না। মৃত্যু, মৃত্যু আর মৃত্যু। চারদিকে যেন মড়ক লেগেছে। কিন্তু তার মধ্যেও—'

'তার মধ্যে কী?' আসলাম জানতে চাইল।

'এই মড়ক আর লাশের পাহাড়ের মধ্যেও ওই যে বউ দুটো যাদের স্বামীরা তাদের পিঠে চাপিয়ে রায়পুর থেকে নিয়ে এসেছে, মজফ্‌ফরপুর অবধি বয়ে নিয়ে যাবে, তাদের বাচ্চা হবে। আমরা তাদের দেখতে পাব না, কিন্তু হবে তো। এই মড়কের মধ্যেও কত কষ্টের পর মানুষের জন্ম হয়, ভাবো তো মানুষ মরেও, আবার জন্মায়ও।' সে চুপ করে যেন নিজের মধ্যে ডুবে গেল।

হাঁটতে হাঁটতে অবাক চোখে বিনোদকে দেখতে লাগল আসলাম। এমন আশ্চর্য মানুষ আগে আর কখনও দেখেনি সে। তার নতুন বন্ধুটি যা বলল, এমনভাবে কোনওদিনই সে ভাবতে পারত না। কী ভালো যে লাগছে।

দুপুর পেরিয়ে দিনটা বিকেলের দিকে ঝুঁকেছে। রোদ তার ঝাঁঝ হারাতে শুরু করেছে। তার রং এখন গলানো সোনার সঙ্গে হলুদ মেশালে যেমন হয় অবিকল সেইরকম। আকাশের গা বেয়ে সূর্যটা পশ্চিম দিকে অনেকটাই নেমে গেছে। যতক্ষণ রোদের ঝাঁঝ ছিল, পাখিদের দেখা যায়নি। এবার তারা ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আকাশময় ছড়িয়ে পড়েছে। কতরকম যে রং তাদের। লাল, হলুদ, ধবধবে সাদা, সবুজ, ধূসর এবং আরও অনেক। মাথার ওপর যেন রঙের ফোয়ারা।

এতটা পথ যে তারা এসেছে ধৌলিচাঁদের গাঁওয়ের মানুষজন আর রায়পুর থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসা সেই লোকগুলো ছাড়া কাচ্চির দু'ধারে মাঠঘাট ফসলের খেতের ওধারে দূর দিগন্তের কাছাকাছি কয়েকটা দেহাতে দু'চারজনকে দেখা গেছে। তাও স্পষ্ট নয়, ঝাপসা ঝাপসা।

আসলাম বলল, 'একটা বড় ভুল হয়ে গেছে।'

'কীসের ভুল?' বিনোদ জানতে চাইল।

'ওই যারা মজফ্‌ফরপুরে যাচ্ছিল তাদের কাছ থেকে আমাদের এই কাঁচা রাস্তাটা কতদূরে কোথায় গেছে জেনে নিলে ভালো হতো। যদি পূর্ণিয়া কি কাটিহার অবধি যায়, শুনেছি ওই দুটো শহর থেকে কলকাতায় যাবার ব্যবস্থা হতে পারে।'

'জেনে যখন নাওনি, এখন আর তা নিয়ে ভেবে কী হবে। আমাদের এই রাস্তাটা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, দেখা যাক। আরে ভাই রাহি, হাঁটতেই থাকো—' বিনোদ হাসল।

আরও খানিকটা যাবার পর রাস্তার ডানপাশে বেশ কিছুটা এলাকা জুড়ে ঝোপ জঙ্গল। ঘন ঝোপ, লতাপাতা আর ডালপালাওয়ালা প্রচুর অচেনা গাছ। এদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কয়েকটা ঢ্যাঙা তালগাছ অনেক উঁচুতে মাথা তুলে আকাশের দিকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

হঠাৎ অদ্ভুত আওয়াজ শুনে ঝোপঝাড়ের দিকে তাকাল বিনোদরা। চোখে পড়ল কয়েকটা শকুন দু'তিনটে অচেনা গাছের মোটা ডালে বসে থেকে থেকে ওইরকম শব্দ করছে। আরও ছ'সাতটা শকুন ওই গাছগুলোর মাথায় চক্কর দিচ্ছে।

ঘাসের ঝোপগুলোর ওধার থেকে শিয়ালের ডাক কানে এল।

চমকে উঠে দু'জনে দাঁড়িয়ে পড়ল। আসলাম বলল, 'কী ব্যাপার বল তো। দিনের বেলা শিয়াল ডাকছে, শকুনের পাল জড়ো হয়েছে—'

'কী জানি, কিছুই বুঝতে পারছি না।' ধন্দ-ধরা মানুষের মতো বলল বিনোদ।

'শুনেছি কোথাও মড়ার গন্ধ পেলে শকুন তক্ষুনি সেখানে হাজির হয়ে যায়। তবে কি ঝোপের ওদিকটায় লাশ পড়ে আছে?'

'কী জানি, থাকতেও পারে। নাও থাকতে পারে। কিছুই বুঝতে পারছি না।'

দু'জন খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আসলাম বলল, 'চল, ওখানে গিয়ে একবার দেখা যাক।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ চল—' মনস্থির করে ফেলেছে বিনোদও।

'মাথার ওপর শকুনগুলো উড়ছে। আমাদের দেখলে ঝামেলা করতে পারে। গাছের একটা ডাল ভেঙে নাও।'

কাচ্চি থেকে নেমে দু'জনেই গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে এগিয়ে চলল। যে শকুনগুলো গাছের ডালে বসেছিল তারা কোনও আওয়াজ টাওয়াজ করল না, তীক্ষ্ণ নজরে বিনোদদের লক্ষ করতে লাগল। আর যারা বুনো গাছগুলোর মাথার ওপর উড়ে উড়ে চক্কর দিচ্ছিল দুই অনুপ্রবেশকারীকে দেখে বেজায় উত্তেজিত হয়ে আরও জোরে জোরে চক্কর দিতে লাগল। বিনোদরা যে এই ঝোপ-জঙ্গলে অবাঞ্ছিত, সেটাই তারা বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

শকুনের পালের দিকে নজর রেখে ঝোপের ওদিকটায় চলে গেল বিনোদরা। সেখানে যা তাদের চোখে পড়ল তাতে আঁতকে তো উঠলই, তাদের সারা শরীর কাঁপতে লাগল। বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটার মতো শব্দ করে হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে চলেছে।

সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছত্রখান হয়ে পড়ে আছে বাসি ভাত, শুকনো ডাল, তরকারি, কয়েক টুকরো রান্না করা মাছ, লঙ্কার আচার, রুটির টুকরো, আট-দশটা লাড্ডু, ফিডিং বটল, জলের বোতল, করোনা ঠেকানোর তিন চারটে মাস্ক এমন নানা জিনিস। এছাড়াও রয়েছে দুটো স্যুটকেস, চটের তিনটে ব্যাগ, ঝোলাঝুলি। সবক'টার মুখ খোলা। ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে শাড়ি-ব্লাউজ, প্যান্ট-শার্ট, গেঞ্জি, স্টেনলেস স্টিলের বাটি-গ্লাস-প্লেট, চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আর আছে একশো দু'শো আর পাঁচশো টাকার দু'তিন বান্ডিল নোট এবং বেশ কিছু রেজগি। এগুলোর একধারে একটি যুবক এবং একটি যুবতী হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। স্বামী-স্ত্রীই হবে। দেখেই বোঝা গেছে ওরা বেঁচে নেই। ওদের কাঁধ, বুক, পেট, পা— শরীরের নানা জায়গা থেকে মাংস খুবলে নিয়েছে। দুটি দেহ নিয়ে শিয়ালের পাল আর শকুনেরা কখন যে ভোজসভা বসিয়েছিল কে জানে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আসলাম আর বিনোদ। কী করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। এমন একটা বীভৎস দৃশ্য দেখার পর এখান থেকে যে চলে যাবে তাও পারা যাচ্ছে না।

শিয়ালের পালটা তাদের দেখে পালিয়ে যায়নি, সরে গিয়ে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। শকুনগুলো কর্কশ গলায় মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছে। ভোজে বিঘ্ন ঘটায় তারা আদৌ খুশি হতে পারেনি।

হঠাৎ কোনও শিশুর ক্ষীণ, করুণ কান্নার শব্দ কানে আসতে দু'জন নতুন করে চমকে উঠল। এধারে ওধারে তাকাতে তাদের চোখে পড়ে গেল বাঁদিকের ঘন ঘাসের ঝোপটার গা ঘেঁষে একটি বাচ্চা চিত হয়ে শুয়ে হাত-পা নাড়তে নাড়তে কুঁই কুঁই করে কাঁদছে। চোখ দুটো আধবোজা। তার বয়স কত হবে? খুব বেশি হলে দশ-বারো দিন, নাকি তারও কম, কে জানে। বাচ্চাটা নিশ্চয়ই ওই দুই যুবক-যুবতীর। মা-বাপ কেউ বেঁচে নেই। কয়েক ফুট দূরে তাদের খুবলে-খাওয়া শরীর দুটো পড়ে আছে। আশ্চর্য ব্যাপার, শিয়াল-শকুনদের নজর এড়িয়ে শিশুটা কী করে যে বেঁচে আছে।

বাচ্চাটার মনে হয় খুব খিদে পেয়েছে। বার বার তার ছোট ছোট হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে যাচ্ছে। পা দুটো জোরে জোরে নেড়েই চলেছে সে। আর ক্ষুদ্র শরীরের সবটুকু শক্তি জড়ো করে কেঁদে কেঁদে সারা পৃথিবীকে যেন জানিয়ে দিচ্ছে খিদেয় তার পেট জ্বলে যাচ্ছে।

বিনোদ বলল, 'কী করা যায় বল তো। বাচ্চাটার দুধ দরকার। দুধ না হলে ওকে বাঁচানো যাবে না। এই জঙ্গলে কোথায় যে পাব!' দিশাহারার মতো আসলামের দিকে তাকাল সে।

আসলামেরও খুব চিন্তা হচ্ছিল। হঠাৎ কিছু মনে পড়ায় ব্যস্তভাবে বলল, 'ব্যবস্থা হবে। ফিকর মাত করনা।'

'কী আবোল তাবোল বকছ। কোন ম্যাজিকে এখানে মাটি ফুঁড়ে দুধের ফোয়ারা বেরিয়ে আসবে?' বিনোদ বেশ বিরক্ত।

আসলাম বলল, 'সীতাপুরের হাটিয়া থেকে দু'বোতল দুধ কিনে এনেছিলাম। সে কথা মনেই ছিল না। তুমি চট করে বাচ্চাটাকে নিয়ে এসো। আমি দুধের বোতল বের করি।'

নিজেদের মালপত্র আগেই তারা নামিয়ে রেখেছিল। বিনোদ তার একটা চটের ব্যাগ থেকে তোয়ালে বের করে সেটা চার ভাঁজ করে তার ওপর বাচ্চাটাকে শুইয়ে নিয়ে এল। এদিকে আসলামও দুধের বোতল আর তুলো বের করে ফেলেছে।

আসলাম বলল, 'তোমার কোলে ওকে শুইয়েই রাখো'— চটপট চার পাঁচটা তুলোর পলতে বানিয়ে দুধে ভিজিয়ে বাচ্চাটার মুখে দিতেই হালকা চুক চুক আওয়াজ করে সে খেতে লাগল। কান্নাকাটি আগেই থেমে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তার দু'চোখ ঘুমে জুড়ে এল। আরাম আর তৃপ্তির ঘুম। তার পেট ভরে গেছে।'

বিনোদ বেশ অবাক হয়েই বলল, 'তুমি তো অনেক কায়দা জানো। বাচ্চাটাকে পাঁচ মিনিটের ভেতর খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে ফেললে!'

'কায়দা তো কিছু জানতেই হয়। ভুলে যেও না আমি দুই ছেলের বাপ।' আসলাম হাসল।

'তোমাকে সেলাম।' কপালে হাত ঠেকিয়ে হাসতে লাগল বিনোদও।

হাসি আর মজাটজা থামলে আসলাম বলল, 'বাচ্চাটাকে শান্ত করা গেছে। ওর মা-বাবার কী ব্যবস্থা করা যায়?'

বিনোদ অন্যমনস্ক হয়ে কিছু চিন্তা করছিল। বলল, 'ওদের কথাই ভাবছিলাম। ওরা হিন্দু না মুসলিম না খ্রিস্টান কিছুই জানি না। আমার কী মনে হয় জানো?'

'কী?' দু'চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকাল আসলাম।

'আমাদের মতোই নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে এসে অন্য কোনও রাজ্যে চাকরিবাকরি নিয়ে এসেছিল। করোনা আর লকডাউনে কাজকর্ম খুইয়ে আরও অনেকের সঙ্গে নিজেদের দেশের বাড়িতে ফিরছিল। পথে ওদের হয়তো করোনায় ধরেছিল। নইলে অন্য কোনও ছোঁয়াচে রোগে। সঙ্গীরা তাই পথের ধারে ফেলে রেখে গেছে। এক কাজ করা যাক।'

'কাজটা কী?'

'শিয়াল আর শকুনগুলো এখনও এই তল্লাট ছেড়ে চলে যায়নি। আগে ওদের তাড়াই। তারপর ভেবেচিন্তে ঠিক করা যাবে।'

ঘুমন্ত শিশুটাকে একপাশে শুইয়ে রেখে দু'জনে উঠে পড়ল। এধারে ওধারে প্রচুর মাটির ডেলা, রোদে শুকিয়ে পাথরের মতো শক্ত হয়ে আছে। সেগুলো তুলে তুলে শিয়াল আর শকুনগুলোকে তাক করে ছুঁড়তে লাগল। প্রথমে শিয়ালেরা এলাকা ছেড়ে উধাও হল। তারপর শকুনগুলোও আর রইল না, ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে পালিয়ে গেল।

'একটা কাজ তো হল। এবার কী করতে চাও?' আসলাম জানতে চাইল।

একটু ভেবে মৃতদেহ দুটোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে বিনোদ বলল, 'ওদের বয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না, এখানেই কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে। বাচ্চাটাকে এই জঙ্গলে ফেলে চলে যাওয়া যাবে না। আমরা এখান থেকে চলে গেলে শিয়াল-শকুনেরা আবার ফিরে আসবে। তুমি ওর কাছে গিয়ে বোসো। আমি চারপাশটা ঘুরে দেখি ওর মা-বাবার জন্য কী করা যায়'—

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর ফিরে এসে বিনোদ দেখল বাচ্চাটা এখনও ঘুমোচ্ছে। তার পাশে বসে পাহারা দিচ্ছে আসলাম।

বিনোদ বলল, 'একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এই ঝোপঝাড়গুলোর বাঁদিকে খানিকটা গেলেই কারা যেন তিন-চারটে বড় বড় গর্ত খুঁড়ে মাটি তুলে নিয়ে গেছে। তবে এখনও অনেক মাটি পড়ে আছে। একটা ডোবাও ওখানে দেখতে পেলাম। কোনও একটা গর্তে লাশ দুটো রেখে মাটি চাপা দিয়ে ফিরে আসছি।'

'না না, তুমি একা—'

হাত তুলে আসলামকে থামিয়ে দিয়ে বিনোদ বলল, 'চিন্তা কোরো না, আমি একাই পারব। তুমি বাচ্চাটার কাছ থেকে নড়বে না।' বলেই সে চলে গেল।

এক ঘণ্টাও লাগল না, সব কাজ চুকিয়ে হাত-পা ধুয়ে ফিরে এল বিনোদ। বলল, 'সূর্য ডুবতে চলেছে। একটু পরেই সন্ধে নামবে। ঝোপ-জঙ্গলে থাকা আর ঠিক হবে না, এসো আমাদের মালপত্র গুছিয়ে নিই। বাচ্চাটার মা-বাবার যে সব জিনিস পড়ে আছে, টাকার বান্ডিল ক'টা ছাড়া আর কিছুই নেবো না। ওই টাকা বাচ্চাটার গরম জামা, দুধ, তোয়ালে, অসুখ হলে ডাক্তার ওষুধ, এসবে কাজে লাগবে।'

দু'জনেই তাদের জিনিসপত্র কাঁধে আর হাতে তুলে নিল। সন্ধে নামলেই এখনও হালকা হিম পড়ে। তাই আসলাম তোয়ালে দিয়ে বাচ্চাটাকে যত্ন করে মুড়ে এক হাতে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়েছে।

বিনোদ বলল, 'বাচ্চাটার ভাগ্য খুব খারাপ। কোনও দিনই সে জানতে পারবে না, কারা তার মা-বাবা, কোথায় কোন ঝোপের পাশে মাটির তলায় তারা চিরকালের মতো শুয়ে আছে।'

আসলাম বলল, 'বাচ্চাটার জন্য খুব কষ্ট হয়।'

কথা বলতে বলতে ওরা সেই কাঁচা সড়কটায় চলে এল। শিশুটাকে উদ্ধার করে এনে নতুন এক যাত্রা শুরু হল তাদের। দু'জনে কাচ্চি ধরে সোজা হাঁটতে লাগল।

এখন ওদের দেখলে মনে হবে না, মাত্র তিনদিন ধরে হাঁটছে। বহু শতাব্দী আগের ধূসর কোনও অতীত থেকে মহামারী, মন্বন্তর, হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু, আবার নতুন শিশুর জন্ম, এইসবের সঙ্গী হয়ে বিনোদ আর আসলামরা আবহমান কাল পাশাপাশি হেঁটেই চলেছে। তাদের সামনে এক অন্তহীন পথ, যে পথের শেষ নেই।

অলংকরণ: প্রণব হাজরা

সমাপ্ত

• গল্প

পায়রা

বাণী বসু

বড় পেটুক, আর বড় কামুকও। যখনই দেখ খাচ্ছে, খালি খাচ্ছে। আর দেখ না দেখ, দিন নেই রাত নেই, কালাকাল বলে কিছু নেই, নেই কোনও মাহ ভাদর। যখন তখন ঝটাপটি। মৈথুনচক্র চলছেই চলছেই। জ্ঞানীরা বলবেন যেমন বিউটি ইজ ট্রুথ, ট্রুথ বিউটি, কায়াজমাস অলঙ্কার, এটাও তেমনি। পেটুক ইজ কামুক, কামুক পেটুক। পেটুক হলেই কামুক হবে, এবং কামুক হলেই পেটুক।

ঠিক আছে। হোক না কেন! কিন্তু আমার বাড়ি কেন? দেখুন, আমি পশু-পাখি ভালোবাসি, খুব খুব। কিন্তু দূর থেকে। ওদের পোষবার পক্ষে আমি কোনওদিনই নই। যারা মুক্ত দুনিয়ার আকাশে উড়ে বেড়ায়, তাদের খাঁচায় বন্দি করার ব্যাপারটা আমার খুনের থেকেও ভয়ঙ্কর মনে হয়। তাছাড়া ওদের চান, দাঁতমাজা, শৌচকর্ম আমার পছন্দ হয় না। আমি ওদের সুচিত্রা সেনের কায়দায় বলতেই পারি আমাকে কিন্তু টাচ করবে না। আমাকে টাচ করতে ওদের বয়ে গেছে। আমারও ইচ্ছে নেই। মানে পেটে ইচ্ছে হাতে শিহরণ, এটা একটা স্নায়বিক অপারগতা। সেটাই বলবার চেষ্টা করছি। অনেকে কেমন অবলীলায় খরগোশ হাঁটকায়, বেড়াল চটকায়, কুকুরকে চুমু খায়, বাসা থেকে পাখির ছানা পড়ে গেলে সাবধানে তুলে নিয়ে গুছিয়ে সেবা করে, আমার দেখলে পর্যন্ত কীরকম গা শিউরয়। কিন্তু আমি পুষতে না চাইলে কী হবে গুটিকয় পায়রা আমার পোষিত হয়ে পড়তে চাইছে রাত দিন। নিজেদের কন্ডিশনে অবশ্য। যখন তখন আসবে যাবে, যথেচ্ছ পুরীষ ত্যাগ করবে, বাইরে থেকে সাত পুরনো শুকনো পাতা ডাল কুটিকাটা আনবে ঠোঁটে করে, যে কোনও জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ে যে কোনও উচ্চস্থানে বসে গাবুম-গুবুম করবে। দেখুন ছোটবেলায় যত লাল ইটের বিশাল বিশাল ইমারত দেখেছি, তাতে অজস্র ঘুলঘুলি থাকত, চওড়া আলসে থাকত, তাদের ঘটা করে বলা হতো কপোতপালি। ওরা দলে দলে সেই সব ঘুলঘুলি আলসে সাদা করে বসে থাকত। সাদা করে মানে বুঝেছেন তো? যাঁহা শয়নমন্দির তাঁহা বাথরুম। যাঁহা যাঁহা দৃষ্টি পড়ে তাঁহা তাঁহা বিষ্ঠা স্ফুরে। সেনেট যখন ভাঙা হল তখন তার ওই একটাই পজিটিভ দিক দেখতে পেয়েছি। আপনি পরীক্ষা দিচ্ছেন, গাবুম গুবুম ধ্বনি আপনার পরীক্ষার আবহসঙ্গীত, এই পর্যন্ত ঠিক। তারপরে আপনি মাঝ এসে-তে, বাবার দেওয়া পাইলট পেন দিয়ে আরামসে পরীক্ষা দিচ্ছেন এমন সময় গরম গরম থপাস করে পড়ল আপনার মাথায় কিংবা খাতায়। এরকম গল্প ডজন ডজন শুনেছি। এ ট্র্যাডিশনের অবসান হল। এখন সেই সেনেট-ভাঙা ভাঙা-হাল ছেঁড়া-পাল পঞ্ছিরা যাবে কোথায়?

এমন নয় যে তারা ওই সেনেটেই শুধু বাসা করে থাকত,

ওই লাল বাড়িগুলো ছিল না? সেখানে কপোতজনতা দিব্যি থাকত। যেখানেই খোলা বারান্দা, খোলা দালান সেখানেই কপোতকুল। দুপুরবেলা মানেই গুম গুম গাগুম গাগুম। যেখানে যখন বাজবে সেখানে তখনই দুপুরবেলা। কেউ মাইন্ড করত না। কেন, তা জানি না। তাছাড়া ওরা বোধহয় শুভ লক্ষণ বলে গণ্য হতোটতো। গৃহস্থবাড়ি মানেই পায়রা।

কিন্তু ইদানীং আর্কিটেকচার পাল্টে গেছে। ঘুলঘুলি বন্ধ। আলসে বা কার্নিশ যথাসম্ভব সরু। জানলা দিয়ে ক্যাজুয়ালি দেখি ভিনবাড়ির জানলার লিন্টেলে গাদাগাদি করে বসে আছে। মাঝে মাঝে পা ফসকাচ্ছে, আবার সামলে নিচ্ছে। এরই মধ্যে হায়া লজ্জা নেই, ঝটাপটি ঝটাপটি। যাক। ব্যাপারটা আমার ভারী অদ্ভুত লাগল। পাখিরা কোথা থেকে আসে কোথায় যায়? এইসব লোফ্লাইং পাখিরা? বলতে বলতেই দেখি একটা কালো সেপাই বুলবুলি পাশের বাড়ির বাঁশের খুঁটির ওপর মিষ্টি করে বসে আছে। গা না পাখি গা! ভারী বয়ে গেছে তার ফরমাশি গান গাইতে! আচ্ছা, বাবুই তো বাসা করে, যারা বাদুড় থেকে প্যাঙ্গোলিন সর্বস্ব খায়, সেই নিঘঘিন্নে চীনেরা তো পাখির বাসাও খায়, ওদের মেনু কার্ডে দেখেছি। বাবুই শুদ্ধুই খায় না, কাঁটা বাছার মতো পাখি বেছে ফেলে দিয়ে খায়? দর্জি পাখি সেও তো লম্বা লম্বা ঠোঁট দিয়ে পাতা সেলাই করে বাসা গড়ে। টিয়েরা দেখেছি সাতসকালে ঝাঁকে ঝাঁকে যেন পৃথিবী জয় করতে বেরিয়ে গেল, সন্ধেবেলায় পরশ গাছ তাদের ঘরে ফেরা খাওয়াদাওয়া গল্প আড্ডায় ঝমঝম করতে থাকে, তারপর সব নিঝঝুম। মানে কী? ওদের বাসা করতে হয় না। এত হালকা পলকা বডি যে বনস্পতির ডালে ডালে পাতায় পাতায় দিব্যি ঠোঁট মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ে। আর কাক? কথাতেই আছে কাকের বাসা। সে তো কী ছিরির রোজ দেখতে পাচ্ছি। রান্নাঘর থেকে চায়ের চামচ রোজ হারাচ্ছে, খ্যাংরা ঝাঁটা বারান্দায় রাখা ছিল, তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে তাকে টানামানি করতে করতে চারদিকে ছিটিয়ে একসা। এই সব দিয়ে তাঁদের প্যান্তাচাং বাসা। তা এই ভারীভুরি পায়রাগিন্নিরা থাকেন কোথায়? ওই তো কচি কচি পাতলা পাতলা ঠ্যাং। তার ওপর ভর দিয়ে সারাদিন সারারাত? ঘোড়া নাকি?

গুগলি মারি। হে কপোত পারাবত পায়রা, তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ? কোথায় রাত কাটাও?

পাঁচ হাজার বছরেরও আগে প্রথম পোষ মানানো পাখি হল এই পায়রা। রক ডাভ, মানে পাহাড়ি ঘুঘু এর পূর্বপুরুষ, উঁচু পাহাড়ের বা দুর্গের চূড়োয় বসে থাকত। বাসা নেই, ওই পাহাড়ের ভাঁজে খাঁজেই কোথাও ডিম পাড়ত, ঝড় কাটাত, বাসাহীন!

হায়, এত হাজার বছরেও বাসা বাঁধতে শেখনি! কেন না মানুষ যবে থেকে বুঝেছে তোমার মগজযন্ত্রে আছে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রগুলো অনুভব করার শক্তি, তবে থেকে তোমাকে দূত হিসেবে ব্যবহার করেছে। যত্ন করে বেঁধে দিয়েছে তোমার বাসা। মনে পড়ে উত্তর কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় লম্বা বাঁশের ডগায় মুঠোর মতো স্ট্রাকচার, তাদের নাম বোম। দড়ি দিয়ে বোনা তার ওপর বসে থাকতে তোমরা। তারপর হুইসল বাজিয়ে বা শিস দিয়ে দিয়ে তোমাদের আকাশ মার্চ করাতে দেখেছি সারা ছোটবেলা। এখন আর সে শখ নেই। লক্কা গেরোবাজ পায়রাদের নানান বৈচিত্র্যও তো আছে, সংকর সব। চোখ বড় হয়ে যায় দেখে তাদের খাবার জন্যেও ব্রিড করা হতো! ধন্য বটে এ মানবসভ্যতা! যার দুধ খাচ্ছে তাকেই মেরে খাচ্ছে, যাকে দূত করে চিঠি দিয়ে পাঠাচ্ছে শত্রুসংকুল মহাবিপদের মাঝখানে তাকেই আবার শিকে পুড়িয়ে কাবাব করছে। ধন্য ধন্য!

তা সে যাক। এইবার ওই সর্বভুক মানবসভ্যতা বড় বিপাকে পড়েছে। সূর্যের করোনা হয় জানি। এবার সেখান থেকেই কি খসে পড়ল এক মহাকরোনা? পৃথিবী ব্যেপে তার বেড়। কাউকে সে রেহাই দেয়নি। মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীদের কিন্তু ভারী মজা! মানুষ নন-ফাংশনাল হয়ে যেতে প্রকৃতি ঠাকরুন তাঁর ঘোমটাটি খুলে ফেলেছেন। বিষ শব্দ, বিষ ধোঁয়া, নানাবিধ বিষের তৈরি মানুষ প্রদত্ত ঘোমটাটি। বেরিয়ে পড়েছে নীল যমুনার জল, নীল আকাশ, গাঢ় সবুজের ফুল্লতা বনে বনে ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় রে! রাস্তাঘাট ফাঁকা, হরিণ থেকে বাঘরোল থেকে গন্ডারবাবাজি শুদ্ধু হাওয়া খেতে বেরিয়ে পড়েছেন। গোলাপি ফ্ল্যামিংগোরা নেমে পড়েছে সাগরসীমায়।

কিন্তু না। চেয়ে চেয়ে এই খেলা দেখলেন ঠাকরুনটি, অট্টহাসি দিলেন একটি।

সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎ শিখায় মেলিল বিপুল আস্য
নগরীর দীপ নিবিল বাতাসে রমণী কাঁপিয়া উঠিল তরাসে
আকাশে বজ্র ঘোর পরিহাসে হাসিল অট্টহাস্য।

ডাকাত তো চিঠি দিয়ে গৃহস্থকে জানান দিয়েই আসত। আমাদেরও তো কে যেন বলে গিয়েছিল সে আসবে। আয়লা, ফণী সওয়া মানুষজন তেমন গুরুত্ব দেয়নি।

কিন্তু দেখিলাম। তীক্ষ্ণ সুতীব্র সে শিস, হুইসল বাজাইতে বাজাইতে সীসা রঙের সে প্রকাণ্ড বায়ব দানব অট্টহাস্য করিতে করিতে ছুটিতেছে, এ দুর্বল কলমের সাধ্য কি সে প্রতাপ বর্ণায়! বৃক্ষেরা পাখসাট দিয়া আছাড় খাইয়া শুইয়া পড়িতে লাগিল। গৃহ সকল ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। বিদ্যুতের তারসকল স্পার্ক সৃষ্টি করতঃ কটু গন্ধ ভয়ানক বৃত্ত আঁকিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার ভিতরে পড়িতে লাগিল মানুষ পশু-পাখি উদ্ভিদ, কোনও পক্ষপাত নাই। পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল!

একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর। অনেক দুর্যোগ এই বাংলা সয়েছে কিন্তু এমনটা বোধহয় আর কখনও হয়নি। সারা পৃথিবী দরজা বন্ধ করে বসে আছে। শূন্য রাস্তাঘাট। সারা রাত ধরে কুকুরের ঝগড়া নেই। পায়রারা বসে থাকে না ভিন বাড়ির লিন্টেলে। অথচ আবার কোথা থেকে শিস দিয়ে ওঠে কোন গানপাখি, তার নাম জানি নাকি? কোন পাঁচিলে বসে বসে চারদিক দেখে এক বসন্তবৌরি। হরি! হরি! রাতের বেলায় পিউ কঁহা পিউ কঁহা ডাকতে ডাকতে উড়ে চলে যেতে থাকে পরিযায়ী পাপিয়া। এ সব তো বাপের জন্মে দেখিনি।

বগবগবগুম বগুম... চমকে দেখি আমার ঠিক সামনে ওয়ার্ডরোব নামক আসবাবটির মাথায় এসে বসলেন দুই গোলাগুলি, মানে গোলাপায়রা। এই যাযযাঃ! ভয়ার্ত ঝটাপট, উড়ে চলে গেল, এমনভাবে গেল যেন পেছনে কে হৃদয়হীন ঠ্যাঙা নিয়ে মারতে এসেছে। খারাপ লাগল। তারপর অবাক হয়ে দেখি রোজই আসছে, বাথরুমের স্কাইলাইট দিয়ে ঢুকে গিজারের ওপরে। রান্নাঘরের কাচের আলমারির মাথায়, এমনকী শোবার ঘরে খাটের মৎকৃত শয্যায়। এবং যেখানেই বসছেন, থপাস থপাস। উপরন্তু একরাশ শুকনো পাতা, কাটিকুটি। একে করোনাক্রান্তিতে বাড়িতে লোকজন বাড়ন্ত, তুমিই কুক, তুমিই বাসনমাজুনি, ঘরমুছনি, তুমিই মেথরানি...

তারমধ্যে পারাবতবিষ্ঠা চতুর্দিকে। এবার সত্যি আমার হাতে ঠ্যাঙা উঠে এল। তা মানুষী ঠ্যাঙা তাদের নাগাল পেলে তো! ব্যাপারটা ভাবালো। কাক-কুকুর কমে গেছে। ওরা মানুষের এঁটো খেয়ে বাঁচে, মানুষ আর এঁটো ফেলছে না। মাছ-মাংস কেনবার তেমন পয়সা জুটছে না মানুষের, যেটুকু জুটছে সাপটে খেয়ে নিচ্ছে, কাক-কুকুরের জন্যে আর থাকছে না। কিন্তু পায়রা? তারা কী খায়? এঁটোকাঁটার আস্তাকুঁড়ে ওদের তো কখনও দেখিনি। বলতে কী নীচে ওরা নামেই না। দোতলা সমান উঁচুতে ওদের চলাচল। ওরা খায় ধান, চাল, বীজ এই ধরনের একটা আবছা আইডিয়া ছিল। শহরে অনেকে ছাদে সে সব ছড়িয়ে দেন, পাখিতে খায়। কোথাও শস্যের বস্তা উল্টাল তো হয়ে গেল, ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বসল পায়রা চড়ুই। কিন্তু আজকাল ছাদও নেই, যে তাতে এটা ওটা খাদ্যবস্তু শুকোতে দেবে মানুষ। চাল-ডাল বয়ামে বয়ামে তাকনিবাসী। তবে? এতদিন যারা লিন্টল বিহারী হয়ে দিন কাটাচ্ছিল তাদের খাওনদাওন চলছিল কী করে?

রান্না করছি খাড়াবড়িথোড় আর থোড়বড়িখাড়া। একপাল্লা বন্ধ, নইলে গ্যাস নিবে যাচ্ছে। অন্য পাল্লায় ঠেলাঠেলি। কালো কালো গাবদা বডি আর মৃদু একটা বন্য গন্ধ। এই যাঃ যাঃ। রান্নাঘরে এ সব পায়রালীলা বরদাস্ত করব না তাই বলে। আবার ফতাফত শব্দ, আবার নিষ্ক্রমণ। রান্না শেষ। সব সাজিয়ে ঢাকা দিয়ে চলে এসেছি। ঘণ্টা তিন পরে, খাবার সময়ে, আবার ঢুকেছি। ভাগ্যিস সব ঢাকা দেওয়া ছিল। সেই বুনো গন্ধ, ইনস্টিংকট। ঠিক! দেখি সেই কাচের বাসন রাখার দেওয়াল আলমারির ওপরে গা ডুবিয়ে বসেছে একেবারে। আলমারির মাথায় এতদিন অদৃশ্য হয়েছিল নতুন খ্যাংরা, ছিল টেবিলে ঢাকা, রান্নাঘরের ঝাড়ন গোছা করে। কী করব বলুন আমার তো আর জায়গা নেই! সেইখানে গা ডুবিয়ে বসেছে ব্যাটা, আজ তোমার একদিন কী আমারই একদিন! প্রথমে কিছুতেই যেতে চায় না। তারপরে ছেলে এসে হেঁড়ে গলায় যেই হাঁক দিয়ে তালি বাজিয়েছে কেমন উল্টিপাল্টি খেতে খেতে বেরিয়ে গেল। ঠক করে সিংকের ওপরটায় কী একটা এসে পড়ল, দেখি হলুদ তরল গড়াচ্ছে। এতক্ষণে বুঝলুম ব্যাপারটা। তিনি ডিম পাড়িয়াছেন। কদিন ধরে তার প্রস্তুতিটাই চলছিল। কর্তা কয়েকদিন সঙ্গ দিয়েছিলেন, বেগতিক দেখে এখন তিনি পিঠটান। আর ইনি একা একা আঁতুড়ে ঢুকেছেন। চোখ দুটো সজল হয়ে উঠল। নিজে নারী, মা। গর্ভযাতনার কথা কি মনে নেই? এ বাবদে অনেক গল্পও পড়েছি। কীভাবে বেরালনী কুকুরনীকে আগলাচ্ছেন কোনও সংসারের কর্ত্রী। আমার অনুরূপ কিছু করতে ইচ্ছে হল না। সত্যি বলছি। কনফেস করছি। মনে হল এই করোনা সময়ে আমরা সবাই কত সতর্ক হয়ে থাকছি, কোনও অসুখ-বিসুখ যাতে না হয়। করোনা তো দূর, অন্য কোনও রোগ কারুর হলেও কোনও চিকিৎসা পাব না। আর এই সময়ে ইনি বাধিয়ে বসলেন? তো যাঃ, নিজের ব্যবস্থা নিজে কর গে যা। আর, বাচ্চা তো আর না। সবে অন্ড স্টেজ। গেছে তো কী করব! পারব না, অত পারব না। কদিন চুপচাপ। কাগজে ছবি দেখি। পরবাসী শ্রমিকরা হাজার হাজার মাইল পায়ে হেঁটে ঘরে ফিরছে। ইশশ! একজন শ্রমিক একটা ছোট কাঠের ফ্ল্যাট পাটাতনে চারটে চাকা লাগিয়ে নিয়ে একটা গাড়িমতো করেছে, তাতে শতচ্ছিন্ন বস্ত্র পরা গর্ভিনী শ্রমিকনী। এ পর্যন্ত ইশশ ছিল চোখে জল ছিল। কিন্তু তারপর দেখি সেই মেয়ের
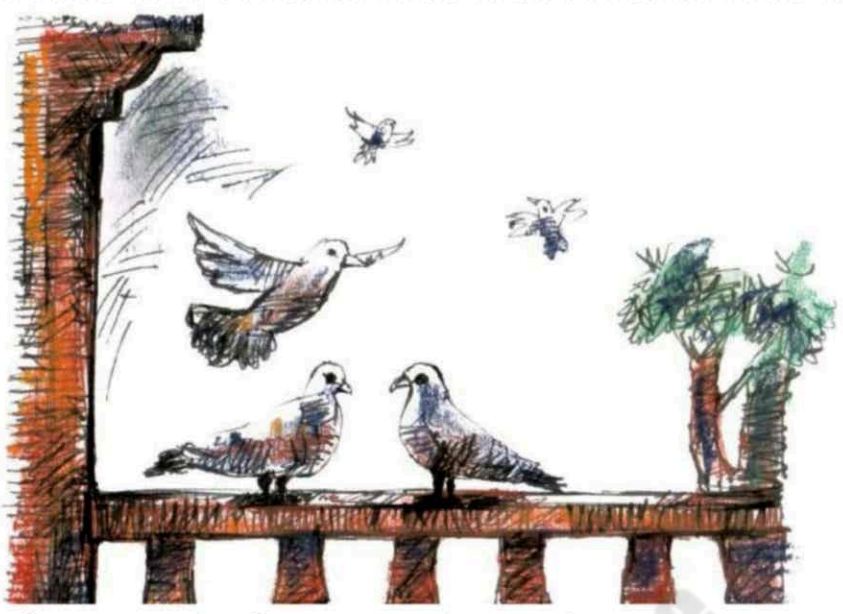
কোলে একটি দুগ্ধপোষ্য বাচ্চা। সত্যি বলছি রক্ত মাথায় চড়ে গেল। বাকি রিঅ্যাকশন হল— স্ত্রীকে গাড়ি বানিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছো, আহা তোমার কত করুণা, কত বিবেচনা! কিন্তু এ কী! সারা দেশ ছেয়ে গেছে ত্রিকোণে, বিনা পয়সায় পাওয়া যায় গর্ভনিরোধক, তার পরেও? নো নো নো। আর করুণা নয়, এখন পবিত্র ক্রোধ। তো যাঃ, নিজের ব্যবস্থা নিজে করোগে যাও। আমরা কিছু করতে পারব না। কিচ্ছু না।

কিছুদিন পরেই আবার কপোত অভ্যুদয় নিরুপায়াবস্থা। কী রকম মরিয়া মতো হয়ে গেছে। দু'জনেই আসছে— যাচ্ছে, আমার সমস্ত জানলা স্কাইলাইট থেকে থেকে বন্ধ। গরমের মধ্যে হা-ক্লান্ত অবস্থা। ভেতরে সর্বক্ষণ টেনশন, তাও না, প্যানিক কখন কোনখান দিয়ে ঢুকে পড়ে। একদিন বাথরুমে গিয়ে দেখি কমোডের সিটে ঢাকনায় সিসটার্নে সর্বত্র থকথকে সবুজ বিষ্ঠা। কী করব? সব পরিষ্কার করতে পারি, এইটি পারিনে। কিন্তু পারতে হল। আর কে করবে? শুধু ওই নয়, নরবরের মতোই উৎকট গন্ধ। আরও সাবধান হই। পরদিন ঢুকতে যাব কেমন ল্যাজে-গোবরে মতো হয়ে একজন মাথায় পড়তে পড়তে কোনওরকমে সামলিয়ে পালালেন। আর পালাবার সময়ে গরম গরম থকথকে এক ঝোড়া ফেলে গেলেন, আমার গায়ে মাথায়, মেঝেতে সর্বত্র। এমা! ইশশ। ওরে বাপরে মারে! ডাক ছেড়ে কাঁদি। দেখি কি বুনো উৎকট গন্ধে সারা বাড়ি ভরে গেছে! গিজারের পাশ দিয়ে সবুজ ঘন ধারা নেমেছে। সে সব পরিষ্কার করেও গন্ধ যায় না। গিজারের পাশটায় তো হাত যাচ্ছে না। মগ মগ জল ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। হলে সেই প্রায় বিকেলে প্রচুর সাবান মেখে চান করে নোংরা জামাকাপড় কাঁদতে কাঁদতে কাচাকুচি করে, কাঁদতে কাঁদতে শুয়ে পড়ি।

এইবারে আমার মাথা কাজ করছে। বাংলার গৃহিণীরাজি, আপনারা জানেন সকল কাজের কাজি। সবুজ পুরীষ মানে? ওদের তো কেমন সাদা সাদা বিষ্ঠা হয়! তার মানে পেটের কোনও বিচ্ছিরি ইনফেকশন হয়েছে। পায়রার পেট খারাপ! খুব বিচ্ছিরি যাতের আমাশা। ছোটতে আমার বাচ্চাদের এমন হলে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার কী দিতেন! কী দিতেন! মার্ক কর। আঁতিপাতি খুঁজতে থাকি। এই তো! একটু পুরনো হয়ে গেছে কিন্তু হলদে হয়নি, ছাড়া ছাড়াও রয়েছে। মানে ওইগুলিতে অ্যালকোহল মেশানো যে ওষুধটা মেশানো হয় সেটাও বর্তমান। পরদিন ছোলার ডাল আর চালের দানার সঙ্গে কয়েক ফোঁটা মার্ক কর থার্টি মিশিয়ে রান্নাঘরের জানলার বাইরে রেখে দিই। জানলা বন্ধ। আসা-যাওয়া চলছে, ছায়া দেখে টের পাই। বিকেল ঘন হতে জানলা খুলি। খেয়েছে! খেয়েছে! হাততালি দিয়ে প্রায় নাচার অবস্থা আমার। ভীষণ একটা আত্মপ্রসাদ! কত গল্প শুনেছি, মানুষের ওষুধ খেয়ে, ওই হোমিও গুলি খেয়ে, ঘোড়ার অসুখ সেরেছে। লেজেন্ড হয়ে আছে। আজ আমিই একটা লেজেন্ড সৃষ্টি করলুম তাহলে। পরদিন ভোর ভোর ঘুম ভেঙে গেল। জানলা দিয়ে চারদিকে তাকাই। শর্মাদের কোথাও দেখা যায় কি না। সারা রাত ব্যথাক্ষান্তির ঘুম ঘুমিয়েছে নিশ্চয়ই। আজ একটু বেলা হবে। নীচে ততক্ষণে জমাদার এসে গেছে। বাড়ির গার্বেজ ব্যাগটা এবার বাইরে দিয়ে আসতে হবে। তা নিজেদের মধ্যে জটলা করছে তো করছেই। কেয়ারটেকার আর মালিও জুটেছে। যাক এসেছে! ময়লাটা দিতে যাই। জিজ্ঞেস করি এত দেরি হল কেন? কী এত গুলতানি মারছিলে? এ ভাষায় বলিনি অবশ্য। কী বলল জানেন? একটা পায়রা মরে পড়ে আছে। সেটাকে তো তুলে ফেলতে হবে, তাই নিয়ে...।

... হ্যাঁ, স্বীকার করছি আমি বিরক্ত হয়েছিলুম, রেগে গিয়েছিলুম, কী করব বলুন। সারা বাড়ি পায়রার বড় বাইরেতে ভরে যাবে? কিচ্ছু বলব না? ব্যবস্থা নেব না? বার্ড ড্রপিংস থেকে নানান রোগ হয়, প্রায়ই অ্যাড দেখি। তবে? হোমিওপ্যাথির গুলিতে রোগ সারুক না সারুক, কেউ কখনও মরে না। নেভার। আপনারা আমাকে দোষী সাব্যস্ত করবার চেষ্টা করবেন না, প্লিজ। হতে পারে আমাশার ওপর ডালটা সহ্য হয়নি। কিন্তু ওটাই তো ওদের খাদ্য! তবে কি, সদ্য প্রসূতি রোগা শরীরে না খেয়ে খেয়ে, আর বসবার দাঁড়াবার জায়গা না পেয়ে পেয়ে ও হয়রান হয়ে গিয়েছিল।

মৃত্যু এক বন্য প্রাণী, গন্ধে চারদিক ভরে গেছে।

পায়রা বউ, ও পায়রা বউ, আমাকে মাফ কর ভাই!

অলংকরণ: দেবাশিস সাহা
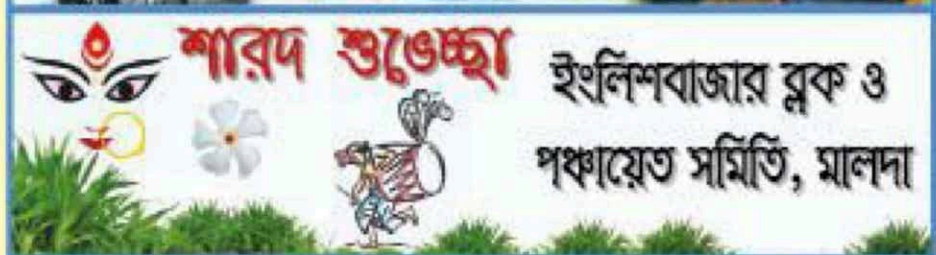
শারদ শুভেচ্ছা
ইংলিশবাজার ব্লক ও
পঞ্চায়েত সমিতি, মালদা

• মাধব রাও সিন্ধিয়া ও জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

• বিজয়ারাজে সিন্ধিয়া

• গায়ত্রী দেবী

• মনসুর আলি খান পতৌদি

• জওহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধী

রাজবাড়ির রাজনীতি

সমৃদ্ধ দত্ত

॥ এক ॥

মহারাজ, এখনই আপনাকে উত্তরাধিকারী বাছাই করতে হবে। আর কিন্তু সময় নেই। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলছেন, ব্রিটিশ রেসিডেন্ট। ১৮৮০, ফেব্রুয়ারি। জয়পুর সিটি প্যালেস।

মহারাজা রাম সিং তিনদিন ধরে অচেতন। এতটাই অসুস্থ যে, ধরে নেওয়া হচ্ছে মৃত্যু আসন্ন। ব্রিটিশ কমিশনারের কণ্ঠস্বর তাঁর কানে গেল কি? বোঝা যাচ্ছে না। সাড়া দিচ্ছেন না। নিয়ম হল, যদি রাজার উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহলে দত্তক নিতে হবে ঝালাই বংশ থেকে। এটাই ট্র্যাডিশন। জয়পুর থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরের এক জনপদ ঝালাই। ঠাকুর সম্প্রদায়ের একটি জমিদারি। বংশপরম্পরায় যখনই জয়পুরের রাজওয়াট বংশের উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন পড়েছে, তখনই সেই ভাগ্যবান এসেছে ঝালাই থেকে।

ব্রিটিশ কমিশনার অপেক্ষা করলেন বিশ্রামাগারে। তাঁর ফিরে গেলে চলবে না। জয়পুর প্যালেসের একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করে যেতেই হবে। ঠিক দু'দিন পর আবার এলেন তিনি। একটু আশান্বিত চেহারা মহারাজের। কমিশনার বললেন, আপনি একজন কোনও উত্তরাধিকারীর নাম বলুন। মহারাজ কোনওক্রমে বললেন, আপনারাই ঠিক করুন।

আমার আর শক্তি নেই। কমিশনার বিনীতভাবে বললেন, হিজ হাইনেস, আপনার উত্তরাধিকারী আপনিই চিহ্নিত করলে রাজবংশের গৌরব বজায় থাকবে। একটু চোখ বুজে রইলেন মহারাজা রাম সিং। তারপর ফিসফিস করে যে নাম বললেন, সেটা শুনে চমকে গেলেন ঘরে উপস্থিত রানি, দাসী, মন্ত্রী এবং ব্রিটিশ কমিশনার সকলেই। মহারাজ বলেছেন, কাঈম সিং! ইসরাদা!

ইসরাদা আর একটি জমিদারি বংশ। কিন্তু উত্তরাধিকারে ঝালাই বংশই তো নির্ধারিত! ব্রিটিশ রেসিডেন্ট একটু ঝুঁকে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন, মহারাজ সব দিক ভেবেচিন্তে বলছেন তো? এটাই চূড়ান্ত! মহারাজা রানির দিকে একবার তাকালেন। ওই দৃষ্টি থেকেই রানিসাহেবা বুঝলেন মহারাজের এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ঠিক পরদিন সকালে মহারাজা রাম সিং এর মৃত্যু হল। যাঁর নাম তিনি পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে করে গেলেন, সেই কাঈম সিং তখন টঙ্কের নবাবের সেনাবাহিনীতে একজন রিসালদার হিসেবে নিয়োজিত। বেশ কয়েক বছর আগে ইসরাদা জায়গীর থেকে তাকে তার বড় দাদা তাড়িয়ে দিয়েছিল। কারণ দাদার মতে সে ছিল অপদার্থ। সারাদিনই শুধু কুস্তির আখড়ায় কাটায়। ওই কুস্তিই ছিল কাঈম সিংয়ের ধ্যানজ্ঞান। চেহারাটি দশাসই। সকলের অগোচরে কাঈম সিংয়ের মা বেশ কয়েকবছর আগে একবার পুত্রকে নিয়ে জয়পুরে প্যালেসে এসে দেখা করেছিলেন মহারাজার দরবারে। বলেছিলেন, মহারাজা আমার এই ছোট ছেলেকে সবদিক থেকে বঞ্চিত করবে এর বাবা দাদারা। আপনি একটু কোথাও ব্যবস্থা করে দেবেন? সেই থেকে সম্পর্ক। মহারাজা ছেলেটিকে মনে রেখেছেন। তাই বলে এভাবে মনে রাখবেন সেটা কেউই ভাবেনি। কাঈম সিং হলেন জয়পুরের নতুন মহারাজা। নাম হল দ্বিতীয় মাধো সিং।

ব্রিটিশরাজ একটা ভুল করেছিল। তাদের ধারণা ছিল মাধো সিং একজন ব্যর্থ প্রশাসক হবেন। আর এই অপদার্থ রাজাকে পুতুল করে জয়পুরের রাজদণ্ড সহজেই আসবে ইংরেজদের হাতে। এসব কাজে তারা তো সিদ্ধহস্ত। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। কুস্তিগীর মাধো সিং অত্যন্ত দ্রুত তীক্ষ্ণ এবং ক্যালকুলেটিভ এক শাসকে পরিণত হলেন এবং ধর্মীয়ভাবে নিবেদিতপ্রাণ এক হিন্দু রাজপুত। ছিলেন ঠাকুর। রাজওয়াট পরিবারের নয়া উত্তরাধিকারী হিসেবে এখন তিনি রাজপুত। কুলদেবতা শ্রীকৃষ্ণ। তিনটি বাঁধ তৈরি করে ফেলেছেন। রাস্তা তো তৈরি করেছেনই, রেল পর্যন্ত এনে ফেলেছেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। এখন চাষের জন্য জল পাওয়া যায় তাঁর রাজ্যে। খুশি প্রজাকুল কিন্তু ব্রিটিশরা ক্ষুব্ধ। কারণ, জয়পুর হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। অথচ মুখে কিছু বলতে পারে না তারা। কারণ বহিরঙ্গে মাধো সিং ব্রিটিশ আনুগত্যে কোনও খামতি রাখেন না। নিয়ম করে বিপুল অর্থও পৌঁছে দেন কোষাগারে। অতএব কী বলার আছে?

১৯০১। সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক হবে। আমন্ত্রণ পেয়েছে গুটিকয় রাজপরিবার। তার মধ্যে অন্যতম মাধো সিং। যেতে হবে লন্ডন। কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব? একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু মহারাজার পক্ষে সাত সমুদ্র পেরিয়ে ম্লেচ্ছদের দেশে যাওয়া মানে তো জাতধর্ম ধ্বংস! কালাপাণি পেরনো একপ্রকার জাতিধর্মকে বিনষ্ট করা। কিন্তু এই সম্মান ছাড়াও যায় না। অতএব মাধো সিং যাবেনই। বৈঠক বসল

কুলপুরোহিতদের। সাতজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিলেন সমাধানসূত্র। মহারাজা যতদিন বিদেশভ্রমণে থাকবেন, ততদিন তিনি শুধুই প্রসাদ ভক্ষণ করবেন। আর কোনও খাবার নয়। আর এমন জাহাজে উঠতে হবে যেখানে কেউই আমিষ খাবার খাবে না। কারণ, মহারাজের সঙ্গে থাকবে স্বয়ং কুলদেবতা গোপালজির বিগ্রহ। এরকম জাহাজ কি পাওয়া সম্ভব? বিদেশে সবথেকে বেশি যাতায়াত করে ইওরোপীয়রা। তাই তাদের তো আমিষ, সুরাপান সবই করতে হয়। জানা গেল, একটি সংস্থা আছে, যারা ভারতের হিন্দু রাজারাজন্যকে জাহাজে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্যই একটি বিশেষ ডিপার্টমেন্ট রেখেছে। তার নাম ইস্টার্ন প্রিন্স ডিপার্টমেন্ট। সেই ডিপার্টমেন্ট স্পেশাল নিরামিষ-বিশুদ্ধ জাহাজ চালায়। সংস্থার নাম কী? টমাস কুক! জাহাজের নাম এস এস অলিম্পিয়া।

সেই জাহাজ ভাড়া করা হল। কী কী নেওয়া হল? ময়দা, ঘি, চাল, চিনি, ডাল, সবজি। মোট ৭৫ হাজার কেজি ওজনের লাগেজ। তিনটে বিপুল বড় জালাভর্তি গঙ্গাজল। বেশ কিছু গোরু। দুধ আর গোবরের জন্য। জাহাজ ছাড়ার আগে সমুদ্রের জলে এবং শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়া হল রুপো, মুক্তো আর রেশমের কাপড়। বরুণদেবতাকে তুষ্ট করার জন্য। যাত্রা নির্বিঘ্ন হয় যাতে। কিন্তু বরুণ দেবতা সম্পূর্ণ তুষ্ট হননি। সুয়েজ খাল পেরনোর সময় ঝড় উঠল। সামাল সামাল রব! জাহাজ প্রায় ডুবে যায়। গোপালজির সামনে গিয়ে মহারাজা নিবিষ্টমনে জপ করছেন। তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই ঝড়ে। তাঁর নির্দেশে একটি রুপোর জালা ফেলে দেওয়া হল সমুদ্রে। আশ্চর্য ঘটনা! কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শান্ত হল সমুদ্র।

এহেন নিষ্ঠাবান মহারাজ মাধো সিংয়ের ভাগ্যও কিন্তু সেই একই। তাঁর বৈধ রানিদের গর্ভে নেই কোনও পুত্রসন্তান। জয়পুর রাজপরিবারের ভাগ্যে কি তাহলে শুধুই বহিরাগত উত্তরাধিকারীদের আগমন? মহারাজ মাধো সিং-এর ঔরসে কি সত্যিই কোনও পুত্রসন্তান নেই? রাজকীয় ঐতিহ্যে বলা যায় নেই। কিন্তু অনেক পুত্রই আছে যাদের তিনি বায়োলজিক্যাল ফাদার। কিন্তু সমস্যা হল, তারা সকলেই প্যালেস থেকে দূরে নাহারগড়ে রয়েছে তাঁর খাস জেনানা মহলে। সেখানে তাঁর পছন্দের নারীরা ৭০ বার সন্তানধারণ করেছে। পুত্রকন্যারা সকলেই মহারাজের সন্তান। কিন্তু তাদের মায়েরা তো রানি নয়! অতএব সিংহাসন থেকে তারা বঞ্চিত। মহারাজার বিবাহ করা দুই রানির কারও পুত্র নেই।

জয়পুরে আবার উত্তরাধিকার সঙ্কট! এবার শুধু জল্পনা অথবা অপেক্ষা নয়, তীব্র চক্রান্ত, এবং রাজনীতির প্রবেশ ঘটল সিংহাসনকে নিয়ে। ঝালাই জায়গীরের ঠাকুর পরিবার এবার বঞ্চনা সহ্য করতে রাজি নয়। মাধো সিং পুনরায় ইসরাদা থেকেই উত্তরাধিকারী বাছাই করলে বিদ্রোহ করবে ঝালাই। এরকমই কঠোর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হল। মাধো সিং এর কানে খবরটা গেল বটে কিন্তু কুস্তিগীর মহারাজা ওসব পাত্তা দিতে রাজি নন। একটা জায়গীরের জমিদার রাজাওয়াট বংশকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে? সাহস কত বড়? তিনি শুধু জানিয়ে দিলেন, আমার বাছাই করা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন ঘোষণা করছি না যে আমার পর কে হবে রাজা। যথাসময়ে রহস্য উন্মোচন হবে। কে সে? গোটা জয়পুর তো বটেই, ব্রিটিশ সরকারের মধ্যেও চরম উত্তেজনা আর জল্পনা।

১৯২০। মে মাস। মহারাজা মাধো সিং ইসরাদার জমিদার সয়াই সিং কে চিঠি লিখে বললেন, আপনার দুই ছেলেকে নিয়ে আসুন। কেউ যেন না জানে। গভীর রাত। রাজবাড়িতে এসেছেন সয়াই সিং। সঙ্গে দুই পুত্র বাহাদুর আর মর্মকূট। বাহাদুর বড়। সিটি প্যালেসের গেটে আগে থেকেই দাঁড়িয়ে এক সাহেব। তাঁর নাম চার্লস ক্লিভল্যান্ড। তিনি প্রাক্তন সিআইডি অফিসার। এখন মহারাজের জয়পুর প্যালেসের ইনটেলিজেন্স অফিসার। মহারাজা বসে আছেন মন্ত্রণাকক্ষে। ঘরটা ছোটো। একটি কার্পেটে কয়েকজন মন্ত্রী। মহারাজা গদিতে। বাহাদুর আর সয়াই সিং বসলেন। কিন্তু আর বসার জায়গা নেই। মর্মকূট কোথায় বসবে? সে ইতস্তত তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। মহারাজা মান সিং হাত বাড়ালেন। কাছে এসো। মর্মকূট দ্বিধায়। বাবা সয়াই সিং-এর দিকে তাকিয়ে। সয়াই সিং হেসে ঘাড় কাত করলেন। মর্মকূট এগিয়ে যেতেই মান সিং তাকে নিজের কোলে বসিয়ে নিলেন। সামান্য কয়েকজনের কাছে আভাস চলে গেল যে, মহারাজা কাকে নিতে চলেছেন দত্তকপুত্র। কিন্তু আর কথা নয়। এবার চলে যাও তোমরা, সময় হলেই আমি ডেকে নেব। অর্থাৎ কোনও ঘোষণাই হল না। রহস্যটা রয়েই গেল।

কয়েকমাস কেটে গেল। আর অপেক্ষা নয়। ঝালাই ঠাকুর বংশ পাশে পেয়েছে বিকানিরকে। ততদিনে গোপন খবর

২৪ মার্চ ১৯২১। মর্মকূট জয়পুরের দত্তকপুত্র ও উত্তরাধিকারী হিসেবে অভিষিক্ত হল। তার নতুন নাম সওয়াই মান সিং। কাছের লোকের কাছে ডাক নাম— জয়!

ফাঁস হয়েছে। ইসরাদা থেকেই আবার রাজা হবে জয়পুরে। ৫০ জনের একটি দল। কালো চাদরে ঢাকা তাদের শরীর। চলেছে কোটায়। সন্ধ্যা হয়েছে। সম্ভবত অমাবস্যা। তাই অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। কোটার মহারাও উমেদ সিং-এর পুত্র ভীম সিং-এর সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে মর্মকূট। ঘোড়া আসবে। তারা যাবে শিকারে। চম্বল নদীর পাশের জঙ্গলে। কোটায় এসেছে কেন মর্মকূট? কারণ, এখানেই স্কুলে পড়ে সে। তার স্বপ্ন, একদিন সে একটা বাঘ মারবে। নিজের হাতে। নদীতীরে রাখা আছে স্কটিশ স্পিডবোট। সেটায় চেপে জঙ্গলের গভীরে যেতে হবে। বাঘ আসবে জল খেতে। তখনই গুলি। ঘোড়ার বদলে প্রচন্ড জোরে একটা গাড়ি এসে থামল। আর কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাদের দুজনকেই তুলে নেওয়া হল সেই গাড়িতে। হঠাৎ পিছন থেকে প্রবল শব্দ। ঘোড়ায় চেপে কিছু লোক আসছে। সেই ৫০ জনের দল। কালো চাদরে ঢাকা। শুরু হল চেজিং। গাড়ির পিছনে ঘোড়ার দল। ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি ছুটে সোজা উমেদ সিং এর প্রাসাদে ঢুকতেই গেট বন্ধ করে দেওয়া হল। আর ছাদ থেকে পরপর গুলির শব্দ। মর্মকূট গাড়িতে বসে। তাকে নামতে বারণ করা হয়েছে। হঠাৎ দুই ইংরেজ হাতে রিভলবার নিয়ে ঢুকে এল। এরা কারা? ভয় পেয়ে গেল মর্মকূট। তারা বলল, আমরা জয়পুর রাজ্যের লোক। ভয় নেই। চুপ। গাড়ির হেডলাইট অফ। চারদিকে নিঝুম অন্ধকার। পিছনের মাঠে নেমে গাড়িটা চলতে শুরু করল। মর্মকূটের চোখ বাঁধা। মুখও। যখন সে চোখ খুলল, তখন হঠাৎ আলোর ঝলকানি। সামনে এক বিরাট প্রাসাদ। ফোয়ারা থেকে জল উড়ছে। লাল আলোয় ভাসছে জগৎ। এটা হল লিলিপুল। জয়পুরের সিটি প্যালেস। মর্মকূট জানতে পারল আগামীকাল তার দত্তকগ্রহণ। এই নাটকীয়তা কেন? কারণ ওই কালো চাদরে ঢাকা দস্যুদের পাঠিয়েছিল ঝালাইয়ের ঠাকুর। মর্মকূটকে হত্যা করতে। সেই খবর পেয়ে যান চার্লস। তাই মর্মকূট বেঁচে গেল। ২৪ মার্চ ১৯২১। মর্মকূট জয়পুরের দত্তকপুত্র ও উত্তরাধিকারী হিসেবে অভিষিক্ত হল। তার নতুন নাম সওয়াই মান সিং। কাছের লোকের কাছে ডাক নাম— জয়!

ঠিক এক বছর পর জয়পুরের অনেক দূরে লন্ডনের এক হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছিলেন এক যুবক। পূর্ব ভারতের একটি সম্পদশালী রাজ্য কোচবিহারের মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ। তাঁর জন্মগত ঠিকুজিতে রয়েছে যদি তিনি কোনওক্রমে ৩৬ বছর বয়স পেরিয়ে যান, তাহলে তাঁর ভাগ্য হবে অতি সুপ্রসন্ন। তিনি হবেন দীর্ঘজীবী ও অসীম সম্পদের মালিক ও ক্ষমতাশালী। কিন্তু ৩৬ বছর বয়সটা আসার আগে তাঁর হস্তরেখায় রয়েছে এক প্রাণসংশয়। হঠাৎ নিউমোনিয়া ধরা পড়ল। শরীর ভেঙে যাচ্ছে। ২০ ডিসেম্বর, ১৯২২। মহারাজের ৩৬তম জন্মদিন। হস্তরেখা সঠিক প্রমাণ করে জিতেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হল। প্রাণপণে সেবা করছিলেন মহারানি ইন্দিরা দেবী। পারলেন না ধরে রাখতে। ৩০ বছর বয়সে স্বামীহারা হলেন পাঁচ সন্তান নিয়ে। তাঁর প্রিয় প্যারিসের ওয়াল হ্যাংগিং, ম্যুরাল, বোলস্টার ইতালির ফেব্রিকস, বেলজিয়ামের রোজ কোয়ার্টজ গ্লাসের মতো সূক্ষ্ম আভিজাত্যের দুনিয়ায় মহারানি ইন্দিরা দেবীর প্রিয়তম সৌন্দর্যটি হল তাঁর কন্যা। আয়েশা!

১৯৩১। কলকাতার ফাঁকা ফাঁকা অংশে উডল্যান্ডস নামক এস্টেট অনেকদিন আগে কিনেছিলেন কোচবিহারের মহারাজা

নৃপেন্দ্রনারায়ণ। সেই আগের ঔজ্জ্বল্য আর নেই। তবু শীতকালে পোলো টুর্নামেন্ট হয়ই। সেই পোলো চ্যাম্পিয়নশিপের গ্ল্যামারাস, হ্যান্ডসাম যে প্লেয়ার আর তাঁর টিম গত কয়েক বছর ধরে জিতে চলেছে, সে পোলো খেলায় চ্যাম্পিয়ন। নাম মান সিং। জয়পুরের মহারাজা। ২১ বছর বয়স। আয়েশা উডল্যান্ডসের ব্যালকনি থেকে একদিন দেখতে পেল তীব্র বেগে একটি হুড খোলা সবুজ রোলস রয়েস ঢুকছে। জানতে পারল এই মান সিং। আয়েশার মা যাঁকে সম্বোধন করেন 'জয়' বলে। আয়েশার মা ইন্দিরা দেবী বরোদার রাজকুমারী। ওই যে প্রথম দেখা এবং আয়েশার চোখে মুগ্ধতা, সেটা চেনেন ইন্দিরা। বুঝে গেলেন তাঁর কন্যাটি জয়ের প্রেমে পড়েছে। জয় বোঝেননি তখনও। তিনি বিবাহিত। যদিও তাঁর অমতেই হয়েছে সেই বিয়ে। তাঁর থেকে তাঁর রানি অনেক বড়। রানির নাম মারুধার। আসলে জয়ের সঙ্গেই যেন মানাবে আয়েশাকে। বিধাতা সেরকমই স্থির করেছিলেন। এক বছর পরের পোলো সিজনে এসে কলকাতার চৌরঙ্গী নামক একটি অভিজাত অঞ্চলে ফারপোজ রেস্তরাঁয় জয় আর আয়েশা মন দেওয়া নেওয়া করেছিল একটিও বাক্য না বলে। কারণ মান সিং এর ভাগ্য নির্ধারণ করে তাঁর রাজবংশের প্রোটোকল। তাঁর স্বাধীনতা নেই। তাই তিনি ভালোবাসা জানাতে পারলেন না। উলটে জয়পুরে ফিরে তাঁর আবার বিবাহ হল। এবার নতুন রানি প্রথম স্ত্রীর বোনঝি।

ম্যাট্রিকুলেশনে ফার্স্ট ডিভিশান পেয়ে আয়েশা লন্ডনে চলে এল পড়তে। হঠাৎ জানা গেল, স্যার হ্যারল্ড ওয়ার্নহারের টিমের সঙ্গে পোলো টুর্নামেন্টে আসছে জয়। বুক ধরাস ধরাস করছে আয়েশার। ফোন এল এক বিকেলে। হ্যাঁ। টেলিফোনে জয়। তুমি একবার ডরস্টারে আসতে পারবে? আয়েশা না বলবে কীভাবে জয়কে? হাইড পার্কে একটি পপলার গাছের নীচে মান সিং বললেন, ভেবে দ্যাখো। এখনই উত্তর দিতে হবে না। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। মনে রেখো আমি পোলো খেলি। যে কোনওদিন অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। তাই এসব ভেবেই সিদ্ধান্ত নিও। তাড়া নেই। আয়েশা মাথা নীচু করল। হঠাৎ প্রবল বেগে হাওয়া দিচ্ছে। হাইড পার্কের সেই ঝোড়ো হাওয়ায় ভেসে গিয়ে আয়েশা বলল, হ্যাঁ....। মান সিং এর তৃতীয় রানি হলেন কোচবিহারের আদরের রাজকন্যা। আয়েশা। যার ভালো নাম গায়ত্রী। ভারতের রাজপরিবারের ইতিহাসে সৌন্দর্য আর আভিজাত্যের উজ্জ্বলতম নাম, মহারানি গায়ত্রী দেবী। তাঁর রচিত একটি স্টাইল স্টেটমেন্ট আজও আভিজাত্যের করিডরে অমলিন— হোয়াইট পার্ল উইথ ব্লু শিফন!

•••

জওহরলাল নেহরুর একটি চিঠি এল মান সিংএর কাছে। 'একটা কথা বলুন তো! আমরা দেশবাসীকে আর কতদিন ধরে কীভাবে বোঝাব যে এই রাজারাজড়াদের রাজ্য চলে যাওয়া সত্ত্বেও বছরে প্রচুর টাকা দিতে হচ্ছে? কেনই বা দিচ্ছি? বহু রাজা আছেন কিন্তু তাদের কাজটা কী? মান সিং এই অপমানে ক্ষুব্ধ। তিনি তখন রাজ্যপাল রাজস্থানের। মহারানি গায়ত্রী দেবীর চোখ জ্বলে উঠল। বললেন, তুমি পালটা চিঠি লেখো। মান সিং নেহরুকে লিখলেন, আপনি যে ভাষায় চিঠি লিখেছেন সেটা দুর্ভাগ্যজনক। আপনার সরকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কে? দেশীয় রাজাদের যে এই প্রিভি পার্স (বার্ষিক অনুদান) দিতে হবে, এটা তো সংবিধানে লেখা আছে। নেহরুর চোয়াল শক্ত হল একটু।

১৯৫৫। বিবাহের পর অনেক পথ পেরিয়ে এসেছেন মহারাজ মান সিং ও মহারানি গায়ত্রী দেবী। এখন নতুন ভারত এসেছে। এসেছে নতুন যুগ। মহারাজ মান সিং ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থকে চিঠি লিখে হুঁশিয়ারি দিলেন, অতি সক্রিয় হয়ে এমন কিছু সিদ্ধান্ত নেবেন না যাতে ভারতে বড়সড় অশান্তি তৈরি হয়। মনে রাখবেন। স্পষ্ট হুঁশিয়ারি। আঘাতটা এল এক বছরের মধ্যে। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর রাষ্ট্রপতি তিনজন তিনটি চিঠি দিলেন। যার মর্ম একটাই। রাজ্যপালের পদে আর থাকা চলবে না। একজন বারংবার রাজ্যপাল হতে পারবে না। একবার একটু জানানোর বা আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করল না এরা? ভাবলেন জয় সিং। এককথায় গদি কেড়ে নিল রাজ্যপালের! ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে রাজাদের। এটা রাজনীতিকদের চক্রান্ত। তাহলে আমরাও রাজনীতিই করব। ভাবলেন মান সিং। জওহরলালকে চিঠি লিখলেন মান সিং।

এই দলটাকে আমি বিশ্বাস করি না। ঠান্ডা চোখে স্বামীকে বললেন গায়ত্রী দেবী। ১৯৬০। বললেন, তোমার মনে নেই, কীভাবে স্বাধীনতার পর অলমোস্ট ৮ কোটি টাকা নিয়ে নিয়েছিল এই কংগ্রেস সরকার? আর লাগাতার অপমান করেছে। সেই দলে তুমি আমাকে যেতে বলছ? হ্যাঁ

মান সিং এর তৃতীয় রানি হলেন কোচবিহারের আদরের রাজকন্যা। আয়েশা। যার ভালো নাম গায়ত্রী। ভারতের রাজপরিবারের ইতিহাসে সৌন্দর্য আর আভিজাত্যের উজ্জ্বলতম নাম, মহারানি গায়ত্রী দেবী।

Coronavirus
COVID 19

আপনার করণীয়

কি করবেন

মাস্ক ব্যবহার করুন

বার বার **সাবান** দিয়ে হাত পরিষ্কার করুন

সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন

কি করবেন না

জনসমাগম এড়িয়ে চলুন

করমর্দন করবেন না

মুখে, নাকে ও চোখে হাত দেবেন না

প্রকাশ্যে **হাঁচি** বা **কাশবেন** না

ভিড়যুক্ত **লিফটে** উঠবেন না

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

(পরিবেশ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

জওহরলাল নেহরু জয়কে প্রস্তাব দিয়েছেন, আপনি অথবা মহারানি কংগ্রেসের টিকিটে ভোটে দাঁড়ান। সেই প্রস্তাব মহারানিকে জানান, কিন্তু গায়ত্রী দেবী নারাজ। বরং রাজাজির (রাজা গোপালাচারী) স্বতন্ত্র দলের একটা আদর্শ আছে। তবে, নেহরুর সঙ্গে ঝগড়া করে টিকে থাকা কি সম্ভব? জানতে চাইলেন মান সিং। গায়ত্রী দেবীর মুখ শক্ত হল। বললেন, তুমি তো জানো আমি সহজে হার মানি না। চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী জানেন, জয়পুরে আসল মহারাজা গায়ত্রী দেবী। মারাত্মক জনপ্রিয়। তাই শুধু গায়ত্রী দাঁড়ালে হবে না। তাঁকে দায়িত্ব নিতে হবে রাজস্থানেও যেন স্বতন্ত্র পার্টির ফলাফল ভালো হয়। গায়ত্রী দেবী জয়পুর লোকসভা থেকে প্রার্থী হলেন। ভোটের প্রচার কেমন হয়? জানেন না গায়ত্রী দেবী। কংগ্রেস প্রচারের রকমসকম দেখে হাসছে। কারণ, মহারানি কিছুক্ষণ প্রচার করেই জয়পুর ক্লাবে গিয়ে ড্রিঙ্ক নিয়ে বসেন। শপিং করতে চলে গেলেন প্যারিস। এই প্রার্থী জিতবে কীভাবে? কংগ্রেসকে চরম বিস্মিত করে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ভোটে জিতলেন গায়ত্রী দেবী। ১৯৬২ সালের সেই ভোটে গোটা প্রচারপর্বে সবথেকে বেশি বিদেশি মিডিয়া অনুসরণ করেছে একজন প্রার্থীকে। গায়ত্রী দেবী। যা নীরবে অন্য এক নারীর চোখে পড়েছে। তিনিও প্রচার করেছেন দিনরাত পরিশ্রম করে। অথচ এত মিডিয়া অ্যাটেনশন পাননি। মহারানি বলে কি গুরুত্বও বেশি? সুযোগ পেলে আমিও দেখিয়ে দেব আমার জনপ্রিয়তা কতটা হতে পারে। তখনই সেই নারী মনে মনে শপথ নিয়েছিলেন, একদিন আমাকে অনুসরণ করবে তাবৎ মিডিয়ার প্রচার। তাঁর নাম ছিল ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী গান্ধী।

প্রথমবারের এমপি। জড়োসড়ো হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু চীনের কাছে ভারতের পরাজয় নিয়ে বিরোধীরা সরকারকে আক্রমণ করে বলছে, চীন যে বারংবার আমাদের দেশে ঢুকে পড়েছে, এসব কথা কেন প্রধানমন্ত্রী গোপন করেছেন? নেহরু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনারা এত কিছু জানেন। কই আমি তো জানি না যে যুদ্ধের আগে কবে কোথায় চীন ঢুকে পড়েছে! হঠাৎ একেবারে পিছনের দিকে বসে থাকা গায়ত্রী দেবী উঠে বললেন, আপনি যদি একটু আধটু জানতেন, তাহলে আজ আমাদের এই লজ্জার অবস্থা হত না। আপনি তো .কিছুই জানেন না। সেটাই সমস্যা! নেহরু, বললেন, আমি কোনও লেডির সঙ্গে ঝগড়া করতে পারব না। সরি! উত্তরে গায়ত্রী দেবী বলেছিলেন, ঝগড়া কেন? অথেনটিক ইনফর্মেশন দিন, তাহলেই হবে।

সেদিন রাতেই স্বতন্ত্র পার্টির নেতা মিনু মাসানির বাড়িতে দলের বৈঠক। জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রধান বক্তা। গায়ত্রী দেবী একটু দেরি করে পৌঁছলেন। তিনি ঢুকতেই সকলে তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। গায়ত্রী দেবী নমস্কার জানিয়ে বললেন, বসুন বসুন, আমি নতুন এমপি। আপনাদের থেকে শিখব অনেক কিছু। বলেই তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণের সামনে কার্পেটেই বসে পড়লেন। প্রিয় ব্লু শিফন শাড়ি পরে। জয়পুরের মহারানি মাটিতে বসে! সকলে হকচকিয়ে গেল। গায়ত্রী দেবী হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা সিলভার বক্স বের করে সিগারেট ধরালেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ বললেন, দুনিয়া বদলে গেছে। মহারানি কি না সাধারণ এক মানুষের পায়ের সামনে মাটিতে বসে! মহারানি হাসলেন। বললেন, দেখুন আমি পার্লামেন্টে ইংরাজিতে কথা বলব। আসলে আমার মাতৃভাষা বাংলা। আর বিয়ের পর রাজস্থানে। তাই হিন্দিটা ভালো পারি না। তিনি সেদিন বলেছিলেন, আমাদের প্রতিদিন লোকসভায় নেহরু সরকারকে চীন নিয়ে চেপে ধরতে হবে। কিন্তু সেই সুযোগ বেশি পাওয়া গেল না। কারণ, দু বছরের কম সময়ের মধ্যে আচমকা নেহরুর মৃত্যু হল। নতুন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীকেও ভারত পেল না বেশিদিন। তিনিও

জয়পুরে আসল মহারাজা গায়ত্রী দেবী। মারাত্মক জনপ্রিয়। তাই শুধু ভোটে দাঁড়ালে হবে না। তাঁকে দায়িত্ব নিতে হবে রাজস্থানেও যেন স্বতন্ত্র পার্টির ফলাফল ভালো হয়। গায়ত্রী দেবী জয়পুর লোকসভা থেকে প্রার্থী হলেন। কংগ্রেসকে চরম বিস্মিত করে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ভোটে জিতলেন গায়ত্রী দেবী।

তাসখন্দে মধ্যরাতে রহস্যজনকভাবে মারা গেলেন। অবশেষে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসলেন ইন্দিরা গান্ধী। যিনি বাবার মতোই এই রাজপরিবারগুলোকে একদম মন থেকে সহ্য করতে পারেন না। তাঁর প্রধান টার্গেট অবশ্য একজন। গায়ত্রী দেবী। ১৯৬৭ সাল। ভোট। গায়ত্রী দেবী দুটি আসনে দাঁড়িয়েছেন। লোকসভা ও বিধানসভা। ইন্দিরা গান্ধী এসে ঝড় তুললেন। জয়পুরে তাঁর সভার বাইরে স্বতন্ত্র পার্টির সমর্থকরা তীব্র স্লোগান দিচ্ছে। ইন্দিরা গান্ধী ততোধিক উত্তেজিত হয়ে সভায় বললেন, ওই যে শুনতে পাচ্ছেন আমার বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছে, তারা যে দলের সমর্থক সেই দলের নেতানেত্রীরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জীবনে মুখ খোলেনি। এরা কেউ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়নি। এরা কারা? সকলে ব্রিটিশদের বন্ধু। চ্যালেঞ্জ করছি আমি, আজকের মহারাজারা বলুন, তাঁরা যখন রাজা ছিলেন, নিজেদের এলাকায় কটা কুয়ো খনন করেছেন? কটা রাস্তা করেছেন? কত মানুষকে জীবিকা দিয়েছেন? একটা উদারহণ দেখান যে, আপনারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একটাও স্টেটমেন্ট দিয়েছেন। বোঝাই গেল সব আক্রমণ আসলে গায়ত্রী দেবীকে লক্ষ্য করে। এদিকে ততদিনে মহারাজা মান সিংকে ভারত সরকার ভারত থেকেই সরিয়ে দিয়েছে। তাঁকে লালবাহাদুর শাস্ত্রী অফার দিয়েছিলেন ভারতের রাষ্ট্রদূত হতে। যে কোনও দেশে। তিনি বাছাই করেছেন স্পেনকে। কারণ স্পেনই হল পোলো খেলার স্বর্গরাজ্য। মান সিং রাজ্যসভার এমপি হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজনীতি ভালো লাগেনি। তাই আয়েশাকে বলেছিলেন, আমি নিশ্চিন্তে কাটাতে চাই। আয়েশা বলেছিলেন, আমি একা একা থাকব? জয় বলেছিল, তোমাকে জয়পুরবাসীর দরকার।

কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী বুঝিয়ে দিলেন, তিনি এক অন্য ঝড়। কারণ, অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল। লোকসভায় মাত্র ৫০ হাজার ভোটে জয়ী হলেও গায়ত্রী দেবী বিধানসভা আসনে পরাস্ত হলেন। নিজের রাজত্বের মধ্যে মালপুরা আসন। ভাবা যায়! গায়ত্রী দেবী টের পেলেন এই ইন্দিরা সত্যিই এক মারাত্মক পলিটিক্যাল শক্তি। নিজের দলেও যেন গুরুত্ব হারাচ্ছেন গায়ত্রী দেবী। কারণ তাঁর নেতারা তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ।। অভিযোগ উঠছে, তিনি সিরিয়াস নন রাজনীতিতে। যখন খুব দরকার লোকসভায়, তখন তিনি ছুটি কাটাতে চলে যান অস্ট্রেলিয়া। গায়ত্রী দেবীর মোহ কাটছে রাজনীতিতে।

১৯৭০ সালে গায়ত্রীর স্বামী জয়ের মাঝেমধ্যেই শরীর অসুস্থ হচ্ছে। গরমের দুমাস এই দম্পতি সাধারণত গত ৩০ বছর ধরেই লন্ডনে কাটান। ২৪ জুন জয় অর্থাৎ মান সিংএর একটা পোলো ম্যাচ আছে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। তাই গ্যালারিতে নয়, গায়ত্রী দেবী গাড়িতে বসে খেলা দেখছেন। হঠাৎ দেখলেন জয় মাটিতে পড়ে গিয়েছে ঘোড়া থেকে। উঠছে না। গায়ত্রী দেবী, জয়পুরের মহারানি বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি থেকে নেমে ছুটছেন...মুখে হাহাকার... জয়... জয়...। জয়পুরের শেষ মহারাজা চেয়েছিলেন তাঁর মৃত্যু যেন হয় পোলোর মাঠে। আশ্চর্য! তাই হল!

দুঃসময় ঘিরে ধরছে। ইন্দিরা গান্ধী এবার চেপে ধরছেন রাজন্যদের। পার্লামেন্টে বিল এনে রাজন্যভাতা বিলোপ করে দেওয়া হল। ভারতবর্ষ থেকে দেশীয় রাজারানিদের শেষ চিহ্নটিও মুছে গেল। গায়ত্রী দেবী স্থির করলেন, আর রাজনীতি নয়। আর ভোটে লড়বেন না। কিন্তু যোধপুরের

মহারানি বললেন, তুমি অন্তত আমাদের একজন প্রতিনিধি হিসেবে থাকো পার্লামেন্টে। নয়তো ওই প্রধানমন্ত্রী আমাদের ধ্বংস করে দেবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবার প্রার্থী হলেন গায়ত্রী দেবী। জয়ীও হলেন। কিন্তু তাঁর সেই তেজ, সেই তীব্র আক্রমণাত্মক ইমেজ নেই। ভেঙে গিয়েছেন তিনি। জয়ের স্বাদ পাচ্ছেন ইন্দিরা গান্ধী। কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি মহারানি গায়ত্রী দেবী সবেমাত্র ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছেন। এক পরিচারিকা বলল, দুজন মানুষ এসেছে। দেখা করতে চায়। কে তারা? ইনকাম ট্যাক্স থেকে এসেছে বলল। দ্রুত ঢুকে এল দুটি লোক। আমরা রেইড করব আপনার বাড়ি। গায়ত্রী দেবী বললেন, তার মানে? তাঁরা বললেন, অর্ডার আছে। জয়পুর দিল্লি, বম্বে সর্বত্র অভিযান চলল। ট্যাক্স অফিসারদের মাথা ঘুরে গেল। মোতি ডোংরির সেই প্রাসাদের মাটির নীচে এক স্টোর রুমে পাওয়া গেল ৫০ হাজার সোনার মোহর। সোনার বিস্কুট, ৩ হাজার আগ্নেয়াস্ত্র। সব মিলিয়ে ৮৬০ কেজি সোনা। ১৭০০ কেজি রুপো। গায়ত্রী দেবী বললেন, এসবই তো আমাদের ঘোষিত সম্পত্তি। আপনারা ১৯৪৭ সালের রাজত্বের সম্পদ ঘোষণা দেখুন। সরকারের কাছেও আছে। একটাও বেআইনি নয়। একজন এমপির ঘরে রেইড করছেন। লিগাল রাইটস সত্ত্বেও হেনস্থা করছেন। অফিসাররা চলে গেলেন। তবে সিজার লিস্ট নিয়ে। মুখে কিচ্ছুটি বলল না।

বম্বেতে ছিলেন গায়ত্রী দেবী। হাসপাতালে ভর্তি। জানতে পারলেন দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। চমকে উঠলেন। সে কী? এই ভদ্রমহিলা আর কী কী করতে চান? ২৯ জুলাই ১৯৭৫। বম্বে থেকে দিল্লিতে এলেন তিনি। অসুস্থ শরীর। পরদিন লোকসভায় যেতে হবে। গেলেনও। কিন্তু খুব অদ্ভুত লাগলো। বিরোধী বেঞ্চ প্রায় ফাঁকা। কেউই নেই। শুনলেন প্রায় সকলকেই অ্যারেস্ট করা হয়েছে। হঠাৎ লোকসভার করিডরে দেখলেন উল্টোদিক থেকে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। তীব্র চোখে দুই নারী দেখলেন পরস্পরকে। কিন্তু কথা হল না। কিছুটা সময় কাটিয়ে ফিরে এলেন গায়ত্রী দেবী বাসভবনে। রাতেই তাঁর সেই বাড়ি ঘিরে ফেলল অসংখ্য পুলিশের গাড়ি। জোর করে গেট খুলে ঢুকে এল তারা। আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। কোথায়? চলুন গেলেই বুঝবেন। কেন? আর কোনও কথা নয়। ধমকে উঠল পুলিশ অফিসার। গায়ত্রী দেবী গ্রেপ্তার হলেন। জরুরি অবস্থায়। কেন? তাঁর কাছে পাওয়া গিয়েছে বিদেশি নোট, সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট আর সোনার কিছু অঘোষিত কয়েন! তিহার জেলে বন্দী হলেন জয়পুরের মহারানি। পিএস ব্যারাক ফোর। সামনেই একটি খোলা ড্রেন। ঘরে ইঁদুর। ঘুম, খাওয়া কিছুই হল না। পরদিন সকালে আলো ফুটলে গায়ত্রী দেবী দেখলেন পাশের সেলে ধ্যানমগ্ন হয়ে যোগাসন করছেন এক নারী। তাঁর এক চেনা মানুষ। তাঁকেও বন্দী করা হয়েছে। গোয়ালিয়রের রাজমাতা। বিজয় রাজে সিন্ধিয়া। বি.জে.পি দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

॥ দুই ॥

রানা শামশের জং বাহাদুর নেপালের আর্মি চিফ। কিন্তু তাঁর মধ্যে এক সহজাত শাসকের রাজকীয় ক্ষমতা আছে। তিনি তো নিজেও রানা বংশের সন্তান। বর্তমান মহারাজার ভাই। অতএব যে কোনওদিন সিংহাসন দাবি করতে পারেন প্রত্যক্ষভাবে অথবা বিদ্রোহ করে। এটাই ভয়। বিশেষ করে লোকটা আগের রানাকে হত্যা করেছে যখন। শামশের জং বাহাদুরকে তাই সরাতে হবে। নেপালের রানা বীর বাহাদুরের নির্দেশে তাই বহু ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তের নাটকীয় ঘটনার পর দেশবিরোধী কাজে অভিযুক্ত করা হল শামশেরকে। শাস্তি? শামশেরকে নেপাল ছাড়তে হবে। পাশের দেশ ভারত। শামশের সর্বাগ্রে ভারতে এসে ব্রিটিশ সরকারের কাছে আশ্রয় চাইলেন। স্থির হল রানা থাকবেন ভারতে। তবে নেপালের শর্ত আছে। তিনি এমন কোনও স্থানে থাকতে পারবেন না যার সঙ্গে নেপালের কোনও সীমান্ত আছে। এরকম জায়গা চেনা পরিচিতের মধ্যে একমাত্র মধ্যপ্রান্ত। অর্থাৎ আজকের মধ্যপ্রদেশে। মধ্যপ্রান্তের সাগর জায়গাটির সঙ্গে প্রকৃতিগতভাবে নেপালের মিল। চারদিকে পাহাড়। ঘন অরণ্য। গোটা পরিবার নিয়ে শামশের জং বাহাদুরের নতুন বাসস্থান হল সেখানে। শামশের সিংএর আদরের কন্যা শ্রীপ্রিয়ার জন্য পাত্র দেখা দরকার। এসব কাজ করেন কুলপুরোহিত। রানা পরিবারের কুলোপুরোহিত নিয়ে এলেন একটি আদর্শ বিবাহ প্রস্তাব। পাত্রের নাম ঠাকুর মহেন্দ্র সিং। ডেপুটি কালেক্টর। শিক্ষিত, ভদ্র এবং হ্যান্ডসাম। বিবাহ স্থির হল। ১৯১৭। বরযাত্রী এসে গিয়েছে সাগরে। হঠাৎ

ইন্দিরা গান্ধী চেপে ধরছেন রাজন্যদের। পার্লামেন্টে বিল এনে রাজন্যভাতা বিলোপ করে দেওয়া হল। ভারতবর্ষ থেকে দেশীয় রাজারানিদের শেষ চিহ্নটিও মুছে গেল। গায়ত্রী দেবী স্থির করলেন, আর রাজনীতি নয়। আর ভোটে লড়বেন না।

বরযাত্রীদের মধ্যে জনান্তিকে আলোচনা, মহেন্দ্রর নতুন বউটি বেশি সুন্দর দেখতে! নতুন বউ? মানে? রানা শামশের ক্রোধে অগ্নিশর্মা। জানা গেল মহেন্দ্র বিবাহিত। এবং তাঁর স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। রানা ওই বিবাহ আসরেই বরযাত্রীকে বললেন, আপনারা চলে যান। আমি এই বিয়ে দেব না। বিবাহিত এবং মিথ্যাবাদী পাত্র আমার জামাতা হতে পারে না। হুলুস্থুল শুরু হল। প্রায় হাতাহাতির উপক্রম। হঠাৎ রানা শামশেরকে তাঁর স্ত্রী বললেন, প্রিয়া ডাকছে তোমাকে। রানা অন্দরমহলে গেলেন। প্রিয়া নতমুখ। কাঁদছে। রানা বললেন, কাঁদিস না। তোর এর থেকে অনেক ভালো বিয়ে দেব আমি। কিন্তু প্রিয়া এবার যা বললেন, সেটা অবিশ্বাস্য! তিনি বললেন, আমি মনেপ্রাণে মহেন্দ্র সিংকেই স্বামী হিসেবে মেনে নিয়েছি। এরপর আর অন্য কাউকে সেই স্থান দিতে পারব না। স্তম্ভিত রানা। তিনি বোঝালেন মেয়েকে, এরকম কোরো না। সাংঘাতিক ভুল হচ্ছে। প্রিয়া অনড়। সে এই বিয়ে করবেই। অগত্যা রাজি হতেই হল। বিয়ে হয়ে গেল।

কিন্তু প্রিয়ার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে যে তাঁর ও স্বামী মহেন্দ্রর কোষ্ঠীবিচার সঠিক হয়নি। তাঁরা স্বভাবচরিত্রে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রিয়া গর্ভবতী। সারাদিন বসে বসে কোষ্ঠী দেখেন। এবং চমকে উঠলেন। কোষ্ঠী বলছে, প্রিয়ার প্রথম সন্তান হবে কন্যা। সে জন্মগ্রহণের পরই প্রিয়া মারা যাবেন। নিজের এই মৃত্যুবার্তা পেয়েও প্রিয়া কাউকে কিছু বললেন না। যথাসময়ে রীতি অনুযায়ী চলে গেলেন সাগরে পিতৃগৃহে সন্তানের জন্ম দিতে। সঙ্গে নিলেন সমস্ত গহনা ও টাকাপয়সা। কারণ তাঁর এই মেয়ের বিবাহের পণ হিসেবে লাগবে। তিনি তো থাকবেন না তখন! সাগরের সিভিল লাইনসের বাংলো নম্বর ফাইভে সত্যিই জন্ম হল এক কন্যার। এবং পাঁচদিন পর সত্যিই মৃত্যু হল প্রিয়ার। সদ্যোজাত কন্যাটি মায়ের স্পর্শই পেল না। ঠিক দু বছর পর মনের দুঃখে মারা গেলেন রানা শামশের জং বাহাদুর। এই গোটা পরিবার আর একটি মা হারা কন্যার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়ল জং বাহাদুরের স্ত্রী ধনকুমারীর উপর। রানা পরিবারের সেই শিশুকন্যাটির নাম হল লেখা দিব্যাকুমারী। কিন্তু তাকে কেন তার দাদু-দিদিমা আটকে রাখছেন? দিব্যার বাবা মহেন্দ্র সিং চড়াও হলেন শ্বশুরবাড়িতে। ধনকুমারী ভেবেছেন সৎ মায়ের কাছে এই কন্যা অত্যাচারিত হবে। বঞ্চিত হবে। তাই তিনি মহেন্দ্র সিং-এর সঙ্গে একটা ডিল করলেন। অগাধ টাকা দিলেন। বললেন, সাত বছর বয়স পর্যন্ত মেয়ে আমাদের কাছে থাকবে। কিন্তু সাত বছর নয়, ১৮ বছর বয়সে প্রথমবার দিব্যা গেলেন বাবার কাছে। ঝাঁসি। দেখা গেল সৎ মা তাকে দেখেই আনন্দে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন। নিজের মায়ের মতোই তাঁকে স্নেহ ভালোবাসায় ভরিয়ে দিলেন। দিব্যার মনে হল, আগে কেন এলাম না!

বারাণসী কলেজে পড়ার সময়ই একবার দিদার সঙ্গে বম্বে গেলেন দিব্যা। ভিড়ে ঠাসা জাহাঙ্গীর হলে একটি সভা হচ্ছে। বক্তাটি সুদর্শন এক ব্যক্তিত্ব। বলছেন, 'আমি এই ভিড় দেখে উদ্বেলিত। এই যে আমার সামনে ছেলেমেয়েরা বসে আছে, আমি তাদের চোখে দেখতে পাচ্ছি এক বিদ্যুৎ। একবার আহ্বান করলেই আমি জানি এই বিদ্যুৎময় অগ্নিশিখাগুলি ব্রিটিশ রাজে আগুন জ্বালাতে পারে।' একটি শিহরণ তৈরি হল যেন এই বাক্যে। দিব্যা ভেবে নিলেন দেশের জন্য, সমাজের জন্য যদি কিছু করতে পারি কোনওদিন! সেই বক্তার ছবিটি তার মনে গাঁথা রইল। বক্তার নাম? সুভাষচন্দ্র বসু!

ত্রিপুরার যুবরাজ দুর্জয় কিশোর দেবের সঙ্গে বিবাহ স্থির হয়েছে দিব্যার। কলকাতায় পাত্রের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে। কিন্তু একবার তো আগরতলায় যেতে হবে। গেলেন দিব্যার মামা। কিন্তু তিনি ফিরে এলেন মনে বেদনা নিয়ে। কারণ, ত্রিপুরার রাজপরিবারটি খুব আধুনিক। ব্রিটিশদের মতোই রকমসকম। এখানে দিব্যার বিবাহ দেওয়া যায় না। আমাদের কালচারের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। তাহলে উপায়? একটি আশার কথা হল ত্রিপুরার রাজকুমারীর গোয়ালিয়রের মহারাজার সঙ্গে বিবাহ হওয়ার কথা থাকলেও, সেটি হচ্ছে না। সুতরাং দিব্যার মামার মাথায় এসেছে নতুন এক আইডিয়া। গোয়ালিয়রের সেই পাত্রের সঙ্গেই তো দিব্যার বিবাহ দেওয়া যায়। কিন্তু পাত্রটি কি রাজি হবে নেপালের মেয়েকে বিয়ে করতে? প্রস্তাব পাঠানো হল। জানা গেল মহারাজা বম্বে গিয়েছেন। সেখানে আসুক পাত্রীপক্ষ।

বম্বের তাজমহল হোটেলে ঠিক বিকেলে একটি ফোন এল। গোয়ালিয়রের মহারাজার সর্বক্ষণের সঙ্গী সর্দার মহাদিগ ফোন করে বললেন, আজ একটা ঘোড়ার রেস আছে। আপনারা রেসকোর্স আসুন। সেখানেই আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়ে যাবে। এরকম একটা অদ্ভুত অ্যাপয়েন্টমেন্ট? যাওয়া ঠিক হবে? ভাবছেন সকলে। অবশ্য স্বয়ং মহারাজার আমন্ত্রণ, যাওয়াই উচিত। বম্বে টার্ফ ক্লাবে স্পেশাল ভিআইপি

নেপালের রাজবংশের দিব্যা এবার যাচ্ছেন গোয়ালিয়রে। মহারাজা জীবাজি রাও সিন্ধিয়ার ঘরণী হয়ে। দিব্যার জীবন আচমকা বদলে গেল শুধু তাই নয়, নামও পরিবর্তন হল। নতুন নাম, মহারানি বিজয়া রাজে সিন্ধিয়া!

গেট। সেখানে আগে থেকে দাঁড়িয়ে মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন ল্যাগার্ড। সাদরে অভ্যর্থনা করা হল দিব্যা ও তার মামাকে। মহারাজার স্পেশাল বক্সে। মহারাজার চারটি ঘোড়া আজ ছুটবে। জিতবে তো? দিব্যা মনেপ্রাণে চাইছেন যেন চারটে ঘোড়াই জয়ী হয়। ঘোড়দৌড় শুরু। রুদ্ধশ্বাস অবস্থা দিব্যার। টেনশনে সে চোখ বন্ধ করে ফেলল। জানা গেল জয়ী হয়েছে ফায়ার আর্ম আর পুষ্পমালা। অর্থাৎ মহারাজের দুটি ঘোড়া। টার্ফ ক্লাবের লাঞ্চে দেখা হল দুজনের। হ্যাঁ। দর্শনেই দুজনে মুগ্ধ। তার উপর আবার লেডি লাক। কারণ, মহারাজ রেস জিতেছেন। রাত আটটায় ফোন এল তাজমহল হোটেলে। মহারাজা দিব্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দিচ্ছেন। নেপালের রাজবংশের দিব্যা এবার যাচ্ছেন গোয়ালিয়রে। মহারাজা জীবাজি রাও সিন্ধিয়ার ঘরণী হয়ে। দিব্যার জীবন আচমকা বদলে গেল শুধু তাই নয়, নামও পরিবর্তন হল। নতুন নাম, মহারানি বিজয়া রাজে সিন্ধিয়া!

•••

কাশ্মীরের রাজদান দম্পতি মাঝেমধ্যেই আসেন গোয়ালিয়র রাজবাড়িতে। ভারত স্বাধীন হয়ে গিয়েছে। গোয়ালিয়র এখন আরও খোলামেলা একটি জনপদ। সিন্ধিয়াদের জয়বিলাস প্যালেসে সারারাত আলো জ্বলে। ১৯৫৭। চারদিকে ভোটের হাওয়া। দেশের দ্বিতীয় লোকসভা ভোট আসছে। রাজদান দম্পতি মহারানি বিজয়ারাজেকে একদিন বললেন, দিল্লিতে কিন্তু একটা কথা খুব শোনা যাচ্ছে। গোয়ালিয়র রাজবাড়ি নাকি হিন্দু মহাসভার সমর্থক। কংগ্রেসের বিরোধী। এমনকী মহারাজা হিন্দু মহাসভাকে নাকি আর্থিক অনুদান দেন নিয়ম করে। সবথেকে মারাত্মক অভিযোগ হল, মহাত্মা গান্ধীকে যে পিস্তল দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল, সেটি গোয়ালিয়র রাজবাড়ি থেকেই চোরাপথে যায় পারচুরে নামক এক ব্যক্তির কাছে। যার থেকে ওই ব্যারেটো পিস্তল কিনেছিল নাথুরাম গডসে। এ তো মারাত্মক অভিযোগ। রাজপরিবারে চরম আশঙ্কা নেমে এল। মহারাজা তখন বম্বেতে। তাই মহারানি ঠিক করলেন তিনি নিজেই সোজাসুজি এই ভ্রান্তি দূর করে দেবেন দিল্লিতে গিয়ে। গোয়ালিয়র থেকে গাড়িতে দিল্লি। সোজা তিন মূর্তি মার্গ। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর বাসভবন। মহারানি বিজয়ারাজে সিন্ধিয়া বললেন, পণ্ডিতজি, বিলিভ মি, মহারাজা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এক ব্যক্তি। আমাদের কোনও বিরোধিতাই নেই কংগ্রেসের সঙ্গে। নেহরুর ঘরে ঢুকলেন তাঁর কন্যা। তাঁর দিকে তাকিয়ে নেহরু বললেন, আপনি একটা কাজ করুন ওর সঙ্গে পণ্ডিত বল্লভভাই পন্থের সঙ্গে দেখা করুন। ওরা ঠিক করবে এসব। মহারানি বললেন, আপনি ভুল করছেন। আমি কংগ্রেসে যোগ দিতে আসিনি। আমি শুধু আপনাকে জানাতে এসেছি আমাদের সম্পর্কে যে রটনা চলছে যে আমরা হিন্দু মহাসভার সমর্থক, তাদের টাকা দিচ্ছি এসব ঠিক নয়। রাজনীতি আমরা বুঝি না।

ইন্দিরা গান্ধী বললেন, আপনি আসুন আমার সঙ্গে। বল্লভভাই পন্থ বললেন, মহারানি তাহলে একটা কাজ করুন।. মহারাজকে বলুন আমাদের দলের প্রার্থী হতে। মহারানি স্তম্ভিত। তিনি বললেন, মহারাজের সামান্য ইন্টারেস্ট নেই রাজনীতিতে। ইন্দিরা গান্ধী বললেন, বেশ! তাহলে আপনি প্রার্থী হয়ে যান! তাহলে প্রমাণ হয়ে যাবে, আপনারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নন। বিজয়ারাজে তখনই কথা দিতে

পারলেন না। তিনি রাতেই ফোন করলেন মহারাজকে। মহারাজা বললেন, আমি আসছি। গোয়ালিয়রে অনেকক্ষণ আলোচনার পর তাঁরা ঠিক করলেন কংগ্রেসের এই অফার ফিরিয়ে দিলে প্রমাণ হয়ে যাবে যে, তারা হিন্দু মহাসভার পক্ষে। সেটা সমস্যা তৈরি করবে। অতএব রাজি হওয়াই ভালো। নেহরুকে তাঁরা যতই বলুন, সিন্ধিয়ারাজের হিন্দু মহাসভার প্রতি দুর্বলতা ছিলই। তাঁর সম্পর্কিত ভাই মহাসভার অন্যতম কর্তা। কিন্তু তা সত্ত্বেও নেপাল কন্যা, সিন্ধিয়া বধূ বিজয়ারাজে ১৯৫৭ সালে মধ্যপ্রদেশের গুণা লোকসভা কেন্দ্র থেকে ভোটে কংগ্রেসেরই প্রার্থী হলেন। সিন্ধিয়া রাজবংশের প্রবেশ ঘটল ভারতীয় রাজনীতিতে। মহারানি জয়ী হলেন অনায়াসে।

ঠিক তখন তাঁর একমাত্র পুত্রকে পাঠাতে হল সিন্ধিয়া পাবলিক স্কুলে। গোয়ালিয়রেই স্কুল। কিন্তু নিয়ম হল হোস্টেলেই থাকতে হবে। সেই পুত্রকে আদর করে বাবা মা ডাকেন ভাইয়া নামে। তার নাম মাধব রাও সিন্ধিয়া। সিন্ধিয়া পরিবারের বাকি চারজনই কন্যা। পদ্মাবতী, ঊষা, বসুন্ধরা, যশোধরা। ততদিনে পদ্মাবতীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে ত্রিপুরার মহারাজা কিরীট দেব বর্মণের সঙ্গে। ভাইয়া হস্টেলে। মহারাজা জীবাজী রাও সময় কাটাচ্ছেন কন্যাদের সঙ্গে। তাঁর শরীর ভালো নয়। মাত্র ৪৫ বছর বয়স। এই বয়সেই ডায়াবেটিস এমনই যে, একটি চোখ ইতিমধ্যেই নষ্ট। লন্ডনের ডাক্তাররাও আশা দিতে পারেনি। ১৬ জুলাই। সকাল থেকে বৃষ্টি। জীবাজী রাও শয্যাশায়ী। হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তাঁর। মাথার কাছে বসে মাধবরাও এবং তাঁর মা কৃষ্ণনাম জপ করছেন। কিন্তু লাভ হল না। মহারাজা চলে গেলেন। ঠিক তিন বছরের মধ্যেই বজ্রপাত। মহারানির বড় কন্যা পদ্মাবতীর মৃত্যু হয়েছে। ভেঙে পড়লেন মহারানি। পুত্র মাধবরাও বললেন, তোমাকে অনেক কাজ করতে হবে। ভেঙে পড়লে হবে না। উঠে দাঁড়াও। ১৯৬৬। মাধবরাও সিন্ধিয়ার বিবাহ দিলেন মহারানি। এবারও নেপালেরই রাজকন্যা। নাম দেওয়া হল মাধবী রাজে। তাঁকে সবথেকে মূল্যবান উপহার যিনি দিয়েছিলেন তিনি হলেন ইন্দিরা গান্ধী। একটি হিরের নেকলেস। মহারাজা নেই। রাজবাড়ি এখন গুরুত্বহীন। এরকমই ভেবেছেন দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। বিজয়ারাজে সিন্ধিয়ার সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়ছে। একদিন মহারানি দেখা করতে এসেছেন। ১৫ মিনিট হয়ে গেল দেখা করছেন না মুখ্যমন্ত্রী। বসিয়ে রেখেছেন। কত বড় অসম্মান! পাঁচমারিতে দ্বারকাপ্রসাদ প্রকাশ্যে বললেন, এই রাজপরিবারগুলিকে আর দলে কোনও পদ দেওয়া উচিত নয়। এরা সুবিধাবাদী। কোনও স্ট্রাগল নেই। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন মঞ্চেই মহারানি। মাইক টেনে নিয়ে বললেন, এসব কি আমাকে লক্ষ্য করে বলা? প্রবল হইচই হল সভায়। ক্ষমা চাইলেন দ্বারকাপ্রসাদ। কিন্তু মহারানি স্থির করলেন অনেক হয়েছে। আর নয় কংগ্রেসে। তাঁর সামনে দুটি বিকল্প। স্বতন্ত্র পার্টি ও জন সংঘ। দু পক্ষই চাইছে মহারানিকে। কাকে রাখবেন! কাকে ছাড়বেন? এক অভিনব সিদ্ধান্ত নিলেন। কারিয়া বিধানসভা আসনে তিনি প্রার্থী হলেন জনসংঘ থেকে। আর গুণা লোকসভা আসনে প্রার্থী হলেন স্বতন্ত্র পার্টি থেকে। একই ব্যক্তি দুই দলের প্রার্থী। এবং দুটি আসনেই তিনি বিপুল ভোটে জয়ী। জনসংঘ পেয়েছিল ১৩০টি আসন। কংগ্রেস ১৬০টি। বসুন্ধরা রাজে হলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেত্রী। মুখ্যমন্ত্রী আবার

সেই কংগ্রেসের দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র। তিনি কটাক্ষ করলেন রাজমাতাকে (ততদিনে মহারাজা হয়েছে মাধব রাও)। এত করেও মুখ্যমন্ত্রী হতে পারলেন না? রাজমাতা চুপ করে রইলেন আপাতত। ঠিক এক বছরের মধ্যেই জবাব দিলেন। কংগ্রেসের গোবিন্দনারায়ণ সিং নামে এক নেতা একদিন রাতে এলেন জয়বিলাস প্যালেসে। কেউ জানতে পারছে না। গোবিন্দ নারায়ণ এক আশ্চর্য প্রস্তাব দিচ্ছেন। চমকে গেলেন রাজমাতা। ৩৬ জন কংগ্রেস বিধায়ক দল ভেঙে বেরিয়ে আসতে রাজি। কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটবে। কিন্তু গণতন্ত্রে এটা কি উচিত? রাজমাতা দ্বিধায়। পুত্র মাধবরাও সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে এরকম সিদ্ধান্তের। মাধবরাও সোজাসাপ্টা মানুষ। তিনি বললেন, আম্মা, ভোটে যারা জিতেছে, তাদের সরকার চেয়েছে মানুষ। এভাবে দল ভাঙানো ঠিক নয়। রাজমাতা বললেন, আমরা ভাঙাচ্ছি না। ওরাই আসতে চাইছে। মাধব রাওয়ের পছন্দ হল না কথাটা। আর সেই প্রথম কংগ্রেসের সরকারের পতন ঘটিয়ে বিরোধীদের সরকার এসে গেল মধ্যপ্রদেশে। মুখ্যমন্ত্রী হলেন সেই গোবিন্দ নারায়ণ সিং। যা ক্ষিপ্ত করল প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে। তিনি কি এর প্রতিশোধ নেবেন না? অবশ্যই। ঠিক যে লোকটি কংগ্রেসের সরকার ভেঙেছিল, সেই গোবিন্দ নারায়ণ সিংকেই কয়েকমাসের মধ্যেই আবার দলে ফিরিয়ে আনলেন ইন্দিরা গান্ধী। তাঁর প্ল্যান আর প্রস্তাব ছিল মাস্টারস্ট্রোক। ফোনে গোবিন্দ নারায়ণকে বললেন, আপনার মুখ্যমন্ত্রী হওয়া নিয়ে কথা তো! কংগ্রেসে ফিরুন সকলকে নিয়ে। আবার আপনিই মুখ্যমন্ত্রী হবেন। ব্যস! গোবিন্দ নারায়ণ বিজয়া রাজে এবং গোটা জনসংঘকে চরম সঙ্কটে ফেলে ফিরে গেলেন কংগ্রেসে।

জুলাই মাস। ১৯৭৫। একটি জিপ যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে। উদ্দেশ্য নেপাল বর্ডার। চারজন সেই জিপে। ঠিক মাঝখানে বিজয়া রাজে সিন্ধিয়া। তিনি গোপনে ভারত ছেড়ে নেপালে যাবেন। কারণ গত এক মাস ধরে তিনি শুধুই পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। যেখানেই যাচ্ছেন, পুলিশ ঠিক খবর পাচ্ছে। জরুরি অবস্থা। সব বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার করা চলছে। রাজমাতাকেও খোঁজা হচ্ছে। বিদেশে আছেন পুত্র মাধবরাও। তিনিও তো তখন জনসংঘের এমপি। তিনি ফিরবেন না ঠিক করলেন। মায়ের জন্য ব্যবস্থা করলেন গাড়ি। এক গোপন দূত এসে বলেছে মহারাজা আপনাকে নেপালে যেতে বলেছে। নেপাল বিজয়া রাজের পিতৃগৃহ। তাঁর মেজ মেয়ে ঊষার বিয়েও হয়েছে নেপাল রাজপরিবারে। সুতরাং একবার নেপাল বর্ডার পেরোলে আর ভয় নেই। কেউ গ্রেপ্তার করতে পারবে না তাঁকে। আর মাত্র দু কিলোমিটার। সকলেই উত্তেজিত। অন্ধকার চরাচর। হঠাৎ রাজমাতা জিপ থামাতে বললেন। তাকালেন আকাশের দিকে। পাঁচ মিনিট। সকলে চুপ। রাজমাতা বললেন, পালাব কেন? আমাকে যারা ভোট দিয়েছে, যারা বিশ্বাস করেছে তাদের ফেলে রেখে পালিয়ে যাব? তা হয় না। জিপ ফেরান। অ্যারেস্ট করুক। সকলে হতচকিত হয়ে গেল। রাজমাতা ফিরে এলেন জয়বিলাস প্যালেসে। গোরক্ষী দেবীর মন্দির রয়েছে প্যালেসে। স্নান করে সেই মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করার পর পুলিশে খবর দিলেন রাজমাতা। গ্রেপ্তার হলেন। পাঁচমারির বোয়সন লজে আটক থাকার পর আনা হল দিল্লির তিহার জেলে। সেল নম্বর ২২৬৫!

ইন্দিরা গান্ধী তখনও শেষ ধাক্কাটি দেননি গোয়ালিয়রের

রাজমাতাকে। যার কাছে জেল কিছুই নয়। ১৯৭৬ সালে রাজমাতা জেল থেকে মুক্তি পেলেন। পরের বছর নির্বাচন। সকলেই ধরে নিয়েছে ইন্দিরা গান্ধী বড়সড় পরাজয়ের মুখে পড়তে পারেন। কিন্তু মাধব রাও সিন্ধিয়া একদিন প্যালেসে ডিনারের সময় বললেন, আম্মা, আমি কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছি। ক্যান্ডিডেট হতে বলেছে আমায়! মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল রাজমাতার। কিন্তু কেন? মাধবরাও একটি অদ্ভুত যুক্তি দেখালেন, তাঁকে বলা হয়েছে, যদি তিনি কংগ্রেসে যোগ না দেন, তাহলে আবার রাজমাতাকে জেলে ঢোকানো হবে। রাজমাতার সর্বক্ষণের পরামর্শদাতা হলেন সর্দার বাল আংরে। জীবাজী রাওয়ের সম্পর্কিত ভাই। তাঁর প্রভাবে বিরক্ত মাধবরাও। তাঁর ধারণা রাজমাতার প্রতিটি সিদ্ধান্ত আসলে নেন ওই আংরে। চারদিন পর আংরে আর মাধবরাওয়ের মধ্যে একটি মিটিং হচ্ছে। আংরে বললেন, কংগ্রেসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ভুল। মাধবরাও এবার বিরক্ত। বললেন, কাকা, আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আমাকে আমার সিদ্ধান্ত নিতে দিন। আংরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে গেলেন। মাধবরাও মায়ের সম্মান রাখতে বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। আমি কংগ্রেসের টিকিটে দাঁড়াব না। নির্দল প্রার্থী হব। তাহলে তো অসুবিধা নেই? রাজমাতা মুখে কিছুই বললেন না। কারণ মাধবরাওকে আদতে কংগ্রেসই সমর্থন করছে এটা স্পষ্ট। নির্দল প্রার্থী হিসেবে মাধবরাও জয়ী হলেন। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী থেকে সঞ্জয় গান্ধী, গোটা কংগ্রেস বিধ্বস্ত। ক্ষমতায় এসেছে বিরোধীদের জনতা সরকার। রাজবাড়িতে সম্পর্ক তিক্ত হচ্ছে। জয়বিলাস প্যালেসের দখলদারি নিয়ে। প্যালেসের ট্রাস্টিতে রাজমাতা পুত্র আর পুত্রবধূকে রাখলেও হঠাৎ দুজন বাইরের লোককেও নিয়ে এসেছেন। এটা অন্যায়। বললেন মাধবরাও। তুমি কি আমাকে সম্পত্তিচ্যুত করতে চাইছো? সরাসরি মাকে প্রশ্ন করছেন মাধবরাও। রাজমাতা উত্তর দিলেন না সে কথার! একদিন প্রাসাদের ৩১৮টি ঘর তালাবন্ধ করে দেওয়া হল। মাধবরাও প্রচণ্ড আঘাত পেলেন।

১৯৮০। ইন্দিরা গান্ধী রায়বেরিলি থেকে প্রার্থী হবেন। হঠাৎ একদিন জয়বিলাস প্যালেসে তুমুল টেনশন। মাধবরাও বনাম রাজমাতা। মাধবরাও বলছেন, এটা কেন করছো তুমি? এই সিদ্ধান্ত নিও না! আমার রিকোয়েস্ট! রাজমাতা বললেন, এটা আমার পার্টির সিদ্ধান্ত! আমি কে? পরিবার আর পার্টিকে মিশিয়ে ফেলো না ভাইয়া! সিদ্ধান্তটি হল, ইন্দিরার বিরুদ্ধে প্রার্থী হবেন রাজমাতা বিজয়রাজে সিন্ধিয়া। যা মাধবরাও চান না। এতে তাঁর চরম অস্বস্তি। সবথেকে বড় ধর্মসঙ্কট হল প্রিয়তম বন্ধুকে নিয়ে। রাজীব গান্ধী সেই কবে থেকে তাঁর বেস্ট ফ্রেন্ড। রাজীবের স্ত্রী আন্তোনিও (সোনিয়া) আর তিনি ফ্রেঞ্চ শেখেন একই টিচারের কাছে। আর মা সেই রাজীবের মায়ের বিরুদ্ধে পলিটিক্যাল ব্যাটলে যাচ্ছেন? রাজমাতা অনড়। ততদিনে একটি নতুন দল গঠন হয়েছে। রাজমাতা সেই দলের ফাউন্ডার মেম্বার। দলের নাম ভারতীয় জনতা পার্টি। অন্যদিকে এবার আর নির্দল নয়। মাধবরাওকে লড়াই করতে হলে সরাসরি কংগ্রেসের প্রার্থীই হতে হবে। এটাই শর্ত ইন্দিরার। সুতরাং এপ্রিল মাসের এক দুপুরে মাধবরাও মাকে বললেন, আম্মা, আজ থেকে আমাদের দু'জনের পথ দুদিকে চলে যাচ্ছে। আমি কংগ্রেসের মেম্বারশিপ নিয়েছি। বিজয়ারাজে সেই নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পরাস্ত হলেন। কিন্তু তার থেকেও বেশি যে

আঘাত ইন্দিরা দিলেন তাঁর প্রতিপক্ষকে, সেটি হল, রাজমাতার পুত্রকে অনেকটাই কেড়ে নিলেন। মহারাজা ও রাজমাতার তিক্ততা গেল চরম পর্যায়ে। কন্যারা সকলে মায়ের দিকে। পুত্র অন্যদিকে। রাজনৈতিকভাবেও। সব কন্যাই বিজেপি সমর্থক। একমাত্র ভাইটি কংগ্রেসের। যদিও কোনও সন্দেহ নেই সিন্ধিয়া রাজবাড়ির মাতা ও পুত্র নিজেদের রাজনীতিতে চরম সফল। ভারতীয় জনতা পার্টিকে আজকের এই শীর্ষস্থানে নিয়ে আসার অন্যতম কৃতিত্ব বিজয় রাজে সিন্ধিয়ার সাংগঠনিক ক্ষমতা। অন্যদিকে ভারতের আধুনিকতম রেল ও বিমান পরিবহণ মন্ত্রী নিঃসন্দেহে মাধব রাও সিন্ধিয়া। মা ছিলেন মধ্যপ্রদেশের স্তম্ভ। আর কন্যা বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া রাজস্থানের বিজেপির প্রধান চালিকাশক্তি। তাঁর ক্যারিশমা আর জনপ্রিয়তা রাজস্থানে দ্বিতীয় কোনও নেতানেত্রীর নেই। যশোধরা রাজে সিন্ধিয়া মধ্যপ্রদেশ সরকারের মন্ত্রী। বসুন্ধরা রাজের পুত্র দুষ্যন্ত রাজস্থানের বিজেপি এমপি। মাধবরাও এর পুত্র জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া যুব রাজনীতিক।

এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মাধবরাও সিন্ধিয়ার মৃত্যু হওয়ার পর নাতি জ্যোতিরাদিত্যকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন রাজমাতা। কিন্তু ভাঙা সম্পর্ক জোড়া লাগেনি। জ্যোতিরাদিত্যকে তিনি বিজেপিতে আনতে ব্যর্থ হয়েছেন। সে বাবার অবস্থানেই অনড় ছিল এবং কংগ্রেসের এমপি হিসেবেই রয়ে গেল। ২০০১ সালে রাজমাতার মৃত্যু হয়। তিনি আর মাত্র ১৯ বছর বেঁচে থাকলে দেখে যেতেন ৪০ বছর পর নরেন্দ্র মোদি নামক তাঁর দেখা এক গুজরাতের ক্ষুদ্র স্বয়ংসেবক প্রধানমন্ত্রী হয়ে গিয়ে রাজমাতার সেই নাতিকে কংগ্রেসের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছেন। সেই নাতি ঠাকুমারই পথ অনুসরণ করলেন। অর্থাৎ ২০২০ সালের মার্চ মাসে একঝাঁক কংগ্রেস বিধায়ককে ভাঙিয়ে নিয়ে কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটিয়ে যোগ দিলেন জনসংঘের উত্তরসূরি ভারতীয় জনতা পার্টিতে। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর দল ভাঙার শাস্তি হিসেবে রাজমাতাকে চিরকালীন এক ধাক্কা দিয়েছিলেন রাজমাতার পুত্রকেই মায়ের রাজনীতির পথ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে। ইন্দিরা গান্ধীর নাতি রাহুল গান্ধী কি পারবেন সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে? জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ও বরোদার রাজকুমারী প্রিয়দর্শিনীর পুত্র ২৪ বছরের মহানআর্যমান সিন্ধিয়াকে কি আগামীদিনে কংগ্রেসে নিয়ে এসে মাস্টারস্ট্রোক দিতে পারবেন রাহুল প্রিয়াঙ্কা? হবে কি আবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি!

॥ তিন ॥

মহারাজা ভূপিন্দর সিং একবার দেখা করতে চান ফুয়েরারের সঙ্গে। ১৯৩৫, জার্মানি। ফুয়েরার মানে হল অ্যাডলফ হিটলার। কে দেখা করতে চায়? জানতে চাইলেন হিটলার। ভারতের প্রিন্সলি স্টেটের এক মহারাজা। হিটলার বিরক্ত। তবু বললেন, ঠিক আছে। ম্যাক্সিমাম ১০ মিনিট কিন্তু। ভূপিন্দর সিং এলেন। ১০ মিনিট হয়ে গিয়েছে। সার্জেন্ট ইশারা করছেন মহারাজাকে, উঠে পড়তে হবে এবার। ফুয়েরার রেগে গেলে সার্জেন্টকে হয়তো জেলে পাঠাবেন। কিন্তু ১০ মিনিট থেকে ৩০ মিনিট। ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা। হিটলারই উঠতে দিচ্ছেন না পাতিয়ালার মহারাজা ভূপিন্দর সিংকে। কারণ, ভারতের এই মহারাজার সব বিষয়ে সাংঘাতিক নলেজ। আর

মহারাজা অমরিন্দর সিং প্রবেশ করলেন রাজনীতিতে। পাতিয়ালার রাজনীতিকে বদলে দিলেন মহারাজা অমরিন্দর এবং রাজমাতা মহিন্দর কাউর।

সবথেকে বেশি জ্ঞান আর ইন্টারেস্ট হল গাড়ি নিয়ে। জার্মানি এত গাড়ি তৈরি করে, তার খুঁটিনাটি হিটলার জানেনই না। অথচ এই মহারাজ জানেন। হিটলার বললেন, আগামীকাল লাঞ্চে আসুন। পরদিন লাঞ্চ। আশ্চর্য ব্যাপার হল, আবার পরদিন আসতে বললেন তাঁকে হিটলার। মহারাজা নিজেই অবাক। এসব কী হচ্ছে? তৃতীয় দিনে হিটলার মহারাজার সঙ্গে দীর্ঘ গল্প করার পর এমন কিছু উপহার দিলেন তা অবিশ্বাস্য খোদ বিপুল সম্পদশালী পাতিয়ালার মহারাজের কাছেও। লিগনোজ, ওয়েল্দারশ ল্যুগার পিস্তল। আর সেসবের থেকে অনেক মূল্যবান একটি আস্ত মায়বেখ গাড়ি। মায়বেখ গাড়ি পৃথিবীতে তখনও পর্যন্ত মাত্র ৬টি তৈরি হয়েছিল। ভারতে একটিও ছিল না। আজও নেই। জাহাজে চেপে সেই গাড়ি এসেছিল। আর রাখা হল পাতিয়ালার মোতি বাগ প্যালেসে। মহারাজার মৃত্যু হলে পাতিয়ালার মহারাজা হলেন যাদবেন্দ্র সিং। আশ্চর্য এক চরিত্র। দিল্লির পাতিয়ালা হাউসে ঢুকলেন মহারাজা যাদবেন্দ্র সিং। গলফ খেলতে গিয়েছিলেন। একজন এডিসি এসে বলল, মহারাজ, সর্দার সত্যজিৎ সিং এসেছেন। মহারাজা বললেন, পাঠিয়ে দাও। সত্যজিৎ সিং বহুকাল এই রাজবংশের এডিসি হয়ে কাজ করেছেন। তিনি এসেই বললেন, মহারাজ, আজ পর্যন্ত ওই মায়বাখ গাড়িতে কেউ চড়েনি। আপনি যদি আমাকে ওটা বিক্রি করেন তাহলে আমি কিনতে রাজি। একজন এডিসি মহারাজের থেকে গাড়ি কিনতে চাইছে! মহারাজা যাদবেন্দ্র বললেন, আমি কোনও কিছু বিক্রি করি না। তোমার যদি ওটা পছন্দ হয়, এমনিই নিয়ে যাও। আর কিছু বলার আছে? এত ছোট ব্যাপারে ডিসটার্ব করবে না। ঘরে উপস্থিত রাজকর্মচারীরা স্তম্ভিত! সত্যজিৎ সিং দাঁড়িয়ে আছেন। বিশ্বাস হচ্ছে না তাঁর। মহারাজ বললেন, দাঁড়িয়ে আছো কেন? আজ্ঞে, আপনি লিখে অর্ডার না দিলে গ্যারাজ সুপারভাইজার হার্ভে তো গাড়ি দেবে না! মহারাজা স্টেনোগ্রাফারকে ডাকলেন। আর দু লাইনের অর্ডার টাইপ করে স্বাক্ষর করে দিয়ে দিলেন। সত্যজিৎ সিং সেই অর্ডার নিয়ে পাতিয়ালায় এসে গাড়ির দখল নিলেন। আর বিক্রি করে দিলেন আমেরিকার এক প্রাইভেট কার কালেকটরের কাছে। যার দাম অন্তত ৫০ লক্ষ ডলার! ২০১৫ সালে ডেনমার্কে ওই গাড়িটিই নীলাম হয়েছিল। এমন অবিশ্বাস্য এক দাম উঠেছিল যে, প্রকাশই করা হয়নি! পাতিয়ালার মহারাজা যাদবেন্দ্র সিং এরকমই। তাঁর প্রসঙ্গ উত্থাপন করার কারণ হল, এই একজন মহারাজা যিনি অনায়াসে ১৯৬৭ সালে নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন। এবং কিছুদিন বিধানসভায় গিয়ে, মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলে, নেতাদের সঙ্গে একই মঞ্চে সভা সমাবেশ করে মনে হয়েছিল এই লোকগুলির মানসিকতা তো খুব খারাপ! এদের সঙ্গে থাকলে আমিও এরকম হয়ে যাব। সুতরাং যেমন ভাবা তেমন কাজ। রাজনীতি ছেড়ে দিলেন। তবে মহারানি ছাড়লেন না। তিনি পাতিয়ালার এমপি হয়ে জয়ী হয়েছেন এবং রয়েই গেলেন। যাদবেন্দ্র সিং এর সবথেকে প্রিয় শখ ছিল ক্রিকেট। ১৯৩৪ সালে তিনি ভারতের হয়ে টেস্ট পর্যন্ত খেলেছেন। তিনি পলিটিক্সে থাকলে তাঁর ছেলেরাও আসবে পলিটিক্সে। আটকাতে হবে তাদের। সুতরাং মহারাজা একটা আশ্চর্য কাজ করলেন। তিনি দুই পুত্রকেই বললেন, আর্মিতে যেতে হবে তোমাদের। ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি। পাতিয়ালার দুই যুবরাজ অমরিন্দর সিং এবং মানবিন্দর সিং। দুই ভাই সেনাবাহিনীতে গেলেন। যেদিন তারা অ্যাকাডেমি

যাবেন, তার আগের দিন রাতে মহারাজা যাদবেন্দ্র সিং তাঁদের ডেকে অফার করলেন এক পেগ করে স্কচ হুইস্কি। বললেন, আমার আড়ালে যেন কেউ না বলে যে আমার ছেলেরা ড্রিঙ্ক করে। আমার সঙ্গেই আমার সামনেই তোমরা ড্রিঙ্ক করো। আর এরপর সিদ্ধান্ত নেবে যে ড্রিঙ্ক করা উচিত নাকি উচিত নয়। ভারতের কোনও রাজপরিবারে এরকম বিস্ময়কর ভ্যালুজ পাওয়া যায় না। নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত করে পাঠানোর পর তিনি আচমকা একদিন হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। বয়স ৬১। যে বিধানসভা আসনে তিনি জয়ী হয়েও ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন সেই আসনটিতে প্রার্থী হলেন নতুন মহারাজ। যাদবেন্দ্র সিং-এর বড় পুত্র অমরিন্দর সিং। অর্থাৎ যাদবেন্দ্র না চাইলেও তাঁর পুত্র রাজনীতিতে এসেই গেলেন। তখন তিনি আর্মিতে ক্যাপ্টেন হয়ে গিয়েছেন। পাতিয়ালার মানুষের দাবি, তাঁদের কথা বলার কেউ একজন থাকুক। অতএব মহারাজা অমরিন্দর সিং প্রবেশ করলেন রাজনীতিতে। পাতিয়ালার রাজনীতিকে বদলে দিলেন মহারাজা অমরিন্দর এবং রাজমাতা মহিন্দর কাউর। সেই শুরু। প্রথমেই জয়ী হলেন এমন নয়। পরাজিত হয়েছেন দুবার। দুন স্কুলের সহপাঠীর নাম ছিল রাজীব গান্ধী। সুতরাং রাজীবের অনুরোধে ১৯৮০ সালে পাতিয়ালা থেকে অমরিন্দ প্রার্থী হলেন। মা হলেন বিধানসভায়। দুজনেই জয়ী। পাতিয়ালা আজও রয়ে গেল রাজপরিবারেরই আওতায়। মাঝেমধ্যেই অন্য দলের কোনও এক প্রার্থী জয়ী হয়। কিন্তু আবার পাতিয়ালা ফিরে আসে রাজপরিবারের কাছে। আপাতত এমপি মহারানি পরনীত কাউর। আর মহারাজা পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। ভুল হল! মহারাজা শব্দটি তিনি পছন্দ করেন না। তিনি চান সবাই তাঁকে বলুক ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং!

•••

বিবাহ মানে কি শুধুই সামাজিক সম্পর্ক? একেবারেই না। তার থেকে অনেক বেশ সমীকরণ থাকে রাজনীতি আর রাজবংশের যোগসূত্রের রসায়নে। তাই পাতিয়ালার মহারাজা অমরিন্দর সিং-এর নাতি অঙ্গদ সিং-এর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে হিমাচল প্রদেশের বুশাহারের মহারাজা বীরভদ্র সিং-এর কনিষ্ঠা কন্যা অপরাজিতা সিং-এর। পাতিয়ালার যুবরাজ নির্বাণ সিং বিয়ে করেছেন কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং-এর পুত্র করণ সিং-এর নাতনি মৃগাঙ্কাকে। কাশ্মীরের মহারাজা করণ সিং-এর পুত্র বিক্রমাদিত্য সিং কাকে বিয়ে করেছেন? মাধবরাও সিন্ধিয়ার কন্যা চিত্রাঙ্গদা সিংকে। বিক্রমাদিত্য সিং কাশ্মীরে কংগ্রেসের নেতা। আর তাঁর শ্যালক জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া মধ্যপ্রদেশে বিজেপি নেতা।

বোলাঙ্গীরের মহারানি সঙ্গীতা সিংদেওকে সবসময়ই লড়াই করতে হয় দেওর কালিকেশ সিংদেওর বিরুদ্ধে। সঙ্গীতার স্বামী কনক বর্ধন সিংদেওর প্রতিপক্ষ আবার তাঁর ভ্রাতৃবধূ প্রকৃতি সিংদেও। ওড়িশার বোলাঙ্গীরের মানুষ জানেন যাঁকেই তারা ভোট দিয়ে জেতান না কেন, ভোট যাবে রাজবাড়িতেই। সুতরাং যে কোনও নির্বাচনেই ওড়িশার বোলাঙ্গীরের ছবিটি স্পষ্ট। একটি হাই ভোল্টেজ সোপ অপেরা হবে। যেখানে পরিবারের বড় বধূ নির্বাচনী সমাবেশে বলছেন, আমি রাজবাড়ির বড় বউ। রাজনীতিতে আমাকে আসতে হয়েছে বিশেষ কারণে। যেভাবে এই এলাকার উন্নতি আটকে দেওয়া হয়েছে বছরের পর বছর, সেই জগদ্দল পাথর সরাতে হবে আমাকে। তাই আমি এসেছি আপনাদের কাছে।

কিন্তু ছোটকুমার আর ছোট বউ কী করেছে? ঠিক পরদিন দেখা যাবে ওই একই স্থানে ছোট কুমার বলছেন, এই যে এতবছর ধরে বড় তরফকে আপনারা জিতিয়ে আনলেন, এখনও কেন একটা ইউনিভার্সিটি হল না? কেন এখনও স্টেডিয়াম নেই?

এসবই কি ড্রামা? কারণ হল, রাজমাতা নিয়ম করে কোনও ভোটে বড় পুত্র আর পুত্রবধূকে সমর্থন করেন। আবার অন্য ভোটে ছোট পুত্র আর পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করেন।

শুধুই কি জয়ের কথা? রাজপরিবারের পরাজয়ের কথা না বললেও এই কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

॥ চার ॥

সুলতান বেগমের ট্রেনিং হয়েছে তাঁর দাদি আম্মার কাছে। দাদি আম্মার নাম সিকন্দর বেগম। ভোর ৫টায় এক ঘণ্টা এক্সারসাইজ। এরপর কোরান, ক্যালিগ্রাফি, ইংরাজি, অঙ্ক, ফারসি, পাশতুন পড়া। বিকেলে ফেন্সিং আর হর্স রাইডিং। একদিনও ছাড় নেই। একটু বড় হওয়ার পর তার কাছে দাদি আম্মা পাঠাতেন অফিসিয়াল পেপার। সেগুলি দেখে বুঝে নিতে হবে জমি জমা, খাজনা, রাজস্ব, ট্যাক্স ইত্যাদি। কারণ, আগামীদিনে ভোপালের শাসক হবেন সুলতান। সব প্রশিক্ষণ হওয়া চাই। ১৮২৬ সাল থেকে ১০০ বছর ধরে ভোপালের লাগাতার শাসক সর্বদাই হয়েছেন নারীরা। তাঁদের অফিসিয়াল পদমর্যাদা হল 'নবাব-বেগম'। তাঁরা কেমন শাসক ছিলেন? কাদিশিয়া বেগম ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার ডেভিড কুককে ডেকে এনে গোটা ভোপালে পাইপলাইনের পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা শুরু করেছিলেন ৬ লক্ষ টাকা খরচ করে। ১৮৪৪ সালে। শাহ জাহান বেগম ১৫ লক্ষ টাকা দিয়ে বম্বে থেকে রেললাইনের সংযোগ নিয়ে আসেন ভোপালে। সুলতান বেগম ১৯০১ সালে যখন সিংহাসনে বসলেন, তিনি ভোপালে চালু করলেন ফ্রি এবং আবশ্যিক প্রাথমিক স্কুল। কাদেশিয়া বেগমের একটি নিয়ম ছিল। তিনি রাতে গোপনে বেরোতেন রাজ্যপাট দেখতে। প্রজারা কেমন আছে, কার কী অসুবিধা হচ্ছে, এসব জানতে। সেরকমই একটি রাত। ফিরে এসেছেন মধ্যরাতে। কিন্তু প্রাসাদে ঢোকার নিয়ম হল, একটি গোপন কোড বলতে হবে। যারা ওই গোপন কোড বলতে পারবে তাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হবে প্রসাদে। প্রহরীদের উপর এরকম নির্দেশ। যাকে বলা যেতে পারে পাসওয়ার্ড। কাদিশিয়া বেগম সেই পাসওয়ার্ড সেই রাতে ভুলে গেলেন। কিছুতেই মনে পড়ছে না। প্রহরীদের বলা হল, আমি নবাব বেগম। খুলে দাও দরজা! প্রহরী বলল, আপনি যেই হন, গোপন সেই সংখ্যা না বলতে পারলে আমি কাউকেই ঢুকতে দেব না। ক্ষমা করবেন। সারারাত স্বয়ং নবাব বেগম গেটের সামনে বসে রইলেন। প্রহরী ঢুকতে দিল না। সকালে এস্টেটের অফিসাররা ছুটে এসেছেন। প্রহরীকে মারতে যায় তারা। এ কি করেছিস! নবাব বেগমকে ঢুকতে দিসনি। গর্দান নেব তোর! কাদিশিয়া বেগম সকলকে নিরস্ত করলেন। তিনি বললেন, এই হল আদর্শ কর্তব্য। ও ঠিক কাজ করেছে। ওকে একটি জায়গীর উপহার দিলাম আমি। প্রহরী হয়ে গেল জমিদার!

এই নবাব বংশের শেষ নবাব অবশেষে হয়েছিলেন এক পুরুষ। হামিদুল্লা খান। হামিদুল্লা খানের তিন কন্যা। মেজ কন্যা সাজিদা সুলতান বিয়ে করেছিলেন এক নবাবকে। ইফতিকার আলি খান। ইফতিকার তাঁর পুত্রকে আধুনিক সংস্কৃতিতে মানুষ করেন। ওরকম অভিজাত হ্যান্ডসাম খুব কম এসেছে ভারতের প্রাসাদে।

তিনি ছিলেন সর্বোত্তম ক্যাপ্টেন ও স্টাইলিশ ব্যাটসম্যান। অথচ রাজনীতির ক্রীড়াঙ্গনে ব্যর্থ হলেন ভোপালের দাপুটে বেগম বংশের উত্তরসূরি সেই ব্যক্তি। মনসুর আলি খান পতৌদি! একটিমাত্র ম্যাচ খেলে চিরতরে রাজনীতির মাঠ ছাড়লেন টাইগার!

কী যে হল হঠাৎ! ইফতিকারের সেই পুত্রটি ১৯৯১ সালে হঠাৎ রাজনীতি করতে নামলেন। ভোপালের রাজবংশে এই প্রথম। রাজনীতির সমুদ্রে তিনি অথৈ জলে পড়লেন। ভোপাল লোকসভা আসনে কংগ্রেস প্রার্থী। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন যে স্থানীয় কংগ্রেসের অনেক নেতাই ঠিক তাঁকে জেতানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে না। কেমন যেন গা ছাড়া ভাব! ইফতিকারের পুত্র এই নবাব ও তাঁর স্ত্রী প্রচণ্ড পরিশ্রম করলেন কয়েকমাস ধরে। কিন্তু সব বৃথা। শেষরক্ষা হল না। নির্বাচনে পরাজিত হলেন তিনি। এই অসম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল না। ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম ক্যাপ্টেন ও স্টাইলিশ ব্যাটসম্যান। অথচ রাজনীতির ক্রীড়াঙ্গনে ব্যর্থ হলেন ভোপালের দাপুটে বেগম বংশের উত্তরসূরি সেই ব্যক্তি। মনসুর আলি খান পতৌদি! একটিমাত্র ম্যাচ খেলে চিরতরে রাজনীতির মাঠ ছাড়লেন টাইগার!

ছবি: সংশ্লিষ্ট সংস্থার সৌজন্যে

সমাপ্ত

• খেলা

বড় হয়েছেন বিদেশ, মানস, প্রসূনদের খেলা দেখে। মোহন বাগান মাঠে ছিল তাঁর অবাধ যাতায়াত। সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ার সময় ক্রিকেট নয়, ফুটবলই ছিল প্রথম প্রেম। কিন্তু জীবনের মোড় ঘুরল আচমকাই। আটের দশকের শেষভাগ। টাইফয়েডে আক্রান্ত বাংলা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের সাত ক্রিকেটার। তাই স্রেফ জায়গা ভরাতে ট্রায়ালে ডাক পেলেন সৌরভ। নিজের কিটস নেই। তাই দাদা স্নেহাশিসের গ্লাভস পরেই নামতে হয়েছিল মাঠে।

প্রথম ম্যাচেই সেঞ্চুরি। তখন জাতীয় নির্বাচক রুশি জিজিবয়। ভবিষ্যতের তারকাকে চিনতে ভুল হয়নি তাঁর। ডেকে নিলেন ভারতের বয়সভিত্তিক দলে। বাকিটা ইতিহাস। আজও দাপিয়ে খেলছেন তিনি। অন্য পিচে। মহারাজকীয় মেজাজে।

বাংলা অভিধান মোতাবেক সৌরভ শব্দের অর্থ সুগন্ধ। কিন্তু ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে এই শব্দটি লড়াইয়ের আরেক নাম। পলকে চোখের সামনে ভেসে ওঠে লর্ডসের ব্যালকনিতে দাদাগিরির দৃশ্য। জার্সি ওড়ানোর মধ্যেই ছিল গর্বিত বিজয়ীর প্রবল গর্জন। যে আবেগে ভেসে পড়তে দ্বিধা করেনি গোটা দেশ। ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জেতার পর পুরো দলকে সঙ্গে নিয়ে লর্ডসের সবুজ গালিচায় তাঁর মহাকাব্যিক দৌড় ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। মাঠে নেমে চোখে চোখ

সৌরভ

সুকান্ত বেরা
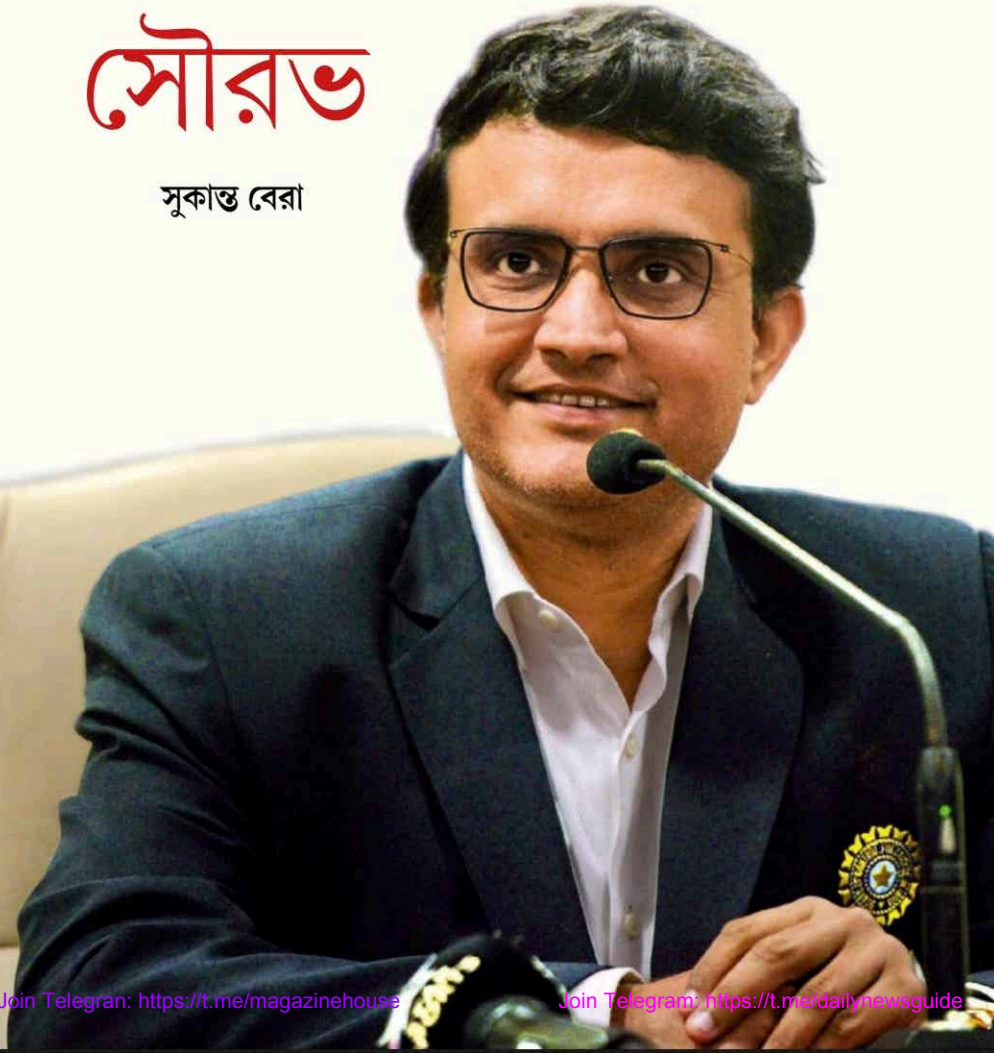
রেখে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের জবাব দেওয়ার ফর্মুলা শিখিয়েছেন এই বঙ্গসন্তানই। ক্রিকেট প্রশাসক থেকে টেলিভিশনের পর্দা, যে কোনও ভূমিকাতেই অতুলনীয় সৌরভ গাঙ্গুলি। দেখলে মনে হবে সবই তাঁর সাম্রাজ্য। ব্যাট, প্যাড ছাড়লেও তিনি আজও 'ক্যাপ্টেন'।

এখন বোর্ড সভাপতি। ভারতীয় ক্রিকেটের ব্যাটন তাঁর হাতে সুরক্ষিত। তাই ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে প্রশাসনিক মসনদে প্রথমবার বসার আগে গায়ে চাপিয়েছিলেন পুরনো ব্লেজারটি। যা পরে তিনি ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেই সময় মহারাজের ব্যস্ততা ঘড়ির কাঁটাকেও হার মানাবে। তবুও প্রতিশ্রুতি রাখা তাঁর অভ্যাস। ঠিক ছিল, সাক্ষাৎকার দেবেন বেহালার অফিসে বসে। কিন্তু পরের দিন সকালে বদলে গেল পরিকল্পনা। টিং করে ঢুকল দাদার হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ, 'কাম সিএবি অ্যাট থ্রি পিএম'।

রাত পোহালেই ইডেনে গোলাপি টেস্ট। দেশের মাটিতে প্রথম। ভারত বনাম বাংলাদেশ। চারিদিকে উৎসবের মেজাজ। ইতিহাসের সাক্ষী থাকতে তৈরি কল্লোলিনী তিলোত্তমা। সৌরভের দূরদৃষ্টি ও পরিকল্পনা এক লহমায় বদলে দিয়েছিল টেস্ট ক্রিকেটের মানচিত্র। গোটা ক্রিকেট দুনিয়ার নজরে তখন শুধু ইডেন আর সৌরভ। কিন্তু এই কাজ মোটেই সহজ ছিল না। গোলাপি টেস্ট খেলতে নিমরাজি ছিলেন বিরাট কোহলি। কিন্তু দাদির একটা ফোনেই ভিকে'র না বদলে গিয়েছিল হ্যাঁ-এ।

বিসি রায় ক্লাব হাউসে এলে সিএবি সভাপতির ঘরেই বসতেন। তখনও মহারাজের আলাদা চেম্বার হয়নি। সময় গড়াচ্ছে। তিনটে পেরিয়ে চারটে, পাঁচটা...। ডাক আর আসছে না। এদিকে ডেইলি পাতার জন্য বরাদ্দ হয়ে গিয়েছে সৌরভের সুরভিত সাক্ষাৎকার। তাই টেনশনও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। এত ব্যস্ততার মধ্যে কি আদৌ সময় দিতে পারবেন বোর্ড সভাপতি? খবরের গন্ধ পেলে জায়গা ছাড়া উচিত নয় সাংবাদিকদের। গোলাপি টেস্টের আগে দাদার সাক্ষাৎকার ফসকে গেলে বিড়ম্বনা নিশ্চিত। তাই বারবার চোখ চলে যাচ্ছে হাতঘড়িতে।

কিন্তু খালি হাতে কখনও ফেরাননি দাদা। রোববারের পাতার জন্য কয়েক বছর আগে কিছু কোট দরকার ছিল। সম্ভবত শচীনের অবসর নিয়ে লেখা। একবার বলতেই রাজি। 'তুমি ওয়ান ডে কভার করতে রাঁচি যাচ্ছ তো। ওখানেই কথা বলে নেব।' সৌরভ এরকমই।

ধোনির মতো মিডিয়া থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেননি কখনও। সাংবাদিকরা বরাবরই তাঁর বন্ধু। ক্যাপ্টেন থাকাকালীন কলকাতার মিডিয়াকে একটু বেশিই প্রিভিলেজ দিতেন। তাই নিয়ে ভিনরাজ্যের সাংবাদিকদের গোঁসাও হতো। বিদেশ সফরে বাংলার অনেক সাংবাদিক টিম হোটেলে মহারাজের রুমে বসেই কপি লিখে ফ্যাক্স করে দিতেন। এই সুযোগ ক'জন দেবে বলুন তো? আসলে আড্ডা দিতে খুব পছন্দ করেন সৌরভ। বিদেশ বিভুঁইয়ে প্র্যাকটিসের পর বন্ধুদের সঙ্গে গল্পে মেতে ওঠা ছিল দাদার নেশা। অনেক সময় মহারাজকে বলতে শুনেছি, পাঁচতারা হোটেলের থেকে রাস্তার ধারের রেস্তঁরার খাবার অনেক ভালো। মনে পড়ছে ২০০৪ সালের একটি ঘটনা। পাকিস্তান সফরে গিয়েছে ভারতীয় দল। নিরাপত্তার প্রবল কড়াকড়ি। মাছি গলার উপায় নেই। ক্রিকেটাররা কার্যত হোটেলবন্দি। কিন্তু হোটেলের খাবার মন ভরাতে ব্যর্থ সৌরভের। তাই নিরাপত্তারক্ষীদের

স্ত্রী ডোনা ও কন্যা সানার সঙ্গে সৌরভ

অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে সপরিবারে সৌরভ

চোখকে ফাঁকি দিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে মধ্যরাতে মহারাজ বেরিয়ে গিয়েছিলেন কাবাবের স্বাদ নিতে। কিন্তু পরিচয় লুকিয়ে রাখতে পারেননি। ধরা পড়েছিলেন। সৌরভের থেকে সেদিন কাবাবের টাকা নেননি রেস্তঁরার মালিক। বুঝে দেখুন কী অবস্থা!

আসলে সৌরভ প্রচণ্ড খাদ্যরসিক। দাদা স্নেহাশিসের কথাতেই বোঝা যায়। 'আমি একেবারেই খেতে চাইতাম না। মহারাজ ঠিক উল্টো। ও খেতে খুব ভালোবাসে। বিরিয়ানি ভীষণ পছন্দ।' বিরাট কোহলি যেমন খাওয়া-দাওয়া নিয়ে প্রচণ্ড সতর্ক। বিদেশ থেকে জল আনিয়ে খান। সৌরভ পুরো উল্টো। ইডেনে প্র্যাকটিসের ফাঁকে দেখতাম, কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতলে তাঁকে অহরহ চুমুক দিতে।

কাট টু ২১ নভেম্বর, ২০১৯। গোলাপি টেস্টের আগের দিন। বিসি রায় ক্লাব হাউসে সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষেধ। অতন্দ্র পাহারায় তৎপর নিরাপত্তারক্ষীরা। দোতলা থেকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে অনেককেই। সেই তালিকায় ছিল এই প্রতিবেদকও। কিন্তু একবার নীচে গেলে সৌরভের ইন্টারভিউ যে আর পাওয়া যাবে না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম। অগত্যা সাহসী পদক্ষেপ নিতেই হল। অতিথিদের সঙ্গে ঢুকে পড়লাম দাদার ঘরের চৌহদ্দিতে। সিএবি'তে বোর্ড সভাপতির পুরনো ঘরের ঠিক বাইরে অতিথি-অভ্যাগতদের বসার একটা জায়গা আছে। সেখানেই ওত পেতে গুনছি অপেক্ষার প্রহর। যাতে ঘর থেকে বের হলেই তাঁকে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু সেই সময় আর আসছে কই! অগত্যা দিতে হল দরজায় ঠেলা। সৌরভের চোখ এড়ায়নি। হাত নেড়ে ডেকে বললেন, 'দেখছ তো কী অবস্থা। দম ফেলার ফুরসত নেই। এখানে হবে বলে মনে হচ্ছে না। নীচে গিয়ে আমার গাড়ির সামনে দাঁড়াও। যেতে যেতে কথা বলব।' গেট থেকে বেরনোর সময় ঠিক মনে করে ডেকে নিলেন। সামনের সিটে চালকের পাশে আমি। পিছনের সিটে দাদা। গন্তব্য তখন তাজ হোটেল। পথেই হল বহু কাঙ্খিত ইন্টারভিউ। সেই মুহূর্তে ক্রিকেটবিশ্বের ব্যস্ততম মানুষ সৌরভ। কিন্তু সাক্ষাৎকারের সময় বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই। গোলাপি টেস্ট সফলভাবে আয়োজনের ব্যাপারে একশো শতাংশ নিশ্চিত। প্রতিটি মন্তব্যে পরিকল্পনার ছাপ। 'কেউ কি ভেবেছিল ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচ হাউসফুল হবে? টেস্ট ক্রিকেটকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে দিন-রাতে গোলাপি বলে ম্যাচ করতেই হবে।' মোবাইল বেজে উঠতেই সৌরভ কথা থামালেন। মুঠোফোনের উল্টো দিকে থাকা কাউকে নির্দেশ দিলেন, 'আজ রাতেই সব কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। কাল বললে শুনব না।' তিনি যে ভারতীয় ক্রিকেটের অভিভাবক। তাই প্রতিটি বিষয় খতিয়ে দেখার দায়িত্ব তাঁরই। যে কোনও কাজের গভীরে ঢুকে পড়া তাঁর

শারদ শুভেচ্ছা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের নিরলস প্রয়াস

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলির সফল রূপায়নের জন্য উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সর্বদা নিরলসভাবে নিয়োজিত রয়েছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সদিচ্ছায় পশ্চিমবাংলায় উন্নয়নের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তার সাথে সঙ্গতি রেখে আমাদের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ সমানভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নের মাধ্যমে।

গ্রামের অভ্যন্তরে রাস্তা, সেতু, পি.ডি.এস.ওয়াই প্রকল্পে সড়ক নির্মাণ ও মেরামতির কাজ প্রতিনিয়ত চলছে।

বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে এমনকী গ্রামের অভ্যন্তরে পরিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপন করা, শৌচাগার নির্মাণ করে দেওয়া সাফল্যের স্বীকৃতি পেয়েছি।

বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীন বিদ্যুতায়ন এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখা আমাদের অঙ্গীকার। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং হস্ত শিল্পের উন্নয়নেও প্রশংসনীয় কাজ করা হয়েছে।

বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং পঠন-পাঠনের মানোন্নয়নে আমরা সদাই ব্রতী। বনসৃজনে, পাট্টা বিতরণে আমরা প্রতিনিয়ত নিয়োজিত রয়েছি। খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য সুষ্ঠুভাবে রেশনিং ব্যবস্থা চলছে।

বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির অংশগ্রহণ করানো এবং তাদের সহযোগিতা করা আমাদের লক্ষ্য। আমরা যোগ্য উপভোক্তাকে বার্ধক্যভাতা প্রকল্পের অধীনে আনতে আমরা উদ্যোগী। কৃষিপণ্য এবং সমবায় মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে আমরা সচেষ্ট।

এই প্রকল্পগুলি সফল রূপায়নের ফলে জেলার যেমন বিপুল উন্নতি হয়েছে, তেমনই জনগণের আর্থিনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে। জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে জেলার প্রতিটি দপ্তরের কাজের গতিকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছি। চতুর্থ রাজ্য অর্থ কমিশনের টাকায় প্রতিটি স্থায়ী সমিতি ভিত্তিক উন্নয়নের কাজ চলছে।

আমফান ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত সমস্ত ধরনের পরিকাঠামোগুলি মেরামতির প্রক্রিয়া এখনও জারি রয়েছে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষদের কাছে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হয়েছি।

করোনা অতিমারী, ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে সমস্তরকমের প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছি।

এমন অক্লান্ত পরিশ্রম এবং পরিষেবা দেওয়ার মাধ্যমে আমরা আরও এগিয়ে যেতে চাই। আপনাদের সহযোগিতাই আমাদের পাথেয়। আমাদের পক্ষ থেকে আসন্ন শারদোৎসবের শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালোবাসা রইল।

–ধন্যবাদান্তে–

শ্রীমতি বীণা মন্ডল

সভাধিপতি

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

শ্রীমতি রুপালী চক্রবর্তী

নির্বাহী আধিকারিক

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

• ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জেতার পর

• ইডেনে সৌরভ গাঙ্গুলি ও বিরাট কোহলি (উপরে)
• কমেন্ট্রি বক্সে শচীন, লক্ষ্মণ ও সেওয়াগের সঙ্গে দাদা (নীচে)

অভ্যাস। তাই সাফল্যের হারও অনেক বেশি। ইডেনের সবুজ গালিচায় শচীন থেকে সানিয়া, মেরি কম থেকে পিভি সিন্ধুর মতো তারকাদের এক মঞ্চে হাজির করেছিলেন নিজের ক্যারিশমায়। বোর্ড সভাপতি হিসেবে সেটাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় অ্যাসাইনমেন্ট। কার্যত নিজের হাতেই সামলেছিলেন সব দায়িত্ব। সেদিনই ক্রিকেট বিশ্ব টের পেয়েছিল, তিনি কত বড় প্রশাসক। হোটেলের গেটের সামনে সৌরভের গাড়ি দাঁড়াল। ব্লেজারটা গায়ে চাপাতে চাপাতে বললেন, 'হয়ে যাবে তো? সমস্যা হলে মেসেজ পাঠিও।'

মিনিট কুড়ির যাত্রা। মন ছুঁয়ে গিয়েছিল মহারাজের কথায়। কর্মসূত্রে বারবার তাঁর সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছে। প্রত্যেকবারই যেন নতুন মোড়কে ধরা দিচ্ছেন তিনি। লকডাউনে ক্রিকেট বন্ধ। অনিশ্চিত আইপিএলের ভবিষ্যৎ। খুব জানার ইচ্ছা হল, কীভাবে পরিস্থিতি সামলাবেন মহারাজ। ফোন করে কিছু বলার আগেই দাদার জিজ্ঞাসা, 'বাড়ির সব ভালো তো?' মানুষ সৌরভ সত্যিই আন্তরিক। প্রচণ্ড ব্যস্ততাও থাবা বসাতে পারেনি তাঁর কর্তব্যজ্ঞানে। সম্প্রতি যখন শুনলেন, ছোটবেলার কোচ অশোক মুস্তাফি অসুস্থ আর তাঁর মেয়ে দেশের বাইরে, তখন গুরুর চিকিৎসার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। এক বন্ধুকে ডেকে বলেছিলেন, হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে আয়। যা লাগবে আমাকে জানাস। চিকিৎসায় যেন কোনও খামতি না থাকে। সেলেব হয়েও সাধারণের মতোই আচার ব্যবহার। সিএবি'র ছোট-বড় সব কর্তাদের জন্যই তাঁর অবারিত দ্বার। সিএবি সভাপতি হওয়ার পর একটা টিম গড়ে তুলেছিলেন। যা দেখে হেসেছিল অনেকেই। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, সৌরভ স্পর্শে সেই অকেজো কর্তারাই কাজের মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। ইডেনে নতুন ড্রেনেজ সিস্টেম হোক কিংবা উন্নত ইন্ডোর কোচিং সেন্টার, অত্যাধুনিক জিমনাসিয়াম, ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ড, প্রশাসক হিসেবে অনেক কিছুই বাংলার ক্রিকেটকে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। স্বপ্ন দেখিয়েছেন, বাংলা ফের রনজি ট্রফি জিতবে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে ভিশন টোয়েন্টি-২০ প্রকল্প তাঁরই চালু করা। যা নিয়ে সিএবি সদস্যরা অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু সৌরভ তোয়াক্কা করেননি। তিনি

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্প

মালদা জেলা প্রশাসন, মালদা

"মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্প-২০০৫" এর লক্ষ্য হল গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী পরিবারের সদস্য/ সদস্যা যাদের বয়স ১৮ বছরের বেশী এবং কায়িক শ্রম করতে ইচ্ছুক তাদেরকে বছরে ন্যূনতম ১০০ দিন কাজ সুনিশ্চিত করে আগামী দিনে আর্থিক ও সামাজিক চাহিদার মান উন্নয়ন করা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের মূল লক্ষ্যই হল গরীব, দুঃস্থ, বিধবা-মহিলা বা তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি পরিবারগুলিদের বছরে ন্যূনতম ১০০ দিন কাজ প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক সশক্তিকরন করা। সেই উদ্দেশ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক পরিকল্পনা এবং সার্বিক অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই প্রকল্পে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে স্থায়ী সম্পদ তৈরী, জল সঞ্চয়, মাটি সংরক্ষণ, জমি-উর্বরিকরণ, স্থায়ী বন-সম্পদ তৈরী ও বন্যা-প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় কাজগুলি সুষ্ঠ ও সার্বিকভাবে প্রনয়ণ করা হয়। যার ফলে দারিদ্র দূরীকরণের মাধ্যমে দুঃস্থ পরিবারগুলিকে ভবিষ্যতের আয়ের সুযোগ করে দেওয়া হয়।

এক নজরে আমাদের সাফল্য

(আর্থিক বছর ২০১৯-২০)

মোট ১,৬৫,২৫,৭৪০ টি শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতিটি জব কার্ড ধারী পরিবারকে বছরে ৫৩ দিন কাজ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ৯৮,০৭,৬৭২ টি মহিলা নির্ভর শ্রমদিবস সৃস্টি করা হয়েছে। ১৩,৭৮৭টি পরিবার সম্পূর্ণ ১০০ দিন কাজ পেয়েছে। ৩,১৪,২১৬ টি পরিবার ১০০ দিনের কাজ পেয়েছে।

(আর্থিক বছর ২০২০-২১)

চলতি আর্থিক বছরে **আগষ্ট** ২০২০ পর্যন্ত ২,৮৫,২৯৫ টি পরিবারকে গড়ে ৩৬ দিন কাজ দিয়ে মোট ১,০২,৮৩,৩৯৪ টি শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে মহিলা শ্রমদিবস ৬২,০০,৫০৭ টি এবং ১,৯১২ টি পরিবারকেসম্পূর্ণ ১০০ দিন কাজ দেওয়া হয়েছে।

বুঝেছিলেন, অন্য রাজ্যের থেকে বাংলা অনেক পিছিয়ে। কমপিট করতে হলে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য দরকার। সৌরভকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন জয়দীপ মুখার্জি। দীর্ঘদিন তিনি বাংলা দলের সঙ্গে যুক্ত। সিএবি কর্তা সৌরভকে নিয়ে তাঁর ব্যাখা, 'অনেক দূর দেখতে পায় মহারাজ। এটাই ওর সবচেয়ে বড় গুণ। প্রি-সিজনে বাংলা দলকে শ্রীলঙ্কা পাঠানোর কথা কেউ কি কখনও ভাবতে পারত? দাদা পাঠিয়েছিল। ভিশন টোয়েন্টি-২০ থেকেই উঠে এসেছে আকাশ দীপ, মুকেশ কুমাররা।'

আজও জনপ্রিয়তার শিখরে মহারাজ। খেলা ছাড়ার পরেও ক্রিকেট জনতার হৃদয় জুড়ে তিনি। বোর্ড সভাপতি হিসেবে প্রথম যেদিন কলকাতায় পা রাখলেন, তখনও বিমানবন্দরের সামনে উপচে পড়া ভিড়। যেমনটা দেখা যেত তাঁর ক্রিকেট জীবনে। সাফল্যের মুকুট পরে শহরে ফেরার সময়। আসলে সৌরভ যেন ভারতীয় ক্রিকেটে হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা। চুম্বকের মতোই সবাইকে কাছে টেনে নেন। যাঁরা একদিন তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ার শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন, তাঁরাই পরে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন মহারাজকে। এর থেকে বড় সাফল্য আর কী-ই বা হতে পারে। খেলা ছাড়ার বারো বছর পরেও দেশের অন্যতম সেরা ব্র্যান্ড সৌরভ গাঙ্গুলি। তাঁর বায়োপিক করার জন্য লম্বা লাইন। সৌরভ গাঙ্গুলি মানেই বিশ্বাসযোগ্যতা, উত্তরণের লড়াই, নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার তাগিদ। তাঁর কাজের প্রতি অগাধ আস্থা কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডেরও। আর নিজের জীবন দিয়েই যেন প্রতিনিয়ত সেটা প্রমাণের চেষ্টা করেন সৌরভ। সিএবির দায়িত্ব যখন নিয়েছিলেন, দেখতাম অনেক রাত অবধি ক্লাব হাউসে বসে বাংলার ক্রিকেট সংক্রান্ত কাজকর্ম করেই যাচ্ছেন। নিজের ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে জেনেও দায়িত্ব থেকে নড়েননি। বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেও বদলায়নি তাঁর কর্মধারা। দিনের অধিকাংশ সময়টাই কাটে বোর্ডের কাজে। একটা ট্রেন্ড সেট করে যেতে চান উত্তরসূরিদের জন্য। ঠিক যেমন টিম ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন হিসেবে দিশা দিয়েছিলেন উত্তরসূরি ধোনিকে।

মাঠ ও মাঠের বাইরের সৌরভকে মেলানো সত্যিই কঠিন। বাইশ গজে তিনি প্রচণ্ড আগ্রাসী। ২০০১ সালে অস্ট্রেলিয়ার তৎকালীন অধিনায়ক স্টিভ ওয়াকে টসের সময় দাঁড় করিয়ে রাখতেও দ্বিধা করেননি। এই প্রসঙ্গ উঠলেই সৌরভ হেসে বলেন, ব্লেজারটা ড্রেসিং-রুমে ভুলে রেখে চলে এসেছিলাম। ভারতীয় দলকে বিদেশের মাটিতে তিনিই তো জিততে শিখিয়েছিলেন। টিম সিলেকশনে নিজের পছন্দের ক্রিকেটারকে দলে নেওয়ার জন্য লড়াই চলত নির্বাচকদের সঙ্গে। আসলে, ক্যাপ্টেন মানেই তো অভিভাবক। সতীর্থদের সব সময় আগলে রাখার চেষ্টা করতেন। এটাই একজন লিডারের সবচেয়ে বড় গুণ। সবাইকে নিয়ে চলা। যা অতীতে বারবার করে দেখিয়েছেন মহারাজ। প্রবল চাপের মুখে কখনওই ভেঙে পড়েননি। কোনও ঘটনায় আঘাত পেলে তা নিজের ভিতরেই রেখেছেন। রক্তস্নাত হৃদয়ের অভিব্যক্তি বুঝতে দেননি পাশের লোককেও। ৪০০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার পরেও ভারতীয় দলে ফিরে আসার জন্য তাঁকে ছুটতে দেখেছি চণ্ডীগড়ে। অকিঞ্চিৎকর জেপি আত্রে ট্রফিতে খেলতে। নিজেকে নতুন করে প্রমাণের তাগিদে।

মাঠের বাইরে মহারাজ ভীষণ ঠান্ডা। প্রচণ্ড রাগ হলেও তাঁর বিস্ফোরণ ঘটতে দেন না। সিএবি সচিব হওয়ার পর এমন অনেক খবর প্রকাশিত হয়েছে, যা তাঁর পছন্দ হয়নি। জনৈক সাংবাদিককে তিনি ফোন করে বলেছেন, 'আমার নম্বর তো তোমার কাছে আছে। লেখার আগে একবার ফোন করে নিতে পারতে।' শাসনের মধ্যেও থাকত স্নেহের স্পর্শ। সৌরভ জায়া ডোনা গাঙ্গুলির কথায়, 'ও অন্য ধাতুতে তৈরি মানুষ। ২৪ বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে। ওর জীবনের অনেক ওঠাপড়ার সাক্ষী থেকেছি। সহজে হারতে শেখেনি। এই মানসিকতাই অনেক অসম লড়াই জিতিয়েছে আপনাদের দাদাকে। আমার কাছে মানুষ সৌরভ অনেক বড়। ভীষণ কেয়ারিং। প্রেমিক কিংবা স্বামী হিসেবে তো বটেই। এছাড়া পিতা ও পুত্রের ভূমিকাতেও মহারাজ অতুলনীয়। আইপিএল দেখতে আমাকে দুবাই যেতে বলেছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে মন চাইল না। তবে ওকে কখনও আটকে রাখার চেষ্টা করিনি। অনেক বছর হয়ে গেল। এখন আর মিস করি না। ও কাজ পাগল মানুষ। এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আইপিএল করে দেখাল। এর থেকে বড় আনন্দ আর কী হতে পারে।'

ভারতীয় ক্রিকেটের আঙিনায় সৌরভের দৌড় শুরু ১৫ বছর বয়সে। যা আজও থামেনি। বদলেছে শুধু ভূমিকা। অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলের হয়ে মুম্বইয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন মহারাজ। তখন বাংলা দল রনজি ট্রফির প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। প্র্যাকটিস ম্যাচের জন্য দুটো দল তৈরি করা হচ্ছে। টিম মিটিংয়ে অরুণ লাল বললেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে ছেলেটা সেঞ্চুরি করেছে ওকে নিলে কেমন হয়। খেলিয়ে দেখা যাক না। বাংলার বাঘা বাঘা বোলারদের পিটিয়ে দুর্দান্ত একটা ইনিংস খেলেছিলেন সৌরভ। যা তাঁকে সেবার রনজি ট্রফির ১৫ জনের দলে জায়গা করে দিয়েছিল। কিন্তু ফাইনালের আগে একটাও ম্যাচে খেলার সুযোগ পাননি। কিছুদিন পরেই বোর্ড পরীক্ষা। তাই নিয়েই ব্যস্ত। একদিন টিউশন থেকে ফিরে দেখলেন বাড়িতে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। ডাইনিং টেবলে বসেই বললেন, মা খেতে দাও। থমথমে মুখে নিরূপা দেবী থালা এগিয়ে দিলেন। কী হয়েছে গো মা, প্রশ্ন সৌরভের। তুই ফাইনালে খেলবি। উত্তর শুনে লাফিয়ে উঠলেন মহারাজ। বাংলা দলের হয়ে রনজি ফাইনালে খেলবেন তিনি। ছুটলেন দাদার কাছে। কার জায়গায় খেলছি রে? উত্তরটা শুনেই গাঙ্গুলি বাড়ির ছোট ছেলের মুখে হাসি উধাও। জানতে পারলেন, দাদার পরিবর্তেই দলে স্থান হয়েছে তাঁর। হ্যাঁ, ফাইনালে দাদা স্নেহাশিসকে বাদ দিয়েই খেলানো হয়েছিল মহারাজকে। কারণ, মার্চের শেষে ছিল ম্যাচটা। প্রখর গরম। তাই বোলারদের দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ার ভয় পেয়েছিল বাংলার টিম ম্যানেজমেন্ট। অগত্যা প্রয়োজন একজন অলরাউন্ডারের। ব্যাট করার পাশাপাশি মিডিয়াম পেসটাও করতে পারলে ভালো। তাই বেছে নেওয়া হয়েছিল সৌরভকে। বাকিটা সবারই জানা। দিল্লিকে হারিয়ে রনজি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলা। সৌরভের ব্যাটিং দেখে তৎকালীন বাংলার অধিনায়ক সম্বরণ ব্যানার্জিকে গিয়ে রাজসিং দুঙ্গারপুর বলেছিলেন, ছেলেটার টেকনিক অসাধারণ। নজর রেখো।

স্মৃতির সরণি দিয়ে পথ চলা শুরু সম্বরণের, ''বয়স কম হওয়ায় অনেকেই ওকে ফাইনালে খেলানোর ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু মহারাজের প্রতিভা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। ক্যাপ্টেন হিসেবে আমার ভোট ছিল ওর দিকেই। মনে হয়েছিল, ফাইনালে ও কাজে লাগবে। ম্যাচের আগে ভোকাল টনিক দিতে পিকে ব্যানার্জিকে ডাকা

করোনাকে আমরা করবো না ভয়,
করোনাকে আমরা করবো জয়।

জেলা পুলিশের আবেদন ট্রাফিক আইন মেনে চলুন
এবং সহযোগীতা করুন

মালদা জেলা পুলিশ

হয়েছিল ড্রেসিং রুমে। প্রদীপদা একটা যুদ্ধের কাহিনী বলছেন। আমরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছি। সৌরভ আনমনা। দাঁত দিয়ে নখ কাটতে ব্যস্ত। সেটা নজর এড়ায়নি প্রদীপদার। পরে বলেছিলেন, 'ছেলেটা কে রে? ও পারবে ফাইনালের চাপ নিতে?' আমি বললাম, 'চণ্ডীদার ছোট ছেলে। দেখোই না?' ফাইনালে মাত্র ২২ রান করলেও সৌরভ জাত চিনিয়েছিল।''

সৌরভের ক্রিকেট জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তের সাক্ষী সম্বরণ। রনজি অভিষেকে তিনিই যেমন ছিলেন মহারাজের ক্যাপ্টেন, কাকতলীয়ভাবে ভারতীয় টেস্ট দলে দাদার অন্তর্ভুক্তিও হয়েছিল সম্বরণ জাতীয় নির্বাচক থাকার সময়েই। সালটা ১৯৯৬। ২৩ এপ্রিল। দিল্লির তাজ প্যালেস হোটেলে ইংলন্ডগামী দল নির্বাচনের টিম মিটিং। তৎকালীন ক্যাপ্টেন আজহারউদ্দিন। কোচ সন্দীপ পাতিল। এঁরা কেউই সৌরভকে দলে নিতে রাজি হচ্ছিলেন না। পাতিলের বিরোধিতাই ছিল সবচেয়ে বেশি। অনেক বাগবিতণ্ডার পর শেষ পর্যন্ত দলে জায়গা পেয়েছিলেন মহারাজ। ১১টায় শুরু হয়েছিল মিটিং। শেষ হতে বেজে গিয়েছিল দুপুর দু'টো। সৌরভ তখন কলকাতা ময়দানে খেলতে ব্যস্ত। এক সাংবাদিকই তাঁকে প্রথম খবরটা দিয়েছিলেন। মহারাজ এর আগেও বেশ কয়েকবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। তাই যতক্ষণ না টিম লিস্ট প্রকাশ হচ্ছে, ততক্ষণ তিনি খবরটা চেপেই রেখেছিলেন নিজের মধ্যে। যখন জানতে পারলেন, চিফ সিলেক্টরকে পাশে বসিয়ে বোর্ড সচিব জগমোহন ডালমিয়ার ঘোষিত দলে ন'নম্বরে তাঁর নাম রয়েছে, তখন দেরি না করে দাদুর উপহার দেওয়া লাল রংয়ের মারুতি ৮০০ চড়ে বাড়িতে ফিরে মাকে সুসংবাদটা দিয়েছিলেন মহারাজ। গাঙ্গুলি পরিবারে বয়ে গিয়েছিল খুশির জোয়ার। মা নিরূপা দেবী সৌরভকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিলেন ঠাকুর ঘরে। আসলে মায়ের মন তো। বারবার সৌরভের সঙ্গে ঘটে যাওয়া অন্যায়ের সুবিচার চেয়ে তিনি যে ঈশ্বরের কাছে মানত করেছিলেন!

দক্ষিণ ও পশ্চিম জোনের নির্বাচকদের জোরালো দাবি ছিল, বাঁ-হাতি যদি খেলাতেই হয় তাহলে সৌরভকে কেন? ডব্লুভি রামন ওর থেকে অনেক ভালো। তার আগের সফরেই ভরাডুবি হয়েছিল ভারতীয় দলের। দল চয়ন নিয়ে বিসিসিআই কর্তারাও বিরক্ত ছিলেন। তাই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে আশ্বস্ত করে সেদিন এক শীর্ষ কর্তা নির্বাচক কমিটিকে বলেছিলেন, দলে নিলেই খেলাতে হবে তার তো কোনও মানে নেই। এবার মিটিং শেষ করুন।

বর্তমান ভারতীয় দলের কোচ রবি শাস্ত্রীও প্রবল বিরোধিতা করে বলেছিলেন 'কোটার প্লেয়ার'। মুম্বইয়ের আর এক কিংবদন্তি ক্রিকেটার সৌরভ সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন, 'কলকাতার রসগোল্লা'। আসলে এঁরা প্রত্যেকেই মহারাজের প্রতিভা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁদের আশঙ্কা ছিল, ভারতীয় ক্রিকেটে মুম্বই-রাজের পতন ঘটাতে পারে বেহালার ছেলেটা। টিম সিলেকশনের পর হোটেলের লাউঞ্জে বসে ডিনার করছিলেন জাতীয় নির্বাচকরা। সন্দীপ পাতিল ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, সৌরভকে দলে ঢুকিয়েই ছাড়ল সম্বরণ। ও আজকে আমাদের খাওয়াবে। সম্বরণের ঠোঁট কাটা জবাব ছিল, তোমাদের তুলনায় এই বাঙালি একটু গরিব হলেও নিশ্চয়ই খাওয়াবো। তবে সৌরভের ভারতীয় দলে ঢোকার কারণে নয়। ভারতীয় দল সৌরভের মতো একজন প্রতিভাবান ক্রিকেটারকে পেল বলে। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক সম্বরণ আজও ভোলেননি। বলছিলেন, 'সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল সন্দীপ। বলতে বাধ্য হয়েছিলাম, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তোমাদের অবদান কতখানি? ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখ, বাঙালিরা কীভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছেন। ব্যাটা সেদিন চুপ করে গিয়েছিল। আর কিছু বলতে পারেনি।'

তার পরেও সৌরভের কেরিয়ার শেষ করে দেওয়ার বহু চেষ্টা হয়েছে। শোনা যায়, ইংল্যান্ডে খেলতে গিয়ে তৎকালীন অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন বলেছিলেন, ভালো করে ইংল্যান্ড ঘুরে দেখো বাছা। শপিং কর। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সময় কাটাও। ভুলেও দলে জায়গা পাওয়ার আশাকে মনে ঠাঁই দিও না। কিন্তু ক্রিকেট দেবতা অন্য কিছু চেয়েছিলেন। না হলে লর্ডসে সৌরভের মহারাজকীয় টেস্ট অভিষেক হত না। ভারতীয় দল তখন একাধিক গ্রুপে বিভাজিত। প্রথম টেস্টের আগে আজহার আর সিধুর মধ্যে ব্যাপক ঝামেলা। সফরের মাঝপথে দেশে ফিরে এলেন সিধু। তখন ঠিক হয়েছিল, রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে ওপেন করবেন বিক্রম রাঠোর। অর্থাৎ প্রথম একাদশে সৌরভের জায়গা নেই। কিন্তু প্র্যাকটিসে সুনীল যোশী চোট পেয়ে বসায় মহারাজকে খেলানো ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। তবুও পাতিল, আজহারদের চক্রান্ত চলছিলই। ইংল্যান্ডের স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় নতুন বল খুব স্যুইং করছিল দেখে ওয়ান ডাউনে ঠেলে দেওয়া হয় সৌরভকে। যাতে ডমিনিক কর্ক, অ্যালান মুলালিদের বিষাক্ত পেস ও স্যুইংয়ের সামনে ছেলেটা খাবি খায়।

তার আগেই অবশ্য সৌরভের গায়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছিল আর একটা তকমা। দক্ষিণ ও পশ্চিমি মিডিয়ার অপপ্রচার ছিল, সৌরভ নাকি ১৯৯২ সালে ব্রিসবেনে ওয়ার্ল্ড সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলারদের বল চোখেই দেখতে পাননি। সেবার অস্ট্রেলিয়া সফরেও চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হয়েছিলেন মহারাজ। ছিলেন বেঙ্গসরকরের রুম পার্টনার। সৌরভ একবার আমায় মজা করে বলেছিলেন, 'একশোটা টেস্ট খেলা একজন ক্রিকেটারের সঙ্গে একই রুমে থাকতে বিব্রত লাগছিল। তাই অধিকাংশ সময়ই আমি শচীনের ঘরে চলে যেতাম। সেখানে সুব্রত ব্যানার্জি থাকত। ওদের সঙ্গেই আড্ডা দিতাম।' বিরানব্বইয়েই ভারতীয় দলে জায়গা পাকা করে ফেলতে পারতেন বঙ্গসন্তানটি। কিন্তু ভারতীয় দলের নোংরা রাজনীতির শিকার হতে হয়েছিল তাঁকে। ম্যাচ খেলা তো দূরে থাক, ভালো করে প্র্যাকটিসের সুযোগও পাননি। কিন্তু হাসি মুখে সেটা মেনে নিয়ে নিজেকে তৈরি করেছেন আগামীর জন্য।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লর্ডসে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসেই সৌরভ সেঞ্চুরি হাঁকাবে, সেটা কেউই আন্দাজ করতে পারেননি। প্রথম রাতে বেড়াল মারার মতো ঘটনা। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের লক্ষ্য ছিল, কলকাতার ছেলেটার কেরিয়ার সারাজীবনের মতো শেষ করে দেওয়া। কিন্তু সৌরভ হার মানার পাত্র নন। তিনিও জানতেন, এটাই তাঁর শেষ সুযোগ। লর্ডসে সৌরভ যে ইনিংসটা খেলেছিলেন, তা মিথ হয়ে রয়েছে। সে তো অনেক পরিশ্রমের ফসল। তার নেপথ্যে রয়েছে অন্য এক কাহিনী। প্রত্যেক সফল ব্যক্তি তৈরির পিছনে থাকেন একজন বিশ্বকর্মা। মহারাজের ক্ষেত্রে তাঁর নাম চণ্ডী গাঙ্গুলি। বড় ছেলে স্নেহাশিসকে অনেক আগেই তিনি ধরিয়েছিলেন ক্রিকেট। ছোট ছেলে সৌরভকে নিয়েও ছিলেন প্রচণ্ড আশাবাদী। মাঝে মধ্যে ময়দানী বন্ধুদের

বলতেন, ‘ছোটোটা তৈরি হচ্ছে দেখ, ও কিন্তু ঝাঁকাবে।’ সবাই হাসত অন্ধ পুত্রপ্রেম বলে। হাসিটা অবশ্য পরে বদলাতে বাধ্য করেন সৌরভই। ক্রিকেট জীবনে বারবার তাঁর কেরিয়ার বিপাকে পড়লেও পিতা চণ্ডী গাঙ্গুলির ভরসা কমেনি। বলতেন, ‘আমি ওকে চিনি। ঠিক বেরিয়ে যাবে।’ পি সেন ট্রফি শেষ হলেই ফ্লাইটের টিকিট কেটে দিতেন দুই ছেলেকেই। বিলেতে দেবু মিত্রের কাছে প্রশিক্ষণ নিতেন স্নেহাশিস। পরে বাংলা থেকে দেবাং গান্ধী, জয়দীপ মুখার্জিদের সঙ্গে যাওয়া শুরু করেন সৌরভও। আসলে, ক্রিকেট মাঠে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সৌরভকে তৈরি করেছিলেন চণ্ডী গাঙ্গুলি। সেই অভিজ্ঞতা শুনিয়েছেন স্নেহাশিসও, ‘বাবার জন্যই সৌরভ এত বড় ক্রিকেটার হতে পেরেছে। আমরা দু’জনেই দুখীরাম কোচিং সেন্টারে প্র্যাকটিস করতাম। সৌরভ কিছুটা পরে এসেছে। বাবার ক্রিকেট জ্ঞান ছিল ভীষণ প্রখর। তখন ক্রিকেটাররা জিম করবে, কেউ ভাবতই না। কিন্তু আমাদের দু’জনের জন্য বাড়িতে জিমনাসিয়াম এবং পিচ তৈরি করে দিয়েছিলেন বাবা। মনে পড়ে, অশোক মুস্তাফি স্যারের কোচিং সেন্টারের দিনগুলি। তখন ফ্লাড লাইটে খেলা হত না। বাবা এরিয়ান ক্লাবের নীচে টিউব লাইট লাগিয়ে দিয়েছিলেন। যাতে আমরা টিউশনের পর প্র্যাকটিস করতে পারি। অনবদ্য সব চিন্তাভাবনা। যা ভাইকে বড় ক্রিকেটার হওয়ার পথে বিভিন্ন বাধা টপকাতে সাহায্য করেছিল। এমনিতে ও ছিল একটু ভীতু প্রকৃতির। খুব ভূতের ভয় পেতো। বাড়িতে কিছুতেই একা শুতো না। হোটেলের রুমে টিভি চালিয়ে ঘুমোত। সেই ছেলেটাকেই যখন অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে লড়তে দেখেছি, খুব গর্ব হয়েছে। আসলে মানুষ তো ঘা খেতে খেতেই তৈরি হয়।’

সারাজীবনই অদ্ভুত সব অভিযোগের শিকার হয়েছে সৌরভ। প্রথমে বলা হত ক্রিকেটই খেলতে পারে না ছেলেটা। লর্ডসে নিজেকে প্রমাণ করার পর নিন্দুকদের নতুন গান শুরু, একদিনের ক্রিকেটে চলবে না। টরেন্টোতে একটা ম্যাচে কুম্বলের পরে (আট নম্বরে) ব্যাট করতে নেমে ৮ বলে ১২ রানে নট আউট ছিলেন। ওয়াসিম আক্রামের ব্যানানা ইনস্যুইঙ্গারকেও সোজা ব্যাটে বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়েছিলেন মহারাজ। তার পরেও অবহেলিত থেকেছেন।

একটা সময় তাঁর পিছনে কার্যত লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল কোচ গ্রেগ চ্যাপেল ও নির্বাচক প্রধান কিরণ মোরেকে। অধিনায়কত্বের লোভে রাহুল দ্রাবিড় তখন নগ্ন ব্রুটাস। কিন্তু সৌরভকে আটকে রাখা যায়নি। কামব্যাকেই দশ হাজার রান পূর্ণ করেছিলেন। মনের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ জমলেও তিনি বুঝতে দেননি। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে শুধু বলেছিলেন, ‘জীবনের প্রথম ওয়ান ডে রানটা করার পর জানতাম না পরের ম্যাচে দলে থাকব কি না। আজ দশ হাজার রান করার পরেও জানি না, পরের ম্যাচে আমার সামনে কি অপেক্ষা করছে!’

সবচেয়ে হাস্যকর অভিযোগ ছিল সৌরভ নাকি জোরে বল খেলতে পারেন না। আরে বাবা ১৮ হাজার রান কি শুধু স্পিনের বিরুদ্ধে করেছেন? অ্যামব্রোস, আক্রাম, চামিন্ডা ভ্যাস, গ্লেন ম্যাকগ্রা, ড্যারেন গফ, ডোনাল্ড, ব্রেট লি— প্রত্যেকেই একাধিকবার সৌরভের শ্রেষ্ঠত্ব একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। শোয়েব আখতারের বলে বুকে আঘাত পেয়ে

মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পরেও হাসপাতাল থেকে ফিরে ৫৭ রান করেছিলেন দাদা। এমন মহারাজকীয় ইনিংস গুণতে শুরু করলে শেষ হবে না। ১৯৯৭ সালে করাচি ওয়ান ডে'তে সৌরভের ব্যাটে মার খাওয়ার ঘটনা আজও মনে আছে ওয়াকার ইউনিসের। পাকিস্তানের মাটিতে ভারতকে জিততে শিখিয়েছিলেন মহারাজই। রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস তাঁর আত্মজীবনীতে সৌরভ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'শরীরটা মানুষের মতো। কিন্তু ভিতরের খাঁচাটা দৈত্যের।'

ভারতীয় ক্রিকেটকে তিনিই পথ দেখিয়েছেন। ২০১১ সালে ধোনির নেতৃত্বে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জয় তো আসলে তাঁরই গড়া ভিতে সাফল্যের ইমারত তৈরির কাহিনী। ম্যাচ ফিক্সিংয়ে জড়িয়ে আজহারউদ্দিন ভারতীয় ক্রিকেটকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিলেন। হাল ছেড়ে দিয়েছিল সবাই। মনে হয়েছিল, জিম্বাবোয়ে হয়ে যাবে টিম ইন্ডিয়া। মুম্বই লবির জোরালো দাবি ছিল, শচীনই ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার আদর্শ লোক। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা শচীনের। অগত্যা ত্রাতা সৌরভ। চাপিয়ে দেওয়া নেতৃত্ব তিনি হাসি মুখে গ্রহণ করেছিলেন। জানতেন, সফল হবেন। কিন্তু অনেকেই ভেবেছিলেন, সৌরভের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটের সলিলসমাধি হবে। তেমনটা হয়নি। উলটে ভরাডুবি হয়েছিল নিন্দুকদেরই। সৌরভের ছোঁয়ায় সুরভিত হতে শুরু করে ভারতীয় ক্রিকেট। গড়াপেটার আতঙ্কে থাকতেন ক্রিকেটাররা। কেউ কারও সঙ্গে ভালোভাবে কথা পর্যন্ত বলতেন না। দমবন্ধ পরিবেশে স্বস্তির হাওয়া এনে দিতে পেরেছিলেন সৌরভ। শচীন, দ্রাবিড়, কুম্বলেদের নিয়ে তিনি গড়ে তুলেছিলেন স্বপ্নের টিম ইন্ডিয়া।

নিজের সঙ্গে ঘটে যাওয়া অন্যায় আর কারও জীবনে হতে দেননি অধিনায়ক সৌরভ। বীরেন্দ্র সেওয়াগ, হরভজন সিং, আশিস নেহরা, যুবরাজ সিং, জাহির খান, মহম্মদ কায়িফ— সবাইকে তুলে এনেছিলেন মহারাজই। আগলে রেখেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল, অস্ট্রেলিয়ার মতো একটা শক্তিশালী দল গড়ে তোলা। যাতে দেশের সীমরেখা টপকেও টেস্ট সিরিজ জেতা যায়। ভারতের সর্বকালের সফলতম অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। তিনিও তো সৌরভেরই আবিষ্কার। ২০০৪ সালের ঘটনা। কয়েকটি ম্যাচে রান পাচ্ছিলেন না মাহি। সুযোগ বুঝে ধোনিকে তুলে আনা হল চার নম্বরে। বিশাখাপত্তনমে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৪৮ খুলে দিয়েছিল ধোনির কপাল। একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় সৌরভের মুখে, 'নীচের দিকে খেলালে সে বড় ব্যাটসম্যান হতে পারে না।' দলনেতা হিসাবে বরাবরই সহ-খেলোয়াড়দের পাশে থেকেছেন মহারাজ। কিন্তু নিজে কখনও সেই নিরাপত্তা কিংবা আশ্বাস পাননি কারও থেকে। অনিল কুম্বলে, রাহুল দ্রাবিড়ের অধিনায়কত্বে তাঁকে বাদ পড়তে হয়েছিল ঠিকই, অথচ তাঁদেরই একদিন দলে জায়গা দিয়েছিলেন মহারাজ। সৌরভ চেয়েছিলেন বলেই গ্রেগ চ্যাপেল কোচ হতে পেরেছিলেন ভারতীয় দলের। কিন্তু দু'মাসেই বদলে গিয়েছিল ছবিটা। সেই লোকটাই পিছন থেকে ছুরি মারলেন। কিন্তু রাখে হরি মারে কে। সৌরভ যে শেষ হওয়ার নয়। ধ্বংসস্তুপ থেকে ফিরে আসতে জানেন ফিনিক্স পাখির মতো।

প্রত্যেক সফল মানুষের জীবনে কিছু না কিছু আপশোস থাকে। সৌরভেরও রয়েছে। বিশ্বকাপ জিততে না পারা তো অবশ্যই। ২০০৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ফাইনালে টসে জিতেও প্রথমে ফিল্ডিং নেওয়াটা ঠিক হয়নি।

ভারতীয় ক্রিকেটকে সাফল্যের শিখরে নিয়ে যাওয়ার পরেই অবিচারের শিকার হয়েছেন সৌরভ। নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান দিলীপ বেঙ্গসরকর তাঁর কেরিয়ার ২০০৮ সালেই শেষ করে ফেলার পণ নিয়েছিলেন। তাতে মদত জুগিয়েছিলেন এন শ্রীনিবাসন সহ বোর্ডের অন্য কর্তারাও। মহারাজ বুঝে গিয়েছিলেন, এই লড়াই আর চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অষ্টমীতেই বিসর্জনের ঘণ্টা বাজিয়ে বেঙ্গালুরুতেই ক্রিকেটকে আলবিদা জানানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন সৌরভ। তার আগেই জীবনের একমাত্র টেস্ট দ্বিশতরান ও ইডেনে সেঞ্চুরি করেছেন। নাগপুর টেস্টের পর তিনি পাকাপাকিভাবে ব্যাট তুলে রাখেন। ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে জীবনের শেষ প্রেস কনফারেন্সে বলেছিলেন, 'এবার নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব।' সত্যিই তো। দীর্ঘ ক্রিকেট জীবনে কখনও তাঁকে শান্তিতে ঘুমোতে পারেননি। জীবনের শেষ ম্যাচে সতীর্থদের বিলিয়ে দিয়েছিলেন যাবতীয় সরঞ্জাম। পেয়েছিলেন, দলের সবার সই করা জার্সি। আর বিপক্ষ দলের গার্ড অব অনার। মহারাজের কথায়, 'এটাই জীবনের সেরা প্রাপ্তি।'

সৌরভ আজও সমান ব্যস্ত। ক্রিকেট প্রশাসক হিসেবে এক শহর থেকে আর এক শহরে ছুটে বেড়াতে হচ্ছে তাঁকে। কীভাবে সময় বের করেন মহারাজ? হাসতে হাসতে একবার বলেছিলেন, 'বছরের শুরুতেই একটা ক্যালেন্ডার বানিয়ে নিই। প্রথম দিকে কমার্শিয়াল শ্যুটিংয়ে অনেক সময় দিতে হত। ব্যাপারটা বুঝতাম না। এখন গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। শ্যুটিংয়ে গিয়েই বলে দিই, তিনটে টেক দেব। তার মধ্যেই শেষ করতে হবে।' সৌরভ এখন বিনোদনে বাংলার বড় মুখ। আট থেকে আশি সবাই তাঁকে দেখার জন্য টিভির পর্দায় হুমড়ি খেয়ে পড়েন। সাফল্যের সিঁড়িকে একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নেপথ্যে কারিগর তিনি নিজেই। অসম্ভব আত্মবিশ্বাস তাঁর মূলধন। আর রয়েছে প্রচণ্ড পরিশ্রম করার ক্ষমতা।

সৌরভকে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হতে দেখতে পেলে সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন দু'জন। এক তাঁর বাবা চণ্ডী গাঙ্গুলি। অন্যজন ময়দানে মহারাজের অভিভাবক জগমোহন ডালমিয়া। তাঁদের দেখানো পথেই এগিয়ে চলছেন দাদা। সিএবি সচিব হয়েছিলেন ডালমিয়ার ডাকে সাড়া দিয়ে। ক্রিকেট জীবনের মতোই সৌরভের প্রশাসক জীবনও রোমাঞ্চকর। ডালমিয়ার মৃত্যুর পর সিএবি সভাপতি হন তিনি। তারপর ভারতীয় ক্রিকেটের জটিলতা কাটাতে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট। তাও নাটকীয়ভাবে। রাত সওয়া দশটা পর্যন্ত সবাই জানত, বোর্ডের পরবর্তী সভাপতি হচ্ছেন ব্রিজেশ প্যাটেল। কিন্তু ডিনার টেবলে উলটে গিয়েছিল পুরো চিত্রনাট্য। ভারতীয় ক্রিকেটের বেতাজ বাদশা হলেন সৌরভ। শেষ বলে ম্যাচ জেতার মতোই ঘটনা। অনেকে বলেন, সৌরভের বোর্ড সভাপতি হওয়ার পিছনে রাজনীতির অঙ্ক রয়েছে। এসব শুনে মহারাজ হাসেন। তাঁর কথায়, 'কীভাবে ম্যাচটা শেষ হল, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। জয়ই শেষ কথা!'

মেজাজটাই যে আসল রাজা মহারাজের।

ছবি: সংশ্লিষ্ট সংস্থার সৌজন্যে

সমাপ্ত

পাঁঠার মাংসের দশরকম

রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মানুষের জীবনে দশ সংখ্যাটির গুরুত্ব অপরিসীম। দশ দিক, দশ অবতার, দশ মহাবিদ্যা, দশ ইন্দ্রিয়— চারিদিকে দশেরই ছড়াছড়ি। তাই আমি আজ বলতে বসেছি পাঁঠার মাংসের দশটি আলাদা আলাদা মনোলোভা পদ নিয়ে। এখন মজা হল, পাঁঠার মাংস তো একটাই উপাদান কিন্তু তাকে নানান ভাবে কেটে-থুড়ে-ভেঙে-বেটে নিয়ে, রকমারি তেল-মশলা-সব্জির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারে, তা দিয়ে তৈরি বিভিন্ন পদের স্বাদ, রূপ, বর্ণ, গন্ধ সবকিছুই যেন বদলিয়ে যায়। [illegible] বদলে বিভিন্ন নাটকে আলাদা আলাদা চরিত্র হয়ে যায়— এও যেন ঠিক তেমনি।

একথা সবারই জানা যে, পাঁঠার মাংস বহু যুগ ধরেই বাঙালিদের খাদ্য তালিকার একদম শীর্ষে বসে রয়েছে। সে আছে— মানে আনন্দ আছে, উৎসব আছে। সে নেই— মানে যেন সবটাই ম্যাড়মেড়ে, আলুনি। প্রাথমিক ভাবে গেরস্তবাড়িতে পাঁঠার মাংসের টলটলে ঝোল, থকথকে কালিয়া, শুকনো কষা এবং পাঁঠার মেটের চচ্চড়ির আগমন ঘটেছিল। কিমা, কোফতা, কাবাব, দোপেঁয়াজির আগমন তার অনেক পরে [illegible]

কচি পাঁঠার টলটলে ঝোল

প্রথমেই আসি পাঁঠার মাংসের টলটলে ঝোলের কথায়। এই পদটি ছিল মধ্যবিত্ত বাঙলিদের রোববারের দুপুরের খাদ্যতালিকার একটি ঐশ্বর্য। কালিয়া রাঁধতে যেমন রেওয়াজি খাসি দরকার, তেমনি এর জন্যে প্রয়োজন দিশি কচি পাঁঠা। কারণ এর মাংসটি হতে হবে শীতের দুপুরের রোদের মতো নরম ও তুলতুলে। মুখে দিলেই সে যেন তার লাবণ্য ও পেলবতা নিয়ে একটু একটু করে গলে যায়। মিশে যায় সামান্যতম জিভের সাহচর্যে-- দাঁতের ব্যবহার প্রায় যেন সেভাবে করতেই না হয়। এই পদটির জন্যে মাঝারি মাপের চন্দ্রমুখী আলু অত্যন্ত জরুরি। অত্যন্ত অল্প লাগলেও দরকার সুখসাগরের মতো মাঝারি মাপের দেশি পেঁয়াজ— যা কুচিয়ে বাদামি করে ভেজে নেওয়াই হল রীতি। ধনে, আদা, জিরে এবং হলুদের সান্নিধ্যে এসে এর ঝোলটির রং হবে কালচে হলুদ। তেজপাতা আর ছেঁচা গরম মশলার সুঘ্রাণ আমাদের বহুদূর থেকে ডেকে নিয়ে আসবে যৌথ খাবারের থালার দিকে। এর গরম গরম ঝোলটি দিয়ে সাধারণ তাপমাত্রার ধবধবে ভাত মেখে খেতে ভালো লাগে। ভালো লাগে মাখা ভাতে দু'ফোঁটা দিশি পাতিলেবুর রস চিপে খেতে।

উপকরণ: কচি পাঁঠা ৭৫০ গ্রাম আলু ৩টে মাঝারি (অর্ধেক করে কাটা), পেঁয়াজ ১টা বড় (কুচনো), টোম্যাটো ২টো মাঝারি (কুচনো), রসুন ৫ কোয়া (বাটা), আদা ২ ইঞ্চি মতো (বাটা), টকদই ২ টেবল চামচ, ছোটো এলাচ ৪টে, দারচিনি ১টা বড় স্টিক, লবঙ্গ ৩-৪টে, তেজপাতা ২টো বড়ো, হলুদ গুঁড়ো দেড় চা চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচ, ধনে গুঁড়ো ২ চা চামচ, জিরে গুঁড়ো দেড় চা চামচ, গরম মশলা গুঁড়ো ১ চা চামচ, ঘি ১ টেবল চামচ, সাদাতেল পরিমান মতো, নুন স্বাদ মতো।

প্রণালী: মাংস, দই, নুন, অর্ধেক আদা-রসুন বাটা, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো দিয়ে অন্তত ৩-৪ ঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখুন। কড়াইতে তেল গরম করে ছোটো এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ ও তেজপাতা ফোড়ন দিন। সুন্দর গন্ধ বেরোলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে স্বচ্ছ হওয়া পর্যন্ত নাড়তে থাকুন। এবার আদা-রসুন বাটা দিয়ে কষাতে থাকুন যতক্ষণ না পেঁয়াজ সোনালি হয়ে আসছে। টমেটো কুচি দিয়ে দিন। টোম্যাটো যখন নরম হয়ে গলে যাবে তখন মাংস ও আলু দিন। ভাজতে থাকুন যতক্ষণ না মাংসের রং বদলাচ্ছে ও জল ছাড়তে শুরু করছে। মাংস জল ছাড়তে শুরু করলে সবসুদ্ধ প্রেশার কুকারে ঢেলে দিন। কতটা ঝোল প্রয়োজন সেই বুঝে জল দিন। প্রেশার কুকার চাপা দিয়ে ৪-৫ টা হুইসেল পর্যন্ত সিদ্ধ করুন। স্টিম বের করে দিয়ে ঢাকনা খুলুন। ৭-১০ মিনিট একদম ঢিমে আঁচে রাখুন। কতটা ঝোল চান সেই অনুযায়ী ঠিক করে নিন আঁচে কতক্ষণ রাখবেন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে আঁচ বন্ধ করে ঘি ও গরম মশলা গুঁড়ো ছড়িয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন। খাওয়ার আগে ঢাকনা খুলবেন।

মেটে কষা

এবারে পাঁঠার ঝাল ঝাল মেটে কষার কথা কিছুটা বলা যাক। বরাবর চালানে আসা বিরাট গতর পাটনাই খাসিদের ঘাস ছাড়াও ছোলা আর ভুট্টার দানা খাওয়ানো হয়। তাই এদের মাংস হয় রেওয়াজি। কিন্তু এদের মেটে বা লিভারের গায়েও চর্বি জমে থাকে। ফলে মেটের যে স্বাভাবিক কালচে লাল চেহারা, তার গায়ে একটা ফ্যাকাসে হলদেটে ছোপ চলে আসে। এতে ওই মেটের স্বাদ কমে। তাই খেতে হলে দেশি পাঁঠার ঝকঝকে লাল মেটে কেনাই সবথেকে ভালো। এই মেটে নেওয়ার মজা হচ্ছে আলাদা করে সেদ্ধ করতে হয় না। ভালো করে পাতিলেবুর রস, পেঁয়াজ, রসুন, আদার রস মাখিয়ে বেশ কিছুক্ষণ মজতে দিতে হয়। এরপর তেলে পেঁয়াজ, টমেটো আর লঙ্কাকুচির সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করে শুকনো হয়ে এলে ও সুঘ্রাণ বেরোলে, একে খাস্তা পরোটা দিয়ে সময় নিয়ে খেলে বেশ মৌতাত হয়। আর পরপর দু'দিন খেলে হৃদয় ময়ূরের মতো নেচে ওঠে।

উপকরণ: খাসির মেটের পিস ৫০০ গ্রাম, নুন স্বাদ মতো ,হলুদ গুঁড়ো ১ চা চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো ২ চা চামচ, জিরে গুঁড়ো ১ চা চামচ, ধনে গুঁড়ো ১ চা চামচ, পেঁয়াজ দুটি মাঝারি কুচি করা, আদা বাটা ১ চা চামচ, গরম মশলার গুঁড়ো ১ চা চামচ, তেল ৫ টেবিল চামচ।

প্রণালী: কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজ কুচি দিতে হবে ভালো করে ভাজতে হবে আদা বাটা রসুন বাটা দিয়ে কষাতে হবে। বাদামি হয়ে এলে মেটের পিস গুলো দিতে হবে। নুন, হলুদ, লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে আবার কষাতে হবে। কম আঁচে ঢাকা দিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে, জিরেগুঁড়ো ধনেগুঁড়ো দিয়ে আবার কষাতে হবে। মেটেগুলো পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে গেলে, গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে নাড়াচাড়া করে, শুকনো শুকনো হয়ে এলে নামাতে হবে।

মাটন স্ট্যু

স্ট্যু এর ইতিহাস খুবই পুরনো। প্রথমে প্রাচীন জাপানে এবং তারপরে রোমে স্ট্যু এর চল শুরু হয়েছিল। তবে এটি সবথেকে বেশি ছড়িয়েছিল বিলিতিদের খাদ্যতালিকায় আর সেখান থেকেই চলে এসেছিল বাঙালিদের হেঁসেলে। স্ট্যু এর সহজ মানে হল কিছু বিশেষ সব্জিকে কিছুটা মাছ বা মাংসের সঙ্গে ভাপে সেদ্ধ করে তার ঝোল। কিছু সত্ত্বগুণী ধার্মিক মানুষ অবশ্য নিরামিষ স্ট্যুয়েরও ব্যবস্থা করে থাকেন কিন্তু সেসব আমাদের মতো লোভী মানুষের জন্যে নয়। স্ট্যু এর জন্যে পাঁঠার গর্দান বা শিনার, নরম এবং টুকরো করা মাংসই সবচেয়ে উপযোগী। একে চন্দ্রমুখী আলুর দো-আধখানা করা টুকরো, ছোটো দিশি পেঁয়াজ, গাজর, বিনস, পেঁপেফালির সঙ্গে পরিমাণ মতো আদা-রসুন বাটা মিশিয়ে, প্রেশার কুকারে জল দিয়ে সেদ্ধ করতে হয়। নামানোর আগে একদলা মাখন দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। এই স্ট্যু-এর সঙ্গে সবথেকে জমে থান পাউরুটির কড়া করে সেঁকে নেওয়া টুকরো। শরীর ভারী হবে না, হজমের সমস্যা হবে না, গাঢ় ও গভীর ঘুম হবে— এমন একটি সুখাদ্যকে বেশিদিন না খেয়ে কি দূরে সরিয়ে রাখা যায়?

উপকরণ: ছাগলের গর্দান বা সামনের পায়ের হাল্কা এবং ছোটো হাড়যুক্ত মাংস ৫০০ গ্রাম, মাঝারি চন্দ্রমুখী আলু ৫ টি আধাআধি কাটা, পেঁপের ৫/৬ টি ছোটো ফালি , গাজর ফালি করা ২ টি ছোটো, বিনস টুকরো করা ৫০ গ্রাম, ছোটো গোটা পেঁয়াজ ৬ টি, রসুন বাটা ২ চা চামচ, আদা বাটা ১ চা চামচ, টমেটো ছোটো ২ টি আধাআধি কাটা, গোটা গোল মরিচ ১০ টি, তেজপাতা ৩/৪ টি, সাদা তেল ৩ টেবিল চামচ, নুন ও মিষ্টি পরিমাণ মতো, মাখন ২৫ গ্রাম।

প্রণালী: মাংস ভালোভাবে গরমজলে ধুয়ে কুকারে অর্ধেকের সামান্য কম জল দিয়ে ৩ টি সিটি মেরে নিতে হবে। তারপর ঢাকা খুলে কুকারের মধ্যে মাখন ছাড়া বাকি সব কিছু দিয়ে ১ টি সিটি মেরে নিতে হবে। এবার কুকারের ঢাকনা খুলে মাখন দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে নামিয়ে নিতে হবে। গরম গরম পরিবেশন করতে হবে।

মাটন ডাকবাংলো

ডাকবাংলো শব্দ-মধ্যে যে ছমছমে রহস্য লুকিয়ে আছে, তার আসল মানের মধ্যে কিন্তু তা একেবারেই নেই। ব্রিটিশ আমলে চিঠি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেত, ঘোড়ার পিঠের বস্তায় ভরে। সেইসময় যে যাত্রাপথ ধরে চিঠিগুলি যেত, তার জায়গায় জায়গায় সরকারি অফিসারদের থাকবার জন্যে এক-একটি বাংলো তৈরি করা হয়েছিল, যার ইংরিজি নাম হল সার্কিট হাউস আর দেশি নাম ডাক-বাংলো। ডাক-বাংলো কারণ সেই বাংলোগুলোতেই ছিল এক-একটি পোস্ট অফিস। সেখানে চিঠির বস্তা নিয়ে আসা ঘোড়ার চিঁ হি হি ডাক শুনে বোঝা যেত— চিঠি এসেছে। আর সেই থেকেই ডাক শব্দটির আরেকটি মানে হয়েছিল চিঠি। সেখানকার কেয়ারটেকার বা খানসামারা হাতের কাছে পাওয়া চটজলদি উপকরণগুলো দিয়ে মাংসের একটি বিশেষ পদ রান্না করতেন, যাতে মাংসের টুকরোর সঙ্গে ডিম এবং আলুও পড়ত। ভালো লাগত গরম গরম হাতরুটি দিয়ে। পরবর্তীকালেও বিভিন্ন ডাকবাংলোয় যখন সাধারণ মানুষরাও রাত কাটাতেন, তখন তাঁদের জন্যেও এই পদটিই রান্না করে দেওয়া হত। পরে হাতরুটি ছাড়াও তাওয়াগরম তন্দুরি রুটি দিয়েও এটি খেয়ে দেখেছি— ভারী চমৎকার!

উপকরণ: মটন ৭৫০ গ্রাম, টক দই ১০০ গ্রাম, আদাবাটা ২ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ২ টেবিল চামচ, পেঁপেবাটা আধ কাপ, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, টমেটো কুচি ১ কাপ, লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা-চামচ, গোলচরিচ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, গরমমশলা গুঁড়ো ২ চা-চামচ, মেথি আধ চা-চামচ, তেজপাতা ২ টো, সরষের তেল ৬ টেবিল চামচ, ঘি ১ টেবিল চামচ, কেওড়ার জল ১ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়ো ২ চা-চামচ, নুন স্বাদ মতো, আলু বড় ৪ টুকরো, জল ৬ কাপ।

প্রণালী: ভাজা মশলা বানানোর জন্য এক চামচ গোটা জিরে, এক চামচ গোটা ধনে, দশটা গোলমরিচ, চারটে শুকনো লঙ্কা, ছ'টা ছোট এলাচ, ছ'টা লবঙ্গ, দারচিনি কড়াইতে দিয়ে হালকা নাড়াচাড়া করুন। এর পর ঠান্ডা করে বেটে নিন। একটা পাত্রে মাটন নিয়ে তাতে একে একে সরষের তেল, ভাজা পেঁয়াজ বাটা, আদা রসুন বাটা, টক দই, নুন দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে ফ্রিজে রাখুন দু' থেকে তিন ঘণ্টার জন্য। এবার কড়াইতে সরষের তেল দিয়ে ভালো করে তাতিয়ে নিন। তাতে তেজপাতা ফোঁড়ন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি যোগ করুন। পেঁয়াজের উপর কয়েক দানা চিনি ছড়িয়ে দিয়ে লালচে করে ভেজে নিন। এরপর ম্যারিনেটেড মাংস দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। একটু কষিয়ে একে একে কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো দিয়ে আরও বেশ কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন। এরপর প্রেসার কুকারের মধ্যে দিয়ে পরিমাণমতো জল যোগ করুন। দুটো সিটি দিয়ে ঢাকনা খুলে অল্প আঁচে রাখুন। এরপর তৈরি করে রাখা ভাজা মশলা আর ডিম সেদ্ধ যোগ করুন। চাইলে সেদ্ধ ডিমগুলি হালকা ভেজেও নিতে পারেন। পাঁচ মিনিট অল্প আঁচে ঢাকা দিলেই তৈরি মাটন ডাকবাংলো।

মাটন চাঁপ

মাটন চপ কথাটির অর্থ ভেড়া বা খাসির, মেরুদণ্ড লাগোয়া পাঁজরার হাড়ের, মাংস-লাগা বড়োসড়ো টুকরো। তাই মাটন চপ দিয়ে করা মাংসের বিশেষ পদটির নাম, এদেশের মৌখিক উচ্চারণে মাটন চাঁপ হয়ে গেছে। মাটন চাঁপ গেরস্তবাড়িতে ইদানীং হতে দেখা গেলেও, আসলে তা পাওয়া যেত মোগলাই রেস্তরাঁগুলিতেই। একটি বিরাট চ্যাটালো প্যানের চারপাশে থরে থরে খাসির পাঁজরার মাংসের বড়ো বড়ো টুকরো সাজানো। আর পাত্রটির মাঝামাঝি জায়গায় পার্বত্য হ্রদের মতো গোল হয়ে জমে রয়েছে তার থকথকে সোনালিরঙা গ্রেভি— এটাই হল মাটন চাঁপের প্রথম ছবি যা খাদ্যরসিক বাঙালির মানসচক্ষে সবসময় জেগে থাকে। মাংসের টুকরোটি সার্ভ করার সময় তাকে সেই হ্রদের গ্রেভিতে সামান্য স্নান করিয়ে দেওয়া হয়— যাতে তার উষ্ণ শরীরটি থেকে মৃদুমন্দ জাফরানের সৌরভ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। তবে মাটন চাঁপের সঙ্গে হাড়ের কুচো মিশে থাকার ব্যাপারটি খুবই স্বাভাবিক। তাই একটু সতর্ক হয়ে না খেলে হরিষে বিষাদ হতে পারে। এটিকে লাচ্চা পরোটা, তন্দুরি বা রুমালি রুটি এবং মাখ্খন নান দিয়ে খাওয়া যেতে পারে। তবে মাটন বিরিয়ানির সঙ্গে মাটন চাঁপ হল সত্যিকারের রাজযোটক। আর কালোয়াতি শিল্পীকে দিয়ে যেমন রবীন্দ্রসংগীত হয় না, তেমনি মুরগির মাংস দিয়েও আস্লি চাঁপ হয় না। এই কথাটি নির্মম হলেও বোধহয় না মেনে কোনো উপায় নেই।

উপকরণ: খাসির পাঁজরার মাংসলাগা চাঁপের পিস (১ কেজি), টক দই (১০০ গ্রাম), পেঁয়াজবাটা (২ টি মাঝারি), আদা বাটা (২ টেবল চামচ), রসুন বাটা (১ টেবল চামচ), লঙ্কারগুঁড়ো (১ চা চামচ), হলুদ গুঁড়ো (১ চা চামচ), গরম মশলা গুঁড়ো (২ টেবল চামচ), জায়ফল/জয়ত্রি গুঁড়ো (আধচা চামচ), আস্ত শাহজিরা (১ চা চামচ), তেজপাতা (৩/৪টি), কেওড়া বা গোলাপজল (কয়েক ফোঁটা), ঘি(২ টেবল চামচ), তেলও নুন (পরিমাণমতো)।

প্রণালী: মাংস ধুয়ে জলঝরিয়ে তাতে ফেটিয়ে রাখা টক দই এবং আদা, পেঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা ভালোভাবে বেটে মাখিয়ে কমপক্ষে ৩ ঘণ্টার জন্যে ফ্রিজে রাখুন। হাঁড়িতে তেল গরম করে শাহজিরা ও তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে আদা-রসুন বাটা ও হলুদ-লঙ্কারগুঁড়ো নেড়েচেড়ে তাতে মজে যাওয়া মাংস ঢেলে দিন। আঁচ কমিয়ে ঢাকনা দিয়ে সেদ্ধ করুন কমপক্ষে ৩০ মিনিট। এরপর তাতে গরম মশলা গুঁড়ো, জায়ফল-জয়ত্রি গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। পরিমাণ মতো জলদিয়ে আবার ঢাকনা দিয়ে উনুনে বসান মাংস সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। মাংস সেদ্ধ হয়ে তেল ছেড়ে আসলে কেওড়া জল ও ঘি মিশিয়ে কয়েক মিনিট দমে রেখে নামিয়ে ফেলুন। ঢেলে নিন চ্যাটালো প্যানে, যার মাঝখানে তেল-মশলায় মেশা সোনালি গ্রেভি জমবে, মাংস সাজিয়ে দিন তার ধারে ধারে। এবার ঢিমে তাপে বসিয়ে রেখে গরম গরম পরিবেশন করুন।

মাটন রেজালা

নধর খাসির সামনের পা অথবা গর্দান থেকে নেওয়া হাল্কা চর্বির পরত লাগা একটুকরো বড়োসড়ো মাংস, চকচকে ঘি-ভাসা অফ হোয়াইট গ্রেভির মধ্যে হিমশৈলের মতো ডুবে আছে। আর তারই আশপাশ থেকে নতুন কুটুমের মতো উঁকি দিচ্ছে দু-একটি টুকটুকে লাল লঙ্কা। এটাই হল মাটন রেজালার ফার্স্ট লুক। নাম শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, এর উৎস মোগলদের রান্নাঘর। এই পদটি তৈরির সময় যেহেতু কাজুবাটা, পোস্তবাটা, টক দই— এমন বিশেষ কয়েকটি সাদাটে উপাদান পড়ে এবং রান্নার সময় হলুদ পড়ে না, তাই এর মাংস এবং গ্রেভির রঙ অমন সাদাটে হয়। মাটন রেজালার স্বাদ সামান্য মিষ্টি ঘেঁষা। মচমচে খাস্তা লাচ্ছা পরাঠা কিংবা তপ্ত তন্দুরি রুটি থেকে একটি টুকরো ছিঁড়ে এর গ্রেভিতে চুবোলেই, সেটি সাঁ করে তা শুষে নেবে। আর ওমনি তাকে মুখের মধ্যে টুক করে পুরে দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে একটুখানি মাংস সামনের দুটি দাঁতের সাহায্য টুক করে কামড়ে নিয়ে, ধীরে ধীরে চিবোনোটাই হল শাস্ত্রীয় নিয়ম। এই পুরো ঘটনাটি ঘটার সময় চোখের পাতা খুব আলতোভাবে বন্ধ রাখতে হয়, কারণ তাতে আমাদের হৃদয়, চুলবুলে একটি পাখির মতো, তৃপ্তির নতুন এক দিগন্তে, ডানা মেলে ভেসে বেড়ানোর আনন্দ পুরোপুরি উপভোগ করতে পারে।

উপকরণ: খাসির মাংস ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ (কুচনো) বড় ২৫০ গ্রাম, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ চা চামচ, লাল কাঁচালঙ্কা ৪-৫ টি গোটা, টক দই ১০০ গ্রাম, কাজু বাটা ২ টেবিল চামচ, পোস্ত বাটা ৪ টেবিল চামচ, ফ্রেশ ক্রিম ১ টেবিল চামচ, তেজপাতা ২/৩ টি, গরম মশলা গুঁড়ো অল্প, ভৈঁসা ঘি ৪ টেবিল চামচ, নুন স্বাদমত, সাদাতেল আধ কাপ।

প্রণালী: মাংস ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। তা নুন ও টক দই দিয়ে ম্যারিনেট করুন। পেঁয়াজ কুঁচিয়ে নিন। কাজু ও পোস্ত গরম জলে ভেজান। গ্যাসে কড়াই চাপান। তাতে সামান্য সাদাতেল দিন। গরম তেলে পেঁয়াজ কুচি ছাড়ুন। গোলাপি করে ভাজুন। নামিয়ে পোস্ত, কাজু, ও পেঁয়াজ মিহি করে বাটুন। কড়াইয়ে বাকি তেল ও ঘি ঢালুন। গোটা গরম মসলা ফোড়ন দিন। আদা রসুন বাটা দিয়ে কষুন। সুগন্ধ বেরোলে ম্যারিনেটেড মাটন ছাড়ুন। লংকা বাটা দিয়ে কষুন। নাড়াচাড়া করে পোস্ত, কাজু ও ভাজা পেঁয়াজের পেস্ট মেশান। অল্প আঁচে আধ ঘণ্টা রাখুন করুন। গরম মশলা গুঁড়ো মেশান। প্রয়োজনে জল দেবেন। মাংস তেল থেকে আলাদা হলে নামান। এই মাংস এবং গ্রেভি থকথকে সাদা রঙের হবে। ওপরে তেল ভাসবে।

কাশ্মীরি রিস্তা

কাশ্মীরি রিস্তা হল ভেড়া বা পাঁঠার মাংসের মিহি কিমাকে, সামান্য চর্বি, ছোটোএলাচ, আদা এবং মৌরির গুঁড়ো, পেঁয়াজ-রসুন-আদাকুচি ইত্যাদি মিশিয়ে পিং পং বলের চেয়ে একটু ছোটো আর সলিড গোল্লা পাকিয়ে থকথকে ঝোলের মধ্যে ফুটিয়ে রান্না করা। রিস্তার লালচে গ্রেভি তৈরির সময় সাদা তেলের সঙ্গে হিং, হলুদগুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো, সাধারণ লঙ্কাগুঁড়ো ইত্যাদি পড়ে। এই ঝালঝাল পদটি তন্দুরি রুটি এবং লাচ্চা পরোটা সহযোগে খাওয়া যেতে পারে। খাওয়া যেতে পারে কাশ্মীরি পোলাও এর সঙ্গেও। আর রিস্তেদারদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে খেলে এর স্বাদ আরও একশোগুণ বেড়ে যাবে।

উপকরণ: মিট বলের জন্য হাড়বিহীন খাসির মাংস ৫০০ গ্রাম, আদাকুচি ১ চামচ, রসুনকুচি ১ ১/২ চামচ পিঁয়াজকুচি ৩ চামচ মৌরিগুঁড়ো ১ চামচ জিরেগুঁড়ো ১ চামচ বেকিং সোডা ১/৪ চামচ কর্ণফ্লাওয়ার ৩ চামচ ডিম অর্ধেক নুন স্বাদ মতো।

গ্রেভির জন্য তেল ৬ টেবিলচামচ, পিঁয়াজ ছাঁকা তেলে ভেজে বাটা ৫ চামচ, আদাবাটা ১ ১/২ চামচ , রসুনবাটা ১ ১/২ চামচ , মৌরিগুঁড়ো ১ চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চামচ , লঙ্কাগুঁড়ো ১ ১/২ চামচ , কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো ২ চামচ, শুকনো আদাগুঁড়ো ১ চামচ, গোটা এলাচ ৬ টি, দারচিনি ২ স্টিক, গোটা জিরে ১/২ চামচ, টক দই ৫ টেবিল চামচ।

প্রণালী: খাসির মাংস ভালো করে মিক্সিতে পেস্ট করে নিতে হবে। এবার মাটন বলের জন্য যা যা মশলা দেওয়া আছে সবকিছু মিশিয়ে ভালো করে ১০ মিনিট মাখতে হবে। এরপর হাতে অল্প তেল লাগিয়ে মাঝারি সাইজের বল তৈরি করতে হবে। একটি বাটিতে জল গরম করতে হবে। ফুটে গেলে বলগুলো তাতে দিয়ে দিতে হবে। আঁচ কমিয়ে চাপা দিয়ে ২০ মিনিট রান্না করতে হবে। হয়ে গেলে তুলে নিতে হবে। অন্যদিকের কড়াই গরম করে তাতে সাদাতেল দিতে হবে। গোটা জিরে ও গোটা গরমমশলা দিতে হবে। এরপর আদাবাটা ও রসুনবাটা দিয়ে ২ মিনিট ভাজতে হবে। এবার ভাজা পিঁয়াজবাটা আরো কিছুক্ষণ ভাজতে হবে। এবার গরম মশলা ছাড়া সমস্ত গুঁড়ো মশলা একটা বাটিতে অল্প জলে গুলে দিয়ে দিতে হবে। আঁচ কমিয়ে রান্না করতে হবে। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে টক দই ফেটিয়ে দিতে হবে। আবারও কষতে হবে। এরপর বলগুলো যে জলে ফোটানো হয়েছিল সেই জলটা পুরোটা দিয়ে দিতে হবে। গ্রেভি ফুটে উঠলে বলগুলো ছেড়ে দিতে হবে। আঁচ কমিয়ে ১ ঘণ্টা রান্না করতে হবে। জল লাগলে গরম করে দিতে হবে। রান্না হয়ে গেলে গ্রেভিটা একটু কমিয়ে গুঁড়ো গরম মশলা ও ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে আরো ৩ মিনিট ফুটিয়ে নামিয়ে নিতে হবে।

মাটন রোগান জোস

সারা পৃথিবীর কত ধরনের খাবারই তো আমরা ঘরে বসে খাই অথবা খাই কাছেপিঠের কোনো চেনা এবং নামকরা রেস্তরাঁয় গিয়ে। কিন্তু যে জায়গায় খাবারটির সৃষ্টি, সেখানে গিয়ে তা খাওয়ার আনন্দ একদমই আলাদা। আরেকটি লাভ, এতে করে পদটির আসল স্বাদটি আমাদের জিভে ধরা পড়ে। যেমন, কাশ্মীরি রাঁধুনিদের আবিষ্কার মাটন রোগান জোস পদটি আমরা খেয়েছিলাম সোনমার্গের বুকের ওপর একটি ওপেন-এয়ার রেস্তরাঁয় বসে। আমাদের চারপাশ ঘিরে ছিল বরফ-ঢাকা পাহাড়। মাঝে মাঝে ঠান্ডা হাওয়া বইছিল। আকাশ ছিল পরিষ্কার। ছিল সোনালি রোদ্দুর। আর আমাদের সামনের টেবিলে, ধবধবে সাদা কাচের বোলে সাজানো ছিল কাশ্মীরি মাটন রোগান জোস। এটির জন্যে ভেড়া বা ছাগলের পিছনের পায়ের নলি-হাড়ের সঙ্গে লেগে থাকা বড়ো সাইজের মাংসের টুকরো লাগে। এই পদটি কাশ্মীরি পোলাও কিংবা সাদা গরম ভাতের সঙ্গেও মারহাব্বা। কিন্তু সেদিন তপ্ত তন্দুরি রুটি এবং গরম গরম লাচ্চা পরোটা দিয়ে এটি মুখে তুলতে তুলতে আমরা তাকাচ্ছিলাম সোনমার্গের অসামান্য পাহাড়ি নিসর্গের দিকে।

উপকরণ: ১ কেজি মাটন (mutton), এক চিমটে হিং , দুটো দারচিনি স্টিক, ৩ টে এলাচ, ৩ চামচ মৌরি গুঁড়ো, ১ চামচ ধনে গুঁড়ো, এক চিমটে জাফরান, হাফ কাপ খোয়া, ২ মিলি কেওড়া জল, ১ চামচ কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, পরিমাণ মতো সরষের তেল, ১ চামচ জিরা গুঁড়ো, অল্প করে গোলমরিচ, ৩ টে কাঁচা লঙ্কা, ১ চামচ আদা গুঁড়ো, এক কাপ দই, হাফ চামচ গরম মশলা, ১৫ গ্রাম বাদামের পেস্ট, স্বাদ অনুসারে নুন, ১-২ কাপ জল, অল্প কিছু লবঙ্গ।

প্রণালী: একেবারে প্রথমেই মাংসটা একটু সেদ্ধ করে নিতে হবে। তারপর একটা বড় কড়াই নিয়ে তাতে অল্প করে তেল দিন। তেলটা ভালো রকম গরম হলে, তাতে হিং, জিরা, দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ এবং গোটা কাঁচা লঙ্কা ফেলে হাল্কা আঁচে কিছুক্ষণ মশলাগুলি নাড়িয়ে নিয়ে তাতে মাংসের পিসগুলি যোগ করে কমআঁচে রান্না করতে হবে। ১০-১৫ মিনিট মাংসটা রান্না করার পর অল্প করে জল মেশাতে হবে। আর তারপরেই কড়াইটা চাপা দিয়ে দিতে হবে। যখন দেখবেন মাংসের পিসগুলি হালকা খয়েরি রং নিতে শুরু করেছে, তখন কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো এবং সবকটি গুঁড়ো মশলা যোগ করতে হবে। সেই সঙ্গে এক চিমটে জাফরান, অল্প পরিমাণ দুধের সঙ্গে মিশিয়ে সেই মিশ্রনটাও মাংসের উপর ঢেলে দিতে হবে। তারপর কম করে ৩-৪ মিনিট রান্না করতে হবে। এরপরে স্বাদ অনুসারে নুন মেশানোর পর পরিমাণ মতো দই মাংসের উপর ছড়িয়ে দিয়ে আরও ৩-৪ মিনিট রান্না করতে হবে। এবার গরম মশলা, খোয়া,বাদামের পেস্ট এবং কেওড়া জল মেশানোর পালা। সবকটি উপাদান মেশানোর পর ধীমে আঁচে মাংসটা রান্না করতে হবে। যখন দেখবে মাটনের পিসগুলি নরম হতে শুরু করেছে, তখন আঁচটা বন্ধ করে দিতে হবে। এবার মাংসের উপরে ধনে পাতা এবং কাঁচা লঙ্কা ছড়িয়ে পরিবেশন করতে হবে।

মাটন কাবাব

মাটন কাবাব হল সেই আশ্চর্য খাবার, যা খেতেও হয় না, শুধু খাব ভাবলেই জিভে জল এসে যায়। চোখের সামনে ফুটে ওঠে ছাদের ওপর পাশাপাশি কয়েকটি ইট দিয়ে বানানো চুলা, যার নিচে কাঠ কয়লা জ্বলছে আর একদম ওপরে আড়াআড়ি রাখা রয়েছে তিন-চারটে লম্বাটে শিকের মধ্যে গেঁথে রাখা মাংসের লালচে-হলুদ টুকরো। আগুনের তাপে এদের গায়ে ছোপ ছোপ কালচে রং ধরছে, আর গা থেকে ভেসে আসছে ঝলসানো মাংসের হাল্কা সুগন্ধ, যার সঙ্গে একটা হাল্কা ধোঁয়াটে ভাপ মিলেমিশে অদ্ভুত মাদকতার সৃষ্টি করছে। এই মাংসর টুকরোগুলোর গায়ে নানান ভালো ভালো জিনিসপত্র বহুক্ষণ ধরে মাখিয়ে রাখার ফলে, তারা মাংসের শরীরের মধ্যে পুরোপুরি সেঁধিয়ে যেত পেরেছে। আগুনের তাপে যাতে মাংসের টুকরোগুলো বেশি না ঝলসে যায়, সেজন্যে মাঝে মাঝে ওদের গায়ে ব্রাশে করে মাখনের রূপটান বুলিয়ে দিতে হয়। এর ফলে যখন কাবাবেরা চুলা থেকে নামবে, তখন মুখে দিলে মনে হবে, কোনো জান-এ জিগর, জান-এ চমন, জান-এ তমন্না যেন আলতো করে এইমাত্র আপনার দুটো ঠোঁট স্পর্শ করে গেল! এই সময় রফি সাহেবের একটি রোমান্টিক গান শুনবেন হালকা ভল্যুইমে, তাহলে মৌতাত আরও জমে যাবে।

উপকরণ: খাসির সামনের রাং এর হাড় মাংস ১ কেজি, টক দই ২ টেবিল চামচ, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ৪ চামচ, ধনেপাতা বাটা ২ চা চামচ, পুদিনাপাতা বাটা ২ চা চামচ, পেঁপে বাটা ২ টেবিল চামচ, জিরা গুড়ো ১ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কাবাটা ২টি, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, সাদা তেল ২ টেবিল চামচ, নুন স্বাদ মতো, মাখন ৫০ গ্রাম।

প্রণালী: প্রথমে মাংসের ওপর থেকে পর্দা ছাড়িয়ে হাড় থেকে মাংস আলাদা করে ছোটো টুকরো করুন। তারপর একটি বোলে টুকরো মাংসের সঙ্গে মাখন বাদে সব উপকরণগুলো ভালো করে মাখিয়ে ২-৩ ঘণ্টা ম্যারিনেট করুন। এবার কয়েকটি শিকে মাংসের টুকরোগুলো পরপর গেঁথে ফেলুন। ওভেনে বা কাঠ কয়লায় আগুনে ২০-২৫ মিনিট ঝলসে নিন। ঝলসানোর সময় কাবাবগুলোর গায়ে অল্প অল্প মাখন মাখিয়ে দিতে পারলে খুবই ভালো হয়। খেয়াল রাখবেন মাংসগুলো যেন সম্পূর্ণ পুড়ে না যায়। তৈরি হলে পরিবেশন করুন সেদ্ধ ভেজিটেবলস এর সঙ্গে।

মাটন উইদ কলিফ্লাওয়ার অ্যান্ড কোরিয়েন্ডার

আরে আরে চমকে গেলেন নাকি! না না চমকে যাওয়ার মতো কোনো পদ এটা নয়। আসলে ফুলকপি আর ধনেপাতা দিয়ে রাঁধা খাসির মাংসের পদটির এটা হল বিলিতি নাম। পুরনো বাঙালি বাড়িগুলোতে শীতের শুরুতে যে দিশি ফুটফুটে ফুলকপি উঠত, তাকে যে কতভাবে অভ্যর্থনা জানানো হত তা বলার নয়! এইভাবেই কপি দিয়ে পাঁঠার মাংস রান্নাটিও বাঙালিদের কাছে বেশ পুরনো। আর মজা হচ্ছে এতে কপির স্বাদ এবং মাংসের আহ্লাদ দুই-ই সমানভাবে বিদ্যমান থাকে। মাংসটা সিনার বা মেরুদণ্ড ঘেঁষা হলে ভালো। কারণ না পারলেও, কপির পেলবতা এবং লাবণ্যকে তো তাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করতে হবে। এই পদটি খেতে হয় সেদ্ধ বাসমতী চালের ভাত দিয়ে, মানে যা অপূর্ব ঝরঝরে হবে শিউলিফুলের মতো কিন্তু কোনো নিজস্ব গন্ধ থাকবে না। এটা গঙ্গাবক্ষে স্টিমারের ছাদে বসে হাওয়া খেতে খেতে একাকী ঠুংরি শোনার মতো। যদি পাওয়া যায় খুবই ভালো, আর না পেলেও ক্ষতি নেই।

উপকরণ: এক কেজি টুকরা করে কাটা মাংস, ছয় টেবিল চামচ ভৈঁসা ঘি, তিনটি বড় সাইজের পেঁয়াজ, ছয় কোয়া রসুন, এক টুকরো আদা বাটা, দুটি টমেটো, এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, এক চা চামচ মরিচ গুঁড়ো, এক চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো, এক চা চামচ ধনে গুঁড়ো, দুই চা চামচ দই, নুন পরিমাণ মতো, আধ কেজি দেশি ফুলকপির ফুল, তিনটি মাঝারি চন্দ্রমুখী আলু টুকরো করা, মাখন ২৫ গ্রাম, কোয়ার্টার চা চামচ গুঁড়ো গরম মশলা, এক টেবিল চামচ ধনেপাতা কুচি।

প্রণালী: পেঁয়াজ, আদা ও রসুন, টমেটো কুচিয়ে নিতে হবে। একটা বড় ডেকচিতে ঘি গরম করে কুচোনো পেঁয়াজ, কুচোনো টমেটো, মরিচের গুঁড়ো, গরম মসলার গুঁড়ো ও হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে বাদামি করে ভাজতে হবে। প্রয়োজন হলে কয়েক চামচ জল দেওয়া যেতে পারে। এবার তাতে আগে থেকে প্রেসারে দুটি সিটি মেরে রাখা মাংসের টুকরো দিয়ে আরও পাঁচ মিনিট ভেজে নিতে হবে। পরিমাণ মতো জল, ফেটানো দই ও নুন মিশিয়ে ডেকচি ঢাকা দিয়ে মাংসটাকে পঁচিশ মিনিট আঁচে বসিয়ে রাখতে হবে। বড়ো বড়ো টুকরো করে ফুলকপি আর আলু কেটে মাংসের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে। ঢাকা দিয়ে ঢিমে আঁচে আরও ১৫ মিনিট বসিয়ে রেখে মাখন দিয়ে দিতে হবে। কিছু পরে মাংস নরম হয়েছে বুঝে নামিয়ে নিয়ে গরম মশলা গুঁড়ো ও ধনেপাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করতে হবে।

ছবি: সংশ্লিষ্ট সংস্থার সৌজন্যে

• বাবা মহেশ ভাটের সঙ্গে
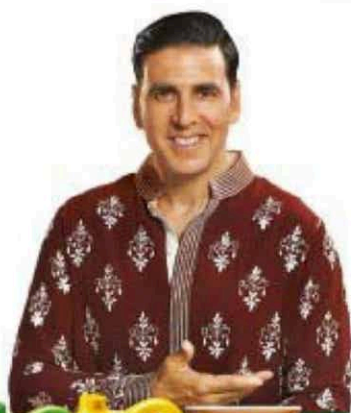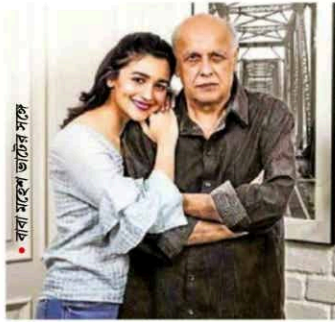
সন্দীপ রায়চৌধুরী

১৪ জুন ২০২০। এই একটা দিনের পর থেকে যেন বলিউড স্টারকিডদের দুনিয়াটাই আমূল বদলে গিয়েছে। সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর খবরটা যত দাবানলের মতো দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশে আছড়ে পড়তে লাগল, ততই যেন নেপোটিজমের তত্ত্ব সামনে এসে তারকা সন্তানদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলল। পথ-ঘাট থেকে সোশ্যাল মিডিয়া— সর্বত্রই টার্গেট হয়ে গেলেন হিন্দি ছবির সুপারস্টার নায়ক-নায়িকারা। বিশেষ করে সেইসব অভিনেতা-অভিনেত্রী যাঁরা তারকা পরিবারের সন্তান। আর 'সড়ক ২' ছবির ট্রেলার প্রকাশ্যে আসতেই এই বিদ্বেষের আগুনে ঘি পড়ল। নেটিজেনরা দায়িত্ব নিয়ে এই ছবির ট্রেলারকে বিশ্বের সবথেকে ঘৃণ্য বা জঘন্য ট্রেলারের তকমায় নিশ্চিত করে দিলেন। আক্ষরিক অর্থেই যেন 'সড়ক ২' রাস্তায় নামিয়ে আনল মহেশ-আলিয়া ভাটদের। সঞ্জয় দত্তর

ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার খবরও ছবিটিকে হেনস্তার হাত থেকে বাঁচাতে পারল না। করোনা পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এমনিতেই বিরাট ক্ষতির মুখে বলিউড। তারপর বলিউড সেলিব্রিটিদের বয়কটের ডাক গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দিয়েছে। আলিয়া ভাট-রণবীর কাপুর-সলমন খানদের ভবিষ্যৎ কী— তা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আগের কয়েক বছরের চিত্রটা কিন্তু মোটেই এরকম ছিল না। আলিয়ার আগমনে নতুন তারার আলোয় তখন উদ্ভাসিত বলিউড। বছর কয়েক আগে মুম্বইয়ের ফিল্ম সিটিতে কৌন বনেগা ক্রোড়পতির প্রেস কনফারেন্স চলছে। উপস্থিত আছে দেশের তাবড় সংবাদমাধ্যম। সঞ্চালক অমিতাভ বচ্চন তাঁর অভিনয়জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা সকলকে বলছেন। এই সময়ের কোন অভিনেত্রী ভবিষ্যতের তারা হয়ে দীর্ঘদিন বলিউডে নিজের রাজ্যপাট কায়েম করতে পারেন তা বলতে গিয়ে সেদিন দুজন অভিনেত্রীর নাম নিয়েছিলেন বিগ বি— দীপিকা পাড়ুকোন আর আলিয়া ভাট। সেদিন আরও একটা কথা জেনেছিলাম। কোনও নতুন অভিনেতার কাজ ভালো লাগলে অমিতাভ নিজের হাতে অভিনন্দন বার্তা দিয়ে একটা চিঠি পাঠান। আর সেটা গোপনেই। কিন্তু কথাটা সেদিন আর গোপন ছিল না। সেই সময়ের উঠতি অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান এই চিঠির কথা ফাঁস করে দিয়েছিলেন। অমিতাভ সেদিন বলেছিলেন, 'সোনু কে টিটু কি সুইটি' ছবিতে কার্তিকের অভিনয় দেখে আমার দারুণ লেগেছে। তাই ওকে আমি অভিনন্দন জানিয়েছিলাম, যা নতুনদের ক্ষেত্রে আমি করে থাকি।'এরকমই একটা হাতে লেখা চিঠি অমিতাভের কাছ থেকে পেয়েছিলেন আলিয়া ভাটও। আর সেটা নিজের জীবনের দ্বিতীয় ছবিতেই।

শৈশব, কৈশোর থেকে আলিয়ার সঙ্গী মা সোনি রাজদানই। বাবা মহেশ ভাটের সাহচর্য তেমন একটা পাননি তিনি। অভিনেত্রী মা সোনিই তাঁকে একার হাতে বড় করে তুলেছেন। আসলে মেয়েকে আলাদা করে সময় দেওয়া সম্ভব হতো না মহেশের পক্ষে। তিনি ব্যস্ত মানুষ, নামী প্রযোজক। ছবির জগতের মানুষদের নিয়েই মশগুল থাকতেন। তাই আলিয়ার কাছে মহেশ ছিলেন দূর আকাশের তারা। বাবা-মায়ের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নিয়েও খোলামেলা কথা বলেন আলিয়া। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'সিনেমায় আসার আগে আমি সেভাবে বাবাকে মিস করিনি কোনওদিন। কারণ বাবা কোনওদিনই আমাদের সঙ্গে সেভাবে থাকেননি। মা আমার ছোটবেলায় একসঙ্গে দু'জনের ভূমিকাই পালন করতেন। তাই বাবার অনুপস্থিতি আমি টের পাইনি। অনেকটা বড় হওয়ার পর একদিন হঠাৎই বাবা আমাদের সঙ্গে থাকতে শুরু করলেন। তখন থেকেই ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আর বলিউডে প্রবেশ করার পর বাবার গুরুত্ব আলাদা করে বুঝতে পারলাম।' তবে বাবা যে তাঁর জীবনের পথপ্রদর্শক একথা বলতেও দ্বিধা করেন না অভিনেত্রী। ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েই তাঁকে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিতেন মহেশ। আলিয়ার কথায়, 'বাবা বলতেন ভুল না করলে তুমি সঠিকটা চিনতে পারবে না। যদি ক্লাসের পরীক্ষায় কখনও ফেলও কর, ভেঙে পড়বে না। ভুল থেকে শিক্ষা নিতে পারলেই জীবনে মানুষ হতে পারবে।'

মায়ের দিক থেকে আলিয়া কাশ্মীরি-জার্মান ঐতিহ্যের বাহক। মহেশ গুজরাতি। সোনি হলেন মহেশের দ্বিতীয় স্ত্রী।

মহেশ-সোনি দুজনেই হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেও বিয়ের সময় দুজনেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। 'মহেশ ইজ অলওয়েজ রাইট হোয়েন হি সেজ দ্য রং থিংস। সিম্পল।' মহেশ ভাট সম্পর্কে চিত্রনাট্যকার সেলিম খানের এই অমর উক্তি দিয়েই এক লহমায় এই বোহেমিয়ান পরিচালকের ঘটনাবহুল জীবনের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। মহেশের বাবা নানাভাই হিন্দু ব্রাহ্মণ। হিন্দি ও গুজরাতি ছবির নামী প্রযোজক। আর মা শিরিন মহম্মদ আলি ছিলেন গুজরাতের মুসলিম পরিবারের সন্তান। শিরিনকে কোনওদিনই স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দেননি নানাভাই। শিরিন একার হাতেই মহেশকে বড় করে তোলেন। মাতুঙ্গার ডন বস্কো স্কুলে পড়তে পড়তেই নিজের হাতখরচ নিজে যোগাড় করে ফেলতেন মহেশ টুকটাক কাজকর্ম করে। মা-বাবার এহেন সম্পর্কও কিন্তু বিয়ে সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা আনেনি মহেশের মনে। বাল্যবন্ধু লোরেন ব্রাইটকে খুব অল্পবয়সেই বিয়ে করেন মহেশ। নিজের রোমান্টিক জীবনের আধারেই পরবর্তীকালে তৈরি করেন সুপারহিট ছবি 'আশিকি'। বিয়ের পর লোরেনের নাম হয় কিরণ ভাট। মহেশ আর লোরেনের দুই সন্তান-পূজা আর রাহুল।

মহেশ-লোরেনের প্রেমের মধুচন্দ্রিমা শেষ হয় মহেশের জীবনে ৭০-এর সুপারহিট নায়িকা পারভীন ববির আগমনে। কিন্তু পারভীন স্কিৎজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় এই প্রেমকাহিনীরও ট্র্যাজিক পরিণতি হয়। যে ঘটনার ছায়ায় মহেশ তৈরি করেন কঙ্গনা রানাওয়াত অভিনীত 'ও লমহে' ছবিটি। লোরেনের সঙ্গে ডিভোর্স নিয়েও বিবাদ চরমে ওঠে। কিন্তু ততদিনে মহেশের জীবনে চলে এসেছেন সোনি রাজদান। ডিভোর্স নিয়ে লোরেনের টালবাহানা আর সহ্য হচ্ছিল না মহেশের। সোনিকে বিয়ে করতে তাই মহেশ মা শিরিনের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

মুম্বইতে জন্ম হলেও আলিয়া আদতে ব্রিটিশ নাগরিক। তবে আলিয়া বোন শাহিনের মতো ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। আর পরিবারের মধ্যে মা আর বোনের কথার গুরুত্বই তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে মেন্টর প্রযোজক-পরিচালক করণ জোহর আর বন্ধু পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্যায়ের কথাও তিনি ফেলতে পারেন না। ছোটবেলা থেকেই চকোলেট, আইসক্রিম আর সোয়াবিন খেতে দারুণ ভালোবাসেন আলিয়া। মোটাসোটা ছিলেন বলে পরিচিতজনেরা তাঁকে 'আলু' বলেও ডাকতেন। অথচ সেই 'আলু'ই প্রথম ছবিতে অভিনয় করতে গিয়ে ১৬ কেজি ওজন ঝরিয়ে স্লিম-ট্রিম করে নেন নিজেকে। এখন আইসক্রিম চকোলেট খাওয়াও প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন। বদলে জায়গা করে নিয়েছে গ্রিন টি আর বাদাম। তবে একটা জিনিস এখনও তিনি ছাড়তে পারেননি। তা হল মুগ ডালের হালুয়া।

মহেশ ভাটের কন্যা হওয়ার জন্য বাড়তি সুবিধা পেয়েছেন এমনটা কখনও স্বীকার করেন না আলিয়া। বাবা নাকি তাঁকে কেরিয়ার নিয়ে কখনও টিপসও দেন না। আলিয়া বলছেন, 'বাবা কখনও কারও কাজে হস্তক্ষেপ করে না। এমন খুব কমই হয়েছে যে, ছবি সই করার আগে বাবার সঙ্গে আলোচনা করেছি।' তবে বাবার সঙ্গে তাঁর কথা হয় না, এমন নয়। সামনাসামনি কথা যদিও বা না হয়, ফোনে কথা আর মেসেজ চলতেই থাকে। আলিয়ার পরিবারের সঙ্গে বলিউডের যোগ বিরাট। শুধু কি মহেশ! মহেশের প্রথম কন্যা দিদি পূজা ভাটও অভিনেত্রী। প্রযোজক মুকেশ ভাট তাঁর কাকা। অভিনেতা ইমরান হাশমি আর পরিচালক মোহিত সুরিও তাঁর আত্মীয়। ফলে এহেন ফিল্মি পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা মেয়ের দিকে যে স্বজনপোষণের আঙুল উঠবে তা বলাই বাহুল্য। যদিও ইমরান হাশমি বা মোহিত সুরির মতো নিজেদের প্রযোজনা সংস্থাতেই আটকে থাকেনি আলিয়ার অভিনয়প্রতিভা। বাবার 'সংঘর্ষ' ছবিতে শিশুশিল্পী হিসেবে অভিনয়ে হাতেখড়ি হলেও করণ জোহরের টিনএজ ড্রামা 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার' ছবিটিই প্রথম জানান দেয় বলিউডে মহেশ-কন্যার আগমন বার্তা। এরপর থেকে করণের ধর্মা প্রোডাকশনই তাঁর ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে ওঠে। অর্জুন কাপুরের সঙ্গে '২ স্টেটস', ডেভিড ধাওয়ানের ছেলে বরুণ ধাওয়ানের সঙ্গে জুটি বেঁধে 'হামটি শর্মা কি দুলহনিয়া' আর 'বদ্রীনাথ কি দুলহনিয়া' এবং শাহরুখ খানের সঙ্গে 'ডিয়ার জিন্দেগি' ধর্মা প্রোডাকশন্সের একের পর এক ছবিতে হিট আলিয়া। এমনকী 'ডিয়ার জিন্দেগি'তে কিং খানের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিয়েছেন তিনি। 'হাইওয়ে', 'উড়তা পাঞ্জাব', 'রাজি' বা 'গালি বয়'— ভাট ক্যাম্প বা ধর্মা প্রোডাকশন্সের বাইরেও নিজের অভিনয়প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন আলিয়া। তাই তাঁর নামের আগে স্বজনপোষণের তকমা দিয়ে দেওয়াটা বোধহয় সমীচীন নয়। কিন্তু উপায়ও নেই। বাবা মহেশ ভাটের অসংযত জীবন বারবার চলে আসছে আতসকাচের তলায়। আর তার আগুনে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছেন আলিয়াও। জনতা জনার্দন যে তখন আর আলাদা করে তাঁকে দেখছেন না!

অথচ সাধারণ জীবনযাপন করার সুবাদে আর পাঁচটা মেয়ের মতোই তাঁর শৈশব কেটেছে। মুম্বইয়ের যমুনাবাই নার্সি স্কুলে পড়াশোনা। কিন্তু অভিনয়টা নিঃসন্দেহে তাঁর পারিবারিক সূত্রেই পাওয়া। কিন্ডারগার্টেনে একটি নাচের অনুষ্ঠানের রিহার্সাল করতে করতেই অভিনয়ের প্রতি ছোট্ট আলিয়ার আগ্রহ দেখে সোনি রাজদান তাঁকে কোরিওগ্রাফার শামক দাভারের কাছে নিয়ে যান। স্কুলের নাচের অনুষ্ঠানে বন্ধুদের সঙ্গে রিহার্সাল করছিল আলিয়া। একসময় ডান্স টিচার সকলকে নির্দেশ দেন, আলিয়াকে ফলো করে ওর মতো গাওয়ার চেষ্টা করো। এই যে সকলের মধ্যমণি হয়ে ওঠা, এটাই তাঁকে এই নাচ-গানের দিকে আকৃষ্ট করে। শামকের ইনস্টিটিউটে ভর্তি হওয়ার পর নাচ ছাড়া আর কিছু জানতেন না আলিয়া। মাত্র ৮ বছর বয়সেই নাচে তাঁর দক্ষতা দেখে শামক তাঁকে বয়সে বড় স্টুডেন্টদের সঙ্গে কোরিওগ্রাফ করতে থাকেন। বাবার প্রযোজনায় তৈরি 'সংঘর্ষ' ছবিতে প্রীতি জিন্টার ছোটোবেলার চরিত্রে অভিনয় করেন আলিয়া। তখনও অভিনয়কে সিরিয়াসলি নেওয়ার ভাবনা ছিল না। পরবর্তীকালে সেই শ্যুটিংয়ের স্মৃতি নিয়ে বলতে গিয়ে আলিয়া বলেছেন, 'আসলে আমি তখন খাবার প্যাকেট পাওয়ার লোভেই সেটে হাজির হতাম। শ্যুটিং-ট্যুটিং অতকিছু বুঝতামই না।' বাস্তবে তিনি কিন্তু এরকমই খোলা মনের মানুষ। রাখ-ঢাক করে কথা বলা তাঁর ধাতে সয় না। যা বিশ্বাস করেন তাই বলে দেন।

ছোটবেলার এই নাচের ট্রেনিংটা আলিয়ার কাজে লেগে যায় 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার' ছবিতে অভিনয়ের সময়। এই ছবির শ্যুটিংয়ের সময় ফিল্মমেকিং কী জিনিস, তার নানা ডিপার্টমেন্ট বা প্রোডাকশন ডিজাইন সম্বন্ধে কোনও ধারণাই ছিল না তাঁর। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে শ্যুটিং করতে হয়, এটুকুই জানতেন। তবে করণ তাঁর সুবিধে করে দিয়েছিলেন প্রথম দিনই একটা গানের সিকোয়েন্সে অভিনয়ের সুযোগ দিয়ে। একটা নার্ভাসনেস থাকলেও পরোক্ষে যেটা তাঁর সহায়কই হয়েছিল। জীবনের প্রথম ছবি সব শিল্পীর কাছেই

স্পেশাল। আলিয়াও তাঁর ব্যতিক্রম নন। সচেতনভাবে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, 'নিজেকে সুন্দর দেখানোর জন্য যে এত খাটতে হয় এটাই আমাকে অবাক করেছিল। কখনও ভাবিনি আমাকে ডায়েট করতে হবে। লেহেঙ্গা পরতে খুব ভালোবাসি। আর ভারী চেহারায় লেহেঙ্গা পরে নাচলে ক্যামেরায় আমাকে বিশ্রী দেখাবে সেটা জেনে অবাকই হয়েছিলাম। চোখের পাতা ফেলা থেকে দাঁড়ানো সবকিছুই এত বুঝে করতে হয়, না হলে ক্যামেরা আপনার সবকিছু ধরে নেবে।' প্রথম ছবিতে তাঁকে অবশ্য কেউই খুব একটা নম্বর দেননি। না দর্শক, না সমালোচক। তারকা সন্তান, আই ক্যান্ডি— ব্যস ওইটুকুই। তবে শুধু 'প্রেটি ফেস' হিসেবে থেকে যাবেন তিনি, সেটা একদমই চাননি আলিয়া।

ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করে দ্বিতীয় ছবিতেই। ইমতিয়াজ আলির পরিচালনায় 'হাইওয়ে'। বিয়ের আগে পালানো বীরা ত্রিপাঠির চরিত্রে আলিয়া যা অভিনয় করেন, তা অনেক অভিনেত্রীরই সারা জীবনের সম্পদ হয়ে থাকতে পারে। মজার ব্যাপার, বীরার জন্য আলি একটু বয়স্ক অভিনেত্রী খুঁজছিলেন। আলিয়াকে একঝলক দেখেই অবশ্য আলি বুঝেছিলেন মেয়েটা অল্পবয়সি হলেও বেশ ম্যাচিওরড। বীরার মতো এই মেয়েও মনে হয় নিজের জগতে থাকতে চায়। সুযোগ দিয়ে দেখাই যাক না! আলিয়াও দর্শকদের দেখিয়ে দেওয়ার আশা নিয়েই 'হাইওয়ে' ছবিতে সাইন করেন। ফার্স্ট ডে, ফার্স্ট শো দেখে আলিয়াকে অভিনন্দন জানাতে শাবানা আজমিকে নিয়ে সটান তাঁর বাড়ি চলে যান জাভেদ আখতার। অভিনন্দনবার্তা সহ চিঠি আর ফুল আসে অমিতাভ বচ্চনের কাছ থেকে। প্রথিতযশা অগ্রজদের থেকে এরকম অভ্যর্থনা পেয়ে আলিয়া বুঝতে পারেন তিনি সঠিক পথেই হাঁটছেন। ফিল্মি পরিবারের সন্তান হওয়ার ফলে একটা ঘেরাটোপের মধ্যে তিনি ছিলেনই। জুহুর বাইরের জগৎ তাঁর কাছে অপরিচিতই ছিল। 'হাইওয়ে' ছবিতে কাজ করতে গিয়ে দেশের অন্যান্য জায়গা ও মানুষদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হল তাঁর। পর্দা আর পর্দার বাইরের ফারাকটা ধরতে শিখলেন তিনি। শ্যুটিংয়ের সময় পরিচালক ইমতিয়াজ সহ গোটা ইউনিটের সঙ্গে ভারতের ৬টি রাজ্যতে যেতে হয়েছে তাঁকে। হিমাচলপ্রদেশের কাজায় প্রচণ্ড ঠান্ডায় রাস্তায় বসে হাত দিয়ে ম্যাগি খেয়েছেন যেমন, তেমনই ছবির চরিত্র বীরার মতোই জীবনে প্রথমবার গাছে চড়ার অভিজ্ঞতাও এই ছবিতে কাজ করতে করতেই হয়েছে। আর এটাই যে তাঁকে অভিনেত্রী হিসেবে পরিণত করেছে সেকথাও উপলব্ধি করেছেন তিনি। বলেছেন, 'আসলে ইমতিয়াজ এমনভাবে ছবিটা শ্যুট করেছিলেন যাতে বীরা নিজেকে পর্দায় আবিষ্কার করে। আর সেটা করতে গিয়ে বাস্তবে নিজের সঙ্গে আমার পরিচয় হতে থাকে। দুটো পাশাপাশি জীবন যেন একসঙ্গে চলছিল। হাইওয়ে যে আমাকে অভিনয় জীবনের হাইওয়েতে পৌঁছে দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।'

ছোটবেলায় 'দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে যায়েঙ্গে' বা 'ক্যায়ামত সে ক্যায়ামত তক'-এর মতো রোমান্টিক সিনেমা দেখতে পছন্দ করতেন তিনি। খুব ভালো লাগত 'দিল হ্যায় কি মানতা নেহি'তে দিদি পূজা ভাটকে। আর পছন্দ ছিল জুহি চাওলাকে। জুহির জন্য 'হাম হে রাহি পেয়ার কে' যে কতবার দেখেছেন! ক্যামেরার সামনে একটা উচ্ছল ভাবমূর্তি তাঁর।

• মা সোনি রাজদানের সঙ্গে

• ব্রহ্মাস্ত্র ছবির শ্যুটিংয়ের অবসরে অমিতাভ বচ্চন ও রণবীর কাপুরের সঙ্গে

• তিন ভাই-বোন আলিয়া, পূজা ও রাহুল

এমনিতে তিনি বেশ ছটফটেও। অল্পবয়স আর এই বালিকাসুলভ ভাবমূর্তির জন্য অনেকসময় সিরিয়াস রোল হাতছাড়াও হয়েছে। জনসম্মুখে আলিয়াকে যতটাই টমবয় আর চটপটে মনে হোক বাস্তবিকে তিনি কিন্তু একটু অলস প্রকৃতির। ঘুমানো তাঁর ফেভারিট পাসটাইম। তবে তাই বলে ফিটনেসের সঙ্গে আপস করেন না। নিজেকে ফিট রাখতে ভোর ভোর উঠে ব্যায়াম করেন। তারপর নিয়ম করে হাঁটেন। তাঁকে দেখে যাই মনে হোক নিজেকে লাজুক আর অন্তর্মুখী বলেই দাবি করেন আলিয়া। যদি কখনও মন খারাপ হয় তাহলে কেঁদে নিজেকে হালকা করেন তিনি।

'হাইওয়ে'র পরপরই চেতন ভগতের বেস্টসেলার অবলম্বনে তৈরি 'টু স্টেটস' ছবিতে অভিনয় করেন আলিয়া। হাইওয়ে'র মতো এই ছবির প্রযোজনা করেন সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা। ইন্ডাস্ট্রির প্রবীণ এই প্রযোজকও আলিয়ার অভিনয়ে মজে। 'যে মেয়ে বীরা করার পাশাপাশি আইআইএম আমেদাবাদের তামিল এমবিএ হিসেবে নজর কেড়ে নিতে পারে, আবার সে-ই হামটি শর্মা..য় এমন একটা মেয়ের চরিত্র করে যার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য একটা ডিজাইনার লেহেঙ্গা পরা, সেটাও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। অভিনয়ের এই রেঞ্জ কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির অনেকেরই নেই', স্পষ্ট বলছেন সাজিদ। এখনও ত্রিশ ছোঁননি অভিনেত্রী কিন্তু ইতিমধ্যে বেশ কিছু ম্যাচিওরড চরিত্র করে ফেলেছেন। মহিলাদের অধিকার নিয়ে 'ক্যুইন' খ্যাত পরিচালক বিকাশ বহেলের একটি ভিডিও 'গোইং হোম'-এ অভিনয় করেন আলিয়া। ভিডিওটি এমন মহিলাদের কথা বলে যাঁরা সমস্ত সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে পারেন। এই ভিডিওটা লক্ষ মানুষের সঙ্গে হৃদয় জিতে নেয় হলিউড স্টার অ্যাস্টন কুচারেরও। নিজের অভিনয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ভালোবাসলেও শুধুমাত্র মুখ দেখানোর জন্য অভিনয় করাটা না পসন্দ আলিয়ার। ছবি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে চরিত্রের দৈর্ঘ্য নয়, ছবির গুরুত্বটাই আসল বলে মনে করেন তিনি। হাতে সময় আছে বলেই ছবি করতে হবে এমনটাও ভাবেন না। তবে বাস্তবটাও অস্বীকার করেন না। 'বলা যায় না এমন একটা দিন হয়তো আসবে যেদিন হাতে কোনও কাজ থাকবে না। আর তখন যা অফার আসবে তাই আমাকে আঁকড়ে ধরতে হবে', আশঙ্কা তাঁর।

সুশান্তের মৃত্যুর পর স্বজনপোষণ ইস্যুকে ঘিরে ব্যাপক ট্রোলের মুখে পড়তে হয়েছে আলিয়াকে। অন্যদিকে সুশান্তের বান্ধবী রিয়া চক্রবর্তী ও মহেশ ভাটের সম্পর্ক নিয়েও সোশ্যাল মিডিয়ায় কম কাটাছেঁড়া হয়নি। কিন্তু তাই বলে ফাদার্স ডে'তে সোশ্যাল মিডিয়ায় বাবাকে শুভেচ্ছা না জানালে চলে? যাই হোক, বাবা তো। আর তাঁকে জনতা যতই আক্রমণ করুন তিনি দমে যাওয়ার পাত্রী নন। আলিয়া লেখেন, 'আমার বাবা, আমার বন্ধু, আমার শক্ত পাহাড়, যখন আমার আশ্রয় নেওয়ার দরকার হয়। আবার আমার জল, যখন আমি সাঁতার কাটতে চাই। আমার হাওয়া যখন আমি উড়তে চাই। একটা মানুষের মধ্যে এতগুলো মানুষ কীভাবে পাওয়া সম্ভব? তুমি আমার জীবনে খুব স্পেশাল ড্যাডি, আমি কৃতজ্ঞ যে আমি তোমার মেয়ে! ধন্যবাদ আমাকে আমার মতো করে তোলবার জন্য এবং তোমার মতো হওয়ার জন্য।'

সুশান্তের আত্মহত্যার পর ভাইরাল হয় আলিয়ার 'কফি উইথ করণ' রিয়েলিটি শো-এর একটি পুরনো ভিডিও

ফুটেজ। সেখানে করণের একটি মজার প্রশ্নে দেখা যায় আলিয়া বলছেন, সুশান্তকে তিনি খুন করতে চান। যদিও তৎক্ষণাৎ সুশান্তের কাছে ক্ষমাও চেয়ে নেন আলিয়া। তবু এই ফুটেজ দেখে নেটিজেনরা মনে করেন সুশান্তকে তাচ্ছিল্য করেছেন তিনি। সঙ্গে স্টারকিড তকমা থাকায় সোশ্যাল মিডিয়া ট্রোলিং এবং বুলিংয়ের মুখে পড়েন নায়িকা। বাধ্য হয়ে কিছুদিনের জন্য ইনস্টাগ্রামের কমেন্ট সেকশনে বিধিনিষেধ আরোপ করেন। সুশান্ত ইস্যুতে হু হু করে কমতে থাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে তাঁর ভক্তের সংখ্যা। এই লেখা প্রেসে যাওয়ার সময় পর্যন্ত যদিও ইনস্টায় তাঁর ফলোয়ার সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে তাঁর এই ওঠাপড়াকেও স্বাভাবিকভাবেই নিচ্ছেন আলিয়া। পজিটিভের সঙ্গে নেগেটিভের সহাবস্থানেই বিশ্বাসী তিনি। 'যদি নেগেটিভিটি নাই থাকে জীবনে, তাহলে জীবন বোরিং হয়ে যায়। এমন কাউকে নিশ্চয়ই প্রয়োজন জীবনে যার আমাকে পছন্দ হবে না। ফলে যাঁরা আমাকে পছন্দ করছেন না, তাঁদের ওপর আমি রেগে যাই না। বরং সেই ডিজলাইকগুলোকে লাইকে পরিণত করতে ভালোবাসি।' তাছাড়া সোশ্যাল মিডিয়ার রিচ অনেক বেশি হলেও এই মাধ্যমকে 'ফেক' বলেই মনে করেন আলিয়া। আর এই 'ফেক' শব্দটাতেই তাঁর প্রচণ্ড আপত্তি। ফেক ভাবে নিজেকে তুলে ধরতে একদমই পছন্দ করেন না। তাই ইনস্টাগ্রামে ছবি পোস্ট করলে ফিল্টার করার পক্ষপাতী নন তিনি। আর যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়ায় যা খুশি বলা যায়, তাই এই ধরনের মন্তব্যে রি-অ্যাক্ট করেন না। সেরকমই কাজের ক্ষেত্রেও কেউ তাঁর সমালোচনা করলে গুটিয়ে যান না অভিনেত্রী। বলেছেন, 'সমালোচনা নিঃসন্দেহে কষ্ট দেয়, কিন্তু তাতে ভয় পেয়ে যাই না। কখনও সমালোচককে পাল্টা আক্রমণও করি না। বরং আমার মনে হয়, আমি নিশ্চয়ই সব ঘেঁটে ফেলেছি। হয়তো মিনিট পনেরো মনখারাপ করে বসে থাকি। তারপর সবকিছু ঝেড়ে ফেলে আবার নতুন উদ্যমে নেমে পড়ি।'

তবে কেরিয়ার নিয়ে কখনওই খুব একটা পরিকল্পনা করে চলেন না পূজা ভাটের অভিনেত্রী বোন। স্টারডম নিয়েও খুব বেশি মাথা ঘামান না। কারণ তিনি জানেন, স্টারডম আজ আছে, কাল নাও থাকতে পারে। একবার তা চলে গেলে সেই পরিস্থিতিটা কাটানো সহজ নয়। এই উপদেশও তিনি বাবার থেকেই পেয়েছেন। তাই ছবি ভালো চললে তিনি উচ্ছ্বাসে ভাসেন না। জানেন পরের ছবিটাই ফ্লপ করতে পারে। একটা সময় ছিল যখন তিনি ভাবতেন বয়সের কারণে তাঁর ভালো ভালো চরিত্র হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। সেইসময় অল্প বয়সের জন্য দর্শকও তাঁকে সিরিয়াসলি নিতেন না। কিন্তু জীবনের নৌকো এক জায়গায় থেমে থাকে না। 'সাফল্য দিয়ে আমার কাজকে মাপি না। আবার ব্যর্থতাকে আঁকড়ে ধরেও বাঁচি না। বিশ্বাস করি, পরের বার ঠিক ঘুরে দাঁড়াব', বলছেন আলিয়া। 'হাইওয়ে' বা 'গালি বয়'র সাফল্য তাই তাঁর মাথা ঘুরিয়ে দেয়নি। আসলে আলিয়ার চেরফোবিয়া রয়েছে। এটা এমন একটা রোগ যেখানে এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি প্রচণ্ড খুশির মধ্যেও দুঃখের আশঙ্কা করে। ভয় পায়। আলিয়ারও মনে হয়, একদিন তাঁর সব যশ-খ্যাতি চলে যেতে পারে। নিজেই স্বীকার করেছেন, 'ব্যক্তিগত আর কর্মক্ষেত্র দু'জায়গাতেই আমি চেরফোবিয়ায় ভুগি। তাই সাফল্যকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। ভয় হয় যদি সব হারিয়ে ফেলি।'

কেরিয়ারের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও পরিকল্পনা অনেকটাই সেরে ফেলেছেন আলিয়া। 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার' ছবির পর তাঁর সঙ্গে সিদ্ধার্থ মালহোত্রার সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন উঠেছিল। পরে অবশ্য রণবীর কাপুরের সঙ্গে সম্পর্কের রটনাকেই মান্যতা দেন তিনি। ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে ছেলে রণবীরের সম্পর্কের সময় আপত্তি তুলেছিলেন রণবীরের বাবা ঋষি কাপুর। আলিয়ার সঙ্গে অবশ্য সেটা হয়নি। জুহুর বিখ্যাত 'কৃষ্ণভিলা'য় আলিয়ার নিয়মিত যাতায়াত। প্রয়াত ঋষি যখন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে আমেরিকায় চিকিৎসাধীন ছিলেন, তখনও হবু শ্বশুরমশাইকে দেখতে সেখানে উড়ে গিয়েছিলেন আলিয়া। রণবীরের মা নীতু সিং আর দিদি ঋদ্ধিমার সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ভালো। কোভিড পরিস্থিতি না হলে এতদিনে কাপুর পরিবারের বউ হয়ে রণবীরের বাড়িতে প্রবেশ ঘটত আলিয়ার। করোনাই সে খুশিতে বাধা হয়ে দাঁড়াল। ঋষির মৃত্যুর পরেও বিয়ের প্রস্তুতিতে ভাটা আসেনি। কিন্তু বিয়ের জন্য যে ডিজাইনার লেহেঙ্গার অর্ডার দিয়েছিলেন সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়কে, সেই অর্ডার আপাতত স্থগিত করেছেন আলিয়া। তবে রণবীর-আলিয়া দু'জনেই জানিয়েছেন বিয়েতে খুব বেশি দেরি তাঁরা চান না। সম্ভবত কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই আগামী বছরের শুরুতে কাপুর খানদানের সঙ্গে ভাট পরিবারের সম্পর্কে সিলমোহর পড়বে। তবে রণবীর কাপুর অবশ্য জানিয়েছেন, শুধু কোভিড নয়। বিয়ে পিছনোর অন্য কারণও রয়েছে। এ বছর সব শিডিউল এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। শ্যুটিংয়ের জন্য বুক করা 'ডেট'ও বদলাতে হচ্ছে। এরমধ্যে বিয়ের চাপ না নিয়ে বরং ধীরেসুস্থে আগামী বছরই বিয়ের পরিকল্পনা করতে চান আলিয়া।

আসলে রুটিনমাফিক জীবন কাটানো বোধহয় আলিয়ার পক্ষে সম্ভব নয়। জীবনে যতটুকু নিয়ম মেনে চলা উচিত সেটা করেন, কিন্তু বাড়াবাড়ি একদমই নয়। খুব ডিসিপ্লিনড হলে তাঁর দম আটকে আসে। সেজন্যই অভিনয় তাঁর ভালো লাগে। কত রকমভাবে, কত ধরনের চরিত্রে নিজেকে এক্সপ্লোর করা যায়। অভিনয়ের জন্য সেই চরিত্রতে নিজের একশো শতাংশ দেন। নাওয়া-খাওয়া প্রায় ভুলে যান। কেরিয়ারের শুরুর দিকে একবার বলেছিলেন, পরিণীতি চোপড়াকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করেন আলিয়া। এখন বলিউডের পয়লা নম্বর নায়িকার আসনের দৌড়ে দীপিকার সঙ্গে আলিয়ার দ্বৈরথই দেখেন ফিল্মি বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু আলিয়া নম্বর গেমে বিশ্বাসীই নন। তাঁর মতে, 'অ্যাক্টিং শুড বি মেজারড বাই কোয়ালিটি, নট কোয়ান্টিটি।' পরিণত আলিয়া এটাও বুঝেছেন, বেশি বয়সে পৌঁছেও কেউ সাফল্যের সিঁড়ির সন্ধান পেতে পারে। নিজে সাফল্য পেয়েছেন এটাও মানতে চান না। আর এটা তাঁর বিনয় নয়। আলিয়া এরকমই।

ব্যক্তিগত জীবনে মুডি আর অ্যাডভেঞ্চারাস বলেই অভিনয়ের মধ্যেও সবসময় বৈচিত্র্য খুঁজে বেড়ান আলিয়া। তাই তাঁর সিভি'তে যেমন 'হাইওয়ে', 'রাজি' বা 'গালি বয়' আছে, তেমনই 'হামটি শর্মা..' বা 'কলঙ্ক'র মতো ছবিও আছে। চিত্রনাট্য আর পরিচালকের কথা মাথায় রেখেই সাধারণত নতুন ছবি সাইন করেন তিনি। প্রত্যেকটা ছবির আগে আলিয়া ঠিক করে নেন, এবার এমন কিছু একটা করবেন যাতে নিজেই অবাক হয়ে যান। গ্ল্যামারাস চরিত্রের পাশাপাশি ডি-গ্ল্যাম চরিত্রেও চুটিয়ে অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা আদায় করে নিয়েছেন। তবু আলিয়া মনে করেন গ্ল্যামারাস চরিত্রে অভিনয় করাটা বেশি কঠিন। কেন? আলিয়ার কথায়, 'গ্ল্যামারাস হওয়া কিন্তু সহজ নয়। আমি দু'ধরনের চরিত্রেই কাজ করেছি বলেই জানি ব্যাপারটা কতটা

কঠিন। ড্রেস, মেক আপ, হেয়ার স্টাইলিং সবকিছুই যাতে নিখুঁত হয় তা নিয়ে সবসময় তটস্থ থাকতে হয়। একটু এদিক-ওদিক হলে নিস্তার নেই।' তাই ব্যক্তিগত জীবনে খুব বেশি সাজগোজ করা তাঁর পছন্দ নয়।

আর পছন্দের মানুষ কেমন হবে? রণবীর কাপুরকে কী দেখে পছন্দ করলেন তিনি? এককথায় আলিয়া উত্তর দেন 'বন্ধুত্ব'। আসলে প্রেম তো একপ্রকার বন্ধুত্বই। আর আলিয়া মনে করেন শুধু প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কেই নয়, প্রতিটি সম্পর্কেই বন্ধুত্ব ভীষণ জরুরি। একমাত্র বন্ধুকেই বিশ্বাস করা যায়, মনের আগল খুলে সবকিছু বলা যায়। এই বিশ্বাস না থাকলে কোনও সম্পর্কই মজবুত হয় না।

করণ জোহরকে নিজের মেন্টর বললেও বিয়ে নিয়ে তাঁর পরামর্শে কান দেননি আলিয়া। রণবীর কাপুরকে বিয়ে করা নিয়ে নাকি খুশি ছিলেন না করণ। কেন? করণের জনপ্রিয় টক শো 'কফি উইথ করণ'-এর সম্প্রচারিত না হওয়া একটি পর্বের কিছু ক্লিপিংস লিক হয়ে যাওয়ার পরেই এই তথ্য সামনে আসে। দেখা যায়, আলিয়া যাতে সাত তাড়াতাড়ি বিয়ের পিঁড়িতে না বসেন সেই জন্য আলিয়াকে বোঝাচ্ছেন করণ। আলিয়া নিজেও যে ত্রিশের আগে বিয়ে করতে উৎসাহী ছিলেন, এমন নয়। কিন্তু প্রেমে কী না হয়! ঋষিপুত্রর প্রতি টান আলিয়ার সংকল্পে জল ঢেলে দেয়। আর এখানেই আপত্তি করণের। চটজলদি বিয়ে করে বহু নায়িকার কেরিয়ার শেষ হয়ে গিয়েছে, এমন নানা উদাহরণ দিয়েও আলিয়ার মন ঘোরাতে চেয়েছিলেন করণ। কিন্তু আলিয় নাছোড়। নিজের প্রথম জীবনের বয়ফেন্ডদের থেকে রণবীর কতটা আলাদা সেটাও একটি সাক্ষাৎকারে বলেন আলিয়া। রণবীর তাঁকে নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছেন একথা যেমন স্বীকার করেন আলিয়া, তেমনই এটাও বলেন যে কাপুর প্রজন্মের নবতম সুপারস্টারের সান্নিধ্য তাঁকে কমফোর্ট জোনে থাকতে সাহায্য করে। রণবীর, আলিয়ার বিয়ে নিয়ে এমনই হাইপ তৈরি হয়েছিল সংবাদমাধ্যমে যে একসময় সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের একটি ভুয়ো আমন্ত্রণপত্রও ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল। অয়ন মুখোপাধ্যায়ের 'ব্রহ্মাস্ত্র' সায়েন্স ফিকশন। এছাড়াও রণবীরের হাতে রয়েছে 'শামসেরা'। অন্যদিকে প্রেমিক রণবীরের তুলনায় 'বেশি ব্যস্ত' আলিয়া। 'গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি' ছাড়াও তাঁর হাতে রয়েছে করণ জোহরের 'তখত'। সেই ছবির স্টারকাস্টও দুর্দান্ত। রণবীর সিং, করিনা কাপুর, ভিকি কৌশল, ভূমি পেডনেকর, জাহ্নবী কাপুর। কথা হয়েছিল সলমন খানের সঙ্গে সঞ্জয় লীলা বনশালির 'ইনশাআল্লাহ' ছবিরও। তবে এই ছবিটির ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত। সে যাই হোক, আলিয়া-রণবীরের বিয়ে যে দীপিকা পাড়ুকোন-রণবীর সিং আর প্রিয়াঙ্কা চোপড়া-নিক জোনাসের পরে বলিউডের সবথেকে হাইপ্রোফাইল বিয়ে হতে চলেছে, তা নিঃসন্দেহে লিখে ফেলা যায়।

তবে শুধু লাইফ পার্টনারের ক্ষেত্রেই নয়, এমন মানুষদের সঙ্গে মিশতে পছন্দ করেন তিনি যাঁদের থেকে পজিটিভ এনার্জি পান। চান তাঁর সারল্য যেন ধরে রাখতে পারেন আজীবন। সাফল্য চিরদিন ধরা দেবে না, বিলক্ষণ জানেন। বরং খেয়াল রাখেন, সাফল্য যেন কোনওভাবেই তাঁর মাথা না ঘুরিয়ে দেয়। মাটিতে পা রেখেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চান আলিয়া ভাট। ♦♦

ছবি: সংশ্লিষ্ট সংস্থার সৌজন্যে

ডিয়ার হয়ে উঠছে প্রিয় সবার কাছে

SIKKIM STATE LOTTERIES

ডিয়ার
দুর্গা পুজা বাম্পার

প্রথম পুরস্কার

টিকিট মূল্য ₹২০০০

₹ ১০ কোটি

15600793

(Including Super Prize Amount)

(₹5 Crores x 2 Prizes)

দ্বিতীয় পুরস্কার ₹ ২ কোটি (₹1 Crore x 2 Prizes) (Including Super Prize Amount)

টোটাল স্কীম ২ লাখ টিকিট মাত্র

(1st Prize Rs.10 Crores & all other prizes will be drawn within this 2 lakh tickets only)

তৃতীয় ড্র ২৪.১০.২০২০ | ড্র-এর সময় সন্ধ্যা ৮ টায়